আনন্দ ভবন

এলাহাবাদ, ১লা মে ১৯৩৮

জয়শ্রী সম্পাদিকা মহাশয়েষু—

২২সি, অশ্বিনী দত্ত রোড্

বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

প্রিয় বন্ধু,

আপনার ২৪শে এপ্রিলের পত্র পাইলাম। জয়শ্রীর বিগত বৎসরের অবদানের কথা মনে করিয়া আমি উহার জন্য একটী প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম। বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের কবলে পড়িয়া ইহার উদ্যোগীগণ যেরূপ দুঃখ বরণ করিয়াছেন, তাহা যে কোন পত্রিকার পক্ষে শ্লাঘনীয় হইত। মহিলা পরিচালিত পত্রিকার পক্ষে ইহা বিশেষ ভাবেই গৌরবের কথা।

পত্রিকাখানি পুনরায় প্রকাশিত হইবে জানিয়া আমি অতীব প্রীত হইলাম ও ইহার প্রতি আমার শুভেচ্ছা প্রেরণ করিতেছি কিন্তু আমার অনবসর হেতু কোন প্রবন্ধ দেওয়া বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আপনার বিশ্বস্ত

জহরলাল নেহেরু

"জয়শ্রী"র পুনরাবির্ভাব আমি পরম সমাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। গত কয়েক বৎসর সমস্ত দেশের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, "জয়শ্রী"র প্রতিষ্ঠাত্রীমণ্ডলও তাহা হইতে নিস্তার পান নাই। আজ সেই ঝটিকাশেষে দেশ আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে সচেষ্ট। নূতন কালের, নূতন পরিবেশের উপযোগী চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারার সন্ধান করিতেছে। "জয়শ্রী" দেশের এই পরমক্ষণে সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মসন্ধানের সাধনাকে জয়যুক্ত ও শ্রীমণ্ডিত করুক ইহাই আমার নিবেদন।

শ্রীসুভাষ চন্দ্র বসু

৩০।৫।৩৮



জয়শ্রী পুনঃ প্রকাশিত হইবে জানিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। বিশেষ প্রশংসার বিষয় যে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকাখানি সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। ইহার সাফল্য কামনা করিতেছি। আশা করি পত্রিকাখানি আমাদের ভগ্নিদের উন্নতিকল্পে ও আমাদের দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে সবিশেষ সহায়তা করিবে।

বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগ,

যুক্ত প্রদেশ।

জয়শ্রীকে আমার সানন্দ অভিনন্দন জানাইতেছি। আমি ইহার সুদীর্ঘ এবং সার্থক কর্ম্মজীবন কামনা করি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমানে নারী-প্রচেষ্টার সংখ্যা অধিক নহে। দিনে দিনে ইহার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়া চলিয়াছে। কাজেই, যদিও আর্থিক এবং রাজনৈতিক আদর্শগুলি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে আমাদের সামাজিক চিন্তাধারা এখনও পিছাইয়া রহিয়াছে। আমরা এ বিষয়ে অতীতের বন্ধন হইতে অনেকাংশে মুক্তিলাভ করিয়াছি কিন্তু প্রাচীন রীতিনীতি এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বের নিদর্শনকে আমরা সোৎসাহে সম্বর্দ্ধিত করি, কিন্তু সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সুনজরে দেখি না।

আমাদের সাহিত্যে বর্ত্তমানে সামাজিক জীবন এবং মানসিক ও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নূতন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নির্ভীক নির্দ্দেশের একান্ত অভাব। যখন আমাদের আর্থিক জীবন পুরাতনের বন্ধন ছিড়িয়া নূতনের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে তখন পুরাতন সামাজিক রীতি এবং আদর্শের মাপকাঠি বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা অযৌক্তিক। নূতন অবস্থা তদনুরূপ ব্যবস্থা চায়। এ বিষয়ে নারীকেই অগ্রণী হইতে হইবে, এবং অকুণ্ঠ নির্ভীকতায় এই সকল নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়া সর্ব্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন সত্বেও আপনাদের জন্য নূতন পথ এবং নূতন জীবনধারা গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু ইহার জন্য প্রথমে চিন্তা জগতে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আদর্শ বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে মনোরাজ্যে তাহাকে রূপ দান করিতে হয়।

আমি আশা করি এই পত্রিকা এই মহান্ কর্ম্মে আত্মোৎসর্গ করিবে, এবং নির্ভয়ে অসুন্দর প্রথাগুলির পবিত্রতার মুখোস অপসারিত করিয়া ধর্ম্মাচারের অন্তরালে অবস্থিত কুরূপ নগ্ন সত্যকে উদ্ঘাটিত করিবে। নারীজাতির সমস্যা সম্বন্ধে সমাজ নির্ম্মম ভাবে আপনার সনাতন কঠোরতা অক্ষুণ্ণ রাখিবে; আমাদের কর্ত্তব্য সেই জন্য আরও মহান্। অন্যের বিধিবিধানের দাস না হইয়া নিজেদের জন্য চিন্তা করিবার, নিজেদের শুভাশুভ বাছিয়া লইবার শিক্ষা নারীকে দিতে হইবে। আজ পুরুষ নিজের জন্য এক বিধান এবং নারীর জন্য অন্য বিধান নিজের এবং নারীর জন্য নৈতিক আদর্শের পৃথক পৃথক মাপকাঠি সৃষ্টি করিয়াছে,—ইহা কি সামাজিক জীবনের পবিত্রতা এবং ন্যায় বিচারের পরিপোষক? একমাত্র নারীই ইহার প্রতিবিধান করিয়া ন্যায়ের মানদণ্ড ধারণ করিতে পারে।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

আপনার ২৮শে তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ। পত্রখানি আমি মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে পাইয়াছি। মেয়েদের পত্রিকা বাহির করিবার জন্য আপনাদের অবিচলিত, ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি। মেয়েদের কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য মেয়েদের সমস্যা-বিষয়ক সাহিত্যের একান্ত অভাব থাকাতে বর্ত্তমানে আমাদের দেশের জাতীয় এবং সামাজিক আন্দোলন বাধা পাইতেছে। আমাদের বাঙ্গালী সহকর্ম্মীগণ জয়শ্রীর মধ্য দিয়া এই অভাবপূরণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেছি। ......

হাজ্‌রা বেগম

সাহিত্যসেবা ও সমাজহিত চিন্তা পুরুষেরই কেবল একচেটে নয়। স্ত্রী পুরুষের সংযোগেই সমাজের সৃষ্টি। তথাপি যদি যোগ্যতার তারতম্যও বিচার করতে বসা যায় ত' আমার বিচারে মনে হয় এই দুইয়ের মধ্যে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীর অধিকারই বেশী। চিন্তাশীলতা ও নিঃস্বার্থ সেবায়ও ওঁদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য আমি যখন প্রথম শুনি যে সাহিত্য-সেবার ক্ষেত্রে "জয়শ্রী" রূপ প্রকাশ করছে তখন অত্যন্ত আনন্দানুভূতির সঙ্গে এ কথাও মনে হ'য়েছে যে "জয়শ্রী" যেন কেবল স্ত্রী জাতির হিতাহিত বিচারেই তাঁদের দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে সারা মনুষ্য সমাজের ভাল মন্দের দিকেও দৃষ্টি রাখেন। কেবল স্ত্রী জাতির প্রতি নিজ লক্ষ্যকে আবদ্ধ রাখাটাও এক রকমের সাম্প্রদায়িকতা। সৃষ্টির অনাদি কাল থেকে ভারতীয় নারী সেই উদারতারই প্রতীক হ'য়ে আসছেন। আশা ও প্রার্থনা এই যে "জয়শ্রী" যেন সেই যশোগীতিই কীর্ত্তন করেন।

কাকা সাহেব কালেলকার

স্বরূপ

(সনেট্)

শ্রীমতী সাহানা দেবী (পণ্ডিচেরী)

দূর অম্বরের পূর্ব্ব-ভাল রাঙি' নিঃশব্দে খুলিল
উদয়-তোরণ—আলো-অধিপের প্রথম সম্ভাষ—
আবেশে চাহিনু, দেখি তারি ফাঁকে উল্লোলি' উঠিল
লহমায় শাশ্বতের অতুলন একটি উদ্ভাস !

ঘুচিল পরিধি মোর, হেরিলাম গহনে আমার
অনাদি অনন্ত রাজ্য, স্তরে স্তরে বৈভব-নিশানা।
প্রসিত মালঞ্চ-মর্ম্মে শ্বেত পদ্ম-কোরক সম্ভার
মুঞ্জরে সঙ্কেতে কার,—মন্দ্রে বাজে অশ্রুত অজানা !

আমারো সৈকত চুমি' সুনীলোচ্ছল নীরনিধি
ভাঙিছে গড়িছে কূল তরঙ্গের নৃত্য মূর্চ্ছনায়
ফেনিল-মঞ্জির রোলে গুঞ্জরিত চিরন্তন-গীতি
দিগন্ত-বিতত-বক্ষে উদ্বেলিয়া মুক্তিরে দোলায় !

পূর্ণ আমি অন্তর্লোকে···বাধাহীন···নির্লিপ্ত···অপার···
অমৃতের শুভ্রশিশু···মৃত্যুহীন···অ-সান্ত···উদার !

মেয়েদের শিক্ষা

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

গত কয়েক বৎসর ধরিয়া স্ত্রীশিক্ষা-সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সর্ব্বত্র নানাভাবের আলোচনা শুনা যাইতেছে। পূর্ব্বে ইহা সীমাবদ্ধ ছিল জন সাধারণের দুইচারিজনের মধ্যে, কিন্তু ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হইয়া কিছুকাল যাবৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেও প্রবেশ করিয়াছে। আমাদের দেশে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রসার আরম্ভ হইয়াছে অতি অল্পকাল পূর্ব্বে এবং এখনও পুরুষের তুলনায় মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিস্তার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহারই মধ্যে তাহার বিরুদ্ধে এরূপ কলরব কেন উঠিল, দুঃখের বিষয় তাহার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ বুঝিতে পারি নাই।

কথা চলিতেছে, মেয়েদের শিক্ষিত করিয়া তোলা অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষার ধারা একরূপ না হইয়া ভিন্নরূপ হইলেই সমাজের সমধিক মঙ্গল হইবে, অতএব ব্যবস্থা হউক। রূপটি যে কি হইবে, তাহা এখনও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই এবং তাহা লইয়াই বচসা; তবে ভিন্ন যে হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এবিষয়ে মতদ্বৈধ বড় একটা শুনিতে পাইনা, এমনকি, মহিলানেত্রীদের, বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলাসদস্যদের মুখেও না। শিক্ষা বলিতে কি বুঝায়, তাহা লইয়া আজকাল বিশিষ্টদের মধ্যেও চিন্তার অনৈক্য ও মতান্তর আছে, এবং বোধ হয় সেই কারণেই শুধু স্ত্রীশিক্ষা-সংস্কার নয়, সাধারণ শিক্ষাসংস্কার লইয়াই এত গবেষণা উঠিয়াছে। শিক্ষা অর্থে অনেকে মনে করেন general education অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জন, অনেকে মনে করেন vocational training অর্থাৎ অর্থকরী বিদ্যা। আমরা এই দুই অর্থেই নির্ব্বিচারে 'শিক্ষা' শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। এবং তাহাতে অনেক গোলমালের সৃষ্টি হইয়া থাকে। 'শিক্ষা' শব্দটিকে Vocational training অর্থে ধরিয়া লওয়াতেই আজকাল মেয়েদের শিক্ষাকে ছেলেদের শিক্ষা হইতে ভিন্নপথে চালাইয়া লইবার চেষ্টা এত বলবতী হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু জ্ঞানার্জ্জনের পরিবর্ত্তে শিক্ষাকে অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত করা আমরা সঙ্গত মনে করি না। অর্থের প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা চাই; সংসারে গৃহস্থালী দরকার এবং সেজন্য গৃহকর্ম্ম জানিতে হইবে। কিন্তু যে লোক রোজগার করিতে শিখিয়াছে অথবা যে মেয়ে গৃহকর্ম্মে নিপুণ, সেই শিক্ষিত, 'শিক্ষা'শব্দের ইহা অপেক্ষা কদর্থ আর কিছুই হইতে পারে না। তাহাই যথার্থ উচ্চশিক্ষা যাহা মনুষ্যত্ব বিকাশে সহায়তা করে, জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া আত্মাকে জাগ্রত করিয়া তোলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানতম কাজ সেই জ্ঞানেরই বিস্তার করা। অর্থকরী বিদ্যার জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার ভার পৃথক এক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করিতে পারে। অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি যথেষ্ট উৎসাহ ও অর্থপ্রাচুর্য্য থাকে, তবে তাঁহারা ঐ সব বিভাগের শিক্ষাব্যবস্থা নিজের আয়ত্তাধীনে পৃথক ভাবে চালাইতে পারেন। কিন্তু শিক্ষার এই গৌণ

উদ্দেশ্যকে মুখ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া তদনুসারে শিক্ষাপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করিবার সংকল্প বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সমীচীন নয়।

সুতরাং অর্থকরী শিক্ষার কথা আপাততঃ ছাড়িয়া দিলে, পুরুষ ও নারীর শিক্ষার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠনীতিতে কোনরূপ তারতম্য হওয়া অনুচিত। যে জ্ঞান মানবত্ব বিকাশের জন্য প্রয়োজন সে জ্ঞান পুরুষ নারীর বিভেদ জানে না। এমনকি সভ্যজগতের উপযুক্ত নাগরিক হইয়া জীবনযাপন করিবার জন্য যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাও ছেলে ও মেয়ের পক্ষে সমভাবেই প্রয়োজন। সুতরাং ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি প্রভৃতি বিষয়ের মোটামুটি জ্ঞানলাভ প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের পক্ষে অবশ্য করনীয়। ইহার মধ্যে কোনটি লইয়া যে তারতম্য করা যাইতে পারে, বুঝিনা। অথচ তারতম্যের প্রচেষ্টা হইতেছে। জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে যে মানসিক সম্পদ আহরণ করিতে হয়, তাহা প্রাকৃতিক বিধানে পুরুষ ও নারীর জন্য ভিন্ন করিয়া রাখা হয় নাই। সুতরাং অন্তরজীবনের সমৃদ্ধিসাধনের জন্য জ্ঞানের যে সর্ব্বতোমুখী বিস্তারের আবশ্যকতা, মেয়েদের বেলায় তাহাতে এত কার্পণ্য ও কুণ্ঠা কেন? মনের সমৃদ্ধির জন্য পুরুষের পক্ষে যে যে পাঠ অবশ্যশিক্ষনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে, মেয়েরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে কোনমতেই রাজি নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪০ সন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার যে নুতন পাঠ্য তালিকা নিরূপণ করিয়াছেন, সেগুলি ভালো করিয়া পড়িয়া ও ভাবিয়া দেখিলে তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়। অর্থকরী বিদ্যার দিকে তাহারা যে বেশী ঝোঁক দেখাইয়াছেন, তাহা নয়, সাধারণ জ্ঞানার্জ্জনের অনুযায়ীই বেশীর ভাগ এখনও আছে। তবু তাহার মধ্যে এমন সব পার্থক্য ছেলে মেয়েদের জন্য করার চেষ্টা হইয়াছে, যাহার অর্থ বুঝা যায় না। মেয়েদের জন্য Domestic Science বা গৃহকর্ম্ম পাঠ্য করা হইয়াছে, সেটি মন্দ নয়। কিন্তু উহা যখন অবশ্যপাঠ্য করা হয় নাই, তখন তাহাকে একেবারেই optional Subjects এর তালিকাভুক্ত করিলে ক্ষতি ছিল না। লাভ হইত এইটুকু যে, অঙ্কশাস্ত্র অবশ্যপাঠ্য (Compulsory) হইতে পারিত, যেমন ছেলেদের জন্য করা হইয়াছে। ছেলেরা অঙ্ক পারে আর মেয়েরা পারে না, অভিজ্ঞতায় জানি, ছেলেদের মধ্যে অঙ্ক সম্বন্ধে এমন নিরেটমূর্খ অনেক আছে, যাহারা Compulsory অঙ্ক উঠিয়া গেলে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিত। অথচ সে সুযোগ তাহারা পায় নাই। তাহাদের পক্ষে compulsoryই রহিয়া গেল, মেয়েদের বেলায় তুলিয়া লওয়া হইল। অর্থাৎ মনের যে উচ্চাঙ্গের শিক্ষার জন্য ছেলেদের পক্ষে অঙ্ক অবশ্য শিক্ষনীয় বিবেচিত হইয়াছে, মেয়েদের পক্ষে সে বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের তেমন কোনও প্রয়োজনীয়তা নাই, এই মাত্র বুঝা যায়। এবং এই মনোভাব আরও পরিস্ফুট হইয়াছে প্রাথমিক বিজ্ঞানশিক্ষা (Elementary Scientific Knowledge) ছেলেদের জন্য অবশ্যপাঠ্য (Compulsory) ও মেয়েদের জন্য ইচ্ছাধীন (Optional) রাখিয়া। Classical Language সম্বন্ধেও তাই। এখানেও ছেলেদের সম্বন্ধে অবশ্যশিক্ষনীয়তা, মেয়েদের বেলায় যথা ইচ্ছা। অর্থাৎ মানসিক তীক্ষ্ণতা ও জ্ঞানের উচ্চতার জন্য ছেলেদের বেলায় যত দরদ, মেয়েদের

বেলায় তত দরদ কর্ত্তৃপক্ষ দেখান নাই। পক্ষান্তরে আবার উল্টা ব্যাপারও দেখা যাইতেছে। Optional subjectsএর তালিকা পড়িলে দেখা যায় যে, মেয়েদের জন্য সেলাই একটি বিষয়রূপে নির্ব্বাচিত আছে; ছেলেদের জন্য তাহা নাই। মেয়েদের জন্য যে সেলাই আছে, এটি খুব ভালো ব্যবস্থা, এবং আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে ছেলেদের জন্য সেলাইয়ের বিধান না থাকাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই কারণ ছেলেরা সাধারণত কখনও সেলাই করে না। তবে হাতে সেলাই না করিলেও পুরুষেরা দরজীর দোকান অনেক সময়েই দিয়া থাকে, সে হিসাবে সেলাই শিক্ষার একটি সুযোগ তাহাদের দিলে মন্দ হইত না। কিন্তু তাহার চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, মেয়েদের জন্য সঙ্গীত, ও কলাবিদ্যা (Drawing, Painting and Fine Arts) নির্ব্বাচিত হইয়াছে, অথচ ছেলেরা ইচ্ছা করিলেও ও দুইটি বিষয় শিখিতে পারিবে না। এ রকম আশ্চর্য্য ব্যবস্থা কেন? ছেলেরা কি মেয়েদের চেয়ে সঙ্গীত ও কলাবিদ্যায় কম দক্ষ অথবা কম উৎসাহী? বরঞ্চ কলাবিদ্যায়—যাহার মধ্যে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ইত্যাদিও স্থান পাইয়াছে—পুরুষেরাই এযাবৎ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। তবে এরকম পক্ষপাতী ব্যবস্থা কেন? দেখিয়া শুনিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষ মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, উচ্চশিক্ষায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনই যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য করা চলে না, কিন্তু জনসাধারণের কলকোলাহলে বাধ্য হইয়া একটা কৃত্রিম পার্থক্যের ব্যবস্থা করিয়া কোনমতে সন্তুষ্ট রাখা।

উচ্চশিক্ষার পরিবর্ত্তে আমরা যদি প্রাথমিক শিক্ষার কথা ধরি—অর্থাৎ যেখানে মনুষ্যত্বের উন্নত-বিকাশ ততটা উদ্দেশ্য নয়, যতটা উদ্দেশ্য কোন রকমে অক্ষর পরিচয় করাইয়া চলতি পৃথিবী সম্বন্ধে যৎসামান্য দুইচার কথা জানিবার সুযোগ দেওয়া, যাহাতে প্রচলিত সমাজজীবনে বেশ সুচারুভাবে সংসার চালানো যায়—তাহা হইলে ছেলেমেয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় খানিকটা তারতম্য করা ভালো। কারণ, আমাদের বর্ত্তমান প্রচলিত সমাজে ছেলেদের কর্ম্মক্ষেত্র ও মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ পৃথক্—একেবারে দেওয়ালের এদিকে আর ওদিকে, প্রকাণ্ড ব্যবধান। সেখানে যার যার কর্ম্মক্ষেত্র অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। (এযাবৎ যেরূপ সমাজব্যবস্থা পৃথিবীর অধিকাংশস্থানে প্রচলিত ছিল, তাহাতে পুরুষ বাহিরে গিয়া উপার্জ্জন করিবে এবং নারী ঘরে বসিয়া গৃহস্থালী করিবে ও পুরুষের চিত্তবিনোদন করিবে, এইরূপই কর্ম্মবিভাগ ছিল বটে; কিন্তু বর্ত্তমান জগতে এরূপ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। বরং নারীও রীতিমত উপার্জ্জন করিবে, অন্ততঃ তাহার প্রয়োজন হইতে পারে, ইহাই ক্রমশঃ অধিকতর সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।)—কিন্তু উচ্চ-শিক্ষা সম্বন্ধে সে কথা খাটেনা, কারণ তাহার উদ্দেশ্য মানুষ তৈরী করা। সমাজ চিরদিন এক পদ্ধতিতে চলে না। যে সমাজ সনাতনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেই করজোড়ে মানিয় লওয়া জড়বুদ্ধির কাজ, উচ্চশিক্ষিত জীবন্ত মনের পরিচয় তাহা নয়। সে উন্নততর আদর্শের প্রয়োজনে বারে বারে সমাজ ভাঙ্গে ও গড়ে। সমাজব্যবস্থা অনুসারে তাহার শিক্ষা নিয়মিত হয় না, তাহার

শিক্ষিত মনের বিচার দ্বারাই সমাজের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। সেইরূপ বিচারবুদ্ধিশীল, মনুষ্যত্বপূর্ণ ছেলে মেয়ে তৈরী করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ।

এগুলি গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ক কয়েকটি কথা। কিন্তু ইহা ছাড়া আরও অনেক তরফ হইতে বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে অনেকপ্রকার অনুযোগ উঠিতেছে। মোটামুটি সে সকলের সারমর্ম্ম এই ঃ—(১) নারীর প্রধান দায়িত্ব পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব, অতএব সেই দায়িত্ব সুনির্ব্বাহ করিবার জন্য তাহারই উপযোগী শিক্ষা নারীর মুখ্য প্রয়োজন, অন্য শিক্ষা গৌণ, (২) উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা মেয়েরা বিলাসিতাপরায়ণ হইয়া থাকেন এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং শিক্ষাধারা পরিবর্ত্তিত করিয়া ইহার গতিরোধ করা হ'উক।

(১) পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের উপযোগী শিক্ষা বলিতে ইহারা কি বুঝেন ও বুঝাইতে চাহেন, তাহা পরিষ্কার জানি না। বৈজ্ঞানিক বিচারে বলিতে হয়, যৌনবিজ্ঞান, ধাত্রীবিদ্যা ও শিশুমনোবিজ্ঞানশিক্ষাই পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের একমাত্র উপযোগী শিক্ষা যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। কিন্তু সংস্কারোন্মুখ ব্যক্তিগণ কি মহিলাশিক্ষাধারায় ইহাই প্রবর্ত্তিত করাইতে চান? আমার নিশ্চিত ধারণা, তাহা নয়। বরং তাঁহারা অধিকাংশই শিশুমনোবিজ্ঞানকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার হাস্যে উড়াইবেন এবং যৌনবিজ্ঞান শিক্ষার নামে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন। খুব সম্ভবতঃ, তাঁহারা পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব বুলিতে বুঝেন—পাতিব্রত্য, সন্তানপালন ও গৃহস্থালী। পাতিব্রত্য সম্বন্ধে বিস্তর বাগ্‌বিতণ্ডা উঠিতে পারে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে চাহি না। কিন্তু এসম্বন্ধে মোটের উপর ইহাই বলি যে, জ্ঞানের বিকাশ বিজ্ঞানের শিক্ষা ও মনুষ্যত্বের স্ফূরণ যে নারীর মধ্যে হইয়াছে, পতির প্রতি ও সন্তানের প্রতি যথোচিত আচরণ এবং গৃহকর্ম্মের সুনিপুণ ব্যবস্থা তাহার সহজেই অভ্যাস-সিদ্ধ; পক্ষান্তরে বিজ্ঞানের দৃষ্টি যাহার খোলে নাই, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা যাহার মধ্যে হইবার অবকাশ পায় নাই, পাঠশালায় বসাইয়া তোতাপাখীর মত নানা বিধিবিধান মুখস্থ করাইলেই সন্তানপালনের যোগ্যতা তাহার হয় না, এবং বারংবার 'পতি পরম দেবতা' আবৃত্তি করাইলেও স্বামীর প্রতি প্রকৃত প্রেম জাগে না। নারীর 'পত্নীত্ব' ও 'মাতৃত্ব' লইয়া যাঁহারা অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পত্নীত্ব ও মাতৃত্ব গোটা মনুষ্যত্বের এক একটি অংশ মাত্র, তত্তৎ শিক্ষা দ্বারা জীবনের সম্পূর্ণতা আসে না; বরং মানবজীবনকে সম্পূর্ণ করিবার উপযোগী মনুষ্যত্বের শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিলে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব সহজেই সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং শিক্ষাবিধায়ক-গণের একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত সেই শিক্ষা বিতরণ যাহাতে সমাজের প্রত্যেক নারী ও পুরুষ জ্ঞানে ও চরিত্রে এক একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইবার সুযোগ লাভ করে।

(২) মেয়েরা আজকাল বিলাসিতা করিয়া থাকেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহাতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মেয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছুই দেখি না। রাস্তায় বাহির হইয়া যখন দেখিতে পাই বিচিত্রবসনা তরুনীরা চলিয়াছেন তখন বেশভূষা দেখিয়া চিনিবার উপায়ই থাকে না, ইহার মধ্যে কোনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারিণী আর কোনটি চতুর্থশ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াই

পাঠসাঙ্গ করিয়াছেন। সুতরাং শিক্ষিতে অশিক্ষিতে বিলাসিতার তফাৎ কিছুই নাই, তফাৎ যা কিছু আছে গ্রাম্য ও সহুরে মেয়েতে। অর্থাৎ শিক্ষার সঙ্গে বর্ত্তমান বিলাসিতার কোনও সম্পর্ক নাই; আসল কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব; এবং ইহাকে মেয়েদের শিক্ষা-সঙ্কোচ দ্বারা নিরসন করা যাইবে না; দুর্ভাগ্যক্রমে, পশ্চিমের রাজনীতিক অধীনতাপাশে যখন জড়াইয়া পড়িয়াছি, তখন প্রভুজাতির-প্রভাব কাটাইয়া উঠাও সহজসাধ্য নয়।—আর এক কথা। মেয়েরা বিলাসিতা করিতেছে শুধু বর্ত্তমান যুগে নয়, আবহমান কাল হইতেই পুরুষকর্ত্তৃক তাহাদের বিলাসিনী সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। পার্থক্যের মধ্যে এই দেখি যে, সাজসজ্জার প্রকারভেদ হইয়াছে,—পূর্ব্বে মেয়েরা পায়ে আলতা পরিতেন, এখন তৎস্থলে জুতামোজা পরেন, পূর্ব্বে তাম্বুলরঞ্জিত অধর দেখা যাইত এখন সেস্থলে লিপষ্টিক্ মাখা হয়, পূর্ব্বে ভারি ভারি গহনা ও বেনারসীর বাহুল্য ছিল, বর্ত্তমানে অলঙ্কার হাল্কা হইয়াছে ও বেনারসীর স্থান অধিকার করিয়াছে জর্জ্জেট। হাসিবার কথা নয়, কিন্তু বাস্তবিক প্রভেদ শুধু এইটুকু। ইহার মধ্যে শিক্ষার অপবাদ আসে কেন? কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদ পত্রের মারফৎ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, বিগত নিখিল ভারত শিক্ষাসম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বীয় অভিভাষণে বলিয়াছেন, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা তিনি খুবই পছন্দ করেন, কিন্তু আজকাল উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা যে কেশরাশি 'বব্' করিয়া ফেলিতেছেন ও পুরুষের মত চুরুট ফুঁকিতেছেন, ইহা বড়ই অবাঞ্ছনীয়, সুতরাং এরূপ শিক্ষাধারার পরিবর্ত্তন হওয়া বিধেয়।—আশ্চর্য্য হইয়াছি এইজন্য যে, মেয়েদের 'বব্' করার ও চুরুট খাওয়ার মধ্যে এমন কি যুক্তি তিনি দেখিলেন যাহাতে তাহাদের শিক্ষাধারা পরিবর্ত্তিত হওয়ার প্রস্তাব উঠিতে পারে। 'বব্' করা বা চুরুট খাওয়া আমি সমর্থন করিতেছি, ইহা কেহ মনে করিয়া লইবেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই কথা যে, মেয়েদের বিধাতৃদত্ত কেশরাশি ছাঁটিয়া ফেলার মধ্যে যাহারা নৈতিক অবনতি ও চরিত্রের লঘুতা দেখেন, পুরুষে চুল ছাঁটিলে বা জটাশ্মশ্রুবিমণ্ডিত না থাকিয়া প্রকৃতিদত্ত কেশ সম্ভার একবারে মুণ্ডন করিয়া ফেলাতে কখনও তাঁহারা অপরাধ গণ্য করিয়াছেন কি? চুরুট খাওয়া যদি গর্হিত কর্ম্ম হইয়া থাকে, তবে অসংখ্য পুরুষ যে চুরুট সেবন করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের উচ্চশিক্ষাকে রোধ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে কি? যাহা অন্যায়, তাহা প্রত্যেকের পক্ষেই অন্যায়। পাশ্চাত্য বেশভূষা ও আচরণ অনুকরণ করা যদি ভারতবাসীর পক্ষে অবৈধ বলিয়া গণ্য হয়, তবে তাহার প্রতিবিধান পুরুষ নারী নির্ব্বিশেষেই করিতে হইবে, সেজন্য বিশেষভাবে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচের কোনও অর্থই হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে পুরুষ ও নারীকে বিচার করিবার জন্য এক নৈতিক মাপকাঠি ব্যবহার করা হয় না। এত গোলযোগের সৃষ্টি সেই জন্যই।

নানা দিক দিয়া নানাভাবে চিন্তা করিয়াও ছেলেদের বাদ দিয়া বিশেষভাবে মেয়েদের শিক্ষা সংস্কারের কোনই প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। তবে এ আন্দোলন উঠিতেছে কেন, তাহাই ভাবি। বিগত অল্প কয়েক বৎসরেরই অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে, নারীর মস্তিষ্ক শক্তি পুরুষের চেয়ে ন্যূন নয়; আরও দেখা যাইতেছে, সমানশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ করিয়া নারী সামা-

জিক, রাজনৈতিক সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সমকক্ষতা ও সমানাধিকার দাবী করিতেছে, এবং মনুষ্যোচিত জ্ঞান ও শক্তিবলে বলশালী হইলে নারীর সেই দাবী ও স্বাধীনতা খর্ব্ব করিবার কোনও উপায় সমাজের হাতে আর থাকিতেছে না। আশঙ্কা হয়, হয়তো বা ইহাই এই শিক্ষাসংকোচক আন্দোলনের প্রকৃত গূঢ় কারণ।

গান — Song - Song - Song.

শ্রীঅনুরূপা দেবী

দুঃখের তাপে তাপিত এ চিত
হে আমার দুঃখ হরণ হে
শত গ্লানিমার কালিমাখা বুকে
লইনু তোমারই শরণ হে
যাহা কিছু ছিল তোমারে আগুলি,
একে একে খসে পড়িছে সকলি
অনাহত চিত উঠিছে আকুলি,
করিছে তোমায় বরণ হে।

ঘর বুঝি ভাঙে !

নীলিমা দেবী

এ দেশের সনাতনপন্থীরা মেয়েদের অগ্রগতির পথ সব সময়ই আটকে রাখতে চান কেউ প্রকাশ্যে আর কেউ বা মনে-মনে। কিছুকাল আগে কল্‌কাতার একটি দৈনিক কাগজে "ক্যারিয়ার্ ভ্যর্স্যস ম্যারেজ ফর্ উইমেন" নামে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। এই ধরনের সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে সাধারণতঃ রোজকার টাট্‌কা খবরের ওপরেই মতামত প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। এ দেশের মেয়েদের নানা সমস্যা জটিল হোলেও অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মতোই অনেকটা গা-সহা হোয়ে গেছে ; সে গুলির কোনোটারই ভেতর এমন কিছু অভিনবত্ব নেই যা খবরের কাগজের সম্পাদককে আচম্‌কা ব্যাতিব্যস্ত করে তুল্‌বে।

'চীন-জাপানের লড়াই', 'আন্তর্জাতিক সমস্যা', 'প্রভিন্‌সিয়াল অটোনমি'র স্বরূপ', 'মহাত্মাজী কিম্বা পণ্ডিতজী কিম্বা ভারতমাতাজী কোন্ পথে ?' এ-সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকা সত্ত্বেও ঐ দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগ হঠাৎ কেন মেয়েদের সমস্যা নিয়ে উতল হয়ে উঠ্‌লো বুঝ্‌তে পারা গেল না।

আজকাল অবিশ্যি সম্পাদকেরা তাঁদের কাগজের তুএকটি পাতা আলাদা করে রাখ্‌ছেন কেবল মেয়েদেরই ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য—দেশের নারীজাতির প্রতি তাঁদের এই পক্ষপাতিত্ব ক্রমেই সংক্রামক হয়ে উঠচে। তার প্রমাণ, দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক—প্রায় প্রত্যেক কাগজেই ইদানীং "মহিলামহল", "নারী জগৎ" কিম্বা ঐ ধরণেরই আর কোনো মার্কার আশ্রয় নিয়ে বেশ বড় রকমের নারী সাহিত্য গড়ে উঠচে। সে—সাহিত্যে কাগজের সম্পাদকেরও যে নিজস্ব কিছু দান করবার মতো আছে তা ঐ প্রবন্ধটি পড়ে বোঝা গেল।

মোটামুটি আলোচ্য প্রবন্ধটিতে পুরুষদের মতো মেয়েদের স্বাধীন ভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করা কেন অসঙ্গত তার একটা সনাতনী ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। লেখকের মনের আসল কথাটা এই :— মেয়েরা পুরুষের একচেটিয়া সব কর্ম্মক্ষেত্রে একবার নামতে সুরু করলে, একবার স্বাবলম্বনের স্বাদ পেলে আর রক্ষে নেই ; পুরুষজাতিকে চিরবিদায় দিতে হবে শান্তিতে ঘর সংসার করার আশা। ঘর-ভাঙার বিভীষিকাময় চিত্রটি এই 'লীডার'-রাইটার হঠাৎ দেখতে পেয়েচেন তাঁর চোখের সাম্‌নে ! কী সর্ব্বনাশ !

অতি তুঃখের সঙ্গে লেখক আরো জানিয়েছেন যে, এদেশের মেয়েদের মধ্যে স্বাবলম্বনের আকাঙ্ক্ষা জাগ্‌তে আরম্ভ করেছে ব'লে তারা আর বিবাহ করতে ইচ্ছুক নয়। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশেই নাকি মেয়েরা আর পুরুষের কর্ম্মশ্রান্তির শান্তিপূর্ণ নীড় রচনায় নিযুক্ত থাকতে রাজি নয়। এটা খবর না টিপ্পনী ? খবর হোলে সত্যি নয়—আর টিপ্পনী হোলে নিতান্তই মন গড়া। কেন না স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও বহুদেশে এখনও শান্তিপূর্ণ নীড় বাঁধবার রেওয়াজ উঠে যায়নি।

পারিবারিক জীবন ও গৃহই যে সামাজিক জীবনের ভিত্তি, সে কথা দুনিয়াতে বহু নর নারী বিশ্বাস করে ও মানে।

পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে মেয়েদের ঘরের বাইরে কর্ম্মক্ষেত্রে নামায় কোনো বাধা নেই, সব দেশে মেয়েরা ঘর সংসার করে না, স্ত্রী এবং মা হয়ে যে সমস্ত দায়িত্ব তাদের নেওয়া উচিত সে গুলি পালন করে না, এ কথা সত্যি নয়। সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে যতটুকু জানি তাতে তো মনে হয় যে, বিবাহ করিতে চায় না এমন মেয়ের সংখ্যাই পৃথিবীতে বিরল।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মহাযুদ্ধের পর থেকে, পুরুষের সংখ্যার চেয়ে মেয়েদের সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুণ বিবাহ যোগ্যা ও বিবাহেচ্ছু অনেক মেয়েরই বিবাহ ঘটা সম্ভব হয়ে উঠ্‌ছে না। সেজন্য সে সব দেশের সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা প্রত্যেকেই কার্য্যকরী বিদ্যা আয়ত্ত করে কর্ম্মক্ষেত্রে নামচে, পাছে ভবিষ্যতে অবিবাহিত অবস্থায় অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হয়। আর বিবাহিত স্ত্রী-লোকও যে জীবিকা উপার্জ্জনে বেরুচ্ছে তার একমাত্র কারণ, তাদের স্বামীর উপার্জ্জনে পরিবারের ভরণপোষণ সংকুলান হচ্ছে না।

কিন্তু স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জ্জন করেও এসব মেয়েরা ঘরকন্নার সমস্ত কাজ আগের মতোই করে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশে ঘরের কাজ করার জন্য চাকর রাখা এক বড়লোক ছাড়া সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই সেখানে এমন অসংখ্য গৃহস্থের ঘর আছে যেখানে বিবাহিত স্ত্রীলোক বাইরের কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেও সংসারের সমস্ত দায়িত্ব আর কারুর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় না।

ঘর ভাঙার ভয় দেখে টিপ্পনীকার বলেছেন যে, নারীশিক্ষা ও পাশ্চাত্য মতবাদের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রগতিশীল মেয়েরা বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। একথা যদি সত্য হয় তা হোলে বুঝতে হবে যে, এদেশেও মেয়েদের ভেতরে নিজেদের মতামত বলে একটা বস্তু দেখা যাচ্ছে!

আমরা তো এতদিন জানতুম যে বিয়ে ব্যাপারটা আমাদের দেশের কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত মেয়ে বা ছেলের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর এতটুকুও নির্ভর করে না। যদিও গৌরীদানের রেওয়াজ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উঠে গেছে তবু এখনো বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েদের বিবাহ নির্ভর করে তার বাপ-মা বা অভিভাবকের ইচ্ছা ও সুবিধার ওপর। এখন পর্য্যন্ত এদেশে মেয়েদের এমন সাহস নেই—তারা যতই আলোকপ্রাপ্তা হোক না কেন—যে, বিবাহে অনিচ্ছা থাকিলেও অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তারা তাদের নিজস্ব মত জাহির করে। কাজেই মেয়েদের বিবাহে ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এখন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে কোনোই সমস্যার সৃষ্টি করেনি।

এ—যুগে বিবাহের কদর কমে গেছে, এ কথার উল্লেখও ঐ প্রবন্ধে আছে। পঁচিশ বছর আগেও অবিবাহিত থাকা আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে লজ্জার কথা ছিল; এবং সেই লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই কুলীনের মেয়েরা বহু বিবাহিত পুরুষকেও স্বামী বলে বরণ

করে এবং বিবাহিতার মর্য্যাদা পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতো। পাশ্চাত্য দেশে কৌলিন্য প্রথামতে বহু বিবাহের চল করতে পারলে সে সব দেশে 'সারপ্লাস উইমেন্' সমস্যার সমাধান হোতো সন্দেহ নেই। কিন্তু, এ দেশে কৌলিন্য প্রথার ফলাফল সম্বন্ধে মেয়েদের অভিজ্ঞতা আছে বলেই অন্ততঃ এই উপায়ে সে মর্য্যাদা পাবার লোভ আমাদের আর নেই এইটুকু ভরসা করা যায়।

লেখক আরও বলেছেন, ফরাসীদেশে স্ত্রী স্বাধীনতা বলে কোন বস্তু নেই। ফ্রান্সে স্ত্রী স্বাধীনতার বাহ্যিক আন্দোলন কম দেখা গেলেও সে-দেশে মেয়েদের ঘরে-বাইরে আধিপত্য অটুট আছে। তাদের ব্যবসা বা চাকুরীর ক্ষেত্রে নামায় কোনোই বাধা নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের ঘরে বা বাইরে যে কোনো ক্ষমতাই নেই এ-কথা সনাতনপন্থীরাই মানবেন সবার আগে। এখনো পর্য্যন্ত মনুর নির্দ্দেশ মতো মেয়েরা বৃদ্ধ বয়সেও নাবালিকার সামিল; বাপ ভাই, স্বামী এবং পুত্রের অভিভাবকতায় তাদের জীবন কাটে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অন্যের অনুজ্ঞায় চলে এসে আমাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি বা চিন্তাধারা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে বল্লেই চলে।

স্বাধীনতা কি তা বোঝার ক্ষমতাই বা আমাদের ক'জনের ভেতর আছে? প্রগতিশীল মেয়েই বা আছে ক'টি? আর প্রগতির মর্য্যাদাই বা দিচ্ছে কে? যে দেশে ঘরে ঘরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে মেয়েরা পীড়িত, সে-দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকটি মেয়ে যদি স্বাবলম্বনের পথ খুঁজতে চায় অমনি চারিদিক থেকে 'গেল-গেল' রব ওঠে; সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে পর্য্যন্ত ঘর-ভাঙার ভীতিপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত হয়।

সত্যিকারের ঘর-ভাঙার ভীতি অবিশ্যি এ নয়; এটা হচ্ছে সনাতন পন্থীর দিন ফুরিয়ে আসার ভীতি। সনাতন পন্থীরা চায় দাবিয়ে রাখতে মেয়েদের মনে স্বাবলম্বনের সব আশা, আর সাধারণের মনে জাগিয়ে তুলতে চায় ঘর-ভাঙার বিভীষিকা। যে-দেশে মেয়েদের না আছে স্বাধীনতা ঘরে, না আছে স্বাবলম্বনের সম্মান বাইরে, তাদের আবার ঘর-ভাঙার ভয় কী?



আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্কসবাদ

শ্রীশৈলজা দাসগুপ্তা

প্রকৃতপক্ষে কাল মার্কসই সমাজতন্ত্রবাদের ধারাকে নূতন জীবন দান করেন। ইতিপূর্ব্বে সমাজতন্ত্রবাদ একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে অর্দ্ধনির্ব্বাপিত অগ্নিশিখার ন্যায় বিরাজ করিতেছিল এবং তাহার গতি ছিল সুযোগসাপেক্ষ। কিন্তু ১৮৪৮ সালে মার্কসের Communist Mnaifestoই আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের জননী। ইহাতে তিনি ইতিহাসের ধারাকে অর্থনৈতিক সমস্যার একটা প্রগতিশীল উল্লেখ বলিয়া যুক্তিদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ইহা হইতেই যে উৎপীড়িত জনগণের একাধিপত্য অবশ্যম্ভাবী তাহা অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। ১৮৬৭ সালে তাহার Das Capital, Volume আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় * এই Das Capitalই সমগ্র পৃথিবীর সমাজতন্ত্রীদের Bible ইহা ভাব জগতে এক যুগান্তর আনিয়াছে এবং তাহার আদর্শেও এক নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছে। আন্দোলন জগতে এই পুস্তক অদ্বিতীয়।

মার্কস ইতিপূর্ব্বের সমাজতন্ত্রবাদকে অর্থহীন ও অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়াছেন, কারণ ইহাতে কতগুলি অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র কখনও বুদ্ধিবৃত্তির সুচিন্তিত চিন্তাধারার উপর অবস্থিত বলিয়া উৎকৃষ্ট হইলেও মানিয়া লওয়া যায় না। তাহার মতে ভবিষ্যৎ অতীতেরই সূক্ষ্ম প্রকাশ, ইহা কতকগুলি অপ্রতিহত শক্তি ও ধারার বিবর্ত্তন। সামাজিক দর্শনের কার্যাই সেই সকল শক্তি ও ধারাগুলিকে আবিষ্কার করা এবং তাহার যথাযথ গতি নির্দ্দেশ। এক কথায় বলিতে গেলে সামাজিক দর্শনবাদকে (Social Philosophy) ঐতিহাসিক দর্শনবাদের (Philosophy of history) উপরই নির্ভর করিতে হয়।

আচ্ছা, এখন এই ঐতিহাসিক দর্শন কি? ইহা হইতে আমাদের কি শিক্ষার আছে? মার্কস এই প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাসকে মানব মনের অর্থ নৈতিক প্রবৃত্তিরই বিকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সমগ্র ইতিহাসেই যে দলগত বিসম্বাদ (Class Struggle) বর্ত্তমান তাহার বিচার করিয়াছেন। তাহার মতে মানব মনের গোড়ার কথাই হইল অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান আর আর্থিক সমস্যাই হইল মানব মনের প্রকৃত চিন্তাধারা। ইহা হইতেই মানুষের জীবনের গতি সুনিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপন্ন দ্রব্যের যন্ত্রগুলি যাহাদের অধীনে তারাই সমাজের বিধাতা, তাদের ইচ্ছামতই সমাজ পরিচালিত হয় এবং সমস্ত সামাজিক নিয়ম কানুন ও শিক্ষাদীক্ষা তাদের স্বার্থসাপেক্ষ, কাজেই তারা সমাজের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। সুতরাং এখানেই সমাজের দুইটি অবস্থা বা দলের পরিণতি দেখিতে পাই। এক যাহারা পরিচালনা করে আর যাহারা পরিচালিত হয়। এই দুইটি ভাগই সমাজে পরস্পর

* ১৮৮৩ সালে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার বন্ধু ও সহকর্মী এঙ্গেলস্ (Engels) সমস্ত লেখাগুলিকে একত্র করিয়া ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন।

বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং এইখান হইতেই আরম্ভ দ্বিতীয় দলগত বৈষম্য বা বিসম্বাদ (Class Struggle)। মার্কস্ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাকে অকাট্য যুক্তি দ্বারা অতীতের এই বিসম্বাদই যে ক্রমবিবর্ত্তমান অবস্থার পরিণতি তাহা দেখাইয়াছেন। অতীতের ভূস্বামী ও ক্রীতদাস, জমীদার ও প্রজা, বিত্তশালী ও ব্যবসায়ীর মধ্যে যে বিবাদ ইহাই মার্কসের ব্যাখ্যার যথেষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। অধিকন্তু সমস্ত ইতিহাসই একটা দল স্ব স্ব স্বার্থবিরোধী দলকে কি করিয়া তাড়াইয়া ধনদৌলত ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করিয়াছে সেইসব ঘটনাস্রোতেরই বিকাশ। কিন্তু Industrial Revolution সেই পুরাতন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারীদের রাজনৈতিক চালবাজী সমূলে উৎপাটন করিয়া বুর্জ্জোয়া (bourgeose) বা মধ্যবিত্ত বণিক সম্প্রদায় নামে এক দলের সৃষ্টি করে আর একদল উৎপীড়িত নিষ্পেষিত সামান্য বেতনভোগী (wage carver) এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই অশিক্ষিত জনগণের শক্তিকে নির্লজ্জ ও নির্দ্দয় ভাবে শোষণ করিয়া মাত্র কয়েকজন ধনীর ধনবৃদ্ধির জন্য অবিরাম চেষ্টা চলিতে থাকে। ক্রমে বিরুদ্ধগামী এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। মার্কস মনে করেন এই দুই সম্প্রদায়ের সংঘর্ষের ফলে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবে তাহা হইতেই শোষিত জনগণের একাধিপত্য (Dictatorship of the Proletariate) প্রতিষ্ঠিত হইতে বাধ্য। এই জন্যই তিনি তাহার Communist Manifestoতে সমগ্র শোষিত জনগণকে একতাবদ্ধ হইতে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই ঐক্যের সম্মুখে সমস্ত উৎপীড়িত ধনিসমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, তার শোণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে সমগ্র বিশ্বের ঐকালব্ধ প্রাতৃভাব, অশান্তির রাজ্যে সৃষ্টি হইবে শান্তির সুষমা। শোষিতের শুধু হারাইতে হইবে তার সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী কঠোর শৃঙ্খল।

ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ও দলগত দ্বন্দই মার্কসবাদের মূল নীতি। অতঃপর মার্কস্ সঞ্চিত অর্থকে সমবন্টন না করায় ধনিক সম্প্রদায়কে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। তাহার মতে সমস্ত সঞ্চিত অর্থই পরিশ্রম লব্ধ এবং সেই অর্থের সমবন্টন হওয়া সমীচীন। শ্রমিককে তাহার শ্রমের মূল্য যত কম দিয়া পারা যায় ততই ধনিকের লাভ। এই ধনিক মনোবৃত্তির বিরুদ্ধেই তাহার প্রবল আক্রোশ! অবশেষে মার্কস্ দেখাইয়াছেন যে এই রীতি ধনিকে ধ্বংসের মুখে আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে। এইভাবে সমাজের শ্রমিক নিষ্পেষণে এমন একটা সময় আসিবে যখন কতিপয় ধনিকের সঞ্চিত অর্থের বিরুদ্ধে অগণিত শোষিত জনগণ বিদ্রোহ করিয়া বসিবে এবং এই বিদ্রোহের ফলে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হইবে তাহা হইতেই উপরি উক্ত শোষিত শক্তির একাধিপত্য স্থাপিত হইবে বলিয়া মার্কসের দৃঢ় বিশ্বাস।

মার্কস্‌বাদের আর একটা বিশেষত্ব ইহার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। মার্কস্ সমস্ত জগতের শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে এখানে তিনি দেখাইয়াছেন যে শ্রমিকদের স্ব স্ব দেশের ধনীদের সহিত তাহাদের যে সম্বন্ধ তাহার চেয়ে বিদেশীয় শ্রমিকদের সহিত তাহাদের স্বার্থজনিত ঐক্য অনেক বেশী। এই জন্যই মার্কস্ অন্তর্জাতিক শ্রমিকদের (International Workman's Association) গঠন করিয়া ১৮৩৫ সালে লণ্ডনে ইহার প্রথম অধিবেশনে

করান এবং ইহাই "প্রথম ইন্টার নেসনেল" (First International) নামে খ্যাত। এই অধিবেশনে ইয়ুরোপের প্রায় অধিকাংশ দেশের প্রতিনিধিগণই যোগদান করিরাছিলেন এবং ইহার কার্য্য অনেকটা মার্কসের আদর্শে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ ইয়ুরোপের কতিপয় প্রধান নগরে ইহার রীতিমত অধিবেশন চলিয়াছিল কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৮০ পর্য্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে বাকুনান প্রভৃতির সঙ্গে ইহার মতানৈক্য ঘটে, ফলে কিছু সময়ের জন্য ইহার কার্য্যক্রম স্থগিত থাকে। আবার ১৮৭১ সালে প্যারিসে Communistsদের নিস্ফল বিপ্লব প্রচেষ্টা—যাহাতে মার্কসের আন্তরিক সহানুভূতি সূচীত হইয়াছিল ; শান্তিপ্রিয় লোকদের নিকট ইহার তিক্ত অভিজ্ঞতাই ইহাকে ক্ষণস্থায়ী করিয়া তোলে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইহাকে শক্তিশালী করিতে চেষ্টা করা হয় কিন্তু এবারও পূর্ব্বেরই মত অচিরেই ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই ভাবে দুইটা "ইন্টার নেশনেলই" কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থাকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ১৯১৯ সালে মস্কোতে রুশীয়ার Cmmunistগণ এক বিরাট অধিবেশন করান। ইহাই Thrid International নামে পরিচিত। ইহার কর্ম্মপন্থা সম্পূর্ণ বিপ্লব মূলক। সমগ্র পৃথিবীময় বিপ্লব প্রচেষ্টাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এবং সমগ্র বিশ্ব আজ রুশীয়ার এই দূরদর্শী উদ্দেশ্যের ফলাফলের দিকে উদগ্রীব হইয়া চাহিয়া আছে।



আলোক যাত্রী

রাধারাণী দেবী

আমার ভাবনাগুলি আকাশবিহারী মুক্তপাখী
অগ্নিদীপ্ত দ্বিপ্রহরে রুদ্র রৌদ্রে মেলি দৃপ্ত ডানা
মেঘলোকে আবর্ত্তিয়া অবিরাম চলে দিতে হানা
মৃত্তিকার ছায়াশ্যাম অরণ্যেরে বহু নিম্নে রাখি !

প্রভাতের স্বর্ণোৎসবে যাত্রা তার পূর্ব্বাচল পানে
গগনে গগনে যবে অরুণের বর্ণরাগ ফুটে
বিস্তারি' ব্যাকুলপক্ষ ঊর্দ্ধ্বপানে চলে ধেয়ে ছুটে
কী অজ্ঞাত আকর্ষণে,—নিজেও তা' বুঝি নাহি জানে।

তমসাকুন্তলা মৌনা রজনীর কৃষ্ণাঞ্চল তলে
ভাবনা-কপোতগুলি ধীরে ধীরে নীড়ে নেমে আসে,
স্বপ্ন-প্রজাপতি পুঞ্জ প্রত্যাগত হয় নিজ বাসে
কল্পনা ভ্রমর পাঁতি ঘুমাইয়া পড়ে পুষ্পদলে।

কী মধু সন্ধানে ওরা আপনা পাশরি' নিত্য ভোরে
আলোক দূতের ডাকে গৃহত্যজি' ধায় দূরান্তরে ?
কাননে কান্তারে শূন্যে মেঘঊর্দ্ধ্বে অশ্রান্ত বিচরে
কার বাঁশি অনুসরি' আত্মহারা দিকে দিকে ঘোরে !

আড়ালে রহিয়া ডাকে হাত ছানি দিয়া চিরদিন
কোন্ সে মায়াবী, যার আকর্ষণ এত দুর্নিবার
অশ্রুত সে বেণুধ্বনি অনির্বচনীয় সে-ঝঙ্কার
এ গৃহ-বন্দীর মন নভোচারী তাই উদাসীন।

স্ত্রীরত্নম্

শ্রীসীতা দেবী

কর্ত্তাদের আমলের মস্ত বড় তিনতলা বাড়ী, এখন মাঝখানে পাঁচিল উঠিয়া দ্বিধা বিভক্ত। বড় ভাই মুরারীমোহন, এবং ছোটভাই মদনমোহন পারত পক্ষে পরস্পরের মুখ দেখেন না, দেখা হইলেও যথাসাধ্য কথা না বলিবার চেষ্টা করেন। গৃহিণীদ্বয় এবং বাড়ীর ছেলেমেয়েরা আবার অতটা বাড়াবাড়ি করিয়া উঠিতে পারেন না। বড়গিন্নী কথা বলেন বটে, তবে ছোট গিন্নীর মহলে পা দেন না, ছোটগিন্নী একটু গরীব ঘরের মেয়ে, তাঁর চাল কম, এবং বুদ্ধিও বোধ হয় কিছু কম, তিনি মাঝে মাঝে কারণে অকারণে বড় জায়ের ঘরে গিয়ে হাজির হন, হাসিয়া গল্প করিয়া খানিক সময় কাটাইয়া আসেন। ছেলেমেয়েরা প্রায় কিছুই বিচার করে না, যাওয়া আসা খেলাধুলা তাহাদের লাগিয়াই আছে। বড়গিন্নী আড়ালে নাসিকা কুঞ্চিত করিলেও খোলাখুলি বারণ করেন না। ছোট গিন্নীর ত ইহা ভালই লাগে, কাজেই তিনি বাধা দিবেন কেন? স্বামীকেও এই মনোমালিন্য মিটাইয়া ফেলিবার জন্য তিনি অনেকবার অনুরোধ করিয়াছেন, তবে মদনমোহন সে কথায় বড় কান দেন নাই। তিনিও যে বাপের ছেলে মুরারীমোহনও সেই বাপেরই ছেলে। তিনি যদি একটু খানি অগ্রসর না হন, তাহা হইলে মদনমোহন বা নিজেকে খাটো করিবেন কেন? তিনি কম কিসে? দাদা হাড় কৃপণ এক শ্বশুরের কল্যাণে টাকা খানিক বেশী পাইয়াছেন, এই ত তফাৎ? তা অমন টাকায় তাঁহার কাজ নাই।

ছোটগিন্নী বলেন, "হাজার হোক, বড় ত তিনি?"

ছোটকর্ত্তা বলেন, "তা হোন তো বড়! অমন দু বছরের বড়কে আমি কেয়ার করি না। এখন যদি আমি যেচে গোলমাল মিটতে যাই, তাহলে ওরা সকলে ভাববে ওদের টাকা দেখে আমি নিজেকে নীচু করছি।"

দুই ভায়ের প্রায় একই সময় বিবাহ হইয়াছিল। গৃহিণী দুইজন সমবয়স্কাই হইবেন। ছোটগিন্নীর প্রথমে দুই ছেলে পরে তিনটি মেয়ে। বড়গিন্নীর প্রথমে এক মেয়ে তারপর এক ছেলে। আর সন্তান তাঁহার হয় নাই। ছোট জায়ের কাছে এইখানে হারিয়া যাওয়াতে তিনি মনে মনে দুঃখিত। মুখে অবশ্য বলেন, "কাজ নেই বাপু পঁচিশ গণ্ডায়, ওই দুটিই বেঁচে থাক্।"

শুধু সংখ্যায় কম হইলেও ত ভাবনা ছিল না, অন্য কিঞ্চিৎ গোলমালও ছিল। বড়গিন্নীর মেয়ে প্রতিভা দেখিতে মন্দ হয় নাই, বনিয়াদী ঘরের মর্য্যাদা রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ছেলে প্রবীর দেখিতে একেবারে ভাল নয়। গরীবের ছেলে হইলে লোকে তাহাকে সোজাসুজি কুৎসিত বলিত, মা বাপের অনেক পয়সা থাকাতে মন্তব্যটা আড়ালে করে। রং তাহার রীতিমত কাল, শরীর অতিশয় রোগা, লম্বাও সে বিশেষ নয়। বাল্যকালে বসন্ত হইয়া মুখ ক্ষত চিহ্নে ভরিয়া গিয়াছে। সুতরাং সে যে সুশ্রী নয়, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

যাহা হউক পুরুষের বাচ্ছা, রূপের জন্য কোথায়ও আটকাইবে না এই আশাই তাহার মা করিতেছিলেন। আড়ালে লোকে নানা রকম বলে, তার আর কি করা যাইবে। আড়ালে ত লোকে রাজার মাকেও ডাইনী বলে? ছোটগিন্নীর ছেলে মেয়ে কটিই দেখিতে ভাল, ইহাও বড় গিন্নীর মনস্তাপের একটা কারণ ছিল। পোড়া বিধাতার চোখ নাই, না হইলে এমন হয়?

তাঁহার বড় মেয়ে প্রতিভার বিবাহ খুব ঘটা করিয়াই হইয়াছিল। স্বামী যদি বা একটু হাত গুটাইতে চাহিয়াছিলেন, স্ত্রী জোর করিয়া সেটা হইতে দেন নাই। দেখুক সকলে মেয়ের বিবাহ কেমন করিয়া দিতে হয়। আরো ত মেয়ে পাশের বাড়ীতে রহিয়াছে, রূপের দেমাকও তাহাদের কম নয়, এত ঘটা করিয়া এমন বনিয়াদী ঘরে বিবাহ যেন তাহারা দেয়। কুটুম্ব কেমন যে করিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিয়া বড় গিন্নী নিরস্ত হইলেন!

কিন্তু শিক্ষাটা কাজে লাগিল কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার অবকাশ বহু দিন হইল না। ছোট গিন্নীর মেয়েরা তখনও ছোট ছোট, ছেলেগুলিরও বিবাহের বয়স হয় নাই।

দ্বিতীয়বার বিবাহের ফুল যাহার এ বাড়ীতে ফুটিল সে ছোট গিন্নীর বড় ছেলে বিনোদ। ছেলেটি দেখিতে ভাল, পড়াশুনায়ও মন্দ নয়। এইবার বি, এ, পরীক্ষা দিল, সুতরাং ছোটকর্ত্তার বৈঠকখানায় ঘটকের ভীড় লাগিয়া যাইবে তাহা আর বিচিত্র কি? বড় কর্ত্তার নগদ টাকা অনেক আছে বটে কিন্তু বংশমর্য্যাদা, বাড়ীঘর, জমি জমায় ছোটকর্ত্তা তাহার চেয়ে হীন নন, সুতরাং বড় বড় ঘর হইতেই বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল। শেষে তাহাদের অবস্থা হইল যেন বাঁশবনে ডোমকানা। কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি রাখিবেন তাহাই যেন ভাবিয়া পাইলেন না।

ছোটগিন্নী বলিলেন, "ঐ যে চাটুয্যেদের মেয়েটি, ওর মত সুন্দর ত আর একটা মেয়েকেও মনে হয় না!"

কর্ত্তা বলিলেন, "আরে ছবিতে সুন্দর অমন সবাইকেই দেখায়, পয়সা খরচ করলে ওবাড়ীর যুবরাজটিরও সুন্দর ফটোগ্রাফ তোলান যায়। আমি ত বলি রতন মুখুয্যের মেয়েটিই সেরা। যেমন উঁচু ঘর, টাকা কড়িও তেমন।"

গৃহিণী নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "অমন শ্বশুরের টাকায় বড় মানষী করার দরকার নেই আমার ছেলের। শেষে বউ তাকে গ্রাহ্যই করবে না, ওবাড়ীর বড়ঠাকুরের দশা হবে আর কি? কথায় বলে উঠ্‌তি ঘরে মেয়ে দিতে হয়, আর পড়্‌তি ঘর থেকে মেয়ে আনতে হয় আমি বাপু কোনো কুটুমের কাছে মাথা হেঁট করতে পারব না তা বলেই দিচ্ছি।"

কর্ত্তার হয়ত কথাটা মনে লাগিল, তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন। স্ত্রীর ধনে ধনী বলিয় সর্ব্বদাই তিনি বড়ভাই সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করিতেন, এখন নিজেও ছেলের জন্য সেই ব্যবস্থা করেন কি করিয়া? আর নিজেকে কাহারও চেয়ে ছোট বলিয়া স্বীকারই বা তিনি করেন কি প্রকারে?

অবশেষে গৃহিণীর মতই টিকিল। মহাঘটা করিয়া চাটুয্যেদের মেয়ে দেখিয়া আসা হইল বাড়ী ফিরিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "নাঃ ছবির চেয়ে মেয়ে সরেশ বই নিরেশ নয়।"

ছোটগিন্নী বলিলেন, "দেখলে বাপ্‌, গরীবের কথা বাসি হলে মিষ্টি লাগে।"

বিনোদের বিবাহ হইয়া গেল। ধুমধাম হয়ত প্রতিভার বিবাহের মত হইল না, ইহাতে বড়গিন্নী অনেকটাই সান্ত্বনা পাইলেন, কিন্তু বউ ভাতের দিন বউ দেখিয়া সে সান্ত্বনার লেশমাত্র আর তাঁহার মনে রহিল না। কি আশ্চর্য্য সুন্দর চেহারা বউয়ের, সত্যই যেন মেয়েটি রূপে ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছে।

ছোটগিন্নী আড়ালে স্বামীকে বলিলেন, "দিদির মন বড় ছোট বাপ্‌, দেখলে, বউ দেখে কেমন মুখ করল ?"

কর্ত্তা বলিলেন, "তা করবেই ত, সবটাতে আমাদের উপর টেক্‌কা দিতে চান্ কি না ? তা ঐ কালপেঁচা ছেলের জন্যে এই রকম বউ একটি আনেন যেন।

ছোটগিন্নী মুখ নাড়িয়া বলিলেন, "সে আর আনতে হয় না গো। মেয়ের মা বাপেরও ত চোখ আছে ? তারা অমনি বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার দিল আর কি ?"

বড়গিন্নীর মনে কিন্তু এই আশাই বেশী করিয়া মাথা তুলিতে লাগিল। হইলই বা তাঁহার ছেলে কুৎসিত, তাঁহার টাকার জোর কতখানি ? পুরুষ মানুষের আবার সুন্দর কুৎসিত কি ? তাঁহার ছেলের স্বভাবচরিত্র ভাল, সেও আসচেবার বি, এ পরীক্ষা দিবে। তিনি যদি ঐ ছোটকীর বউয়ের চেয়ে সুন্দর অন্ততঃ তাহার সমান সুন্দর বউ না আনিতে পারেন ত বাপের বেটী নন।

মহোৎসাহে চারিদিকে ঘটক ঘটকী ছুটিতে সুরু করিল। এ বাড়ীতে গৃহিণীর উপর কেহ কথা বলে না, প্রবীর ছাড়া। তাহার কথা কেন জানিনা, তাহার মা সহ্য করিয়া যান। মায়ের অতি ব্যস্ততা দেখিয়া সে বলিল, "এত তাড়া কিসের মা ? পরীক্ষাটা আগে হয়ে যাক্।"

মা বলিলেন, "তুই থাম দেখি বাছা। বিয়ে অমনি হট করতেই হয় কি না ? একি ডোম ডোক্‌লার ঘর ? বেছে নিতে হবে না। হাজার জায়গায় কথা হবে, তবে এক জায়গায় জোড় মিল্‌বে।"

প্রবীর বলিল, "যা তোমার রাজপুত্ত্বরের মত ছেলে জোড় কোথাও লাগলে হয়।"

মা তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, "কে বলেছে রে এ কথা ? মুখ ঝাঁটা দিয়ে থেতো করে দেব না ? আমার ছেলের বিয়ে হবে না ? আজই ইচ্ছে করলে একসঙ্গে দশটা বিয়ে দিতে পারি। সে মুরোদ আমি রাখি, তা সব হা ঘরের বেটীদের জানিয়ে রাখছি।"

প্রবীর হাসিয়া বলিল, "অনর্থক কাকে গাল দিচ্ছ মা ? আমাকে কেউ কিছু বলেনি, আমার আয়নাটা ছাড়া। তা বেশ বিয়ে দিও এখন সামনের বছর। দশটাতে কাজ নেই, একটাই হোক আগে।" সে মায়ের ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বড়গিন্নীর রোখটা এইবার ভালরকম চড়িয়া গেল। ঘটক, ঘটকী বাদেও আত্মীয় স্বজন যে

যেখানে ছিল, সবাইকে তিনি কসে খুঁজিতে লাগাইয়া দিলেন। এমন কি অতি সাবধানে নাম ধাম গোপন করিয়া খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপনও ছাপা হইয়া গেল।

সম্বন্ধ অবশ্য আসিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বড়গিন্নীর পছন্দ বড় সহজ জিনিষ নয়, তিনি মনোমত একটা সম্বন্ধও খুঁজিয়া পাইলেন না। কোনোদিকে যে তিনি নামিতে রাজী নন। তাঁহার রূপ চাই, বংশ চাই, টাকাও চাই। নিজের দিকে যত বড় খুঁৎই থাক, কন্যার দিক হইবে একেবারে নিখুঁৎ।

সুন্দরী মেয়ে দুচারটি জুটিল বটে, কিন্তু দরিদ্রের ঘরের বংশও যে খুব উচু তা নয়। বড়গিন্নী এমন জায়গায় কুটুম্বিতা করিতে পারেন না। যাহারা ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করে, তাহাদের ঘরে বিবাহ দিলে, তাঁহার মেয়ে রাজবধূ প্রতিভা ত কোনোদিন ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ীতে পা দিবে না। এমন জায়গায় কি তিনি বিবাহ দিতে পারেন? তাও মেয়ে যদি এমন কিছু অপরূপ হইত, যাহাতে সব খুঁৎ চাপা পড়ে, তাহা হইলেও না হয় হইত। কিন্তু সকলের মুখে শুনিয়া যা মনে হয় কোনোটিই এমন কিছু আহা মরি নয়, চলনসই রকম সুন্দর।

ছেলেকেও তিনি রেহাই দিলেন না। বলিলেন, দেখ খোকা, তোর ত বন্ধুবান্ধব অনেক, কারো ঘরে বিয়ের যুগ্যি বোনটোন আছে নাকি খোঁজ রাখিস একটু।"

প্রবীর বলিল, "তা সাতডিঙ্গা সাজিয়ে দাও, আমিও দুর্গা বলে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

মা বলিলেন, "যা, যা, ফাজলামি করতে হবে না। মোট কথা এই বছরের মধ্যে বিয়ে তোর হওয়াই চাই। ছোটগিন্নী বউয়ের শাশুড়ী হল, আর আমি বড়, আমার ঘর শূন্যি থাকবে?"

প্রবীর বলিল, "আমার এখন বি, এর চিন্তাই বেশী, আর কিছু ভাবতে পারছি না।" কিন্তু আর কিছু ভাবুক বা নাই ভাবুক, গল্পচ্ছলে কথাটা তাহার বন্ধুমহলে প্রচার হইয়া গেল।

দিন কয়েক পরে তাহার বন্ধু রমেশ আসিয়া বলিল, "ওহে সত্যিকারের সুন্দরী বউ যদি চাও ত আমি সন্ধান দিতে পারি।"

প্রবীর বলিল, "মা বিয়ে যখন দেবেনই, তখন সুন্দরী হলেই ভাল, অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশের পক্ষে। তবে সুন্দরী আমাকে দেখে ভির্মি না যান তা হলেই হয়।"

রমেশ বলিল, "হ্যা ভির্মি যাচ্ছে, তোর যেমন কথা। গরীবের মেয়ে বিয়ে হচ্ছে না বলে কিছুতেই, তোর মত রাজপুত্র পেলে তারা এখন হাতে স্বর্গ পায়।"

প্রবীর বলিল, "তাহলেই ত বিপদ বাধালে দেখছি, মা ও যে আবার রাজকন্যাই চান কি না?"

রমেশ বলিল, "কেন তোর অভাব কিসের শুনি যে তুই শ্বশুরের টাকা চাস? বাপের এক ছেলে তুই, সবই ত তোর?"

প্রবীর বলিল, "তা বল্‌লে কি হয়। মায়ের জেদ মেয়ে একাধারে লক্ষ্মী, সরস্বতী, নন্দিনী হবে। কোনও দিকে কম হবার জো নেই।"

রমেশ হতাশ হইয়া বলিল, "তা হলে আর কি হবে? তারা সত্যিই গরীব, তোর মায়ের পছন্দ হবে না।"

প্রবীরের কি মনে হইল, সে বলিল, "আচ্ছা চল মেয়েটিকে একবার দেখে আসা যাক, সত্যিই যদি খুব সুন্দরী হয়, তাহলে মায়ের মত ফিরলেও ফিরতে পারে।"

মেয়েটি রমেশেরই দূর সম্পর্কের পিস্‌তুতো বোন্। একদিন ফাল্গুনের সন্ধ্যায় প্রবীর রমেশের সঙ্গে গিয়া মেয়ে দেখিয়া আসিল।

সত্যই গরীবের ঘর। অত যে বড় মানুষের ছেলে আসিতেছে, তাহার অভ্যর্থনার কোন আয়োজনই নাই। বাহিরের ঘরখানা ঝাড়িয়া মুছিয়া তক্তপোষের উপর চাহিয়া আনা একখানা বেড্‌কভার চাপা দিয়া, বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। বাক্স প্যাঁটরা খাটের তলায় ঠেলিয়া দিয়া, চোখের আড়াল করিবার বৃথা চেষ্টা করা হইয়াছে। লোকজনের বাহুল্যও আছে বলিয়া বোধ হইল না। কন্যার পিতাই গাড়ীর শব্দে ব্যস্ত সমস্ত ভাবে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং অতিথিদের আদর করিয়া বসাইলেন।

জলখাবারের সামান্য কিছু আয়োজন ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার হইয়া যাইতেই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া একজন ঝি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

মেয়েটির বয়স ষোলো সতেরো হইবে, অঙ্গে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য কিছুমাত্র নাই, সাদাসিদা ভাবে একখানি ঢাকাই নীলাম্বরী শাড়ী পরা। কিন্তু প্রবীরের মনে হইল সত্যই যেন তাহার সম্মুখে উপকথার রাজকন্যা দাঁড়াইয়া আছে। এমন রূপ সে কোথাও দেখে নাই, বিশেদের বউও ইহার কাছে লাগেনা। সে বিস্মিত দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া রহিল।

রমেশ বলিল, "নাম টাম জিগ্‌গেষ কর কিছু, অমন হাঁ করে রইলি কেন?"

প্রবীর বলিল, "আমি ও সব পারবনা।" কনে দেখিতে আসিয়া কোনো প্রশ্নই করেনা, এমন অদ্ভুত বর কেহ কখনও দেখে নাই। কন্যার পিতার বোধ হইতে লাগিল যেন একটা ধর্ম্ম বিগর্হিত কাজ হইতেছে। তিনি যাচিয়াই বলিয়া দিলেন যে মেয়ের নাম লাবণ্যবতী, ঘরের কাজকর্ম্মে তাহার জুড়ী নাই, শেলাইও আশ্চর্য্যরকম জানে। গান বাজনা তিনি পছন্দ করেন না, কাজেই শেখান হয় নাই। স্কুলে পড়ানোরও তিনি পক্ষে নন, তবে ঘরে মেয়েকে তিনি যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন, ম্যাট্রিক পাশ মেয়েরাও তাহার কাছে লাগে না।

কিন্তু এততেও প্রবীরের উৎসাহের সঞ্চার হইল না শেষ অবধি কোনো প্রশ্ন না করিয়াই সে বাড়ী ফিরিয়া গেল। হঠাৎ সচেতন হইয়া ভাবিল তাই ত কলিকাতায়ও বসন্ত আসিয়াছে। তাহার জীবনেও আজ ঋতুরাজের আগমন হইল নাকি? মূর্ত্তিমতী বসন্ত লক্ষ্মীকেই কি আজ সে দেখিয়া আসিল?

রমেশকে বলিল, "মাকে জিগ্‌গেষ করে কালই তোকে খবর দেব।"

রমেশ বলিল, "আচ্ছা, একটু বুঝিয়ে বলিস্। তোরাও যদি টাকা চাইবি, তাহলে দেশের উন্নতি হবে কোথা থেকে? অন্য লোকে ত তাহলে পেয়েই বসবে।"

রাত্রি নটা দশটার আগে এ বাড়ীতে খাওয়া হয় না। ইহার আগে খাইলে নাকি চাকর বাকরের কাছে মান থাকে না। বড়গিন্নী ছেলের খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছেন, চাকর গিয়া প্রবীরকে ডাকিয়া আনিল। বড়কর্ত্তার আজ বাহিরে কোথায় নিমন্ত্রণ আছে।

প্রবীর আসিয়া খাইতে বসিল। তদারক করিবার কোনো প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার মা সর্ব্বদাই সামনে বসিয়া থাকেন। প্রবীর বলিল, "মা, তোমাদের না জানিয়েই আজ একটা কাজ করে ফেলেছি।"

মা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। বিবাহযোগ্য ছেলের মুখে এমন কথা শুনিলে উৎকণ্ঠা হওয়াই ত স্বাভাবিক। যা দিনকাল! জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে?"

প্রবীর বলিল, "একটি মেয়ে দেখে এলাম।"

নিজের বিবাহে নিজে হাত দিতে যাওয়া হিন্দুসমাজে মস্ত অপরাধ। মায়ের মুখ তৎক্ষণাৎ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তবে প্রবীর নিতান্তই মায়ের এক ছেলে, কাজেই একেবারে তখনই মহা-প্রলয় ঘটিয়া গেল না। মা গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখলি? কাদের মেয়ে।"

প্রবীর খাইতে খাইতে বলিল, "মেয়ে ত খুব সুন্দর ওবাড়ীর বৌদিদির চেয়েও সুন্দর। আমাদের ক্লাশের রমেশের সম্পর্কে পিস্‌তুতো বোন হয়।"

ওবাড়ীর বউয়ের চেয়েও বেশী সুন্দরী শুনিয়া বড়গিন্নী মনে মনে একটু উৎসাহ অনুভব করিলেন। কিন্তু এমন মেয়ে যাহাদের তাহারা সোজাসুজি তাঁহাদের কাছে প্রস্তাব না পাঠাইয়া চুপিচুপি ছেলেকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া মেয়ে দেখাইল কেন? নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কিছু গলদ আছে। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘর কেমন? মেয়ের বাপের অবস্থা কেমন?"

প্রবীর বলিল, "ঘর সাধারণ, অবস্থা ত কিছুমাত্র ভাল বোধ হল না।"

বড়গিন্নীর মুখ আরো অন্ধকার হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তাহলে কি করে হয় বাছা? আমাদের ত এসব না দেখলে চলে না। পাঁচজনের কাছে মাথা হেঁট ত করতে পারি না? মান সম্ভ্রম আছে ত?"

প্রবীর বলিল, "সে ত জানি। তবে সকল দিক বজায় রাখা ত আর সম্ভব নয়? বড় ঘর, টাকা ওয়ালা ত ঢের এল, তাই বা তোমার পছন্দ হল কই? আর তোমার পছন্দ হলেই তাদেরও যে আমাকে পছন্দ হত তা কে বল্‌লে? না হওয়ারই ষোলোআনা সম্ভাবনা! আবার এই বছরের মধ্যে বিয়ে দিতেও তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখানে হলে আমার মতে ভালই হত।"

বড়গিন্নী একটু ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন। সুন্দরী বউ তাঁহার চাইই, ছোটগিন্নীর কাছে এক্ষেত্রে হীন হইতে তিনি কিছুতেই পারিবেন না। কিন্তু হা ঘরের মেয়েই বা আনেন কি করিয়া?

ছোটগিন্নীকে তাহা হইলে আর কথা শুনাইবার কোন উপায় থাকিবে না। প্রতিভার কাছেও মান থাকিবে না। সব চাইতে বিপদ যে তাঁহার ছেলে কুৎসিৎ শুনিয়া দুই চারজন মানুষ কন্যার পিতা পিছাইয়াও গিয়াছে। এমন অপমান ত যাচিয়া গায়ে নেওয়া যায় না? ছেলের আদর যেখানে হইবে সেইখানের মেয়ে আনাই ভাল নয় কি? সাত পাঁচ ভাবিয়া গৃহিণী বলিলেন, "হট্ করে কিছু বলতে পারিনা বাপু। আসুন উনি ঘরে, পরামর্শ করে দেখি"

প্রবীর খাওয়া সারিয়া উঠিয়া গেল। দুইজন ঝি এবং বামুন ঠাক্রুন্ মিলিয়া এইবার গৃহিণীর খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিল।

কর্ত্তার সহিত পরামর্শ চলিল অনেক রাত্রি জাগিয়া। পাকাপাকি কিছু স্থির হইল না। কর্ত্তার কাছে রূপ হইতে রূপার আকর্ষণ বেশী, নিজের বিবাহেই তিনি তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। বলিলেন, "রাখ তোমার সুন্দরী। ও বয়সের ছেলের চোখে মেয়ে মাত্রই সুন্দরী। আচ্ছা আমি আগে নিজে দেখি ত? তেমন ডানা কাটা পরী হয় ত তখন না হয় বিবেচনা করা যাবে। চালচুলো হীন গরীবের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে পরে ঠেলা সামলাতে পারবে? তোমার বেহাই বেয়ান ত নাক শিকেয় তুলে থাক্বে। মেয়েই হয়ত পাঠাতে চাইবে না। রূপ ত দুদিন বাদে উবে যাবে, অখ্যাতিটাই থাকবে টিকে। রূপের চেয়ে টাকা, বংশমর্য্যাদা এসব ঢের দামী জিনিষ।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা কি আর না বুঝি? দুটোই যদি পাওয়া যেত, তাহলে ভাবনা ছিল না। কিন্তু বড়মানুষদের দেমাকের সব কথা শুনেছ ত? আমার ছেলে যারা অপছন্দ করে, ঝাঁটা মারি আমি তাদের মুখে। চাইনা তাদের মেয়ে আমি। তার চেয়ে যারা ভাগ্যি মেনে আমার ছেলেকে জামাই করবে, সেই ঘরই ভাল। আর বউ দেখে কেউ যে ওবাড়ীর বউয়ের চেয়ে নীরেশ বল্বে সে আমার প্রাণে সইবে না। কখনও ওদের কাছে ছোট হই নি আমি। ছোট হবও না। আমি বলি তুমি মেয়ে দেখে এস। না হয় তলে তলে কিছু টাকা দিয়েও দিতে রাজী আছি, যাতে বিয়ের উৎসবে আমাদের মুখ রক্ষা হয়।"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "একেই বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। টাকা দিয়ে শেষে ছেলের বিয়ে দিতে হবে? স্বয়ং উর্ব্বশী এলেও না।"

গৃহিণী তবু জেদ ধরিয়া রহিলেন, "আচ্ছা, তুমি মেয়ে দেখই না আগে। "বড়কর্ত্তাও যে রূপের মূল্য একেবারে না বোঝেন তাহা নয়, গত জীবনের শোচনীয় অভিজ্ঞতা হইতে গৃহিনীর ইহা জানা ছিল।

গৃহিণীর জেদে অবশেষে কর্ত্তাকে মেয়ে দেখিতে যাইতেই হইল। ছেলেকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ইহারা যদিও কোন আয়োজন করেন নাই, তবু ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের মান রক্ষার্থ খানিকটা ব্যয় এবং শ্রম স্বীকার তাঁহাদের করিতেই হইল। কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য এতই কম যে বড়কর্ত্তার তাঁহা চোখেই পড়িল না। মোটের উপর মেয়ের বাপের দারিদ্র্যটা তাঁহার চোখে বড় বিষম বলিয়াই ঠেকিল। মুখ তাঁহার বড়ই অপ্রসন্ন হইয়া গেল।

মেয়ে দেখিয়া অবশ্য তিনি অপছন্দ করিতে পারিলেন না। হাঁ সুন্দরী বটে। তাঁহারাও বয়সকালে সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী ছিলেন বই কি? ঘরে যদিও তাহার কোনো প্রমাণ নাই। ছেলে যে মুগ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এই রূপই ত শুধু সম্বল? আর ত সব দিকেই খুঁৎ? তিনিও কি পরিণত বয়সে শেষে অর্ব্বাচীনের মত কাজ করিবেন? বিশেষ কোনো ভরসা না দিয়া তিনি সেদিনকার মত প্রস্থান করিলেন। গৃহিণীর অনুরোধ মত লাবণ্যবতীর একখানা ফোটো সংগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন।

গৃহিণী ত এইবার উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। এ মেয়ে ঘরে আনিতেই হইবে। তাঁহাকে চিরকাল রূপের অভাবের জন্য মনে মনে অন্যের কাছে নীচু হইতে হইয়াছে, মুখে যদিও কখনও তাহা স্বীকার করেন নাই। প্রবীরের রূপহীনতার জন্যও তিনি নিজেকে খানিকটা অন্ততঃ দায়ী মনেই করিতেন। লাবণ্যবতী আসিয়া যদি তাঁহার ঘর আলো করে, তাহা হইলে নাতি নাতিনীরা আর ঠাকুরমার পাপে জগতের কাছে মাথা হেঁট করিবে না। প্রবীর ত সুখী নিশ্চয়ই হইবে। নিজের বধূজীবনের অনেক গোপন দুঃখের স্মৃতি আবার বড় গিন্নীর মনে জাগিয়া উঠিল। যাক্, সে সব তিনি সহিয়া গিয়াছেন, ভুলিয়াও গিয়াছেন একরকম। প্রবীরের দাম্পত্য জীবনে আর যেন সে সবের পুনরাভিনয় না হয়।

কর্ত্তা পুরাপুরি রাজী হন না, কাজেই দেরি হইতে লাগিল। প্রতিভা একদিন বাড়ী আসিয়া মাকে খানিক উৎসাহ দিয়া গেল। সে রাজবধূ হইয়াছে বটে, কিন্তু সুখী হইতে পারে নাই। হীরার গহনায় গা তাহার আলো হয় বটে, তবে মনের আঁধার ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় স্বজন কাহারও উপর সে খুসি নয়।

বড়গিন্নী অনেক বাছিয়া কুটুম্ব করিয়াছিলেন, টাকাকে টাকা জ্ঞান করেন নাই, একটু আধটু অপমানও সহিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়ে সুখী হইল কই? তবে কি টাকা কিছুই না, আভিজাত্যও কিছুই না?

বড়কর্ত্তা কিন্তু টাকা এবং বংশ ইহার দুঃখ কিছুতেই ভুলিতে পারেন না। তিনি মেয়ের বাপের যা দশা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে সে মানুষকে বেহাই বলিতে কেমন করিয়া সম্মত হন? অমন বাড়ীতে তিনি বর লইয়া বরযাত্রী লইয়া গিয়া দাঁড়াইবেন কোথায়? মুরারীমোহন বাঁড়ুয্যের ছেলের বিবাহ, কেরাণীর ছেলের বিবাহের মত করিয়া ত হইতে পারে না?

গৃহিণী তলে তলে লোক লাগাইলেন। যদি কর্ত্তার অজ্ঞাতে তিনি মেয়ের বাপের অবস্থা খানিকটা ভাল করিয়া দিতে পারেন ত মন্দ কি? অন্ততঃ এতটা ভাল কি করা যায় না, যে বিবাহটা ভালভাবে হইয়া যায়? বলা বাহুল্য লাবণ্যের পিতা ইহাতে অমত করিবার কিছু খুঁজিয়া পাইলেন না। এমন সৌভাগ্য কটা মানুষের হয়?

কিন্তু শুভ কর্ম্মে বাধা অনেক। হঠাৎ বড়গিন্নীর কাছে চরের মুখে খবর পৌছিল, দারিদ্র্য ছাড়া মেয়ের নাকি মস্ত একটা খুঁৎ আছে। তাহার কোষ্ঠী ভাল নয়।

বড়গিন্নীর মুখও এবার গম্ভীর হইল। কথাই আছে অতি সুন্দরী কন্যা কখনই সুলক্ষণা হয় না। কথাটা কি তাহা হইলে সত্যই? তিনি তৎক্ষণাৎ কোষ্ঠী চাহিয়া পাঠাইয়া নিজের গুরুদেবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মেয়ে ও ছেলের কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

ফল জানা গেল অতি সাঙ্ঘাতিক। কন্যার ভাগ্যে বৈধব্যযোগ অতি স্পষ্ট। বড়গিন্নীর সাধের স্বপ্ন এক নিমিষে টুটিয়া গেল। আর সব সহা যায়, এত সহিবার নয়? বাঁচিয়া থাক তার ছেলে সুন্দরী বউ নাই বা ঘরে আসিল? সম্বন্ধ তৎক্ষণাৎ তিনি ভাঙিয়া দিলেন। এমন কঠিন আঘাতে ভাঙিলেন যাহাতে কনের বাপের মনে আশার লেশ মাত্রও আর রহিল না।

বড়কর্ত্তা এবার নিশ্চিন্ত হইয়া মনের মত কুটুম্বের সন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রবীর শরীর খারাপের ছুতা করিয়া মাস দুইয়ের মত কলিকাতা ছাড়িয়াই চলিয়া গেল। তাহার মা ইহাতে এখন আর বাধা দিলেন না। তাঁহার নিজের মনও ভাঙিয়া গিয়াছিল। যতই কথা গোপন করিবার চেষ্টা করুন, এ সব কথা লুকান থাকে না। পাশের বাড়ীর লোকেরা যে খানিক খানিক ব্যাপার বুঝিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারিলেন, বড়গিন্নীর দুরাশা লইয়া তাহারা যে হাসাহাসি করে তাহাও তাঁহার অজানা রহিল না। সত্যই কি তবে তিনি ছোট জায়ের কাছে হারিয়া যাইবেন? সুন্দরী মেয়ে কি জগতে আর নাই? কিন্তু লাবণ্যবতীর মত সুন্দরী সত্য সত্যই অনেক নাই।

মেয়েটির খবর এখনও তিনি নিজের নিযুক্ত অনুচরদের মুখে সময় সময় পাইতেন। তাহার বাবা এখন জাতি রাখিতে মহাব্যস্ত। বুড়া এক বরের সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন। জামাই হইবেন শ্বশুরের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তবে টাকা আছে, তা ভোগ করিবার লোকেরও অভাব নাই। আগে দুই গৃহিণী তাঁহার ঘর করিয়া গিয়াছে, ছেলে মেয়েও অনেক গুলি রাখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এ বিবাহ নিতান্তই বৃদ্ধের লোলুপতা মিটাইবার জন্য। লাবণ্যবতীকে দেখিয়া সে পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহাকে চাইই। কনেকে সে বিবাহের পরেই পঁচিশ হাজার টাকা লিখিয়া দিবে। কন্যার পিতার হাতেও বিবাহের আগে কিছু পৌঁছিবে, তাহার আভাষ পাওয়া গেল। কসাইয়ের কাজই যদি করিতে হয়, তবে মূল্য না লইয়া ব্রাহ্মণ মানুষ কেমন করিয়া করে? যারা লাবণ্যবতী ও হীরার গহনা পরিয়া খাটে বসিয়া থাকিবে। অত রূপ একেবারে বিফল হইবে না, তা হইলেই বা সে বুড়ার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী? বাঙলাদেশ সতীলক্ষ্মীরদেশ, ঐ বৃদ্ধকেই সে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিবে।

বড়গিন্নীর মন মেয়েটার জন্য ব্যথিত হইয়া উঠিল। আহা অমনরূপ! শেষে দেব পূজার ফুল এমন করিয়া পঙ্কে ডুবিয়া যাইবে? কিন্তু ললাটে তাহার ভীষণ অভিশাপ নিয়তি আঁকিয়া দিয়াছে তাহার উপর ভরসা করিয়া কে তাহাকে ঘরে আনিবে প্রাণের চেয়ে আর ত কিছু বড় নয়।

প্রবীরের জন্য কনে খোঁজা চলিতে লাগিল, কিন্তু বড়গিন্নীর আর তেমন উৎসাহ নাই। ছোটগিন্নীর বউয়ের মত বা তাহার চেয়ে সুন্দরী বউ তাঁহার ঘরে আসিবে না, ইহা যেন তিনি

মনে মনে মানিয়া লইতে ছিলেন। এ ঘরে রূপের প্রদীপ জ্বালা বিধাতার বিধান নয়, রূপার প্রদীপই জ্বলিবে। কর্ত্তার উৎসাহ অবশ্য কম নাই। ধনী ঘরের একটি মেয়ের সন্ধান তিনি পাইয়াছেন, সেইখানে কথাবার্ত্তা চলিতেছে। মেয়ে দেখিতে কেমন জিজ্ঞাসা করিলে সোজাসুজি কোন উত্তর দেন না, গৃহিণী বুঝিতেই পারেন সে মেয়ে সুন্দরী নয়।

প্রবীর এখন ও ফিরিতে চায়না। মায়ের কাছে সে প্রায়ই চিঠি লেখে। পশ্চিমের জল হাও-য়ায় তাহার শরীর ভাল আছে, নির্জ্জনস্থানে পড়াশুনা ও ভালই হইতেছে। মাঝে কলিকাতায় আসিয়া সে পরীক্ষা দিয়া আবার এইখানেই ফিরিতে চায়। ঘরে আর ছেলের মন বসেনা তাহা গৃহিনী বুঝিতে পারেন। বসিবেই বা কিসে? তিনি পাখীর পায়ে সোণার শিকল পরাইতে পারি-লেন কই? ছেলে যদি এখানে না ফেরে তাহা হইলে বড়গিন্নী কিছুদিন গিয়া তাহার কাছে থাকিয়া আসিবেন স্থির করিয়াছেন। লাবণ্যবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বাড়ীতে শান্তি নাই, নিরিবিলি চিত্তবিনোদনের উপায় নাই। বৃদ্ধ তরুনী ভার্য্যা লইয়া দেশভ্রমনে বাহির হইয়া গেল।

প্রবীর সত্যসত্যই পরীক্ষা দিয়া, আবার ফিরিয়া চলিয়া গেল। মা কান্নাকাটি করিয়াও তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। কর্ত্তা অমত করাতে নিজে তাহার সঙ্গে যাইতেও পারিলেন না। এতবড় ঘরের গৃহিনী চলিয়া গেলে চলেনা, থাকিলেই বা লোকজন? ছেলের বিবাহ যদি স্থির হইয়া যায়, তাহা হইলে উদ্যোগ আয়োজন করিবে কে? সে কি ঝি চাকরের কর্ম্ম? মেয়ে নাকি দেখা হইয়াছে। এমন কিছু মন্দ নয়, শীঘ্রই ফোটো আনিয়া বড়গিন্নীকে দেখান হইবে।

মাস খানিক কাটিয়া গেল। হঠাৎ সংবাদ পত্রের মারফতে জানা গেল লাবণ্যবতীর স্বামী হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মারা গিয়াছে! অদৃষ্ট লিপি তাহার অতিশীঘ্র ফলিয়া গেল। বড় গিন্নীর বুকের ভিতরটা চাঁৎ করিয়া উঠিল। এই বিষকন্যা ত তিনিই আনিতে যাইতেছিলেন। বাপ্‌রে! বৃদ্ধ যে নিজের কর্ম্মফলে, বা আয়ুশেষ হওয়াতেই মরিয়াছে একথা ভাবিতে কাহারও ইচ্ছা হইল না। হতভাগিনী লাবণ্যবতীর কথা তিনি জোর করিয়া মন হইতে মুছিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ঘরে কালো বউই আসুক, চিরকাল সিঁথায় সিঁদুর পরিয়া যেন বাঁচিয়া থাকে। ছেলের বিবাহের কথায় তিনি আবার উৎসাহ দেখাইতে লাগিলেন।

সকাল বেলার জলযোগ সারিয়া বড়গিন্নী তেল মাখিতে বসিয়াছেন। সে এক মহা পর্ব্ব। বড়গিন্নীর মাথায় চুল একরাশ, দেহখানিও বিপুল। সমস্তটি তৈল চর্চ্চিত করা কম ব্যাপার নয়। দুইটি ঝি আদাজল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ ভৃত্য নিধিরাম আসিয়া একখানি চিঠি দিয়া গেল। গৃহিনীর সর্ব্বাঙ্গে তেল, তিনি চিঠি ধরিবেন না। এক আশ্রিতা আত্মীয়া আসিয়া চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দিয়া গেলেন। প্রবীর দুদিনের ভিতরই বাড়ী আসিতেছে!

বাড়ীতে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। ছেলের ঘরদোর ঝাড়িয়া মুছিয়া আবার সাজাইয়া রাখা হইল। ছেলের যেমন বুদ্ধি, কোন ট্রেনে আসিবে তাহাই সে লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক বাড়ীর গাড়ী পর পর তিনটা ট্রেনই দেখিয়া আসিবে স্থির হইল।

দুইবার গাড়ী ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল। তৃতীয়বার দেখা গেল গাড়ী আসিতেছে, পিছনে জিনিষ পত্রের বোঝা। এবার তাহা হইলে ছেলে আসিল। গৃহিনী আনন্দে একেবারে সদর দরজার কাছ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গেলেন।

প্রবীর নামিল। কিন্তু পিছনে ও কে? গৃহিনী দ্রুতপদে গিয়া অবগুণ্ঠিতার ঘোমটা তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পরই চমকিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। এ যে সেই কালসাপিনী লাবণ্যবতী! আ মরণ ইহার পোড়া কপালে আবার সিঁদুর দিল কে?

পিছনে সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল, গৃহিনী বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রবীর তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "মা তুমি কি রাগ করেছ?"

মা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "খোকা একি করলি? আমাদের যে জাতজন্ম সব গেল।"

প্রবীর বলিল, "মা ওর কপালে একবার বৈধব্য যোগ ছিল তা ত খণ্ডে গেল। আর তোমার ভয় নেই। জাত তোমার হয়ত থাকবে না, কিন্তু ছেলে তোমার রইল।"

পাশের বাড়ীর লোকেরা উকি মারিতেছে। বড়গিন্নী সেইখানেই মূর্চ্ছাহতের মত বসিয়া পড়িলেন।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতি

শ্রীইন্দিরা দেবী

এদেশে শুধু ধর্ম্ম নয়, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই বেদ থেকে আরম্ভ বলা যেতে পারে। তাই ভারতবর্ষীয় শিক্ষার আলোচনা বৈদিক যুগ থেকে ধরা যাক্, কারণ বেদ আমাদের সকল শিক্ষাদীক্ষার মূল বলে গণ্য। বলা বাহুল্য আমার এ প্রবন্ধ মৌলিক গবেষণার ধার ধারে না; সুতরাং পণ্ডিতী মতভেদেরও তোয়াক্কা রাখে না। অতএব নির্ভয়ে বলা যাক, খৃঃ পূঃ ১০০০ থেকে ৪০০র মধ্যবর্ত্তী কালকে বৈদিক যুগ বলে' ধরছি।

সেকাল ও একালের শিক্ষার মধ্যে যে দু'একটা স্থূল প্রভেদ লক্ষিত হয়, তার উল্লেখ প্রথমেই করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সেকালের শিক্ষা প্রথমতঃ অধিকাংশই ধর্ম্ম এবং নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, আর আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ ছিল তার মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য। অপরপক্ষে বলা বাহুল্য একালের শিক্ষা ধর্ম্মবর্জ্জিত বল্লেই হয়। দ্বিতীয়তঃ, জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে তা' বিশেষভাবে জড়িত ছিল; আর এখন জাতিভেদ তুলে দেবার দিকেই ঝোঁক। তৃতীয়তঃ, সে শিক্ষা দেওয়া হ'ত খোলা জায়গায় গাছতলায়; আর এখন বড় বড় বাড়ী ও বহুতর সাজসরঞ্জামে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়ে থাকে। একজন সাহেব বলেছেন, তাতে কনট্রাক্টর ছাড়া আর কার কি বিশেষ লাভ হয় বোঝা শক্ত। চতুর্থতঃ, সেকালে শিক্ষা মুখে মুখে দেওয়া হত। তারপর এল হস্তলিখিত পুঁথির যুগ, তাতে অন্ততঃ ঢিমেচালে কমসংখ্যক পুঁথিই প্রকাশিত হ'তে পারত। আর এখন মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় বা জ্বালায় বইয়ের অন্ত নেই; পাঠ্যপুস্তকের বোঝায়ও গরীব ছাত্ররা ধনেপ্রাণে মারা যাবার যোগাড়।

বৈদিক যুগের শিক্ষা বল্লেই আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে ভেসে ওঠে বনের মধ্যে, হয় কুটীরের দাওয়ায় নয় গাছতলায় জটাশ্মশ্রু বল্কলধারী প্রবীণ ঋষিতুল্য গুরুদেব বসে আছেন, এবং কৃষ্ণচূড়াবাঁধা গৈরিক বস্ত্র পরিহিত ব্রহ্মচারী শিষ্যবর্গ তাঁকে ঘিরে বসে মন দিয়ে উপদেশ শুনছে। জানিনে এ মানসিক ছবি কতদূর সত্য। তবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয় বোধ হয়। আর সত্য দুর্লভ হলে কল্পনার শরণ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায় কি?

বৈদিক অধ্যয়নকে বলত স্বাধ্যায়। তার মধ্যে ঋক্, সাম, যজু এই তিন বেদ বা ত্রয়ী ছিল প্রধান। সামবেদ গাওয়া হ'ত এবং এখনো হয়ে থাকে তবে দুঃখের বিষয় সামবেদের সুর শোনবার সৌভাগ্য আমার কখনো হয়নি। কিন্তু এখনো আদি ব্রাহ্মসমাজের স্তোত্র উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরিত স্বরে পাঠ করা হয়ে থাকে। এই তিন বেদ ছাড়া ছয় বেদাঙ্গ শেখানো হ'ত,—যথা শিক্ষা বা শব্দতত্ত্ব; কল্প বা বেদীগঠনাদি অনুষ্ঠান পদ্ধতি;

* Bengal Women's Education League এর বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত; জয়শ্রীর জন্য পুনর্লিখিত।

ব্যাকরণ, সেটা কি তা দুর্ভাগ্যবশতঃ সকলেই জানে (যদিও সকলে মানে না) ; নিরুক্ত বা অভিধান ; ছন্দ, এবং জ্যোতিষশাস্ত্র। এইগুলিকে বলত অপরাবিদ্যা। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে যে ;—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস-পুরাণ, পিতৃযজ্ঞ, দৈব, নিধি বা Divination, রাশি বা Arithmetic বাকোবাক্য বা Logic, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ইত্যাদি হচ্ছে অপরাবিদ্যা।

"অথ পরা যয়াতদক্ষরমধিগম্যতে"। পরা বিদ্যা হচ্ছে সেই পরমবিদ্যা, যার দ্বারা সেই অক্ষরকে জানা যায়। এই পরাবদ্যাই ছিল শ্রেষ্ঠ বিদ্যা এবং "সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা" বা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি বলে গণ্য।

শিক্ষার পদ্ধতি ছিল প্রশ্নোত্তরমূলক, অর্থাৎ শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে গুরু তার প্রার্থিতজ্ঞান বিতরণ করতেন। যদিও সেই উপদেশ সম্বন্ধে শিষ্যকে স্বাধীন চিন্তা করবারও যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হ'ত। অবশ্য পরা বিদ্যালাভের জন্য শিষ্যকে চিরজীবনই সাধনা করতে হ'ত, শুধু গুরুগৃহে নয়। সে রকম ইচ্ছা যার হ'ত, সে গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করেও পরে ঘুরে ঘুরে বিশেষজ্ঞের কাছে এবং ধর্ম্মসভায় যোগদান ও আলোচনা করে জ্ঞানলাভ করত। তা ছাড়া কোন কোন বড় রাজা কখনো কখনো একটি বৃহৎ ধর্ম্মপরিষৎ আহ্বান করতেন, তাতে ভিন্ন দেশের ভিন্নমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ নিজ নিজ মতামতের আদানপ্রদান ও তর্কবিতর্ক করতেন। এইরূপে বিদ্যার অনুশীনল ও প্রচার হ'ত।

সে কালে সাধারণ নিয়ম ছিল এই যে, অল্পবয়সে ছেলেরা বাড়ী ছেড়ে শিক্ষার জন্য গুরুগৃহে বাস করবে। তবে বাপের কাছে বা অপর শিক্ষকের কাছেও যে শিক্ষা না পেতে পারত, এমন নয়। সকলেই জানেন, সে কালের হিন্দু সমাজে মনুষ্যজীবন চার আশ্রমে বিভক্ত ছিল—ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্থ্য, সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থ। এই গুরুগৃহে অবস্থানকালকেই বলত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। গুরুগৃহে প্রবেশলাভে যেন ব্রহ্মচারী পুনর্জন্ম লাভ করত, তাই তখন থেকে তাকে বলত 'দ্বিজ' বা 'অন্তেবাসিন্'। এবং এই শিক্ষায় দীক্ষিত হবার অনুষ্ঠানকে বলত উপনয়ন ; এখন যাকে আমরা চলতি ভাষায় বলি 'পৈতে'। তার আরম্ভকে বলত সাবিত্রব্রত, এবং শেষকে বলত সমাবর্ত্তন যেমন এখনো বলে।

ভিন্ন জাতির পক্ষে উপনয়নের বয়স ছিল ভিন্ন—ব্রাহ্মণের ৮ থেকে ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ১১ থেকে ২২, বৈশ্যের ১২ থেকে ২৪। পরিধেয় বস্ত্র, মেখলা বা ঘাসের কোমরবন্ধ, উপবীত বা পৈতে, দণ্ড বা হাতের লাঠি—এ সবও জাত অনুসারে কোন্ কোন্ রকম ছিল বল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। যদি জীবন্ত ছবিতে ভিন্নতা দেখাতে পারতুম তাহলেও বা কিছু সার্থকতা থাকত। তবে সেই মৃগচর্ম্ম ও পট্টবস্ত্রপরিহিত বনবাসী বালকের যে শুদ্ধ, শান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি কল্পনাচক্ষে দেখতে পাই, তা বড় মর্ম্মস্পর্শী। মনে হয় সেই দেশে ত আমরাও জন্মেছি,—কিন্তু কালে ও পাত্রে কত, কতদূর চলে এসেছি তার ঠিক নেই।

গুরুর কাছে শিক্ষা পাবার জন্য শিষ্যকে রীতিমত আবেদন করতে হ'ত। আবার গুরুও তাকে গ্রহণ করবার আগে তার বংশাবলী ও চরিত্রের পরিচয় নিতেন। গুরু শিষ্যকে উপনয়ন দিয়ে প্রথমতঃ তাকে আদ্যোপান্ত শৌচক্রিয়া শেখাবেন; আচার, অগ্নিপরিচর্য্যা, সন্ধ্যোপাসনাও শেখাবেন। পাঠারম্ভে ও শেষে শিষ্য প্রতিদিন গুরুকে প্রণাম করবে ও পাঠকালে কৃতাঞ্জলি হয়ে বসে থাকবে। তাকে বলত ব্রহ্মাঞ্জলি। প্রণামের সময় বাঁ হাতের উপর ডান হাত আড়াআড়িভাবে রেখে গুরুর দুই পা ধরতে হবে।

গুরুকুলে থাকাকালীন শিষ্য প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যা কাষ্ঠ আহরণ করে হোমাগ্নি জ্বালাবে ও ভিক্ষা করবে; খাটে না শুয়ে মাটীতে শোবে, এবং সকল বিষয় গুরুর আজ্ঞাবহ ও হিতকারী হবে।

গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ অতি মধুর ছিল, এবং কখনো কখনো আজীবন রক্ষা হ'ত, অর্থাৎ কেউ কেউ চিরদিন গুরুগৃহেই থেকে যেত। এদের বলা হ'ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। গুরুদেরও প্রকারভেদ ছিল। যিনি শিষ্যকে অবৈতনিকভাবে বেদ শিক্ষা দিতেন, তিনি ছিলেন আচার্য্য; যিনি বেদের কোন অংশ বা বেদাঙ্গ শেখাবার জন্য বেতন গ্রহণ করতেন, তিনি ছিলেন উপাধ্যায়। তবে শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে শিষ্যগণ আচার্য্যকে কিছু গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতে পারতেন। শুধু বিদ্যাদান নয়, শিষ্যকে পূর্ণ মনুষ্যত্বদানই ছিল তখনকার শিক্ষার লক্ষ্য।

গুরু হবার জন্যও কতকগুলি যোগ্যতা থাকা আবশ্যক ছিল। যথা, তাঁকে শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হতে হত, এবং উপযুক্ত শিষ্য পেলে সত্য বলে যা জানেন তাকে অকপটে তাই শেখাতে হ'ত। সেকালের গুরুগণ কঠোর শাস্তির পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং নিতান্ত আবশ্যক না হলে মারধোর ক'রতেন না।

গৃহ্যসূত্রে বলে যে, সেকালে তিন শ্রেণীর দ্বিজকেই শিক্ষাদান করা হত। এবং যাঁরা নির্দ্দিষ্ট বয়সে দীক্ষিত না হতেন, তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। এই প্রকার আচারভ্রষ্টদের বলা হ'ত 'ব্রাত্য' এবং তাঁদের একঘরে করা হ'ত। তাই মনে হয় যে, আমরা আজকাল জনসাধারণের শিক্ষাকে অবশ্য কর্ত্তব্য করে তোলবার জন্য যে এত ব্যগ্র, তখনকার দিনে আর্য্যগণ কার্য্যতঃ কতকটা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন—অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর পক্ষে। প্রত্যেক জাতের শিক্ষা ঠিক একই রকম না হলেও, উপনিষদে দেখা যায় কোন কোন বিদ্বান ক্ষত্রিয় বা রাজা শস্ত্র ছাড়া শাস্ত্রবিদ্যাতেও পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। যথা স্বনামধন্য বিদেহরাজ জনক, সীতাদেবীর পিতা।

বৈদিককালে মেয়েরাও বিদ্যালাভে বঞ্চিত ছিলেন না; গার্গী প্রভৃতি খ্যাতনামা মহিলা তার দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া নৃত্যগীত প্রভৃতি দু একটী বিষয়, যা পুরুষদের শেখাবার অনুপযুক্ত বিবেচিত হত, তাও মেয়েদের শেখানো হ'ত। কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ—শ্লোকটী আমরা সর্ব্বদাই আওড়ে থাকি। আর একটি শ্লোকেও বলা হয়েছে যে, কন্যাকেও বিদ্যা এবং ধর্ম্মনীতি শে[illegible]

উচিত, এবং বিদূষী কন্যা পিতৃকুল শ্বশুরকুল উভয়তঃই কল্যাণদায়িনী হন। আর সেই দেশে স্ত্রীশিক্ষার কি দুর্দ্দশা!

বৈদিক যুগে সম্ভবতঃ কোন স্বতন্ত্র শিক্ষায়তন ছিল না। বেদান্ত বা উপনিষদ যুগে উভয়কুরু প্রভৃতি বিদেশে সংস্কৃত বা শুদ্ধ ভাষা ও বিশুদ্ধ যজ্ঞানুষ্ঠান শিখতে যাবার কথা পাওয়া যায়।

বেদের পরে নাগরিক জীবনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ নতুনরকম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হল। সহরের বাইরে ছিল আশ্রম, সেখানে অল্পসংখ্যক ছাত্রের সঙ্কুলান হত। সহরে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে তক্ষশিলাই বোধহয় প্রাচীনতম এবং বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বেই স্থাপিত। সেখানে শিল্পবিদ্যা এবং চিকিৎসা বিদ্যাও শেখানো হত। রাজগৃহে রাজা বিম্বিসারের সভাচিকিৎসক জীবক এইখানেই তাঁর শিক্ষালাভ করেছিলেন, এবং কাশী, রাজগৃহ ও কোশলাদি সহর থেকে লোকে এখানে পড়তে আসত। পুরাণে অনেক আশ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি এক একটি বিখ্যাত অরণ্য এক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ ছিল।

পৌরাণিক ও স্মৃতিযুগ। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের শিক্ষার বিশেষ তারতম্য ছিল না। তবে বেদ বা শ্রুতির অপ্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচলন হল। এই পৌরাণিক যুগে বৈদিক যুগের শিক্ষাপদ্ধতি বিধিবদ্ধ হল। এই যুগকে মোটামুটি খৃঃ পূঃ ৪০০ থেকে ৪০০ খৃঃ পর্য্যন্ত ধরা যেতে পারে।

সেকালে কেবল ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া নয়, তিন দ্বিজশ্রেণীর ভবিষ্যৎ জীবনের কাজ অনুসারে তাদের তৈরী করাই ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। যদিও সকলেই অধ্যয়ন করবে, কিন্তু অধ্যাপনার কাজ শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট ছিল; ক্ষত্রিয়ের নীতিশাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ এবং বৈশ্যের অর্থনীতি শেখবার নিয়ম ছিল। শূদ্রের উপরে শিক্ষার যে একেবারে কোন প্রভাব ছিল না, তা নয়।

স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগে "বিদ্যারম্ভ" নামে ছেলেদের পাঁচ বৎসর বয়সে একটি অনুষ্ঠানপূর্ব্বক বর্ণপরিচয় করানো হত। এই বয়স সকল জাতের পক্ষে সমান ছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে ঐ বয়সে হাতে-খড়ি হয়। তারপরে উপনয়ন দ্বারা প্রকৃত শিক্ষায় দীক্ষা হত। তার মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্মকালে, এবং বৈশ্যের শরৎকালে উপনয়ন হবার নিয়ম ছিল। ভাগ ভাগ করতে আমাদের হিন্দুজাত অদ্বিতীয়!

শকুন্তলার উপাখ্যানে প্রসিদ্ধ কণ্বের আশ্রম একটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। সেখানে বেদ বেদাঙ্গ ছাড়া জ্যামিতি ও পদার্থবিজ্ঞানাদিও শেখানো হত। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও ব্যাসের আশ্রমও পুরাণ প্রসিদ্ধ। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী একটি আশ্রমই আমাদের কাছে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক, কেন না সেখানে দুটি নারীঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়।

বেদ উপনিষদের কালেও যেমন, পৌরানিক যুগেও তেমনি বড় বড় যজ্ঞে নানা বিদ্বজ্জনের সমাগম শিক্ষাবিস্তারের একটি উপায় ছিল। সমগ্র মহাভারতই ত রাজা জনমেজয়ের অনুষ্ঠিত এই

প্রকার একটি যজ্ঞে আবৃত্তি করা হয়। রামায়ণ মহাভারতে সেকালের রাজকুমারদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অনেক তালিকা পাওয়া যায়। যথা:—ধনুর্ব্বেদ, বেদবেদাঙ্গ, নীতিশাস্ত্র, হাতী ও রথে চড়া সাঁতার, অঙ্ক, শিল্পকলা, চিকিৎসাবিদ্যা, ইতিহাস, ন্যায়, গাথা, নাট্য, কথাদি।—

বৌদ্ধ যুগ।— বৌদ্ধ যুগ পৌরাণিকের কতকটা সমসাময়িক, অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪০০ থেকে ৮০০ খৃঃ পর্য্যন্ত ধরা যেতে পারে।

শ্রুতিস্মৃতির পরে কয়েক শতাব্দী শিক্ষার ইতিহাসে ফাঁক পড়ে যায়। তারপর পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীতে যে-সকল চীনা পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্ম্মের এই পুণ্যজন্মভূমিতে তীর্থ করতে এসেছিলেন, তাঁদের লিখিত বিবরণ থেকে সেকালের শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায়।

ফা-হিয়ান নামে এক বিখ্যাত পরিব্রাজক পাঞ্জাব থেকে বাঙ্গলার তাম্রলিপ্ত বা তমলুক পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৌদ্ধ ভারতবর্ষের অসংখ্য মঠের উল্লেখ করেছেন। তাতে হয় হীনযান কিম্বা মহাযানপন্থী বহু ভিক্ষু বাস করতেন। বিখ্যাত বিদ্বান অধ্যাপক থাকলে চারদিক থেকে বহুশত শিষ্যবর্গ এসে জুটত। বড় বড় রাজা বা শ্রেষ্ঠী জমিজমা, বাগান এবং অন্নবস্ত্র দানে এই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করতেন।

ব্রাহ্মণদের পুরাকালের পদ্ধতি অনুসারে বৌদ্ধযুগেও শিক্ষা মুখে মুখে দেওয়া হত, বিশেষতঃ উত্তরে। তবে পাটলিপুত্র (পাটনা) ও তাম্রলিপ্তিতে অর্থাৎ পূর্ব্বাঞ্চলে নকল করবার মত পুঁথি পরিব্রাজকরা পেয়েছিলেন। ফা-হিয়ান পাটলিপুত্রের মঠে তিন বৎসর থেকে সংস্কৃত পড়েছিলেন, সুতরাং বোঝা যায় যে বৌদ্ধযুগেও সংস্কৃতের চর্চ্চা অব্যাহত ছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে যখন স্বনামধন্য হিউয়েন-ৎ-সাং এদেশে আসেন, তখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে; এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আবার মাথা তুলেছে।

ব্রাহ্মণদের তখনো চারিবেদ অধ্যয়ন করতে হ'ত। আচার্য্যরা অতি যত্নপূর্ব্বক পড়াতেন এবং চেষ্টা করতেন শিষ্যের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগিয়ে তুলে তার দ্বারাই প্রশ্নের মীমাংসা করাতে। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পঠদ্দশা চলত। তখনো পূর্ব্বোক্ত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর দল লোপ পায়নি। তারা সমস্ত সাংসারিক সুখসৌভাগ্য ও ধনমানযশ ত্যাগপূর্ব্বক অতি সামান্যভাবে জীবন যাপন করতেন ও একমাত্র জ্ঞানের তপস্যায় নিজেদের নিবেদিত করতেন। উপযুক্ত গুরুগণ তাঁদের মনে যথার্থ জ্ঞানপিপাসা ও সত্যজিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই একদল লোক সমাজের উপকারার্থেই সমাজ ত্যাগ করে কেবলমাত্র জ্ঞানচর্চ্চাকে জীবনের ব্রত করেছিলেন।

হিউয়েন-ৎ-সাংএর সময় বৌদ্ধধর্ম্ম অবনতির দিকে গেলেও তখনো তার যথেষ্ট প্রভাব ছিল, এবং বিখ্যাত মঠ ও শিক্ষকের অভাব ছিল না। এই মঠগুলি ছিল কলেজের মত, এবং তার আগে ছাত্রদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাধা করতে হ'ত। প্রথমে ছেলেকে সিদ্ধিরস্তু অর্থাৎ সংস্কৃত বর্ণপরিচয়ের বারো পরিচ্ছেদ পড়ানো হত। তারপর সাত বৎসর বয়সে পঞ্চবিজ্ঞান শেখানো হ'ত, যথাঃ—ব্যাকরণ, শিল্পস্থানবিদ্যা, হেতুবিদ্যা বা logic এবং অধ্যাত্মবিদ্যা বা philosophy.

উচ্চশিক্ষা কি ভাবে দেওয়া হ'ত, তা এই পরিব্রাজকের নালন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবরণ থেকেই বেশ বোঝা যায়। এই বিখ্যাত বিদ্যালয় গুপ্ত যুগ বা ৫০০ খৃঃ স্থাপিত হয়ে দশম একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

নালন্দের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে তিনটি বৃহৎ শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল; যথা:—(১) বেহারে ওদন্তপুরী এবং (২) (৩), উত্তরবঙ্গে বিক্রমশীলা ও জগদ্দল। ওদন্তপুরী অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি বঙ্গদেশের রাজা গোপাল কর্ত্তৃক, এবং বিক্রমশীলা অষ্টম শতাব্দীর শেষে রাজা ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। শেষোক্ততে নাকি ১০৭ টি মন্দির এবং ছটি কলেজ ছিল।

ব্রহ্মচারীর যেমন পরিধেয়ের চার অঙ্গ ছিল বস্ত্র, চর্ম্ম, মেখলা ও দণ্ড; তেমনি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ছিল সঙ্ঘাতি বা জোড়া জোব্বা, উত্তরাসঙ্গ বা উত্তরীয় এবং অন্তর্বাস বা ভিতরে পরবার কাপড়। এই তিনকে বলত চীবর এবং এর রঙ হত কাষায় বা লালচে। বাসনের মধ্যে তাঁদের থাকত এক ভিক্ষাপাত্র, এক নিষীদন বা শোবার বসবার মাদুর, আর এক পরিশ্রবণ বা জল-ছাঁকনি।

মঠবাসী ভিক্ষুছাত্রদের সকাল সন্ধ্যা নানা নিয়মাধীন থেকে গুরুর পরিচর্য্যা এবং বিদ্যাচর্চ্চা করতে হত। বাহুল্যভয়ে সে সবের উল্লেখ করলুম না। গুরুজনের সামনে বসবার সময় আরাম করে বসা নিষিদ্ধ। পা মাটিতে রেখে, হাঁটু তুলে, কাপড় ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বসা যেতে পারে। পাপমোচন করবার সময়ও এইরকম বসার নিয়ম।

পড়বার সময় বা খাবার সময় ছোট ছোট চৌকী বা চৌকোণা কাষ্ঠখণ্ডে বসা হত। চৌকী গুলি এক এক হাত তফাৎ রাখা হ'ত, যাতে কেউ কাউকে না ছোঁয়। আর মাটিতে গোবর লেপে সবুজ পাতা ছড়িয়ে দেওয়া হত।

বৌদ্ধ মঠে ভিক্ষু ছাড়াও এমন সব ছাত্র নেওয়া হত, যাদের ভিক্ষু হবার কোন অভিপ্রায় ছিল না; এবং তাদের বলা হত ব্রহ্মচারী। ভিক্ষুগণও ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রচর্চ্চা করতেন।

এর থেকে বোঝা যায় যে, সেকালে বৌদ্ধ মঠগুলি এমন এক এক শিক্ষাকেন্দ্র ছিল, যেখানে ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মেতরজ্ঞান দুয়েরই অধ্যাপনা চল্‌ত, এবং বৌদ্ধ অ-বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে সকলেই শিক্ষালাভ করতে পারত। এমন কি, ভিক্ষুদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তাঁরা অবহিত ছিলেন, কারণ তাদের জন্য বিশেষ ব্যায়াম নির্দ্দিষ্ট ছিল।

বৌদ্ধগুরুর যোগ্যতার মধ্যে সমাজসেবার বিদ্যাদি, যথা চিকিৎসাবিদ্যাও জানা কর্ত্তব্য ছিল। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীদের মত বৌদ্ধভিক্ষুদেরও মঠের নানা দৈনিক গার্হস্থ্যকর্ম্ম সম্পাদন করতে হত। তাদের মধ্যে কর্ম্মদান নামক একজনকে এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা করা হ'ত, ও তার হুকুমই সকলকে মেনে চলতে হ'ত। বিদ্যালাভের মাত্রা অনুসারে এই সব হেয় কাজ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যেত। ছাত্রদের ব্যাখ্যান বা বিতর্কের ক্ষমতার উপরে খুব জোর দেওয়া হ'ত। এবং বাক্ যুদ্ধে পটুতার জন্য পুরস্কার দেওয়া হত।

একদিন যিনি ছিলেন এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি, যাঁহার বীরত্ব সম্মুখযুদ্ধে অর্জ্জুনের মত বীর শ্রেষ্ঠকেও মুগ্ধ করিবার মত, আর্য্যকর্ত্তৃক অপহৃত রাজ্য সেই বীর নাগরাজ আজ অর্জ্জুনের নিকট তস্কর বলিয়া তিরস্কৃত! অদৃষ্টের একি নিদারুণ পরিহাস, চন্দ্রচূড় বলিতেছেন—

"একটি বিশাল রাজ্য হরিল যাহারা
পশুবলে, নররক্তে ভাসায়ে ধরণী,
করিল খাণ্ডব প্রস্থ এই বনস্থলী,
হিংস্র নর জন্তু বাস, অগ্নিতে, অসিতে,
সাধু তারা!—মহাসাধু তাঁদের সন্তান!
আর সে প্রাচীন জাতি মরিয়া পুড়িয়া
সাধু আর্য্যজাতি ভয়ে লইল আশ্রয়
হিংস্র বন্য জন্তুদের,—তাঁদের-সন্তান
জ্বলিয়া জঠরানলে করিলে গ্রহণ
মুষ্টান্ন যে আর্য্যদের,—তস্কর তাহারা।"

বালিকা কন্যার অন্বেষণে আসিয়া রাজ্যচ্যুত মরণাহত বীর, অর্জ্জুনের নিকট তস্কর বলিয়া অভিহিত হইয়া সেই পররাজ্যাপহারী আর্য্যবংশধরের নিকট অনার্য্যের মর্ম্মব্যথা কি মর্ম্মান্তিক ভাষাই না ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন,—

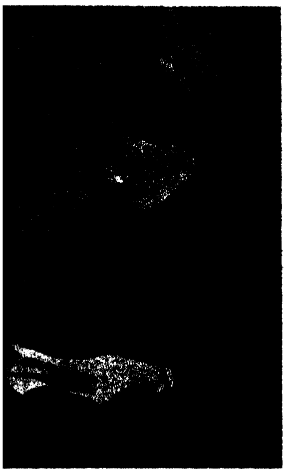
"একটি প্রাচীন জাতি করিল যাহারা
জঘন্য দাসত্বজীবী ভিক্ষা-ব্যবসায়ী,
নিষ্পেষিয়া মনুষ্যত্ব দলিয়া চরণে,
পশুত্বতে পরিণত করিল যাহারা
সাধু তারা!—আর সেই জাতি বিদলিত
আপনার রাজ্যে চাহে মুষ্টি ভিক্ষা যদি
তস্কর তাহারা!—এই আর্য্য ধর্ম্মনীতি
অসভ্য অনার্য্য জাতি বুঝিব কেমনে!
ভূতনাথ! নাহি জানি করিল কি পাপ
নিরীহ অনার্য্য জাতি—এত অত্যাচারে
কাঁপিবে না তোমার কি করের ত্রিশূল।"

দেবতার পায়ে এই শেষ কাতর নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রচূড়ের শেষ নিশ্বাস মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল কিন্তু দেবতার নির্ব্বিকার হৃদয়ে তাহা কোনও তরঙ্গ তুলিতে সমর্থ হইল কিনা কে ... পরস্পর সংঘাতশীল আর্য্যজাতির ...শ্চিত্ত স্বরূপে দে[খা] দিয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

তার আশা আকাঙ্ক্ষাসহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হোয়ে যাচ্ছে। জাপানের সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধে সৈনিক বাহিনী পরাজিত হোয়েছে, কিন্তু চীনবাসী আত্ম-সমর্পণের কথা মনেও কর্তে পার্ছে না, নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করেও চীনজাতি দেশ রক্ষায় সর্ব্বস্ব পণ করে আজ নেমেছে। দেশের নরনারী শেষ পর্য্যন্ত লড়াই ক'রবে, তারা দেশমাতৃকার বেদীতে জীবন আহুতি দিতে প্রস্তুত হোয়েছে। চীনের এই দুর্দ্ধর্ষ, অপরাজেয় মনোভাবের মূলে রয়েছে মহিয়সী নারী সুং মেল লিং (Soon Mei-ling) এর প্রভাব। আধুনিক চীনকে বুঝতে হোলে এর পরিচয় জানা দরকার।

সুং পরিবার একটী সম্ভ্রান্ত বংশ, এই বংশজাতা তিন ভগ্নী ম্যাডাম কুঙ্গ ম্যাডাম সান ইয়াট্-সেন ও ম্যাডাম চিয়াং কাইষেক চীনের রাষ্ট্র জগতে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। ম্যাডাম কুঙ্গ অর্থসচীবের পত্নী। অর্থ সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে তিনি স্বামীর সহায়তা করে থাকেন, তাঁর অত্যাশ্চার্য্য স্বাভাবিক কার্য্যকরী ক্ষমতা আছে, এক্ষেত্রে তিনি চীন জাতির অন্যতম কর্ণধার। ম্যাডাম সানইয়াট্ সেনের নাম অতি সুপরিচিত, তাঁর কার্য্যাবলী ও দেশপ্রমিকতার কথা কারও অবিদিত নেই, সানইয়াট্ সেনের মৃত্যুর পরে তিনিই তাঁর কাজ চালিয়ে এসেছেন। দেশের একটি অংশে এখনও তিনি তাঁর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আছেন। ম্যাডাম চিয়াং কাইসেকের কুমারী নাম সুঙ্গ মেল-লিং, তিনি চীন-গণতন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট ও বর্ত্তমান প্রধান সেনানায়কের পত্নী। জেনারেল চিয়াং কাইসেক পরিণত বয়স্ক, বিবাহিত,







সুঙ্গ ভগ্নীত্রয়।

কিন্তু এই বুদ্ধিমতী, সুরূপা ও নানা গুণসম্পন্না নারী তাঁকে পতিত্বে বরণ করলেন, অনেকের ধারণা যে ক্ষমতা-প্রিয়তাই এর কারণ। নবচীনের গঠনে ও শাসন ব্যবস্থায় চিয়াং কাইসেক প্রভৃত ক্ষম-

তার অধিকারী তাঁর পত্নী হিসাবে এবং নিজের প্রতিভাবলে অদম্য উৎসাহে ম্যাডাম চিয়াং কাইসেক ক্রমে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান দখল ক'রে তাঁর অপূর্ব্ব কার্য্যকুশলতা ও উদ্যমের পরিচয় দিচ্ছেন, তিনি আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করেছেন, সুতরাং তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের গুণাবলীর সুসামঞ্জস্য হোয়েছে। এই নিঃসন্তানা নারী তাঁর স্বামীর কার্য্যে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর জলন্ত দেশপ্রেমিকতা চীনে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিদেশীদূতের সঙ্গে কথা চালাবার সময় [illegible] আলোচনার গতি পরিবর্ত্তিত করবার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। সে সুযোগ গ্রহণ করতে তিনি কার্পণ্য করেন না। সুতরাং চীনের রাষ্ট্রনীতিতে তিনি একপ্রকার সর্ব্বেসর্ব্বা বললেই চলে। তিনি চীনে এমন সম্মান পেয়ে থাকেন, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশ দেশের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ তৎপরতার সঙ্গে পালিত হয় যে তাঁকে একবাক্যে চীনের 'মুকুট-হীন-রাণী' বলা যায়। বস্তুত পক্ষে চীনবাসীগণ তাঁকে রাণীর ন্যায় মর্য্যাদা দিয়ে থাকে বর্ত্তমান চীন জাপান যুদ্ধে তাঁর একটি বিশেষ মত আছে। চীন যুদ্ধ আত্ম-রক্ষার যুদ্ধ বলদর্পী পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্য বাদীর হস্ত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায়; আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামে সকলেরই অধিকার আছে সুতরাং জাপানের বিরোধিতা করা চীন জাতির পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধের ন্যায় পরিগণিত হচ্ছে। ম্যাডাম চিয়াং কাইসেক এই অবস্থা বিশেষরূপে বুঝেছেন, তিনি চীনেদের কোন অবস্থাতেই পরাজয় স্বীকার করতে দেবেন না, বক্তৃতা করে লেখনী চালিয়ে, আদেশ দিয়ে, অনুরোধ করে শাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে তিনি চীনবাসীদের উদ্‌বুদ্ধ করেছেন, তাঁর দেশানুরাগ দেশের চিত্ত স্পর্শ করেছে। ম্যাডামের বিশ্বাস, যদি দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলে ও জাপানের অর্থবল নিঃশেষিত হয় তাহোলে জাপানে গণবিপ্লব ও চীনের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। এ ছাড়া বহুকাল ব্যাপী চীন-জাপান সংগ্রাম চল্‌লে পৃথিবীর অনেক জাতির স্বার্থে আঘাত লাগবে, এবং জাপানের বর্ব্বর আচরণ দেখে সকলেই চীনের আত্মরক্ষার অধিকার ও বাধাদানে যৌক্তিকতা স্বীকার করবে, তার ফলে প্রধান শক্তিসমূহ যেমন বৃটেন, আমেরিকা ও রুশিয়া এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হবে, যে ভাবেই হোক্ তাতে চীনের বাঁচাবার পথ উন্মুক্ত হ'বে। ম্যাডামের এ বিশ্বাসের মূল্য চীনবাসী দিচ্ছে। চীনরক্ষায় অন্যান্য শক্তি সমূহেরও যে স্বার্থ আছে, সে কথাও তিনি পরিস্ফুট করে তুলেছেন, জাপান বিজয়ী হলে তার লোভের মাত্রা এতদূর বেড়ে যাবে যে পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে। চীন হস্তগত হওয়া মাত্র জাপানের চেষ্টা হবে যাতে ক্রমে ক্রমে এই ৪৫ কোটী চীনবাসীকে এক বিরাট সামরিক জাতিতে পরিণত করে সাম্রাজ্য-বিস্তারে প্রধান অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা যায়। জাপানের সংবাদ পত্র-সমূহের এবং প্রধান প্রধান জাপানী রাজপুরুষদের বক্তৃতাতে ও জাপানী সরকারের এই মনোভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখাযায়। জাপানে যুদ্ধানুরাগীদের সংখ্যা এত অধিক যে সেখানে



মৃত্যুবাহী সৈন্যদল।

যুদ্ধ বিরতির প্রশ্নই উঠতে পারে না, যুদ্ধের প্রতিকূলে যত বড় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিই মত প্রকাশ করুক না কেন, ঘাতকের হস্তে তার প্রাণ বিনাশ অনিবার্য্য, শান্তির তিলমাত্র চেষ্টা সেখানে চলতে পারে না, শান্তিপিপাসুদের কত অমূল্য জীবন যে নিঃশব্দে সাম্রাজ্যবাদের বলি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জাপান চীন-বিজয়ী হোলে তাঁর সঙ্গে কেউ সমকক্ষতা করতে বা তখন নব-সমৃদ্ধ প্রবল প্রতাপশালী শক্তির বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াতে পারবে না, সুতরাং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের কথা ভেবে শক্তিমান জাতিগণের পক্ষে চীনের সহায়তা করা কর্ত্তব্য। সাংহাই এর সাংঘাতিক পতনের পরও চীনবাসী দমে নাই বরং নূতন উৎসাহে নবীনতেজে শক্তিমান হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। ম্যাডাম চিয়াং কাইসেক শত পরাজয়েও শাসনভার হস্তচ্যুত না করতে উপদেশ দিচ্ছেন, তাঁর প্রেরণা না থাকলে চিয়াংকাইসেক এই অবিচলিত দৃঢ়তা, তেজস্বিতা অটুট উৎসাহ দেখাতে পারতেন না, একথা চীনবাসীরা মনেপ্রাণে অনুভব করে। তাঁর অসামান্য কর্ম্মকুশলতার জন্য তাঁকে চীনের বিমানবহরের মন্ত্রীর পদ দেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু মহিলা মন্ত্রীর অধীনে রুশীয় কর্ম্মচারীগণ কার্য্যভার গ্রহণ করতে অসম্মতি জানানোতে তিনি উক্তপদ পরিত্যাগ করেন, যদি এ ঘটনা সত্য হয়, তাহোলে তাদের আপত্তি গভীর বিস্ময়জনক।

চীনের তরুণীগণও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। অল্পবয়স্ক নারীরাও সামরিক শিক্ষা পাচ্ছে ও সকল প্রকার ক্লেশ স্বীকারে প্রস্তুত হয়েছে। সংখ্যায় অল্প হোলেও যুদ্ধেও কেউ কেউ নেমেছে। তবে সাধারণতঃ তারা পরোক্ষভাবে যুদ্ধে নানারূপে সহায়তা করছে। তারা প্রচার করছে, আহত সেনাদের সেবাশুশ্রূষার ভার নিয়েছে। গত আগষ্টমাসে ম্যাডাম চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে যোদ্ধাদের সহায়তার জন্য একটি মহিলা সমিতি গঠিত হোয়েছে তাতে সাতমাসে ১৮০,০০০ ডলার সংগৃহীত হয়েছে, এছাড়াও প্রচুর বস্ত্র, অর্থ, চিকিৎসার ঔষধপত্রও তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। চীনতরুণীগণ গ্রামে গ্রামে গিয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিচ্ছে, সৈনিকদের লিখ্‌তে পড়তে শেখাচ্ছে তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত, গীতিনাট্যের আয়োজন করছে, দেওয়াল সংবাদপত্রের প্রকাশে সংবাদ প্রচারে অনেক সুবিধা হচ্ছে। মহিলাদের মৃত্যুবাহিনী সৈন্যদল (Death Battalion) গঠিত হোয়ে কাজ করছে। ১২০০ নরনারী এই বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত; তাদের কার্য্যতৎপরতা, শৃঙ্খলা, সাহস অতুল। তারা গরিলাযুদ্ধে সবিশেষ পারদর্শিতা দেখাচ্ছে। ২০০টী বিদ্যালয়ের ছাত্রী মিলে একটী নারী সেনাদল গঠিত হয়েছে। এরূপ আরও নানা নারী-বাহিনী চীনদেশে আছে। চীনকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে নারীর প্রভাব ও দান অসামান্য।

অনির্ব্বাণ

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

জ্বলেছে জ্বলেছে শিখা
আনন্দ অমৃত লিখা
আজি মোর সুন্দর ভুবনে।
বন হতে বনে
শিহরণ ওঠে জেগে
সুকুমার মুখ হতে
অনিন্দ্য মাধুরী খানি লেগে।
আজি মোর মন
প্রগাঢ় প্রসুপ্তি হতে পেল এক
নব জাগরণ।
যে আনন্দে ফুল ফোটে
শাখে শাখে জেগে ওঠে
যেন কার স্নিগ্ধ স্পর্শখানি
কে সে নাহি জানি
প্রতিদিন প্রকাশের লীলার সঙ্গীতে
বিশ্বের হৃদয়খানি রাখে তরঙ্গিতে
ছেয়ে মোর মানস গগন
সে বিরাট বসে ছিল
ধেয়ানে মগন
গম্ভীর মূরতি
বিকীর্ণ করিয়া তার তপস্যার জ্যোতি।
যবে মুগ্ধ দক্ষিণ সমীরে
মানুষের হৃদয়ের তীরে
জেগে ওঠে গান
বিশ্বের তপস্যা পায়
আপনার প্রাণ
সহসা তখন
মুক্ত করি চিত্ত মোর
দীপ্ত করি মন

সে ধ্যান লভিল এক রূপ অনুপম
অন্তরের অন্তরাল ছিন্ন হল মম।
হৃদয়ের ভার
আপন প্রকাশে লভে কী হর্ষ অপার।
যে অপূর্ব অজ্ঞাত বেদনা
আচ্ছন্ন করিয়াছিল সমস্ত চেতনা
অপরূপ রূপ নিল অমৃত-রোচন
আমার দেহের গ্লানি করিতে মোচন।
অন্তর মন্থিয়া তোলে উদ্বেলিত সুখ
বিকশিত পুষ্পসম সেই শিশু মুখ।
আনন্দে অপার
আমার বাহিরে এল হৃদয় আমার।
সে প্রাণ জ্বলিয়া ওঠে
মেলি উর্দ্ধশিখা
যুগ যুগান্তের বার্ত্তা ললাটে
রয়েছে তার লিখা।
প্রকাশের পথে প্রতিদিন
জীবনের বৃন্ত হতে ফুটাবে সে ফুল অমলিন।
নব নব অর্থ নিয়ে পলকে পলকে
বিকশিত হবে চিত্ত রূপের ঝলকে
মুগ্ধ চমকিত বিশ্ব।
এই নিঃস্ব
ক্ষুদ্র দেহ হতে
প্রাণধারা যাবে বয়ে অনাগত দিবসের পথে।
চেনা তারে নাহি যাবে
তবু সেই চিরন্তন আমি
অনির্বাণ রূপ লয়ে মম অন্তর্যামী
ওই দেহে আজ উদ্ভাসিল।
শেষ তার নাহি হবে
অন্তহীন প্রাণ সে যে নিল।
কী অবাধ অফুরন্ত গতি
কাল হতে কালান্তরে
ছোটে নিরবধি
আমার বন্ধন হতে মুক্ত মম প্রাণ
অন্তহীন চলা তার দীপ্তি অনির্বাণ!

ভাবধারা

*আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া

স্বাধীনতা এবং শান্তির প্রসারকল্পে সংগঠনমূলক প্রচেষ্টা বর্ত্তমান জগতে ক্রমশঃ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে। জগতের নানাবিধ অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শত শত প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে সংগ্রামশীল কংগ্রেসের পররাষ্ট্র বিভাগের সম্পাদকরূপে আমাকে আসিতে হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি অল্পায়ুসরকারী দমনে অথবা জনসাধারণের ঔদাসীন্যে তাহাদের অবসান ঘটে। আবার কতকগুলির উৎপত্তি চীন বা ইথিওপিয়ার দুর্ভাগ্যের অনুরূপ কোনও বিশেষ দুর্ঘটনায় তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য জগতের বিবেককে নিজেদের বিশেষ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করা। আবার এমন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যাহারা ক্রমে শক্তি আহরণ করিয়া নিজেদের দলবৃদ্ধি করে, এবং অবশেষে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করিয়া লয়। বর্ত্তমান জগতের রাষ্ট্রীয় বিপ্লব এবং পরিবর্ত্তনের অনিশ্চয়তার মধ্যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অসহায় এবং উৎপীড়িত অবস্থা দেখিয়া তাহাদের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের সংশয় আসা উচিত নয়। শত লক্ষ নরনারীর হৃদয়ে গভীর সাড়া জাগাইবার ক্ষমতায়ই তাহাদের শক্তি, যাহা ডিনামাইট হইতেও শক্তিমান। এই শক্তির বলে তাহারা কালক্রমে জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হয়।

এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় "ইন্টার ন্যাশনাল"—এই দুইটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন দেশের কারখানার শ্রমিক সম্প্রদায় হইতে শক্তি আহরণ করিয়া গঠিত এই দুইটী প্রতিষ্ঠান আর্থিক সুবিচার এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য গণজনের প্রচেষ্টার প্রতীক। যে ধননীতির নির্দ্দেশে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সমাজকে অধিকার করিয়া আছে ইহারা উভয়েই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমান ধননীতিকে দূর করিয়া ইহারা সেই স্থলে সমাজতন্ত্র নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে চায়—যে প্রথায় রাজা এবং প্রজায়, জমিদার এবং কৃষকে, কারখানার মালিকে এবং শ্রমিকে কোন বিভেদ থাকিবে না। এই দুইটী প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট দল পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, এবং কোন কোন স্থানে তাহারা নিজেদের দেশও পরিচালনা করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট দল তৃতীয় 'ইন্টারন্যাশনালের' সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া দেশ শাসন করিতেছে, এবং স্পেন ও সুইডেনের, এবং কখনও কখনও ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্টদল তাহাদের স্ব স্ব

* শ্রীশকুন্তলা দেবী কর্ত্তৃক অনূদিত।

দেশের শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতীত অন্য কোথায়ও এই সকল দল ধনতান্ত্রিক সমাজের উচ্ছেদ সাধন করিয়া গণতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। এই দুই 'ইণ্টার-ন্যাশনালের' প্রভেদ প্রধানতঃ তাহাদের কর্ম্ম পদ্ধতিতে। 'কম্যুনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনাল' সমরপন্থী এবং কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার পক্ষপাতী, অপরপক্ষে সোশালিষ্ট—'ইণ্টার-ন্যাশনাল' শান্তিপূর্ণ পরিবর্ত্তনের সাহায্যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। জগতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে বিশেষতঃ অবিরত 'ফ্যাসিজম্'এরআক্রমণে এবং ক্রমবিবর্দ্ধমান শস্ত্রসজ্জার প্রভাবে এই দুই 'ইণ্টার-ন্যাশনাল' বহু বিষয়ে একমত হইয়া আসিতেছে; উভয়েই স্পেন এবং চীনদেশে গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার স্বপক্ষে অভিযান করিয়াছে।

এই 'ইণ্টার-ন্যাশনাল'গুলির ইতিহাস বিচিত্র। বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠান লইয়া গঠিত প্রথম 'ইণ্টার-ন্যাশনাল' আভ্যন্তরীন বিবাদের ফলে ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পরে দ্বিতীয় 'ইণ্টার-ন্যাশনাল' শ্রমিক শ্রেণীর প্রচেষ্টার অগ্রণীরূপে চলিতে থাকে; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইহার বিভিন্ন জাতীয় শাখাগুলি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে জাতীয় সংগ্রামে পরিণত করিয়া শ্রমিক শ্রেণী দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার আয়ত্তের পন্থা পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং নিজ নিজ দেশের ধনবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী দলগুলির সহিত একত্রিত হইয়া জাতীয় যুদ্ধের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিল। সুবিধা-বাদের নিকট আদর্শের এইরূপ বলিদান জগতের ইতিহাসে বেশী ঘটে নাই একমাত্র রাশিয়ার প্রতিষ্ঠানই এই যুদ্ধের সুযোগে শ্রমিকের জন্য রাজনৈতিক শক্তি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল এবং পরে তৃতীয় 'ইণ্টার-ন্যাশনালের' শাখা স্থাপন করিতে সহায়তাক রিয়াছিল। তৃতীয় 'ইণ্টার-ন্যাশনাল' সাম্রাজ্যবাদ ও ধনবাদ সম্বন্ধে দ্বিধাহীন এবং অবিচলিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু দ্বিতীয় 'ইণ্টার-ন্যাশনালের' অন্তর্ভুক্ত দলগুলি, যথা বৃটিশ শ্রমিকদল অনেক সময়েই বিদেশে সাম্রাজ্যপন্থী শাসনের পরিপোষকতা এবং স্বদেশে নিরীহ ধরণের পার্লিয়ামেণ্টারী সমাজতন্ত্রবাদের অনুবর্ত্তন করিয়াছে। তবে দ্বিতীয় 'ইণ্টার-ন্যাশনালের' দলগুলি গণতন্ত্র শাসন পদ্ধতি এবং শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলন দ্বারা সামাজিক পরিবর্ত্তণ সাধন প্রণালীতে অধিকতর অভিজ্ঞ।

জগতের ভবিষ্যৎ বহুল পরিমাণে এই দুইটী 'ইণ্টার-ন্যাশনালের' সহিত জড়িত। আজ পৃথিবীর প্রধান সমস্যা এরূপ ভাবে রাষ্ট্রীক এবং আর্থিক ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করা যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রভুত্ব এবং ধন সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের বিলোপ সাধন হয়। একমাত্র এই উপায়েই পৃথিবীতে সাম্য এবং প্রগতি আনয়ন করা সম্ভব; এই দুই 'ইণ্টার-ন্যাশনাল' এই সমস্যা সাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে। তাহারা যে ইহাদের আদর্শ এবং কর্ম্ম পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ভাবে একমত হইবে তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত যে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, কর্ম্মক্ষেত্রে কতকটা মিল না ঘটিলে শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে পৃথিবীতে ফ্যাসিষ্ট এবং সাম্রাজ্যবাদীদিগের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। পৃথিবীর বিভিন্ন সোশালিষ্ট এবং

কম্যুনিষ্ট দল গুলি কমবেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী হইলেও ভারতবর্ষ, চীন, আরব প্রভৃতি দেশের অধিকাংশ স্বাধীনতা আন্দোলনই তাহাদের ক্ষেত্র বহির্ভূত।—ভারতের অথবা চীন দেশের জাতীয় অভিযান যদিও আগেকার সমাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণ করে নাই তবুও এই সকল আন্দোলন উন্নতি পন্থী এবং স্বাধীনতা ও জগতের প্রগতির পক্ষে অপরিহার্য্য। এই সকল বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলন লইয়া একটী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। (The League against Imperialism) সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীসঙ্ঘ এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সঙ্ঘের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অবস্থায় বার্লিনে ইহার মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল পরে হিটলার উহাকে লণ্ডনে বিতাড়িত করে। ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে সরকারী শাসন এবং সাধারণের ঔদাসীন্য ব্যতীত সাম্প্রদায়িকতার জন্যও এই 'লীগ' শক্তিমান আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকাংশ সময়েই বিভিন্ন ঔপনিবেশিক আন্দোলনের কেবলমাত্র সর্ব্বাপেক্ষা চরমপন্থী সোশ্যা-লিষ্ট এবং কম্যুনিষ্ট শাখাগুলিকেই সাহায্য করায় ক্রমে ক্রমে এই লীগ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গুলির মূল কর্ম্মস্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে এই লীগ সাবধানী হইয়াছে, কিন্তু পুনর্ব্বার প্রভাবশালী হওয়া এখন ইহার পক্ষে কঠিন হইবে।

পৃথিবীর শান্তি চিরকালই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ভিত্তির উপরে স্থাপিত কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসর ধরিয়া অবস্থা ক্রমশই সঙ্কটতর হইয়া উঠিতেছে। চীন ইথিওপিয়া এবং স্পেনের তিনটী মহাযুদ্ধে বহু লক্ষ লোকের প্রাণ-নাশ এবং বহু শতাব্দীর কীর্ত্তি কলাপ বিদ্ধস্ত হইয়া সমগ্র জগতের উপর নিরানন্দের গভীর ছায়াপাত করিয়াছে। এই মুহূর্ত্তে আমাদের প্রায় তিন হাজার মাইলের মধ্যেই কামানের গোলা এবং আকাশ হইতে নিক্ষিপ্ত বোমা আবালবৃদ্ধবণিতার মস্তকে মৃত্যু বর্ষণ করিতেছে। এই অবস্থায় মনুষ্য হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধান আকাঙ্খা শান্তি স্থাপন করা। এই কামনা হইতে অনেক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানও গঠিত হইতেছে।—এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী এবং বহু বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান হইতেছে International Peace Campaign,—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইহার সঙ্ঘভুক্ত। এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটী বর্ত্তমানে জাতীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র এবং বর্ব্বর আক্রমণের বিপক্ষে জগতের বিবেক বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান 'League of nations' কে এই রূপ শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চায় যাহাতে উহা যে কোন রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সশস্ত্র আক্রমণের অপরাধের জন্য সমগ্র জগৎ হইতে সম্পর্কচ্যুত করিতে সক্ষম হয়। 'International Peace Campaign' প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ এবং শান্তির ফলাফল সম্বন্ধে ভিতরের কারণ অনুসন্ধান করিয়া বিশেষ কোনও ঘটনাবলীর বহিঃপ্রকাশ দ্বারাই বিচার করিয়া থাকে, কিন্তু world Committee against fascism and war নামক প্রতিষ্ঠান ফ্যাসিজম্‌কেই বর্ত্তমান জগতের প্রধান শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী আন্তর্জাতিক শান্তিপ্রতিষ্ঠান আছে, ইহাদের মধ্যে 'The War Resisters International প্রতিষ্ঠান উহার উচ্চ আদর্শের জন্য বিশেষ

ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ অহিংসার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কোন অবস্থাতেই তাহারা অস্ত্র গ্রহণ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। ইহার সভ্য সংখ্যা সীমাবদ্ধ, কারণ সশস্ত্র শত্রুর বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র শান্তিবাদ প্রয়োগ করা তাহা সে যতই প্রাণবন্ত হউকনা কেন,—অধিকাংশ লোকের পক্ষেই সম্ভব নহে। পরিশেষে আমি 'Women's International League for Peace & Freedom' নামক আন্তর্জ্জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিতে চাই। জগতের জনমত গঠনের উপর এই প্রতিষ্ঠানের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের বিকাশ 'Women's International League for Peace & Freedom' যে সকল অন্যায় এবং অবিচার ভারতীয়েরা ভোগ করিতেছেন, আশা করি ভারতীয় নারীগণ তাহার বিবরণ এই প্রতিষ্ঠানকে জানাইবেন এবং এই প্রতিষ্ঠান হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশের নরনারীগণের বিবিধ নির্য্যাতনের বিবরণ জানিতে পারিবেন। এই সম্মিলিত দুঃখ বোধ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপলব্ধিতে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে।

ভারতীয় ঐতিহ্যের অর্থমূলক ব্যাখ্যা

(মার্ক্সের জড়বাদ)

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু

Ultramontane এবং Romantic প্রভাবের জোয়ার গতির বিরুদ্ধে যখন কার্ল মার্ক্স তাঁর জড়বাদ এবং ইতিহাসের বস্তুমূলক ব্যাখ্যা প্রচার করেন তখন পাশ্চাত্য ভাবধারায় এক তুমুল আবর্ত্তনের সূচনা হয়। দৃশ্যমান বাস্তবের অন্তরালে থাকিয়া এক অপ্রত্যক্ষ্য উদ্দেশ্য মহাকালের রথ চালাইতেছে এই বিশ্বাসের উপর ইতিহাসের ভিত্তি গড়িয়া মনীষীগণ মানুষের কর্ম্ম প্রবাহের উৎস খুঁজিয়াছেন কত গুলি ভাবোচ্ছাস বা মনোবৃত্তির মধ্যে—যথা, ধর্ম্মবিশ্বাস, যৌনাকর্ষণ, দেশপ্রীতি, হিংসা, অসূয়া, লোভ ইত্যাদি। মার্কস্ উদ্দেশ্যবাদ ভাঙ্গিয়া কারণবাদের উপর নূতন করিয়া ইতিহাস ও সমাজ বিদ্যার গোড়াপত্তন করিলেন। জৈবগতির কার্য্য কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া তিনি আবিষ্কার করিলেন যে অর্থকরী বৃত্তি মানুষের মূল বৃত্তি। ধনের উৎপাদন এবং বণ্টনের বৈষম্য হইতে যে শ্রেণীদুষ্ট সমাজের উদ্ভব হয় তাহাই মানুষের বহুমুখী বিকাশ ও বিবর্ত্তন ঘটায়। সভ্যতা, প্রগতি দর্শন, সাহিত্য, শিল্প সমস্তই এই শ্রেণীবৈষম্যকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া ওঠে। মানুষের যাবতীয় সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে এই বৈষম্যের বিনাশ বা রক্ষণার্থে প্রযুক্ত হয় অথবা অন্য কোন কঠিন বাস্তব শক্তি দৃশ্য পটের পশ্চাত হইতে তাহার গতি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং বিশ্লেষণের চরম সীমায় দেখা যায় অর্থমুখী প্রেরণা মানুষের ভাব সমষ্টির মূলাধার এবং এই কেন্দ্রস্থ শক্তি তাহাকে যন্ত্রের চাকার মত ঘুরাইতেছে।

জড়বাদী ও অধ্যাত্মবাদীর সংঘর্ষ এখনও মেটে নাই। কিন্তু মার্ক্সের দর্শন সর্ব্বসম্মত ভাবে গৃহীত না হইলেও সুধীসমাজ একথা মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন যে জীবনধারা কোন মতামতের অপেক্ষা রাখিয়া চলে না,—ঘটনা চক্রের কারণসম্বন্ধ বহির্বস্তুর বিষয়ীভূত, ইতিপূর্ব্বে বহুমতে সমাজ বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিদ্যায় এইরূপ পার্থক্য বিবেচিত হইত যে প্রথমটিকে সৃষ্টি করে কর্ত্তার উদ্দেশ্য —দ্বিতীয়টির জন্ম হয় নিরপেক্ষ ভাবে কার্য্যকারণের সম্বন্ধ পাঠ করিয়া; সামাজিক পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা স্বেচ্ছাকৃত সমাজ ব্যবস্থা বা আইনকানুন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এই সমস্ত যন্ত্রতন্ত্রের ছাঁচে ঢালাই হইয়া সমাজ এক এক প্রকার রূপ ধারণ করে। মানুষ আইন প্রণয়ন করিয়া পরস্পরের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে ইহা যদিও বা সমাজের নিগূঢ় ব্যাখ্যা হয়, তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিতে পারে দেশভেদে ও কালভেদে এই সম্বন্ধের রূপান্তর হয় কেন? শুধু লক্ষ্যের বিভেদ দেখাইলেই এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হইবে না—দেশকালান্তরে লক্ষ্যের কেন বিভেদ হয় তাহাও দেখাইতে হইবে। অতএব উদ্দেশ্যের দোহাই দিলেও শেষ পর্য্যন্ত কারণবাদেই গিয়া পড়িতে হয়। অপরপক্ষে দেখা যায় শ্রেণীবিশেষ তার বিশিষ্ট স্বার্থ অনুযায়ী সমাজ সম্বন্ধ নির্ণয় করে! বস্তুতঃ মনুষ্যসমাজ নৈসর্গিক

জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন নয় এবং ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র নিয়ম নাই, সমাজদেহের তাগিদে না আসিলে বাহ্যিক আইনকানুনের অনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় এবং এই তাগিদ প্রবল হইলে কোন আইনের প্রাকার তাহা ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান—দেবসাহিত্য ও গণসাহিত্য

মার্কস্ তাঁহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন ইউরোপের ইতিহাস হইতে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারা লক্ষ্য করিয়া তিনি যে সিদ্ধান্তগুলিতে আসিয়াছিলেন তার প্রত্যেকটী যে হুবহু ভারতবর্ষের উপর খাটিবে এমন কথা বাতুলেও বলিবে না। বহিরাবেষ্টন সমাজের মূর্ত্তি রচনা করে ইহা মার্ক্সের বানী অতএব ইউরোপীয় ও ভারতীয় ইতিহাসে পার্থক্যের যথেষ্ট অবসর বিদ্যমান। মার্ক্স বিশ্বমানবের ইতিহাসকে এক লোহার ছাঁচে ঢালাই করেন নাই, ইতিহাস পাঠের এক অভিনব বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। মানুষ মূলত অর্থমতি, নিরঙ্কুশ প্রতিযোগিতার ফলে ধন পাত্রবিশেষে সঞ্চিত হয়, ইহা হইতে শ্রেণী স্বার্থ আসিয়া পড়ে এবং সমাজের গতি নিয়ন্ত্রণ করে শুধু এইটুকু দেশ কালোত্তর সত্য কিন্তু ভারতবর্ষের সভ্যতা, ঐতিহ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা এখনও এদেশে এত বদ্ধমূল রহিয়াছে যে বাস্তবের অমোঘ প্রভাব উচ্চারণ করিলে অনেক বিদ্বানের বিভীষিকা সঞ্চার হয়। এ নাকি বুদ্ধ, চৈতন্য, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথের দেশ যেখানে ঋষির তপোবনে বাঘে হরিণে হিংসা ভুলিয়া গলাগলি করিত, রাজা রাজ্য ছাড়িয়া বানপ্রস্থ লইত, রাষ্ট্রবিষয় ভুলিয়া ধর্ম্মবিষয়ে শক্তিনিয়োগ করিত, যেখানে আজও মানুষ সত্যের জন্য অহিংসভাবে নির্য্যাতন সহ্য করে। ভারতের ইতিহাস আছে বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, ত্রিপিটক, পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে ইহার ভিত্তি অর্থ নয়, পরমার্থ।

ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার জন্য কোন থুসিডিডিস অথবা ট্যাসিটাস্ জন্মগ্রহণ করেন নাই, অধ্যাত্মসাধন ও দৈববিধি নির্দ্দেশ করিবার জন্য শ্রুতিস্মৃতিকারের বহুল আবির্ভাব হইয়াছিল। এই 'ত্রিকালজ্ঞ' ঋষিগণ ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের আদর্শ অনুযায়ী সমাজের বিধান দিয়া গিয়াছেন। এ বিধান সমাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এই প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের কোন কোন পুরাতাত্ত্বিক এক মিথ্যা ইতিবৃত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন। ধোয়াটে স্বাদেশিকতা, ধর্ম্মভাব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব ইহার রসদ জোগাইয়াছে। ভারতীয় সমাজ যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না একথা Senart, Fick প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণ বহুকাল পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। গুণ ও কর্ম্মভেদে জাতিবিভাগ স্মার্ত্তদের কল্পনা বা আদর্শমাত্র। ব্রাহ্মণ বলিয়া যাহারা পরিচিত তাহারা লাঙ্গল চালাইতেছে, শূকর-কুক্কুট গোমাংসে উদরপূর্ত্তি করিতেছে, কুশীদ লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, আবার শরাসন বা পরশু হস্তে যোদ্ধাশ্রেণীর হৃদকম্প জন্মাইতেছে—এইরূপ প্রমাণের অভাব নাই।[১] পঞ্চাশোর্দ্ধে গৃহস্থকে অজীন বল্কল লইয়া বনে ভ্রমণ করিবার পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বর্গের মধ্যবর্ত্তী দুটি বর্গের উপাসনা করিতেই দেখা যায়। নারীকে নরকের দ্বার জ্ঞান করিলে কোন দেশে উভয়ভারতী ও মৈত্রেয়ীর আগমন হয় না। 'ষড়্ভাগী' রাজা অর্দ্ধাধিক ভাগ লইয়াও নির্ম্মমভাবে

কৃষকদিগকে শোষণ করিতেছে আবার দেবাংশধারী রাজা ক্ষিপ্ত প্রজার কোপে প্রাণ দিতেছে বা নির্ব্বাসনে যাইতেছে এ উভয়বিধ দৃষ্টান্ত প্রাচীন সামাজিক চিত্র হইতে উদ্ধার করা যায়।

বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাস বেদ পুরাণে নাই রাজপ্রসাদপুষ্ট প্রশস্তিকারদের স্তুতিগাথায়ও নাই। বৈদেশিক আগন্তুকগণও এই দ্বৈতপ্রভাবের মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিখিয়া গিয়াছেন। রাজহর্ম্ম্য ও তপোবনের মধ্যস্থলে যে অন্তহীন লোকারণ্য প্রসারিত ছিল তাহার প্রাণস্পন্দন রাজপ্রশস্তি বা দেবসাহিত্যে অনুভূত হয় না। গণজীবনের যথার্থ উপাদান একমাত্র গণসাহিত্যেই পাওয়া যায়। রাজবংশের কুষ্ঠী-ঠিকুজী এবং যুদ্ধবিগ্রহের নিখুঁত বর্ণনা সম্বলিত ইতিহাস ভারতবর্ষের না থাকিলেও এপ্রকার গণসাহিত্যের একান্ত অভাব নাই। অবশ্য এ সাহিত্যও সঙ্কলয়িতার ধার্ম্মিকতার প্রলেপ হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নাই।

ব্রহ্মণ্যের ধর্ম্মসাহিত্য ও বৌদ্ধের ধর্ম্মসাহিত্যে মুখ্য প্রভেদ এই যে প্রথমটির বাহন দেবভাষা, দ্বিতীয়টির বাহন গণভাষা, ব্রহ্মণ্যের ভেদবাণী হইতে তথাগতের ধর্ম্ম সঙ্ঘ ও রাষ্ট্রনীতিতে সাম্য এবং গণতন্ত্রের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছিল। এজন্য বৌদ্ধ লেখকদের পালি রচনায় গণসমাজের নিজস্ব কথা কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে। গ্রাম্যসমাজের নিস্তরঙ্গ জীবনপ্রবাহ সুখদুঃখ সখ্যদ্বন্দ্বের এক একটি ছোট ছোট আবর্ত্ত রচিয়া বিচিত্র কথায় গাথায় রূপ পরিগ্রহ করে এই সমস্ত নিরুদ্দেশ্য, স্বতঃ স্ফূর্ত্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে লোকারণ্যের সংস্কার, ভাবধারা এবং জীবনচিত্র স্বচ্ছ আকারে ফুটিয়া ওঠে। জাতকের গল্পগুলি এই জাতীয় যুগযুগসঞ্চিত রূপকথা। শুধু বোধিসত্ত্বের নায়কত্ব ও গুনকীর্ত্তন ইহার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গণসাহিত্যের ধারা মাঝে মাঝে বিলুপ্ত হইয়া আবার পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে অংশত আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। পুরাণ এবং রামায়ণ মহাভারতের মধ্যেও মাঝে মাঝে শিল্পচাতুর্য্য ও আদর্শকীর্ত্তনের আস্তরণ ভেদ করিয়া নগ্ন মানবজীবন দেখা দেয়।

ধর্ম্ম ও পুরোহিত

এই সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধান করা যাইতে পারে গণজীবনে ধর্ম্মের স্থান কোথায় এবং রূপ কী। ধর্ম্ম বা religionকে দ্বিভক্ত করিলে দাঁড়ায় অধ্যাত্ম (Theology) এবং লোকাচার (ritual)। তপস্বী নৈয়ায়িকের কারবার আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শন লইয়া, গণসাধারণের সম্পর্ক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও দেখা যায় গোষ্ঠীজীবনের শিশু অবস্থায় মানুষ বীরের ন্যায় সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে, অজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি হইয়াছে ভীতির মধ্যে—ভীতি হইতে আসিয়াছে অজ্ঞেয়ের স্তুতি এবং দৈবত্ব ; জ্ঞান ও আয়ত্তের ক্ষুদ্র পরিধির বাহিরে যাহা তাহাই হইয়াছে অলৌকিক, দৈব, প্রশ্নের সহজ মীমাংসা হইল জড়ত্বে বিশ্বাস (Animism) ; শঙ্কটের অনন্য প্রতিকার হইল জড়পূজা, প্রস্তর, পশু, বৃক্ষ সর্ব্বত্র অনার্য্যগণ প্রেতযোনী ও দেবযোনীর প্রাদুর্ভাব দেখিত। অনার্য্যদের জড়দেবতা হইতে আর্য্যদের নৈসর্গিক দেবতার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইন্দ্র, অগ্নি, পবন, বরুণ এক একটী অনায়ত্ত নৈসর্গিক শক্তির প্রতীক।

বারিবর্ষণ স্বেচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিয়া কৃষক ধারাদেবতার তুষ্টিবিধানে প্রয়াস পাইল, অগ্নির প্রকোপ দমন করিতে না পারিয়া গৃহস্থ রুদ্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল, ঝঞ্ঝা বন্যা রোধ করিতে মানুষ পবন বরুণের শরণাপন্ন হইল। সাধারণের ভীতি এবং সংস্কারকে মূলধন করিয়া আসিল পেশাদার পুরোহিত; সন্ত্রস্ত মানব এবং নিষ্ঠুর দেবতার মধ্যে মধ্যস্থতা করিবার জন্য তুক তাক্, মন্ত্র-তন্ত্র, ক্রিয়া-কর্ম্ম অনেক কিছুর প্রয়োজন হইল। ক্রমশঃ ইতরজনের সহজ অজ্ঞানতাপ্রসূত নগ্ন নৈসর্গিক দেবতার পরিবর্ত্তন হইল সূক্ষ্মবুদ্ধির কপোল-কল্পিত অতিপ্রাকৃতিক গুণবাচক দেবতায়, দাহিকাশক্তিরূপী রুদ্র হইল শঙ্কর শ্মশানচারী, ত্যাগবৈরাগ্যের আদর্শ। পর্জ্জন্যদেব হইল অসুরঘাতী দেবরাজ, শাসন ও শৃঙ্খলার প্রতিভূ। শক্তি হইল তেজের প্রতীক। বিষ্ণুর মধ্যে রূপায়িত হইল প্রেম বা রক্ষণধর্ম্ম। এই সমস্ত দেবতা ও তত্তৎ গুণ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় দাঁড়াইল। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মারুতির মধ্যে বিরোধ কায়েমী করিয়া রাখিল নর ও দেবতার মধ্যবর্ত্তী নর-দেবতা, নরদেবতার কায়েমী স্বার্থে মূলবদ্ধ হইয়া গণধর্ম্ম বিচিত্র শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিল। এই প্রকারে লৌকিক ধর্ম্ম আর্থিক সংগ্রামের সূত্রপাতে সহজ পূজায় অঙ্কুরিত হইল পরে শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষণে বহুল আচার বিচার ও ভেদ-দ্বন্দে পরিণতি লাভ করিল।

অবশ্য বহুর মধ্যে এক, বিভেদের মধ্যে সমন্বয়, দেবের ঊর্দ্ধে দেবাত্ম (God head) পণ্ডিতের পুঁথিতে এ সমস্তই ছিল, ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব তার অলৌকিক রূপ; লৌকিক ধর্ম্মাচারের সঙ্গে ইহার যোগসূত্র নাই।

একথা অবশ্য স্বীকার্য্য ভারতের বহু ঋষি অর্থকে অনর্থ জ্ঞান করিয়া রহস্যের দুয়ার খুলিতে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মিশর-ব্যাবিলন এবং মধ্যযুগের ইউরোপে দেখা যায় দেব-মন্দিরে জাতীয় ধনসম্পদ সঞ্চিত হইত, এই অর্থ ও মানবচিত্তের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া পুরোহিত রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং 'দেবসম্পত্তি' 'নাস্তিকের' হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নৃশংস চক্রান্ত, রক্তপাত বা দেশদ্রোহিতায় পশ্চাদপদ হয় নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে ধর্ম্মের নামে এরূপ শোচনীয় বর্ব্বরতা দেখা যায় না। কিন্তু এই ত্যাগবৈরাগ্যের দেশেও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা সংসারী অর্থচারী যাজকশ্রেণী সংখ্যায় অনেক গরিষ্ঠ ছিল, 'ধর্ম্মধ্বজ' ও 'কটজটিলে' দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। রাজদত্ত ব্রহ্মদেয় ও দেবোত্তর সম্পত্তিতে সন্ন্যাসীর ভাণ্ডার স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। সর্ব্বত্রই দেখা যায় ব্রাহ্মণ সহস্র সহস্র 'করিষ' জুড়িয়া নিষ্কর ভূমি ভোগ করিতেছে—হলবলদ, দাসভৃতক সহযোগে শস্য উৎপাদন করিতেছে এবং রাজার হালে জীবনযাপন করিতেছে। অথবা ব্রাহ্মণের ভোগের জন্য বিপুল গ্রামসমষ্টির রাজস্ব রাজাজ্ঞায় বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে রাজকোষের এই শূন্যাংশ পরিপূরণের ভার পড়িয়াছে দরিদ্র জনসাধারণের উপর সাধারণের অর্থের বিনিময়ে এই ব্রাহ্মণ সমাজকে দিয়াছে বড় জোর দুই ছত্র রাজপ্রশস্তি, একটী স্বপ্ন রহস্যের সমাধান কিংবা দেবতুষ্টির জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে তাহাও দেয় নাই। অর্থ ও প্রতিপত্তির সুবিধা লইয়া সে রাষ্ট্রে ও সমাজে

স্বীয় অধিকার আরও বিস্তার করিল। রাজার প্রধান মন্ত্রণাদাতা হইল পুরোহিত, ধর্ম্মশাসনের (Canon law) মুখপত্র হিসাবে সে বিচারশালার আসনে উপবেশন করিল, ক্রমে 'ব্যবহার' ও 'বিনিশ্চয়ে'র (Civil law) প্রশস্ত ক্ষেত্র তাহার করতলগত হইল। এদিকে গ্রামভোজক এবং ব্রহ্মোত্তরভোগী ব্রাহ্মণদের অনেকে পণ্যজীবী হইয়া উঠিল—কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য অথবা কুশীদ গ্রহণ এই চতুর্বিধ বৈশ্যোচিত বার্ত্তা অনুসরণ করিয়া 'অশীতি কোটী বিভব' ধণিক স্বার্থে পর্য্যবসিত হইল। একদিকে ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের মধ্যে য্যামন পূজা যে পরিমাণ বাড়িতে লাগিল অন্যদিকে ব্রাহ্মণে মুক্তহস্ত বদান্যতা ততই রাজগৌরবের পরাকাষ্ঠা বলিয়া গণ্য হইল।

অভিজাত শাসক, ভূস্বামী ও বণিক

ধরিত্রীর দুধের সরে বকধার্ম্মিকের একচেটিয়া অধিকার ছিলনা। তাহার সঙ্গে সমস্বার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল আর দুই শ্রেণীর ব্যক্তি যাহাদিগকে ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যদিও ক্ষত্রবাচ্য যুদ্ধজীবী এক পুরুষানুক্রমিক জাতি সমষ্টির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না তথাপি এক শ্রেণীর অভিজাত দল যে রণবিদ্যা ও রাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা করিত এবং শাসন বিভাগের কতগুলি উচ্চপদ পরিপূর্ণ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজার বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সেনা-পতি, সামন্তরাজ বা রাজপুরুষ রূপে এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইল। অথবা শাক্য কোলিয়, বৃজ্জি, মল্ল এবং পরবর্ত্তী কালে রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই তথাকথিত ক্ষত্রিয় শ্রেণী ভূমিস্বত্ব বণ্টন করিয়া লইল। 'রাজকুলের' মধ্যে সন্নিবদ্ধ রহিল তাহাদের বহুকীর্ত্তিত গণতন্ত্র, অধস্তন সামন্ত উপরাজ, অমাত্য প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ প্রভুর প্রসাদ লাভ করিত আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দাস ও ভৃতক দল ভূমি কর্ষণ করিত, প্রভুদের স্বার্থরক্ষার্থে যুদ্ধে প্রাণ দিত, বিনিময়ে অশন বসন অথবা জীবন ধারণের পরি-মাণ বেতন পাইত। এই শ্রেণীর সাথে সাথে অভ্যুদয় হইল পণ্যজীবী বণিক শ্রেণীর, অর্থের কবলে আসিয়া পড়িল বড় বড় ভূসম্পত্তির মালিকানা। ইহারা শুধু যবদ্বীপ, বলিদ্বীপে পণ্যবাহী পোত পাঠাইয়া ক্ষান্ত ছিল না দাস ভৃতক যোগে ভূমি কর্ষণ করিয়া 'অশীতি কোটি' বিভবত্বের মহা কৌলীণ্য অর্জ্জন করিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে যেমন দেখা যায় স্থিতস্বার্থ পুরোহিত এবং জমিদার শ্রেণীকে স্থানচ্যুত করিয়া পণ্যজীবী বুর্জ্জোয়ার স্বার্থ ও শক্তি প্রতিষ্ঠা ছিল গণতন্ত্রের স্বরূপ বৌদ্ধ গণতন্ত্রের আদর্শও ছিল ব্রহ্মণ্য পৌরহিত্যের স্থানে 'সেট্‌ঠি' এবং 'গহপতি' দলের প্রতিষ্ঠা। বৌদ্ধ ও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের সংঘর্ষের আর্থিক পৃষ্ঠপট দুই শক্তিমান স্বার্থের বিবাদ—একদিকে পুরোহিত যাজক পূজারীর দল—অন্যদিকে ক্ষাত্রশক্তি ও বণিক শক্তি!

বৌদ্ধদের পরিচর্য্যা, চৈত্যনির্ম্মাণ, আদর আপ্যায়ন করিয়া পণ্যজীবী ধনিকদল প্রতিষ্ঠালাভ করিল। দীর্ঘ দ্বন্দের পর ক্রমে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম ইহাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিল। শ্রেষ্ঠী—গৃহপতি কৌলীন্যে উঠিল এবং স্বার্থ সিদ্ধির সহিত শ্রমণকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মণকে দান ধ্যানে তুষ্ট করিল। এতকাল শুধু বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত রাজ্যগুলিতে এই শ্রেণী শাসন ক্ষমতার ভাগ পাইয়া

আসিয়াছিল। গুপ্তদের সময় হইতে দেখা যায় ব্রহ্মণ্য অনুশাসিত সাম্রাজ্য গুলিতে তাহারা শাসন বেদীতে অধিষ্ঠান করিল।

হৃতস্বার্থ দাস ও অন্ত্যজ

ধন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সারাংশ সমাজের উদ্ধতম শ্রেণীগুলির কাছে আটক হইয়া রহিল। সভ্যতার বাহন, যামন যজ্ঞের আহুতি দাসভৃতকগণের খাতায় রহিল শূন্যের অঙ্ক। ধনীর সেবায় দাস ও ভৃতকগণ দলে দলে নিযুক্ত হইত। দাস ছিল প্রভুর পশুর সামিল। নিজ সত্ত্বা বা স্বত্ব তার ছিল না। তবে গৃহী যেমন স্বার্থের খাতিরেই পালিত পশুর যত্ন করে, দীর্ঘকালের সম্বন্ধের মধ্যে দিয়া পশুর প্রতিও দরদ বোধ করে প্রভুও তেমন দাসের প্রতি সাধারণত নির্দ্দয় ব্যবহার করিত না। বেতন বা লভ্যাংশভোগী ভৃতকের এই সৌভাগ্যটুকু ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাণধারণের উপযোগী ন্যূনতম বেতন (living wage) তার ভাগ্যে জুটিত না। দাসের ন্যায় উদর পূর্ত্তি করিয়া 'কল্মাষ' বা 'যজ্ঞভক্ত' খাইতে হইলে তাহাকে দাসের চেয়ে অধিক পরিশ্রম করিতে হইত। লভ্যাংশের সর্ত্তে ধনিকের ক্ষেত্রে, পশুশালায় বা বিপণিতে কার্য্য করিলে দশমাংশ নিদ্ধারিত ছিল শ্রমের জন্য বাকি নয়ভাগ পাইত অলস মূলধনের মালিক। ভূমিহীন নিঃস্ব ভৃতকের দল আর্থিক সোপানের নিম্নতম ধাপে পড়িয়া রহিল। নীতিকার ও স্মৃতিকারদের বিধানে তাহাদের ভাগে ধনীর উচ্ছিষ্টও জুটিল না।

সঞ্চিতবিত্ত তিন শ্রেণীর অভিজাত শাস্ত্রোক্ত দ্বিজজাতি, বঞ্চিতবিত্ত শূদ্রই দাস জাতি। তথা কথিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অনেকে অবস্থা বিপর্য্যয়ে নিধন হইয়া এই অধস্তন স্তরে নামিয়া আসিয়াছিল। নিয়ম নিষ্ঠায় গুরুতর স্খলন হইলে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ শূদ্রত্বে পতিত হইত। পাশার বাজি হারিয়া শপথ রাখিতে গিয়া মহারাজও দাসত্ব লাভ করিত। বিদেশগামী পণ্যদ্রব্য দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইলে অথবা বাত্যায় জলমগ্ন হইলে বৈশ্যকে পর সেবায় দেহপাত করিতে হইত। এই-রূপে মনগড়া চতুর্বর্ণ বিভাগ বাস্তবের কঠোর আঘাতে চূর্ণ হইয়া বিভিন্ন স্বার্থের ভিত্তির উপর বিরোধী শ্রেণীর আকার ধারণ করিল।

দাসভৃতক শ্রেণীর সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়া আসিল আর একটী শ্রেণী—অন্ত্যজ জাতির দল। চণ্ডাল, পুক্কস, নিষাদ নামধেয় জীবগণ শাস্ত্রে ম্লেচ্ছ সংজ্ঞায় শূদ্রেরও অধঃস্থলে স্থান পাইয়াছে। ইহার কারণ অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল রুচিবিগর্হিত বৃত্তি যা না হইলে সমাজের চলে না অথচ যাহার সংস্পর্শে আসিলে নির্ম্মল সুসভ্য মানবের চিত্ত বিকার হয়। এই কারণে ইহাদিগকে গ্রামদ্বার বা পুরদ্বারের বাহিরে বাস করিতে হইত, পথের এক প্রান্ত দিয়া চলিতে হইত ; উচ্চ বর্ণের সন্নিহিত জল বায়ু স্পর্শদোষে কলুষিত করিলে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে হইত। পক্ষান্তরে দাস ও ভৃতকগণ প্রভুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে থাকিত—তাহাদের পরিচর্য্যার অধিকার পাওয়াও কথঞ্চিৎ সম্মানের লক্ষণ যা অস্পৃশ্য জাতির ছিল না।

শ্রেণী-বিরোধ ও শ্রেণী-চৈতন্য

অতএব দেখা যায় বিশ্বমানবের বিচিত্র জীবনযাত্রার মধ্যে যে অর্থমুখী প্রবৃত্তি এক শাশ্বত ঐক্য রাখিয়া আসিয়াছে প্রাচীন ভারতবর্ষে তাহার অন্যথা হয় নাই। এখানেও পুরাকাল হইতে শোষক শোষিতের অভ্যুদয় হইয়াছিল—শ্রমজীবী হইয়াছিল নিঃস্ব পরশ্রমজীবী হইয়াছিল ধনিক, নিঃস্বজন ছিল প্রজা ধনিকজন ছিল শাসক। প্রজার কাজ ছিল শাসকের আজ্ঞা পালন, পরার্থে যুদ্ধে গমন ও প্রাণদান। শাসকের কাজ ছিল স্বার্থসিদ্ধির সঙ্গে রাষ্ট্রনীতির সামঞ্জস্য স্থাপন, স্বার্থরক্ষার জন্য যুদ্ধ বিগ্রহে প্রজার অর্থব্যয় ও রক্তক্ষয়।

ইহা অবশ্য প্রণিধান করিবার বিষয় যে এই অসাম্যের ব্যবধান অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় ভারতবর্ষে অনেক কম ছিল। রোম, গ্রীস, মিশর বা পরবর্ত্তীকালে ফরাসী দেশের মত এখানে শ্রেণীবিরোধ রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই। রোমে partician ও plebian এর চিরন্তন সংঘর্ষ স্পার্টায় helotদিগের প্রচণ্ড বিক্ষোভ, মিশরে সমগ্র গণ-সাধারণের দাসত্বে পরিণতি ও পিরামিড্ নির্ম্মাণে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান—এ সমস্তের পুনরাভিনয় ভারতবর্ষে হয় নাই। শ্রেণীচেতনা এবং শ্রেণী বিরোধ কেন এদেশে পরিপক্ক হইতে পারে নাই তাহা গবেষণার বিষয়।

প্রধানতঃ ইহার কারণ প্রাচীন ভারতে জমিদার প্রথা বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। কৃষক তাহার বাস্তুভিটা ও শস্যক্ষেত্রের যথার্থ মালিক ছিল। ক্ষুদ্র চাষী নিজস্ব জোতজমিতে আবাদ করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত—আইনের চোখে বৃহৎ ভূস্বামীর সঙ্গে তার কোন পার্থক্য ছিল না। দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন আকস্মিক বিপর্য্যয় না হইলে তার স্বত্বহারা হইবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল না। সাধারণতঃ প্রবলের বিরুদ্ধাচরণ না করিলে এবং নিয়মিত রাজস্ব দিতে পারিলে জমির উপর তার পুরুষানুক্রমিক ভোগদখল থাকিত। গ্রামভোজকদের উপর শাসন ক্ষমতা এবং রাজস্ব-ভোগের অধিকার থাকিলেও ভূমির স্বত্ব অর্পিত হয় নাই। জমিদার প্রভুর চাপে স্বাধীন কৃষককুল নির্ম্মূল হইয়া যায় নাই। এই স্বাধীন স্বল্পবিত্ত কৃষক আর কুটীর শিল্পীকে প্রাচীন ভারতের petty bourgeoise বলা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে ধনিকের উদ্বৃত্ত বিত্ত ন্যূনাধিক সমভাবে বন্টিত হইয়াছিল। সংখ্যায় এই মধ্যশ্রেণীই গরিষ্ঠ ছিল এবং এই অধোবর্ত্তী 'বৈশ্য'গণ 'শূদ্র' ও দ্বিজ শ্রেণীর মধ্যে ভার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্য করা যায় অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষে বঞ্চিতের দল কখনও এক শ্রেণী ও এক স্বার্থের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে নাই। এখনও দেখা যায় ব্রাহ্মণ কায়স্থ শবর জাতিকে অস্পৃশ্য বলিয়া যত অবজ্ঞা করে, শবর আবার চণ্ডালকে নীচ-জ্ঞানে ততোধিক ঘৃণা করে। দেবাজ্ঞার মুখপাত্রগণ নিপুণভাবে হীনজাতির মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি ও রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। অধিকন্তু দাসভৃতকদল শুধু যে অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইতে পারে নাই তাহাই নয়—তাহাদের নিজেদের মধ্যেও সম্প্রদায় বোধ বিকাশ পায় নাই। ইহার কারণ রোম মিশরের দাসদের মত তাহাদের সংখ্যার জোর ছিল না এবং তাহারা পরস্পর হইতে

বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিত। চণ্ডালপল্লী বা নিষাদপল্লীর মত দাসপল্লী বা ভৃতকপল্লী নামে কোন স্বতন্ত্র আবাসস্থান নির্দ্ধারিত ছিল না। দাসগণ প্রভুর গৃহে সাধারণতঃ আদর যত্ন পাইত, পারিবারিক ঘনিষ্ঠতার মাধুর্য্য হইতে একেবারে বঞ্চিত ছিল না, দাসত্বের বন্ধন হইতে মুক্তির ব্যবস্থাও ছিল সুতরাং অসন্তোষ সংক্রামিত হইতে পারে নাই। ভৃতকদিগের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার কোন পন্থাই ছিল নাই। তাহারা এক এক সময়ে এক এক প্রভুর সেবা করিয়া অন্ন সংস্থান করিত অথবা এক কালে বহু প্রভুর কর্ম্ম করিত। তাহাদের স্থান কাল ও কর্ম্মের কোন স্থিরতা ছিল না। তাহাদের উর্দ্ধতন শিল্পীগণ যেমন স্বার্থরক্ষার জন্য শ্রেণী, সঙ্ঘ, পূগ প্রভৃতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হইত, তাহারা সেরূপ কোন প্রতিষ্ঠান গড়িবার সুযোগ পায় নাই। নিদারুণ অন্নসমস্যা এবং শ্রমদক্ষতার অভাব ইহাদিগকে ধনিকের নির্ম্মম সর্ত্তে বাঁধিয়া দিয়াছিল।

তৃতীয় কারণ নিম্ন শ্রেণীকে কোন দিন সভ্যতার জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই। শূদ্রের শাস্ত্রপাঠ হেন পাপ নাই। তথাগতের সঙ্ঘে ও চণ্ডালপুক্কুসের স্থান ছিল না। আবহমান কাল হইতে এই সমস্ত দুর্গতের দলকে নিবিড় তমসার মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের কানে অহরহ এই মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে যে অভিজাত শ্রেণীর পরিচর্য্যা ও নির্দ্দেশ পালন তাহাদের মোক্ষের পথ। চেতনার ক্ষীণ রশ্মি যার অন্ধকার চিত্তগহনে ক্ষণেকের জন্য আলোক-সম্পাত করিয়াছে, রুদ্ধদ্বার জ্ঞানমন্দিরে যে একবার করাঘাত করিয়াছে ব্রহ্মণ্যের শ্যেনদৃষ্টি ও নির্ম্মম দণ্ড হইতে তার অব্যাহতি ছিল না। শূদ্র ও ম্লেচ্ছ জাতি কোনদিন মাথা তুলিয়া মুক্ত আকাশের দিকে তাকাইতে পারে নাই।

অতএব ভারতের লোকাতীত সংস্কৃতি বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে টেকে না। ঋষির সাধনায় যাহাই থাকুক, সমাজ নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বাস্তবের অমোঘ ঘাতপ্রতিঘাতে, বৃহত্তর ভারতের মহান আদর্শ বলিয়া আমরা যাহা কীর্ত্তন করি তার পশ্চাতে কখনও ছিল রাজশক্তির কোপ, বহিঃশত্রুর চাপ, ঋণজাল হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা অথবা স্বদেশে স্বার্থরক্ষণের অসুবিধা। ইউরোপীয়গণ যেমন পবিত্র খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে আফ্রিকা ও এশিয়ায় যায় নাই অর্থের সন্ধানে গিয়াছিল, ইহুদিগণ যেমন আজ হিটলারী শাসনে জার্ম্মানী ছাড়িয়া দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ভারতীয়দের উপনিবেশপ্রয়াস ও অনুরূপ স্বার্থপ্রণোদিত ছিল, ভারতীয় আচার অনুষ্ঠান এবং পাণ্ডিত্যের একটি খোলস তাহাদের সঙ্গে ছিল মাত্র। তথাগত দেখিলে বিস্মিত হইতেন যে তাঁর অমৃতময়ী বাণী পর্য্যবসিত হইয়াছে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য লোকাচারে, চতুর্বিদ্যা ও অষ্টমার্গ সাধনের পরিবর্ত্তে তাঁহার নখদন্তের পূজা হয়ত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিত না। কিন্তু ইহাই চিরন্তন সত্য। বৌদ্ধমত যতদিন বাস্তব প্রভাবের অনুকূল ছিল ততদিন কার্য্যকরী ছিল তার পর কঙ্কাল রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। প্রকৃতি গুরুবাদ মানে না, এবং মানবপ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতিরই অন্তরঙ্গ।

অবাধ পণ্যক্ষেত্র।

শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ

"পণ্যক্ষেত্র" শব্দের ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে বৈষম্য ঘটেছে। এর কারণ ঐ যুগ্মশব্দের বিভিন্ন অংশে গুরুত্ব আরোপ। সাধারণ অর্থে আমরা "ক্ষেত্রর" উপরে ঝোঁক দেই—এজন্য এখানে ক্রয়বিক্রয়ের স্থানই পণ্যক্ষেত্র। অর্থনীতি সম্মত ব্যবহারের ক্ষেত্রে জোর পড়ে "পণ্যে"র উপরে; এজন্য স্থান বিশেষে ক্রেতা-বিক্রেতার দৈহিক উপস্থিতির কথা এখানে প্রাথমিক নয়—মূল কথা ক্রয়-বিক্রয়। ফোর্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁর গাড়ীর লক্ষ লক্ষ ক্রেতাদের সাক্ষাৎ নিশ্চয়ই ঘটেনা তবুও অর্থনীতির মতে ফোর্ড্ গাড়ীর পণ্যক্ষেত্র পৃথিবী ব্যাপী। এ প্রবন্ধে শব্দটীকে পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহার করা হোলো।

"পণ্যক্ষেত্রে"র আসল কথা সামাজিক বিনিময়। অর্থাৎ একের শ্রমোৎপন্ন দ্রব্য মূল্যের পরিবর্ত্তে অন্যের ব্যবহারের সামগ্রীতে পরিণত হচ্ছে। এ ব্যবস্থায় উৎপাদক ও ব্যবহারক ভিন্ন ব্যক্তি। এই দুইএর মিলন সংঘটনের জন্য উৎপাদন ও ব্যবহারের মধ্যে আরও একটী স্তর আছে। তার নাম বিনিময়।

কথাটা আপাতদৃষ্টিতে অদ্ভুত মনে হলেও সত্য যে সমাজের এই চিরন্তন ব্যবস্থা নয়। একদা উৎপাদক ও ব্যবহারকের সংযোগ ঘটানোর জন্য কোন তৃতীয়পক্ষের দৌত্যের প্রয়োজন হোতো না। মোটামুটিভাবে উৎপাদক ও ব্যবহারক, সে ব্যবস্থায় একই ব্যক্তি ছিল। ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলে অবশ্য এ ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটল। তার পরিবর্ত্তে আর এক সমাজ ব্যবস্থা এল যেখানে উৎপাদন ও ব্যবহার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল বটে কিন্তু একের শ্রমলব্ধ দ্রব্যের অন্যের ব্যবহার বা ভোগের সামগ্রীতে পরিণতি ঘটল, মূল্যের পরিবর্ত্তে নয়—আভিজাত্যের অধিকারে। এরই নাম ancien regime. উনবিংশ ও প্রাক্‌সামরিক বিংশ শতাব্দীতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার প্রতিষ্ঠা এই ancien regimeএর উত্তরাধিকার সূত্রে। অবাধ পণ্যক্ষেত্রের জন্ম, বিকাশ ও জরা সমস্তই ইতিহাসের এই অঙ্কেরই অন্তর্ভুক্ত। উত্তর-সামরিক যুগে সাময়িক বিরুদ্ধ চেষ্টা সত্বেও দেখি পণ্যক্ষেত্রের অবাধতা প্রথমে ধীরে ধীরে ও পরে অতি দ্রুত ভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে।

অর্থাৎ পণ্যক্ষেত্রের ও একটা ইতিহাস আছে। আমরা এখানে সংক্ষেপে সেই ইতিহাসের পর্য্যালোচনা করব।

ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের পথে মধ্যযুগের ভূস্বামী সমাজে ধীরে ধীরে দেখা দিল এক বিশেষ শ্রেণী। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে ভূস্বামীদের প্রাপ্য ও উৎপাদকের নিজস্ব ব্যবহারের উপরেও এক উদ্বৃত্ত অংশের উপত্তি হল। এক সমাজের বিশিষ্ট সামগ্রীর উদ্বৃত্ত অংশ অন্যসমাজে স্থানান্তরিত করে, পরিবর্ত্তে শেষোক্ত সমাজের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত অংশ নিজের দেশে আমদানী করে শীঘ্রই এ

শ্রেণী বিশেষ লাভবান হতে আরম্ভ করল। শ্রেষ্ঠী, সদাগর Burgher গঠিত এই শ্রেণী সামাজিকতার মাপকাঠিতে ভূস্বামী ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী বলে বিবেচিত হল। এ জন্য তার নাম হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। পণ্যবিনিময়ের কেন্দ্র নগর ও বন্দর এই শ্রেণীর প্রতিপত্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হল। এই স্বল্পপরিসর ও বিশেষভাবে স্থল পথে পরিচালিত বাণিজ্য, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ গুলির আবিষ্কারের ফলে শতগুণ পরিপুষ্ট হল। ইতিহাসে এরই নাম বাণিজ্য বিপ্লব।

তৎকালীন সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী-ভূস্বামীগণ প্রথমেই এই উন্মেষোন্মুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। কিন্তু শীঘ্রই বিবাদ আরম্ভ হল। ভূস্বামিগণ বুঝলেন যে বিত্তের দিক থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বেশী দিন মধ্যবর্ত্তী রাখা সম্ভব হবে না। সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি এমন কি রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বের দিকেও মধ্যস্থানীয়ের প্রথম হওয়ার লোভ গুপ্ত রইল না।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও ভূস্বামীদের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার কোন কারণ ছিল না। সামন্তশ্রেণী চার্চ্চ এবং মধ্যযুগের ঈশ্বরপ্রতিভূ সম্রাটের যথেচ্ছাচার, গুরু করভার, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির দৌর্ব্বল্য-জনিত নিরাপত্তার অভাব ও অব্যবস্থা এবং যান্ত্রিক উৎপাদন পরিচালনার উপযোগী শ্রমশক্তির অভাব ক্রমে ক্রমে বিকাশোন্মুখ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। অসন্তোষ—অনুযোগ, প্রতিবাদের পথ ধরে অবশেষে বিপ্লব আকার ধারণ করল।

এ বিপ্লবের রূপ কি? মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল যেখানে মূল্যের পরিবর্ত্তে বিনা বাধায় যে কোন স্থান থেকে যে কোন সামগ্রী হস্তগত করা সম্ভব। অর্থাৎ তাদের দাবী ছিল সকল সামগ্রীকে পণ্যে পরিণত করার অবাধ পণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার। মানুষের শ্রমশক্তিও এ ব্যবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়ের সামগ্রীরূপে গণ্য অথচ এই শ্রমশক্তি তখনও ভূস্বামীদের বিস্তৃত কৃষিভূমি বা অরণ্যে আবদ্ধ ছিল। কাজেই শ্রমশক্তিকে পণ্যে পরিণত করার প্রত্যেকটী চেষ্টা ভূস্বামী বা মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান ভূস্বামী চার্চ্চের বিরুদ্ধতারূপ ধারণ করল। কিন্তু এ সকল চেষ্টা ব্যাপক অবাধ পণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টারই অংশমাত্র। চতুর্দ্দশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপের ইতিহাস এই অবাধ পণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠারই ইতিহাস।

এই বিপ্লব ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় Reformationএর সঙ্গে জড়িত। মধ্যযুগের চার্চ্চের অধিকারে যে বিশাল কৃষিভূমি ছিল Protestant আন্দোলনের আঘাত সর্ব্বপ্রথম তারই উপরে পড়ল। মতবাদের দিক থেকেও রাষ্ট্রশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবিরোধী রোমান চার্চ্চের একচ্ছত্রতা খর্ব্ব হল। এর ফলে একই সময়ে আমরা দু'টী বিপরীত আন্দোলন লক্ষ্য করি। চার্চ্চের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং রাষ্ট্রিক ব্যাপারে রাজশক্তির একাধিপত্য Reformationএর এই হল প্রধান দাবী। সত্যসত্যই "Had there been no Luther, there could have been no Louis XIV"

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিপ্লব ইতিহাসে দ্বিতীয় প্রধান ঘটনা—ইংলণ্ডের Puritan Revolution. Reformation আন্দোলনের স্রোতে ইংলণ্ডে পূর্ব্বেই চার্চ্চের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। Puritan

Revolutionএর দাবী হল রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজশক্তির একাধিপত্যের বিনাশসাধন। অবশ্য রাজশক্তির একাধিপত্যের ধ্বংস এবং রাজতন্ত্রের বিলোপ এক কথা নয়। বরঞ্চ ঐতিহাসিক Trevelyanএর "Prosperous patriot"রা সাময়িকভাবে সাধারণতন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যগ্রতা দেখালেন। জনসাধারণের সামনে রাষ্ট্রশক্তির প্রতীক হিসাবে রাজাকে স্থাপন করে, যথার্থ ক্ষমতা তাঁরা Parliamentএ কেন্দ্রীভূত করলেন।

অবাধ পণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ প্রধান ঘটনা ফরাসী বিপ্লব। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদল—ফ্রান্সের Third Estate রাজশক্তি ও ভূস্বামী শ্রেণীর অত্যাচারে রাষ্ট্রক্ষমতার আংশিক অধিকার লাভেও বঞ্চিত হলেন। ফলে "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার" ধ্বজাবাহকরূপে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ফরাসীবিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। এই ফরাসী বিপ্লবের পরেই ইয়োরোপে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে ভূস্বামীশ্রেণী থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও হস্তান্তরিত হল।

(ক্রমশঃ)

—সাময়িকী—

আমাদের কথা—

দীর্ঘ সাত বৎসর পর আবার "জয়শ্রীর" সঙ্গে ছিন্নসূত্র জোড়া দেবার পালা। যারা প্রথম থেকে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইহজগতে নেই, অনেকের সঙ্গে এসেছে ভিন্ন পথের দূরত্ব—আবার অনেক নূতন সহযাত্রী বহন করে এনেছেন তাঁদের নবীন প্রেরণা ও উদ্যম। পথ চলার রীতিই এই। কত অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদ, ও কত নূতনের সান্নিধ্যলাভ অপেক্ষা কোরে আছে এর বাঁকে বাঁকে। অতীতে "জয়শ্রীর" পথের বাধাকে যারা অপসারিত করেছিল তাদের কর্ম্মকুশলতা দ্বারা তাদের কথা মনে কোরে অন্তর কৃতজ্ঞ হচ্ছে। ভিতর ও বাহিরের সমস্ত বাধাবিঘ্নের সঙ্গে সংগ্রাম কোরে যে সকল বন্ধু, আমাদের অসমাপ্ত কাজকে আমাদের অবর্ত্তমানে বাঁচিয়ে রাখবার কঠিন শ্রম ও কঠিনতর আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদেরও আজ সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। তাঁদের উদ্যম ও নিষ্ঠা আমাদের প্রধান পুঁজী।

জয়শ্রীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন কিছু বলবার নেই—বাংলাদেশ তার সঙ্গে সুপরিচিত। এর স্বরূপ সম্পর্কে যদি কারো মনে কোন সংশয় থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বিশ্ব-মানবের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে আমরা বিশ্বাসী। এই প্রগতির স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা "জয়শ্রী" ক্রমে ক্রমে দিতে চেষ্টা কোরবে। যেসব শক্তি এই প্রগতিকে অগ্রসর কোরছে দৃঢ়তার সঙ্গে "জয়শ্রী" তাদের সমর্থন কোরবে, বিপক্ষ শক্তিকেও সমান দৃঢ়তার সঙ্গেই বাধা দেবে। বিভিন্ন মতবাদ ও পন্থাকে যুক্তিচালিত বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা "জয়শ্রী" গ্রহণ বা বর্জ্জন কোরবে। প্রধানতঃ বাংলার শিক্ষিত মেয়েদের ও গৌণতঃ সর্ব্বসাধারণের সহায়তা ও সহানুভূতি আমরা এই কাজে প্রার্থনা করছি।

স্বার্থের সংঘাত—

কিছুদিন ধরে ঘটনা পরম্পরার সমাবেশ দেখে ক্রমেই বিভিন্ন সংঘর্ষের সম্ভাবনা সর্ব্বত্র স্পষ্ট হোয়ে উঠছে। এ সম্ভাবনা ক্ষেত্রভেদে বিভিন্নরূপ নিচ্ছে সত্য কিন্তু তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র বের করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। প্রথমতঃ দেখি সাম্প্রদায়িকতার বিষ ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হোয়ে উঠছে, সম্প্রতি জিন্না-বসু আলোচনার ফলাফল দেখে এর উপশমের আশা করবার কিছু নেই। এখানে সংঘাত বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে—এ সংঘাতের ভিত্তি যে কি তা বলা দুঃসাধ্য কারণ যদিও ধর্ম্মের নামে দুই বিভিন্ন দল সৃষ্টি করা হোয়েছে সংঘর্ষ বাঁধছে পারত্রিক

ব্যাপার নিয়ে নয়, নিতান্ত ঐহিক ব্যাপার নিয়ে। তারপর প্রাদেশিকতা সর্ব্বত্রই দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রদেশের লোক পরস্পরের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য নানা আইন কানুনের আশ্রয় নিচ্ছে—এর মত আত্মঘাতী আর কিছু হোতে পারে না। যারা প্রাদেশিকতার দোহাই দিয়ে এক প্রদেশে অন্য প্রদেশের লোকের স্বাধীনতা সঙ্কোচ করছে—তারা ভারতের বৃহত্তর ঐক্যের পরিপন্থী কাজই করছে। এদিকে নানা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে যাতে কংগ্রেসে একটা বিভেদ সৃষ্টি হয়। এরূপ একটী হীন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত আমরা পাই জেঙ্কিন্স নামক এক ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এক ইস্তাহারে। এই ইস্তাহারটীর বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছু আছে কিনা, অথবা এটা সম্পূর্ণ জাল তা জানবার উপায় নেই। তবে এর মধ্যে সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে ইঙ্গিত ছিল তা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হোয়েছে। এই একই প্রতিবেশে দ্বারভাঙ্গার মহারাজার সভাপতিত্বে অযোধ্যার জমিদারদের লক্ষ্ণৌয়ে সম্মেলন আহ্বান ভাববার বিষয়। এই সম্মেলনে ছত্রীর নবাব ডাঃ স্যার জাওলাপ্রসাদ প্রমুখ বহু জমিদার ও তালুকদার কমিউনিজম্ স্যোসিয়ালিজম্ থেকে আরম্ভ কোরে মায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পর্য্যন্ত প্রচুর উষ্মাপ্রকাশ করেছেন। শ্রেণী হিসাবে জমিদারেরা যাতে সঙ্ঘবদ্ধ হোয়ে কলের মালিক ও অন্যান্য ধনী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একযোগে কংগ্রেস কিষাণ ও শ্রমিক আন্দোলন দমন কোরে নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারেন সে সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে। কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যে বিরোধিতা করবার জন্য এক ভলান্টিয়ার দল গঠন করবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হোয়েছে। রায়তও কিষাণদের প্রাপ্য অধিকার অন্ততঃ কিছুটা দেবার জন্য যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপরিষদে যে বিল আনা হয়েছে, জমিদার সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য তার বিরোধিতা করা। কৃষকদের বংশানুক্রমিকভাবে জমির উপর অধিকার দান এবং রায়তদের যথেচ্ছ উচ্ছেদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করবার ব্যবস্থা এই বিলে আছে। জমিদারেরা তাঁদের 'আইনসঙ্গত' অধিকারে হস্তক্ষেপ বন্ধ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। এই বিল জমিদারদের মালিকানা সত্ত্বকে স্পর্শও করে নাই কিন্তু এতেই জমিদারেরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এদের সঙ্গে কাণপুরের মিলের মালিকদের যোগদান বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। কাণপুরের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে এঁরা সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। এই ঘটনাগুলির মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই ভাববার অবসর রয়েছে। জমিদার ও ধনিকশ্রেণীরা শ্রেণী প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভয়ের চক্ষে দেখে থাকেন। কিন্তু ঘটনাচক্রের কার্য্যকারণের ফলে এই শ্রেণী সংগ্রামকেই নিজেদের অদূরদর্শিতায় তাঁরা নিকটতর করছেন। চিন্তা জগতে যে বহুল পরিবর্ত্তন এসেছে তার ঐতিহাসিক কারণগুলি সম্বন্ধে এঁরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জগতের শোষিত শ্রেণীর নির্ব্বিচার শোষনের বিরুদ্ধে এই সঙ্ঘবদ্ধতার অমোঘতা সম্বন্ধে এঁদের কোন ধারণা নেই। কল্পনা এঁদের পঙ্গু, ভবিষ্যতকে সে ধারণা করতে পারে না—মানুষের অসহায়ত্বের উপর এদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। এদের সমধর্ম্মী রাষ্ট্র তাকে "ন্যায্য" আখ্যা দিয়েছে বলেই বাস্তবিক তা ন্যায়োচিত নয়। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন যদি এঁরা

না করেন, তাঁদের গণ্ডীবদ্ধ স্বার্থকে যদি তাঁরা অগণিত শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড় করান তবে ক্ষতি ও অমঙ্গল হবে তাঁদেরই। সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সমগ্র সমাজের সঙ্গে অভিন্নরূপে নিজের বৃহত্তর স্বার্থ এ দুয়ের মধ্যে একটীকে তাঁদের বেছে নিতে হবে।

কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র কৃষক সভা—

স্বতন্ত্র কৃষকসভা কংগ্রেসের স্বার্থের পরিপন্থী কিনা এ নিয়ে বহু বাদানুবাদ চলেছে ও চল্‌ছে। এ সম্পর্কে সম্প্রতি দুই বিভিন্ন দিক্‌কার যুক্তি আমরা শুনেছি, একটী স্বামী সহজানন্দের ত্রিপুরার কৃষকসম্মেলনে অভিভাষণ, যাতে তিনি স্বতন্ত্র কৃষক আন্দোলন সমর্থন করেছেন---অপরটী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লঘোষের মানভূম রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে অভিভাষণ, স্বতন্ত্র কৃষক আন্দোলনের অনিষ্টকারীতা ও অপ্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কোরে। কৃষক আন্দোলনের বর্ত্তমান পরিণতির মূলে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে। ১৯২১ সের অসহযোগ আন্দোলন ভারতের কৃষককে সর্ব্বপ্রথম অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখাল। পূর্ব্বজন্মের ফল মনে কোরে যারা সমস্ত দুঃখদৈন্য শোষণকে মেনে নিয়েছে নীরবে তারা হঠাৎ প্রশ্ন করতে শিখল "মান্‌বো কেন?" এ প্রশ্ন করবার শক্তি যোগাল কংগ্রেস। যে শক্তি সে নিজে সৃষ্টি করেছে আজ তাকে ভয়ের চক্ষে দেখলে চলবে কেন?

স্বতন্ত্র কৃষক সভার বিরোধীপন্থীরা মনে করেন এতে শ্রেণীগত স্বার্থ, জাতীর বৃহত্তর স্বার্থকে সঙ্কুচিত কোরবে। তাতে একদিক দিয়ে যেমন জাতীয় ঐক্য নষ্ট হবে, পরস্পর সংঘাতশীল খণ্ডিত স্বার্থও তেমনি সৃষ্টি হবে। বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় আমরা দেখছি, বিভিন্ন এমন কি পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও রয়েছে। এ অবস্থায় এক অখণ্ড স্বার্থের কল্পনা করার কোন অর্থ হয় না। যে ঐক্য শ্রেণীবিশেষের অসহায়ত্ব ও দুর্ব্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে স্বাভাবিক বা সুস্থ বলা চলে না।

আর একটী যুক্তি যে এতে কংগ্রেস দুর্ব্বল হবে। প্রথমতঃ কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে চাই, শোষিত বঞ্চিতদের পক্ষে সে সংগ্রাম করবে এই আশায়, এই শোষিত শ্রেণীর শক্তিতে কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি পাবারই কথা লাঘব হবার নয়! কাজেই স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কৃষকরা যদি দৈনন্দিন সংগ্রামকে ভিত্তি করে সঙ্ঘবদ্ধ হয় তবে তাকে কংগ্রেসের সানন্দে অভিনন্দিত করাই উচিত।

আর একটী বিপক্ষ যুক্তি এই যে—কংগ্রেসে যখন শতকরা ৯০জন সদস্যই কৃষক তখন কংগ্রেসই বৃহত্তম কৃষক প্রতিষ্ঠান, স্বতন্ত্র কৃষক প্রতিষ্ঠানের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কোন একদল সংখ্যা গরিষ্ঠ বলেই কোন প্রতিষ্ঠানের সার্ব্বজনীনত্ব নষ্ট হোতে পারে না কাজেই কংগ্রেসকে কোন শ্রেণী বিশেষের প্রতিষ্ঠান বলা যায় না। শ্রেণীপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস দ্বারা সম্পন্ন হয় না। কংগ্রেস যদি কৃষক আন্দোলন থেকে নিজেকে বিযুক্ত কোরে নেতৃত্ব হারায় তবেই কৃষক আন্দোলন

কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবার সম্ভাবনা। দেশের পক্ষে এ যে কত বড় অমঙ্গলের হবে তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝবেন। গণআন্দোলনকে নির্ভীক দৃঢ়তার সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালনা করা উচিত—কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও অস্তিত্ব গণআন্দোলনকে কেন্দ্র কোরে—যদি তারসঙ্গে কংগ্রেস হারায় তবে তার অস্তিত্বের কোন হেতুই থাকে না।

বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইন—

১৯২৮ সনের বঙ্গীয় প্রজাসত্ত্ব আইনে অগ্রকর ও নজর নির্দ্দিষ্ট কোরে দেওয়া হয়—এ সম্পর্কে বাংলার কৃষকদের অসন্তোষ দীর্ঘদিনের। বর্ত্তমানে যে সংশোধন প্রস্তাব আনা হোয়েছে ভিত্তিগত কোন পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা তাতে নেই—কেবলমাত্র এই কর দুইটী উঠিয়ে দেবার প্রয়াসেই হোয়েছে। এতেও জমিদারদের আপত্তি কালের গতি সম্বন্ধে, তাঁদের অজ্ঞতারই পরিচয় দেয়। বিলটী উভয় আইন সভায়ই গৃহীত হোয়ে সম্মতির জন্য গভর্ণরের নিকট পাঠানো হোয়েছে। বিলের একটী ধারা অনুযায়ী ৩১শে মে'র পরে বিল বাতিল হোয়ে যাওয়ার কথা। গভর্ণর এখনো এ সম্পর্কে কোন মতামত জানান নাই। এদিকে ৩১শে মে জমিদারদের প্রাপ্য নজর ইত্যাদি উঠে যাবে এই আশায় অনেকে দলিল রেজিষ্টারি করছে না। কর আদায়ে নানা জঠিলতা দেখা দিচ্ছে। রেজেষ্টারি করার ও টাকা আদায়ের মেয়াদ কাজেই বৃদ্ধি করতে হোয়েছে এক অর্ডিন্যান্স জারী কোরে। জনমতের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ অবজ্ঞা কোরে জমিদারদের স্বার্থই কায়েমী করবার চেষ্টা যদি গভর্ণর করেন তবে অটোনমীর অন্তঃসারশূন্যতা আর একবার প্রকাশ হবে। আর এর পরও যদি হকমন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ না করেন তবে কৃষকদের স্বার্থ সম্বন্ধে তাঁদের উদাসীনতাই শুধু প্রকাশ পাবে না তাদের স্বার্থের সুস্পষ্ট বিরোধীতাই করা হবে।

কাণপুরে শ্রমিক ধর্ম্মঘট—

কানপুর মিলের প্রায় ৪২ হাজার শ্রমিক তিনটী দাবী উত্থাপন কোরে ধর্ম্মঘট করেছে এই তিনটি দাবী—চাকুরীর নিরাপত্ততা, উপযুক্ত বেতন ও বাসোপযোগী গৃহ। এই ধর্ম্মঘটের বিশেষত্ব, শ্রমিকেরাই এ পরিচালন করছে ও সম্পুর্ণ শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বজায় রয়েছে। যুক্ত প্রদেশের শাসনবিভাগ এই তিনটি দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার কোরেছেন। কিন্তু কলের মালিকেরা লাভের সামান্যতম অংশ ছাড়তেও রাজী নন! যাদের প্রাণপাত শ্রমের উপর ধনিকের সৌধশ্রেণী নির্ব্বিবাদে ধাপের পর ধাপ গড়ে উঠেছে এতদিন পরে তারা প্রশ্ন করেছে তাদেরই শরীরের রক্তজল করা শ্রমে মালিকদের যখন এমন পুষ্টিসাধন, তাদের ভাগ্যেই বা ক্ষুধার অন্ন, শীতের বস্ত্র জোটে না কেন? কোন নিয়মের জোরে মানুষের ন্যূনতম অধিকারে তারা অধিকারী নয়—এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর জগতের সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্রকে আজ দিতে হবে। এ প্রশ্নের শ্বাসরোধ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি একে এড়িয়ে চলবার প্রয়াস বুদ্ধিহীন, একথা আমরা যত শিগ্‌গির বুঝি ততই মঙ্গল।

যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট—

যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মনোভাব কি সে সম্বন্ধে কিছুমাত্র অস্পষ্টতা যাদের ছিল, লর্ড জেটল্যাণ্ডের উক্তিতে তার কোন অবসর রইলো না। লর্ড জেটল্যাণ্ডের মতে "ভারতবাসী যদি এমন একটা ঐতিহাসিক সুযোগ ব্যর্থ করে দেয় তবে এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে।" এই উক্তির মধ্যে যে বিজেতা-সুলভ আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের অদূরদর্শিতারই আর একটা পরিচয় পাই। ইতিহাসের শিক্ষা যেমন এদের স্থূল বিষয় বুদ্ধিকে ভেদ করে না তেমনি কালের গতি কোন ভবিষ্যতের নির্দেশ দিচ্ছে তাও এদের কল্পনাতে ধরা পড়ে না। সমস্ত দেশের জনমতের বিরুদ্ধে এই যে গায়ের জোরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলছে এর ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে তাতে ভারতবর্ষেরই ক্ষতি—না ইংলণ্ডের ক্ষতি—তার বিচারক ভবিষ্যতের ইতিহাস। তবে আমাদের মনে হয় ইংলণ্ড তার অষ্টাদশ শতাব্দীয় মনোভাব পরিবর্ত্তিত না করলে ভারতবর্ষই শুধু সুযোগ হারাবেন না—ইংলণ্ডই প্রকৃত পক্ষে ভারতবর্ষের মৈত্রী লাভের সুযোগ হারাবে।

এবিষয়ে কংগ্রেসের মনোভাব কি তা এখনও সুস্পষ্ট নয়। তবে কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে এবিষয়ে কোন আলোচনা হয়নি—শাসনতন্ত্রকে অচল করবার নীতি এতে গৃহীত না হোয়ে বরং কিভাবে তাকে কাজে লাগান যেতে পারে সে দিকেই সমস্ত দৃষ্টি দেওয়া হোয়েছে। শাসন ভার গ্রহণ করবার সময় কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলা হয়েছিল কাজেই নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে যাওয়াই যদি স্থির হয় তবে তার আগে এ সম্পর্কে দেশের মত কি তা জানা দরকার।

প্রাদেশিকতা—

প্রাদেশিকতার ফলাফল বাঙ্গালীর পক্ষে জটিল আকার নিয়েছে, বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীর স্থান পাওয়া ক্রমেই দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রধানতঃ বিহারে ও আসামে প্রবাসী বাঙালীদের যে অবস্থা তাতে তার আশু মীমাংসার প্রয়োজন। যদিও বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ভার দিয়েছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিষ্টার দাসকে তবুও এ গুরুতর পরিস্থিতি বাঙ্গালীর পক্ষে অপমানজনক ও লজ্জাকর। বিহারে বাঙ্গালী সমস্যার কথায় ওঠে প্রথমেই 'ডোমিসাইল সার্টিফিকেট' সরকারী বা আধাসরকারী কর্ম্মপ্রার্থীদের এই সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করতে হয়। যে ফরমে দস্তখত করতে হয় তা একেবারেই সম্মানজনক নয়। বিহার প্রবাসী আর কোন জাতির পক্ষে এটা প্রযোজ্য নয়, বাঙালীর পক্ষেই এ ব্যবস্থা। বাঙলাদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষীর সর্ব্বক্ষেত্রে আধিপত্যের অন্ত নাই কিন্তু বাঙলার বাহিরে বাঙালী সমস্যা সর্ব্বত্রই প্রবল হয়ে উঠে এর কারণ কি? কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যাদের উপরে এ ভার দিয়েছেন তাঁরা এ বিষয়টী সবিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক সমাধান করবেন আমরা সে আশা করছি। এই প্রতিক্রিয়া-

শীল মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন না হোলে শুধু বাঙালী নয় বিভিন্ন প্রদেশের সম্পর্ক জটিল হোয়ে উঠবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েকটী সর্ত্তের পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট থেকে বার্ষিক ৭ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা সাহায্যদানের ব্যবস্থা হয়েছে। সর্ত্তগুলি পাঠ করলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি বাঙলা সরকারের শুভ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে সরকারের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকে অনুমোদন করবার প্রচ্ছন্ন সর্ত্তটি অত্যন্ত অপমানজনক। ১৯৩২ সালে বাঙলা সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কতগুলি বন্দোবস্ত হয়েছিলো সর্ত্তাধীনে। সম্প্রতি আবার যে নূতনতর ব্যবস্থা হোয়েছে চলতি বৎসর থেকে সে নিয়মেই চোলবে বহু আলোচনার পর সিনেটে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে সর্ত্তাধীন সাহায্য দান যেমন অপমানজনক তেমনই তার স্বাধীনতার সঙ্কোচক। শিক্ষার প্রসারই গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য হোলে এরূপ মনোভাব অসম্ভব হোত।

কর্পোরেশনের শিক্ষয়িত্রী ঘটিত ব্যাপার—

এতদিন পর কর্পোরেশনের শিক্ষয়িত্রী ঘটিত ব্যাপার সম্পর্কে রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। তদন্ত কমিটির মতে মূল অভিযোগটি ভিত্তিহীন তবে এ প্রসঙ্গে এমন সব তথ্য নাকি প্রকাশ পেয়েছে যা যে কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ শিক্ষাবিভাগের পক্ষে অমার্জ্জনীয়। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের পর মতামত দেওয়া সম্ভব নয় আর তদন্ত কমিটির মত ও সর্ব্বত্র নির্ব্বিচারে গৃহীত হয় নি। তবে কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগে যে নানা গলদ ঢুকেছে তার আশু প্রতিকার হওয়া দরকার যাতে ভদ্র ঘরের মেয়েদের কাজ করবার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। এদিকে তদন্ত কমিটি যথেষ্ট জোর দিয়েছেন বলে মনে হয় না অথচ এ বিষয়টীই সবচেয়ে গুরুতর—এর একটি সুমীমাংসা করবার জন্য কাউন্সিলাররা কি পথ গ্রহণ করেন আমরা দেখতে অত্যন্ত উৎসুক থাকবো।

সাম্প্রদায়িকতা—

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষাবিষ বাঙ্গলাদেশে দিন দিন কি ভাবে ছাড়িয়ে পড়ছে নিম্নলিখিত ঘটনাবলী তার চরম দৃষ্টান্ত।

মৌলানা আবদুল হাইলাল ঢাকা থেকে নোয়াখালী যাত্রাকালে ঝড়-বৃষ্টির জন্য এক খালে আশ্রয় নেন। এসংবাদ শুনে স্থানীয় হিন্দু মুসলমান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনিও তাদের যথারীতি আদর অভ্যর্থনা করেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুও ছিল। পরে এক স্থানীয়

মৌলবী তার সঙ্গে দেখা করতে যান কিন্তু মৌলনা সাহেব তাকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি অস্বীকৃত হন, যেহেতু পূর্ব্বে উহা হিন্দু স্পর্শদ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে। স্পর্শদোষ হিন্দু সমাজেরই একটি বড় কলঙ্ক বলে আমরা জানতাম। শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই স্পর্শ দোষের জন্য লজ্জা অনুভব করেন মুসলমানেরা এ দোষ থেকে মুক্ত বলে গর্ব্ব অনুভব করেন, আর এ গৌরব করার অধিকারও তাদের আছে বলে আমরা জানতাম, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার বিষ মুসলমান সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে কি ভাবে বিকৃত আকার ধারণ করছে, তার প্রমাণ উপরোক্ত ঘটনা। মৌলানা সাহেব নানা শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করেও মৌলবীসাহেবকে বুঝিয়ে উঠতে পারেননি পরিশেষে আলোচনা হাতাহাতিতে পরিণত হয় এমন কি শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য ফাঁকা বন্দুকের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। হাস্যকর ব্যাপার, কিন্তু এসব ঘটনার পরিণাম জাতির পক্ষে কত দূর অশুভই না হয়ে দাঁড়ায়।

রাজসাহী থেকে যে ঘটনার খবর আমরা পেয়েছি তাতে আরো বিস্মিত হ'তে হয়। প্রকাশ কালিকাপুরে কৃষক প্রজাসমিতির সদস্য ও পাঁচশতেরও অধিক মুসলমান, কয়েকজন হিন্দু ও একজন মুসলমানের বাড়ী আক্রমণ করে। তাদের অপরাধ যে তারা কৃষকপ্রজা সমিতির সদস্য হতে অস্বীকার করেছিলো, শেষ পর্য্যন্ত রাজসাহী থেকে সশস্ত্র পুলিশ আনতে হোয়েছিলো। সদস্য সংগ্রহের এরূপ বীরত্বপূর্ণ অভিযানের দৃষ্টান্ত আমরা আর পাই নাই। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান ও সংবাদ পত্রগুলি যে ইন্ধন যোগাচ্ছে, এ তারই ফল।

কোনরূপ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানেরই আমরা বিরোধী, কাজেই সম্প্রতি কোলকাতার বস্তি অঞ্চলে গরীব মুসলমান মেয়েদের জন্য যে মুসলিম নারী-শিল্প-শিক্ষালয় স্থাপিত হয়েছে তাতে আমরা সুখী হতে পারি নাই। দুঃস্থমেয়েদের সহায়তার জন্য এ ধরণের বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে—সেজন্য উদ্যোক্তাগণ ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু বিদ্যালয়টী মুসলমান মেয়েদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্ব্ব শ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত রাখা উচিত ছিল। অভাবগ্রস্ত নারীর সমস্যা সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষেই সমান—হিন্দু ও মুসলমান নারীর সমস্যা পৃথক নয়—কাজেই স্বতন্ত্রভাবে কলেজ বা শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। হিন্দু মুসলমান যার অর্থেই শিক্ষালয় স্থাপিত হোক্ না কেন সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

যশোহর সম্মেলনের শোচনীয় দুর্ঘটনা—

সম্প্রতি যশোর সম্মেলনে যে মর্ম্মান্তিক ব্যাপার ঘটে গেল, তার জন্য প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই লজ্জা অনুভব করেন। যত প্রকার চিত্ত বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খলতার কারণই থাকুক না কেন নিরস্ত্র জনতার ওপর লাঠি চালানো পুলিশেরই একচেটে বলে জানা ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতবাদ বা দল উপদল থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তার এরূপ নির্লজ্জ

প্রকাশকে নিন্দা করবার মত ভাষা নাই। বাস্তবিক ক্ষত কোথায় বের কোরে তার উপর অস্ত্রোপচার করতে হবে নিষ্ঠুর ভাবে। সমস্ত ব্যাপারটী বাংলার রাজনৈতিক জীবনের এক গভীর গ্লানিকর অধ্যায়। বাংলায় যথার্থ কাজ করবার উপযুক্ত অবহাওয়া সৃষ্টি যদি কোরতে চান তবে প্রত্যেক কর্ম্মীর অগ্রসর হোয়ে এই মীমাংসার ভার গ্রহণ কোরতে হবে।

দেশীয় রাজ্যে দমননীতি—

সম্প্রতি হায়দারাবাদ ষ্টেট-মহারাষ্ট্র সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের আয়োজন হয়, কিন্তু হায়দারাবাদ সরকার সভাপতির অভিভাষণ থেকে কোন কোন অংশ ও আলোচ্য কয়েকটী প্রস্তাব বাদ দেবার আদেশ দেন, ফলে উদ্যোক্তাগণ সম্মেলন আহ্বান করা অসম্মানজনক মনে কোরে তা স্থগিত রেখেছেন। প্রস্তাবগুলি ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শোভাযাত্রা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সম্পর্কে। দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের যথার্থ অবস্থা ক্রমেই পরিস্ফুট হোয়ে উঠ্ছে, নিয়মতান্ত্রিকভাবেও কিছু করবার অধিকার তাদের নেই। এই তো কিছুদিন আগে বিতুরাশ্বত্থমের দুর্ঘটনা ঘটে গেল আবার হায়দারাবাদের এ ঘটনা। নিজাম তাঁর রাজ্যে প্রজাদের স্বাধীনতা আছে বলে বিশেষ গর্ব্ব অনুভব কোরে থাকেন। সামান্য মত প্রকাশের সুযোগও যেখানে নাই, স্বাধীনতার কতটুকু অবকাশ সেখানে থাকতে পারে সহজেই বোঝা যায়। একমাত্র প্রজাসাধারণের উপরই এর প্রতিকারের দায়িত্ব রয়েছে। যতবড় প্রবল রাজশক্তিই হোক্ না কেন, সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির নিকট একদিন তার পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।

জহরলালের বিদেশ যাত্রা—

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও সহানুভূতির বিশেষ মূল্য আছে, সুতরাং বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম যে ভাবে পরিচালিত হয়েছে তা থেকেও ভারতবাসীর শিক্ষনীয় বিষয় আছে। ভারতের সমস্যা বিশ্বসমস্যার অন্তর্ভুক্ত, বিচ্ছিন্নভাবে এর সুমীমাংসা হতে পারে না, বিদেশে ভারতের তরফ থেকে প্রচারের এই হিসাবে বিশেষ মূল্য আছে। সম্প্রতি জহরলাল নেহেরু চারমাসের জন্য বিদেশ যাত্রা করলেন। তিনি যদিও কংগ্রেসের নিযুক্ত প্রতিনিধি হোয়ে যাননি কংগ্রেসের উপর তাঁর অসামান্য প্রভাবের ফলে সর্ব্বত্র তিনি কংগ্রেসের মুখপাত্র রূপেই গৃহীত হবেন। ভারতের বর্ত্তমান পরস্থিতি, এদেশের আশাআকাঙ্খা যথাযথ ভাবে তিনি বিদেশে প্রচার করতে পারবেন এবং তাতে ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে জগত পরিচিত হবে শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতের স্থান সম্পর্কে মতামত সুনিয়ন্ত্রিত হবে।

হিন্দু মুসলমান মৈত্রী আলোচনা—

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রথম শ্রেণীর যতগুলি সমস্যা আছে, হিন্দু মুসলমান সমস্যা তার অন্যতম। যে কোন দেশহিতৈষী, এ সমস্যার আশু প্রতীকারের পক্ষে। কিন্তু যদি সমস্যার মীমাংসার প্রয়োজনীয়তাবোধ অন্তর থেকে না আসে তখন বাহিরের কোন ব্যবস্থা, প্যাক্ট বা চুক্তিতে তার সমাধান হয় না, সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে এত অন্ধ করে রাখে যে মানুষের দৃষ্টি আবদ্ধ হয় শুধু নিজেতেই। জিন্না-সুভাষ আলোচনা ব্যর্থ হবার কারণ এই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির সংকীর্ণতা। জিন্নার সর্ত্তের বহরে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তির চিন্তা-প্রসূত যুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাঁর যথার্থ উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানের মিলন তাও মনে হয় না। এই মৈত্রী প্রস্তাবে হিন্দুদেরই একতরফা লাভ সুতরাং জিন্না ও তাঁর সম্প্রদায় তাদের পর্ব্বত প্রমাণ দাবী নিয়ে আপনাদের আসনে সুপ্রতিষ্ঠ থাকবেন। নেমে আসতে হয় তো হিন্দুরাই আসুক, কারণ গরজ তাদের এরূপ একটা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রস্তাবগুলির কয়েকটী উদ্ধৃত করে দিলেই তার অযৌক্তিকতা বোঝা যাবে যথা, লীগ ও কংগ্রেস দুইটি সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন পক্ষ বলে স্বীকার করতে হবে। লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করলেই কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে আলোচনা চলতে পারে। কংগ্রেসই হিন্দুমুসলমান ও অন্যান্য নানা ধর্ম্মাবলম্বীদের একমাত্রজাতীয় প্রতিষ্ঠান, এ অবস্থায় মোসলেম লীগের ন্যায় এক সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান কি করে তার সমকক্ষতা দাবী করতে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আর একটা দাবী, যে সকল প্রদেশে বর্ত্তমানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সব প্রদেশ সমূহের পূণর্গঠনে, সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে স্বীকার করতে হবে। বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা বর্জ্জন করতে হবে অন্যথায় মুসলিম লীগের পতাকাও সমান মর্য্যাদা দাবী করবে।

ইতিপূর্ব্বের অনুরূপ আলোচনা থেকে জিন্না-সুভাষ আলোচনা যে বেশী ফলপ্রদ হবে এমন মনে হয় না কারন, ঐক্য যখন উভয় পক্ষের শুভবুদ্ধি উদ্ভূত না হয়, তখন আশা করবার মত কিছু নেই।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন—

বোম্বাইয়ে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইয়ের ভবনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। কতকগুলি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা এই অধিবেশনের বিশেষত্ব। মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী মিঃ শরীফের পদত্যাগপত্র গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শিক্ষাসচিব নারী-নির্য্যাতনের অপরাধে দণ্ডিত একজন মুসলমান বন্দীকে মুক্তি দেওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তারই ফলে এই পদত্যাগ। বাঙ্গালী বিহারী সমস্যা সম্পর্কে কলিকাতা অধিবেশনের প্রস্তাবই অনুমোদিত হয়েছে এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও মিঃ পি আর দাসকে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসবার ভার দেওয়া হোয়েছে। বিহার

ও আসামে বাঙ্গালী বিতাড়নের যে অনুদার ও সঙ্কীর্ণ নীতি গৃহীত হয়েছে এর অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করা উচিত ছিল। চীনে এম্বুলেন্স প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশীয় রাজ্যের এলাকামধ্যে কংগ্রেসের নামে আন্দোলন চালানো যাবে না এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যাতে দেশী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত না হয়। মহীশূর পতাকা সত্যাগ্রহ সম্পর্কে আপোষ মীমাংসার রিপোর্ট ওয়ার্কিং কমিটি গ্রহণ করে। 'বন্দেমাতরম' সম্পর্কে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে সে বিষয়েও একটা মিটমাটের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মিত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বুগতি রাজ্যের নবাবের যথেচ্ছাচারের তীব্র নিন্দা ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের দাবী কোরে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে। আইন সভার বাহিরে কাজ করার জন্য যে নূতন বিভাগ খোলার ব্যবস্থা হয় তার ভার দেওয়া হয় আই, সি, এস পদত্যাগী মিঃ কামাথকে। কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীকে পরামর্শ দিতে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে কমিটি গঠনের প্রস্তাব হয় সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত হয় নাই।

বাংলার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী—

নূতন শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের পর বহু বছর ঘুরে এলো বাঙ্গলার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী সমস্যার কোন সমাধান হলোনা বা অদূরভবিষ্যতে হবে বলেও কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এ সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি—অন্যরূপ আশাও অবশ্যি কেউ করে নি, তবে গান্ধিজীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাবার একমাসের মধ্যে সরকার পক্ষ থেকে যে বিবরণ দেবার কথা ছিল দুমাস অতীত হোল এখনো সে সম্বন্ধে কোন কিছুই আমরা জানতে পারিনি—এদিকে গান্ধিজীর নির্দ্দেশমত বন্দীমুক্তির জন্য সমস্ত আন্দোলন বন্ধ কোরে দেওয়া হয়েছে। বন্দীমুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে এই নীতিকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না, প্রথমতঃ রাজবন্দীদের মুক্তি আমরা ভিক্ষা হিসাবে চাচ্ছি না চাচ্ছি দাবী হিসাবে—কাজেই যতক্ষণ না সে দাবী গ্রাহ্য হোচ্ছে ততক্ষণ কোন কারণে আন্দোলন থামাবার কোন অর্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ এদিকে কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনা চালানো ও বার বার বন্ধ হওয়ার মন্থরতার মধ্যে কারা প্রাচীরের অন্তরালে বন্দীরা যে কি অধীর অধৈর্য্যে দিন গুনছে তা ভুক্তভোগীমাত্রেই অনুমান করতে পারবেন, এ অধৈর্য্যতা কারাগৃহের ক্লেশক্লিষ্ট জীবনের বিরুদ্ধে নয়—কারণ এই শ্রেণীর বন্দীরা কারাগৃহের ক্লেশকে নির্ব্বিবাদে সহ্য করতে পারে—এ অধৈর্য্যতা তাঁদের বাধ্যতামূলক কর্ম্মহীনতার বিরুদ্ধে। সমস্ত দেশ জুড়ে যে বিপুল প্রাণচাঞ্চল্য উত্তাল হোয়ে উঠছে তার ঢেউ তাঁদেরও ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে, আর তাঁদের জ্বলন্ত কর্ম্মাকাঙ্খাকে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে তিলে তিলে ব্যর্থ করবার গ্লানি কারাগৃহের জীবনকে করে তুলেছে বিস্বাদ। এই আত্মহত্যা থেকে মুক্তি দেবার গুরুদায়িত্ব বিশেষ কোরে তাদের, দুদিন আগেও যারা সম অবস্থাভোগী ছিল।

পাঞ্জাব মেল দুর্ঘটনা—

আবার আর একটি মেল দুর্ঘটনার খবরে সকলেই বিচলিত হবেন। ঘটনার বিবরণ এই, ৭ই জুন রাত্রি ১১টা ১২ মিনিটের সময় মধুপুর এবং শাখেরপুর ষ্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় ৫নং আপ মেলখানা লাইনচ্যুত হয়। ইঞ্জিন, ইঞ্জিনের পরব কর্ত্তীয়লার গাড়ী ও তার পরের ৫খানি বগী লাইনচ্যুত হোয়ে, উঁচু বাঁধ হতে নীচে পড়ে যায় ফলে মেল সর্টার ও ইঞ্জিনচালক নিহত হয় ও বহু-লোক আহত হয়। রেলকর্ত্তৃপক্ষ সন্দেহ করেন দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হোয়ে কোন লোক একখানি ফিস প্লেট রেলওয়ে লাইনের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে দেয় ও স্লিপারের বোল্টুর স্ক্রু খুলে রাখে। অল্পদিন আগে বিহিটা ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে কত জীবন নষ্ট হোল। এই রেল দুর্ঘটনাগুলির কারণ ভাল কোরে অনুসন্ধান হওয়া দরকার এবং যাতে এই দুর্ঘটনাগুলি দৈনন্দিন ব্যাপারে পর্য্যবসিত না হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া কর্ত্তৃপক্ষের উচিত।



জয়শ্রী

সপ্তম বর্ষ | শ্রাবণ | দ্বিতীয় সংখ্যা

মৈত্রী বা মেত্তা

শ্রীসুরমা মিত্র

আমাদের দেশে সাধনার মূল মন্ত্র "আত্মানং বিদ্ধি"—নিজেকে জান। কেমন করে নিজেকে জান্‌তে হবে?—নিজেকে কি আমরা জানিনা? তার উত্তর শাস্ত্র দিয়েছেন নিজেকে ব্রহ্ম স্বরূপে জানো—বৃহৎ করে জানো। যেমন ক'রে আমরা আমাদের জানি তা অতি স্থূল ও সাধারণ ভাবে জানি—তাতে আমাদের সমগ্র পরিচয়টি অজ্ঞাত থেকে যায় এবং এই না জানার খবরটিও আমরা সকল সময় পাইনা। সমুদ্রের বুকে যে তরঙ্গ ভেসে উঠে আবার লয় পেয়ে যায় শুধু সেই টুকুই'ত সমুদ্রের সব নয়; যে অন্তঃপ্রবাহ সদাই প্রবাহিত হ'য়ে চলেছে একটির পর একটি ঊর্ম্মির গতিকে সঞ্চারিত ক'রে—তাকে না জান্‌লে অনেকখানি বাদ থেকে যায়। তাই এই জানার প্রচেষ্টায় মানুষ চলেছে—অবিশ্রান্তগতিতে নানাদিকে। কত মায়া মন্ত্রের চাবী দিয়ে সেই রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে চেষ্টা করেছে—ফলে নানা পথ, নানা মতের সৃষ্টি হয়েছে—সে প্রয়াসের আজিও বিরাম হয় নাই—কোনদিন হবে কিনা কে বল্‌তে পারে? পর্ব্বতের গোপন গুহা থেকে নির্ঝর বয়ে চলে দিকেদিকে, কত নদনদীর শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হোয়ে পৌছায় সাগরে কিন্তু সেখানেও তো তার প্রবাহের বিরাম হয়না। সেখানে তার স্রোত এসে বিরাট বারিধির বক্ষে যে অবিরাম অনন্ত লীলা চলে তারই সঙ্গে মিলিত হয়ে রূপ থেকে রূপান্তরে নিজেকে প্রতিফলিত করে। কোন্ সুদূর অতীত থেকে বয়ে এসেছে মানুষের জীবনধারা। ঘূর্ণাবর্ত্তে কোথাও ফেনিল উচ্ছল, কোথাও শান্ত, কিন্তু ধারা লুপ্ত হয়নি, একদিক থেকে আর একদিকে আঁকা বাঁকা রেখায় তরঙ্গিত হয়ে চলেছে—কিসের আহ্বানে? নিজেকে জান্‌বে এই ভরসায়। তার এই আত্মপরিচয়ের প্রয়াসে হোল কাব্য, সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি। আর সেই ভাব আবেগের তরঙ্গের অন্তঃপ্রবাহকে চিন্তার

দ্বারা দেখার প্রয়াসে হ'ল দর্শনের সৃষ্টি। দর্শন মানে আর কিছু নয় বিশেষ ভাবে দেখা। এর ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি হচ্ছে দৃশ (প্রেক্ষণ) + অনট্ অর্থাৎ দর্শন মানে প্রকৃষ্ট ঈক্ষণ, সাদা চোখে যা দেখি তার চেয়ে গভীর ভাবে অনুধাবন করে দেখা। আমাদের দর্শন শুধু এই বিশ্লেষণ করে দেখা নয়, সে আবার শাস্ত্রও বটে—সে শাসন করে, মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু জানা বা দেখা নয়, তাকে পাওয়া বা জীবনে লাভ করা—এই মানুষের লক্ষ্য হ'ল। এই দেখার বৈষম্যে দৃষ্টির ভঙ্গিবৈচিত্র্যে বিভিন্ন দর্শনের উৎপত্তি হ'ল—আর সেই সঙ্গে এলো তাকে জীবনে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার পালা। জীবন দিয়ে তথ্যের অনুসন্ধান অন্বেষণের প্রয়াসে সম্পদ, যশ, প্রভৃতির লোভ বা আকর্ষণ সব ভেসে গেল। যা জান্‌তে হ'বে তার স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ হ'লেও তিনি যে ব্রহ্ম বা বৃহৎ এই সম্বন্ধে সংশয়ের লেশমাত্র রইল না। তাঁকে সংশয়ের বাইরে ব'লে যাঁরা মনে করলেন তাঁরা ব্যবহারিক জগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে চলে গেলেন—যাঁরা এরই মধ্যদিয়ে তাঁকে লাভ করা যায় মনে কর্‌লেন—তাঁরা জীব ও ব্রহ্মজগতের শরীর-শরীরিবাদ প্রচার কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রয়াসের মধ্যে তাঁরা দুঃখনিবৃত্তিকে অতি প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ সকলেই এই কথা বলেছেন, যে এই পরমতত্ত্ব জানলে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হবে, আনন্দে প্রাণ পূর্ণহবে। কি করে এই জ্ঞানলাভ করা যায়—এর উপায় সম্বন্ধেও পরম একটি ঐক্য আছে—সেটি যোগের বহিরঙ্গ, সাধন প্রাণায়াম প্রভৃতি এবং অন্তরঙ্গ সাধন মৈত্রী করুণা প্রভৃতি দ্বারা চিন্তা ও ভাবধারাকে নির্দ্দিষ্ট দিকে পরিচালিত করা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এই চতুষ্টয়ের সম্মিলনে সাধনার রাজপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল, এই প্রশস্ত রাজপথ বেয়ে—অজানা আত্মস্বরূপ বা চরম-তত্ত্বের মন্দির দ্বারে উপনীত হওয়া যায় এই ছিল প্রাচীনদিগের সিদ্ধান্ত। আজ তাঁদের সম্বন্ধেই সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর্‌বো।

যোগসূত্রে এদের চিত্তপ্রসাদনের উপায়স্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে—"মৈত্রী করুণা মুদিতোপেক্ষাদীনাং পুণ্যাপুণ্যবিষয়ানাং ভাবনতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। বৌদ্ধদিগের মহাযান্ সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধিমগ্গ নামক পালিগ্রন্থে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বুদ্ধঘোষ অতি সহজ সুললিত ভাষায় নিপুণভাবে এই বৃত্তিনিচয়ের বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের চিত্ত অতি জটিল, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করতে হলে অতি সতর্ক হ'য়ে চল্‌তে হয়—বিভিন্ন তন্তুগুলির একটু এদিক ওদিক থেকে টান পড়লেই বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশী। তাই তিনি অতি সন্তর্পণে কোন্ দিক্ হতে আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে সামঞ্জস্যের সহিত এদের অনুশীলন করা যায় সেজন্য প্রয়াস করেছেন। এই চারিটির অনুশীলনকে ব্রহ্ম বিহার বলা হয়েছে।

ব্যাসভাষ্যানুসারে—"তত্র সর্ব্বপ্রাণিষু সুখ সম্ভোগা-পন্নেষু মৈত্রীং ভাবয়েৎ, দুঃখিতেষু করুণাং পুণ্যাত্মকেষু মুদিতাম-পুণ্যাত্মকেষু উপেক্ষাম্"। সুখীর সুখে আনন্দ অনুভব করাই মৈত্রী। দুঃখিতের দুঃখে আর্দ্র হওয়া করুণা, পুণ্যাত্মাকে দেখিয়া আনন্দিত হওয়া মুদিতা এবং পাপীর প্রতি ঔদাসীন্যই উপেক্ষা। বৌদ্ধদিগের বিচার কিছু বিভিন্ন—সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জিত হইয়া

প্রেমে দ্রবীভূত হয়ে তাহাদের সহিত ঐক্যবোধ করাই মৈত্রী, আর্ত্তের প্রতি করুণা, আনন্দিতের সহিত আনন্দিত হওয়াই মুদিতা ও প্রিয়াপ্রিয় নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সাম্যদৃষ্টি—কোথাও বিশেষ ভাবে আবদ্ধ না হওয়াই উপেক্ষা। মৈত্রীদ্বারা প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করবে কিন্তু উপেক্ষা দ্বারা রাগ বা আসক্তি দূর করবে, কারণ প্রেম ও রাগ এক বস্তু নয় বরং পরস্পর বিরোধী। প্রেমে আত্মবিস্মৃতি ও শুদ্ধি, আসক্তি বা রাগে সঙ্কীর্ণতা, তা শ্রেয়ো লাভের পক্ষে হানিকর—বন্ধন আনে মুক্ত করেনা—সুতরা উপেক্ষা বা ঔদাসীন্যের দ্বারা তা জয় করতে হবে। এইটীই ভারতবর্ষের সাধনার মূলমন্ত্র। প্রাপ্তির মধ্যে ত্যাগের—ভোগের মাঝে বৈরাগ্যের শঙ্খ ধ্বনিত হয়, বিরোধী বৃত্তির সাম্য বা মিলনই এর বৈশিষ্ট্য।

মৈত্রী প্রসঙ্গে প্রথমেই বুদ্ধঘোষ চিন্তা করেছেন—এর প্রথম পাত্র কে হবে? ঈর্ষ্যা দ্বেষ মানুষের সহজাত বৃত্তি, তাদের অপসারিত করে প্রীতিরসে চিত্তকে স্নিগ্ধ কোরে তোলা, বিশেষ সাধনার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে সুতরাং আলম্বন ও উদ্দীপন এবং ভাবনার প্রণালী দুই বিষয়েই চিন্তা করা প্রয়োজন। পাত্র সম্পর্কে বলেছেন অতিপ্রিয়, অপ্রিয়, মধ্যস্থ ও বৈরী...এই চারজনের সম্বন্ধে প্রথমে মৈত্রী ভাবনা করা উচিত নয়। কারণ—যে বড় প্রিয় একান্ত ভালবাসার পাত্র, তাকে সাধারণ মিত্রের স্থানে কল্পনা করিতে মন ক্লিষ্ট হয় তা ছাড়া সেখানেই মনোনিবেশ করিলে চিত্ত আবদ্ধ হোয়ে থাকে, অতএব সে প্রথম পাত্র নয়।

অপ্রিয়কে মিত্র ভাবাও কষ্টকর, মধ্যস্থের প্রতিও চিত্ত উদাসীন থাকে, তাকে সহসা অনুকূলে প্রবর্ত্তিত করা সহজ নয়—আর বৈরীর প্রতি মনকে স্নিগ্ধ ক'রে তোলা আরও দুরূহ কাজেই এরাও প্রথম পাত্র নয়। তা'হলে কার সম্বন্ধে ও কি উপায়ে মৈত্রী ভাবনা করা হবে—তার উত্তরে বলেছেন—প্রথমে নিজের বিষয় ভাবতে হবে—আমি যেন সুখী হতে পারি নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে শান্তিতে থাকতে পারি—এ প্রত্যেকেরই কাম্য কাজেই এতে কোনও ক্লেশ নেই। এরূপ ভাবলে চিত্ত যখন প্রসন্ন হয় তখন আমি যেমন সুখকামনা করি, অন্যেও সেরূপই সুখপ্রার্থী, অতএব সকলের প্রার্থনা পূর্ণ হোক্—সকলে সুখী হোক্—এই কল্পনা দ্বারা নিজেকে অন্যের মধ্যে প্রতিফলিত করা সহজ হয়। যথা "অহং সুখকামো দুখ্খপটি-কুলো জীবিতু-কামো অমরিতুকামো এবম্ অন্নেপি সত্তাতি আত্মানাং সখিখং কত্তা অন্নসত্তেষু হিতসুখকামতা উপজ্জতি"।

ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

"সর্ব্বা দিসা অনুপরিগম্মা চেতসা
নেবাজ্ঝ বাগা পিয়তরম্ অত্তনা ক্বচি
এবং পিয়ো পুথু অত্তা পরেষাম
তস্মা ন হিংসে পরম্ আত্মকামোতি।"

মনে মনে সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করলে এই দেখি যে আত্মা অপেক্ষা কিছুই প্রিয় নয়—সেইরূপ সকলের পক্ষে ইহা মনে ক'রে কাকেও হিংসা করবে না। এই ভাবে কোন ব্যক্তিবিশেষের

সম্বন্ধে না ভেবে অমূর্ত্ত কল্পনার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের প্রতি মন প্রসন্ন হ'লে তখন প্রিয়, মধ্যস্থ ও শত্রুকে অবলম্বন করে মৈত্রী সাধন করতে হবে। এই যে বিশ্বের কল্যাণ প্রার্থনার পর ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলকামনা করার নির্দ্দেশ—এর মধ্যে মানুষের চিত্তের গতির একটী সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। মানুষের মনে প্রতি বিশেষ বৃত্তির মধ্যে একটী সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আছে—অনেক সময় সেখানে পাত্রবিশেষের সম্বন্ধে যে প্রীতির সম্পর্ক ব্যাহত হতে পারে তা সাধারণের সম্বন্ধে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। কারণ ব্যক্তিগত প্রকৃতিগত উপাধির দ্বারা কাল্পনিক ব্যক্তিসমষ্টি আবদ্ধ নয়। তবে এই নিছক কল্পনাগত বিশ্বমৈত্রীতে আনন্দ ছাড়া বেশী কিছু লাভ হয়না। যদি তা প্রতি পাত্রের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত না হয় তবে মহত্ত্ব বা শুচিতা দুটিই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। তাই বুদ্ধঘোষ বলেছেন, যিনি এই প্রাপ্তিটুকুতে তৃপ্ত হতে পারেন না—তিনি উপরোক্ত পাত্র সকলকে অবলম্বন ক'রে আরও বিস্তৃতভাবে সাধন করবেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ব্রত হচ্ছে অনিষ্টকারীর প্রতিবৈরীর প্রতি চিত্তকে বিদ্বেষমুক্ত করে প্রীতির রসে অভিষিক্ত ক'রে তোলা। এর জন্য একটির পর একটি উপায় নির্দ্দেশ করেছেন। এই আলোচনা হতে একটী অতি গভীর সত্য আমাদের সম্মুখে স্বচ্ছ হয়ে ফুটে উঠে সেটি এই, যে অতীতে সাধকদিগের কত নিগূঢ় মর্ম্মবেদনার ফলে সমগ্র জীবন মথিত ক'রে কত অশান্ত গভীর আলোড়নের দ্বারা—এই অন্তর্দৃষ্টি তাঁরা লাভ করেছিলেন—সেই সুধার সন্ধান পেয়েছিলেন যার দ্বারা দুজ্জয়ং জেতি সঙ্গমম্—দুর্জ্জয় সংগ্রাম জয় করা যায়—ঈর্ষা দ্বেষ কলুষ ধৌত করে সকল মালিন্য বিগলিত ক'রে প্রেমের পূতধারায় জীবনক্ষেত্র সরস শুচি ও শ্যামল ক'রে তোলা যায়। প্রথমেই প্রশ্ন হয়েছে—যে অনিষ্ট করেছে—পাপের আবিলতায় যে ম্লান তার চিন্তায় যে প্রথমেই বিদ্বেষ আসে—কেমন করে তাকে জয় করা যায়? তার উত্তরে বলেছেন—যদি শত্রুর অপরাধের কথা স্মরণ ক'রে মন ক্লিষ্ট হয় তাহলে জীবনে যে কতস্থানে কত আনন্দ পেয়েছ তাই স্মরণ করবে—আনন্দের প্রবাহে নিরানন্দ তুচ্ছ তৃণের মত ভেসে যাবে।—সেই প্রাচুর্য্যে হয়ত অপরাধ মার্জ্জনা করা সহজ সাধ্য হবে। যদি সফল না হও তবে মনে 'করো বুদ্ধের বাণী—তিনি বলেছিলেন যদি দুইদিক্ থেকে তস্কর ও বিশ্বাসঘাতক তীক্ষ্ণ করাতের দ্বারা তোমার শরীর ছিন্নভিন্ন করতে থাকে তাতেও যদি তুমি ক্ষুন্ন হও তবে তুমি বুদ্ধের পথ অনুসরণ করবার যোগ্য নও।

তিনি বলেছেন—তস্স এব তেন পাপীয়ো যো কুদ্ধং পতিকুদ্ধজ্ঝতি
কুদ্ধম্ অপ্পতিকুজ্ঝন্তো সংগামং জেতি দুজ্জয়ম্।
উভিন্নম অথ্থম চরতি অত্তনো চ পরস্স চ
পরম সংকুপিতম্ ঞত্বা যো সতো উপসম্মতি ॥

অর্থাৎ যে ক্রুদ্ধের প্রতি রুষ্ট হয় সেই পাপীয়ান্, বেশী অনিষ্টের হেতু—কারণ সে চেষ্টা করলে অপরের ক্রোধের কারণ বু'ঝে শান্তচিত্তে ক্রুদ্ধ না হোয়ে নিজের ও অপরের কল্যাণ সাধন করতে পারে এবং দুর্জ্জয় সংগ্রাম জয় ক'রে। বারংবার ইচ্ছাশক্তির প্রয়াসের দ্বারাও যদি সফলকাম না হও

তবে যারা যতটুকু ভাল ততটুকুই চিন্তা করবে। প্রত্যেকেরই কোনও না কোনও অংশ ভাল আছে। যা কিছু অসুন্দর, অনুদার তাকে উপেক্ষা করে যা সুন্দর, মধুর, বৃহৎ তাকে যদি চিত্ত গ্রহণ করতে না পারে তবে মক্ষিকার হীনবৃত্তিই তার একমাত্র সরণি হইয়া দাঁড়ায়।

যদি শত্রুকে ভালবাসিতে নাও পার তবে এমন বিদ্বেষ ভাল যার দ্বারা তার কোনও অপকার না করে নিজের উন্নতি লাভ করতে পার। তিনি বলেছেন—তুমি তো শত্রুর আনন্দের কারণ হ'তে চাও না? তাই যদি হয় তবে ক্রোধের দ্বারা তোমার মনেরই পবিত্র মাধুর্য্যের যে হানি হবে—চিত্ত বিক্ষোভের ফলে কর্ম্মজীবনে যে চ্যুতি বিচ্যুতি ঘটবে এবং তার জন্য যে অশান্তির সৃষ্টি করবে তাতে সেই শত্রু উৎফুল্ল হবে। অতএব যেরূপ চিন্তায় আনন্দ ও শান্তি পাও তাই করে চিত্ত প্রফুল্ল রাখবে।

এরপর বুদ্ধঘোষ সমস্যাটির মূল বিশ্লেষণ করে সমাধানের চেষ্টা করেছেন। যে দুঃখকষ্ট পেয়েছি বলে অন্যকে দায়ী করে মনকে তার প্রতি বিরূপ করে তুলি—সেই দুঃখের মূল কোথায়? আমাদের সকল অনুভূতির দুটি ক্ষেত্র আছে—বাহির ও অন্তর। বহির্ভাগে অপরের প্রবেশ চলে কিন্তু আন্তর সীমানা একেবারে নিজস্ব। বহির্ভূমির কোনও পরিবর্ত্তন ভিতরকে দোলা দিয়ে যায় বটে কিন্তু সেই স্পন্দনটীকে কিরূপে গ্রহণ করবো সেটি আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গ বাহিরের জগতে কেবল স্পন্দনাত্মক—যখন তাকে আমাদের বোধশক্তির দ্বারা গ্রহণ করি তখনই তাকে "আলোক" বলে বুঝি। সুখদুঃখ সকল বিষয়ে এই একই সত্য দেখা যায়। অহিতকারী কোনও না কোনরকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারে বহির্ভূমিতে—কিন্তু তাকে দুঃখ বলে আবিষ্কার করার ভার আমাদের। বাইরে যে যাই করুক না কেন—যে স্পর্শমণির দ্বারা সকল ধাতুই স্বর্ণের দীপ্তি লাভ ক'রে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে—যে অমৃতসিঞ্চন বিষকে মধুতে পরিণত করতে পারে—তাহা অন্তরের অন্তস্থলে আছে, তাকে আবিষ্কার করাই তো সাধনার বিষয়। অবশ্য বুদ্ধঘোষ সংস্কার, বাসনা ও পুরুষকারের জটিল প্রশ্নের মধ্যে আর প্রবেশ করেন নাই। অতি সহজ, সুন্দর ও সরলভাবে এই কথাগুলি তিনি ছন্দে উদ্ধৃত করেছেন—

অত্তনো বিসয়ে দুখ্‌খং কতং তে যদি বেরিণা
কিং তস্সাবিসয়ে দুখ্‌খং সচিত্তে কত্তুমিচ্ছসি?

যদি তার অধিকার যেখানে, সেখানে দুঃখদায়ক কিছু ক'রে থাকে—যেখানে তার প্রবেশাধিকার নাই সেই যে তোমার আপন চিত্ত, আপন সাম্রাজ্য সেখানে কেন তুমি দুঃখ বোধ কর?

যানি রখ্‌খসি সীলানি তেসম্ মুলনিকন্তনম্
কোধং নামুপলালেসি কো তয়া সদিসো জলো?

তোমার চরিত্রের যে শীলসম্পদ তুমি রক্ষা করতে চাও তার মূলচ্ছেদকারী ক্রোধকে কেন লালন করছো? তোমার মত জড়বুদ্ধি আর কে আছে?

কতম্ অনরিয়ং কম্মং পরেন ইতি কুজ্‌ঝাসি
কিন্তু ত্বম্ তাদিসং যেব সো সয়ং কত্তুমিচ্ছসি?

অপরে অন্যায় করেছে বলে ক্ষুব্ধ হোচ্ছ কিন্তু তুমি নিজের প্রতি নিজেই যে অনিষ্ট করছো ?

তুম্হং তস্স চ নাম ত্বং কুদ্ধো কাহসি বান বা

অত্তান পন ইদানেব কোধহুখেখন বাধসি ?

তুমি ক্রুদ্ধ হলে অপরকে কষ্ট দিতেও পার বা না দিতেও পার। কিন্তু নিজেকে ত এখনই দুঃখ দিচ্ছ।

কোধং বা অহিতংমেগ্‌গম্ অরুহ্লা যদি বেরিণো

কস্মা তুবমপি কুজ্‌ঝন্তো তে সম যেবানুসিখ্‌খসি ?

শত্রু যদি অহিতকর ক্রোধমার্গ অবলম্বন ক'রে থাকে তুমিও কেন তাকেই অনুসরণ করছো ?

যম্ দোসম্ তব নিস্‌সায় সত্তুনা অপিপয়ং কতম্

তম্ এব দোসং ছিন্দস্‌সু কিম অথ্‌থানে বিহন্নসি ?

যে কারণে, শত্রু তোমার অনিষ্ট করেছে সেই দোষকে উন্মুলিত কর—কেন অকারণে ক্লিষ্ট হও ?

তার পর বলছেন, যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে সবই ক্ষণিক তবে কেন বৃথা ক্রোধ অভিমান ?

খনিকত্তা চ ধম্মানম্ যে হি খন্ধে হি তে কতম্

অমনাপং নিরুদ্ধা তে কস্স দানীধ কুজ্‌ঝসি

সকল ধর্ম্মই ক্ষণিক সুতরাং যে কারণে অপ্রিয়ানুষ্ঠান হয়েছিল সে কারণ ত চ'লে গিয়েছে এখন কি হেতু ক্রোধ কর ?

দুখ্‌খং করোতি যো যস্‌স তম্ বিনা কস্‌স সো করে

সোয়মপি দুখ্‌খহেতু ত্বমিতি কিং তস্‌স কুজ্‌ঝসীতি ?

যে দুঃখ অনুভব করে সেই ত দুঃখের হেতু—তুমি নিজেই নিজের দুঃখের কারণ, কেন মিথ্যা অপরের প্রতি ক্রুদ্ধ হও ?

এর পরে কর্ম্মফলের প্রসঙ্গ এনেছেন। যে কর্ম্ম করে দায়িত্ব তারই সুতরাং সেই ফলভোগ করবে। যদি কেউ অন্যায় ক'রে থাকে তার শুভাশুভ তারই, তুমি যা'করবে তার দায়িত্বও তোমারই সুতরাং তুমি কেন অশুভ আচরণ করবে ?

যো অপ্প দুট্‌ঠস্‌স নরস্‌স দুস্‌সতি,

সুদ্ধস্‌স পোসস্‌স অনঙ্গস্স

তমেব বালম্ পচ্চেতি পাপম্

সুখুমো রজো পতিবাতম্ বা খিত্তোতি।

নির্দ্দোষ শুদ্ধ ব্যক্তির যে অহিতাচরণ করতে চেষ্টা করে তার সেই প্রয়াস তাকেই ফিরে আঘাত করে, যেমন বাতাসের প্রতিকূলে ধূলা নিক্ষেপ ক'রলে তা সেই নিক্ষেপকারীর

অঙ্গে এসেই লাগে। এইরূপে একটির পর একটি নানাপ্রকার চিত্তের দুর্ব্বার প্রবৃত্তিকে শান্ত করবার উপায় নির্দ্দেশ করেছেন। এইখানেই ক্ষান্ত হননি শেষের দিকে বলেছেন—শুধু মৈত্রী নয় সকলের সহিত নির্ব্বিচারে ঐক্যবোধ করাই উচ্চতর উদ্দেশ্য। নিজের ও অপরের মধ্যে যে সীমা বা ভেদরেখা আছে তা বিলুপ্ত করতে হবে। একে বলা হয় সীমাসম্ভেদ। একটি উদাহরণ দিয়েছেন—স্বয়ং, প্রিয়, মধ্যস্থ ও শত্রু এই চা'রজনের মধ্যে কোনও ভেদ থাকবে না। যদি কোথাও এই চারজন উপবিষ্ট থাকে এবং সশস্ত্র তস্কর এসে একজনকে নিয়ে যেতে চায় তখন যদি অমুককে গ্রহণ কর বলা যায়, তা' হলে সীমা সম্ভেদ হয় নাই বুঝতে হবে। যদি আমাকে গ্রহণ করো এই কথা বলা যায়, তা' হলেও নিজের ও অপরের মধ্যে পার্থক্য বোধ আছে বুঝতে হবে। যখন ভিক্ষু এই স্থলে এই কথাই বল্‌তে পারবেন—কাহাকেও দিতে পারি না তখনই সকলের সঙ্গে ঐক্যবোধ হয়েছে বলা যেতে পাববে। প্রেমের পূর্ণতা সেইখানেই যেখানে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের ভেদ ঘুচে যায়—মাধুর্য্যে স্নিগ্ধতায় দ্বৈতের মধ্যে ঐক্য ও ঐক্যের মধ্যে দ্বৈত দ্রবীভূত হয়ে যায়—এই গভীর তথ্যটি এখানেই স্ফুট করতে চেয়েছেন।

নিজের মনকে যখন বশে আনা কঠিন হয় তখন জাতকের নানা সুন্দর দৃষ্টান্ত মনে করার কথা বলেছেন। জাতকে দেখি মৈত্রী শুধু মানবের মধ্যে নিবদ্ধ নয় সমস্ত প্রাণীজগতে এর নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেক উদাহরণ বুদ্ধঘোষ উদ্ধৃত করেছেন তার মধ্যে শুধু এক বানরের উল্লেখ করবো। একটী বানর এক ব্যক্তিকে একটী পর্ব্বতগুহা থেকে উদ্ধার করেছিল। সেই ব্যক্তিটী কিন্তু তাকে হত্যা করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে সঙ্কল্প কোরে তাকে আঘাত করলো—এতে সেই বানরটী অশ্রুপূর্ণ করুণনেত্রে চেয়ে শুধু বল্ল—"ভগবান তোমার কল্যাণ করুন তুমি এরূপ কোর না—তোমার অহিতাচরণ অন্যকে সৎকর্ম্ম হোতে নিবৃত্তি করবে।"

প্রাচীনদের উদ্দেশ্য ছিল অতি বিস্তৃত, ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকলেই যাতে মৈত্রী পালন করে। তাই মানুষকে লক্ষ্য ক'রে তাঁরা ক্ষান্ত হননি—পশুপক্ষীর মধ্যেও তা বিস্তৃত করতে চেয়েছেন। কতরকম বাধা এসে তাদের বিপর্য্যস্ত করেছে—অন্তরের বাহিরের দ্বন্দ্বে কত স্খলন পতনের আশঙ্কা তাদের উৎকণ্ঠিত করেছে, তথাপি পথভ্রষ্ট হন নি। সিদ্ধি যখন বহুদূরে, অন্তরে বাহিরে যখন বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্য, তার মধ্য দিয়ে সেই দুর্গম পথের যাত্রীরা চলেছেন—অদম্য নিষ্ঠা ও দৃঢ়-বিশ্বাসকেই একমাত্র পাথেয় কোরে। কবিগুরু এই নিষ্ঠার সুন্দর উপমা দিয়েছেন উটের সঙ্গে। সাধনার মরুভূমিতে মানুষের সহায় কে? সৌখিন ভাবোচ্ছ্বাস নয়—আবেগবিহ্বলতা নয় কিন্তু নিষ্ঠা। পদতলে বালুরাশি উত্তপ্ত হয়ে উঠে, নৈরাশ্য, নিন্দা, অপমানের ঝঞ্ঝা বিপর্য্যস্ত কোরে ফেল্‌তে চায়, তখনও চলে নিষ্ঠা মাথা নত করে—ঝঞ্ঝাকে সহ্য করে—উত্তাপকে তুচ্ছ কোরে। মরীচিকা এসে পথভ্রান্ত করে, মাঝে মাঝে সিদ্ধির ওয়েসিস্ সান্ত্বনা ও আশ্বাস দান করে। এম্‌নি কোরে গভীর নিষ্ঠার সহিত এই মৈত্রী সাধন কোরে পথে চলেছিলেন—প্রাচীন বৌদ্ধ সাধকেরা—উৎপীড়ন অত্যাচারে তাঁরা অটল—আঘাতে স্নিগ্ধ, সর্ব্ব অপরাধেও শান্ত, উদার করুণ দৃষ্টিমেলে বলেছেন—"সবেব

সত্ত্বা সুখিতোহস্তু" সর্ব্বজন সুখী হোক্। বিপদকে দৃক্‌পাত করেননি—অবহেলা নির্য্যাতন তুচ্ছ হোয়ে গেছে ক্ষমার বর্ম্মে ঠেকে—তাঁদের সমগ্র জীবন মথিত করে যে অমৃতভাণ্ড লাভ করে ছিলেন, তাই তাঁরা রেখে গেছেন পরবর্ত্তী পথচারীদের জন্য।

তাঁদের পঞ্চভৌতিক দেহ আজ পঞ্চভূতে মিলিয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রের সকল অনুশাসনের মধ্যে তাঁদের অমর আত্মা আজও জাগ্রত আছে। সস্নেহ উৎকণ্ঠার সহিত তাঁরা পরবর্ত্তীদের যেন বলেন "এক উপায়ে না হয় উপায়ান্তর অনুসরণ করো, সফল-কাম হ'বে"। তাঁদের গভীর স্নেহের ও সহানুভূতির স্পর্শ পুঁথির প্রতি ছত্রে মূর্ত্ত হ'য়ে আছে, জীর্ণ ক্লিষ্টমানবের চিত্তে প্রেরণা এনে দেবার জন্য তাঁদের করুণ দৃষ্টি যেন সততই জাগরুক হ'য়ে আছে। আমরা তামস মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে বলি, ওসব বাণী সাধারণের জন্য নয়, আমাদের জন্য নয়, ভুলে যাই যে সাধারণ ও অসাধারণ একত্রে মিশে আছে এক হ'য়ে। ক্ষুদ্র বটের বীজ কেমন ক'রে অনাগত মহীরুহের সম্ভাবনাকে যত্নে ধারণ ক'রে রাখে সে রহস্য আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

আজ এই ব্যক্তিগত, জাতিগত, সমাজগত, ধর্ম্মগত সংঘর্ষের মাঝে, লোভ ও পাপের হলাহলের মাঝে তাঁদের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। তাঁদের মধ্যে যখনই প্রবেশ ক'রতে চেষ্টা করি, তখনই তাঁরা জাগ্রত হ'য়ে উঠেন। সেই অতীতের পুণ্য বনচ্ছায়ে প্রকৃতির স্নিগ্ধশান্ত আবেষ্টনের মধ্য থেকে যেন আবার মুণ্ডিতমস্তক তপস্বীদের উদার গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—সব্বে সত্তা সুখিতো হোন্তু। যে বৃহতের আহ্বানে মানুষ চলেছে অনাদিকাল থেকে, তার সন্ধান সে পেয়েছিল বাহিরের উপকরণ সম্ভারের মধ্যে নয় অন্তর্লোকের স্বচ্ছশান্ত জ্যোতিতে, ব্রহ্মবিহারে, মৈত্রীসাধনের মধ্যে। সেই শুভক্ষণের পুনরাবির্ভাব হোক্—সকলের সম্মিলিত কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হোক্—সব্বে সত্তা সুখিতো হোন্তু, অবেরা অব্যাপজ্ঝা অনীঘা হোন্তু—সর্ব্বপ্রাণী সুখী হোক্—মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হোক, সকল দ্বেষ, দুঃখ ও বিঘ্ন হতে মুক্ত হোক্। এই মেত্তা বা মিলনের বাণী আবার অমৃতের আবাহন করুক ও এই মিলনের সাধনায় আমাদের আত্মপরিচয় লাভ করে ধন্য হই।



বঙ্কিম-মনীষা

শ্রীবীণাপাণি রায়

সাহিত্যের বিহার বস্তুনিরপেক্ষ। রসোত্তীর্ণ কাব্য, গল্প বা উপন্যাস সাহিত্যের দরবারে আপন অধিকার লাভ করে নিজস্ব স্বকীয়তার মহিমায়, বিষয়বস্তুর তারতম্যের অপেক্ষা রাখে না; মনীষার রস-ইঙ্গিতে সাধারণ ঘটনাবলীও বিচিত্র ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি করে। রস-শিল্পীর দৃষ্টি সমধর্ম্মী, সেখানে নেই উচ্চ-নীচের ভেদ-বৈষম্য, দেশকালের আপেক্ষিকতা, নিছক সৌন্দর্য্যের পরিবেশই তার কাম্য। অথচ এ কথাও সত্য যে শুদ্ধমাত্র ভাবের বুদ্‌বুদের পরে রসসৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না, তাকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় বিভিন্ন আধারে, যেখানে তা নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে, তাই, যুগে যুগে তার পরিচ্ছদ বদলও চলে। অতএব কবির কাব্যে, ভাবুকের ভাবনায়, শিল্পীর রস-রচনায় পাই দেশকালাতীত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে, সঙ্গে জটিলতর সামাজিক সমস্যা, লৌকিক ও ব্যবহারিক জগতের বহু তথ্যপূর্ণ আলোচনা, সংগ্রাম-বন্ধুর মানবজীবনের প্রতিদিনের কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এ দুয়ের সমাবেশ, কোথাও বা পরিস্ফুট কোথাও বা অন্তর্নিহিত, কিন্তু তাঁর লেখাতে সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয় সংস্কারকের উদ্যত চক্ষু, ভাষার, ভাবের, সেকালের সমাজ-আবহাওয়ার নৈতিক পরিবর্ত্তনে, ধর্ম্ম, লোকশিক্ষা, মানব-চরিত্র ও জীবন অনুশীলনে তিনি যেনো সংস্কারকরূপে লেখনী ধারণ করেছিলেন।

বর্ত্তমানকালে সমাজের যুগসন্ধিক্ষণে, ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্প সমাজ-ব্যবস্থায় চাঞ্চল্য, ভাঙা ও গড়ার মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, গতি ও স্থিতির আবর্ত্তনে, তাই বোধহয় বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে এতো আলোচনা, গবেষণা, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে, তাঁর সাহিত্য বিশ্লেষণের ভিতরে বিচারে, বিতর্কে। কারণ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কারকহিসাবে অনেক বিষয়েই মীমাংসা করতে চেয়েছিলেন। তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আড়ালে রয়েছে বোধহয় পথনির্দ্দেশের প্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে বহু বৎসর চলে গিয়েছে, যান্ত্রিক সভ্যতার আবেষ্টনে দেশ ও বিদেশ, ঘর ও বাহিরের ভৌগলিক সীমা নির্দ্দেশ হয়েছে কঠিনতর, সহজ সরল পথে জীবনের মীমাংসা হবার আর উপায় নেই, নানাবিধ জটিলতর পন্থা ও কলকোলাহলময় বন্ধুর জীবনযাত্রা, সে যুগে আর এ যুগে তফাৎ—বিস্তর। নূতন যুগের পূর্ব্বাভাস দেখা দিয়েছে, সমাজে, নব চেতনা, নূতনতর অনুভূতি, চারিদিকে গুরুতর পরিস্থিতি, প্রতি মানুষকে ঘিরে' অহরহ ওঠে অভিনব সমস্যা। পূর্ব্বের সে সহজ সরল দৃষ্টিভঙ্গি আর নেই, গতি তির্য্যক ও সর্পিল, নরনারীর সম্বন্ধের জটিলতা, আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত, জীবনের সঙ্গে কাব্যের, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের। ভারতবর্ষের সে সাবেকী নির্লিপ্ততা আর চলেনা, নূতনতর সমাজ-ব্যবস্থায় নূতনতর আবহাওয়ার প্রকাশ। সাহিত্যসমাজের প্রতীক্ ও দর্পণ-স্বরূপ। কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে

প্রস্ফুটিত হয় জাতির মনোভাব, শিক্ষা, সভ্যতা, ও চিত্তপ্রকর্ষ। যে অনাগত সমাজের উদ্যোগ-পর্ব্বের আয়োজন চলছে, সাহিত্যে, শিল্পে তার প্রকাশ চাই। বঙ্কিমের অব্যবহিত পরে আমাদের বর্ত্তমান যুগ এক বিরাট বিপ্লবকারী, প্রগতিশীল রুচি পরিবর্ত্তিত যুগ।

রবীন্দ্রেতর যুগে আমাদের জন্ম, যখন বাঙলা ভাষা, সাহিত্য নবশোভা সমৃদ্ধসাজে বিকশিত, শব্দ সম্পদ, ভাব সম্পদের যখন সীমা পরিসীমা নেই, রবীন্দ্রনাথের বিরাট প্রতিভা প্রতিফলিত কাব্যে উপন্যাসে, গল্পে প্রবন্ধে, রসরচনায়। বঙ্কিম সাহিত্যে আমাদের এই বর্ত্তমান সংগ্রামশীল জীবনের ছবি তেমন করে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, সমাজিক বিবর্ত্তনের ফলে পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে সকল অপ্রতিবিধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তার তরঙ্গ আমাদের দেশের সাহিত্যেও প্রতিহত হচ্ছে, কিন্তু বঙ্কিম, উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক সংস্কারক, বিংশ শতাব্দীর সমস্যা তাঁর সাহিত্য-জীবনে প্রবলরূপে প্রকট হতে পারে নাই। আমাদের দৃষ্টি ধাবিত হয় বাস্তব-প্রধান সাহিত্যসৃষ্টিতে। কল্পনার ভাববিলাস ও রোমান্স-মুখী সাহিত্যে অন্তর তৃপ্ত হয় না, সমস্যার সমাধান তাতে নেই, আমাদের বঙ্কিম-বিমুখিতার বোধহয় কতকটা কারণ এই, যে তাঁকে আমরা মনেকরি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের, যেনো আধুনিক যুগের কোন সমস্যার সমাধান, আলোচনা তাঁর দ্বারা হয় নাই। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠ করলে বোঝা যাবে আমাদের বর্ত্তমানযুগের অনেক সমস্যা বীজরূপে বঙ্কিম সাহিত্যে অঙ্কুরিত হয়ে গিয়েছিলো, তাঁকে আমরা যতটা গ্রীক্‌যুগীয় বলে মনে করি ততটা তাঁর প্রাপ্য নয়। আপন প্রতিভা-প্রদীপ্ত বঙ্কিম এখনো বাঙালীর শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। বর্ত্তমান যুগের অনেক সমস্যা তাঁর রচিত সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর দান অনবদ্য, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে নানা পথের সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন। কবিসম্রাট যে পথ দিয়ে গিয়েছেন তার বাঁকে বাঁকে সহস্র ফুলের মেলা, বিচিত্র সমারোহ, তবু মনে হয় সে রাজপথের পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ হতে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যিকই সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিম-প্রভাব এড়াতে পারেন নাই, বঙ্কিম সাহিত্যের যে ধারা, নির্দ্দেশ করে দিয়ে গিয়েছিলেন, আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাদেশে সে ধারা অন্তঃশীলা স্রোতে বয়ে চলেছে। আশে পাশে হতে অনেক নূতনধারা এসে যোগ দিয়ে সে ধারাকে স্ফীত ও পূর্ণতা দিয়েছে, কিন্তু সরিয়ে দিয়ে অন্যধারার প্রবর্ত্তন করতে পারেনি, সাহিত্যে অতি-আধুনিক বলে যারা গর্ব্ব করেন তারাও নন্। পূর্ণতোয়া শাখানদী ও উপনদী সমূহ দুইকূল প্লাবিত করে বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ক্ষীণকায়া নদীটি আজও শুকিয়ে মরে যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় আমাদের ভাবরাজ্যে এক বিরাট বিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছে, এদের বিপরীতমুখী সৃষ্টি আমাদের বিচার বুদ্ধি ও রস-পিপাসাকে অন্যপথে চালিয়ে নিয়েছে। বঙ্কিমের ঘটনাবহুল উপন্যাসাদি হতে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসরাজি পৃথক জাতীয় হোলেও, একই পর্য্যায়ভুক্ত বলা যেতে পারে কারণ এও রোমান্স, সম্পূর্ণ বাস্তব উপন্যাস নয়; যদিও পরবর্ত্তী লেখকদের রোমান্স, সমাজের উন্মুক্ত অঙ্গনে সংঘটিত হয় নাই, হয়েছে কবির মানসজগতের কল্পনায়। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, তিনি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব-

বাদী কিন্তু তাঁর আধুনিকতম উপন্যাস 'চরিত্রহীন, 'গৃহদাহ,' রোমান্স-গন্ধী। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা,' 'ঘরে বাইরে' 'চতুরঙ্গ' ইত্যাদিতে সমাজ বহির্ভূত নানা সমস্যা, আধুনিক জগতের ঘাত প্রতিঘাত, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে উদ্ভূত মানসিক আলোড়নের ও প্রতিস্পর্দ্ধী সমাজের চিত্র পাওয়া যায়, কিন্তু এসবও যে সম্পূর্ণ বাস্তবপ্রধান নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। অতি আধুনিক ও প্রগতিশীল যেসব সাহিত্যিক, নবসৃষ্টি প্রয়াসী, তাঁদের মনন ও মনীষায় এই বিংশশতাব্দীতেও যখন নূতনতর সাহিত্য, দর্পণ-স্বচ্ছ হয়ে ফুটে ওঠেনি, তাঁরাও যখন পুরাতনকে অনুসরণ ও অনুবর্ত্তন করছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রে আধুনিকতা একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

ভাষা সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিকতার দাবী করতে পারেন, তাঁর এ দাবী অযৌক্তিক ও অসঙ্গত নয়। বাঙ্গলাভাষার প্রকাশ সৌষ্ঠব, মাধুর্য্য, সাবলীলভঙ্গিমা, গাম্ভীর্য্য, ও লীলাচঞ্চলতা অস্বীকারের উপায় নেই, সুধী সমাজের হাতে বাঙ্গলাভাষার বিচিত্র বিকাশ হয়েছে। মানবমনের সকল প্রকার ভাব-বৈচিত্র্য প্রকাশক্ষম ভাষা রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রপ্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টাদের রচনায় উৎকর্ষ লাভ করেছে, কিন্তু ভাষার এই আধুনিকরূপের, সর্ব্বপ্রথম জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র। বর্ত্তমান-কালের, সব সাহিত্যিকের লেখাতেই বঙ্কিমভাষার প্রভাব গৌণত বা মুখ্যত প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য-ভাব-সংস্পর্শে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষিগণ আমাদের জাতীয় জীবনে নূতনধারা ও চিন্তাপ্রবাহ সূচনা করেছেন কিন্তু সে ভাবধারাকে সুস্পষ্ট ও দৃঢ়-সংবদ্ধ রূপ দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকের চেয়ে সাহিত্যিকের কলমে জোর বেশী, তাঁর অঙ্কিতচিত্রে সমাজের ছবি স্ফুটতর হয়, আর বঙ্কিমের ভাষায় জোর ছিল, কারণ তিনি ভাব-উপযোগী ভাষা সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন। তিনি কথ্য-ভাষা ও লেখ্য-ভাষার সংযোগে নূতন ভাষার সৃষ্টি করে বাঙ্গলাভাষার ওজস্বিতা, গাঢ়তা ও ভাব প্রকাশোপযোগীতা বৃদ্ধি করেন। আমাদের এই চলতি ভাষার সাহিত্য-স্বীকৃতির দিনেও একথা অস্বীকার করতে পারিনে যে, সংস্কৃতভাষাবর্জ্জিত বাঙ্গলাভাষা শ্রীহীন ও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, উভয়ের সংমিশ্রণেই ভাষার শ্রী ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথ চলতি বা কথ্যভাষায় অসাধ্যসাধন করেছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা সংস্কৃতবর্জিত নয়। বিবিধ ভাষা হতে বিভিন্ন রত্ন আহরণ করে, ভাষার সমৃদ্ধি ও পূর্ণত্ব লাভ হয়। তিনি বর্জ্জন-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না, এবিষয়েও আধুনিকযুগ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষে জাতীয়তার জন্মদাতা, পরিপোষক ও পরিবর্দ্ধক। তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধে এই জাতীয়তা-বোধকে তিনি ভারতবাসীর মনে উদ্বুদ্ধ করতে আপ্রাণ সচেষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, দেখি ভারতীয় পল্লীসভ্যতার ক্ষীণাবশেষ, মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের অসার তত্ত্বালোচনায় পর্য্যবসিত, অপরদিকে বিদেশী নাগরিক সভ্যতার প্রচণ্ড সংঘাত, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন সভ্যতা, শিক্ষা ও চিত্তপ্রকর্ষ কক্ষচ্যুত ও দিশাহারা, বঙ্কিমই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ভিতরে জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্ম-ধারাকে নূতন রূপদান করেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রামমোহন রায়ের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সমন্বয় প্রচেষ্টা, বঙ্কিম সাহিত্যে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। প্রতীচ্য জগত হতে যাহা গ্রহণীয়, ভারতবর্ষীয় মর্য্যাদায়

সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, বরণ করার অনুশীলন-শিক্ষা বঙ্কিমের। তখনকার সমাজব্যবস্থায় এই জাতীয়তা বোধ আমাদের যে কতদূর প্রয়োজন ছিল এ কথা কী আমরা অস্বীকার করতে পারি? বর্ত্তমানযুগেও কি আমাদের জাতীয়তা বোধনার প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়েছে? জাতীয়তাবোধ অর্থ জাতির আত্ম-সচেতনত্ব বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা। বর্ত্তমান প্রগতিপন্থী মতবাদের মতে এই আত্মসচেতনত্ব মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ, যে কথা ব্যক্তিগত হিসাবে সত্য, সমাজহিসাবেও তা সত্য, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র যে জাতীয়তবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন তা, প্রগতি-বিরোধী নয় এখনকার কষ্টিপাথরেও। তাঁর জাতীয়তা বোধ সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থান্বেষী ছিল না, বিশ্বমানবের সভত্যায়, ভারতীয় আদর্শ, শিক্ষা ও সভ্যতার মিলন সাধন তাঁর কাম্য ছিল, তাঁর কল্পনা-প্রবণ চিত্ত, শুদ্ধমাত্র ভাবসাগরে বিলীন না হয়ে, যুক্তি ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণে রত পশ্চিমী সভ্যতার দরবারে ভারতীয় ঐতিহ্যের দান সে যুগে জনসাধারণের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করার প্রয়োজন বোধকরেছিল এবং তিনি সে চেষ্টায় সফলকাম হন। জাতির আত্মবোধ সংগ্রামে তিনি ভাববিলাস ও কর্মপরাঙ্মুখতার প্রশ্রয়বিরোধী ছিলেন, তাঁর সাধনা জ্ঞানের সাধনা, নিরলস কর্ম্ম ও জ্ঞানময় পথেই, যে জাতির উদ্বোধন সম্ভবপর এ তিনি বিশ্বাস করতেন, বৈষ্ণবযুগের কবিজন-সুলভ, কোমলতা ও সংসার-বিমুখতার আবেশে, জাতীয় জীবনের যে মেরুদণ্ড শিথিল হয়ে এসেছিলো, তাকে নবশক্তি ও আদর্শে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনা তাঁর। কোমল-কান্ত-পদাবলীর রসাবেশ, তিনি দূরীভূত করতে চেয়েছিলেন, কঠোর চরিত্রের অণুপ্রেরণায়। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' তাঁর অন্তরস্থিত আদর্শ-পুরুষ, যিনি শুধু বাঁশীই ধারণ করেন নি প্রয়োজনকালে অসিও ধারণ করেছেন। বাঙালী-জনসুলভ চারিত্রিক দৌর্ব্বল্য ও ভাব-বিলাস, কঠোর কটাক্ষে ও ব্যঙ্গে চিত্রিত করে, নূতন জাতীয়তার ও কর্ত্তব্য-বোধের সংগ্রামে নিরত করা তাঁর আজীবন উদ্দেশ্য ছিল। অধ্যয়ন, আলোচনা ও অনুশীলন যে বর্ত্তমান বাঙালী জীবনের একমাত্র পন্থা, নিছক ভাব-বিলাসে যে জাতীয়তার বিকাশ সাধন নয়, এ কথাও তিনি আমাদের শেখান। একদিকে প্রাচ্য ও অন্যদিকে প্রতীচ্য এই উভয় সভ্যতার সম্মিলিত জ্ঞান সম্ভারেই যে আমাদের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মজ্ঞান সম্ভবপর এ তাঁর নির্দ্দেশ। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি এ কথা ব্যক্ত করেছেন, তাই তাঁর প্রবন্ধে একাধারে যেমন পাই মিল্, কোমতে, রুসো প্রভৃতির প্রভাব, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় উপনিষদ্, গীতা, ভাগবৎ ইত্যাদির শিক্ষা। আধুনিক কালেও সর্বাঙ্গীন শিক্ষা এ দুয়েরই সমন্বয়।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত সংস্কারক, তাঁর রসরচনায় পাই সংস্কারকের তীব্র চক্ষু, হয়তো তার জন্য দায়ী, সে কালের গুরুতর সামাজিক পরিস্থিতি। আধুনিকপন্থীরা সেজন্য অনুযোগ করেন যে তিনি নৈতিকতার নিকটে সৌন্দর্য্যকে, আর্টকে বলি দিয়েছেন। যাহোক সে যুগের নৈতিক আবহাওয়া দূষিত ছিলো বলেই বোধহয় তিনি কঠোর বিচারকরূপে পাপপুন্যের, ভালোমন্দের বিচার করেছেন। তাঁর উপন্যাসের বিশদসমালোচনা কোথায় আর্ট ক্ষুন্ন হয়েছে, রস ব্যাহত হয়েছে ইত্যাদি ভবিষ্যৎবর্ত্তীদের, আমার আলোচ্য তাঁর সংস্কারশীলতা। তিনি যেনো আজীবন সংস্কারব্রতী, তাঁর প্রবন্ধ মালায় তিনি এ হিসাবে অনেক আলোচনা করেছেন। এখানেও তাঁর চিন্তার

আধুনিকত্ব আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সঙ্খেপে কয়েকটী বিষয়ের মাত্র আমরা উল্লেখ করতে পারি।

বর্ত্তমানযুগ সাম্যবাদের আওতায় বর্ধিত প্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সাহিত্যে ও সমাজে সাম্যবাদের প্রভাব পড়েছে, সাম্যবাদ নিয়ে নানা আলোচনা, গবেষণা বিচার বিশ্লেষণ চলেছে, আধুনিকযুগের, এই আধুনিক ভাব বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পর্শ করেছিলো। তাঁর সময়ে যদিও এর বিস্তার স্বল্পপরিসর ও অপর্য্যাপ্ত তবু বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করে গিয়েছেন। এখনকার মত সাম্যবাদ-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ এতো বহুল প্রচার ও বিস্তৃতি লাভ না করলেও তিনি এ বিষয়ে তৎকাল প্রচলিত গ্রন্থাদি পাঠ করেছেন। রুসোর 'Le Contract Social' নিয়ে কিছু আলোচনা করেন, ভূসম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থা ইত্যাদিও তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল।

নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে উদ্ধৃত অংশ তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে। "স্ত্রী-পুরুষ সমান। এক্ষণে সুশিক্ষায়, বিজ্ঞানে, রাজকার্য্যে, বিবিধ ব্যবসায়ে একা পুরুষেই অধিকারী—স্ত্রীলোক অনধিকারিণী থাকিবে কেন? মিল বলেন, নারীজাতিও এ সকলের অধিকারী। তাহারা যে পারিবেনা, উপযুক্ত নহে, এ সকল চিরপ্রচলিত লৌকিক ভ্রান্তিমাত্র। মিলের এ মত ইউরোপে গ্রাহ্য হইয়া, ফলে পরিণত হইতেছে, আমাদিগের দেশে এ সকল কথা প্রচারিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।" বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং নারী-চরিত্র অঙ্কণে কৃপণতা করেন নাই, তাঁর বিচিত্র নারী, পুরুষ অপেক্ষা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে চারিত্রিক বলে কোনরূপেই হীন নয়, বরং নারী-চিত্র যেনো অধিকতর তেজস্বিনী। নারীকে তিনি উপন্যাসেও সমানাধিকার দিয়েছেন, রাজকার্য্যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তিপরীক্ষায়, বুদ্ধির ক্ষেত্রে, প্রধান স্থান দিয়েছেন অকুণ্ঠিত চিত্তে। বর্ত্তমান কালের সব সমস্যা এতো জটিল না হয়ে উঠলেও, কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি নারীকে ডাক দিয়েছেন, এ বিষয়ে তাঁর আধুনিকতা স্বীকার্য্য, বরঞ্চ অতিআধুনিক সাহিত্যে ও সমাজ ব্যবস্থায় এমনতর জটিলতর পরিস্থিতির ভিতরেও, এ ধরণের নারী-চিত্র বিরল, যার জীবন, সংগ্রামে বন্ধুর, তিতিক্ষায় কঠোর, বহির্জগত ও অন্তরজগতের ঘাতপ্রতিঘাত সতত দহ্যমান। প্রাক্ বঙ্কিমযুগ হতে আরম্ভ করে সকল চরিত্রই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা।

তারপরে কৃষক শ্রমিক সমস্যা। বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বত্র প্রচলিত সমস্যা, বঙ্কিম এ নিয়েও আলোচনা করেছেন। 'বাঙ্গলার কৃষক' শীর্ষক নিবন্ধে তিনি ভূস্বামী ও প্রজার সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে বলেন, বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী ভূস্বামী। কৃষকদের দুরবস্থা, জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ, পূর্ব্বতন অবস্থা ও তার প্রতিকার, বর্ত্তমান কৃষক আন্দোলন বা কিষাণ সমস্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। "বৈষম্যবিষ ভারতীয় প্রজার দুর্দ্দশার একটী মূল কারণ।" যে শুদ্ধ অন্নের কাঙাল, আর পাঁচ সাত জন টাকা খরচ করিয়া ফুরাইতে পারে না, সে ভালো, না সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, কাহারও নিষ্প্রয়োজনীয় ধন নাই সে ভাল? * * * যিনি টাকার গাদায় গড়াগড়ি দেন এ দেশে

তাহার গর্দ্দভ জন্ম ঘটিয়া উঠে, আর যাহারা নিতান্ত অন্নবস্ত্রের কাঙাল তাহাদের কোন শক্তি হয় না। কেহ অধিক বড় মানুষ না হইয়া, জনসাধারণের স্বচ্ছন্দাবস্থা হইলে সকলেই প্রকৃত মনুষ্য হইত ইত্যাদি।" বঙ্কিমচন্দ্রের দূরদৃষ্টি সুদূর অতীতেও বাঙালীর ভাবী-আন্দোলনের সূচনা করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাপক সমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মধ্যে সম্ভবপর নয়, আমরা কেবল তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েই ক্ষান্ত রহি। পূর্ব্বে কথিত হয়েছে যে বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধ এক দেশদর্শী নয়, তাঁর জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশপ্রীতি বিশ্বপ্রীতির নামান্তর। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ং বলেছেন "বস্তুত জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই।" বিশ্বমানবের হিতসাধন ও মমত্ববোধে তিনি মিল, স্পেন্সর, কোমতের মতাদি আলোচনা করেছেন, মিলের 'Greatest good of the greatest number' এই মানবতার মন্ত্র তার উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো বলে মনে হয়। সাহিত্য জগতে বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব অত্যন্ত বিরল, বঙ্কিম-পরবর্ত্তী যুগের দ্রুত চাঞ্চল্য ও অগ্রগামিত্ব এতো আকস্মিক যে বঙ্কিম-প্রতিভা তার সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলার পক্ষে কিছুটা পশ্চাৎপদ হয়ে পড়লেও, তাঁর মনীষার সব্যসাচিবত্ব আমরা অবশ্য স্বীকার করতে বাধ্য। বাঙালী জাতীয় জীবনের সকল প্রকার সমস্যা, আন্দোলন তাঁকে স্পর্শ করেছে এবং গভীর অভিনিবেশ সহকারে মীমাংসা করার প্রচেষ্টা তাঁর আজীবনের সাধনা ছিলো। ভারতবর্ষের সাধনা, সুখ দুঃখ ও আত্মবোধের সঙ্গে তাঁর যেনো অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ ছিলো, সুতরাং বর্ত্তমানযুগে আমাদের মতবাদের যতো দ্রুত পরিবর্ত্তন হোক, তাঁর প্রভাব আমাদের উপরে অনিবার্য্য। আজ শতবৎসর পরেও তাঁর সাহিত্য ও জীবনের আলোচনার মধ্যে আমাদের সঙ্গে তাঁর যে শাশ্বত যোগ তারই প্রমাণ পাই।

প্রলয়-নাচন

শ্রীবাণী মিত্র

ঈশানে তোমার প্রলয়-বিষাণ
বাজ্‌বে যখন বিশ্ব-ব্যেপে,
সেই বিষাণের ভীষণ রবে
অখিল ভুবন উঠ্‌বে কেঁপে !

আকাশ-পথে লক্ষ তারা
হবে সবাই লক্ষ্যহারা,
ইন্দু-রবি নিভ্‌বে সব-ই—
ঘোর আঁধিয়ার আস্‌বে চেপে !

মরণ তখন তুফান সম
আস্‌বে সবার চক্ষে নেমে,
তুহিন-শীতল সেই বসুধায়
জীবন-চক্র যাবে থেমে !

তুমি তখন সেই শশ্মানে
নাচ্‌বে যুগের অবসানে,
মুক্ত-জটা উড়বে ঝড়ে—
ভীম পারাবার উঠ্‌বে ক্ষেপে !

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

শ্রীশান্তা দেবী

শৈশবে ও বাল্যে মানুষের শরীর মন যে ভাবে গঠিত হয়, ভবিষ্যৎকালে তাহার ভাগ্য অনেকাংশে তাহার উপর নির্ভর করে। তাহার শরীর সংসারের দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামে টিঁকিয়া থাকিতে পারিবে কিনা, রোগ শোকের আক্রমণে ভাঙিয়া পড়িবে কিনা, তাহা তাহার দেহমনের শক্তির উপর অনেকটাই নির্ভর করে। সেইজন্য সন্তানের দেহমনের যত্ন ঠিকমত হইতেছে কিনা, মাতার এদিকে অতন্দ্রিত দৃষ্টি থাকা দরকার। ঘরে শরীরের যত্ন অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার তদারক অনেক মা করেন বটে, কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বাহিরে এবং মায়ের চোখের আড়ালেও ছেলেমেয়ের শরীরের যত্ন যে প্রয়োজন একথা অনেক মা জানেন না, অনেকে জানিয়াও কিছু করিতে পারেন না। মনের কথাত পিতামাতার চিন্তারই বাহিরে।

ইউরোপে শিক্ষাতত্ত্ববিদ্‌রা এসব কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, কারণ শিক্ষালয়েই ছোট ছেলেমেয়ের জীবনের অধিকাংশ দিন কাটে। সেখানে তাহাদের শরীর মন জখম হইলে, ভবিষ্যতে মেরামত হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। নানাদেশের চিন্তাশীল লোকেরাই মনে করেন যে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত খাটানো হয়। ইহা একটি ভাবনার বিষয়। এইসব ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাই নানা দেশে নানা রকম প্রচেষ্টা হইতেছে। স্কুলের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম বিষয়ে জেনিভার International Bureau of Education এ বিশেষ আলোচনা হয়। জেনিভায় সুইজারল্যাণ্ডের শিশুতত্ত্ববিদেরা যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও শিক্ষাবিভাগে পেশ করেন, সেগুলির বহুল প্রচার দরকার বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, স্বাস্থ্য ও শরীর গঠনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি যেসব ছেলেমেয়ের বিদ্যালয়েই কাটে, জেনিভার শিশু-চিকিৎসকেরা, তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া চিন্তান্বিত। ইহা বিদ্যালয়ে পড়ারই ফল।

ছোট ছেলেদের দিনে ৯।১০ ঘণ্টা ঘুম দরকার। যে ১৪ ঘণ্টা তাহারা জাগিয়া থাকিবে, তাহার ভিতর ৭ ঘণ্টার বেশী কাজ চাপানো উচিত নয়। ঘরের কাজ ও স্কুলের কাজ সব জড়াইয়াই যেন মোট সাত ঘণ্টার বেশী না হয়। বাকি সাত ঘণ্টা, স্নান আহার পোষাক-আসাক করা, খেলা, বাড়ীতে থাকা, ধর্ম্ম ও নীতি চর্চ্চা এবং স্বাস্থ্যপালন ইত্যাদি করার জন্য রাখা দরকার।

সমস্ত সপ্তাহে বাড়ীর পড়া ধরিয়া ৩৫ ঘণ্টার বেশী পড়াশুনা করিতে দেওয়া উচিত নয়।

উপরের ক্লাশের ছেলেমেয়েরা ইহার ব্যতিক্রম করিতে পারে, তাহারা পূর্ণবয়স্কদের মত দিনে আটঘণ্টা খাটিতে পারে।

শিশুদের পূর্ব্বোক্ত ভাবে জীবনযাপন স্বাভাবিক মনে করাতে জেনিভার শিশুচিকিৎসকেরা শিক্ষাবিভাগের কাছে কতকগুলি প্রস্তাব আনয়ন করেন। তাঁহারা আশা করেন শিক্ষা-বিভাগ এই প্রস্তাবগুলির দিকে একটু সুনজর দিবেন।

১। শনিবারের মত বৃহস্পতিবারেও বিকালের ক্লাশ বন্ধ রাখা উচিত।

২। সোমবারে কোন পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করা উচিত নয়, এবং বাড়ীতে এমন কোনও পড়া করিতে বলা উচিত নয় যাহাতে রবিবারেও শিশুদের খাটুনি হয়।

৩। যতদূর সম্ভব নীচের ক্লাশের শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব শিক্ষকের নিজের হাতেই থাকা ভাল। তাঁহার উপর আর কাহারও তদারক না করাই ভাল।

৪। বাড়িবার মুখে, বয়ঃসন্ধির সময় এবং বাল্যকালের অন্যান্য পীড়া প্রভৃতির জন্য ছেলে মেয়েদের শরীরের উপর একটা চাপ পড়ে। সেইজন্য কোন ছেলে মেয়ে যদি একই শ্রেণীতে দুই বৎসর পড়িতে বাধ্য হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহা যেন লজ্জার বিষয় বলিয়া আর না ধরা হয়।

স্কুলের পড়ার সময় কমাইতে বলা হইতেছে বলিয়া শিক্ষকদের বেতন যেন কমানো না হয় চিকিৎসকেরা এই অনুরোধ করেন। শিক্ষকেরা যে বাড়তি ছুটি পাইবেন সেই সময়ে পাঠ্য বিষয়-গুলি নিজেরা ভাল করিয়া তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিবেন।

শিশুচিকিৎসকেরা মনে করেন দেশের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা তাঁহাদের এই ইচ্ছাগুলি শিক্ষাবিভাগকে জানাইতেছেন। এগুলি আধুনিক স্বাস্থ্যপালন চিকিৎসাশাস্ত্র সঙ্গত ইচ্ছা।

আমাদের দেশে ছেলেদের স্কুলে সপ্তাহে একদিন মাত্র ছুটি হয়, কিন্তু জেনিভার ও ফ্রান্সে রবিবারের মত বৃহস্পতিবারেও পুরা ছুটি থাকে। সপ্তাহে একদিন ছুটি থাকিলেও শনিবারে একবেলা ক্লাশ হইলে সপ্তাহে মোট ক্লাশ হয় ২৮ ঘণ্টা। এখানে প্রত্যহ আধঘণ্টা করিয়া টিফিনের ছুটি বাদ ধরিতেছি, না হইলে ৩০½ ঘণ্টা মোট হইত। জেনিভার শিশু-চিকিৎকেরা সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা পড়ার যে নিয়ম পালনীয় মনে করেন তাহার ভিতর বাড়ীর পড়াও ধরা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের স্কুলের যে কাজ বাড়ী বহিয়া আনিতে হয় তাহাতে সকালে বিকালে প্রত্যহ তাহাদের দুই হইতে চারি ঘণ্টা সময় যায়। সুতরাং রবিবার বাদ দিলে মোট পড়া দাঁড়ায় সপ্তাহে ৪০ হইতে ৫২ ঘণ্টা। অত শিশুদের আমাদের দেশেও ৪ ঘণ্টা ক্লাশ হয় শুনি। কলিকাতায় অনেক বালিকাবিদ্যালয়েও ইউরোপীয় স্কুলে সাপ্তাহিক ছুটি বেশী। কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলের সমস্ত পড়া ও লেখা বাড়ী হইতে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। স্কুলে পাঠের সময় কিছু বাড়াইয়াও ছাত্রছাত্রীদের বাড়ীতে বহিবার এই বোঝা যদি কমাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বেশী হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। আজকালকার স্কুল পরীক্ষা লইবার জায়গা। বাড়ীতে অভিভাবক কিম্বা গৃহশিক্ষক পড়া করাইয়া দেন, স্কুলে শিক্ষকেরা তাহার পরীক্ষা লন। তা না করিয়া যদি স্কুলেই তাহাদের পাঠশিক্ষা ও পাঠ চর্চ্চাটা হওয়া

সম্ভবহইত তাহা হইলে এত গুলি ঘণ্টা বই মুখে করিয়া বসিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না।

অবশ্য এই ব্যবস্থা ব্যয়সাধ্য। গৃহশিক্ষকের মত পড়া করাইয়া দিতে হইলে স্কুলের সকল ক্লাশই খুব ছোট হওয়া দরকার এবং শিক্ষক ও স্কুলের সংখ্যাও অনেক বাড়া দরকার।

ছোট ছেলেমেয়েদের ঘুমের সময়ও আমাদের দেশে অত্যন্ত কম। যাহারা স্কুলে যায় তাহারা ৫।৬ বৎসর বয়সেও দিনে ঘুমাইবার কোন সময় পায় না। সকালে স্কুলের জন্য তৈয়ারী হইতে হয় বলিয়া ভোরেই উঠিতে হয়। সন্ধ্যায় যদি গৃহশিক্ষক আসেন তাহা হইলে পড়া ও খাওয়াদাওয়া সারিয়া রাত্রি ৯½ টার আগে কেহ ঘুমাইতে পায় না। ৯½টা হইতে ৫½ ধরিলে মোট ঘুম হয় ৮ ঘণ্টা মাত্র। একটু উপরের ক্লাশে উঠিলেই শুইতে হয় রাত্রি ১০½টা সুতরাং তখন ঘুমের সময় দাঁড়ায় ৭ঘণ্টা।

মেয়েদের স্কুলে গাড়ী করিয়া যাইতে হয় বলিয়া মেয়েদের বিশ্রামের সময় আরও কম। অনেক মেয়েকেই ৮টা ৮½ টায় গাড়ীর জন্য তৈরি থাকিতে হয় এবং বাড়ী ফিরিতে পাঁচটা বাজে। এই সাড়ে আটঘণ্টার পর বাড়ীতে দুই হইতে চারি ঘণ্টা পড়া এবং অন্তত সাত ঘণ্টা ঘুমাইলেও বিশ্রাম খেলাধুলা খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির সময় অতি সামান্যই থাকে।

এই বিষয়ে আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও শিশুদের অভিভাবকেরা আর একটু মন দিলে ভাল হয়।

সভ্যতার রূপ

শ্রীগৌরী দেবী ভারতী

ইটালি আবিসিনিয়া অধিকার করার পর হইতে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী তাহার বিরুদ্ধে শুধু কৃষ্ণ ও পীতাঙ্গ নয়-শ্বেতাঙ্গগণ পর্য্যন্ত একটানা ছি ছি করিতেছে যেন এরূপ ঘটনা কোন দিন কেহ দেখে নাই শোনে নাই। কিন্তু তিক্ত কুইনিন চোখ বুজিয়া মুখে পুরিয়া মিষ্টি বলিলেই উহা মধুর হইবে না তিক্ততা থাকিবেই, তেমনি দেখি নাই শুনি নাই বলিলেই ইতিহাসের নিষ্ঠুর সত্য মিথ্যায় রূপান্তরিত হইবে না।

রেনেশাঁসের পর সহস্র বৎসরের সীমাবদ্ধ দিগ্বলয় রেখা অসীমে প্রসারিত হইল—মানুষ নিজেকে ও বহির্জগৎকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিয়া আত্মস্থ করিতে সংকল্প করিল। অন্তরের ও বাহিরের সীমাহীন অতলস্পর্শী সমুদ্রের কল্পনাতীত রহস্যকে উদ্ঘাটিত করিবার জন্য দুঃসাহসী নবযৌবনোদ্বেলিত ইউরোপ নিরুদ্দেশের যাত্রী হইল—যেপথকে কাল ঘনতিমিরাবৃত করিয়া সুদীর্ঘ দিন গোপনে রাখিয়াছিল। নিষ্ঠা ও তীব্র ইচ্ছার আলোতে সে অন্ধকার কাঁপিয়া কাঁপিয়া সরিয়া গেল—দূরে ধীরে ধীরে দেখা গেল নূতন মহাদেশ আমেরিকা—কিন্তু ইহা হইতেও বিস্ময়কর মহাদেশ আবিষ্কৃত হইল অন্তরে—সাহিত্য-ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রে।

আমেরিকা হইতে সম্পদ আহরণ করিতে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি যাইতে লাগিল। সম্পদের নিকট, মানুষের সভ্যতা বলিতে যাহা বুঝায়—ধর্ম্ম-দয়া-সংস্কৃতি সব তুচ্ছ হইয়া গেল। মানুষের প্রাণের মূল্য রহিলনা। এমন করিয়া বুঝি পশুকেও নিশ্চিহ্ন করিয়া মারেনা। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রহিলনা—মানুষের স্বাধীন সত্বা বলিয়া কিছুই রহিলনা। অনেকে নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হইল—অনেকে মৃত্যুকে আপন মনে করিয়া বিষাক্ত লতাপাতা খাইয়া মরিয়া রক্ষা পাইল। যাহারা পলাইতে পারিলনা তাহারা দাস হইয়া রহিল। যাহারা পলাইতে পারিল তাহারা বন্য পশুকে কম হিংস্র মনে করিয়া তাহাদের মধ্যে গিয়া বাস করিল। এমনি যখন হইতেছিল তখন সমুদ্রের এপারে ওপারে গির্জ্জায় গির্জ্জায় যীশুর প্রার্থনা সঙ্গীত হইতেছিল—ভগবানের মহিমা ঘোষিত হইতেছিল।

স্পেন তখন পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেছিল। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়া তাহার সংস্কৃতি সকলকে গৌরবান্বিত করিবে, মানবকে সভ্যতার দিকে আর একধাপ অগ্রসর করাইয়া দিবে। বর্ব্বরতাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া যাইবেনা। ইহারই জন্য প্রাচীন অরণ্যের অন্ধকারে যাহারা ছিল—তাহাদের টানিয়া বাহির করিয়া নরমেধযজ্ঞ আরম্ভ করিল। এই ভাবেই আধুনিক ইউরোপ সভ্যতার রথ লইয়া বাহির হয়।

আমেরিকাতে উপনিবেশ ও সম্পদ সংগ্রহের জন্য প্রভু যীশুর শিষ্যগণ সভ্যতার যে নিদর্শন দেখাইয়াছে—বিজ্ঞান ও ধর্ম্মজগতের চিন্তাধারায় ক্রম বিকাশের সময়ও ইহারা বাইবেল মাথায় ঠেকাইয়া শান্তছেলের মত চুপ করিয়া বসিয়া ছিলনা। কুকুরে কামড়াইলে শুনিয়াছি জলাতঙ্ক হয়। ইউরোপকেও কেমন করিয়া একদিন 'ডাইনী'র আতঙ্ক পাইয়া বসিল। সমাজ-সংসার হইতে ভূত ছাড়াইবার জন্য কত হাজার নারী ও পুরুষকে আগুনে পুড়িয়া ও জলে ডুবিয়া মরিতে হইয়াছে তাহার হিসাব করা কঠিন। ক্রুণোও জোয়ান অব আর্কের চিতাগ্নির একঝলকের আলোতে দেখিলাম খৃষ্টান ইউরোপ বুকে ক্রস ও হাতে বাইবেল লইয়া চলিয়াছে "Council of blood" "Massacre of st. Bartholomew" সন্ধ্যার রক্ত মেঘের মত উঁকি মারিতেছে, গাষ্টভাষের ছিন্ন শির বর্শা ফলকে তুলিয়া নিষ্ঠুর মৃত্যুর মত হাসিতেছে। স্পেনের সাম্রাজ্য মহিমা—মানুষের মনে চিরন্তন অভিশাপের মত জাগরুক থাকিয়া স্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল।

রাত্রির গর্ভ হইতে দিন যেরূপ অম্লানরূপে বাহির হইয়া আসে স্পেন সাম্রাজ্যাবসানের ঘনান্ধকার হইতে চতুর্দ্দশ লুইর সাম্রাজ্য বাহির হইয়া আসিল। নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যেসব যুদ্ধ করিয়াছেন, সন্ধি করিয়া সুবিধামত অস্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপের অন্যান্য শক্তিও সেই সাথে যেসব কার্য্য করিয়াছে তাহা সমর্থন করা সম্ভব নয়। এই ভাবেই রাশিয়ায় কেথারিন দি গ্রেট সাম্রাজ্য বিস্তারের কল্পনা করিয়াছেন। ফেডারিক দি গ্রেটের ফাইলেসিয়া আক্রমণ ও অধিকার, রুশিয়া, প্রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার পোলাণ্ডের বিভক্তিকরণ, ইংলণ্ডের ও পাশ্চাত্যের প্রায় প্রত্যেক জাতির এশিয়া ও আফ্রিকাকে লুণ্ঠন ও অধিকারকে সমর্থন, বর্ত্তমান সভ্যতার এ চিরন্তন রূপ। মুসোলিনি ও হিটলারের অন্যায় ভাবে পররাজ্য আক্রমণনীতি নূতন নহে। ইউরোপের গত শতাব্দীগুলির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিব এমন কোন জাতি নাই যাহারা অন্যের স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করিয়াছে, এমন কোন দেশ নাই যে সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে অথবা সুবিধা পাইলে পররাজ্য আক্রমণ নীতি হইতে বিরত রহিয়াছে। শবলুব্ধ গৃধ্রদের মত ইহারা এশিয়া আফ্রিকা ও অন্যান্য মহাদেশের বুকে বসিয়াছে। কে কার চেয়ে বেশী ছিঁড়িয়া লইবে তাহা লইয়া পরস্পর পরস্পরকে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে। ইহাদের কর্কশ ও ইতর শব্দে ডান্টে, গেটে সেক্‌সপিয়ারের কণ্ঠ ডুবিয়া গেল।

আজ যখন—অনেকে ইংরেজ ফরাসিকে, চীন-জাপান, স্পেনিশ ও আবিসিনিয়ার যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার জন্য তিরস্কার করেন, জার্মেনীর অষ্ট্রিয়া অধিকারের সময়ও ইহারা দর্শক হিসাবে থাকার জন্য আদর্শবাদের কথা তুলিয়া তাহাদের মনকে চেতন করিয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করিতে উপদেশ দেন, তখন হাসিও পায় দুঃখও আসে। জানিতে ইচ্ছা হয় ইহাদের মধ্যে কোন জাতিটী শুধু আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিয়াছে? রাণী এলিজাবেথ হইতে ইংরেজ বেলজিয়াম ও হলেণ্ডের চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে ও অনেক যুদ্ধে হস্তক্ষেপও করিয়াছে। সেকি বিনা স্বার্থে? ফ্রান্স ও জার্ম্মেনির মধ্যে যে কেহই ইহাদের অধিকার করুক না কেন ইংরেজ তাহা সহ্য

করিবেনা। কারণ ইহা যে অধিকার করিবে ভৌগলিক অবস্থানের দ্বারা সে ইউরোপের শ্রেষ্ঠ নৌ-বহর করিতে পারিবে। জার্ম্মেনি ও ফ্রান্সের মধ্যে Buffer state হিসাবেও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ বেলজিয়ামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল—নিছক আদর্শ বাদের জন্য নহে, তাহার স্বাধীনতা তাহার স্বার্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলিয়াই। ইংরেজের সদাজাগ্রত চক্ষুছিল জার্ম্মেনির নৌশক্তির উপর। ফ্রেঙ্কো-জার্মেন যুদ্ধের পর জার্মেনি ইউরোপে শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল। তাহার উপর যখন এক অতি প্রবল নৌবাহিনী নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিল তখন ইংরেজ বিপদ গণিল। যদি জার্মেনি ফরাসিকে পরাজিত করিয়া বেলজিয়ামকে অধিকার করে তাহা হইলে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য আর থাকিবে না Rule Britannia সঙ্গীত মাঝখানেই থামিয়া যাইবে। জার্মেনির যদি ঐরূপ ক্রমবর্দ্ধমান শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকিত তাহা হইলে হয়ত এ্যাংলো-জার্মেন বিরোধ ১৯১৪তেই আরম্ভ হইতনা।

গত কয়েক শতাব্দী হইতে ইংরেজের প্রধান রাজনীতিই হইল এই যে, শক্তি যখন প্রবল হয় তাহার বিরুদ্ধে শুধু দলের পর দল গঠন করা। এই জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া অর্থ ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিতেও অনেক সময় পশ্চাদপদ হয় নাই। এই ভাবেই নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে, পরে রাশিয়ার ও তারপর জার্মেনির বিরুদ্ধে দল গঠন করিয়াছে। ইংরেজ সৈন্য ফ্রান্সে তুরস্কে মরিয়াছে স্বার্থ রক্ষার জন্যই। শুধু ইংরেজ নয় প্রত্যেক জাতিই এক উদ্দেশে যুদ্ধে নামিয়াছে। যে পর্য্যন্ত না পূর্ণভাবে ইহাদের স্বার্থে আঘাত না পড়িবে সে পর্য্যন্ত ইহাদের চেতন করা যাইবেনা—ঢাক বাজাইয়া ভাঙিয়া ফেলিলেও নহে।

বিশাল সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার নিকট আবিসিনিয়া চীন বা স্পেনের স্বাধীনতার মূল্য কিছুই নহে। যে ইটালি, জাপ, জার্মেন তাহাকে এত অপমানিত করিতেছে নিজের হাতে গড়া সন্ধি পত্র ছিড়িয়া ফেলিতেছে ইংরাজ প্রয়োজন মনে করিলে কালই ফান্সের স্বার্থ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের সাথে সন্ধি করিতে পারে।

ইউরোপের পশ্চাতে একটী প্রচণ্ড শক্তি রহিয়াছে। ইহার নাম পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌। সর্ব্বভুক অগ্নির মত ইউরোপকে গ্রাস করিয়া এশিয়ার দিকে এখন লক্ষ্য রাখিয়াছে। প্রাচ্য জাতিদের মধ্যে জাপানই তাহাকে প্রথম গ্রহণ করিয়াছে। ব্যক্তির জীবনে আদর্শ থাকে আবার অসংখ্য মানুষের অসংখ্য ভাষা ও সহস্র অসামঞ্জস্যকে অতিক্রম করিয়া একটী জাতিগত আদর্শ থাকে যাহা বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া জাতির চিন্তধারাকে একস্রোতে প্রবাহিত করে, এক কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। এই জাতিগত আদর্শ যদি প্রাত্যহিক জীবন ধারার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে না পারে অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে যাহা অন্যায় বলিয়া মনে হয় জাতিগত হিসাবে যদি তাহাই পূণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় তাহা হইলে জাতির আদর্শে একটা মস্তবড় গলদ থাকিয়া যায়। ঐ বৈষম্য সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে ও সাহিত্যে প্রচণ্ড বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়া এতবড় ঘাত প্রতিঘাতের

সৃষ্টি করে যাহার ফলে মানুষ দিশাহারা হইয়া চিন্তাজগতে ক্রমশঃ অবসন্নতা বোধকরে। পরস্পর বিরোধীভাব তাহাকে অকল্যাণের পথে নিয়া যায়।

কোন রাষ্ট্রে, শান্তির সময় অর্থাৎ অন্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে যদি কেহ খুন করে, দস্যুতা করে, মেয়েদের উপর অত্যাচার করে তাহা হইলে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু একটী জাতি যখন অপর একটী জাতিকে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিতে থাকে, ঘর বাড়ী শস্যাদি জ্বালাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়, গ্যাস ও বোমাদ্বারা ছেলেমেদের এমনকি গৃহপালিত পশুগুলিকে পর্য্যন্ত মরণাধিক যন্ত্রণা দিয়া যুদ্ধ জয়ের স্বপ্ন দেখিতে থাকে তখন সাহিত্যিক ও কবি তাহাদের উদ্দ্যেশে শত শত কবিতা ও পুস্তক লেখেন, দেশবাসী তাহাদের বরমাল্য দান করে আর তাহাদের স্মৃতির উদ্দেশে প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। যে যত অকম্পিত ভাবে মানুষ মারিতেপারে সেই তত বড় বীর বলিয়া পরিগণিত হইয়া ভিক্টোরিয়া বা আয়রণ ক্রস পায়। এই ভাবেই লুসিটেনিয়া জাহাজ ডুবে, লুভেনের বিশ্ববিদ্যালয়, বা মড্রিডের রাস্তায় ফুলের মত সুন্দর শিশুরা মুহূর্ত্তে নিশ্চিহ্ন হয়।

বহুদিন পূর্ব্বে আলেকজেণ্ড্রিয়ার গ্রন্থাগার পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল মানুষের হিংস্রতার নিকট উহা রক্ষা পায় নাই, তারপর এমনি করিয়া দেশে দেশে গ্রন্থাগার, বিহার জ্বলিয়া জ্বলিয়া মানুষের বর্ব্বরতার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে। মহাযুদ্ধের সময় গির্জ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া কিছুই কামানের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত গুণ্ডামির নিকট হইতে আত্মরক্ষা করা যায় কিন্তু একটা জাতি যখন গুণ্ডামি আরম্ভ করে তখন সে কিছুতেই বাধা মানে না। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, ভাবুক যাঁহারা মানবের চিরন্তনসত্য অনুভব করিয়া সত্য, শিব, সুন্দরের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা দ্বিধাহীন ভাবে উহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে—একমুহূর্ত্তে শতাব্দী-সঞ্চিত ভাব ও চিন্তাধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া সভ্যতার শুভ্রশতদল শিল্প ও সাহিত্যকে বিনাশ করিতে পারে তাহাদিগকে কি বলিয়া অভিহিত করা যায় ভাবিয়া পাইনা। অতীতে অনেক জাতি অতীতের মহিমাকে মুছিয়া ফেলিয়াছে। ইহার সাথে পরিচিত ছিলনা, এরূপ সৃষ্টির সাথে তাহাদের জীবন ধারার যোগ ছিলনা বলিয়া হয়ত ক্ষমা করা যাইতে পারে কিন্তু পাশ্চত্য জতিরা অথবা জাপানীরা যখন ঐরূপ ধ্বংসে মাতিয়া ওঠে তখন তাহাদের বর্ব্বরতায় তৈমুরও লজ্জা পাইবে। পেট্রিয়টিজ্ম, সাম্রাজ্যের স্বপ্নে মানুষকে মাতালের চেয়েও বেশী মাতাল করিয়াছে। পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কোটি কোটি পাউণ্ড যখন অস্ত্রবৃদ্ধির জন্য ব্যয় করা হয় তখন দেশের অসংখ্য লোক অর্থাভাবে ভাল করিয়া দুইবেলা খাইতে পারে না, শীতেরদিনে আগুনের অভাবে কত লোক অবর্ণনীয় কষ্ট পায় কে তাহার সন্ধান রাখে?

সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন। কে যুদ্ধ করে? ইচ্ছা করিয়া কেহত সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইতে চাহেনা। Conscription বসে। কেহ বাদ যায়না,—কৃষক, শ্রমিক, অধ্যাপক, শিল্পী, পথে পথে সৈন্য বেওনেট উচু করিয়া চলে, বুটের শব্দ নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া দেয়, ভেরী বাজিয়া ওঠে।

তার পর একদিন রাজ নীতিজ্ঞ যুদ্ধ ঘোষণা করে। বক্তা দেশের জন্য সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে বলে। অধ্যাপক ছাত্রদিকে যুদ্ধ করিতে বলে। সবাই বলে যুদ্ধ কর! যুদ্ধ কর! আবার গির্জ্জায় গির্জ্জায় প্রার্থনা ওঠে...... .....

মানুষ দিনের বেলায় মুক্ত বাতাসে ইচ্ছামত থাকিতে পারেনা, মাটির নীচে ভয়ে চুপ করিয়া কোনমতে প্রাণ লইয়া থাকে। ভগবানের সুন্দরতম সৃষ্টি আকাশকে দেখিবার ক্ষমতা আর থাকেনা চতুদ্দিকে শুধু বিষাক্ত গ্যাস্! গ্যাস্! গ্যাস্! রাত্রি বেলায় আলো আর জ্বলেনা! আশে পাশে শুধু মৃত্যু তাকাইয়া থাকে হাঁসপাতালের উপর বোমা পড়ে...........

জাতিসংঘ সভাবসে—জোরালো বক্তৃতা চলে, ইংরেজ ইটালিকে আদ্দিস আবা বায় বোমা ফেলার জন্য তিরস্কার করে, পরের দিন দেখি অসভ্য পাঠানদের সভ্য করিবার জন্য ইংরেজের বিমান হইতে বোমা ফেলা হইতেছে প্রতিদিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তাহাদিগকে ভদ্র করার ব্যবস্থ চলিতেছে।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা! গবেষণাগারে বৈজ্ঞানিকদল ভীষণ ভীষণ মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেশের কাজ করিতেছেন! দেশে আর এখন আর লোক মহামারীতে মরেনা, ব্যাধিকে পরাজিত করা হইয়াছে কিন্তু সুস্থ সবল লোকদিগকে যুদ্ধের জন্য বাছিয়া রাখা হয়। ওখানেই উহারা আপনার স্থান সন্ধান করিয়া লইবে, ট্রেঞ্চে যুদ্ধ চলে, চতুর্দ্দিকে মৃত্যুর বিভীষিকা। জার্মেন ফরাসি সৈন্যকে হত্যা করিয়া ভাবে—

"Comrade, I did not want to kill you. If you jumped in here again, I would not do it, if you would be sensible too. But you were only an idea to me before, an abstraction that lived in my mind and called forth its appropriate response. It was that abstraction I stabbed. But now, for the first time, I see you are a man like me. I thought of your hand-grenades of your bayonet, of your rifle, now I see your wife and your face and our fellowships. Forgive me comrade. We always see it, too late, why do they never tell us that you are just poordevils like us, that your mothers are just as anxious as ours, and that we have the same fear of death, and the same dying and the same agony—. Forgive me, comrade; how could you be my enemy?

অনাহার ক্লিষ্ট মানুষের অন্তরের ব্যথাকে উপেক্ষা করিয়া চাবুক মারিয়া যাহারা ইচ্ছামত পশুর মত কাজ করাইতেছে তাহাদের নাম পেট্রিয়ট, কেপিটালিষ্ট্ ইম্পিরিয়ালিষ্ট।

মানুষ

(গল্প)

শ্রীহাসিরাণী দেবী

'ভোঁ' প'ড়বার সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায় কারখানার প্রকাণ্ড ফটক, তারপরে উন্মত্ত জলস্রোতের মত বার হ'য়ে আসে শ্রমিকের দল।

কর্ম্মান্তের ক্লান্তি তো ওদের দৃষ্টিতে, মুখে আঁকা তৃপ্তির আনন্দ।

দীর্ঘ আটঘণ্টা কাজ করার পর ওরা আবার কয়েকঘণ্টার মত বিশ্রাম করতে পারবে,—এই আনন্দে মন ভরপূর। আশায় মন ভ'রে কেউ দ্রুত, কেউবা ক্লান্ত গতিতে চলে কোয়ার্টারের উদ্দেশ্যে, যেখানে বিশাল বিশ্বের অন্তহীন কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে, সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য, সমস্ত রোগশোককেও উপেক্ষা ক'রে, এতটুকু শান্তি, এতটুকু আনন্দের আশায় ওরা ক্ষুদ্র নীড় রচনা ক'রেছে—দেহমনের সবটুকু শক্তি দিয়ে।

সনাতনও একদিন তার দারিদ্র্য-অনশন-ক্লিষ্ট, জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে, মনের সবটুকু শক্তির বিনিময়ে ক'রে নিল এদেরই মধ্যে এতটুকু স্থান, যেখানে সে একখানা হাততিনেক খাটিয়া পেতে শীত-গ্রীষ্মেও হাত পা মেলে নিশ্চিন্তে শুতে পারে, আর ঐ দাওয়ারই এককোণে চুল্লী জ্বেলে দু'টি চাল ডাল ফুটিয়েও পারে পেট ভরাতে। একা মানুষ সে; একটা মাত্র ঘটি আর কম্বল সম্বল ক'রে যেদিন সে এই শহরে এসেছিল, সেদিনটা বর্ষার কি বসন্তের ছিল, তা ঠিক মনে নেই, কিন্তু মনে পড়ে সেই দুর্দ্দিনে সহযোগীদের তার প্রতি করুণ সহানুভূতি! সনাতন ছিল ঐ কারখানার লোহার ফটকটার সামনে ঐ শুক্‌নো গাছটার গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ব'সে। তিন চারদিনের অভুক্ত অবস্থায়, ব্যর্থ পরিশ্রম-ক্লান্ত পা' দুটো যেন আর চলছিল না, মাথাটাও বিশ মণ বোঝার মত ঝুঁকে প'ড়েছিল বুকের ওপোর।

কিন্তু না; তাকে উঠতে হবে, আহার্য্যের সন্ধান ক'রতে হবে, বাঁচতে হবে;—

সে বাঁচা মানুষের মত না হোক—অন্ততঃ পশুর মতও হ'য়ে বাঁচা। এই, এত তাড়াতাড়ি,—জীবনের এই অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে সে রাজী নয়।

ম'রতে সে পারবে না কিছুতেই,—জীবনের এই অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে সে রাজী নয়।

মরতে সে পারবে না কিছুতেই, মরণে তার বড় ভয়।

কতক্ষণ এইভাবে কেটে গিয়েছিল সনাতন জানেনা, জানলো একটা ভীষণ 'ভোঁ' শব্দে।

কানের ভেতর দিয়ে সে শব্দ মাথা পর্য্যন্ত চড়্‌ চড়্‌ ক'রে উঠলো; মাথা তুলে সনাতন দেখলে এতক্ষণের বন্ধ ঐ লোহার ফটকটা হাঁ ক'রে যেন বিশ্বমানবকে উজাড় ক'রে দিচ্ছে।

এক এক ক'রে জনকয়েক, তারপর আরও, আরও জনকতক এসে তার আশে পাশে যে ভিড় জমিয়ে তুললো, সেই ভিড় থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন এসে প'ড়তে লাগলো—

"কে তুমি ?"

"এ অবস্থা কেন ?

কি চাও ?"

উত্তরে সনাতন জানালে—

অন্ন, শুধু একমুষ্ঠি অন্নের জন্যই সে এই তিন দিন অনাহারে বারো ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে এসেছে।

চাই অন্ন, না হ'লে এখান থেকে উঠবে না ; মরবে ; মাথা খুঁড়ে, রক্তারক্তি হ'য়ে মরবে ; ঐ লোহার ফটকের গায়ে মাখিয়ে রেখে যাবে—বিশ্বমানবতার ইতিহাসে সেই কলঙ্ক কালিমা।......

কেউ ব'ললে—

আহা ঃ—

কেউ ব'ললে—

তাইতো !...

কিন্তু, কি করা যায় !...

অনেক ভেবে সেদিনকার মত আহার্য্য দিয়ে তারা চ'লে গেল, ব'লে গেল এর ব্যবস্থা তারা শীগ্‌গিরই ক'রবে।

কিন্তু পারলে না ;

হতাশ সনাতন কিন্তু মৃত্যুর প্রতীক্ষা ক'রতে ক'রতে বেঁচে গেল একদিন ধর্ম্মঘটের সময় কাজ ক'রে।

যারা এতদিন নিজেদের কায়ক্লেশের অন্নের ভাগ তাকে দিয়েছিল তাদেরই প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাদের দানের অপমান ক'রে।...

তবু একদিন, যেদিন সনাতনও আর সকলের মত মাসকাবারের মাইনে হাতে নিয়ে আনন্দ ক'রতে ক'রতে বাসায় ফিরলো, সেদিন এরা সকলেই ভুললো এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা, ভুললো এর আগে ওর দীনহীন অবস্থার কথা,—ভুললো সব। ঠাট্টা ক'রে ব'ললে—

বুঝ্‌লে স্যাঙাৎ, আহারও জুটলো, ঘরেরও অভাব রইল না, শুধু ঘরণীর অভাব ; কিন্তু সেটাই বা থাকে কেন ? একদিন শুভলগ্নে সেটাও শেষ ক'রে জীবনের বড় কর্ত্তব্যটা পুরিয়ে ফেল, অভাব থাকে কেন ?

যতই ঘর ভরাও ধনে রত্নে, কিন্তু সে'জন না থাকলে বেবাক ফাঁকি ও ফাঁকি আর কেউ ভ'রতে পারবে না।"

কথাটা সনাতন শুনলে মন দিয়ে, হাসলোও একটু, কিন্তু কোনও উত্তর দিলে না।

হয়তো ইচ্ছে ক'রেই।

বাসায় এসে এক ক'লকে তামাক সেজে নিয়ে গিয়ে ব'সলো সেই দড়ীর খাটিয়াটার ওপর, তারপরে মনে মনে হিসেব ক'রতে লাগলো তার গত জীবনের চৌতিরিশটা বছরের জমা-খরচের।

মিলিয়ে দেখলে যে চৌতিরিশটা বছর সে বর্ত্তমানের পেছনে ফেলে এসেছে, তাতে জমার চেয়ে খরচের অঙ্কটাই ধরা হ'য়েছে বেশী, লাভ বড় কিছু নেই—লোকশান ছাড়া এই গত দীর্ঘ ঐ বছরগুলোর মধ্যে কবে যে বসন্ত এসেছে কি গেছে, সে খবর সে রাখেনি, তাসপাশা খেলায় এত সময় কাটিয়ে এসে যখন বর্ত্তমানের পেছনে দৃষ্টিপাত ক'রলে, তখন দেখলে বাপের যা কিছু বিষয়-আশয় তারজন্য জমা ছিল সমস্তই দেনার দায়ে গিয়ে উঠেছে নীলামে ; খাবার জন্য যেমন কিছু বাকী নেই, তেমনি নেই মাথা গুঁজে দাঁড়াবার জায়গা , শুধু প'ড়ে আছে তাস পাশা খেলার খান ছুই ছক, আর দাবাব'ড়ে গুলো। মনে ঔদাস্য জেগেছিল, তাই এগুলোর মায়া সনাতন কাটিয়ে ফেললে অতি সহজেই ;

ছক দুটোকে ছিঁড়ে খুঁড়ে আর ব'ড়ে গুলোকে এধার ওধার ছড়িয়ে ফেলে সে বার হ'য়ে প'ড়লো রাজপথে।

দূরবর্ত্তী শহর তার লক্ষ্য।

সেখানে সে যাবে ; অনেক কাজ, অনেক মানুষ সেখানে, কেউ না খেয়ে মরে না, সেও মরবে না, বাঁচবে ; কাজ ক'রে খেয়ে, বেড়িয়ে বাঁচবে।

সনাতন শেষরাত্রে শয্যাত্যাগ করে ;—

ডাল ভাত ফোটায়, খায়, তারপরে কাজে যায় সকাল ছটায় "ভোঁ" প'ড়লে, কাজ থেকে যখন ফেরে, তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে ধোঁয়া আর ধূলো মিলে শহরের আকাশ হোয়ে ওঠে গাঢ় ধূসরবর্ণ।

সেই ধূম-ধূসরতায় দুই একটি তারা ফোটে বটে, কিন্তু তাও অস্পষ্ট, ভালো দেখা যায় না।

কাজের মাঝখানে সনাতন টিফিন-ঘণ্টা পায় বটে, কিন্তু সেটাও পূর্ণ করে টুক্‌রো কাজ দিয়ে। কারণ, তাকে পয়সা উপার্জ্জন ক'রতে হবে, অভাবের কষ্ট দূর করাই এখন তার জীবনের মূলমন্ত্র।

কিন্তু জীবনের ওপোর দিয়ে যে দীর্ঘ চৌতিরিশটা বছর চ'লে গেছে—ততদিন যে ক্ষতি তার সমস্ত দেহে, সমস্ত মন ভ'রে হ'য়েছে সে ক্ষতি সে পূর্ণ ক'রবে কেমন ক'রে কি দিয়ে! যে ভুল ভ্রান্তির বোঝা অল্প নয়,—তা কমালেও, সে ব্যথার স্মৃতি কি মোছা যায়! কেমন ক'রে সে ঐ পূর্ণ স্বাস্থ্য সবলদেহ, তরুণ সহযোগীদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা ক'রবে।

ভেবে ভেবে সে অন্যমনা হ'য়ে পড়ে ;

একটানা ব্লক ; ছোট ছোট ভাগ ক'রে নম্বর এঁটে একেই ক'রে তোলা হ'য়েছে বাসোপযোগী।

দুপাশে সারি দেওয়া ব্লকের মাঝে মাঝে খানিকটা ক'রে খালি জায়গা, পথ চলবার জন্যে ;

যেন কলির বিশ্বকর্ম্মার কেরামতি দেখাতে তার সৃষ্ট লোকালয়টি মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এরই মধ্যে বাস করে বাঙ্গালী আর অ-বাঙ্গালী, কিন্তু গলাগলি ক'রে নয় ; ঝগড়া ক'রে, মারামারি ক'রে।

নিত্যনিয়মিত এই ঝগড়া মারামারি তো হয়ই, আরো লেগে আছে বচসা আর গালি গালাজ।

এসবের মূল হয় একবিঘৎ জায়গা, নয় বড়জোর কয়েকটা পয়সা, এর বেশী আর কিছু নয়।

একদিন যদি এদের ভেতর লাঠালাঠিও হয়, পরদিন মিটতে মোটে দেরী হয় না, বড়জোর যদি জের টানতে হয়তো দু'দিন কি চারদিন, তারপরেই যথা পূর্ব্বং তথা পরং।

কোথাও শোনা যায় ক্রন্দন, কোথাও শোনা যায় সস্তাদামের হারমোনিয়মের সঙ্গে সুরে বেসুরে সঙ্গীতালাপ।

এরই মধ্যে কাটাতে হয় প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতিদিন, হয়তো জীবনও।

সনাতনও থাকে এরই মধ্যে।

ওর এপাশে, ওপাশে, সামনে, পেছন—বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালীতে ভরা।

কিন্তু কথাবার্ত্তা চলে ভাঙ্গা বাংলাতেই।

অবসর সময়ে সনাতন কথা কয় ; বলে—

"কি হ'চ্ছে তোমাদের ?"

ওরা উত্তর দেয়—

খাওয়া, আর তার ব্যবস্থা ; যা চিরদিন হ'য়ে আসছে।

ব'লে একটু হাসে ; সে হাসি যেন নৈরাশ্যের। পরে বলে—

"খেলবে ? তাস ?"

সন্ধ্যার পর বিশ্রামটা বেশ আরামদায়ক কি না !

সনাতন কিন্তু শিউরে ওঠে ; বলে—

"তাস ? না ; খেলবার সময় কোথায় ? খাটা খাটুনীর শরীর এখন একটু খেয়ে দেয়ে শুতে পারলে বাঁচি। শরীরে আর বয়না ভায়া, বয়না ; হাজার হোক, বয়েস হ'লো তো !"

ওরা হাসে ;

বলে—

"বয়েস হ'লো, তোমার ? বল কি দাদা ? কে বললে এসব কথা, বলোতো, দেখে নেই তাকে একবার। হ্যাঁ, যতসব ইয়ে।

তার চেয়ে মাইরি ব'লছি দাদা, তোমার ঐ আট হাত ধুতি আর বুক কাটা কোট ছেড়ে

একখানা শান্তিপুরে ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে একেবারে বেরিয়ে পড়োতো, দেখে নেই একবার, কি ব'লবার ক্ষমতা আছে কার! ইয়ার্কি নাকি?—

সনাতনের কুঞ্চিত শুষ্ক ওষ্ঠাধর খুশীর হাসিতে এতটুকু কেঁপে বড় হয়, কিন্তু কথা কয় না।

ওরা বলে—

"সে যাই হোক দাদা, ঘর শূন্য কিন্তু আর ভালো দেখায় না; হাজার হোক বিয়ের বয়েস যখন আছে, আর কাজও যখন পেয়েছে, তখন বড় পোষ্ট পাবার আশাও যে একেবারে নেই তা নয়—তবে………"

বাধা দিয়ে সনাতন জিজ্ঞেস করে—

"আমি যে বড় পোষ্ট পাব, তা জানলে কেমন করে?"

হিতার্থীরা হেসে বলে

"তা আর বলতে দাদা, ধর্ম্মের কল যে বাতাসে নড়ে, জানো না? বড় সায়েব যে তোমার ওপোর বড় খুশী……মাইরি দাদা, খাইয়ে দাও।"

হাসিতে সনাতনের বিকৃত মুখখানা যেন বিভৎস হ'য়ে উঠে, বলে—

"দেব বইকি খাইয়ে—বড়বাবু হই আগে নিশ্চয় খাওয়াব।"

মানুষের হিতচিন্তা মানুষেই ক'রে থাকে; তাই একদিন মিস্ত্রি শিবচরণের কন্যা আন্নাকালীর সঙ্গে সনাতনেরও বিবাহ হ'য়ে গেল ছাদনা তলায় পুরোহিতে মন্ত্র পাঠ ক'রে। সে বিয়েতে শাঁখ বাজলো কিনা কি হুলুধ্বনি প'ড়লো কিনা কে জানে, কিন্তু মিস্ত্রি শিবচরণ যে একটা ভবিষ্যৎ গুরু ভারের দায় থেকে নিস্তার পেলে, একথা জানলে সবাই, বুঝলেও সবাই; তাই তার মেয়ে আন্নাকালী কৈশোরেও প্রৌঢ় স্বামী সনাতনকেই আকড়ে ধরলো জীবনের আশ্রয় মনে ক'রে।

এতে আর যে যাই ঠাট্টা রসিকতা করুক না কেন, সনাতন যেন খুশীই হ'য়ে উঠলো অতিরিক্ত রকম।

মনে হ'লো এতদিন পরে তার দিশেহারা জীবনের একটী কূল কিনারা মিলেছে; তাই সব ভুল সব ভ্রান্তির শেষ করতে তার অন্ধকারময় জীবনে আলোর রেখা বহন ক'রে এনেছে ঐ শিবচরণের কুরূপা কুৎসিতা কন্যা আন্নাকালী।

কয়েক বৎসর কেটে গেছে;

সনাতনের জরা জীর্ণ দেহ আরও জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে আরও ঝুঁকে প'ড়েছে সামনের দিকে, কিন্তু কোঠরগত চোখ ছুটো হ'য়ে উঠেছে আরও তীব্র, আরও উজ্জ্বল।

সনাতনের স্ত্রী আন্নাকালী কুরূপা হ'লেও তার পয় আছে, তাই সে দিয়েছে এই কয় বছরে সনাতনকে কয়েকটি সন্তান উপহার; সেই সঙ্গে সনাতনের হ'য়েছে কাজের পদোন্নতি।

অনেক মাইনে, মস্ত বড় বাসা, আন্নাকালী আর ছেলে মেয়েদের নিয়ে সনাতন এখন সুখে আছে; ভুলে গেছে অতীত জীবনের সেই দুঃখ পূর্ণ ইতিহাস।

কিন্তু সেই খাটুনী আর খাটুনী ;

শরীর যেন আর বইতে চায় না, পারেও না, আর।

পয়সা আজ সনাতনের কাছে আসবার পথ খুঁজে পেয়েছে কিন্তু যে শক্তি আজ বিদায় প্রার্থনা ক'রছে তাকে সে ফিরিয়ে আনবে কেমন ক'রে ?·········

কলঙ্ক পড়া,—রূপোর ডাঁটি শুদ্ধ চশমাটা কপালের উপোর তুলে সনাতন তাই হিসেবের খাতা দেখতে দেখতে ভ্রূ কুঁচ্‌কায়, মুখ ভঙ্গি করে ; বলে—

"লোকগুলোর যদি মাথামুণ্ডু কিছু জ্ঞান থাকে ! হিসেব দিয়েছে না মাথা দিয়েছে—"

ব'লে খুঁটিয়ে দেখে হিসাবের খাতা। কুলীদের কাজের খুঁৎ ধ'রে, প্যাকারদের হুমকী দেয় ; বলে—

"ফাইন ক'রবো তোদের, জানিস ? তিনখানা রিপোর্ট এলেই কাজ যাবে, করিস্ তখন নবাবী ; কি খেয়ে করিস্, দেখে নেব।"

প্রথম প্রথম ওরা মনে ক'রতো এটা—সনাতনের সত্যিকারের রাগ নয়, আত্মীয়ের মত সস্নেহ তিরস্কারই হয়তো—কারণ সেও একদিন এদেরই মত কিম্বা এদের চেয়েও খারাপ অবস্থায় এসেছিল একমুষ্টি অন্নের সংস্থান ক'রতে ; না পেলে আত্মহত্যা ক'রে ম'রতে, কিন্তু মরলো তো না-ই, উপরন্তু একে ব'কে ওকে মেরে তাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করিয়ে তাড়াতাড়ি পদোন্নতি ক'রে ফেললে চাকরীর।

এই ব্যাপারের পর কেউ ওকে ব'ল্লে—

ভাগ্যমন্ত ;—

আবার কেউ ব'ললে...

বড় সায়েবের খয়ের খাঁ—!

যাইই সে হোক না কেন ; সনাতন কিন্তু তার জন্যে কারো কোনও দোষ ক্ষমা করেনা, বলে—

"নেমক খেয়ে হারামী করার মত কাজ সনাতনের নয় ; যার ভাত খেয়ে বাঁচ্‌ছি তার মঙ্গল চিন্তা ক'রবো আগে, পরে অন্য কাজ্‌ !

সনাতনের এই জবাব দিহি কিন্তু মনুষ্যত্বের দরবারে টিক্‌লো না, ফলে ধীরে ধীরে তার ওপোরে জ'মে উঠতে লাগলো বিপুল অসন্তুষ্টি, যে অসন্তুষ্টি ধার ধারলো না কোনো যুক্তি তর্কের।

আশ্রয়-হারা অন্নহারাদের ক্লেশ, বুভুক্ষা লিপি চোখের জলে লিখে বিধাতার দরবারে যারা আর্জ্জি পেশ ক'রলে, তারা মজুর :—

দারিদ্র্য আর চিরদুঃখপিষ্ট সেই হতভাগাদের মুখেরদিকে তাকিয়ে থাকে—অনেকগুলি পোষ্য, অনেকগুলি শিশু। আর তারাই, যারা একদিন নিজেদের মধ্যে বড় আপনি ভেবে গৃহহারা

খাদ্যহারা সনাতনকে স্থান দিয়েছিল, তারাই আজ খাদ্য, গৃহও হারিয়েছে বড়বাবু সনাতনেরই ব্যবস্থায়।

বর্ষা এসে প'ড়েছে বড় অসময়ে!

চারিদিকে শুধু বৃষ্টি পড়ার ঝম ঝম শব্দে কানে যেন তালা ধ'রে যায়।

সনাতন নিজের অফিস ঘরে ব'সে চোখ বুজে চুরুট-ফুঁক্‌ছিল। কাজের মধ্যে এইটুকু নিভৃত অবসর।

বাড়ীতে ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে আন্নাকালী এতক্ষণ কি ক'রছে কে জানে! দেখতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটার হ'য়েছে সর্দ্দি জ্বর, কি ক'রছে এতক্ষণ? ঘুমুচ্ছে হয়তো! নয় তো কাঁদ্‌ছে!

আর দুর্দ্দান্ত ছেলে দুটো? হয়তো তারা এতক্ষণ উঠোনে জমা হাঁটুখানেক জলে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে বৃষ্টিতে দৌড়া দৌড়ি ক'রছে, নয়তো মাছ ধরাধরি খেলছে আন্নাকালীকে লুকিয়ে।

কে জানে কি ক'রছে সব! গিয়েই শোনা যাবে সারাদিনের কান্নাকাটি আর খেলা ধূলোর ইতিহাস।

কিন্তু সত্যিই যদি আজ ছেলে দুটো ভিজে থাকে, মেয়েটা কেঁদে কেটে ঘুমায় আর আন্না-কালীর মেজাজ খিট্‌খিটে হয়, তবে হতভাগা চাকরটার আজ কাজ যাবে।

আর শুধু কাজেই যাবে না স্বয়ং সনাতনের শ্রীহস্ত-সেবাও তার অদৃষ্টে নিশ্চয় আছে।

সনাতন চুরুট্‌ ফোঁকে.....

হঠাৎ মনে প'ড়লো, আজ মাল দেবার কথা, দূর ষ্টেশানে......জরুরী কাজ... .তার এসেছে।

কিন্তু প্যাকার'রা, কুলীরা সব ক'রছে কি? কেউ এখনো হিসেব লেখাতে আসেনা কেন? কোথায় গেল ওরা? ওদের হাঁক ডাকই বা শোনা যাচ্ছে না কেন? নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আড্ডা দিচ্ছে, নয় ঘুমুচ্ছে নাক ডাকিয়ে!

ফাঁকি,..... শ্রেফ্‌ ফাঁকি......ফাঁকি দিয়ে মাইনে খাবে, আর তাকে একা বইতে হবে সব, এই সব ফাঁকি দেওয়ার দায়িত্ব; কেন? তা হবে না, হ'তে পারে না, অন্ততঃ সে যতক্ষণ আছে,—ততক্ষণ!

সনাতন উঠলো;—শুধু পায়ে অল্প বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চ'ললো কুলীদের আর প্যাকারদের খোঁজে।......

কিন্তু, কোথায় তারা? চারিদিকে অসম্পূর্ণ কাজের ভেতর দিয়ে সনাতন চ'ললো তাদের খোঁজ ক'রতে ক'রতে।

কিছুক্ষণ পরে দেখলে গুদাম ঘরের শেষপ্রান্তে তারা সবাই দাঁড়িয়ে সেই বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রেও যেন কার ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা শুনছে হাঁ ক'রে।

কাজে অবহেলা!—

সনাতনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বালা ক'রে উঠলো ; আজ প্রত্যেকের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দাখিল ক'রবে প্রতিজ্ঞা ক'রে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো জনতার পেছনে কেউ তাকে লক্ষ্য ক'রলে না ; শুনলে ওদের মধ্যে কে ব'লছে—

"আমাদের রুটী কেড়ে নিয়েছে, আশ্রয় কেড়ে নিয়ে পথে বার ক'রেছে পথের কুকুরের মত ; কিন্তু একদিন এমন অবস্থায় ও এসেছিল, যেদিন আমরাই দয়া ক'রে ওকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, খেতে দিয়েছিলাম......!

হঠাৎ একটা মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল—

ঐ, ঐ, ...ঐ সেই নিমকহারাম, যে আমাদের ঘর কেড়ে নিয়েছে, রুটী ছিনিয়ে নিয়েছে......

ভয়ার্ত্ত সনাতন হাত তুলে সেই বিক্ষুব্ধ জনতাকে কি ব'লে বোঝাবার চেষ্টা ক'রলে মাত্র, কিন্তু কেউ শুনলে না ; সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনস্রোত ভেঙ্গে প'ড়লো তার ওপোর।

সনাতন কিছু ব'লতে পারলে না শুধ্ একটা আর্ত্ত চীৎকার তার পাঁজর কয়খানাকে যেন ফাটিয়ে দিয়ে বার হ'য়ে এলো ; ব্যস্ তার পরই নীরব।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে, যখন সেই জনকোলাহল থেমে গেল ; লোক জনের চিহ্নও আর সেখানে রইল না, তখন দেখা গেল সনাতনের হাড় জিরজিরে জরাজীর্ণ দেহখানা রক্তাক্ত অবস্থায় ভেঙ্গে মুচ্‌ড়ে সেখানে একটা ছেঁড়া লতার মত লুটিয়ে প'ড়েছে।......

যেন তার এতদিনের সমস্ত ভুল ভ্রান্তি, সমস্ত অপরাধ উত্তেজনার সমাপ্তি হ'য়েছে ঐ রক্তাক্ত কর্দ্দমের মধ্যে যা অনেকদিন আগেই হ'য়ে যেত, মানুষ তার জন্য দায়ী হ'তোনা, আর দায়ী হ'তোনা আন্নাকালীর সিঁথির সিঁদূর।

বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে আর্ট

শ্রীজিতেন্দ্র মোহন গোস্বামী

কান্ট-মতবর্ত্তীদের মতে সৌন্দর্য্য বস্তুনিরপেক্ষ এবং অতীন্দ্রিয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তাঁরা প্রকৃতিকেই সকল রসের আধার বলে মনে করেন এবং সুন্দরকে কল্যাণের সাথে অভিন্ন বলে জানেন।

দার্শনিক শেলিংয়ের মত এই দিক দিয়ে কিঞ্চিৎ অগ্রসর এবং ডায়েলেক্‌টিক-গন্ধী। তাঁর মতে বিষয় ও বিষয়ীর অপ্রভেদ স্বীকৃত হয়েছে। আর্টের ক্ষেত্রেই নাকি তার এ বিশ্লেষণ বিশেষ ক'রে প্রযুজ্য। তিনি বলেন, বুদ্ধি দ্বারা নিজের প্রকৃত সত্বাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় শুধু এই আর্ট সৃষ্টিকে উপলক্ষ্য ক'রেই।

হেগেলীয় দর্শনে আর্টের এ অনন্য প্রাধান্য কিঞ্চিৎ অবদমিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, হেগেলবাদীরা আর্টকে চরম সত্বার অভিব্যক্তির প্রথম পর্য্যায় বলে স্বীকার করেন—যে পর্য্যায়ে তা অতীন্দ্রিয়ের অনধিগম্য পরিবেশ থেকে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হ'তে সুরু করেছে মাত্র। প্রকৃতিতে অভিব্যক্ত সৌন্দর্য্য শিল্পীর সৃজনী শক্তির বলে রসলিপ্সুর উপভোগ্য সামগ্রী রূপে পরিবেশিত হয়। হেগেলের মতে স্থপতি হ'লো আর্টের জাতি বিচারে অন্ত্যজ, তার বস্তুপ্রাধান্যই এই জন্যে দায়ী। এই বস্তুবাচক সংজ্ঞার পরিধি থেকে দূরত্ব ক্রম-বর্দ্ধিতহারে আর্টের আভিজাত্য নির্দ্দেশক এবং এই হিসেবে কবিতা হ'লো আর্টের চরমোৎকর্ষ হেগেল ও শেলিং-এর মধ্যে আমরা একটি ডায়েলেক্‌টিক্‌-সম্মত দার্শনিক আদর্শমূলক ব্যাখ্যা পাই। ডায়েলেক্‌টিক্যাল বাস্তববাদে বিশ্বাসীরাও আর্টকে বিষয়ী ও বিষয়ের সমন্বয় হিসেবেই জানেন। কিন্তু আদর্শবাদীদের সাথে বাস্তববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হ'লো এইখানে যে বাস্তববাদীরা পরম সত্বার অভিব্যক্তি বলে কিছু স্বীকার করেন না। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রতিফলন হয় আর্টে সত্য কিন্তু তাই বলে একথা সত্য নয় যে আর্ট একটি অবিকল প্রতিলিপি—শিল্পীর শ্রেণী-সচেতনতা তাতে নূতন আলোকসম্পাত ক'রে অভিনব ভাবে সৃষ্টি করে। শিল্পীর সৃষ্টির বহুমুখিতার কারণ এর ভিতরেই রয়েছে। যে শ্রেণী যখন যত প্রবল হ'বে আর্টের পটভূমিকা ও পরিপ্রেক্ষিক সেই অনুপাতেই হবে তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত। এক যুগের শিল্পের সাথে অন্যযুগের বা একই যুগের শিল্পীবিশেষের সাথে অন্যশিল্পীর সৃষ্টিতে যে বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় তার কারণও ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিশেষের সংস্থান।

আর্টের রস-বিশ্লেষণে শ্রেণী-বিন্যাসের কথা উঠলেই যাঁরা অকারণ শঙ্কিত হয়ে উঠেন তাঁরা বলেন সংঘর্ষ-বিদ্বেষ-বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রের মাঝে সহজ সুন্দর শান্তিপূর্ণ আশ্রয় এই আর্ট—দৈনন্দিন জীবনের ঝঞ্ঝা-বাত্যায় উৎপীড়িত মানব সমাজ এই উপকূলে এসে নিরুপদ্রব স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়, বাস্তব জীবনের নির্ম্মম কাঠিন্যকে ক্ষণিকের জন্যও ভুলে থাকতে পায়। সৌন্দর্য্য

ও আনন্দের রাজ্যে শ্রেণী-সংঘর্ষের কথা শুধু অবাঞ্ছিত নয়, অবান্তরও। ক্রেমলিন-প্রাসাদের চূড়ায় যখন গোধূলির সোনালী আলো মায়া পরশ বুলায় তখন সেখানে বিশ্ববিপ্লবের কোন কথাই জাগেনা। সৌন্দর্য্যের বিশিষ্ট প্রকাশ ছাড়া ওকে আর কিছুই বলা চলে না। বীঠোফেনের কথা "my realm is in the air like of the wind, when the tones whirl my soul whirls with them" এর মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের সুবিধাবাদিতার কথা কোথায়? খাঁটি আর্ট সামাজিক শ্রেণী-বিভাগ বা অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের স্তরবিন্যাসের অপেক্ষা রাখেনা। যে নিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা, বাক্য বা গতির সুসম্বদ্ধ ছন্দ মানুষের অন্তরে ভাবাবেগের সঞ্চার করে তারই লৌকিক সংজ্ঞা হ'লো চিত্র-ভাস্কর্য্য-স্থপতি, কাব্য বা নৃত্য। স্বার্থ-লেশবিহীন কালপাত্র নির্ব্বিশেষে আনন্দ পরিবেশনই ইহাদের প্রাণবস্তু।

বাস্তববাদীরা এর জবাবে বলে থাকেন আর্ট ও আর্টিষ্ট সম্বন্ধে এই যে চিত্তহারী বিবরণ শ্রেণী-স্বার্থ-বিপর্য্যস্ত সমাজব্যবস্থায় এর কোন স্থান নেই। অপগত-শ্রেণী সমাজব্যবস্থা ব্যতিরেকে এর সম্ভাব্যতা আশা করা অলীক কল্পনা।

আর্টের উৎপত্তি গতি ও বৃদ্ধির ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'র্‌লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ ভিত্তিহীন। আর্টকে শুধু আনন্দ পরিবেশনের তথা বাস্তবজীবনকে এড়িয়ে চল্‌বার ব্যবস্থা হিসেবে জানাটাই পর্য্যাপ্ত নয়। যাঁরা এমতের সমর্থক এতে করে তাঁদের চিন্তা-দৈন্যই সূচিত হয়। আর্টের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবকে ভেঙ্গে নিজের ইচ্ছানুগ করে পুনর্গঠন। এ-প্রসঙ্গে আরও একটী বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। আনন্দ পরিবেশন বা রূপসৃষ্টিকেই যাঁরা আর্টের চরম ও পরম উদ্দেশ্য বলে প্রচার করেন। তাঁদের একটি বিশিষ্ট উপদল আনন্দের বা রূপ সৃষ্টির বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও অতিমাত্রায় উদার। তাঁরা বলে থাকেন যেখানে আনন্দ বা রূপই হ'লো আসল কথা সেখানে "পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাস" আর সমুদ্র-সৈকতে স্নানার্থিনী আধুনিকার অর্দ্ধনগ্ন "তনুর তনিমায়" কোন বিচারের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। রুচির সম্মতির বিপরীতার্থক হিসাবে রুচির বিকৃতি তাঁরা স্বীকার করেন না। এই অবাঞ্ছিত অত্যুদার মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে শুধু এইমাত্র বলাই যথেষ্ট যে আর্টে নীতির অনুমোদন না থাকলে তা আর্ট পদবাচ্যই নয়, কেননা সমস্ত জীবনই যেখানে একটা সুচিন্তিত নীতিবাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তখন সেখানে আর্টকে তা' থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবার যুক্তিযুক্ততা কোথায়? দার্শনিক Schiller এর 'Spieltrieb' মতবাদকেও এই দিক দিয়েই আক্রমণ করা হয়। সমগ্র জীবনের উপর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সাথে এই অমিল ও ক্রমে অপনীত হ'বে সন্দেহ নেই।

তৃতীয়দল রয়েছেন যাঁরা আর্টকে উদ্দেশ্যবিহীন স্বয়ম্-সম্পূর্ণ শিল্প-বিলাস বলেই জানেন অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন প্রকাশভঙ্গীর বিচিত্রতা ও কুশলতাই আর্ট বিচারের মানদণ্ড এবং এর বাইরে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের—যেমন, সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি বা লোকমত গঠনের—দায়িত্ব আর্টের নয়। এ মত যে যুক্তি-সহ নয় তা বলাই বাহুল্য। যুগবিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের

প্রাণশক্তি যখন নিঃশেষিতপ্রায়। তখন খোলসটাকে ঘসেমেজে তার অন্তর্দৈন্য ঘোচাবার এ নিস্ফল প্রয়াস ইতিহাসে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। একেতো যুদ্ধব্যবস্থার ক্রমোন্নতির ফলে তলোয়ারের ব্যবহারই গেছে উঠে, তার উপর এখন যদি খাপটাকে চিত্রবিচিত্র করে গঠন করার ব্যাপারই যুদ্ধোপকরণের উপকর্ষের প্রমাণ বলে উপস্থাপিত করা হয় তখন হৃত-শ্রী শিল্পের অন্তঃসারশূন্যতার আস্ফালন ও করুণ পরিণতির পরিচয়ই প্রস্ফুট হ'য়ে উঠে। Art tradition বা ক্লাসিক্যাল রীতি প্রবর্তনের মূলেও নবজাগ্রত প্রতিভাকে বিগতকালের পরিচারক ও বাহকরূপে নকলনবিশীতে অভ্যস্ত করার পরোক্ষ অপচেষ্টা। স্থানকালপাত্রের কষ্টিপাথরে নিজেরা অবাঞ্ছিত অযোগ্য প্রমাণিত হ'য়েও দূরকালে নতুন সামাজিক পরিবেশের মধ্যে জোর করে নিজেদেরকে প্রসারিত করার প্রোপাগ্যাণ্ডা।

যা বলতে যাচ্ছিলাম, অর্থাৎ আর্টের সত্যিকারের রূপের কথা। ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে আর্টের অভিব্যক্তি স্থানকালকে অতিক্রম করে' একটা সার্ব্বভৌম চিরন্তনত্বের দাবী কর্ত্তে পারে কি না? অথবা, শ্রেণীসচেতনতার বাইরে আর্ট বিচারের অন্য কোন মানদণ্ড আমরা স্বীকার কর্ত্তে রাজি আছি কিনা? এ বিষয়ে কবুল জবাব দেবার আগে absolute value বা চরম মূল্যের কথা স্বতঃই উঠে পড়ে; কিন্তু কথার মারপ্যাচে বিষয়টিকে জটিল করে না তুলে এইটুকু আমরা বলবো যে স্থান ও কালের অর্থাৎ একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি আর্ট। তার বিষয়গুলির চিরন্তনত্বের দাবী অস্বীকার না করেও বলা যেতে পারে যে, চিরন্তন বলেই তা অ-সাময়িক নয়, হ'তেই পারেনা। সমসাময়িক গ্রীকসমাজ বা বাঙালীসমাজের সম্পূর্ণ আলেখ্য প্রতিফলিত হয়েছে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি হোমার বা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে। ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্প সম্বন্ধে মাইকেল এঞ্জেলো বা র‍্যাফেলের সৃষ্টি তৎকালীন সমাজের আলেখ্য হিসাবে সমসাময়িক সংবাদপত্র বা লিপিবদ্ধ ইতিহাসের চাইতে কম প্রামাণ্য নয়। এই সামাজিক স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে আমাদের প্রতিপাদ্য সমস্যার সমাধান। তর্কশাস্ত্র-সম্মত সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভবপর না হ'লেও নির্ব্বিরোধভাবে অন্ততঃ একথা বলা যেতে পারে যে "The bulk of the successful artists of any time are men in harmony with the spirit of that time, and identified with the powers prevailing." স্থান কালকে অতিক্রম করে সর্ব্বকালের সর্ব্বলোকের জন্যে যারা রস পরিবেশন করে গেছেন বলে, প্রকাশ তাঁদের দু'একজনের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখলেই এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। মহাকবি হোমারকে অবিসংবাদিতভাবে এ পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। কাজেই ওঁকে নিয়ে আলোচনা করাই শ্রেয়ঃ। একটা অজ্ঞেয়, অজেয়, প্রতিকূল অদৃষ্ট যার কাছে মানুষকে নিয়তই নতি স্বীকার কর্ত্তে হচ্ছে কাব্যের বিষয়বস্তু নির্ব্যতিক্রম এই। একটি অসংযত দেবতাগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আক্রোশের বিবরণ, আর একটি সম-ধর্ম্মী অনার্জ্জিতবিত্তভোগী খেয়ালী অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রশস্তি গাঁথা যুগের সীমারেখা পেরিয়ে ও যুগান্তরের রসভাণ্ডারের যোগান দিয়ে চলেছে। অর্দ্ধশতাব্দী

পূর্ব্বেও ম্যাথু আর্ণল্ড্ ও গ্ল্যাড্‌ষ্টোন গ্রীকসাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করে প্রসিদ্ধি লাভ কর্লেন। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাতে চিরন্তনের স্বাক্ষর পায় না; সন্দেহ করে বসে যে এই প্রচারের মূলসূত্রটি হ'লো যে উনবিংশতি শতকের চতুর্থপাদে ইংলণ্ডের সামাজিক পরিবেশ হোমারীয় গ্রীকসমাজের পরিবেশের সাথে মূলতঃ অভিন্ন। পরিশ্রম-পরিপুষ্ট সম্প্রদায়ের উশৃঙ্খল ইচ্ছাশীলতা এবং প্রচুর অবসর-বিলাসী অভিজাত মণ্ডলীর অভিমান, জনসাধারণ থেকে নিজেদের সংস্কৃতির দূরত্ব বজায় রাখবার নিদর্শন হিসেবে এই ক্লাসিক্যাল জ্ঞানানুশীলনের পুনঃ প্রবর্ত্তন ক'রেছিলো।

সমসাময়িক শাসক-সম্প্রদায় ও নবজাগ্রত "ভদ্রলোক" শ্রেণীর প্রশস্তিকার বল্‌তে সেক্সপিয়ার অনবদ্য, অতুলন রূপকার। এমন একটি কথাও তিনি লেখেননি বা এমন একটি চরিত্রও তিনি সৃষ্টি করেন নি যাতে করে তাঁর পাঠক-সমাজের কাছে তাঁকে অপ্রিয়ভাজন হ'তে হয়। যে সব সমাজ ব্যবস্থার সাথে তিনি নিজেকে সঙ্গত বোধ কর্ত্তেন না এবং তাই নিয়ে যে সব বিদ্রূপ তাঁর লেখনীমুখে নিঃসৃত হ'য়েছে তা তাঁর রসগ্রাহী পরিমণ্ডলের প্রীতিপ্রদ হ'য়েছিলো বলেই করেছেন, নয়তো বা প্রাক্-সেক্স্‌পিরীয় যুগের সাহিত্যে সেসবের সমর্থন ছিল।

সফলকাম চিত্র-শিল্পী ও ভাস্করদের প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথাও এই অভিজাত সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন। তাদের স্বার্থকে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে বর্দ্ধন ও পরিপোষণের মূল্যে তারা সামাজিক স্বীকৃতি ক্রয় করে। এ যাঁরা পারলো না তাঁরা হ'লো অবজ্ঞাত এবং রইলো অজ্ঞাত। নিজেকে পারিপার্শ্বিকের সাথে মিলিয়ে নিয়ে সুচতুর শিল্পী নশ্বর দেহ ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি কি উপায়ে রক্ষা করে থাকেন একটিমাত্র ছোট দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে। শিল্পী Boucher ও Fragonard এর চিত্রপদ্ধতি অবলম্বনে স্নানাগার ও প্রমোদকক্ষের নগ্ন নারীমূর্ত্তির লাস্যলীলা অঙ্কিত করে বিলাসী প্যারিসবাসীদের আনন্দবিধান কর্ত্তেন শিল্পী Boilly. তারপর এলো ফরাসী বিপ্লব—বিপ্লবের মাপকাঠিতে নীতি-বিগর্হিত অশ্লীল চিত্রের রচয়িতা বলে তাঁকে অভিযুক্ত করা হ'লো। চতুর Boilly যখন খবর পেলেন যে বিপ্লবীরা তাঁকে ধরে আন্‌বার জন্যে আস্‌ছে তখন তুলির টানে একটা চিত্রের খসড়া করে ফেল্‌লেন যার বিষয়বস্তু হ'লো—বিজয়ী বিপ্লব সৈন্য নায়ক 'ম্যারাটের' অধীনে শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হচ্ছে! সেই থেকে বিপ্লবের শিল্পী হ'লো Boilly. এ শুধু একটা উদাহরণ। যুগে যুগে শিল্পীরা এম্নি করে নিজেদেরকে মানিয়ে এসেছে সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে, প্রশস্তি রচনা করেছেন যাঁরা তাঁদের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা করেছে তেমন মুষ্টিমেয় ভাগ্যবন্ত। কয়েকজনের! যাঁরা তা পারেননি অভাবের কঠিন নিষ্পেষণে তাঁরা হয় তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন, নয়তোবা তাঁদের স্ফুটনোন্মুখ স্বপ্ন কোরকগুলো মুকুলেই ঝরে গেছে। যাঁরা নিয়ত যুদ্ধ্যমান পারিপার্শ্বিককে অতিক্রম করেও বেঁচে থাকবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে থাকেন তাঁরা জনসাধারণের কাছ থেকে বহুদূরে চলে যান। বাস্তবের সংস্পর্শকে এড়িয়ে চলার পরিণতি হয় প্রথমটায় mysticism, এবং ক্রমে pessimism ও cynicism এ। গঠনমূলক কিছু বাৎলে দেবার ক্ষমতা হয়তো থাকে না, নয় তো

থাকলেও প্রয়োগক্ষেত্রের অভাবে তাও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে এবং তাইতে করে গড়ে ওঠে একটা "rugged individulism" বা আত্মমুখিতা যা, সামাজিকতার বিপরীতার্থ বোধক। এই এড়িয়ে যাওয়ার দলকে লক্ষ্য করেই প্লেখানভ্ বলেছেন "The leaning of artists in artistic creative endeavours towords art for art's sake arise as the result of the hopeless dissonance between themselves and soicial environment." সমাজের স্থুল স্পর্শ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আত্মনিবদ্ধ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে একটি গোষ্ঠীগত হয়ে ওঠেন এঁরা, এবং ক্লান্ত ক্লিষ্ট প্রতিভা ক্রমে অকালে বিনষ্ট হয়।

আসল বাস্তব আর্টের কর্ম্মক্ষেত্র হবে ব্যাপক, সমাজের সমস্ত স্তরের কাছ থেকে আসবে এর স্বীকৃতি—এই অবাঞ্ছিত সঙ্কীর্ণতার কুম্ভীপাক থেকে ছাড়া পেয়ে সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রে মুক্তি। সকল শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান করে প্রত্যাসন্ন মরণের হাত থেকে বাঁচবার অধিকার অর্জ্জন ক'রবার সাধনাই হচ্ছে বাস্তব আর্টের।

বর্ষা

শ্রীলীলা নন্দী

হে আষাঢ়! আকুল সজল!
কেন আঁখি অশ্রু ছলছল?
বিকচ কেতকী ফুলে,
কাঁটা কি বিঁধেছে ভুলে
বুকে কি বেজেছে ব্যথা, বল্॥

আজি মেঘ-মেদুর সন্ধ্যায়—
কেহ কি বকুল বীথিকায়
মালা গাঁথি ফুলদলে,
পরায়ে দেয়নি গলে,
ঘন-পল্লবিত কুঞ্জ ছায়॥

মেঘে মেঘে দিক্ অন্ধকার,—
শুনি শুধু ঝিল্লির ঝঙ্কার।
ঘন আন্দোলিত তাল,
বল আর কত কাল
তুলিবে এমন হাহাকার॥

কি তোরে ব্যথিছে, অভিমানি!
শ্বসিছে ক্রন্দন ভরা বাণী?
বিশৃঙ্খল বেশ বাস
উড়ে পড়ে কেশরাশ
শোকার্ত্ত গম্ভীর মুখ খানি॥

বৃথা দুঃখ কেন অকারণ,
কেন এই সুকঠিন পণ?
বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল
ঝরে গণ্ডে অবিরল
তনু কণ্টকিল নীল বন॥

তোল আঁখি তোল, হে গরবি!
ক্ষমা পাক্ লাজ কুণ্ঠ রবি।
স্নেহ-আলিঙ্গনে তার
ধরা দাও আর বার
লজ্জা সুখে স্মিত-মুখচ্ছবি॥

——:o:——

সুদাম

(গল্প)

শ্রীসুকৃতি সেন

গ্রামের একপ্রান্তে সুদামের ঘর। স্ত্রী ও মেয়ে লইয়া সুদামের সংসার। দিন রোজগারে যাহা পায় তাহা দিয়া কোন রকমে সংসারটা চলিয়া যায়। ইহার অতিরিক্ত ব্যয় করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। ঘরের ছাউনি অনেক জায়গায় খসিয়া পড়িয়াছে, মাটীর দেওয়াল ও কতক জায়গায় ধ্বসিয়া গিয়াছে—এ সকলই মেরামত করিতে হইবে। সুদাম কাহার কাছে টাকা ধার করিতে যাইবে তাহাই বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। জমিদারের খাজনাও দিন তুইয়ের ভিতর দিতে হইবে, এবার আর মিথ্যা আশ্বাস দিলে চলিবে না। সুদাম ভাবিল মহাজনের কাছে—যাইয়া হাত পাতিবে। কিন্তু মহাজন যে সুদ হাঁকিয়া বসে তাহা যে সে কোন দিন শোধ করিতে পারিবে এ ভরসা নাই। ভাল কথা, বিণু কবিরাজের কাছে গেলে হয় না? বিনু কবিরাজ পাশের গ্রামে গিয়াছে ফিরিতে দেরি হইবে। সুদাম ডাক দিল, "লক্ষ্মী—তামাক দিয়ে যারে।" ছোটমেয়ে লক্ষ্মী তামাক সাজিয়া আনিল। সুদাম তামাক টানিতে টানিতে কত কথাই ভাবিল। লক্ষ্মী যে কখন তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পিঠের উপরং ঝুঁকিয়া রহিয়াছে সুদাম তাহা বুঝিতে পারে নাই। লক্ষ্মীকে কাছে টানিয়া সুদাম বলিল, "কি রে লক্ষ্মী, কি দেখছিস।" লক্ষ্মী মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমি কখন থেকে দাঁড়িয়ে রইছি—" অভিমানে তাহার ঠোঁট ফুলিয়া উঠিল। সুদাম মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "লক্ষ্মী মেয়ে, ছিঃ রাগ করেনা।" যাও দেখি হুকোটা রেখে এস। একটু ঘুরে আসি।" সুদাম গামছা কাঁধে ফেলিয়া গ্রামের পথ ধরিল।

তুপুর বেলায় এক হাটু ধূলা লইয়া সুদাম ফিরিল। এত ঘুরিয়া কোথাও কিছু মিলিল না। একমাত্র সম্বল বসত বাটী খানা বন্ধক দিয়া মহাজনের কাছ হইতে টাকা আনিতে তাহার ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুঝি তাহাই করিতে হয়।

জমিদারের লোক আসিয়া উপস্থিত। সুদাম মহাজনের কাছ হইতে যাহা পাইল তাহা দিয়া সমস্ত খাজনা দেওয়া যায় না। সুদাম হাতে পায়ে ধরিয়া অনেক অনুনয় করিল। কিন্তু জমিদারের লোক আজ সম্পূর্ণ খাজনা না লইয়া যাইবে না। সুদাম মাথায় হাত দিয়া বসিল। সঙ্গে চারজন পাইক আসিয়াছিল তাহারা সুদামের ঘরে ঢুকিয়া যে কয় আঁটি ধান ছিল তাহা বাহির করিল। সুদাম অসহায়ের মত সেদিকে চাহিয়া রহিল। সুদামের বৌ কপাটের আড়াল হইতে সমস্তই দেখিতেছিল, এবার তাহার চোখ দিয়া কয়েক ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল। তুই

বেলা দুই মুঠা যাহা মিলিল তাহাও নিঃশেষ হইয়া গেল। লক্ষ্মী বাপের কাছে দাঁড়াইয়া মুখে আঙুল দিয়া একবার খাজনাদার, একবার সুদাম আবার আঁটিগুলির দিকে চাহিতেছিল। খাজনা শোধ হইল না দেখিয়া খাজনাদার সুদামকে জমিদার বাড়ী ধরিয়া লইয়া চলিল। লক্ষ্মী সুদামের কাপড় ধরিয়া বলিল, "ওকি! আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ গো?" খাজনাদার সরে যা বলিয়া লক্ষ্মীকে ঠেলা দিয়া সরাইয়া দিল! লক্ষ্মী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

সুদামকে এখন জমিদার বাড়ী কাজ করিয়া দিতে হয়! সেখানে সে এক পয়সাও পায় না। কিন্তু খাজনা বাকীর অজুহাতে তাহাকে ইহা করিতেই হয়। আজ দিন দুই হইল সুদামের বৌয়ের জ্বর। জ্বর মন্দের দিকে চলিয়াছে। সুদাম তাই বিনু কবিরাজকে ডাকিতে আসিয়াছে। বিনু কবিরাজ আসিল। রোগী দেখিয়া বলিল, "বেশ শক্ত রোগে ধরেছে রে সুদাম। ভাল করে চিকিৎসা করাতে হবে।" সুদাম কবিরাজের পায়ে ধরিয়া বসিল। টাকা পয়সা সে কোন রকমেই দিতে পারিবেনা, কবিরাজ মশায় দয়া করিয়া যদি সারাইয়া দেন। বিনু কবিরাজ স্বীকার করিল। সুদামকে হাত ধরিয়া উঠাইতে তাহার পিঠে চোখ পড়িল। কাল কাল দাগ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর পিঠে ও কিসের দাগ সুদাম?" সুদাম হু হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। জমিদারের বাড়ী বিনা পয়সায় খাটিতে রাজী হয় নাই বলিয়া জমিদারের পাইকেরা তাহাকে মারিয়াছে। এখন সে একটুও সময় পায়না যে পরের বাড়ী খাটিয়া দুই পয়সা পাইবে। বিনু কবিরাজের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। অত্যাচার সে কোন রকমেই সহ্য করিতে পারে না। গ্রামের আরও কয়েকজনের কাছ হইতে সে এরকম অভিযোগ শুনিয়াছে। আজ যেন সহ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। বৃদ্ধ হইলে ও ভীত হইবার লোক সে নয়। বিনু কবিরাজ বিবাহ করে নাই। স্ত্রী পুত্রের জন্য তাহার কোন চিন্তা ছিলনা। সুতরাং টাকা পয়সা যাহা পাইত তাহা গরীব দুঃখীদের মধ্যে বিলাইয়া দিত। গরীবের দুঃখ দেখিলে তাহার প্রাণ কাঁদিত। বিনা পয়সায় কত গরীব দুঃখীর রোগ সে সারাইয়া দিয়াছে। গ্রামের চাষাভূষা তাহাকে এজন্য দেবতার মত ভক্তি করিত।

ভোরে উঠিয়া বিনু কবিরাজ জমিদার বাড়ীর দিকে রওনা হইল। চারি ক্রোশ পথ হাঁটিতে বেশ সময় লাগিবে ভাবিয়া বিনু কবিরাজ ভোরেই রওনা দিয়াছে। জমিদার শশাঙ্কশেখর বন্ধুবান্ধব লইয়া গান বাজনা করিতেছিল। বিনু কবিরাজ সোজা সে ঘরে ঢুকিয়া গেল। এক ছেঁড়াকাপড় পরা বৃদ্ধকে অকস্মাৎ ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সকলেই চুপ করিয়া গেল। শশাঙ্কশেখর চিনিতে পারিলেও ভাণ করিয়া বলিল, "কি চাই আপনার? আপনাকে এখানে আসতে কে বলেছে?" বিনু কবিরাজ রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, বলিল, "চুপ পাপিষ্ঠ! গরীবের সর্ব্বনাশ করে বড়াই করিস, লজ্জা করে না? হাহাকারে যে দেশ ভরে গেল লক্ষ্য করেছিস্ কিছু? ভাল চাস্ তো ওদের দিকে ফিরে চা। সর্ব্বনাশ ডেকে আনিস না।" শশাঙ্কশেখরের মুখ দিয়া আর কোন কথা বাহির হইল না। বন্ধুরা এ ওর দিকে চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল। একজন বলিয়া উঠিল, "আপনার বুকের পাটা তো কম নয়?" বিনু কবিরাজ হুঙ্কার

দিয়া উঠিল, "চুপ বখাটে ছোকরা !" বন্ধুবরের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। বিনু কবিরাজ হন্ হন্ করিয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল।

শশাঙ্কশেখরের মাথায় যেন আজ খুন চাপিয়াছে। এতগুলো বন্ধুর সম্মুখে অপমান, ইহা সে কোন রকমেই সহ্য করিতে পারিবেনা। এ কবিরাজকে সে বিলক্ষণ চিনিত। ইহার হাতে সে বাগ্দী পাড়ার লোক রহিয়াছে ইহাও সে জানিত। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মুখে একটা ক্রুর হাসি খেলিয়া গেল।··· ······

······গভীর রাত্রি। সুদাম কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া বসিয়াছে। বারে বারে দুঃস্বপ্নের কথা মনে পড়িয়া সে রীতিমত ঘামিয়া উঠিল। এঁ্যা, দূরে যেন কিসের কোলাহল শোনা যায়! কোলাহল স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। সুদাম বাহিরে আসিলে। ওখানে আকাশ লাল কেন ? সুদাম সন্দেহে ছুটিয়া গেল। বাগ্দীপাড়ায় ভীষণ আগুন লাগিয়াছে। কাছে কোথায়ও জল নাই। লোকগুলি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘর পুড়িতে দেখিল। দিনের বেলায় সকলে মিলিয়া আধপোড়া বাক্স, বিছানা টানিয়া বাহির করিতে লাগিল। পোড়াবেড়া সরাইতে সরাইতে কাহার অর্দ্ধদগ্ধ-মৃতদেহ দেখা গেল। মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া সুদাম চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ যে বিনু কবিরাজ রে ! দেখে যা কি সর্ব্বনাশ হোল, হায় হায় !" সুদামের চীৎকারে সকলে আসিয়া চিনিতে পারিল এ বিনু কবিরাজই বটে। কি করিয়া যে সে পুড়িয়া মরিল কেন আগুন লাগিতেই ঘর হইতে ছুটীয়া বাহির হইল না তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। সকলের নিকট এ একটা রহস্য মনে হইল। কিন্তু সুদামের কাছে এ রহস্য পরিষ্কার হইয়া গেল। সে যাহা বলিল তাহা এই, বিনু কবিরাজ সুদামের পক্ষ লইয়া জমিদারের কাছারিতে গিয়াছিল। রাগের মাথায় জমিদারকে অপমান করিতে বুঝি সে কসুর করে নাই। এ অপমানের শোধ লইবার জন্যই বিনু কবিরাজের ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং নিশ্চয়ই বাহির হইতে দরজা বন্ধ করা হইয়াছিল যাহাতে সে বাহির হইতে পারে নাই। বাগ্দীপাড়ার সকলেই যেন ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু জমিদার শশাঙ্কশেখরের অসম্ভব বলিয়া কিছু নাই ইহাও তাহারা জানিত। সেদিন কাহারও চোখের জলে, কাহারও দীর্ঘশ্বাসে বাকী দিনটুকু কাটিয়া গেল।

কিন্তু সুদামের এই কথাগুলি জমিদার বাড়ী পৌঁছিতে দেরী হইল না। শশাঙ্কশেখরের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গেল। পেয়াদাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, "কাল খুব ভোরে সুদামকে এখানে নিয়ে আস্‌বি।

কাল সারাদিন সুদাম কিছু মুখে দেয় নাই—জলটুকুওনা। কবিরাজের শোক বুঝি সে কোনদিনই ভুলিতে পারিবে না। লক্ষ্মীর একটা লাল কাপড় আনিয়া দিতে হইবে। লক্ষ্মী বহুদিন হইতে বায়না ধরিয়াছে। পুঁজি যাহা ছিল তাহা হইতে কিছু লইয়া হাট হইতে একখানা কাপড় কিনিয়া দিবে মনে করিয়া সুদাম ভোরে উঠিল। কিন্তু ভোরেই পেয়াদা আসিয়া

উপস্থিত, এখনি তাহাকে জমিদার বাড়ী যাইতে হইবে। দেরি করিলে চলিবেনা। সুদাম কথামত সঙ্গে চলিয়া গেল। পথে আসিতে আসিতে সুদাম ডাকিবার কারণ খুঁজিয়া পাইলনা। সুদাম আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল। ও, হ্যাঁ মনে পড়িয়াছে। কাল সে জমিদারের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছে। ভয়ে তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

...... কাল সুদাম বাড়ী ফিরে নাই। সুদামের বৌ দুয়ারের সামনে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়াছিল। অসুস্থ শরীর লইয়া বসিবার মত শক্তি তাহার ছিলনা। বাবার কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে লক্ষ্মী সন্ধ্যাবেলায় ঘুমাইয়া পড়িল। কতরাত্রি পর্য্যন্ত যে সুদামের বৌ বসিয়াছিল তাহার ঠিক নাই। কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল তাহাও সে ঠিক জানেনা। হঠাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ঘরের আলো কখন নিবিয়া গিয়াছে, লক্ষ্মী শুধু মাটীর উপর শুইয়া রহিয়াছে। বাকী রাতটুকু আর ঘুম হইলনা--কত কি চিন্তা মনে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভোরবেলা উঠিয়া লক্ষ্মী বাবার খোঁজ করিল কিন্তু মার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া রাগ করিয়া মুড়ির ডালা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সুদামের বৌ সে দিকে লক্ষ্য করিলনা। পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্বামীর কথা ভাবিতে লাগিল। এত ভোরে পেয়াদা আসিবার কারণ কি? তাহার স্বামী কোন অপরাধ করে নাই তো? জমিদার বাড়ী গিয়াছে কাল কিন্তু আজও ফিরিতেছেনা দেখি! জমিদার বাড়ীতে নাকি এক চোরা কুঠরি আছে। সেখানে যাহাদিগকে লইয়া যাওয়া হয় তাহারা নাকি আর ফিরেনা ইহাও সে শুনিয়াছে। তবে কি তাহাই? সে আর ভাবিতে পারিলনা, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। লক্ষ্মী মুড়ি আর বাতাসা খাইলনা। বাহিরে খুঁটী ধরিয়া সুদাম যে পথে যাওয়া আসা করিত সে দিকে চাহিয়া রহিল। কোথায়, বাবা তো তাহার কাছে কোন দিন মিথ্যা কথা বলে নাই। যাহা দিবে বলিয়াছে তাহা তৎক্ষণাৎ আনিয়া দিয়াছে। তবে আজ এত দেরী কেন? অভিমানে লক্ষ্মীর ঠোট ফুলিয়া উঠিল।......

ভার্সাই সন্ধির প্রতিক্রিয়া

শ্রীঅমিতা রায়

বর্ত্তমান ইয়োরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিতে গেলেই হিটলার ও মুসোলিনী সমস্ত দৃষ্টিকে আবৃত করে। নাৎসি দলের নেতা হিটলারের অভ্যুত্থান আকস্মিক ঘটনা বলিয়া অনেকে মনে করেন। মহাযুদ্ধের পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জার্ম্মাণির অবস্থা যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন—তাঁহারা জানেন ভার্সাই সন্ধি ও ফ্রান্সের প্রতিশোধমূলক নীতিই জার্ম্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। নিজের অবিবেচনা ও সঙ্কীর্ণতার ফলে ফ্রান্সকে আজ ভুগিতে হইতেছে। ফ্রান্স ও বৃটেনকে—হিটলার ও মুসোলিনীর সকল প্রকার অপমান নির্ব্বিবাদে আজ হজম করিতে হইতেছে—যে কোন উপায়ে যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য। যুদ্ধের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ঘটনা আলোচনা করিলে বোঝা যাইবে এ পরিস্থিতির কারণ কি। ১৯১৮ তে প্রেসিডেন্ট উইলসনের ১৪ দফার উপর নির্ভর করিয়া জার্ম্মানগণ যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে সম্মত হয় কিন্তু সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে যাইয়া অবাক হইয়া যায়। তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না। কাজেই এ সন্ধি দেশে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করিবে ইহা জানিয়াও জার্ম্মান নেতাগণ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন।

ইংলণ্ড ও অন্যান্য মিত্র শক্তির সাহায্যে ফ্রান্স তাহার চিরশত্রু জার্ম্মানিকে শুধু দুর্ব্বল নয় সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিতে মনস্থ করিয়াছিল। সেদিনের জয়গর্ব্বের উত্তেজনায় ফ্রান্স জার্ম্মাণির অসাধারণ শক্তির কথা বিস্মৃত হইয়াছিল। ভুলিয়াছিল যাহাকে পরাজিত করিতে, মিত্র শক্তিগণের বিপুল আয়োজন আমেরিকার সাহায্য ব্যতীত ব্যর্থ হইতে বসিয়াছিল—সেই দুর্দ্ধর্ষ জাতি এই অপমান সহ্য করিবে না। ইহার প্রতিশোধ একদিন লইবেই।

সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে জার্ম্মানীর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল রাজ্যে পরিণত হইল। বিজেতৃগণ জার্ম্মান রাজ্যের নানা স্থানের উপর অধিকার আদায় করিয়াই ক্ষান্ত রহিলনা—আফ্রিকার বিস্তৃত উপনিবেশও নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করিয়া লইল। ইহা ব্যতীত সর (Saar) প্রদেশের কয়লা ও লৌহখনি সমূহ ১৫ বৎসরের জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ ফ্রান্সকে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিতে হইল। এই সর প্রদেশ ১৯৩৫ শে Plebiscite গ্রহণের পর পুনরায় জার্ম্মাণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রাইনল্যাণ্ড ও তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৫ বৎসরের জন্য মিত্র সৈন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত থাকিবে এবং এই সৈন্যদলের ব্যয়ভার জার্ম্মাণীকে বহন করিতে হইবে এরূপ স্থির হইল। ১০০০০০ এর বেশী সৈন্য রাখা ও বাধ্যতামূলক সৈন্য রাখা নিষিদ্ধ হইল। সামান্য অস্ত্রশস্ত্র ও খানকয়েক নৌবাহিনী ও সাব্‌মেরিণ মাত্র রাখিবার অনুমতি দেওয়া হইল। ইহার

উপর যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বা reparation বাবদ বহু অর্থ দিতে বাধ্য করা হইল। কারণ মিত্র শক্তিগণের বিবেচনায় যুদ্ধের জন্য দায়ী একমাত্র জার্ম্মাণী অতএব ন্যায়তঃ তাহারই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় বহন করা উচিত। কিন্তু এদিকে ধন উৎপাদনের সমস্ত পথ তাহার পক্ষে বন্ধ হইল কারণ কয়লা ও লোহার খনি তাহার হস্তচ্যুত করা হইল। এই অসম্ভব দাবী সে কি করিয়া মিটাইবে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিল না। তবু তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু এই মিথ্যা দোষারোপ ও অন্যায় দাবীতে জার্ম্মানি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। হিটলারের হস্তে ভার্সাই সন্ধির এই দুইটী সর্ত্ত জনমতকে নাৎসী দলের স্বপক্ষে আনিতে অনিবার্য্যরূপে সহায়তা করিল।

১৯১৯ খৃঃ জার্ম্মাণীস্থিত ওয়েমারে সমাজতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হইলেন আরবার্ট। প্রথম হইতে এই সাধারণতন্ত্রকে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া জীবন আরম্ভ করিতে হইল। ইহার প্রবর্ত্তকদের দেশের লোক ঘৃণার চক্ষে দেখিত কারণ ইহার নেতারাই সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। জোসেফকিং তাঁহার লিখিত The German Revolution নামক গ্রন্থে এই রিপাব্লিক সম্বন্ধে জার্ম্মান জনমতকে এভাবে বিবৃত করিয়াছেন। "We can suffer our defeat after 4 years fighting against the rest of Europe, Asia, America but Germany can and shall be great again not under these democrats who think that by submission and trying to carry out an impossible treaty they can become your friends in a peaceful Europe, that is against the spirit and the traditions of Germany." অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার বিরুদ্ধে চার বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের পর আমাদের এই পরাজয়কে আমরা সহ্য করিতে পারিব কিন্তু জার্ম্মানী পুনরায় বড় হইতে পারে ও হইবে—তবে এই ডেমোক্রেটদের অধীনে নয়—যাহারা পরাজয় স্বীকার করিয়াও অসম্ভব এক সন্ধিতে স্বাক্ষর করিয়া মনে করিয়াছে তাহারা জার্ম্মাণির বন্ধুর কাজ করিয়াছে ও ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। জার্ম্মাণ জাতির সংস্কার ও চিন্তাধারার ইহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই সাধারণ-তন্ত্র কোনদিনই জনমতের সমর্থন লাভ করে নাই।

Reichstag এ সংখ্যাগরিষ্ঠ সোসিয়াল ডেমোক্রেটিক দল ছাড়াও আরো চারিটী দল ছিল। নাৎসী, কমিউনিষ্ট, ন্যাশনালিষ্ট, জার্ম্মান পিপলস্ সেণ্টার পার্টি। ১৯৩২ পর্য্যন্ত স্যোসিয়াল ডেমোক্রেটিক পার্টিই গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা করিয়াছে।

নাৎসী দলের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আনটন ড্রেক্সটার (Anton Drexter)। তিনি ১৯১৯ সনে ৪০ জন সভ্য লইয়া জার্ম্মাণ ওয়ার্কার্স [illegible] ইহাদের মধ্যে ৬ জন সভ্য লইয়া পার্টির আভ্যন্তরিণ কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র দল গঠিত হয়। এইদল যুদ্ধ অবসানকেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী ছিল না।

পরবর্ত্তীকালে এই দল হইতে নাৎসীদলের উদ্ভব হইয়াছিল। Captain Ernst Rohm নামক একব্যক্তি এই ওয়ার্কার্স পার্টিতে সৈন্য ও অফিসারদের আনিয়া ভুক্ত করিতে লাগিলেন। Feder নামক আর এক ব্যক্তি সভ্যগণকে রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে সচেতন করিতে লাগিলেন। জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে হিটলার Feder এর অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন। Ernst Rohm ও Feder এই দুই জনের কাছে হিটলার বহুল পরিমাণে ঋণী। জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতা হিটলারের জীবন আরম্ভ হয় কঠোর সংগ্রামের ভিতরে। ১৯১৪ সনে তিনি মহাযুদ্ধে যোগদান করেন। রণভূমিতে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য দুই একবার তাহার নাম ডিসপ্যাচে উল্লেখিত হইলেও তিনি একজন নগণ্য সৈনিক মাত্র ছিলেন। ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরে সমগ্র জগতের সম্মুখে জার্ম্মাণীর এই লাঞ্ছনা ও অপমান তাহাকে বড় আঘাত করে। তিনি সৈন্যদলে যোগ দিলেন। ক্রমে আভ্যন্তরিণ বিভাগের inner cell এর সপ্তম সংখ্যক সভ্য হইলেন। হিটলারই প্রথম জনসাধারণের ভিতর যাইয়া স্বপক্ষে এই পার্টির প্রচার কার্য্য চালাইবার প্রস্তাব করিলেন এবং Drexter ও Feder এর সহায়তায় দলের কার্য্য পরিচালনার জন্য কর্ম্ম প্রণালী প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে ২৫টি সর্ত্ত আছে। সেই কার্য্য প্রণালী উল্লেখিত সর্ত্ত অনুসারে আজ হিটলার তাঁহার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালনা করিতেছেন।

এদিকে ফ্রান্স জার্ম্মাণিকে দুর্ব্বল শক্তিতে পরিণত ও লজ্জিত করিয়াই নিরস্ত রহিলনা। জার্ম্মাণি যাহাতে কোন উপায়েই আবার শক্তিসম্পন্ন হইতে না পারে—১৯২০ হইতে ১৯৩২ পর্য্যন্ত ইহাই তাহার একমাত্র নীতি ছিল। এইজন্য জার্ম্মাণিকে বেষ্টন করিয়া যে সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাদের সহিত জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইল।

১৯২২ সনে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম, জার্ম্মাণি সর্ত্ত অনুসারে ক্ষতিপূরণের টাকা ও মাল দিতেছেন —এই অজুহাতে ইংলণ্ডের অনুমতি ছাড়াই রুর (Ruhr) প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করে। ইহার ফলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে কিছুকালের জন্য মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীকে তাহার বাণিজ্যের জন্য এই রুর প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত— এখান হইতে সে শতকরা ৮৪ ভাগ কয়লা, শতকরা ৮০ ভাগ ইস্পাত ও পিগ্ লৌহ পাইত। এই অন্যায় আক্রমণের জন্য জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট অসহযোগ নীতির অনুসরণ করিল। কোন নাগরিক ফ্রান্সের সৈন্যদের কোনরূপ সাহায্য করিতে নিষিদ্ধ হইল, মজুর ও কর্ম্মচারীগণ ধর্ম্মঘট করিল— ফ্রান্স ঐ প্রদেশের অধিবাসীদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল — যে সাহায্য করিতে অসম্মত হইল তাহাকেই বন্দী করিল। রুরের এই অসহযোগপন্থী যোদ্ধারাই বর্ত্তমান নাৎসী দলকে নবজীবন দান করে। এই সময় হইতে এই দলের সভ্যসংখ্যা অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যায়। হিটলার জনসাধারণের ভিতর প্রচার দ্বারা ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট জনমত গঠন করিতে লাগিলেন। এই সময় এই দলের সভ্য সংখ্যা ১৫০০ হাজার হইল। ১৯২৩ সনে হিটলার জার্ম্মাণীকে নাৎসী ষ্টেটে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া

রিপাব্‌লিক কর্ত্তৃক ৫ বৎসরের জন্য বন্দী হন। এই সময় তিনি "My struggle" নামক তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক লেখেন।

১৯২৩ সনে Stressmann এর পররাষ্ট্র বিভাগের সম্পাদকত্ব লাভ করার পর সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল জার্ম্মাণীতে শান্তি স্থাপন করা এবং ফ্রান্সের সহিত মিটমাট্ করিতে সচেষ্ট হওয়া। Stressmannএর কার্য্যতৎপরতায় পুনরায় ইউরোপের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণ সম্মান প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২৫ সনে যুদ্ধের পর জার্ম্মাণি সন্ধিতে সর্ব্বপ্রথম ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বাক্ষর দিল। তাহার চেষ্টাতেই যুদ্ধ-ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে মিত্র শক্তিগণ Dawes settlementএ স্বীকৃত হইলেন ও ১৯২৬ সনে জার্ম্মাণী জাতিসঙ্ঘের সভ্যরূপে গৃহীত হইল। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য জার্ম্মাণ অধিবাসীগণ তাঁহাকে কোন সম্মান প্রদর্শন করিলনা। হিটলার ও Hugenberg "Warguilt Clause ও "Young plan" এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালাইতে লাগিলেন। ১৯২৯ সনে The Hague Conferenceএ Stressmann যোগদান করিলেন। ইহার ফলে অন্যান্য দেশ জার্ম্মাণীকে টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হইল ও ১৯৩০ সনে সকল মিত্র সৈন্যবাহিনী জার্ম্মাণ রাজ্য পরিত্যাগ করিল।

১৯২৯-১৯৩১ সনে জগৎব্যাপী Economic depression আরম্ভ হইল। বেকারের সংখ্যা অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল—এই সময় ন্যাশন্যাল সোসালিষ্টদের সংখ্যাও দ্রুত বাড়িতে লাগিল। ১৯২৬-২৭ সনে সভ্যসংখ্যা ছিল ১৭০০০—৪০,০০০, ১৯২৮ সনে সভ্যসংখ্যা হইল ২১০,০০০ এই সময় ১২ জন ডেপুটীকে Reichstagএ পাঠান হইল।

১৯৩২ সনে Hindenbergএর প্রতিদ্বন্দী হইয়া হিটলার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইলেন। হিটলারের ভোট সংখ্যা হইল ১১,৩০০০০; কিন্তু হিটলার প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করিলেন না। ১৯৩৩ সন হইতে নিরস্ত্রীকরণ সভার বৈঠক আরম্ভ হইল। কিন্তু ফ্রান্সের বিরুদ্ধতায় কিছু অগ্রসর হইল না। ১৯৩৩ সনে হিটলার Chancellor হইয়া সভায় যোগদান করিলেন এবং অন্যান্য শক্তির সহিত সর্ব্ববিষয়ে জার্ম্মাণির সমান অধিকার দাবী করিলেন। গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকা স্বীকৃত হইল কিন্তু ফ্রান্স এবারও সম্মতি দিলনা। হিটলার Leagueএর সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া গেলেন। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা বাড়াইয়া ৫০০০,০০০ পর্য্যন্ত করিলেন—পুনরায় Conscription আরম্ভ হইল। এরোপ্লেনের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিলেন—কিন্তু রণতরী বৃটীশ রণতরীর শতকরা ৩৫ ভাগের বেশী হইবেনা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

ইহার উত্তর স্বরূপ ফ্রান্সও বিপুলভাবে সামরিক আয়োজন আরম্ভ করিল। জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত ফ্রান্সের মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হওয়ার সংবাদ যেদিন আসিল সেদিনই হিট্‌লার ত্রিশহাজার সৈন্য রাইনল্যাণ্ডে প্রেরণ করিলেন ও দূর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। ইংলণ্ড ফ্রান্সের সহিত যোগদান করিয়া—ভার্সাই সন্ধির চুক্তি ভাঙ্গার জন্য হিট্‌লারের বিরুদ্ধে যাইতে অস্বীকৃত হইল। হিট্‌লার ঘোষণা করিলেন যে তিনি লোকার্ণচুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। প্রথমে ফ্রান্সই রাশিয়ার সহিত মিলিটারি প্যাক্টে আবদ্ধ হইয়া চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে।

হিট্‌লার তাহার গ্রন্থে নাৎসীদলের জন্য ২৫টী সর্ত্ত করিয়া একটী কার্য্যাবলী প্রস্তুত করেন। এই অনুসারে তিনি বর্ত্তমান বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। ইহার মধ্যে একটী বিষয় হইতেছে হিট্‌লারের "Racial Unification" অর্থাৎ জার্ম্মানীতে জার্ম্মাণ রক্তের লোকছাড়া আর কেহ থাকিতে পারিবে না—এবং নাগরিক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে না—তাহাদিগকে জার্ম্মাণীতে alien অর্থাৎ বিদেশীর ন্যায় বাস করিতে হইবে। নতুবা তাহাদের সংমিশ্রণের ফলে জার্ম্মাণ আর্য্য জাতির রক্ত দুষিত হইয়া যাইবে। তজ্জন্য ইহুদিগণ জার্ম্মাণীর নাগরিক অধিকার পাইবে না। কাহারো পিতা অথবা মাতা কিংবা পূর্ব্ব পুরুষদের মধ্যে কেহ ইহুদী থাকিলেও তাহারা জার্ম্মাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। Jews রা কোনরূপ অফিসে অথবা ফার্ম্মে কাজ করিতে পারিবে না। সকল রকম সাংবাদিক পত্রিকা, মাসিক ও জার্ম্মাণ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ—জার্ম্মাণ নাগরিকগণ দ্বারা লিখিত ও পরিচালিত হইতে হইবে। হিটলার চ্যান্সেলার হইয়াই ইহুদিদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল এই যে ইহুদীগণ সর্ব্বদা জার্ম্মাণ জাতীয়তার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং তাহারাই এই যুদ্ধপরাজয়ের কারণ। অসংখ্য জার্ম্মাণ ইহুদি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে এবং ইহুদী প্রফেসারগণ যে নিত্য নূতন মারণ অস্ত্রআবিষ্কার করিয়া জার্ম্মাণগণকে সাহায্য করিয়াছেন সে তথ্যের কোন মূল্য রহিল না। আর এক অভিযোগ যে তাহাদের জন্যই জার্ম্মানীতে এত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, কারণ গবর্ণমেণ্টে নাকি ইহুদীগণের সংখ্যাই বেশী। ইহাও ঠিক নহে। সমগ্র অধিবাসীদের মধ্যে জার্ম্মাণ ইহুদীগণ শতকরা দশজনেরও কম হইবে, কি করিয়া তাহারা Reichstag পূর্ণ করিবে। জার্ম্মানী ইহুদীগণের নিকট জার্ম্মাণসভ্যতা ও শিল্পকলার উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রভূত পরিমাণে ঋণী। ৪৪ জন নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত জার্ম্মাণগণের মধ্যে ৮ জন ইহুদী। ব্যাঙ্কার, উকিল, ডাক্তার, সাংবাদিক ও অন্যান্য বিভাগে যাহাতে বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন সে সব স্থানে জুদের সংখ্যা অধিক ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু তাহারা নিজের গুণের দ্বারাই ঐ সব পদ পাইয়াছে। হিট্‌লারের অত্যাচারে জুদের জার্ম্মাণী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইতেছে যাহারা আছে তাহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইহুদীগণের উপর সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই অত্যাচার হইয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণীর এই মনোভাব নূতন নহে। জার্ম্মাণগণ তাহাদের সকল দুঃখের কারণ ইহুদীদের মনে করে ও তাহাদের উপর অত্যাচার করে। কেবল মাত্র মহাযুদ্ধের অবসানের পর লিবারেল ডেমোক্রেটীক গবর্ণমেণ্ট জুদিগকে অন্যান্য নাগরিকদের সহিত সমান অধিকার দান করিয়াছিল। হিট্‌লারের ইহুদীদের উপর এই বিরুদ্ধ মনোভাবকে নাৎসীবাদের সাফল্যকল্পে একটী শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত করিয়াছেন মাত্র। জার্ম্মানী আবার মধ্যযুগীয় অত্যাচারের আমলে ফিরিয়া গিয়াছে।

ন্যাশনাল সোসালিষ্ট পার্টির নেতা হিটলারের তিনটী মুলমন্ত্র—১ম, ভার্সাই সন্ধির সকল চুক্তি অমান্য করা—২য়, জার্ম্মাণীর পূর্ব্বের সম্মান ও প্রতিপত্তি ফিরাইয়া আনা—৩য়, জার্ম্মাণ জাতি জগতের

যে সকল অংশে আছে সেই সকল স্থান যথা সম্ভব জার্ম্মানীর অধীনে আনিবার চেষ্টা করা এবং অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর মিলন কার্য্যে পরিণত করা। ১৯৩৫ সনে সন্ধির সামরিক চুক্তি হিটলার অমান্য করেন এবং বাধ্যতামূলক সামরিক নীতি পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন—এই ব্যাপারে ফ্রান্স বা বৃটেন কেহই বাধা দিতে সক্ষম হইলনা এই সময় হইতেই হিটলারের প্রতিপত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল এবং বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিপত্তি ইউরোপে কমিতে লাগিল। ১৯৩৬ সনে রাইনল্যাণ্ডে পুনরায় জার্ম্মাণ সৈন্য প্রবেশ করিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের হস্তে ক্রীড়নক রাষ্ট্রসঙ্ঘ হিটলারের এই অসমসাহসিকতার কোনরূপ বাধাই প্রদান করিতে সমর্থ হইল না, সমগ্র ইউরোপ ভীত হইয়া যুদ্ধের পূর্ব্বেকার পন্থা অর্থাৎ সমরসজ্জা বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য-যাহারা ফ্রান্স ও বৃটেনের উপর নির্ভর করিয়াছিল —তাহারা উহাদের উপর আস্থা হারাইল।

মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রিয়ার অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িল অধীনস্থ রাজ্যসকল হইতে বিচ্যুত হইয়া অষ্ট্রীয়া একটী শক্তিহীন রাজ্যে পরিণত হইল---অন্যের সাহায্য ব্যতীত ইহার স্বাধীনতা রক্ষা করাই মুস্কিল হইয়া পড়িল। যুদ্ধের অবসানের পর অষ্ট্রীয়া আশা করিয়াছিল যে মিত্র শক্তিগণ জার্ম্মানীর সহিত অষ্ট্রিয়ার মিলনের পক্ষ সমর্থন করিবে। কিন্তু ইটালী এবং ফ্রান্স ইহার বিরুদ্ধে যাওয়ায় এ আশা সফল হইল না। তাহারা ভয় পাইল অষ্ট্রিয়াও জার্ম্মানী একত্রিত হইলে পুনরায় মধ্য ইউরোপে জার্ম্মান প্রাধান্য স্থাপিত হইবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ফ্রান্স টাকা ধার দিয়া অষ্ট্রিয়াকে পুনর্জ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইল। Dr Seipel অষ্ট্রিয়ার অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। Dr Dolfuss তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইলেন। হিটলারের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়া, জার্ম্মান রিপাবলিকের সহিত মিলিত হইবার জন্য মাঝে মাঝে আন্দোলন করিতে লাগিল। ১৯৩৩ সনে হিটলারের অভ্যুত্থানে তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইল—অষ্ট্রিয়ার অধিকাংশ লোকই নাৎসী ষ্টেটের সহিত একত্রিত হইবার বিরুদ্ধে ছিল। হিটলার বিস্তৃতভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অষ্ট্রীয়াতে নাৎসী পার্টির জয় হইল। নাৎসী পার্টীর সহিত গভর্ণমেণ্ট পার্টির সর্ব্বদাই সংঘর্ষ বাধিতে লাগিল। ইহার ফলে ডাঃ ডলফাস ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মান গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। Dr. Schuschnigg ইহার পর চ্যান্সেলার হইলেন। অষ্ট্রিয়ার নাৎসী ষড়যন্ত্রকারীদের আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং হিট্‌লার ডাঃ শুশনিগের বিরুদ্ধে তাহাদের উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসোলিনী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালীর সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলেন ও সতর্কবাণী পাঠাইলেন যে অষ্ট্রীয়ার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তিনি বদ্ধপরিকর। হিট্‌লার তখন তাহার কাজে বাধা পাইলেন। পরে ইটালীকে তাহার আবিসিনিয়ার উপর দস্যুবৃত্তিতে সাহায্য করিয়া হিটলার মুসোলিনীর সহিত বন্ধুতায় আবদ্ধ হইলেন। এখন তাহার কার্য্যে বাধা দিবার কেহই নাই। ইংলণ্ডও হিটলার ও মুসোলিনীর মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হইবার জন্য উৎসুক। একা ফ্রান্স ইংলণ্ডের

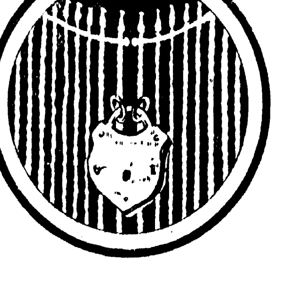
সাহায্য ছাড়া কিছু করিতে অক্ষম। চতুর হিট্‌লার সুযোগ বুঝিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী হিটলার ও ডাঃ শুশনিগ Berchtesgadenএ সাক্ষাৎ করিলেন। হিটলার ডাঃ শুশনিগকে একটী Ultimatum পাঠান। ১৫ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ইহার সর্ত্তগুলি যদি মানিয়া না লয়েন, তবে হিটলার অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিবেন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। হিটলার নিজ মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি এখন আর কাহাকেও ভয় করেন না। "There was a real risk for me, when I sent my troops into the Rhineland," said he to Schuschnigg—"But to-day I can do with you whatever I want. The occupation of Austria would be no more difficult for the Reichswehr than an ordinary military parade. No assistance will come from outside. Neither Italy nor France nor England will move." ইহার পর Schuschnigg বাধ্য হইয়া চ্যান্সেলারসিপ পরিত্যাগ করিলেন ও অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য বিনা রক্তপাতে লুপ্ত হইল। এতবড় দস্যুবৃত্তি জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই।

অষ্ট্রিয়ার জয়ের পর চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯১৯ সনে—চেকোশ্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরার অন্তর্গত ছিল। যুদ্ধের পর চেকোশ্লোভাকিয়া নবরাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৩৫ সনে পর্য্যন্ত প্রফেসর মাসারিক ইহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাহার স্থলে ডাঃ বেনেশ পরে প্রেসিডেণ্ট হন। উভয়েই অতি দক্ষতার সহিত রাজ্য পরিচালনা করিয়া ইউরোপে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নাৎসী জাগরণের পর হইতেই ধীরে ধীরে চেকাশ্লোভাকিয়ায় অশান্তির সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে।

চোকাশ্লোভাকিয়ার ব্যবস্থাপক সভার ৪৯ জন সভ্য নাৎসী দল হইতেই গৃহীত হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে দুইদল ছিল, এখন এই সংবদ্ধ দলই ব্যবস্থাপক সভার বৃহত্তম সংহতি। অথচ সমগ্র চেকোশ্লোভেকিয়ায় শতকরা ২২জনের অধিক জার্ম্মান ভাষী নাই। ২২শে ও ২৯শে মে চেকোশ্লোভাকিয়ার মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচনের দিন স্থির ছিল। এই সময় চেকোশ্লোভোকয়ার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। তবে ডাঃ বেনেশ ও মন্ত্রী হোজা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রাণপণে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। নির্ব্বাচনের দিনে জার্ম্মাণভাষীদের গ্রামে ও সহরে নানারূপ অশান্তির সৃষ্টি হইতেছিল। সামান্য ঘটনাকেও বার্লিনের সংবাদপত্রিকাগুলি অতিরঞ্জিত করিয়া প্রকাশ করিতেছিল, সুদেতেন জার্ম্মানদের উপর নানারূপ অত্যাচার করা হইতেছে। ইহার মধ্যে দুজন চেক্—পুলিশ কর্ত্তৃক হত হয়। জার্ম্মাণভাষীগণ হের হেনলিনের নেতৃত্বে তাহাদের প্রেস ও বাক্যের স্বাধীনতা ও নিজেদের দলগঠন করিবার অধিকার দিবার জন্য আবেদন করে। এখানেও হিটলার প্রকাশ্যে নাৎসীদলের সহিত যোগ দেওয়া সম্ভব হইলে দিতেন।

কিন্তু হিট্‌লার জানেন অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার অবস্থার মধ্যে তফাৎ আছে। উপরন্তু ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী, রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। বর্ত্তমানেও ফ্রান্স ও রাশিয়া পুনরায় তাহাদের অঙ্গীকারের কথা স্বীকার করিয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ডাঃ বেনেশকে হেনলিনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জার্ম্মাণদের সকল অভাব অভিযোগ যতদূর সম্ভব দূর করিবার জন্য অনুরোধ জানান। ডাঃ বেনেশ ও হেনলিন ইহাতে স্বীকৃত হন। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপদ মনে হয় আপাততঃ কাটিয়া গেল। তবে সকলেই নিজেদের ঘর সামলাইতে ব্যস্ত। প্রয়োজন হইলে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে কে কতটা পারিবে বলা যায় না।

হিট্‌লার স্পেনের গৃহ বিবাদেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তিনি ও মুসোলিনী জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করিতেছেন। অচির ভবিষ্যতে স্পেনও ফাসিষ্ট ষ্টেটে পরিণত হইবে বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে ইউরোপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুশিয়া ব্যতীত সকল দেশই ফাসিষ্ট ষ্টেটে পরিণত হইবে। ফ্রান্সের অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। "ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীরের" মত তাহার অবস্থা হইয়াছে। ভবিষ্যত ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। যদিও প্রত্যেকেই ইউরোপীয় শান্তিরক্ষার জন্য প্রাণপণ করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন সকলেই তাহাদের সমস্ত শক্তি সামরিক সাজ সজ্জায় ব্যয়িত করিতেছেন। ভবিষ্যতে আবার আরেকটী যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা নিকটতর হইয়াছে। এবার ফাসিষ্ট শক্তির পরীক্ষা হইবে। কে জানে জার্ম্মানী ও ইটালীর ভবিষ্যতে কি নিহিত আছে? তবে বর্ত্তমানে হিট্‌লারের প্রচণ্ড দর্পে ইউরোপীয় রাজনৈতিক গগন কম্পিত হইতেছে।



নবীনচন্দ্রের কাব্যে অনার্য্যের মর্ম্মব্যথা

শ্রীআশালতা সেন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চন্দ্রচূড়ের পর 'রৈবতকে' আমরা দেখা পাই চন্দ্রচূড়ের ভ্রাতুষ্পুত্র নাগরাজকুমার বাসুকির। আর্য্য কর্ত্তৃক অধিকৃত অনার্য্য সাম্রাজ্য পুনরায় উদ্ধারের বাসনায় বাসুকি ঋষি দুর্ব্বাসার সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ঋষি দুর্ব্বাসার উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার অনুগামীবর্গের বিনাশ সাধন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ব্যাঘাতকারী বলিয়া দুর্ব্বাসার হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা। শ্রীকৃষ্ণ প্রচারিত নিষ্কামধর্ম্ম সকাম বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির পরিপন্থী হইয়া ব্রাহ্মণ প্রাধান্য লোপ করিবে ইহাই দুর্ব্বাসার একান্ত বিশ্বাস। নিজ নিজ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য সাধনকল্পে উভয়ে একত্র সন্ধিতে আবদ্ধ ও গোপন মন্ত্রণায় নিযুক্ত হইলেও উভয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। প্রতিহিংসা পরায়ণ হইলেও, বাসুকি উদারহৃদয়, সরল ও অকপট, আর কুচক্রী দুর্ব্বাসা নিতান্ত ক্রূর ও কূটনীতিপরায়ণ। বাসুকি দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক আশার ছলনায় প্রতারিত, আর দুর্ব্বাসা কণ্টকদ্বারা কণ্টক উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যাপৃত। দুর্ব্বাসা আত্মগোপনে অত্যন্ত সুনিপুণ, আর বাসুকি নিজ হৃদয়ের ভাব দুর্ব্বাসার নিকট অসঙ্কোচেই ব্যক্ত করে। এমন কি দুর্ব্বাসার সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র বাহ্যিক শ্রদ্ধাও প্রকাশ করে না। তাই দেখি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামই কেবলমাত্র বাসুকির শত্রু কিনা, দুর্ব্বাসার এই প্রশ্নের উত্তরে বাসুকি আগ্নেয়গিরির মত জ্বালাময় অগ্নি প্রবাহ উৎসারিত কয়িয়া অতি স্পষ্টরূপেই বলে যে সমগ্র আর্য্যজাতিই তা'র পরম শত্রু! সে বলে—

"শত্রু মম আর্য্যজাতি ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ; আসমুদ্রগিরি
আমাদের এই রাজ্য হরিল যাহারা
প্লাবিয়া ভারতবর্ষ অনার্য্য শোণিতে !

* * *

আছিল যে জাতি এই ভারত ঈশ্বর
আজি তা'রা হা বিধাতঃ, বিদরে হৃদয়
অস্পৃশ্য, উচ্ছিষ্টভোজী, কুক্কুর অধম,
তাহাদের শূদ্র নাম, দাসত্ব ব্যবসা।

অর্দ্ধাহার অনাহার জীবন-নিয়ম,
পরমার্থ আর্য্যদের চরণলেহন।
পদচিহ্ন পুরস্কার! দেখিবে যখন
পবিত্র আর্য্যের মূর্ত্তি, যাইবে সরিয়া
শতহস্ত, প্রণমিবে ধূলি বিলুণ্ঠিয়া।
কেবল সঞ্চিবে অর্থ, ধরিবে জীবন,
আর্য্যের সেবার তরে।
একই শোণিত
বহিছে অনার্য্য আর্য্য উভয় শরীরে
এই নির্য্যাতন তবে সহিব কেমনে?"

সে দুর্ব্বাসার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ বলিয়া তাহাকেও রেহাই দেয় না, অনায়াসেই বলে,

"—যেই নীতিচক্রে
হ'তেছে অনার্য্য জাতি এত নিষ্পেষিত
তোমরা ব্রাহ্মণগণ প্রণেতা তাহার!"

দুর্ব্বাসার আর্য্যের জন্য একপ্রকার ও অনার্য্যের জন্য অন্যপ্রকার নীতি ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যাতে এবং একই কাজ আর্য্যের পক্ষে ন্যায় আর অনার্য্যের পক্ষে অন্যায় এইরূপ বুঝাইবার প্রচেষ্টার উত্তরে বাসুকি দুর্ব্বাসার মুখের উপরই সমুচিত প্রত্যুত্তর দেয়,—

"হা ধর্ম্ম, তুমিও তবে দুই মূর্ত্তি ধর;
একমূর্ত্তি অনার্য্যের, দ্বিতীয় আর্য্যের?
*　　*　　*
তর্কজালে বিজড়িত হেন শাস্ত্র ঋষি
কর গিয়া ঐ সিন্ধুনদে বিসর্জ্জন।"

সুভদ্রা-লাভ-প্রয়াসী বাসুকি দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে বলিতে থাকে,

"—করধৃত যষ্টি
নহি আমি ঋষি তব, ঘুরিব ফিরিব
ঘুরাইবে ফিরাইবে তুমি যেইরূপে।
নহে তব শুষ্ক যষ্টি মানব হৃদয়
তাহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত পিপাসা।
নহে মৃত্তিকার সৃষ্টি, যথা ইচ্ছা তুমি
গড়িবে ভাঙ্গিবে। *　*　*
মুনি, উভয়ে আমরা

বনবাসী,—কিন্তু বন শুষ্ককাষ্ঠ তুমি
আমি মহা-মহীরুহ। তুমিতো নিস্ফল
পুষ্প, ফল, আশা-মত্ত যৌবন আমার।"

প্রবল আর্য্য-বিদ্বেষী হইলেও বাসুকি উন্নত হৃদয় ও সত্যাশ্রয়ী। শত্রুরও মহত্ত্ব এবং গুণ উপলব্ধি করার মত উদারতা তা'র আছে। শত্রুর নামেও মিথ্যা রটনা বা হীন বিদ্রূপ সে সহ্য করিতে পারে না। তাই মথুরার সিংহাসন ও সুভদ্রার পাণিপ্রার্থী বাসুকি শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে উভয় বিষয়েই প্রত্যাখ্যাত হইয়া যদিও তাঁহার প্রতি প্রবল ক্রোধ বিশিষ্ট ও শত্রুতা সাধনে তৎপর, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে দুর্ব্বাসার ব্যঙ্গোক্তি ও মিথ্যা দোষারোপ সে সহ্য করিতে পারে না। দুর্ব্বাসাকে সে স্পষ্টই বলে—

"মিথ্যা কথা! শত্রু কৃষ্ণ পরম আমার
শত্রুর অযথা নিন্দা কিন্তু অনার্য্যের
নহে বীর ধর্ম্ম ঋষি।"

আবার শরশয্যা শায়িত বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে বিদ্রূপ করিয়া যখন হীনচেতা দুর্ব্বাসা বলে—

"শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম ওই দেখ ওই,
মৃত সজারুর মত পড়িয়া ভূতলে,—
কিবা দৃশ্য হাস্যকর! বীর্য্যে অহঙ্কারে
ধরাকে ভাবিত সরা,—বুঝেছেন এবে
সার্দ্ধ তিন হস্ত ভূমে সেই পৃথিবীর
হ'য়েছে গর্ব্বিত শৌর্য্য বীর্য্য পরিমিত
ভীষ্ম ও ভীরুর শেষ এক পরিমাণ!"

তখন বীরত্বের এই বিদ্রূপে বাসুকি ক্রোধে জ্বলিয়া ওঠে। ভীষ্ম তাঁহার চির শত্রু আর্য্য বংশধর হইলেও সে দুর্ব্বাসার কথার প্রবল প্রতিবাদ করিয়া উত্তর দেয়,—

—"যজ্ঞ ব্যবসায়ী
কাপুরুষ, তুমি ঋষি,—বীরত্ব তোমার
অশ্বমেধ, নরমেধ, এই বীরত্বের
কেমনে বুঝিবে তুমি অতল মহিমা
মূষিকে বুঝিবে কিসে সিংহের গৌরব।"

(৩)

চন্দ্রচূড় ও বাসুকি এই দুইজন রাজ্যহারা হৃতসর্ব্বস্ব অনার্য্য রাজবংশধরের মুখ দিয়া কবি অনার্য্য-হৃদয়ের যে সুতীব্র মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ছাড়া আর একটি বেদনাহত হৃদয়ের চিত্রও তিনি জ্বলন্ত ও জীবন্তভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্র অনার্য্য রাজকন্যা বাসুকি সহোদরা

জরৎকারুর। কৈশোর প্রভাতে কৃষ্ণার্পিত হৃদয়ে জরৎকারুর প্রেম মহাসিন্ধুর মতই অকূল ও অতলস্পর্শ; ঠিক তেমনই সতত আকূল আবেগে তরঙ্গায়িত। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে কৃষ্ণদর্শনাশায় আগতা ও পথ প্রান্তে অবসাদভরে মূর্চ্ছিতা জরৎকারুকে ধূলায় লুণ্ঠিত অবস্থায় পতিত দেখিয়া করুণারূপিণী ভদ্রাদেবী তাঁহাকে নিজ অঙ্কে সংস্থাপন করিয়া সযত্ন শুশ্রূষায় সচেতন করিয়াছেন। সেই সময় ভদ্রার সহিত কথোপকথন কালে জরৎকারুর হৃদয়ের বেদনা বিধাতার বিধানে অভিযোগের ভিতর দিয়া কি ব্যাকুল ভাবেই না উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে,—

> "হায় নাথ, তুমি পিতা," — চাহি আকাশের পানে
> কাতরে করুণ কণ্ঠে কহে নাগবালা,
> "হায় নাথ, তুমি পিতা নহ কি অনার্য্যদের
> তবে কেন তাহাদের কপালে এ জ্বালা।
> মানব তাহারা নহে যদি নাথ, তবে কেন
> একরূপ রক্তমাংসে করিলে সৃজন।
> কেন বা হৃদয় দিলে, হৃদয়েতে দিলে প্রেম
> প্রেমেতে নিরাশা দিলে গভীর এমন ?"

অতুল সৌন্দর্য্য ও বহু গুণশালিনী এবং একটি প্রাচীন বিশিষ্ট রাজবংশ সম্ভূতা অভিমানিনী জরৎকারুর দৃঢ় বিশ্বাস যে সে কেবলমাত্র অনার্য্যা বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাহার প্রণয় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ও তাহার সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে সম্মত হন নাই। কিন্তু সে অনার্য্যা বলিয়া তাহার কি হৃদয় নাই ? আর তাহার সেই হৃদয়ের অনুরাগ কি আর্য্যনারীর অনুরাগ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট ? তাহা কখনই নয়, অনন্যহৃদয়া জরৎকারুর বাঞ্ছিতের প্রতি তাহার অবিচলিত নিষ্ঠার ভিতর দিয়া জীবন ভরিয়াই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। তাহারই জন্য আজীবন চিরব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকিয়া জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়াও আকুল আবেগে বলিয়াছে।

> "তুমি নয়নের আভা, তুমি রসনার সুধা,
> তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল,
> তুমি মম চির সুখ, তুমি মম চির দুঃখ
> সুখ দুঃখ মন্থনের অমৃত শীতল।"

প্রণয়ের প্রতিদান বঞ্চিতা অনার্য্যা রাজকুমারী জরৎকারুর হৃদয় বেদনা এই একদিকে যেমন তীব্র, অপর দিকে অনার্য্য রাজবংশধর রাজ্যচ্যুত ভ্রাতা বাসুকির জন্য তাহার মর্ম্মজ্বালাও তেমনই অপরিসীম। জীবনের সকল সুখের আশা বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র সহোদরের কল্যাণ কামনাতেই সে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছে। নিজের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ বলিয়া কিছুই আর সে অবশিষ্ট রাখে নাই।

শৈশবে পিতৃ মাতৃহীনা কারু জ্যেষ্ঠ সহোদরের অপরিসীম স্নেহে ও যত্নে লালিতা ও বর্দ্ধিতা। কারুর ভাষায় বাসুকি তাহার একাধারে "পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সহচর।" তাহার নিরাশার অন্ধকারে আবৃত হৃদয়ে একটি মাত্র আশার আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছে—কারুর ভাষায় তাহা—

"ভ্রাতার সাম্রাজ্য আশা এক ক্ষীণালোক।" ভ্রাতার সাম্রাজ্য উদ্ধারের সহায়তা কল্পে কারু যে দুর্ব্বাসাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে তাহারই সহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক বাহ্যিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে এবং নিয়ত ক্রোধপরায়ণ ব্রাহ্মণের হস্তে অনার্য্যা বলিয়া বহু লাঞ্ছনা ও অপমান সর্ব্বদাই সহ্য করিতেছে। রাজ্যোদ্ধার প্রচেষ্টায় বহুধা বিচ্ছিন্ন অনার্য্য জাতিকে পুনরায় একসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য বাসুকি কোথায় কোন্ দূর দূরান্তরে পর্ব্বত, প্রান্তর ও বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর কারু গৃহদ্বারে তাহারই জন্য গভীর চিন্তামগ্ন হৃদয়ে পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। দুর্ব্বাসা আসিয়া আর্য্যধর্ম্ম অনুসারে তাহাকে উপদেশ দেয়,—

"পতিচিন্তা একমাত্র সতী রমণীর
মহাধর্ম্ম, অন্য চিন্তা মহাপাপ তার
নারীর আবার কেবা পিতা মাতা ভ্রাতা
তাহার সর্ব্বস্ব স্বামী। বিবাহের সাথে
ছাড়ি পিতৃকুল পতিকুলেতে স্থাপিত
হয় অরুন্ধতী মত। হ'লে বৃক্ষান্তর,
ভাঙ্গিয়া পড়ুক ঝড়ে, পড়ুক কুঠারে
পূর্ব্ব তরু, আছে তাহে দুখ কি লতার?"

কারু দুর্ব্বাসার কথায় শিহরিয়া ওঠে ও এই আর্য্য ধর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া বলে—

"শিব, শিব, একি কথা! ইহা যদি প্রভু
নারী ধর্ম্ম আর্য্যদের, অনার্য্যা এদাসী
পারিবেনা তাহা কভু করিতে পালন।"

কারু যে তাহার সমস্ত হৃদয় ভ্রাতার সুখ দুঃখের সঙ্গেই মিশাইয়া দিয়াছে। তার কথা,—

"মানব-হৃদয়-সিন্ধুনদ শতমুখ
কত আশা, কত তৃষ্ণা, কত ভালবাসা,
অবরুদ্ধ সর্ব্বস্রোত মম হৃদয়ের।
একস্রোতে হায়, আমি দিয়াছি ঢালিয়া
এজীবন এহৃদয়; সহোদর স্নেহ
সেই স্রোত, সেই স্বর্গ।"

দীর্ঘকাল পরে বাসুকি উদ্বেগ আকুল কারুর গৃহপ্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসে। ভগিনীর দুর্ব্বাসা-লাঞ্ছিত জীবন-চিত্র তাহার চোখের কাছে ভাসিতে থাকে, ক্রোধে ও ক্ষোভে সে গর্জ্জিয়া ওঠে—

"নরাধম দুরাচার!"—লৌহ দৃঢ়তম
আঘাতিল শিলা দৃঢ় —অনন্ত স্ফুলিঙ্গ
ছুটিল বাসুকি চোক্ষে—"পাপী নরাধম
ধর্ম্মব্যবসায়ী, জ্ঞানী! সুসভ্য ইহারা
আমরা অনার্য্যগণ অসভ্য বর্ব্বর!
হা বিধাতা, বাসুকির স্নেহের মৃণালে
একটি যে নীলোৎপল, অতুল জগতে
ফুটিল,—তাহার ভাগ্যে লিখিলে এ লিপি।
ফেলিলে আনায়ে এই বনের শার্দ্দূল,
করিলে নির্বীর্য্য হেন, রয়েছে চাহিয়া,
ভগিনীর অপমান।"

যে আর্য্য জাতিকে সে পরম শত্রু বলিয়া জানে, রাজ্যোদ্ধার প্রচেষ্টায় সেই আর্য্য জাতিরই এক কূটচক্রী ব্রাহ্মণের কাছে আজ বাসুকি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এখন এই বন্ধন জাল ছিন্ন করিবার সাধ্যও আর তার নাই। তাই আবাল্য স্নেহলালিতা সহোদরাকে বক্ষে ধারণ করিয়া নিষ্ফল আক্রোশে বাসুকি কেবল অশ্রু ধারাই বর্ষণ করিতে থাকে—কোনোদিকে কোনওরূপ পরিত্রাণ পাইবার পথ কিছুই সে আর খুঁজিয়া পায় না!

সুদূর অতীত হইতে নিকটতম কাল পর্য্যন্ত কতনা অলিখিত ইতিহাসের পাতায় পাতায় কতনা নিপীড়িতের গভীর মর্ম্মবেদনার কাহিনী পুঞ্জীভূত হইয়া আছে; কে তাহার পরিমাপ করিবে? আর্য্যের হস্তে অনার্য্যের বিজেতার হস্তে বিজিতের, প্রবলের হস্তে দুর্ব্বলের; কতনা লাঞ্ছনার বারতা, ভারতের কেন জগতের সর্ব্বত্র, যুগ যুগ ধরিয়া আকাশে বাতাসে গুমরিয়া মরিতেছে কে তাহার সংবাদ জানে? কিন্তু ইহার কি প্রতিকার নাই? এ জগৎকি এমন করিয়া গড়িয়া তোলা যায় না যে সেখানে আর্য্য ও অনার্য্য, বিজেতা ও বিজিত, সবল ও দুর্ব্বল বলিয়া কোনও পার্থক্য থাকিবেনা, কাহারও শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান অন্যের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিতে উদ্যত হইবে না। এমন কি সম্ভব হয় না যে সর্ব্বত্রই মানুষ মানুষের সহিত এক পরম প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। সর্ব্বত্রই মানুষ মানুষকে কেবল মাত্র মানুষ হিসাবেই মানিয়া লইয়া সকলের সমান অধিকার স্বীকার করিয়া লইবে?

আজ মনে হয় যেন নবীন যুগের দিগন্ত রেখায় এমনই এক উষার আভাস দেখা যাইতেছে! মনে হয় যেন মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম ও গভীর সহানুভূতির স্পর্শে জগৎ এক সম্পূর্ণ নূতনরূপ ধারণ করিবে। কবি নবীনচন্দ্র সমগ্রজগৎব্যাপী প্রীতিরবন্ধনে আবদ্ধ যে এক মহান বিশ্বরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়া ব্যাসদেবের মুখ দিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণকে শুনাইয়াছেন এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ পরিসমাপ্ত করিতেছি,—

"যেইরূপে আর্য্যজাতি আঘাতিয়া বলে
করিয়াছে স্থানভ্রষ্ট অনার্য্য দুর্ব্বলে,—
সেই বলে প্রতিঘাত পাইবে নিশ্চয়
একদিন! বিশ্বরাজ্য, দেখ বাসুদেব
রাজত্বের মহাদর্শ।—নহে পশুবল
ভিত্তি কিংবা হে কংসারি,—নিয়ম ইহার।
বিশ্বরাজ্য প্রীতিরাজ্য, রাজত্ব দয়ার,
বিশ্বরাজ্য ন্যায়রাজ্য, রাজত্ব নীতির।
ক্ষুদ্র বনপুষ্প হ'তে অনন্ত গগন
সর্ব্বত্র অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত কৌশল,
সর্ব্বত্র অনন্ত প্রীতি। হেন মহারাজ্য
যতদিন যদুশ্রেষ্ঠ না হবে স্থাপন,
ততদিন আর্য্যরাজ্য—জানিও নিশ্চয়,
ভীষণ কালের স্রোতে বালির সৃজন।"

কবির মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ এই বিশ্বরাজ্যের মহান্ স্বপ্ন অচিরেই সফল হউক!

অবাধ পণ্যক্ষেত্র।

(শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

"বণিকের মানদণ্ড কি ভাবে সমাজবিপ্লবের পথে ধীরে ধীরে "রাজদণ্ডে" পরিণত হল, পূর্ব্বেই আমরা সে আলোচনা করেছি। কিন্তু সে ইতিহাস, বিশেষভাবে ইয়োরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে, বণিক ও শিল্পপতির ক্রম-প্রাধান্যের সূত্র ধরে আমরা এসিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকায় উপস্থিত হলাম। পণ্যক্ষেত্রের অবাধ বিস্তৃতির পরিধি, পশ্চিম ইয়োরোপকে কেন্দ্র করে বিশাল পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হল। মধ্যবিত্তের এই দিগ্বিজয়ী অভিযান পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর কলম্বস্, ভাস্কোডাগামা, লিভিংষ্টোন্, ষ্টান্লীর রোমাঞ্চকর, অথচ বিচ্ছিন্ন সমুদ্রযাত্রা বা ভূ-পর্য্যটন প্রচেষ্টামাত্র নয়। শিল্পোৎপন্ন সামগ্রী গ্রহণের উপযোগী, ক্রম-সম্প্রসারণ-শীল পণ্যক্ষেত্রের অন্বেষণই এই জয়যাত্রার উৎস! Marxএর ভাষায় "The need of a constantly developing market for its products, chases the bourgeoisie over the whole surface of the globe. It must nestle everywhere, settle everywhere, establish connections everywhere."

কিন্তু সর্ব্বত্র যোগসূত্র স্থাপনের যে কথা Marx এখানে বলেছেন, সেই সংযোগ দুই সম-পর্য্যায়ের শক্তির মধ্যে ঘটেনি। দুর্ব্বল, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির নাম মাত্র অধীন, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং-সম্পূর্ণ "স্বদেশী-সমাজে"র উপরে ধনতন্ত্রের ভিত্তির পরে গঠিত, অতি সুদৃঢ়, জাতীয় রাষ্ট্রের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে শীঘ্রই প্রথমোক্তকে দ্বিতীয়ের কাছে অবনতি স্বীকার করতে হল। এ অবনতি স্বীকার শুধু বিজ্ঞান, সাহিত্য বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়—এর অর্থ সামন্ত-তান্ত্রিক প্রাচ্যের উপরে ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিক প্রাধান্য বা সাম্রাজ্যবাদ।

পণ্যক্ষেত্রের আয়তন ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনপ্রণালীর ব্যাপকতার বিচারে, সাম্রাজ্যবাদ পণ্যক্ষেত্র বিস্তার প্রচেষ্টার সাফল্য নির্দ্দেশক। মুদ্রাব্যবহারের প্রচলন, রেলপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি সহস্র

উপায়ে সাম্রাজ্যবাদীশক্তি ধীরে ধীরে, দাস দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক ক্রয়-বিক্রয়ের উন্মুক্তপ্রাঙ্গণে উপস্থিত করে—স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্যতার বিলুপ্তি ঘটায়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় সাম্রাজ্যবাদ অবাধ পণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার চরম সোপান।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ প্রকৃতপক্ষে অবাধ পণ্যক্ষেত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে।

প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদের অর্থ অবরুদ্ধ পণ্যক্ষেত্র। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাষ্ট্রিক ক্ষমতা প্রয়োগে দাসদেশের পণ্যক্ষেত্র অন্যান্য দেশের নিকট সম্পূর্ণ না হলেও আংশিকভাবে রুদ্ধ রাখে—সেখানে বিশেষভাবে তার নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের পণ্যক্ষেত্র, এইভাবে প্রথম যুগে, বৃটিশ অর্দ্ধদস্যু, অর্দ্ধ-বণিকের লুণ্ঠনের, দ্বিতীয় যুগে বৃটিশ শিল্পোৎপন্ন সামগ্রীগ্রহণের এবং বর্ত্তমানে বৃটিশ মূলধন প্রয়োগের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হ'য়েছে। চীনের পণ্যক্ষেত্র সম্বন্ধে, আমেরিকার "Open door" প্রস্তাবে এ কথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরপদানত না হ'লেও অর্থনৈতিক সুবিধা (economic concession) ও রাষ্ট্রিক অবনতি স্বীকার (Political Capitulation) ক্রমে ক্রমে চীনকে বিভিন্ন ধনতান্ত্রিকশক্তির নিজ নিজ সীমাবদ্ধ পণ্যক্ষেত্রে পর্য্যবসিত ক'রেছিল। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দক্ষিণ আমেরিকার স্বয়ংনিযুক্ত অভিভাবক, Munroe -doctrineএর নিয়ামকের এই আকস্মিক নিরঙ্কুশ পণ্যক্ষেত্র-প্রীতি হাস্যকর বটে। বাস্তবিক প্রতিপত্তি-ক্ষেত্র (Sphere of influence), বিশেষ আজ্ঞা অনুযায়ী শাসিতরাজ্য (mandate) আশ্রিত রাষ্ট্র (Protectorate) ডোমিনিয়ান হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ অধীন রাজ্য পর্য্যন্ত সকল দেশেই বিভিন্ন পরিমাণে পণ্যক্ষেত্রের অবাধতা ক্ষুন্ন হ'য়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শুধু বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকটই পরাধীন দেশের পণ্যক্ষেত্র অবরুদ্ধ রাখে না। শুল্ক নিরূপণ অধিকারের অপ-প্রয়োগ দ্বারা অধিকৃত দেশের উন্মেষমুখী ধনতন্ত্রকেও কৃত্রিম উপায়ে শৃঙ্খলিত করে। প্রকৃতপক্ষে ভিতর ও বাহিরের ধনতন্ত্রের যথেচ্ছ বিনিময়ের অধিকার যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত ক'রবার জন্যই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতে Cotton excise dutyর কলঙ্কময় ইতিহাস এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। অবাধ বাণিজ্য, laissez faireএর ইংলণ্ড কিভাবে আইনের পর আইন রচনা করে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য বিনষ্ট করেছে মেজর বি, ডি, বোসের "Ruin of Indian Trade and Industries" পুস্তকে তার বিবরণ সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। নূতন ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায়ও শুল্ক নিরূপণের চরম ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের বজ্র মুষ্টিগত রইল।

সাম্রাজ্যবাদ ও অবাধ পণ্যক্ষেত্র যদিও এই দুই কারণে পরস্পর বিরোধী তবু উনবিংশ ও প্রাক্‌সামরিক বিংশ শতাব্দীর জগতে ব্যাপক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-যত অসম্পূর্ণভাবেই হোক্—অবাধ পণ্যক্ষেত্রেরই সাক্ষ্য দিত। কিন্তু উত্তরসামরিক পৃথিবীতে বিশেষভাবে ১৯২৯এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর থেকে পণ্যক্ষেত্রের অবাধতা অতি দ্রুতভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে। শুল্কপ্রাচীরের ক্রমবর্দ্ধমান উচ্চতা, আমদানী পণ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ (quota), উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, Trust, Cartel প্রভৃতি

একচেটিয়া শিল্পের বিকাশ, আন্তর্জাতিক নির্ভরশীলতার পরিবর্তে জাতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভ্যুদয়—অর্থাৎ অর্থনৈতিক জাতীয়তার বিভিন্ন উপসর্গগুলির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। পৃথিবী আজ ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের একচ্ছত্র অধিকারভুক্ত হয়ে খণ্ড, খণ্ড, বিচ্ছিন্ন পণ্যক্ষেত্রের সমষ্টিতে পরিণত হ'য়েছে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে অবাধ পণ্যক্ষেত্র বিস্তারের প্রচেষ্টা প্রলয়োচ্ছ্বাসের মত জগতকে অভিভূত করেছিল। সেই স্রোত ক্রমশঃ প্রশমিত হয়ে অধুনা এতই নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে যে তার স্বল্পপ্রাণতায় ক্ষুব্ধ হয়ে অনেক অর্থনীতিবিদ্ আজ "হায় রে সেকাল" বলে আক্ষেপ করছেন। অনেকে আবার নূতন করে অবাধ পণ্যক্ষেত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে চান। অবশ্য আসন্ন জগৎযুদ্ধের পৃষ্ঠপটে পণ্ডিতদের এপ্রকার অধিকাংশ আলোচনাই নিস্ফল, সূক্ষ্ম কূটতর্কমাত্র। অনৈতিহাসিক দৃষ্টির ফলে তাঁরা এ কথা ভুলে যান যে ধনবাদেরও জন্ম, বিকাশ, জরা ও বিনষ্টি আছে। পণ্যক্ষেত্রের সম্প্রসারণ যেমন ধনতন্ত্রের বিকাশের চিহ্ন—বর্ত্তমানে পণ্যক্ষেত্রের সঙ্কোচন তেমনই তার জরা নির্দ্দেশক। ধনবাদের নিজস্ব নিয়মেই, মূলধনের ক্রম-কেন্দ্রীভূততার ফলে পণ্যক্ষেত্রের সঙ্কোচন অবশ্যম্ভাবী। সাময়িকভাবে এ নিয়ম ব্যাহত হওয়া সম্ভব, কিন্তু জরায়মান ধনবাদের পুনর্যৌবন আনয়নের উপযোগী অর্থনৈতিক কায়কল্প চিকিৎসা আজও আবিষ্কৃত হয়নি। কাজেই নিরঙ্কুশ বিনিময়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সংস্কৃতি সৃষ্টি যাঁদের কাম্য—সাম্রাজ্যবাদ ও তার মূল ধনবাদ এই দুইএর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাঁদের প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

(সমাপ্ত)

যা স্বাভাবিক

(গল্প)

শ্রীমানকুমারী সান্ন্যাল

কলিকাতায় কোন একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ক্লাশ বসিবার ঘণ্টা পড়িতেই উচ্ছ্বসিত জোয়ারের জলের মত মেয়েরা হুড়মুড় করিয়া যে যাহার ক্লাশে ঢুকিয়া পড়িয়া অকারণ ও অবান্তর হাসি গল্পে মশ্‌গুল্ হইয়া উঠিল। চারিদিকে পরিপূর্ণ জীবনের আনন্দস্রোত। প্রত্যহ এইরূপ স্কুল বসিবার পূর্ব্বে একচোট বকুনী খাওয়া যেন ইহাদের নেশার সামিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তবুও যাঁহারা বকেন ও বকুনী খায় তাহাদের কাহারও মধ্যেই উৎসাহের অভাব পরিলক্ষিত হইত না।

বাজে-কথার মাঝখানে তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়া ঢুকিলেন—গণিতের শিক্ষয়িত্রী মিসেস হাল্‌দার। প্রথমেই রোল্‌কল্' সুরু হইল; তাহাতেও স্বস্তি নাই। একের নম্বরে অপরে উত্তর দিয়া বসে, ফলে ক্ষুদ্র গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

মিসেস্ হাল্‌দার গম্ভীর স্বরে হাঁকিলেন—"ফোরটিন!"—তখন অনেকেই দেখিল তৃতীয় বেঞ্চির প্রথম সিট্ খালি, শীলা নাই। শীলা স্কুল-সংলগ্ন বোর্ডিংএ বাস করে।

লতি হাসিয়া চুপি চুপি ধীরাকে কহিল—"দত্ত যে বলেন "নিয়ারেষ্ট দি চার্চ্চ, ফারদেষ্ট দি গড"—কথাটা খাঁটি বটে!"

ঠিক এই সময়ে একটি ১৪।১৫ বছরের মেয়ে একগাদা বই খাতা লইয়া ছুটিয়া আসিয়া ক্লাশে ঢুকিল।

মিসেস্ হাল্‌দার কঠিনকণ্ঠে তাহার দেরীর কারণ শুধাইলেন।

শীলা নতমস্তকে মৃদুকণ্ঠে বলিল—"চোখে একটা ওষুধ দিচ্ছিলাম, সেইজন্যে—"

বাধা দিয়া হাল্‌দার একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই বলিলেন—"তোমার ডান চোখটাও খারাপ হচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ—কাল থেকে হঠাৎ বড় ব্যথা হোয়েছে।"

হালদার আর কিছু না বলিয়া তাহাকে বসিতে বলিলেন এবং অঙ্কের প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

বৈকালে বইখাতার স্তূপ ডেস্ক-জাত করিয়া শীলা মাঠে আসিয়া বসিল। ডান চোখে ব্যথা হওয়ার দরুণ তাহার মনটা আজ একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল।

বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান হইয়া শীলা আজীবন মাতুলালয়েই কাটাইয়াছে। জন্মের কিছুদিন পরেই নিদারুণ অসুখে তাহার বাঁ চোখটি একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছিল। অনেক

চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। মায়ের অনুনয়ে মামারা বাধ্য হইয়া তাহার একটি চোখকে সম্বল করিয়াই পড়াইতে সুরু করেন ও বোর্ডিংএ রাখেন।

ডান-চোখটি এযাবৎ ভালোই ছিল, সহসা কাল হইতে ব্যথা হইয়া জল পড়িতেছে। লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লুকাইয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মাঠে শুইয়া থাকার কথাটাও মনে লাগিতেছে।

অনেকক্ষণ ভাবনার পর চিন্তাকে জোর করিয়া ফেলিয়া সে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় বোর্ডিংএর বারান্দা হইতে কে ডাকিল—"শীলা! ওপরে আয় একবার।"

চোখ তুলিয়া শীলা বলিল—"কেন স্নেহদি"?

"ওপরে এসে শুনবি আয়না!"—বলিয়া স্নেহ ঘরে ঢুকিয়া গেল।

শাড়ীর আঁচলটা জড়াইয়া লইয়া চটিটা পায়ে গলাইতে গলাইতে বেণী দুলাইয়া শীলা উপরে ছুটিল।

হলঘরে ঢুকিয়া সে থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, কারণ সেখানে বড় বড় মেয়েরা ছাড়া মিসেস কর ও মিসেস হালদার বসিয়াছিলেন। তাহার ইতস্ততঃতা দেখিয়া স্নেহ বলিল—"এখানে এসে বোস্—"

শীলা ধীরে ধীরে স্নেহের পাশে বসিয়া পড়িল। সকলের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভাব দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিজের কৃত শেষতম অপরাধের কথা মনে করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু গুরুতর কিছুই মনে পড়িল না। কয়েক মিনিট পরে সে অনুভব করিল ব্যক্তব্যটা কেহই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছেন না। প্রত্যেকেই অন্যের বলার অপেক্ষা করিতেছেন।

অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মিসেস হালদার বলিলেন—"দেখ শীলা! তুমি যে আমাদের কাছে প'ড়ছো—এ খুব আনন্দের কথা, তবে তোমার চোখ যে রকম দুর্ব্বল তাতে তোমার মঙ্গলের দিকে চেয়ে যদি কিছু বলি, আশা করি তুমি ভুল বুঝবে না। তোমার চোখ যেরকম দুর্ব্বল, তাতে এখনই হচ্ছে তোমার দিন কিনে নেবার সময়। ভগবান না করুন যদি ও চোখটাও বাড়ে তাহলে তুমি মুস্কিলে পড়ে যাবে। তাই বল্‌ছি যদি তুমি এইবেলা নার্সিংটা পড়ে পাস্ করে ফেলো তাহলে আখেরে তোমার সুবিধে হবে"। একটু থামিয়া আবার বলিলেন—"যদি তুমি নার্সিং পাস করে এখানে আসতে ইচ্ছে করো তো, স্বচ্ছন্দে আসতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি তখন তোমায় বোর্ডিংএর মাইনে করা নার্সরূপে নিতে পারি। তাছাড়া হেড মিস্‌ট্রেস্‌কে ব'লে ক'য়ে নীচু ক্লাশের দুএকটা 'সাব্‌জেক্‌ট্' পড়াবার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। এতে করে তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, কারও মুখাপেক্ষী হোয়ে থাকতে হবে না।

শীলা স্তব্ধ, নতমুখে মিসেস হালদারের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিল এবং সে কথার সারবর্ত্তাও বুঝিল, তবু মনে হইল সবাই তাহার উপর নিদারুণ অবিচার করিতেছে, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে সেভাব সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মৃদুকণ্ঠে—"আচ্ছা—" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

গৃহমধ্যস্থ সব কয়টি মহিলা ব্যথিত শ্বাস ত্যাগ করিলেন, যাহার অর্থ—'আহা, বেচারী।"

দিন সাতেক পরে জোর করিয়া মায়ের অনুমতি আদায় করিয়া সকলের অশ্রুভারাক্রান্ত দৃষ্টির মধ্য দিয়া ব্যথিত হৃদয়ে শীলা গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল।

৩

চার বৎসর পরে স্কুলের গেটে একটি ট্যাক্সি আসিয়া থামিল। একটি ১৯।২০ বছরের শ্যামবর্ণা তরুণী ত্রস্ত পদে নামিয়া পড়িয়া হাতে ঝুলানো ভ্যানিটী ব্যাগ হইতে একটা টাকা ট্যাক্সি চালকের হাতে দিয়া বোর্ডিং বাড়ীর দিকে আগাইয়া গেল।

অপরিচিতা একটি তরুণীকে সহসা কক্ষে ঢুকিতে দেখিয়া কক্ষ মধ্যস্থিত সবকয়টি মেয়েই বিস্মিত চোখে তাহার দিকে চাহিল। একমিনিট চাহিয়া ধীরার চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুক ভাসিয়া উঠিল—"শীলা না! হাঁ। তাইতো মনে হচ্ছে।"

শীলা থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঘরভরা মেয়েদের মধ্যে সবগুলিই নূতন মুখ; মাত্র ধীরা ও লতা তাহার পাঠ্যসঙ্গিনী। ধীরার কথায় আশ্বস্তচিত্তে সে আগাইয়া আসিল—"চিনতে পেরেছিস তাহলে?" লতা অন্য সকলের নিকট শীলার পরিচয় দিতেই অভিনন্দনের তোড়ে বোর্ডিং বাড়ী ভরিয়া শীলার আগমন বার্ত্তা ঘোষিত হইয়া গেল।

উত্তেজনা ঈষৎ কমিলে শীলা সব খবর লইতে লাগিল—"ওমা! স্নেহদির বিয়ে হোয়ে গেছে? এঁ্যা, মিসেস্ কর মারা গেছেন, মিসেস্ হালদার আছেনতো? দেখিস ভাই, তাঁরে এনে যেন তরী ডোবাস্‌নে। তোরা তো সেকেণ্ড ইয়ার হোয়ে গেলি—আশ্চর্য্য!" সব আনন্দের মাঝে সঙ্গিনীদের এতখানি পাঠোন্নতিটা তাহাকে একটু মুষড়াইয়া দিতে চাহিল,—সে যে থার্ড ক্লাশ পাস্‌ও নয়। কিন্তু তাহার সব ক্ষোভ জুড়াইয়া গেল ধীরা যখন বলিল, "আই, এ—বি, এ তো সবাই পাশ করছে, তোর মত ডাক্তার আর কটা হচ্ছে?"

তরুণ মন ব্যথা পায়ও যতবেশী, ভুলিয়াও যায় তত বেশী।

মিসেস্ হালদার তাঁহার কথা রাখিলেন। প্রিন্সিপ্যাল কে ধরিয়া শীলাকে বোর্ডিংএর মাইনে করা নার্সরূপে রাখিয়া দিলেন এবং এবং নীচু ক্লাশে প্রত্যহ দু-ঘণ্টা পড়ানোর ব্যবস্থাও করিয়া দিলেন। শীলার দিনগুলি আনন্দে, লঘু মেঘের মত কাটিতে লাগিল।

সেদিন কী একটা কাজে হেড্‌মিসট্রেসের অফিস-ঘর হইতে শীলা স্কুল বাড়ীর দিকে আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহার চোখে পড়িল তৃতীয় শ্রেণীর মেয়েদের কক্ষ। মিসেস্ হালদার গণিত শিক্ষা দিতেছেন। সহসা চার বৎসর আগের এই দৃশ্যটী মনে পড়িয়া গেল এবং কৈশোরের সে স্মৃতি মনে পড়িতেই তাহার ওষ্ঠে ঈষৎ হাস্যাভাষ জাগিয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমে মিসেস্ হালদারের নজরও ঠিক সেই সময়ে তাহার দিকে পড়িল—হয়তো তাঁহারও মনে পূর্ব্বের কিছু কথা জাগিয়া উঠিয়া থাকিবে—তাই চোখোচোখি হইতেই তিনি হাসিয়া ফেলিলেন।

শীলার হাসি মিলাইয়া গেল। মনে মনে সে বুঝিল তাহার অদৃষ্টে বকুনী তোলা রহিল কারণ মেয়েদের সম্মুখে শিক্ষয়িত্রী এ ভাবে হাসিয়া ফেলিলে তাহারা পাইয়া বসিবে যে! শীলা মুহূর্তে মুখ ফিরাইয়া লইয়া গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল।

সেদিনই সন্ধ্যায় সে যখন তাহার নার্সিং শিক্ষা-কালীন গল্প করিতেছিল, তখন সহসা গল্পে বাধা ঘটাইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন মিসেস্ হালদার। শীলার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ছিঃ শীলা? তখন তোমায় দেখে হেসে ফেললাম! মেয়েদের সামনে এ ভাবে হাসা অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে করি আমি।"

শীলা নতমুখে অপরাধটা স্বীকার করিয়াই লইল এবং তাহার মৌনতাকে দোষ স্বীকার ভাবিয়া হালদারও তুষ্ট চিত্তে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার জুতোর টক্ টক্ ধ্বনি বারান্দায় মিলাইয়া যাইতেই, শীলা সকালের ব্যাপারটা সঙ্গিনীদের বলিতে লাগিল। শেষে বলিল—"বাব্বাঃ, মিঃ হালদার যে কদিন বেঁচেছিলেন, মিসেস্ হালদারের কত তর্জ্জনই যে খেয়েছেন। বেশী রাগ হোলে বোধ হয়—" ধীরা সভয়ে হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল—"দূর বাঁদরী! চুপ কর এক্ষুনি যদি আবার এসে পড়েন!

৪

সেদিন শীতের অপরাহ্ণে লতি বলিল—"শীলা! ধীরা আর বীণাকে ডেকে নিয়ে আয়—ব্যাড্‌মিন্টন্ খেলি গে—"

চারজন মিলিয়া জাল বাঁধিয়া যখন খেলা সবে সুরু করিয়াছে, এমন সময় দরোয়ান আসিয়া সেলাম জানাইল। তাহার হাতের কাগজের টুকরাটী লইয়া পাঠ করিয়া শীলা হাতের ব্যাটটা ছুঁড়িয়া খানিক দূরে ফেলিয়া দিয়া বলিল—"বাড়ী চল্লুমরে! মামা এসেছেন!" বলিয়া সে বোর্ডিংএর দিকে চঞ্চলপদে অগ্রসর হইয়া গেল। লতি, বীণা ও ধীরা ঈষৎ ক্ষুণ্ণমনে জাল খুলিতে লাগিল।

লেডি সুপারিনটেণ্ডেণ্টের ঘরের সম্মুখে আসিয়া শীলা বলিল "আসতে পারি?"

"এসো"—

কক্ষে প্রবেশ করিয়া কক্ষ-মধ্যস্থিতা মহিলাটীকে সংক্ষেপে একটা নমস্কার করিয়া শীলা সংক্ষেপে তাহার আবেদন জানাইল। "স্লিপ দেখি?" একটু বিরক্ত হইয়া শীলা হস্তস্থিত কাগজের টুকরাটী তাঁহার সামনে ধরিল। পাঠান্তে তিনি বলিলেন—"কবে আসবে? সোমবার? আচ্ছা, যেতে পারো, সোমবার সকালে আসা চাই।"

"আচ্ছা"—বলিয়া বারেক হাতদুটী জোড় করিয়া শীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

ড্রেসিং রুমে ঢুকিয়া বেশভূষার কিছু পারিপাট্যসাধন করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ছোট একটী স্যুটকেশে কতকগুলো শাড়ী ব্লাউজ ভরিয়া লইল। বাহিরে আসিয়া লতিকে সামনে দেখিয়া বলিল—"সোমবার ফিরছি ভাই, গুডবাই।"

"গুড্ বাই"—বলিয়া লতি সখীকে আগাইয়া দিয়া গেল।

মামাকে প্রণাম করিয়া শীলা বলিল—"হঠাৎ ডাক কেন মামা ?"

শীলার দিকে চাহিয়া মামা বলিলেন—"তোর মা নিয়ে যেতে বল্‌লে তাই নিতে এলাম বড় হয়েছিস, আশাকরি মার কথা তুই ঠেল্‌বিনা।"

চকিত দৃষ্টিতে মামার মুখের দিকে চাহিয়া শীলা বলিল—"হঠাৎ এ কথার মানে কী মামা ? মার কথার অবাধ্য আমি কবে হোয়েছি ?—ব্যাপারটা কী বলোত ? "সে এক মজার ব্যাপার ! চলনা গিয়েই দেখতে পাবি—" বলিয়া তিনি শীলার স্যুটকেশটা হাতে লইলেন। একটু আত্মগতই বলিলেন—"সে কী আর হবে ? এযে স্বাধীন জেনানা !"

হঠাৎ এই কথার খটকায় শীলার মনটাও খারাপ হইয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাড়ী যাইবার ইচ্ছাও অৰ্দ্ধেক কমিয়া গেল। অনিচ্ছুক পদে সে মামার সহিত ট্যাক্সিতে উঠিল।

৫

"না মা ! সে সব কক্ষনো হবেনা !"

"লক্ষ্মী মা আমার ! অবাধ্যতা করিসনে। বয়সতো হোল একটা হিল্লে হলে তুইও নিশ্চিন্দি হোস—আমিও স্বস্তিতে মরতে পাই। হোলেই বা দ্বিতীয় পক্ষ, মা-হারা ছেলে মেয়ে দুটোর মা হবি। লক্ষ্মিটী শিলি ! আর অমত করিস্‌নে মা এতে। আমি কবে আছি কবে নেই, কার ভরসায় রেখে যাবো বলতো ? যতই রোজকার করনা কেন, মার প্রাণে কী চায় তাতো বুঝতে শিখেছিস্ এতোদিনে ?"

শীলার কল্পনার নেত্রে ছায়বাজীর মত ভাসিয়া গেল বইএ পড়া সমস্ত প্রকৃত সৎ-মায়ের কাহিণী ! নির্জ্জন প্রান্তর, ছোট্ট বাড়ীখানি, খড়ের চাল—কচি দুটী মাতৃহারা শিশুর অপূর্ব্ব সুষমা ভরা করুণ মুখচ্ছবি ! দোমনা ভাবে সে বলিল "কেন বাপু বেশতো আছি কেন আর আমায় নিয়ে টানাটানি কোরছো ?"

অবশেষে মার পীড়াপীড়িতে দেখার বন্দোবস্তে মত দিয়া ফেলিয়া ভার-চিত্তে সে বোর্ডিংএ ফিরিল। লতি সব কথাগুলা আদায় করিয়া লইয়া আগ্রহে নিজের সম্মতি জানাইল। হাসিয়া বলিল—"কেন শীলা ! অমত করবার কী আছে তোর এতে ? আহা ! মাতৃহারা সে বাচ্চা দুটো হয়তো কোন এক অশিক্ষিতার হাতে পড়ে কত কষ্ট পাবে।"

ধীরা বলিল—"আমি এক্ষুনি মাসীমাকে লিখেদিচ্ছি বিয়ের জোগাড় করতে, শীলার কিছু অমত নেই।"

এই পৃষ্ঠপোষকতার ফলে মাঘের শেষে একদিন বোর্ডিং হইতে বিদেয় লইয়া শীলা চলিয়া গেল।

পথে নামিয়া বোর্ডিং বাড়ীটার দিকে চাহিয়া তাহার দু-চোখে জলে ভরিয়া গেল। মন অব্যক্ত বেদনায় ভরিয়া উঠিল।

৬

দেড় বছর কাটিয়া গিয়াছে। লতি ও ধীরার তখন বি-এ এগজামিন চলিতেছিল।

বৈকাল বেলা লতি শুইয়াছিল, ধীরা আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—"কেমন দিলিরে ?"

লতি হাসিয়া বলিল—"মন্দ নয় নেহাৎ—বেরিয়ে যাবো বোধ হয়। এবার বোর্ডিং-বাস উঠলো বোধ হয়।"

ধীরা তাহার পাশে বসিয়া বলিল—"এবার শ্বশুর বাড়ীর দিকে নাকি ?"

লতির মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। ম্লানকণ্ঠে বলিল, "না ভাই! বিয়ের সুখ—শীলার চিঠি পেলাম, দেখবি ?" বলিয়া বুকের ব্লাউজের ভিতর হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া ধীরার হাতে দিল। ধীরা খামের ভিতর হইতে চিঠি খানা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল :—

ভাই লতি!

আজ বহুদিন পরে তোর কাছে চিঠি লিখতে বসেছি।

প্রায় দেড় বছর হোয়ে গেল তোদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি। বিয়ের পর যথাসময়ে এখানে এসেছি। কিন্তু জানিস্ লতি! যে স্বপ্ন, যে আশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম, তা ভেঙে গেছে। আজ কঠোর বাস্তবের কঠিন বুকে দাঁড়িয়ে আছি। একদিন ভেবেছিলাম—একখানি ছোট্ট ঘর, তার ভাঙা চালের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার টুক্‌রো এসে পড়ছে—একপাশে বসে আমি রাঁধছি, আর স্মৃতির আবেশে ডুব দিয়ে তোদের ভাবছি। তখন শুধু কল্পনাকেই এঁকেছিলাম। ভাঙা চালের পাশ দিয়ে জ্যোৎস্না ছাড়া বৃষ্টির ধারাও ঝরে পড়ে তা তখন মনে পড়েনি। বর্ষার ধারায় সজল বাতাসে কবিতাই জোগান দিয়ে থাকে জান্‌তাম; তখন ভাবতে পারতাম না যে তার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বড় মধুর মিলন! বর্ষার রাতে যখন লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে ম্যালেরিয়ার কম্পন অনুভব করতে করতে স্বামীকে উপবাসী দেখতে হয়—তখন বর্ষার সৌন্দর্য্য ডুবে গিয়ে জেগে ওঠে কদর্য্য বিভৎসতা, আর ক্ষুধার্ত্ত স্বামীর বিরক্তি। না ভাই, আমি তাঁর নিন্দে করছিনে—সত্যটুকু বলছি শুধু। এ সময় বিরক্তি কার না লাগে? সারাদিনের পরিশ্রমের পর যখন তিনি ফেরেন, তখন তাঁকে আরও বিরক্ত করে—শুয়ে থাক্‌তে মন চায়না—কিন্তু উঠতে গেলে গা কাঁপে, মাথা ঘোরে। প্রতিবেশীনিরা বলে—"ও সব আজকাল মেয়েদের ঢং!"

আমি এখানে এসে পেয়েছিলাম স্বামী ও দুটী ছেলেমেয়ে। আশা করে এসেছিলাম মাতৃহারা দুটোর মা হবো,—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—এইটুকু বয়সেই তারা বুঝতে শিখেছে, আমি তাদের মা নই, সৎ মা! দোষ করলে কিছু বলবার অধিকার নেই। স্বামীর দোষ এতে দিই না,—তাঁর ব্যবহার ভালোই বল্‌তে হবে, কিন্তু পল্লীগ্রামে স্বামীর সন্তুষ্টিই যে সব নয়, তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলাম—তার ফলে কাউকেই পারি নি। সবার মুখেই স্বামীর আগের স্ত্রী'র কথা। তাঁর দোষও অনেক ছিল শুনেছি। কিন্তু মরলেই মহৎ হোয়ে দাঁড়ায়! তাই—একবার ম'রে এদের প্রশংসা নিতে ইচ্ছে করে।...এমনি করে আমার বিয়ের একটা বছর

কেটে গেল। তারপর কেমন করে কে জানে, বোধ হয় অভ্যাস, হয়তো খোকার প্রভাব, হয়ত বা অবশ্যম্ভাবীতা এই অবস্থার,—যাই হোক, বেশ সহজ হয়ে আছি।—প্রতিবেশীদের কথায় আত্মীয়াদের সমালোচনায় দারিদ্র্যের জ্বালায়, বুকের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে কখনো কখনো, কিন্তু সংসারের বাঁধন এম্‌নি যে সব ভুলে গিয়ে আবার কর্ম্মচক্র ঠেল্‌তে বসি!

শুধু সন্ধ্যার স্তূপ স্তূপ অন্ধকার যখন গাছের তলায় নেমে আসে, সন্ধ্যা দেখতে গিয়ে একবার হঠাৎ যেন ছাঁত্‌ করে তোদের কথা মনে জাগে কোন কোনো দিন! হয়তো আদ্ধেক রাত্রে ঘুম ভেঙে ছেলেদের জল খাওয়াতে কি এম্‌নি—বাইরে ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে নিঃস্তব্ধ রাত্রির আঁচলে জ্যোৎস্নার সমারোহ উছলে পড়েছে দেখতে পাই; মনে হয় যেন ওদের মাঝে কোথায় আমার কী হারিয়ে গেছে। জান্‌লার ওপর বসে মনে ভাবি—আমারও যেন আগে কী একটা অন্য আমি ছিল।...........কতটুকু? তার পরই মনে হয়, ঘুমিয়ে নিতে হবে। নইলে সকাল ৯টার মধ্যে আফিসের ভাত ও সংসারের কাজ দুই'ই পেরে উঠবোনা। শুধু ভেবে রাখি তোদের চিঠি দেব। তাও সময় পাই যদি। আজ সময়, সুবিধা আর কালি-কলম-কাগজ একসঙ্গে পেয়েছি বোধ হচ্ছে!

তোদের—শীলা।

পাশের মাটি

শ্রীহেমলতা দেবী

এই যে আমার ঘরের পাশে
একটুখানি মাটি,
এরেই আমি যতন ভরে
রাখবো পরিপাটি ;
এরেই আমি উষারআলোয়
করাবো রোজ স্নান,
ভোরাই পাখীর কণ্ঠ হতে
শোনাবো রোজ গান ;
প্রখর রোদে এরেই আমি
ছায়া দিয়ে ঢাক্‌বো,
গভীর রাতের অন্ধকারে
ঘুমপাড়িয়ে রাখ্‌বো।
ফুল ফোটাবো বীজ রোপিয়ে
এরই বুকের তলে,
রসের ভারে ভরবে তরু
মিষ্ট রসাল ফলে।
বাতাসভরা আকাশখানা
থাকবে এরই বুকে,
নবীন রেখায় কালের বাণী
ফুটবে এরই মুখে।
নিমেষে কার মন-মিলালো
ভবিষ্যতের কালোয়,
পাশের মাটি উঠ্‌লো ফুটি
বেদনভরা আলোয়।

রাশিয়ার নতুন যুগের নারী

শ্রীদেবাংশু সেনগুপ্ত

১৯১৭ সালে যখন রুশ বিপ্লব হয় সেখানকার অত্যাচারী ধনিকদের সকলকে বিদায় নিতে হোল। তাদের অত্যাচার বন্ধ হল বটে কিন্তু আক্রোশ তাদের মিটলো না, দেশ বিদেশে গিয়ে নতুন বিপ্লবী গবর্ণমেণ্টের নামে কুৎসা রটাতে আরম্ভ কোরল এবং তাদের এই কুৎসা রটনায় যোগ দিলো অন্যান্য দেশের অত্যাচারী ধনিকরা, যারা তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও চিন্তিত হয়ে উঠেছিল তুনিয়ার এই নতুন রকমের প্রগতি দেখে। সমাজে কাউকে লোকচক্ষে হেয় কোরতে হলে যেমন সবচেয়ে সোজা পন্থা হচ্ছে তার বাড়ীর মেয়েদের সম্বন্ধে নিন্দে রটান, তেমনি পৃথিবীর রাজনৈতিক সমাজেও এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হল না। নিজেদের বেকার সমস্যার সমাধান ও দলিত জনগণের দুঃখ মোচনের চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে যারা কোন রকমের একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা করত, তাদের ভয় দেখাবার সবচেয়ে সোজা পন্থা ছিল "রুশ দেশের পারিবারিক জীবন বর্জ্জন ও নারীর প্রতি অশ্রদ্ধার" কল্পনাপ্রসূত কতকগুলি ভয়াবহ চিত্র এঁকে। কিন্তু আঠার কোটী জনসংখ্যাসম্পন্ন একটা জাতিকে জড়িয়ে আছে যে সত্য তা কখনও চিরদিনের জন্য ধামাচাপা পড়তে পারে না। আজকাল এ বিষয়ে অসংখ্য বই বেরিয়েছে। *

রুশিয়াকে যাঁরা পাশ্চাত্য দেশ বলে অভিহিত করেন তাঁরা হয়ত সাময়িক ভাবে ভুলে যান যে রুশিয়ার দক্ষিণ সীমান্ত আরম্ভ হয়েছে ঠিক আমাদেরই ভারতবর্ষের মাথার ওপর থেকে এবং একটা বাহু পৌচেছে জাপ সীমান্তে। শুধু জনবহুল প্রদেশগুলি সব ইউরোপের অন্তর্গত বলে, অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের সঙ্গে জারের আমলের রুশিয়ার তুলনা করা যায়না কোন রকমেই। তখন সেখানে নারী প্রগতি বলে কিছু ছিল না। ১৯১৭ সালের আগেকার রুশিয়ার কথা আলোচনা করতে গেলেই বর্ত্তমান ভারতবর্ষের কথা মনে পড়ে যায়। জারের আমলে বহির্জগতের সঙ্গে নারীর কোন সম্পর্ক ছিল না। ঘরের কোণায় থেকে স্বামী ও অন্যান্য গুরুজনদের সেবা করেই তাকে তার সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিতে হত এবং তাই ছিল তার আদর্শ। তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল স্বামী, এবং সে ছিল স্বামীর ক্রীতদাসী সমস্ত রকমে এবং সকল ক্ষেত্রে। স্ত্রীর বাইরে বেরিয়ে টাকা রোজগার স্বামী তার নিজের অপমান বলে বোধ কোরত। স্বামী ধারাবাহিক অত্যাচার চালালেও

* আমার প্রবন্ধটি যে বইগুলি উপর ভিত্তি করে লিখিত সেগুলির একটি ক্ষুদ্র তালিকা দিলাম :

1 New Economic Policy—Lenin
2 The position of women in the U. S. S. R—G. N. Serebrennikov
3 Soviet Year Book
4 Comtemporary Archives
5 Women in Honour and Dishonour Robert J. Blakham

স্ত্রীকে সব কিছুই মুখ বুজে সহ্য করতে হোত উপায়ের অভাবে। বিবাহ বিচ্ছেদ কচিৎ কখনও সম্ভব হলেও সেটা এমন একটা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল যার সুবিধা নাকি শুধু খুব বড় ঘরের মেয়েরাই ভোগ করতো। তারপর আদালতে এমন সব ব্যক্তিগত এবং অপমানকর জেরা করার নিয়ম ছিল যার ঝক্কি বহন করা মেয়েদের স্বাভাবিক শালীনতার দিক দিয়ে প্রায় অসম্ভবই। স্ত্রী যদি পালিয়ে গিয়ে মুক্তি চাইত, স্বামীর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল তাকে পুলিশ দিয়ে ধরিয়ে আনবার, কিন্তু তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে স্বামী গা ঢাকা দিলে আইনের সাহায্য সে পেত না। বিবাহ বিচ্ছেদের পর আইনের সাহায্যে পুরুষ তার ছেলে মেয়েকে মার কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে পারত।

বর্ত্তমান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্বেকার রুশিয়ার সব চেয়ে আশ্চর্য্য মিলের বিষয় হচ্ছে বিয়েতে পণপ্রথা। গরীব বাপ মা বেশী টাকার জোগাড় করতে না পারলে মেয়েকে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারত না। যে সব কর্ম্মীরা নতুন রুশ গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করল, এতবড় একটা বিপ্লবের মধ্যেও মেয়েদের এ সব সমস্যার কথা তারা ভুলে যায়নি, তাই সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লেনিন নারীর পক্ষে অপমানজনক সমস্ত কিছু আইন উঠিয়ে দিয়ে বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের মর্য্যাদায় স্ত্রীকে স্বামীর পর্য্যায়ে উন্নীত করে নেন। পণের প্রথা দমন করা হয়েছে আইনের সাহায্যে। এখন স্বামীত আর সংসারের একমাত্র কর্ত্তাত নয়ই, বিয়ের পর স্বামীর নামে নাম নেওয়া না নেওয়াটাও স্ত্রীরই সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। স্বামী এবং স্ত্রী যে রকম ইচ্ছে রোজগারের পথ বেছে নিতে পারে! বিয়ের পরের রোজগার করা সম্পত্তিতে স্বামী ও স্ত্রীর সমান অধিকার। ঝগড়া হলে আইনের সাহায্যে মীমাংসা হয়। বিয়ের আগের সম্পত্তি যার যার নিজের। বিয়ের সময় কোন রকম যৌতুক লওয়ার জন্য আইনত শাস্তি পেতে হয়।

রুশিয়াতে বেশ্যা প্রথা কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে, এ গর্ব্ব পৃথিবীর আর কোন সভ্য দেশই করতে পারে না।

গীর্জায় গিয়ে কিংবা দলিল স্বাক্ষর করে বিয়ে, এ দুটো প্রথাই চলছে পাশাপাশি ভাবে। রুশিয়ায় ধর্ম্মযাজকদের হত্যা করা হয়েছে কিংবা বিবাহ সংস্কার নেই, এ দুটোই নিছক মিথ্যা কথা। মস্কোতে একজন আর্কবিশপ আছেন কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে গভর্মেণ্ট কিংবা জনশিক্ষা অথবা স্কুল কলেজের কোন সম্পর্ক নেই (এখন যেমন ভারতবর্ষে চলছে)। তবে গীর্জ্জায় গিয়ে বিয়ে হলেও দলিল স্বাক্ষরটাও একটা আবশ্যকীয় অঙ্গ।

বিবাহ বিচ্ছেদ এখন স্বামী স্ত্রী যে কোন পক্ষের ইচ্ছেতেই হতে পারে। এখনকার বিবাহ বিচ্ছেদের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, অন্যান্য দেশের মত মামলার সময় ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন অপমানজনক প্রশ্ন কিংবা আচারের মধ্য দিয়ে কাউকে যেতে হয় না। স্বামী স্ত্রী দুজনেরই বিচ্ছেদ ব্যাপারে সমান অধিকার, কিন্তু বিয়েটাকে কেউ যাতে খেলার বিষয় না মনে করে তার জন্য আরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। পারিবারিক ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয় স্নেহের অভাবে সন্তানের মনোবৃত্তি অতি মাত্রায় কঠিন কর্কশ দয়ামায়াহীন হয়ে পড়ে, (Freued) নৈতিক চরিত্র ভাল

করে গড়ে উঠতে পারে না, কারণ এসব বিষয়ে বাপ মা ছাড়া আর কেউ'র তেমন নজর রাখতে পারা অসম্ভব। সোভিয়েট গভর্মেণ্ট তথা কথিত পাশ্চাত্য জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোর বিরোধী এবং তাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্যই হচ্ছে পারিবারিক জীবনকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে তোলা।

সন্তান প্রতিপালন ও তাদের শিক্ষাদান বিষয়ে মা বাপ দুজনেরই সমান অধিকার ও দায়িত্ব। বাপ যদি সংসার ত্যাগ করে নাবালক ছেলে মেয়েদের খোরপোষ দিতে সে বাধ্য। এই খোরপোষের পরিমাণ বাপের আয়ের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে, কিন্তু জজ ইচ্ছে করলে বাপের মাইনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পর্য্যন্ত তার ছেলে মেয়েদের জন্য বরাদ্দ করে দিতে পারেন। কোন লোক যদি সন্তানের ভরণপোষণের ভার শুধু মায়ের ওপর কিংবা গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালাতে চায় সোভিয়েট গভর্মেণ্ট কোন মতেই তাকে ক্ষমা করেন না। খোরপোষ দিতে গাফিলি করলেও কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়। নিজের সন্তান কিংবা গর্ভবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাটা সোভিয়েট সমাজের কাছেও একটা গুরুতর অপরাধ। এরকম কোন একটা ঘটনা ঘটলে সমস্ত খবরের কাগজ গুলি ভয়ানক রকম বিরুদ্ধ জনমত সৃষ্টি করে অপরাধীকে প্রায় একঘরে করে রাখে। সুতরাং আইন ছাড়া লোকনিন্দার ভয়ও আছে। স্বামী কিংবা স্ত্রী যে কারুর শারীরিক অসুস্থতার জন্যই যদি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, বিচ্ছেদের পরও অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে আইনতঃ সাহায্যের দাবী করতে পারে। সংসারে পোষ্য সংখ্যা বেশী হয়ে পড়লে গভর্মেণ্ট থেকে অর্থ সাহায্য করা হয়।

রাজনীতি ক্ষেত্রেও আইনের চক্ষে স্ত্রী পুরুষের ভেদ বিচার নাই। ভোট দেওয়া কিংবা পাওয়ার ব্যাপারে আঠার বছরের বেশী বয়স এমন যে কোন ব্যক্তির সমান অধিকার। এ অধিকারের সুযোগ যাতে মেয়েরা পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করে সে জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা উৎসাহ দেন এবং জোর প্রচার কার্য্য চালান। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা মেস প্রথায় সম্পন্ন হয় বলেই মেয়েরা ঘরের বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্য ও রাষ্ট্র দপ্তরে ছেলেদের পাশেই মেয়েরা বসে সমানে কাজ চালাচ্ছে।

বাইরে কাজ করতে এসে যাতে মা কিংবা তার ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য কোন রকমে খারাপ না হতে পারে সে বিষয়ে সোভিয়েট সরকারের খুবই সতর্ক দৃষ্টি। প্রায় পঞ্চাশ রকমের বিভিন্ন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ মেয়েদেরকে করতে দেওয়া হয় না, সাধারণতঃ অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রমে মেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যেতে পারে সেজন্য বেছে বেছে সেগুলিকে তাদের কর্ম্মতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে ১৯৩১ সালে একটা বিশেষ গবেষণা-মণ্ডল স্থাপিত হয় এবং তাদের নির্দ্দেশ অনুসারে প্রত্যেক মেয়েকে তার শারীরিক সামর্থ্য ও কর্ম্মদক্ষতা অনুসারে বিশেষ বিশেষ কাজে নিযুক্ত করা হয়। যে সব ঘরে তারা কাজ করে তার উপযুক্ত হাওয়া বাতাস খেলবার ব্যবস্থা করা হয়; এসব ব্যবস্থা এবং অন্য সমস্ত রকম স্বাস্থ্য বিষয়ক সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা তারই তদারক করবার জন্য স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা (Health Inspectors) সদা সর্ব্বদা যাতায়াত কর্চ্ছেন।

রুশিয়াতে সাত ঘণ্টার বেশী কেউই কাজ করে না। মাইনের পরিমাণ খুব ভাল হওয়াতে উপরি খাটুনীর আবশ্যকতাও নেই বন্দোবস্তও নেই। একটু বেশী পরিশ্রমের কাজে খাটুনী মাত্র ছয় ঘণ্টা। বছরে দু সপ্তাহের ছুটি দরকার ছাড়াও পাওয়া যায়, দরকার হলে উপরি ছুটির ব্যবস্থা ত আছেই। মাইনের ব্যাপারেও ছেলেতে এবং মেয়েতে কোন তফাৎ করা হয় না। কর্ম্মীদের জন্য সামাজিক বীমার ব্যবস্থাটা খুবই সুন্দর। বীমার ব্যয় তাদের নিজেদের পকেট থেকে যায় না, যেখানে তারা কাজ করে সে সব প্রতিষ্ঠানগুলিই প্রিমিয়াম দিয়ে দেয়। এরকম ব্যবস্থার ফলে বীমা করা হয় প্রত্যেকের জন্যই ; পকেট থেকে পয়সা খরচ না করে ও বীমার সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারে প্রত্যেকেই। সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রত্যেক মেয়ে কর্ম্মী সাধারণ অসুখ, চিরজীবন কিংবা সাময়িক অক্ষমতা, বৃদ্ধ কিংবা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বীমা কোম্পানী থেকে টাকা পায়। অসুস্থতার সময় ডাক্তারের ব্যবস্থাও করা হয় বীমা কোম্পানীর পক্ষ থেকে। রুশদেশে একটীও বেকার না থাকাতে বেকার বীমার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

দেশের সব জায়গাতেই চলতি হাঁসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামের প্রাচুর্য্য। আবার এমন অনেক রুগী আছেন যাদের হাঁসপাতাল কিংবা স্যানাটোরিয়ামে ভর্ত্তি হবার মত খারাপ অবস্থা নয় অথচ দুর্ব্বলতা কিংবা রক্তাল্পতার জন্য শুশ্রূষা ও যত্ন থাকার প্রয়োজন তাদের জন্য আলাদা এক রকমের বিশ্রামাগার আছে। এসব বিশ্রামাগারে সাধারণতঃ প্রসূতিরা প্রসবের আগে এবং পরে এসে বাস করে।

বিনা খরচায় প্রত্যেক লোকের বীমা ব্যবস্থা থাকার দরুণ মেয়ে কিংবা ছেলে কর্ম্মীর যে কি পরিমাণ সুখ সুবিধা হয় তা সহজেই অনুমেয়। আকস্মিক মৃত্যু, দুর্ঘটনা কিংবা অন্য কোন রকম আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয়ের আবশ্যকতা নেই মোটে। কালকে নতুন কি খরচ বাড়বে না জানা থাকাতে আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পয়সা জমিয়ে আজকেই পয়সার অভাব অনুভব করি অনেক সময়। সোভিয়েট রাজত্বের প্রজারা আজ যা রোজগার হচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে তার প্রায় সবটাই খরচ করে বসে থাকতে পারে।

শিশু ও তার মায়ের নিরাপত্তার এত উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা সোভিয়েট গণতন্ত্রছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরকে অপেক্ষাকৃত কম আয়াস-সাধ্য কোন কাজে নিযুক্ত করা হয়। প্রসবের আগে ও পরে সর্ব্ব-সমেত চারমাসের ছুটি আইনতঃ প্রাপ্য। শারীরিক পরিশ্রমের কাজ হলে ছুটি দেওয়া হয় আরও বেশী। এসব ছুটী শুধু প্রাপ্যই নয়, ছুটী নিতে বাধ্য করা হয়। ছুটীর সময় বীমার টাকা ছাড়াও তাদের মাইনের তারা অৰ্দ্ধেক পেয়ে থাকে। গভর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত থাকবার বাড়ীগুলি সাধারণতঃ কর্ম্মস্থলের খুব কাছেই হয়। সোভিয়েট সরকারের মতে শিশুরা ঘন ঘন মায়ের বুকের দুধ না পেলে সবল, সুস্থ ও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠতে পারে না, তাই প্রত্যেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাকে প্রত্যেক সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর আধ ঘণ্টা ছুটি দেওয়া হয়, সন্তানকে দুধ খাইয়ে আসবার জন্য। এসব কোন ছুটীর জন্য মাইনে কাটা হয় না।

আমাদের এখানকার ধন-তান্ত্রিক সমাজ যেখানে নাকি সামান্য একটু গরহাজির, তা যত প্রয়োজনেই হোক না কেন- অক্ষমনীয় অপরাধ সেখানে বসে সোভিয়েট মেয়েদের এসব ছুটীর ব্যবস্থা সহজে বুঝতে পারবো না। এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের লাভের জন্য তাই সামান্য একটু ত্রুটী বিচ্যুতির জন্য ব্যক্তি বিশেষের চোখরাঙানী আর অপমানজনক ব্যবহার। সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রে যে কোন ব্যবসা বাণিজ্যের মালিক হোল গিয়ে গভর্ণমেণ্ট এবং তার লাভের বখরা পায় সমস্ত সমাজ, তাই মায়েরা যদি চাকরীর কাজ একটু কম কোরে আদর্শ সন্তান গড়ে তুলতে পারে, তাতেও সমস্ত সমাজেরই লাভ। ব্যাপক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে দুটো কাজের কোনটাই কম দরকারী নয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে ঘরে থেকে ছেলে মানুষ করাই ত আদর্শ সমাজ সেবা ছিল,—সে প্রথার বিলোপ সাধন করার প্রয়োজন হল কেন এবং কি উপকারের প্রত্যাশায়?

আগেই বলেছি ১৯১৭ সালের পূর্ব্বেকার অবস্থা প্রায় ভারতবর্ষের মতোই ছিল। ধরুন, একটী সাধারণ ঘরের গৃহিণী ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম থেকে ওঠে সংসারের কাজে লেগে গেল। সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে সকালের কাজ শেষ হতে সাড়ে বারটা বাজবেই—ওদিকে বিকেল চারটে থেকে আরম্ভ করে রাত এগারটা—এমনি করে গড়পড়তা চৌদ্দ ঘণ্টা খাটতেই হবে তাকে। তারপর বাড়ীতে কারুর কঠিন অসুখ বিসুখ হলে দুর্দ্দশার আর সীমাই থাকে না। এই যে চৌদ্দ ঘণ্টা খাটুনীর জীবন, এতে ছুটি নেই, কামাই নেই, রবিবার নেই, শনিবার নেই। এতে মানুষ হয়ে যায় কলের মত চিন্তাহীন, তার মন হয়ে পড়ে অপরিসর, দৃষ্টিশক্তি বাঁধা পড়ে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীতে এবং এই সব জড়িয়ে যা হয় তার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পাই আমরা আমাদেরই সমাজে। পুরুষ বাইরে দশটা দেখে শুনে যদি কোন রকমে দু'পা এগোয় সামনের দিকে, নারী তার "যেওনা" "কোরো নার" অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের প্রভাবে তাকে আবার এক পা নিয়ে আসে পিছন দিকে টেনে। যে কোন সংস্কারের সব চেয়ে বড় বাধা আসে ঘরের ভেতর দিক থেকেই। অল্প-বয়স্ক ছেলে যখন বাইরের লোককে কিছু জিজ্ঞেস করে জানতে পারে না নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়বার লজ্জায়। বাপের কাছে যেতে পারেনা কর্ম্মক্লান্ত পুরুষের গাম্ভীর্য্যের ভয়ে তখন সে যায় তার মার কাছে তার সরল হৃদয়ের প্রশ্ন নিয়ে একান্ত নির্ভয় ভাবে। মা যদি ঘরের কোণার জীব হয় ত কেমন করে সে বাইরের দুনিয়ার প্রশ্নের জবাব দেবে? আর জবাব যদি না পায়, ছেলে তখন থেকেই সমস্ত নারী জাতিকে ঘৃণা করতে সুরু করে, অজ্ঞ অশিক্ষিতা ও মূল্যহীনা বলে। সাধারণ মধ্য-বিত্ত ঘরের মেয়ে হয়ত লেখাপড়া শিখল অনেক দূর পর্য্যন্ত, তারপর হ'ল বিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে চৌদ্দ ঘণ্টার ঘানিতে পড়ে বিদ্যে বুদ্ধি সব ধুয়ে মুছে সাফ। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকাতে মনো-বৃত্তি আবার সেই কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হতে থাকে।

এদিকে একদিন বিকেল বেলা সামান্য একটু বেড়াতে বের হলে সংসারের কাজের অসুবিধে, রোজ বেড়ানো ত অসম্ভবই। সংসারে কাজ না করলে ছেলে পুলে মানুষ হয় না, খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে।

খাওয়া দাওয়ার অসুবিধে যাতে না হয়, ছেলেপুলেও যাতে মানুষ হয়। সংসারে বিশৃঙ্খলাও যাতে না আসে, আবার মেয়েদের যাতে সাত ঘন্টার বেশী খাটতেও না হয়, এ সব কয়টা দিক বজায় রেখে বহু গবেষণায় রুষ গভর্ণমেন্ট একটী মৌলিক উপায় বের করেছেন। বিষয়টী বহুদিন যাবৎ খবরের কাগজে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে, যাদের জন্য সংস্কার সেই সব গৃহিণী এবং নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে তবে "ক্রেচ" ও জন-ভোজনালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে।

"ক্রেচ"গুলি সোভিয়েট মায়েদের খুব প্রিয় এবং আদরের প্রতিষ্ঠান। তারা কাজে বের হবার সময় খুব ছোট্ট ছোট্ট শিশুগুলিকে, "ক্রেচের" নার্সদের তত্ত্বাবধানে রেখে যায়। "ক্রেচে" প্রত্যেকটী শিশুকে প্রায়ই ওজন করে এবং তাদের স্বাস্থ্যের দিকে খুব কড়া নজর রাখে। "ক্রেচে"র জন্যই আলাদা গরু রাখা হয়, আবার এসব গরুগুলিও থাকে পশু চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে। "ক্রেচের" জন্য শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোতায়েন রাখা হয় সর্ব্বদা। সম্ভবমত হাওয়া রদ্দুর লাগিয়ে বাচ্চাগুলিকে বেশ পাকা করে তোলা হয়। "ক্রেচ"গুলির কাজ এমনই সুষ্ঠু এবং সুন্দর-ভাবে সম্পাদিত হয় যে রুশীয় মায়েরা একেবারে নিশ্চিন্ত মনে তাদের শিশুগুলিকে "ক্রেচে"র নার্সদের তত্ত্বাবধানে রেখে যেতে সাহস পায়। তারা একথা খুব ভাল রকমই জানে যে তারা নিজেরা শিশুকে যে পরিমাণ যত্ন করত, তার চেয়েও বেশী ছাড়া কম যত্ন হবে না "ক্রেচে"। "ক্রেচ" দু'রকমের আছে, সর্ব্বদার জন্য ও সাময়িক। সর্ব্বদার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি থাকে সহরে, কল-কারখানা ও অন্যান্য অফিস কর্ম্মচারিণীদের ছেলে মেয়েদের জন্য। সাময়িক ক্রেচগুলির কাজ হল গ্রামে। বছরের যে সময়টা কৃষক রমণীরা ক্ষেতের কাজে বার হয়, সেই সময় এরা গিয়ে হাজির হয় তাদের শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধান করবার জন্য। গ্রাম বল্লাম বলে যেন আপনারা কেউ মনে না করেন ১৯৩৮ সালের রুশিয়ার গ্রাম আমাদের দেশের গ্রামের মতোই সভ্যতা বর্জ্জিত, কুসংস্কার-সমাচ্ছন্ন, অভদ্রলোকের বসবাসের জন্য একটা কিছু। সেখানে কলের লাঙ্গলের সাহায্যে হাজার হাজার বিঘা জমী একবারে চাষ হয়, এরোপ্লেন আসে বীজ বপন করতে। শুধু আগাছা উপড়ান ও শস্য কর্ত্তনের কাজটা করতে হয় হাতে। গ্রামে রেডিও সিনেমা, থিয়েটার, স্কুল, কলেজ সব কিছুই আছে। বাড়ীগুলির প্রায় সবগুলিই পাকা ইমারত, ষ্টেলিনের ভাষায় বলতে, গেলে "গ্রামকে কেউ আর আজকাল সংমায়ের মত বিদ্বেষের চোখে দেখে না।"

শিশুদের মধ্যে একটু বড় যারা তাদের দেওয়া হয় "কিণ্ডারগার্ডেনে"। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনেকটা "ক্রেচের"ই অনুরূপ তবে খেলায় খেলায় তাদের কিছু লেখা পড়াও শেখান হয়।

আর বড় ছেলেমেয়েরা সাধারণ স্কুল ছাড়াও Continuation School এর তদারকে থাকে। এখানে স্কুলের ছুটীর পর তারা জল খাবার খায়, তারপর খেলা ধূলো করে ও সর্ব্বশেষ গৃহশিক্ষকের মতো সব শিক্ষকেরা পড়া শিক্ষায় সাহায্য করে তাদের। সুতরাং মায়েরা তাদের সেই সময়টা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমোদ-আহ্লাদ, লাইব্রেরী, ক্লাব, থিয়েটার বায়োস্কোপ ইত্যাদিতে যোগ দিতে পারে। "ক্রেচ", কিণ্ডারগার্ডেন ও কন্টিনুয়েশন স্কুলের বেশীর ভাগ কর্ম্মচারীই মেয়ে। লেনিন

বলেছিলেন এসব কাজে মেয়েরাই বেশী কর্ম্মদক্ষতা দেখাতে পারবে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলির কোন কর্ম্মচারীও দৈনিক সাত ঘণ্টার বেশী কাজ করে না।

আমাদের দেশের রেষ্টুরেণ্ট ও হোটেলগুলির সঙ্গে রুশিয়ার জন-ভোজনালয় ও রেষ্টুরেণ্ট-গুলির তফাৎ অনেক। আমাদের এখানে হোটেল, রেষ্টুরেণ্ট বেশ লাভ জনক ব্যবসা, ভেজাল জিনিষ ও হরেক রকমের অখাদ্য সরবরাহ করে, মালিকেরা সর্ব্বদাই তাদের নিজেদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করতেই তৎপর। লোকের তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হল, কি তারা বিষ খেয়ে মরল হোটেল মালিকদের তাতে কিছু এসে যায়না। জন-ভোজনালয়গুলির তত্বাবধানের ভার থাকে সম্পুর্ণ ভাবে মেয়ে কর্ম্মচারীদের ওপর, সেখানে খায় তাদেরই মা, বাপ, ভাই, বোন, প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনরাও। প্রত্যেক জন-ভোজনালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে একটী গবেষণাগার (ল্যাবরেটারী), সেখানে নিয়মিত ভাবে খাদ্য দ্রব্যের পুষ্টিকারিতা ও বিশুদ্ধতা বিচার করা হয়। এসব কর্ম্মচারিণীরাও কেউ দৈনিক সাত ঘণ্টার বেশী কাজ করে না।

সাধারণ লোকের ধারণা নারীর কর্ম্মকুশলতা পুরুষের চেয়ে কম। সোভিয়েট নারীরা কর্ম্ম ক্ষেত্রে নেমে আমাদের এ ধারণা সম্পুর্ণভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে। যেখানে অতিরিক্ত শারীরিক কিংবা মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন সেখানে অবশ্য পুরুষ কর্ম্মীরাই জয়যুক্ত কিন্তু বেশীর ভাগ সাধারণ কাজেই মেয়েরা ছেলেদের সমকক্ষ। আবার অতিরিক্ত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা কিংবা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকার কাজ ছেলেদের চেয়েও মেয়েরা ভাল করে।

বদ্ধ ঘরের কোনা থেকে বাইরে এসে কি রকম কর্ম্মক্ষেত্রে, শতকরা কটি মেয়ে, কি পরিমাণ কাজ কর্চ্ছে, নীচের তালিকাটি পড়লেই বেশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তালিকাটী ১৯৩৫ সালে প্রস্তুত হয়েছিল, ১৯৩৮ সালে শতকরা মেয়েদের সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি।

		শতকরামেয়ে কর্ম্মী
কয়লার খনিতে	..	২৪·০
ধাতু শিল্পে	..	২৫·৪
রসায়ন শিল্পে	...	৪০·০
কাষ্ঠ শিল্পে	..	৩১·০
কাগজ ইত্যাদি	...	৪১·০
চামড়া ও পশম	...	৫৬·২
বস্ত্র শিল্পে	...	৬৯·৮
সেলাই	...	৮২·৬
খাদ্য-বিষয়ক (Food Industry)		৪৪·৯
বড় বড় কলকারখানা	...	৩৮.৪
ইমারত তৈরী	...	১৯·৭
যান বাহন	....	১৬·৬

		শতকরা মেয়ে কর্ম্মী
বাণিজ্য ও খাদ্য সরবরাহ	...	৩৯.৪
শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজকার্য্য	...	৪৮.৮
কৃষিকার্য্য	...	২৭.০
ওপরের সবগুলি জড়িয়ে গড়পড়তা		৩৯.০

প্রত্যেক মেয়ে কর্ম্মীকে নিযুক্ত করা হয় তার যোগ্যতার বিষয় ভাল কোরে বিচার কোরে। সেই যোগ্যতার মাপকাঠি হচ্ছে সেখানকার পুরুষদের কর্ম্মক্ষমতা। যে কোন কাজে নিযুক্ত হতে হলে পুরুষদের সঙ্গে সমান প্রতিযোগীতায় নাবতে হয়।

১৯২৬ সালে ক্লডিয়া বুইকোভা নামে একটি মেয়ে গ্রাম থেকে আসেন আইভানোভো সহরে। তখন তিনি লেখাপড়া জানতেন না মোটেই, বাইরের কাজকর্ম্মের অনভিজ্ঞতা ছিল ঠিক আমাদের দেশের গ্রাম্য একটি মেয়ের মতোই। কর্ম্মীসংঘ (Labour, Bureau) তাঁকে ফেলিক্স জেজিনিস্কি ফ্যাক্টরীতে একটি সাধারণ গায়ে খাটা মজুরের কাজ যোগাড় করে দেয়। সহরে এসেই তিনি একেবারে বর্ণমালা থেকে লেখাপড়া সুরু করেন। কারুশিল্পে কলেজের (Technical College) পড়া শেষ করতেও তার বেশী দিন লাগল না, এদিকে মেসিন চালানও শিখে ফেললেন খুবই দক্ষতার সহিত। এক বছরের মধ্যেই সেই ফ্যাক্টরীরই মস্ত একটা বিভাগের পরিচালিকা হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর কর্ম্মদক্ষতার নিদর্শন স্বরূপ আজ পর্য্যন্ত তিনি ছাব্বিশটি বিশেষ পুরস্কার লাভ কোরেছেন। এখন তিনি রাশিয়ার সবচেয়ে বড় সম্মান "অর্ডার অব লেনিন" উপাধির অধিকারী।

আরেকটি মেয়ে নাম তার ইলারোইনোভা, কাপড়ের কলের দুশো দশটা মেসিন তিনি একাই একসঙ্গে চালাতে পারেন। দুহাজার মিটার গজ কাপড় একদিনে তৈরী করে ১৯৩৫ সালে তিনি পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ কোরেছিলেন। এই দুহাজার মিটার কাগজের কোন অংশে সামান্য একটু চিড় খায়নি।

১৯২৬ সালে বরোদিনা বলে একটি মেয়ে ক্ষেতের কাজে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে ড্রাইভিং শিখে ট্রাকটার (কলের লাঙ্গল) চালাতে আরম্ভ করেন। মেয়েলোকে ট্রাকটার চালাচ্ছে দেখে প্রথম প্রথম লোকে হাসতো কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে সাধারণ দুটি পুরুষের চেয়েও বেশী কাজ তিনি করতে পারেন। ১৯৩২ সালে মস্ত বড় একটা ব্রিগেডের ভার সম্পূর্ণভাবে তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি এখন সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্ব্বোচ্চ আইন সভার সদস্যা এবং ভাল কাজের পুরস্কার স্বরূপ সম্মানসূচক "লাল পতাকার" অধিকারিণী হয়েছেন। কিছুদিন আগে রাশিয়ার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রফেসর কারনেনকে বিট-চিনি চাষ সম্বন্ধে একখানা বই লিখেছিলেন; বইখানা বাজারে আসা মাত্র এই সব ক্ষেত-চাষ-করা মেয়েরা তার মধ্যে এত সমস্ত ভুল বার কোরেছে যে প্রফেসর তাঁর বইখানাকে আবার ফিরে ছাপাতে বাধ্য হয়েছেন।

ফোমিনা বলে একটি মেয়ের স্বামী মারা যায় ১৯২৭ সালে। ঘরে দুটি শিশু আর নব্বই বছরের বৃদ্ধা শাশুড়ী, আয় বাড়াবার জন্য প্রথমে তিনি কাপড়-কাচা-সংঘে গিয়ে কাপড় কাচতে

সুরু কোরলেন। তারপর গেলেন গরু চরানোর কাজে। ১৯৩২ সালে তিনি বড় একটি ডেয়ারী ফার্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হন। আজকাল যে তিনি নিজেই খুব ভাল কাজ পারেন শুধু তাই নয়, দশজনকে উপদেশও দিয়ে থাকেন।

নাটালী সোলজ বলে একটি মেয়ে-ইঞ্জিনীয়ার মাটীর তলায়, তার—বসান একরকম নতুন টেলিফোন আবিষ্কার কোরেছেন। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ উপাধি দেওয়া হয়েছে।

কিছুদিন আগে খবরের কাগজে উঠেছিল যে রুষ বৈমানিকেরা একরকম বিশেষভাবে নির্ম্মিত রবারে মোড়া বেলুনে করে বাতাসের সীমানা ছাড়িয়েও বহু উর্দ্ধে উঠে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। এই বিশেষভাবে তৈরী বেলুনটির পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পাদন করে দুটি মেয়ে, নাম তাদের কুসিনা ও লেটিভিনা।

কলকারখানা, ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি ও গভর্মেণ্টের খাস বিভাগে কাজ করে লক্ষ লক্ষ মেয়ে; ওপরে মাত্র যে কটির কর্ম্মক্ষমতা ও দক্ষতার দৃষ্টান্ত দিলাম তেমনি দৃষ্টান্তও আছে প্রায় কয়েক লক্ষ। রুশ গভর্মেণ্ট এদের শুধু দয়া করেই নিযুক্ত করেন না, এদের কাজের বিশেষ আদর আছে তাই তারা কাজ পায়। শুধু স্বামীর ভোগ্য বস্তু হোয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করাটাকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে। ছেলেরা নিজেরা যা করতে পারতো মেয়েরা এসে যোগ দেওয়াতে তার চেয়ে কাজের পরিমাণও বেড়ে গেছে অনেক, জিনিষপত্র তৈরীও হচ্ছে অনেক বেশী। এই যে সেখানে জাগরণ এসেছে সহরে, গ্রামে, উচ্চশিক্ষিতা ও অল্পশিক্ষিতার মধ্যে—এ জাগরণও এনেছে নারীরা নিজেরা। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার এও তারা নিজেরাই আদায় কোরেছে—পুরুষ তাদের নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করে যেচে দেয়নি সব কিছুই। কারুর "অযোগ্য দাবী" কিংবা গলগ্রহ হয়ে তারা থাকবে না এই তাদের জীবনের পণ, প্রত্যেক মেয়ে উচ্চ-শিক্ষিতা হবে, বাইরের কাজকর্ম্মে, আমোদে প্রমোদে, থিয়েটার, বায়োস্কোপ দেখায় এবং পুরুষের সুখে ও দুঃখে সমান অধিকারিণী হবে এই তাদের জীবনের আদর্শ। একটা জাতি যখন জাগে এমনি কোরেই জাগে, সমস্ত রাশিয়ায় এখন প্রচণ্ড কর্ম্ম ব্যস্ততা, নতুন আশায় সবাই চলেছে সামনের দিকে এগিয়ে।

লেনিনের স্ত্রী ক্রুপ্‌সকায়া হচ্ছেন সমস্ত রুশ নারীর আদর্শ। লেনিনের চেয়ে তিনি একবছরের বড়ো। উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে তাঁরা একই বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য হয়েছিলেন, স্ব স্ব অনুপ্রেরণায়। সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনকালে তাঁদের দুজনের বিয়ে হয়। লেনিন যখন রুশিয়ার বাইরে থাকতেন তখন তাঁর সবকিছু বৈপ্লবিক কাজকর্ম্ম চালাতেন ক্রুপসকায়া প্রায় সবকিছু গুপ্ত চক্রান্তই হত তাঁরই বাড়ীতে বসে। বিপ্লব সফল হয়েছে, লেনিন মারা গেছেন আজ চৌদ্দ বছর হোয়ে গেছে, কিন্তু ক্রুপসকায়া বেঁচে আছেন আজও, সহরে, গ্রামে, কুটীরে কুটীরে বহন কোরে বেড়াচ্ছেন বিপ্লবের বাণী,—লেনিনের আদর্শ।

—:০:—

আলোচনী

দেশবন্ধু

চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের পর, তেরো বৎসর অতীত হোয়েছে। এ যুগের অতি দ্রুত সার্ব্বভৌমিক পরিবর্ত্তণের মধ্যেও চিত্তরঞ্জন বাঙ্গলার স্মৃতিতে জ্বল্ জ্বল্ করছেন অকুণ্ঠ দীপ্তিতে। কালোত্তীর্ণ, লোকাতীত এঁদের দান—একটা জাতির জীবনীশক্তির মূলে যা অনাদিকাল ধরে করে রস-সিঞ্চন। জাতির আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার ধারা যে রূপই পরিগ্রহ করুক্ না কেন—চিত্তরঞ্জনের প্রতিভার ছাপ অলক্ষ্যে তাতে পড়্বে নিঃসন্দেহ। চিত্তরঞ্জনের দানের বহুমুখীনত্ব ও পরিমাণের বিচার প্রচুর হোয়েছে, পুনরালোচনা নিস্প্রয়োজন। আজ এই স্মৃতি বার্ষিকীতে, শ্রদ্ধানত চিত্তে তাঁর ব্যক্তিত্বের উদার বলিষ্ঠতা থেকে আহরণকরি দৃপ্তনির্ভীকতা, এ যুগের কর্ম্মোম্মাদনার উদ্বেলতার মধ্যে স্মরণ করি, তাঁর শান্ত নিষ্ঠা ও অবিচল নিয়মানুবর্ত্তিতা—সর্ব্বোপরি অনুকরণ করি, আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁর অকম্পিত দৃঢ়তা।

ফেডারেশন ও কংগ্রেস—

ফেডারেশন সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা, সমর্থন ও প্রতিবাদ কিছুদিন ধরে যেরূপ প্রবল হোয়ে উঠ্ছে তাতে এর আসন্নতা সম্পর্কে সংশয়ের আর অবকাশ নেই। সম্প্রতি বিলাতের কোন জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলালের ফেডারেশন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইট মন্তব্য করেন, যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোন বিশিষ্ট সভ্যের সহিত আলোচনায় তাঁর ও আরো বহু ইংরেজের এই ধারণা জন্মেছে যে প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ব্যাপারের অনুরূপ নীতি ফেডারেশন সম্বন্ধে কংগ্রেস গ্রহণ করবেন, অর্থাৎ যদিও ফেডারেশন বর্জ্জনের প্রস্তাব কাগজে কলমে গৃহীত হবে কার্য্যতঃ ফেডারেশন চালু করাই হবে।

নানা কারণে স্যার্ ফ্রেডারিকের মন্তব্য একেবারে উপেক্ষা করা যায়না, ফেডারেশন সম্বন্ধে নেপথ্যে যে বহু তোড়জোড় চল্ছে, আভাষে ইঙ্গিতে তার প্রমানের অভাব নেই। প্রথমতঃ কয়েকজন গভর্ণর ও উচ্চ রাজপুরুষ ছুটী নিয়ে স্বদেশে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন, বড়লাটও সম্প্রতি ছুটী নিয়ে গিয়েছেন। এই যোগাযোগ একেবারেই অহৈতুকী, বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত বুলাভাই দেশাই সম্প্রতি বিলাতে উচ্চ রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখাশোনা ও বক্তৃতাদি করে এসেছেন। একান্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ভারতের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের—পূর্ব্বাপর যে

আন্দোলন ফেডারেশনের বিরুদ্ধতা করে এসেছে—নিন্দা করেছেন। তাঁর সঙ্গে বিলাতের রাজপুরুষদের কি আলাপ আলোচনা হোয়েছে তা প্রকাশিত হয়নি—অনুমান করা যায় মাত্র এবং এই অনুমান অনুচিত হবেনা যে তিনি ফেডারেশন প্রস্তাব গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

তৃতীয়তঃ ফেডারেশন সম্পর্কে সর্দ্দার বল্লভভাই ও শ্রীযুক্ত দেশাই যে মেমোরেণ্ডাম প্রস্তুত করেছেন এবং যার সারাংশ টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল. তার সঙ্গে সার হোয়াইটের উক্তির আশ্চর্য্য মিল আছে। এই মেমোরেণ্ডামে প্রধানতঃ দুটী পরিবর্ত্তনের কথা বলা হোয়েছে প্রথমতঃ দেশী রাজারা ফেডারেল ব্যবস্থাপক সভায় তাদের প্রতিনিধিদের নিজে মনোনীত না করে, প্রজাদের প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার দান করিবেন দ্বিতীয়তঃ, Safeguards গুলি শাসনবিধি থেকে বাদ দেওয়া এ সম্পর্কে ভারত সচিব বলেন যে প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় যদি দেশীয় রাজারা সম্মত হন তবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন আপত্তি তুলবেননা—কিন্তু Safeguards গুলি উঠিয়ে দেওয়া সম্পর্কে স্বতন্ত্র কথা—Safeguards তুলে দেওয়া সম্ভব হবেনা—প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যেমন তাদের কোন ব্যবহার নেই সর্ব্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রেও সেরূপ সাধারণতঃ তাদের প্রয়োগ হবে না।

চতুর্থতঃ—ফেডারেশন সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্ধারণ জানবার আগেই মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় এবং আরো দুএকটী কংগ্রেসী প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় যদি ফেডারেশন পরি-বর্ত্তিত হয় তবে কংগ্রেস তা চালু করতে রাজী হোতে পারে এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে। উপরোক্ত চারদফা প্রমাণ থেকে বোঝা যায় কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীরা ফেডারেশন গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক হোয়ে পড়েছেন এবং তাঁদের এই ঔৎসুক্য শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে ফেডা-রেশন গ্রহণ প্রস্তাবে পর্য্যবসিত হোতে পারে—এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়।

কাজেই সার ফ্রেডারিক হোয়াইটের মন্তব্যের উপর কংগ্রেস-সভাপতির ফেডারেশন সম্পর্কে নিজের মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। যেখানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সভ্যদের মধ্যে কেউ কেউ ফেডারেশন গ্রহণ ব্যাপার নিয়ে গোপনে বড়-কর্ত্তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছেন বলে সন্দেহ করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে সেখানে ফেডারেশন গ্রহণকে কংগ্রেস সভাপতির "ভারতীয় স্বার্থের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা"রূপে বর্ণনাকরা ও যদি ওয়ার্কিং কমিটিতে সংখ্যাধিক্যের ভোটে ফেডারেশন প্রস্তাব গৃহীতই হয় তবে তাঁর পক্ষে কর্ত্তব্য হবে সভাপতিপদের শৃঙ্খল পরিত্যাগ কোরে ফেডারেশনের বিরুদ্ধে দেশময় প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করা—একথা দৃঢ়ভাবে বলা কিছু অস্বাভাবিক হয়না। এই সুস্পষ্ট উক্তিতে মিঃ সত্যমূর্ত্তি প্রমুখ কংগ্রেসের দিকপালগণ যে অসংযত উষ্মা প্রকাশ করেছেন তা সুরুচির সীমা অতিক্রম করেছে। মিঃ সত্যমূর্ত্তির সমস্ত বিবৃতির মধ্যে কোথাও ফেডারেশন গ্রহণসম্পর্কে তাঁর কি মনোভাব অথবা মিঃ দেশাই যদি বাস্তবিকই কংগ্রেসের মত গ্রহণ না কোরে কথাবার্ত্তা চালিয়ে থাকেন তবে তাঁর একাজ সমর্থনযোগ্য কিনা ইত্যাদি বিষয়ে কোন

মন্তব্য নেই। তাঁর বিবৃতিতে শুধু প্রকাশ পেয়েছে বর্ত্তমান কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের প্রতি অবজ্ঞা ও অসংযত অশিষ্টতা। ফেডারেশন সম্পর্কে কংগ্রেসের যথার্থ মত কি সে সম্বন্ধে নানা কারণে জনসাধারণের মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে সুভাসবাবু যে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন—সংশয় দূর করবার জন্য তার প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি। মিঃ সত্যমূর্ত্তির এই আক্রমণ একান্তই ব্যক্তিগত বলে মনে হয়—কারণ মন্ত্রীত্বগ্রহণের পূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল এধরণের বহু উক্তি করেছেন যা মিঃ সত্যমূর্ত্তি প্রমুখ দক্ষিণপন্থীরা নির্ব্বিবাদে সহ্য করেছেন কাজেই স্বভাবতই মনে হয় আপত্তি এ নয়—"কেন একথা বলা হোল?" আসল আপত্তি "কেন সুভাসবাবু একথা বল্লেন?" "Bengal does not count in alll-India politics" মন্তব্যকারী, গোঁড়া সংস্কারপন্থী মিঃ সত্যমূর্ত্তির পক্ষে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। তবে জওহরলালের নিকট আমরা আরো সুস্পষ্ট মতামত আশা করেছিলাম—সুভাসবাবুর উক্তি সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করাতে—"কংগ্রেসপন্থীদের মতবিভিন্নতায় কোন অংশ গ্রহণ করিনা—"এই অজুহাত দেখিয়ে প্রশ্নটি তিনি এড়িয়ে গেলেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখেছি—বহুবার নানাবিতর্কমূলক বিষয়ে পণ্ডিত জওহরলাল মতামত প্রকাশ করেছেন। কাজেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এভাবে এড়িয়ে যাওয়া উচিত হয়েছে বলে আমরা মনে করিনা। সে যা হোক, দেশের সংস্কারবিরোধী দলমাত্রেই সুভাসবাবুর এই উক্তিকে সমর্থন করবে—এবং ফেডারেশন সম্পর্কে কংগ্রেসেরও যে এই মত হওয়া উচিত তা নিঃসংশয়ে বল্‌বে। সংস্কারপন্থীরা ক্রমেই কংগ্রেস আন্দোলনটিকে নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকতার অর্থ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সহায়তা করা। নিয়মতান্ত্রিক মনোবৃত্তি দেশে কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে তার একটি প্রমাণ প্রাদেশিক ক্ষেত্রে মন্ত্রীত্ব গ্রহণের সময় যদিও বারবার বলা হয়েছিল যে শাসনতন্ত্র অচল করবার জন্যই মন্ত্রীত্ব গ্রহণকরা হচ্ছে তথাপি কার্য্যতঃ দেখা যাচ্ছে—অচল করা দূরে থাকুক্ শাসনতন্ত্রকে কিভাবে অধিকতর কাজে লাগানো যেতে পারে—সেই চেষ্টাই বিভিন্ন প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলী কচ্ছেন। এটাই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত এবং বামপন্থীরা এজন্যই মন্ত্রিত্বগ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন। আজও ফেডারেশন সম্বন্ধে সংস্কারপন্থীরা যে মনোভাব দেখাচ্ছেন তাতে বামপন্থীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার বিরুদ্ধতা না করলে ফল যে কি হবে সে বিষয় সংশয় নেই। প্রয়োজন এখন সমস্ত নিয়মতান্ত্রিকতাবিরোধী শক্তির সংহত হওয়া ও একযোগে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরোধিতা করা।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

শাস্ত্রবিধানে হিন্দুস্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আছে কিন্তু লোকাচার দেশাচার ও রাজার আইন এর বিরোধী, কাজেই হিন্দু-বিবাহ অচ্ছেদ্য পতিপত্নীর সম্বন্ধ লোকান্তরেও থেকে যায়। শাস্ত্রের নির্দ্দেশ থাক্‌লেও পতি বা পত্নীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার নেই, বিবাহ-বন্ধন যদি লৌহ-শৃঙ্খলে পর্য্যবসিত হয় তবু মুক্তিপাবার আশা

নেই। আজ দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার পেয়েছে, বিধবাবিবাহ আইনুমোদিত হয়েছে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হোক্ দেশ বিধবাবিবাহ কার্য্যতঃ স্বীকার করে নিয়েছে অসবর্ণ-বিবাহও প্রচলিত হচ্ছে, বাল্য-বিবাহ-নিরোধ আইনও প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের কথায় অতিবড় উদারনৈতিকেরও তীব্র রক্ষণশীল মনোভাব দেখা যায়। ভুক্তভোগী যারা, তারাও এবিষয়ে বিরুদ্ধমত পোষণ করেন। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, জগতে যত বড়বড় সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা অধিকাংশের সমর্থনে বা প্রচেষ্টায় হয়নি বরঞ্চ অধিকাংশের বিরোধিতার মধ্য দিয়েই তারা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে। বালবিধবাদের অশ্রুজল দেখে অনেকেরই হৃদয় বিগলিত হয়েছে, কত পিতামাতার হৃদয় সুকুমারী কন্যার বৈধব্য বেশ দেখে ব্যথিত হয়েছে, কিন্তু অদৃষ্টের উপর দোষারোপ ব্যতীত কোন প্রতিকারের উপায় কেউ করেন নি। সে কাজ ছিল বিদ্যাসাগরের জন্য অপেক্ষা করে—তাঁর সমর্থকও ছিল মুষ্টিমেয়। বর্ত্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের সমর্থনকারীদের সংখ্যাল্পতায় আমাদের নিরাশ হ'বার কিছু নেই। বরঞ্চ সেজন্য আরো দৃঢ়ভাবে প্রচার চালাতে হবে। এর মধ্যে শাস্ত্রের বিধানের কথা, আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক তত্ত্বকথা বিচার না ক'রে বাস্তব ক্ষেত্রে এর উপযোগীতা নিয়ে আলোচনা করাই কার্য্যকরী পন্থা।

মানুষের জীবন দু'ভাগে বিভক্ত, ব্যক্তিগত ও সামাজিক। এ দুয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য হোলেই দেশের ও জাতির কল্যাণ, সামাজিক স্বার্থে যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তাহোলে পরিণামে সমাজের মধ্যেই অলক্ষ্যে সমাজধ্বংশের কারণ সঞ্চিত হয়।

বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি, যে উহা সমাজের পক্ষে গভীর অকল্যাণকর হোয়ে দাঁড়াবে। আইন-বদ্ধ হোলেই, কারণে অকারণে এবং সামান্য কারণেও নরনারী দলে দলে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য ছুটে যাবে, ফলে পারিবারিক জীবন ধ্বংস হবে। এ ধারণা যে মানব-মনের পক্ষে কতবড় অসম্মানজনক তা হয়তো বিরোধীগণ ঠিক অনুধাবন করতে পারেন না। সংযম একনিষ্ঠতা চিরকালই নরনারীনির্ব্বিশেষে আদর্শগুণ থাক্‌বে, আইন প্রচলন হোলেই এসব একেবারে লোপ পেয়ে যাবে, মানুষ স্বেচ্ছাচারী হয়ে দাঁড়াবে এ ভাব্‌বার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। স্নেহপ্রীতি, সহানুভূতি আইননিরপেক্ষ হোয়ে বেঁচে থাকে। নিছক শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে, সমাজের তাড়নায়, আইনের জোরে জোরকরে স্নেহ-প্রেম-হীন পরিবেষ্টনে হতভাগ্য দম্পতীকে জীবনযাপন করতে বাধ্য করা মনুষ্যত্বের তীব্র অপমান।

বিবাহ-বিচ্ছেদের আন্দোলন অতি অল্পসংখ্যকের অধিকার রক্ষণ মাত্র। এ কখনো সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বদা প্রয়োজনে আস্‌বেনা, যে সব দেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত আছে, তাদেরও সমাজ সংসার আছে, সেখানেও নরনারী সহজে বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করেনা,—আর ভয় যদি কিছু থেকেই থাকে তারই জন্য অন্যায় সহ্য করবার যুক্তি কিছু আছে কি ?

কাজেই দু'দশজন আইনের অসদ্ব্যবহার করলে তা থেকে আইনের অনুপযোগিতা প্রমাণ হয় না। সমাজ ব্যক্তির সমষ্টি, ব্যক্তিত্বকে নিষ্পেষণ করলে সমাজের কল্যাণ হোতে পারে না। সত্য যত রূঢ় হোক্ না কেন তাকে সহজভাবে স্বীকার করাতেই শক্তি সঞ্চয় হয়। যে সব ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হোয়ে পড়ে, তাকে স্বাভাবিক পথ না দিলে সে ন্যায়ান্যায় বিচার করে আপন পথ করে নেবেই, তাতে-ই অধিকতর অমঙ্গল হবে।

বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে পত্নী স্বামী পরিত্যাগ করতে পারে না, কিন্তু স্বামীর স্ত্রী-পরিত্যাগে কার্য্যতঃ কোন বাধা নেই, পরিত্যক্তা স্ত্রী হয়তো আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ হোয়ে আপন অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করতে থাকে কিম্বা নানা প্রলোভনের বশবর্ত্তী হোয়ে কুপথে নিয়ে যায় আর যদি পুনর্বিবাহের ইচ্ছা থাকে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহ করতে পারে, বিবাহের পর শুদ্ধিমতে আবার হিন্দুসমাজেও বর্ত্তমানে ফিরে আসতে পারে, এ ব্যবস্থা প্রকারান্তরে একটি প্রহসনমাত্র, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে হিন্দু-সমাজ দুর্ব্বল হোয়ে পড়ে। এর চেয়ে সহজ ব্যবস্থা করলে সমাজপতিদের ক্ষুণ্ণ হবার কারণ কি? স্বামী সন্ন্যাসগ্রহণ করলে স্ত্রী যদি সন্ন্যাসিনী হবার মত যোগ্যতা অন্তরে অনুভব না করে, সেজন্য তার চারদিকের পথ রুদ্ধ করে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করা কেন? [illegible] দুরারোগ্য, পঙ্গু, ক্লীবস্বামীকে পরিত্যাগ করার প্রয়াস অধর্ম্ম বলে পরিগণিত হোতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ আছে। কিন্তু উহা একতরফা মাত্র, সেজন্য অন্যায় আরো বেড়ে গিয়েছে। এই বিধিনিষেধের জন্য কত অন্যায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। কত দুরাত্মা ছলে, বলে, কৌশলে বিবাহ ক'রে আপন স্বার্থসিদ্ধি করে, কিন্তু স্ত্রীর তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। পুরুষ বহু বিবাহ ক'রে স্ত্রীকে লাঞ্ছিত করতে পারে কিন্তু নারীর কোনই প্রতিবাদেরই উপায় নেই। বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনসিদ্ধ হোলে নারীর প্রতি অত্যাচার কম্‌বে। সংসারে নারীকে আপন মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখ্‌তে সকলেরই চেষ্টা থাকবে, যাতে এ অধিকারের সুযোগ নিতে নারীর প্রয়োজন না হয়। নারী ও আপন অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হোয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদে সাহসী হবে। বিবাহের প্রতিবন্ধক, নানা রোগ ইত্যাদি গোপন করে এক শ্রেণীর লোক আর প্রতারণা করতে সাহসী হবে না, কারণ তাদের ছলনা ধরা পড়লেও বিবাহের সংশোধন হাতে থাক্‌বে। সমাজ ক্রমে ক্রমে সত্যাশ্রয়ী ও শক্তিশালী হোয়ে উঠবে।

সম্প্রতি দেশে এবিষয়ে আইন্ প্রণয়ন করার চেষ্টা চলেছে। ডাঃ দেশমুখ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, তার ফলাফল লক্ষ্য করার বিষয়। পাঞ্জাবের ব্যবস্থা-পরিষদে মিসেস্ দুনীচাঁদ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের একবিল এনেছিলেন, দুঃখের বিষয় বিরুদ্ধপক্ষীয়গণের ভোটে উহা আইনে পরিণত হোতে পারেনি, রামপুরের রাজকুমারী ইয়সুফ জাহান বেগমের নেত্রীত্বে লক্ষ্ণৌ মুস্লীম মহিলাবৃন্দ সেদিন এক বিরাট্ সভায় বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার ও সেবিষয়ে আইন প্রণয়নের দাবী উপস্থিত করেছেন। এই সব প্রচেষ্টায় জাতির জাগ্রত মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজের যথার্থ কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রের ও বিশেষভাবে মেয়েদের অকুণ্ঠচিত্তে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী কোরে তোলা উচিত। নূতন কোরে সমাজ গড়বার আজ আয়োজন চলেছে দিকেদিকে, গলদ্ কোথায় তার আবিষ্কার ও দৃঢ়হস্তে তা নির্ম্মূল করবার প্রয়োজন যাঁরা বুঝেছেন এই বিল্‌কে তাঁদের সক্রিয় সমর্থন দেওয়া উচিত।

কানপুরের ধর্ম্মঘট—

দীর্ঘদিন পর কানপুরের ধর্ম্মঘটের সন্তোষজনক মীমাংসায় সমস্ত দেশবাসী স্বোয়াস্তি বোধ করবে। পঞ্চাশদিন ব্যাপী নানা অবস্থান্তরের মধ্যে শ্রমিকেরা যে অবিচল সংকল্প ও শৃঙ্খলা দেখিয়েছে তাতে গভীর বিস্ময় ও আনন্দ জাগে। গণ আন্দোলন দেশে ক্রমেই সুদৃঢ় ও সুনিয়ন্ত্রিত হোয়ে উঠেছে এতে আশান্বিত হবার প্রচুর কারণ রয়েছে। রাজনৈতিক মহলের উর্দ্ধাংশে স্বার্থস্পৃষ্ট অহৈতুকী দলাদলি দিন দিন যত প্রকট হোচ্ছে ভিত্ত্যাশ্রয়ীদের মধ্যে সংহতি ও একত্ব বোধ তত সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করছে দেখে, আশা হয়, এদের ঐক্য ও সংহতি একদিন উর্দ্ধতন মহলের অর্থহীন দলাদলির অবসান ঘটাবে। কেবলমাত্র তখনই রাজনৈতিক আকাশের ধোঁয়াটে অস্পষ্টতা দূর হোয়ে সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনটীর স্বরূপ ও অর্থ প্রকটিত হবে। কাজেই গণসাধারণের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের পরিপোষক যাকিছু, দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই তাকে সমর্থন করবেন। গত কানপুর ধর্ম্মঘট শ্রমিকদেব মধ্যে সেই সঙ্ঘবদ্ধতা বহুল পরিমাণে সৃষ্টি করেছে—এদিক্ দিয়ে এর মূল্য প্রচুর।

এ সম্পর্কে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস সরকারের কাজ বিশেষ প্রশংসা ও অনুকরণ যোগ্য। তাঁদের নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণতা ও ন্যায় বুদ্ধি শ্রমিকেদের বিশ্বাস অর্জ্জন করতে সক্ষম হোয়েছিল বলেই তাঁদের পক্ষে মিলওয়ালা ও শ্রমিকদের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীতা কোরে, এই ধর্ম্মঘটকে উভয়পক্ষের সন্তোষ-জনক মীমাংসায় আনা সম্ভব হোয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত মিলওয়ালারাও তাঁদের জিদ ও প্রেষ্টিজকে বাস্তব অবস্থার উপরে দাঁড় না করিয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। যে সকল সর্ত্তে ধর্ম্মঘটের অবসান হোয়েছে তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান। মালিকেরা স্বীকার করেছেন যে অন্যায় ভাবে কাকেও বরখাস্ত করা হবেনা এবং ধর্ম্মঘটের অপরাধে কাকেও শাস্তি দেওয়া হবেনা। মজদুর সভাও স্বীকার করেছেন অননুমোদিত ধর্ম্মঘট করা হবেনা বা সমর্থন করা হবেনা—তদন্ত কমিটির নির্দ্দেশানুসারে সভার পুর্ণগঠন করা হবে। শ্রমিক ও মালিক উভয়দলের সমান সংখ্যক প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বোর্ডে বেতনের হার নির্দ্ধারিত হবে। গভর্ণমেণ্ট উভয়পক্ষের বিশ্বাসভাজন একজন আই, সি, এস অফিসারকে লেবার কমিশনার ও সালিশ হিসাবে নিয়োগ করার ব্যবস্থা করেছেন অন্যান্য বিষয় উভয় পক্ষের মতানুসারে ব্যবস্থা হবে।

বাঙ্গলায় শ্রমিক ধর্ম্মঘট

বাংলাদেশে কুলটী, হীরাপুর প্রভৃতি নানা স্থানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শ্রমিক নেতাদের কোন অজুহাতে আইনের কবলে ফেলা, ১০৭ ও ১৪৪ ধারা প্রয়োগ, শ্রমিক-মঙ্গল ফাণ্ডের

টাকা শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ব্যবহৃত না হোয়ে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করার ইত্যাদি অভিযোগই প্রধান। এই অবস্থার প্রতিবিধানার্থ শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে কিছুদিন পূর্বে একবিরাট সভার আয়োজন হয়। যুক্ত-প্রদেশে এত বিরাট ধর্ম্মঘট কংগ্রেস সরকারের মধ্যস্থতায় কিভাবে সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হোল তার কারণ অনুসন্ধান করতে আমরা বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলকে অনুরোধ করি।

বাংলার মন্ত্রীসমস্যা ও বঙ্গীয় পরিষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে মৈত্রী

মন্দভাগ্য বাংলাদেশ সমস্যা বহুল। তাই বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলের দুদিনও মন্ত্রীত্বের গদিতে সুস্থির হোয়ে বসবার উপায় নেই। আজ এটা, কাল সেটা লেগেই আছে,—আন্দামান অনশন, প্রজাসত্ব আইন, বন্দীমুক্তি—একটার পর একটা বাংলার "সুখী পরিবারের" দিনের শান্তি ও রাত্রির নিদ্রা হরণ করবার জন্যই যেন ষড়যন্ত্র চালিয়েছে। বহিঃশক্রর আক্রমণেই বেচারীরা জর্জ্জর, তার উপর গৃহশক্র নৌশের আলীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতার ফলাফল কল্পনা করে মন্ত্রীমণ্ডলের জন্য নিদারুণ উদ্বেগে জনসাধারণ দিন কাটিয়েছে। গত ১৩শে জুন সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ ও নৌশের আলী বাদে, পুনরায় পদগ্রহণে সে উদ্বেগের কারণ আপাততঃ দূর হয়েছে। মিঃ নৌশের আলীর দপ্তর মিঃ সুরাবর্দ্দিকে দেওয়া হোয়েছে। এই অভিনয়ের প্রধান ঘটনাগুলি সম্বন্ধে, দৈনিক কাগজ মারফৎ দেশবাসী পরিচিত—কাজেই পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে দুএকটি কথা অবান্তর হবেনা। মিঃ নৌশের আলি হক মন্ত্রীমণ্ডলকে প্রতিক্রিয়াশীল অভিহিত করে কয়েকটি অভিযোগ তার বিরুদ্ধে এনেছেন যথা:—(১) ভূমি রাজস্ব-কমিশন নির্দ্ধারণের সিদ্ধান্ত (২) দমনমূলক আইন দূর না কোরে বরং কায়েমী করবার চেষ্টাদ্বারা নির্ব্বাচন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ (৩) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের উদ্দেশ্যে দমনমূলক আইন প্রনয়ণের চেষ্টা, (৪) বাংলার মুস্লিম প্রধান মন্ত্রীমণ্ডলীর মাদকতা নিবারণে দ্বিধা, (৫) স্বায়ত্তশাসনের অগ্রগতিতে বাধাদান, (৬) প্রজা ও জমিদারের মধ্যে সুদ, ও সেস্ সম্পর্কিত ভেদমূলক আইন প্রণয়ন। হক্ সাহেব তার সুদীর্ঘ বিবৃতিতে এসকল অভিযোগের কোন উল্লেখই করেননি—বোধহয় এগুলি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করবার মত যথেষ্ট উঁচুদরের নয়, বরং মিঃ নৌশের আলি মন্ত্রীত্বের গদিতে বস্বার আগে, কিরূপ প্রজা-বিদ্বেষী ছিলেন এবং হকসাহেব তাঁকে, প্রজানুরাগী করবার জন্য কি প্রাণান্তকর চেষ্টা করেও বিফল হোয়েছেন, তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে নৌশের আলি সম্বন্ধে কোন ভ্রান্তধারণার সম্ভাবনা থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এহেন প্রজাবিদ্বেষী নৌশের আলীকে কেন যে হক্সাহেব মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছিলেন তা বুঝা দুঃসাধ্য। তবে এই প্রহসনের একটি সুফল আমরা দেখ্তে পাচ্ছি—বিভিন্ন দলের মধ্যে মৈত্রী প্রচেষ্টায়। মৌলবী সামসুদ্দিন আমেদ পরিচালিত কৃষক-প্রজাপার্টির সভ্যগণ, মৌলবী তমিজদ্দিন খাঁ পরিচালিত স্বতন্ত্রপ্রজাদল, স্বতন্ত্র তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় দল ও মৌলবী নৌশের আলীর সমর্থকগণ বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিষদে কাজ করবেন বলে স্থির করেছেন। এঁরা বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর, দেশবাসীর আস্থার অভাবসূচক এক প্রস্তাব

গ্রহণ করেছেন। ক্রমেই মন্ত্রীমণ্ডলীর স্বরূপ উদ্ঘাটিত হোচ্ছে এবং পরিষদের বিভিন্ন দলের মধ্যে দেরিতে হোলেও, শুভবুদ্ধি দেখা দিচ্ছে এটা আশার লক্ষণ।

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্রের কর্পোরেশন ত্যাগ—

কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত শৈলেন ঘোষ সম্বন্ধে অভিযোগের পুনরায় তদন্ত দাবী কোরে কর্পোরেশনের এক রিক্যুইজিসান সভা আহূত হয়—সেই সভায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু পুনরায় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। অধিকাংশের ভোটে এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়াতে তিনি কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান্ পদত্যাগ করেছেন। তদন্ত কমিটির সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে যাঁদের সংশয় রয়েছে—তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পি, সি, রায় ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ বহু-মান্য ব্যক্তিরা রয়েছেন। তদন্ত কমিটি—শ্রীযুক্ত ঘোষ সম্পর্কে মূল অভিযোগটি ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ ক'রেছেন; তাঁর বিরুদ্ধে "অযোগ্যতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার"—অভিযোগই প্রধান। আমাদের মনে হয় এই অভিযোগে সতর্ক ক'রে দেওয়াই যথেষ্ট হোত—কারণ অনুরূপ অভিযোগ আরো বহু কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে আনা হয়তো সম্ভব—যাঁদের উপর এরূপ গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হয়নি। আর একবার তদন্ত হোলে ক্ষতি কিছুই ছিলনা—উপরন্তু জনসাধারণের সংশয় দূর হোত। জনসাধারণের প্রতিনিধি কর্পোরেশনের পক্ষে সেই পথ গ্রহণই উপযুক্ত ও ন্যায়োচিত হোত। আর একটী কথা, এই বিষয়টীকে উপলক্ষে কোরে কর্পোরেশনের যে বিশৃঙ্খলতা ও গলদ প্রকাশ হোয়ে পড়েছে সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা করলেন কিছুই জানা যায়নি। অথচ কোন ব্যক্তিবিশেষের থাকা না থাকা অপেক্ষা অনেকবড় কথা কর্পোরেশনের আভ্যন্তরিণ ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করা এদিক্ দিয়ে কি ব্যবস্থা করা হোচ্ছে কিছুই জানা যাচ্ছেনা।

চীন-দিবস—

গত ৭ই জুলাই আই, সি, এস পদত্যাগী শ্রীযুক্ত হরিবিষ্ণু কামাথের সভাপতিত্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভা হয়। ৭ই জুলাই তারিখেই জাপান, চীনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করে। ঐ দিন কল্‌কাতার বিভিন্ন জায়গায় শোভাযাত্রা ও সভা হয়—বহু চীনা নরনারী শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি চীনে যে এম্বুলেন্স পাঠানো সিদ্ধান্ত করেছেন তার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ঐ দিন ও তার পরবর্ত্তী দুইদিন অর্থসংগ্রহ করা হয়। পরাধীন ভারতের পক্ষে চীনের এই দুর্দ্দিনে সহানুভূতি দেখাবার পথও সংক্ষিপ্ত। দুটী পথ উন্মুক্ত রয়েছে—যা অল্প বিস্তর সকলেই অনুসরণ করতে পারেন—এক জাপানী-দ্রব্য বর্জ্জন ও চীনে এম্বুলেন্স প্রেরণের জন্য অর্থসংগ্রহ। যাঁরা চীনের বিরুদ্ধে জাপানের এই অভিযানকে সাম্রাজ্যবাদের অনাবৃত দস্যুবৃত্তি বলে মনে করেন—তাঁদের পক্ষে একে ব্যর্থ করিবার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য—এবং জাপানী দ্রব্যবর্জ্জন দ্বারা তাঁদের চেষ্টাকে একটা বিশিষ্ট ও কার্য্যকরীরূপ তাঁরা দিতে পাবেন।

বাংলার বন্দীমুক্তি প্রশ্ন—

প্রকাশ যে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে বাংলা সরকারের বন্দীমুক্তি প্রসঙ্গ নিয়ে যে আলোচনা চল্‌ছিল—তা এমন একজায়গায় এসে ঠেকেছে যে বাঙ্গলা সরকারের মনোভাবের পরিবর্ত্তন না হোলে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। শোনা যাচ্ছে—রাজবন্দী ও তিন আইনের বন্দীদের নাকি বিভিন্ন কিস্তিতে সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মুক্তি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে কয়েক দফা নামের তালিকাও বের হোয়েছে। যদিও এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত তালিকার মধ্যে অন্তরীনদের নাম নেই—যে বন্দীদের ইতিপূর্ব্বে সর্ত্তাধীনে মুক্তি দেওয়া হোয়েছিল—তাদের উপর থেকেই সর্ত্ত তুলে নেওয়ার খবর এ তালিকাগুলিতে—তবু কালে অন্তরীনদের মুক্তি পাওয়া হয়তো সম্ভবের কোঠায় এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে সরকারী নীতি পূর্ব্বের মতই অটল অচল। তাঁদের সম্বন্ধে নাকি এই ব্যবস্থা হোয়েছে যে যারা অল্পকালের মেয়াদে দণ্ডিত বা যাদের দণ্ডকালের বেশী অবশিষ্ট নেই, অথবা যারা পীড়িত তাদের মুক্তি দেওয়া সম্ভবপর হোতেও বা পারে। কিন্তু দীর্ঘদিনের মেয়াদে যারা দণ্ডিত—বিশেষতঃ চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায় দণ্ডিতদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে সরকার পক্ষ একেবারে বিরোধী। সরকার পক্ষের যুক্তি এইযে, এই শ্রেণীর বন্দীদের হিংসা-ত্যাগের প্রতিশ্রুতির কোন মূল্য নেই। রাজবন্দী ও রাজনৈতিকবন্দীদের সম্বন্ধে সরকার পক্ষের দুই বিভিন্ন নীতি অবলম্বনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ পাওয়া যায়না। বিশেষতঃ সরকার পক্ষই যখন রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের চিরকাল একশ্রেণীভুক্ত কোরে এসেছেন—আজ তাদের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করবার অর্থ আর কিছু নয়—কোন ওজরে এদের মুক্তিকে আট্‌কে রাখা। রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি প্রশ্নে একটী মাত্র বিষয় বিচার্য্য দেশের সমসাময়িক আবহাওয়া—এদিক দিয়ে বিচার কর্‌লে দেখা যায়—দেশের বর্ত্তমান আবহাওয়া সন্ত্রাসবাদ অসম্ভব। স্বাধীনতা আন্দোলনকে গনআন্দোলন থেকে বিযুক্ত ক'রে আজকের দিনে কেউ দেখ্‌ছেনা—আর গণ-আন্দোলনে সন্ত্রাজ্যবাদের কোন স্থান নেই। সরকার পক্ষ দেশের আবহাওয়ার, এই পরিবর্ত্তনের খবর যে রাখেন না তা নয়—কিন্তু সাহস ক'রে দৃঢ়তার সঙ্গে এদের ছাড়্‌তেও পারছেন না। এটা যে তাদের কতবড় অক্ষমতার পরিচয় তা' বোঝবার মত দূরদর্শী, বলিষ্ঠ রাজনৈতিক জ্ঞান এঁদের নেই। এঁদের এই অপরিণাম দর্শিতার বন্দীদের মধ্যে আবার অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। দমদম্‌ ও অন্যান্য স্থানের বন্দীরা মহাত্মা গান্ধীর নিকট জানতে চেয়েছেন, আর কতদিন তাঁদের ধৈর্য্য ধরে মুক্তি সম্পর্কে আলোচনার নিষ্পত্তির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এ অধৈর্য্য অহৈতুকী নয়—ক্রমাগত অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ধৈর্য্য ধরতে তাদের অনুরোধ করা, আমাদেরই অক্ষমতা ও লজ্জার কারণ।

মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদের আর্থিক দুরবস্থা—

মুক্ত রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের আর্থিক দুরবস্থার বিষয় কারো অজানা নেই। বহুদিন পর এমন একটা অবস্থার মধ্যে এরা মুক্তি পেয়েছে যাতে কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করাও এদের পক্ষে অসম্ভব হোচ্ছে। এবিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য চেষ্টা জনসাধারণের তরফ থেকে

হোচ্ছে বলে আমরা প্রমাণ পাচ্ছিনা। সরকার পক্ষ তো এবিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব কিছু স্বীকারই করছেন না। কলকাতা কর্পোরেশনে অথবা বিভিন্ন ফার্ম্মে যে কয়েকজন রাজবন্দী নিয়োগ করা হোয়েছে তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সরকার পক্ষ মুক্ত রাজবন্দীদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না। কাজেই কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের আবেদন করা ছাড়া ও কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা এদের জন্য করা প্রয়োজন হোয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটী যুবক আর্থিক দুরবস্থা সহ্য কোরতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে—এ খবরে বেদনা ও লজ্জা দুইই হয়—এ অবস্থার পরিবর্ত্তন যদি না করা সম্ভব হয় তবে একজন নয়, বহু দিবাকর পাত্রের আত্ম-হত্যা আমাদের দেখতে হবে।

সাম্প্রদায়িক মৈত্রী—

বহুবার বিফল হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টার বিরাম নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত পণ্ডিত জওহরলাল ও নবাব মহম্মদ ইসমাইলের চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবাব মহম্মদ ইসমাইলের কিছু পরিচয় প্রয়োজন। তিনি যুক্তপ্রদেশের মুস্লিমলিগের প্রেসিডেণ্ট—তবে এটাই তাঁর বড় পরিচয় নয়। বৎসর কয়েক আগে পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে ঐক্য-সম্মেলনে ভবিষ্যৎ ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রে কারা সামরিক অধিকার পাবে—সে বিষয়ের আলোচনায় নবাব সাহেব যে মনের পরিচয় দেন—তা' থেকেই ঐক্য চেষ্টার ফলাফল অনুমান করা সহজ। সামরিক জাতিত্বের অধিকার কাদের পাওয়া উচিত এই আলোচনায় তিনি পাঠান, শিখ ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের কয়েকশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই এই অধিকার সীমাবদ্ধ রাখতে প্রয়াসী হন—শুধু প্রয়াসী নয়, বাঙ্গালী ও মান্দ্রাজিকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার জন্য তিনি এতটা অশোভন জিদ্ দেখিয়েছিলেন যে স্পষ্ট ভাবেই বলেন, "যে কোন প্রস্তাবে এরা সম্মতি দেবে,—সেই প্রস্তাবেই আমি অসম্মত জানবেন।" এই যুক্তিহীন অন্ধ জিদের নিকট সেদিনকার ঐক্য সম্মেলনকে হার মানতে হোয়েছিল। তারপর কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপের ফলও হোল অনুরূপ। কংগ্রেস পক্ষের সমস্ত যুক্তিতর্ককে উপেক্ষা কোরে মৈত্রীর সম্ভাবনাকে নিস্ফল করবার কাজে ইনি পূর্ব্বাপর বিস্ময়কর সামঞ্জস্য দেখিয়ে এসেছেন। গত অক্টোবর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কংগ্রেস পূর্ব্বের সুস্পষ্ট বিরুদ্ধতাকে বর্জ্জন কোরে যখন আজ সমর্থনের পথ গ্রহণ করলো কেবল মাত্র সেই একবার নবাব সাহেবের সমর্থন লাভ করবার সৌভাগ্য কংগ্রেসের হোয়েছিল। মুস্লিমলিগের প্রধানতম দাবী সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত হোতে দেখে পণ্ডিত জওহরলালকে নবাব সাহেব প্রীত হোয়ে লেখেন :—

"সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আপনাদের অধুনাতন প্রস্তাব আমাদের একটা প্রকাণ্ড অভিযোগ দূর কোরেছে। আশাকরি ইহার ব্যতিক্রম হইবেনা।"

এতো গেল নবাব সাহেবের পালা। তারপর এ সম্পর্কে অতি আধুনিক ঘটনা মৈত্রী দূতরূপে আগাখাঁর আসরে অবতরণ। ঘটনাটী এতই বিস্ময়কর যে সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ

হওয়া অনুচিত নয়। প্রকাশ মহাত্মা গান্ধীকে মাননীয় আগা খাঁ সাম্প্রদায়িক মৈত্রী সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ পত্র লিখেছেন,—তাতে নাকি তিনি মুস্লিম লিগের মনোভাবকে সমর্থন করেননি। মৈত্রী আলোচনার আসরে এই নূতনতম মাননীয় আগন্তুকটী সম্বন্ধে খুব বেশী উচ্ছ্বসিত হোয়ে ওঠ্‌বার কারণ নেই। এ সম্পর্কে তাঁর অতীতের প্রয়াস আভিজাত্যের গৌরব করতে পারে। হয়তো সকলের মনে নেই—"মিণ্টোমর্লি শাসন সংস্কারের যুগে মাননীয় খাঁ সাহেব লর্ড মিণ্টোর পরামর্শে জনকয়েক মুসলমানসহ দিল্লীতে ডেপুটেশনে যান এবং তারই ফলে সর্ব্বপ্রথম স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। গোলটেবিল বৈঠকেও তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পুতুলরূপে "মাইনরিটি প্যাক্ট" ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করেন। মিলিত নির্ব্বাচনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার বাহাদুরীও তাঁর।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড আগা খাঁ সাহেবকেই প্রধান সমর্থক পান্ এবং তারপর থেকে মাননীয় খাঁ সাহেবই প্রধানতঃ এর স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে আস্‌ছেন। ইনি মুস্লিম লিগের একজন প্রতিষ্ঠাতা ও উপদেষ্টা। মিঃ জিন্নার সঙ্গে ইদানিং মতদ্বৈধতার কোন সংবাদও পাওয়া যায়নি। উপরন্তু আগা খাঁ বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের একজন অতি বিশ্বস্ত দূত এবং একাজের জন্য তিনি বৃটীশ সরকার থেকে মোটা রকমের বার্ষিক বৃত্তি পেয়ে থাকেন বলেও সম্প্রতি প্রকাশিত হোয়েছে। কাজেই এই দৌত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ ও সতর্কতার কারণ রয়েছে। আমাদের মনে হয় কংগ্রেস বহুদিন মুস্লিম লীগে পরোক্ষে যে অনন্য প্রধানত্ব আরোপ করে আস্‌ছেন তার একটা পরিবর্ত্তন দরকার। মুস্লিম লীগের সর্ব্বপ্রধান দাবী মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে তাকে স্বীকার করতে হবে। কংগ্রেস এ দাবী যখন মেনে নিতে সম্মত নন্ তখন বিভিন্ন মুস্লিম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কংগ্রেসের কথাবার্ত্তা চালিয়ে মুস্লিম লীগের প্রতি তাদের মনোভাব কি এবং মৈত্রী সম্পর্কেই বা তাদের মতামত কি তা জান্‌তে চেষ্টা করা উচিত। এতে মুস্লিম্ লীগের প্রতিনিধিত্ব করবার দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণ হয়। এছাড়া মৈত্রীর সমর্থক মুসলমানদের সংহত কোরে মুস্লিম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার দ্বারা অনুকূল মনোভাব গড়ে তুল্‌তেও চেষ্টা করা উচিত। মৈত্রীর বিরুদ্ধতা আজীবন যারা করে এসেছে—সেরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা ও পত্র ব্যবহারে বৃথাশক্তি ক্ষয়ের অপেক্ষা এই উপায় অবলম্বনে বেশী সুফল দেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লীগওয়ালাদের গুণ্ডামি

যুক্তির যেখানে অভাব—ন্যায়োচিতভাবে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবার দাবী যে রাখেনা—উপায়ন্তর না দেখে গায়ের জোরের পথকে সেই করে অবলম্বন—এ আমরা চিরকাল দেখে আস্‌ছি। লীগ-ওয়ালারাও কিছুদিন ধরে এ পথ আশ্রয় করেছেন—এতেই তাঁদের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। লীগওয়ালাদের গুণ্ডামির হাত থেকে এলাহাবাদে জওহরলালজী রক্ষা পাননি—এবার পূর্ব্ব-বঙ্গ সফরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সুভাষচন্দ্রের ভাগ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়নি। কংগ্রেস সভা-

পতিদের সম্পর্কে লীগওয়ালাদের এই অপক্ষপাতিত্ব প্রশংসনীয়। তবে লীগের হর্ত্তা কর্ত্তারা এ সম্পর্কে কিছু উচ্চবাচ্য করেন না দেখে সংশয় হয়, তাঁদের নীরব অনুমোদন হয়তো এতে আছে—কারণ কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমান তাড়নের কাল্পনিক সংবাদপ্রচারে উৎসাহ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন—তাঁরা জানেন উদ্দেশ্যহীনভাবে নীরব হোয়ে থাক্‌বার পাত্র লীগপন্থীরা নন্। তবে উদ্দেশ্যটি কি বোঝা মুস্কিল। লোষ্ট্র নিক্ষেপ দ্বারা কংগ্রেসপক্ষে ঘায়েল ও সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করা? আমাদের বিশ্বাস তাঁর অনুচরবৃন্দ নাহোক মিঃ জিন্না এর চাইতে বেশী বুদ্ধি রাখেন। আসলকথা—পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষতঃ ত্রিপুরাতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা এত অধিক সংখ্যায় রাষ্ট্রপতির সম্বর্দ্ধনাতে উপস্থিত হওয়ায়, লীগপন্থীদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে—এবং তারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক মনের উষ্মা প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানটি যে ক্রমেই মৌলকত্ব হারাচ্ছে আশাকরি লীগ-পন্থীরা তা বুঝ্‌তে পারবেন। এবার তারা উপায়ন্তর গ্রহণ করুন।

হিন্দুস্থানী ভাষা—

সম্প্রতি কল্‌কাতা কর্পোরেশনের টিচার্স ট্রেণিং পরীক্ষায় হিন্দুস্থানী ভাষা অবশ্যপাঠ্য করবার জন্য বেগম সাকিনা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মেয়র মিঃ এ, কে, এম জাকেরিয়া তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এই ভাষা সমস্যা বহুদিন ধরে চলে আসলেও বর্ত্তমানে হিন্দিভাষা প্রচারের তোড়ে এই সমস্যা জটিল হোয়ে উঠ্‌ছে। বহুভাষাবিদ্ হবার মত যাদের অর্থ, সামর্থ্য, সময় রয়েছে তাদের কথা আলাদা কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সম্বন্ধে মাতৃভাষা, হিন্দুস্থানী, ইংরাজি এ তিনটি ভাষা আয়ত্ব করবার ভার চাপিয়ে দিলে তা জুলুমে পর্য্যবসিত হবার সম্ভাবনাই বেশী। যাঁরা পারবেন তাঁরা তিনটে ভাষা নিশ্চয়ই শিখুন কিন্তু অবশ্য পাঠ্য হিসেবে তিনটি ভাষা, আমাদের অতিরিক্ত মনে হয়। ইংরেজী ভাষাতে সর্ব্বভারতীয় ভাবের আদান প্রদান অনেকটা সম্ভব এবং ভারতের সীমার বাইরেও তার সর্ব্বত্র ব্যবহার চল্‌তে পারে. কাজেই ইংরেজীকে বাদ দেওয়া উচিত হবেনা—অতএব যেখানে সম্ভব তিনটী কিন্তু যেখানে সম্ভব নয় সেখানে মাতৃভাষা ও ইংরেজীকে অবশ্য শিক্ষনীয় ভাষা বলে নির্ব্বাচিত করবার আমরা পক্ষপাতী।

ভাষা অনুসারে প্রদেশ বিভাগ—

কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নয় মধ্যইউরোপেও ভাষানুসারে শাসনসংক্রান্ত সীমা নির্দ্দেশের আন্দোলন চল্‌ছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এই নীতি সমর্থন করেছেন। অন্ধ্র, তামিল, কর্ণাট প্রভৃতি এবং মধ্যপ্রদেশকেও মারাঠী ও হিন্দিভাষা-ভাষী হিসাবে বিভাগ করবার আন্দোলন চলেছে। এসব আন্দোলনের স্বপক্ষে দুটী যুক্তি প্রধান—প্রথমতঃ সমভাষাভাষীরা একশাসনাধীনে এলে সংস্কৃতিক ঐক্য দৃঢ়তর হওয়ার সম্ভাবনা—এতে জাতিগত বিশিষ্ট প্রতিভার বিকাশ সহজতর হয়তো হয়; দ্বিতীয়তঃ কোন প্রদেশে ভিন্ন ভাষাভাষী লোক প্রায়ই বিমাতাসুলভ ব্যবহার পেয়ে থাকেন—ভাষানুযায়ী প্রদেশ বিভাগে তা সম্ভব হবেনা। তবে এই আন্দোলনে সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক ঐক্য যদি ক্ষুন্ন হয় তবে তা অনিষ্টকর হবে। নিজেদের বিকাশ ও উন্নতির অনুকূল পরি-

বেষ্টন বাঙ্গালীদের পক্ষে যেমন প্রয়োজন এবং আন্দোলন দ্বারা তা করবার চেষ্টা যেমন যুক্তিসঙ্গত—তেমনি ভারতের যে কোন প্রদেশে ভিন্নপ্রদেশবাসী বা সংখ্যালঘিষ্ঠ ভাষাভাষীদের প্রতি যাতে কোন ভেদাত্মক ব্যবহার না প্রকাশ পায় তার জন্য আন্দোলনও প্রয়োজন। সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিরই লক্ষণ এবং বৃহত্তর ঐক্যের পরিপন্থী—বিভিন্ন প্রদেশবাসীদের স্বার্থ যাতে অক্ষুন্ন থাকে, তার জন্য যেমন চেষ্টা প্রয়োজন •তেমনি আত্মঘাতী—ভেদাত্মক দৃষ্টি দূর হোয়ে যাতে সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী গঠিত হয় তার জন্যও আন্দোলন প্রয়োজন।

রাজসাহী জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে শ্রীযুক্ত শরৎবসুর অভিভাষণ—

গত ২রা জুলাই রাজসাহী জেলা রাষ্ট্রীয়সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর অভিভাষণের প্রধান বৈশিষ্ট তার সুস্পষ্টতা। এই জিনিষটি নেতাদের উক্তিতে আজকাল এত দুর্লভ যে শ্রীযুক্ত বসুর অভিভাষণের বৈশিষ্টটী অতি সহজে ধরা পড়ে। তাঁহার কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি ঐতিহাসিক পারম্পর্য্যে আস্থাবান", "শত ভাগ্যবিপর্য্যয় ও অবস্থা বিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়াও জাতির অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটী যোগসূত্র থাকিবে। এই যোগসূত্রকে বর্জ্জন করিয়া জাতির জন্য একেবারে নূতন করিয়া গৃহপত্তনের কল্পনা স্বপ্ন মাত্র।"...

"ভারতবর্ষে যদি কোনদিন দুর্ভাগ্যক্রমে বণিক ও শ্রমিকের মধ্যে, জমিদার ও কৃষকের মধ্যে অনিবার্য্য সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস যে নিরন্ন ও নিপীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহার পরিচয় বাক্যে ও কার্য্যে বহুবার দিয়াছে।..."

"ব্যক্তিগত মুক্তির পথ যেমন প্রত্যেক মানবসন্তানকে নিজের চেষ্টায় আবিষ্কার ও অবলম্বন করিতে হয়, জাতিগত মুক্তির পথ ও তেমনি দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনায় স্বকীয় চেষ্টায় আবিষ্কার করিতে হয়।"

"প্রত্যেক অভিমতেরই একটী বিশিষ্ট পরিবেষ্টনী ও বাস্তব ভিত্তি আছে। সেই পরিবেষ্টনীকে বাদ দিয়া উহার সত্যাসত্য বিচার করা চলেনা।"

উপরের উক্তিগুলি সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা থাক্‌তে পারে, কিন্তু চিন্তা কর্‌বার খোরাক রয়েছে।

শিকার রাজ্যে গোলযোগ—

শিকার ও জয়পুর রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ এবং তার ফলে জয়পুর ষ্টেট্ কর্ত্তৃক গুলিচালনা ও ১৮ জন হত এবং বহু আহতের খবরে সমস্ত দেশবাসীই চিন্তিত। ব্যাপার যে এমন হোয়ে দাঁড়াবে তা কেউ অনুমান করতে পারেনি, এ ব্যাপারে দেশীয় রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার ক্ষমতা হ্রাস ও শিকারের জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দরুণই এই পরিস্থিতির উদ্ভব। শিকারের অধিবাসীরা পণ্ডিত জওহরলাল, ভারত সচিব ও বৃটীশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করবার জন্য তার করেছেন। এ বিষয়ের কি নিষ্পত্তি হয় দেখবার জন্য দেশবাসী উৎগ্রীব হোয়ে থাকবে।

বিদেশে পণ্ডিত জওহরলাল—

স্পেন ও ফ্রান্স হোয়ে পণ্ডিত জওহরলাল বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে অবস্থান করছেন। ভারতীয় সমস্যা যে আন্তর্জাতিক সমস্যারই একটী অংশ, বক্তৃতা প্রসঙ্গে জওহরলাল এ বিষয়টীর উপর সর্ব্বত্র বিশেষ জোর দিচ্ছেন। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষায় ভারত যে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করবে সেবিষয় সকলেই ক্রমে সচেতন হোচ্ছে। জওহরলাল সর্ব্বত্র বিপুল ভাবে সম্বর্দ্ধিত হোচ্ছেন। বিশিষ্ট সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিগণ, তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে ভারত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করবার জন্যে বিশেষ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিশেষতঃ প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভারতবর্ষের মনোভাব জানবার প্রয়োজনও সকলে অনুভব করছেন। এ সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি—"নীতির দিক থেকে ভারতবর্ষ যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করেনা, কিন্তু ভারত শাসন আইনে যেরূপ ধরণের যুক্তরাষ্ট্রের কথাবলা হোয়েছে ভারতবর্ষ তার সম্পূর্ণ বিরোধী"—সমস্ত ভারতবর্ষ সমর্থন করবে। মতামত গ্রহণ না কোরে জোর কোরে কিছু চাপিয়ে দিবার দিন চলে গেছে—একথা যত শিগ্‌গির বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বুঝতে পারেন ততই উভয় পক্ষে সুবিধা।

জওহরলাল পেলেষ্টাইন সমস্যা নিয়ে আরবদের সঙ্গে আলাপকোরেছেন; কামাল আতাতুর্কের সঙ্গেও স্বাক্ষাৎ করবেন বলে সংবাদ পত্রে প্রকাশ পেয়েছে—বর্ত্তমানে জগতে বিভিন্ন দেশের স্বার্থ পরস্পর গ্রথিত, কাজেই বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগেয় সূত্র যত দৃঢ় হয় ততই মঙ্গল এবং এই কাজের পক্ষে জওহরলাল ভারতের যোগ্যতম প্রতিনিধি।

চীন-জাপানে সংঘর্ষ—

চীন জাপান যুদ্ধের ধ্বংশলীলায় প্রকৃতি এক নূতন অধ্যায়ের যোগ করেছেন। জাপানীরা উত্তরদিক থেকে হ্যাঙ্কাও অভিমুখে অভিযান করেছিল, পীতনদীর প্লাবনের ফলে তা ব্যর্থ হোয়েছে। তারা আবার পূর্ব্ব দিক থেকে আক্রমণের ব্যবস্থা করেছে। এই উদ্দেশ্যে ইয়াংসি উপত্যকায় সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ সমাবেশ চলছে। প্লাবনের ফলে বহু লোকের প্রাণ নাশ ঘটেছে। চীনা গরিলা বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে জাপানীরা প্লাবন পীড়িত স্থান থেকে সৈন্য উদ্ধারের কাজে বিশেষ বাধা পাচ্ছে। চীনে সর্ব্ব সাধারণ থেকে আরম্ভ কোরে মার্শেল চিয়াংকাইশেক পর্য্যন্ত হ্যাঙ্কার রাখাও দৃঢ় সংকল্প করেছেন জগতের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এ সংকল্প রক্ষায় সহায়তা করা উচিত। এদিকে জাপানের আভ্যন্তরিণ অবস্থা সম্পূর্ণ যে শান্তিপূর্ণ তা নয়—মন্ত্রীসভার বর্ত্তমান রদবদলে দুইটী জিনিষ প্রমাণিত হোয়েছে—এক সামরিক তন্ত্র সর্ব্ব সাধারণের সন্তোষবিধান করতে পারছেনা। এরই জন্য নূতন মন্ত্রী যারা নির্ব্বাচিত হোয়েছে, তারা সকলেই উদারনৈতিক দলের ও উগ্র সামরিকতন্ত্রের বিরোধী। ২য় আর্থিক অবস্থা অতি খারাপ এই জন্যই ব্যবসায়ী মহলে বিশেষ অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। এই আভ্যন্তরীণ চাপের ফলে কি পরিস্থিতি উপস্থিত হয় বলা যায় না, তবে জাপান বিনা আয়াসে চীন জয় করতে পারবে, সে আশা দুরাশা।

স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লব—

স্পেনের অন্তর্বিপ্লব এক সঙ্কটরূপ অধ্যায়ে এসে উপস্থিত হোয়েছে। বিদ্রোহ বাহিনী কোষ্টিলিন অধিকার কোরেছে—গণতন্ত্রীদের দুই হাজার সৈন্য জয়লাভ অসম্ভব দেখে স্পেনের সীমা অতিক্রম কোরে ফ্রান্সে উপস্থিত হয়। এদিকে মুসোলিনীর সঙ্গে বিদ্রোহী [illegible]'র গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হোচ্ছে স্পেন সম্পর্কে—বোঝা যাচ্ছে হের হিট্‌লার ও মুসোলিনীর মধ্যে একটী গোপন চুক্তি হোয়েছে তাতে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা রয়েছে, ইটালী ও জার্ম্মানীকে শেষ পর্য্যন্ত স্পেন অধিকার করতে হবে—কাজেই ইঙ্গ-ইতালী চুক্তি ব্যর্থ হওয়া অবশ্যম্ভাবী কারণ এ চুক্তি একটী সর্ত্ত স্পেন থেকে ইতালী সৈন্য অপসরণকরা—ইতালীর পক্ষে এ সম্ভব হবে না। যুগোশ্লভাকিয়াকে হাঙ্গারী ও স্পেনের মধ্যে বিভাগ কোরে দেওয়া, আলসেক লোরেণ, সেভয় ও টিউসিনিয়া অঞ্চল জার্ম্মাণীকে প্রত্যর্পণ করতে ফ্রান্সেকে বাধ্য করা, প্রভৃতি পরিকল্পনাও এতে আছে। গণতন্ত্রীরা অদম্য দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার সঙ্গে যুদ্ধ করছে, কিন্তু সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে কতদিন একা আর পেরে উঠবে—বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় শক্তি গণতন্ত্রের পরাজয় নিশ্চেষ্ট হোয়ে দেখবে—এই অদূরদর্শিতার ফল একদিন তাকে ভুগতেই হবে।

ইহুদী-বিদ্বেষ—

জার্ম্মাণীও সম্প্রতি অষ্ট্রিয়াতে উৎকট ইহুদী বিদ্বেষের ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হোয়েছে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাতে বিচলিত হবেন। এই ইহুদীরা আজ জগতের কোন জায়গায়ই স্থান পাচ্ছে না, এক সোভিয়েট রুশিয়া ছাড়া প্যালেষ্টাইনে এদের জন্য একটি জাতীয় বাসভূমি করবার যে প্রস্তাব হোয়েছিল, আরবেরা তাতে ঘোর আপত্তি তোলে, ফলে সেখানে আরব ও ইহুদীতে ঘোর সংঘর্ষ ও ইংরেজ কর্ত্তৃক উভয় পক্ষের উপর গোলাবর্ষণ চল্‌ছে। জার্ম্মাণিতে ইহুদীরা মানুষের মত বসবাস করবার অধিকার পূর্ব্বেই হারিয়েছে—অষ্ট্রিয়াতেও ইহুদী বিতাড়নের মরসুম চল্‌ছে।

এদের এই দুর্দ্দশায় সার ভিক্টর সেসুন বিশেষ বিচলিত ও ব্যথিত হন্। তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় ১০০০০বর্গ মাইল স্থান কিনেছেন—এখানে জার্ম্মাণি ও অষ্ট্রিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদিদের উপনিবেশ স্থাপন করা হবে। তাঁর ইচ্ছা যে ইহুদিরা ধীরে ধীরে ব্রেজিল ও দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য প্রদেশে গিয়ে বসবাস করে। ব্রেজিল সরকারের অভিমত যে কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ঔপনিবেশিকদেরই ব্রেজিলে গ্রহণ করা হবে। ইহুদিদের মাথাগুজিবার একটা স্থান হোলে সকলেই স্বস্তি বোধ করবেন।

প্যালেষ্টাইনে দমননীতি—

প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট জোর দমননীতি চালিয়েছেন। ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী মিঃ ম্যালকম ম্যাক্‌ডোনাল্ডের বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে যে মিশর থেকে সম্প্রতি দুটি রাইফেল ব্যাটেলিয়েন্ প্যালেষ্টাইনে পাঠানো হোয়েছে। এ ছাড়া হাফিয়াতে ব্রিটিশ রণতরী জড় হোয়েছে—

প্রয়োজন হোলেই ধ্বংসলীলা সুরু হবে। প্যালেষ্টাইনকে ইচ্ছামত বিভক্ত করবার পরিকল্পনার ফলে আরবদের বর্ত্তমান অসন্তোষ। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চিরাচরিত প্রথানুযায়ী, জনমতকে পদদলিত করে সমস্ত দেশময় প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রেছে। এর ফলে বহু আরব এবং অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ইহুদী ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছে, নির্ব্বাসিত অথবা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হোয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের শাসনরথ সমস্ত দেশকে নিপিষ্ট ক'রে চলেছে। পিল্ কমিশনের পরে, আরবদের তীব্র প্রতিবাদকে উপেক্ষা ক'রে যখন প্যালেষ্টাইন্ বিভক্ত করবার আয়োজন সম্পূর্ণ হোতে চলেছে তখন আরবদের নূতন ক'রে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। ফলে—সমস্ত দেশে উভয় পক্ষেই সন্ত্রাসবাদের নরমেধ যজ্ঞ চ'লেছে। কিন্তু এর জন্য দায়ী কে? ইজিপ্ট, আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের ব্যাপারে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে তারই পুনরাবৃত্তি প্যালেষ্টাইনে চল্‌ছে। সম্প্রতি ইংলণ্ডে পণ্ডিত নেহেরু প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে উল্লেখ ক'রে বলেছেন যে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যে অবস্থার সৃষ্টি ক'রেছে সাম্রাজ্যবাদ নীতি দ্বারা তার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতি পণ্ডিত জওহরলালের এই উক্তিকে সমর্থন করবে।

জয়শ্রী

সপ্তম বর্ষ | ভাদ্র | তৃতীয় সংখ্যা

রূপ সুগভীর

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

যা কিছু লেগেছে ভালো নয়নে আমার
ওগো, তার পরে আজ টানো যবনিকা,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মাঝে আলোকের শিখা
নির্ব্বাপিত হোক আজ।
সব কাজ
সব লাভ ক্ষতি আর সব মন্দ ভালো
মুছে যাক্। যেন মোর নয়নের আলো
আজিকে আড়াল নাহি হয়।
আজ হতে একটী আলোক
নিত্য উৎসারিত হোক্
মোর চিত্ত হ'তে
সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিয়া দিয়া নির্ঝরিত স্রোতে।
আজিকে শ্রাবণ বাজ গরজে গগনে
আঁকা বাঁকা রূপ লয়ে মেঘ ক্ষণে ক্ষণে

বিজলী চমকে যায় হেসে,
দূর হ'তে ভেসে
গন্ধবহ নিয়ে আসে ফোটা মালতীর
হৃদয়ে একত্র করা সুগন্ধ নিবিড়
ধরণীর ধূলো যায় ধুয়ে
আন্দোলিত তরুশাখা পড়ে নুয়ে নুয়ে
আজিকে আমার
দেহমন পেতে চায় মুক্তি আপনার।
ছোট ছোট ভাল লাগা ছোট ছোট সুখ
প্রতিদিন প্রকাশ-উন্মুখ
আমার এ মর্ম্মখানি ময়
শত শত বাধা নিয়ে ছায়া মেলে রয়।
ভাল মন্দে ভেদ নাহি থাকে
অতি ক্ষুদ্র গণ্ডি টানি বাঁধে যে আমাকে।
তুচ্ছ সুখে মুগ্ধ হয় মন
তবু মনে মনে জানি
এই নহে সব খানি
অসমাপ্ত অপূর্ণ জীবন।
আপনারে কী সঙ্কীর্ণ লাগে
বিরাট প্রত্যাশা লয়ে হৃদয় যে জাগে।
হে প্রিয়, আমারে লও তুলে
বলে দাও কোথা আছে তীর
চিত্তের গুণ্ঠন খুলে দেখাও সে রূপ সুগভীর।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম অধ্যায়

শ্রীকমলা গুপ্ত

ধনগত বৈষম্যের উচ্ছেদ-সাধনের ভিতরেই সমাজের প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে বলিয়া যাঁহারা মনে করিয়া থাকেন সমাজতন্ত্রবাদীরা তাঁহাদেরই দলভুক্ত। সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাব আজ সমস্ত দেশেই সঞ্চারিত হইয়াছে এবং সমাজতন্ত্রবাদের গুরু হিসাবেই কার্ল মার্ক্সের নাম সর্ব্বজন-বিদিত। কিন্তু ইহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে এই মতবাদ বিশেষ কোন ব্যক্তির সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা। বহুলোকের বহুদিনের চিন্তা ও কল্পনা হইতেই ইহা উদ্ভূত। মার্ক্স ও তাঁহার সম-সাময়িক মনীষীগণ সমাজতন্ত্রবাদকে একটী বিশেষ দার্শনিক ব্যাখ্যা ও কর্ম্মপ্রণালীর উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহাকে একটী সুনির্দ্দিষ্ট আকার দিয়াছিলেন। তাই সমাজতন্ত্রবাদের সহিত তাঁহাদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের চিন্তাধারার ভিতরেই এ মতবাদ প্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

মার্ক্সের কাল হইতে ইহাঁদের সাধারণতঃ স্বপ্নবিলাসী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। এই আখ্যার ভিতর কেমন যেন একটু অবজ্ঞার ভাব মিশানো আছে। হয়তো তাঁহাদের কল্পনায় কার্য্যকরী শক্তির অভাব ছিল। প্রচলিত চিন্তাধারাকে আঘাত করিয়া কোন নূতন মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে যুক্তি, ব্যাখ্যা ও জোরের প্রয়োজন সে আয়োজন তাঁহাদের সম্পূর্ণ হয় নাই। নবজাগ্রত চেতনায় তাঁহারা আদর্শসমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, কল্পনার আলোক প্রতিফলিত করিয়া বিচিত্র বর্ণে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্নকে সফল করিবার জন্য যথার্থ পথের নির্দ্দেশ তাঁহাদের রচনাতে ছিলনা। কিন্তু তবু তাঁহাদের এই রচনাকে কেবলমাত্র ভাবের বিলাস বলিয়া আমরা উপেক্ষা করিতে পারিনা। এই ভাবুকতা আছে বলিয়াই মানুষ বর্ত্তমানের কালিমালিপ্ত পটের উপর ভবিষ্যতের রঙ্গীন চিত্র অঙ্কিত করে। এবং একদিন তাহারি প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমস্ত দেশ আলোড়িত হইয়া ওঠে। মার্ক্স প্রমুখ সমাজ-তন্ত্রবাদীগণের রচনাতেও এই ভাবুকতা যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। সত্য বটে পূর্ব্ববর্ত্তী-গণের তুলনায় তাঁহাদের চিন্তা অনেক পরিণতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক বৃহৎ আন্দোলনই ভ্রূণাবস্থায় এই ভাবের অস্পষ্টতার ভিতরই লালিত পালিত হইয়া থাকে। তাই সমাজতন্ত্রবাদের পূর্ব্বারম্ভকে কল্পনার বিলাস বলিয়া অমর্য্যাদা করা চলেনা।

খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বেই গ্রীস-দেশের বিখ্যাত মনীষী প্লেটো তাঁহার রিপাব্লিকে যে আদর্শ-সমাজের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন ধনগত সাম্যকেই তিনি তাহার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেই সমাজে শ্রেণীগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও ধনগত প্রভেদ সেখানে প্রবেশলাভ করিতে

পারে নাই। প্লেটো নাগরিকদিগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, দার্শনিক, সৈনিক ও শ্রমিক। ইহাদের শিক্ষা দীক্ষা সমস্তই ভিন্নপ্রকৃতির, একের সংস্কৃতির সহিত অপরের কোনই যোগ নাই। কিন্তু ধনের বিভাগ সম্বন্ধে কোন ভেদাভেদ ছিলনা। রিপারিকে সকলেরই সাধারণ প্রয়োজনানুযায়ী পর্য্যাপ্ত ধনে অধিকার থাকা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন। কারণ তিনি জানিতেন সাধারণ খাওয়া পরার অভাবে যে পীড়িত তাহার মনুষ্যত্ব কখনও সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। কিন্তু অপর্য্যাপ্ত ধনেরও তিনি সম্পূর্ণবিরোধী ছিলেন। ধন হইতে বিলাস এবং বিলাস হইতে পতন এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল। যদিও প্লেটোর রিপারিকে আমরা ধনগত সাম্য দেখিতে পাই তবু ইহাকে প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ বলা চলেনা। কারণ কোন অর্থনৈতিক সূত্রের উপর ইহা প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। দ্বিতীয়তঃ যে অসামঞ্জস্যের ভিতর এ মতবাদ স্বভাবতই অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে প্লেটোর সময়ে সমাজে সেই অসামঞ্জস্য তেমনই প্রকট হইয়া ওঠে নাই। ফরাসী বিপ্লব এবং ইংলণ্ডে ইনডাষ্ট্রীয়াল রেভল্যুশন (Industrial Revolution) এই দুই বিপ্লব ইউরোপের জীবনধারায় যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল তাহারি ফলে এই অভিনব তত্ত্বের উৎপত্তি।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" এই মন্ত্রোচ্চারণে যে নবযুগের উদ্বোধন করা হইয়াছিল সে যুগের আলো ও দীপ্তি সর্ব্বসাধারণের জীবনের অন্ধকার এতটুকু দূর করিতে পারে নাই। নেপোলিয়নের নির্ব্বাসনের পরে রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও রাজার সেই পূর্ব্ব-মহিমা আর ছিলনা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে দশম চার্লসের রাজত্বকালে প্যারিসে যে বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহাতে "Old Regime"এর অপ্রতিহত ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া গেল। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ সেই ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারিলনা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ফ্রান্সে বুর্জ্জোয়া শাসন প্রাধান্য লাভ করিল। বুর্জ্জোয়াগণ সমাজের একটী ক্ষীণ অংশ মাত্র। তাহারাই সমাজে ধনের অধিকারী, তাই রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা দ্রুত তাহাদের করতলগত হইল। দারিদ্র্যের পীড়নে সমাজের যে বিশাল অংশটা পঙ্গু হইয়াছিল রাজার পরিবর্ত্তে বুর্জ্জোয়ার হস্তে তাহাদের উৎপীড়ন চলিতে লাগিল। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী যেন তাহাদের সহিত একটা নিষ্ঠুর পরিহাস করিল।

এই নিদারুণ অন্যায় ফ্রান্সের কয়েকজন মনীষীর চিত্ত স্পর্শ করিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন সংগ্রাম কেবল রাজা ও প্রজার ভিতর নয়। সংগ্রামের মূল ধনী ও দরিদ্রের ভিতর। যে সাম্যের মন্ত্রে আজ ফরাসীজাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে কেবলমাত্র রাজকীয় তন্ত্রের উচ্ছেদসাধনে সে সাম্য তাহারা লাভ করিতে পারিবেনা। ধন ও শ্রমের বিভাগেও সেই সাম্য অর্জ্জন করিতে হইবে। ইহাই হইল সমাজতন্ত্রবাদের বীজমন্ত্র।

Babeuf এবং Cadetএর রচনাতেই এই নীতির ক্ষীণ আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা মানুষে মানুষে বিন্দুমাত্র বৈষম্যও স্বীকার করেন নাই বলিয়া তাঁহাদের কল্পনা বড় আড়ষ্ট। St.

Simonই প্রথম অসামঞ্জস্যের ভিতর সামঞ্জস্যের কল্পনা করেন। অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী বিপ্লবের সময় তিনি বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। দরিদ্রতম শ্রেণীর উন্নতিসাধনই সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত এই নীতিকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার মতবাদ গঠিত হইয়াছিল। দরিদ্রের অক্লান্ত শ্রমে ধনীর বিলাসের উপকরণ স্তূপীকৃত হইয়া ওঠে সমাজের ব্যবস্থার এই নিষ্ঠুরতা তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়িত করিয়াছিল। আমরা প্রত্যেকেই সাধ্যানুযায়ী পরিশ্রম করিব এবং সেই অনুযায়ী পারিশ্রমিক লাভ করিব, ইহাকেই ধনবিভাগের প্রকৃত নীতি বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও সাম্যবাদের গোড়ার কথাটাই তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন তবু পরবর্ত্তীকালের সাম্যবাদীদের সহিত তাঁহার প্রভেদও বিস্তর। তাঁহার ধন ও শ্রম বিভাগের নীতির সহিত যে ধনীর সংঘাত ঘটিতে পারে, সমাজে মনিব ও শ্রমিকের স্বার্থ যে স্বভাবতই বিরোধী সে ধারণাকে তিনি আমল দেন নাই। "Business Magnates" দেরই তিনি সমাজের কর্ণধার বলিয়া মনে করিতেন। তিনি সমাজের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ভাবিতেন মানুষের শুভ-বুদ্ধিকে জাগ্রত করিতে পারিলেই আমরা সেই সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিব। তাই ধনীর নিকট আবেদন নিবেদনে তাঁহার কোন কুণ্ঠা ছিলনা। এমন কি অষ্টাদশ লুইএর নিকট এ সম্পর্কে আবেদনপত্র পাঠাইতেও তিনি ক্রটী করেন নাই।

Fourierএর রচনাতে এই ভ্রম অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল। তিনি যে কেবল মনিব ও শ্রমিকের বিরোধিতা সম্বন্ধেই সচেতন ছিলেন তাহা নয়, ক্যাপিটালিষ্ট সিষ্টেমকে (Capitalist System) কেন্দ্র করিয়া যে অন্যায় প্রতিযোগীতার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বিষময় ফল সম্বন্ধেও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না। এই সিষ্টেমের ক্রটী বিচ্যুতি তিনি নিপুণভাবে উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্যায়ের মূল সম্বন্ধে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন সে অন্যায় দূর করিবার উপায় সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা ততদূর পরিণতি লাভ করিতে পারে নাই। অসামঞ্জস্যই যদি সমস্ত অন্যায়ের মূল হইয়া থাকে তাহা হইলে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করাই সমাজের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সত্যই অদ্ভুত। তিনি সমাজকে কয়েকটি উপনিবেশে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশগুলির নাম Phalanx. প্রত্যেক Phalanxএর অধিবাসীগণ একটী বৃহৎ অট্টালিকায় তাহাদের সংসার স্থাপন করিবে। এবং একই উপনিবেশের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন দল রচনা করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুযায়ী জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় অবলম্বন করিবে। এমনি আরো কত স্বপ্ন।

সমাজে সামঞ্জস্যের প্রয়োজন, সেকথা প্রত্যেক সমাজতন্ত্রবাদীই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই পথ যে কত বাধা বিঘ্নে সমাকীর্ণ, কেবলমাত্র শ্রেণীবিরোধ নয়, আমাদের স্বভাবের ভিতরেই যে কত বিরোধের বীজ লুকানো আছে এবং তাহা জয় করা যে কত সুকঠিন তাহা St. Simon বা Fourier কেহই সুস্পষ্ট করিয়া দেখান নাই। লক্ষ্যের প্রতিই তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু লক্ষ্যের পথে যে সমস্যাগুলি ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তাঁহারা সেগুলি উপেক্ষা করিয়াই গিয়াছিলেন।

Louis Blancএর চিন্তা এইদিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল। সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে শ্রেণী বিরোধ যে অবশ্যম্ভাবী সে ধারণা তাঁহার ছিল। এবং সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে যে ধনীর উপর নির্ভর করিলে চলিবেনা, যাহারা পদদলিত তাহাদেরই পথপ্রদর্শকের স্থান অধিকার করিতে হইবে এ কথাও তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়াছিলেন। St. Simon ও Fourier সমস্যার এদিকটা কখনও দেখেন নাই বলিয়া Louis Blancএর তাহাদের প্রতি ভারী একটা অবজ্ঞা ছিল। কিন্তু Louis Blancএর মতবাদ আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার রচনাতেও ভাবুকতা মিশ্রিত ছিল। তাঁহার "জাতীয় শ্রমশালার" (National Workshops) পরিকল্পনা দেশের লোকের বিরোধিতায় এবং সর্বোপরি তাহা বাস্তবোপযোগী ছিলনা বলিয়া কখনও সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। তবে ইহা ঠিকই যে তাঁহার শ্রেণীবিরোধ সম্বন্ধে সচেতনতা তাঁহাকে আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদীদের অনেকটা নিকটে আনিয়া দিয়াছিল।

আনন্দ ও পূর্ণতাকেই Louis Blanc চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাজে যে ব্যবস্থার ভিতর তিনি প্রতিপালিত তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আদর্শের প্রতিকূল ছিল। অভাবের ভিতর পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব। তাই নরনারী নির্বিশেষে প্রয়োজনানুযায়ী ধন থাকা তিনি অবশ্য কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। Capitalist Systemএ ব্যক্তিগত ধনোৎপাদনের রীতির ভিতর এই ধনবিভাগ সম্ভব হইতে পারেনা। তাই রাষ্ট্রের উপর ধনোৎপাদনের ভার দিয়া তিনি সমস্যার মীমাংসা করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত শ্রমশালাগুলিতে যদি সকলেই শ্রমের ও পারিশ্রমিকের অধিকার লাভ করে তাহা হইলেই ধনবৈষম্যের প্রশ্ন দূর হইবে। St Simon শ্রমের তারতম্য অনুসারে ধনবিভাগ অনুমোদন করিয়াছিলেন। Fourier ও প্রতিভার বৈষম্য অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু Louis Blanc এবিষয়ে তাঁহাদের অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাধ্যানুযায়ী শ্রম করা উচিত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু শ্রমানুযায়ী অপেক্ষা প্রয়োজনানুযায়ী ধনবিভাগকেই তিনি সমর্থন করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন "From each according to his ability, to each according to his needs."

জাতীয় শ্রমশালাগুলি তাঁহার আদর্শ-সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। উৎপাদনের যন্ত্রের অধিকারী পুঁজিপতিগণ, তাই তাহাদের সাহায্য ব্যতীত দরিদ্র ব্যক্তি কিছুই উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়না। দরিদ্রব্যক্তিকে ধনীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে হইলে রাষ্ট্রকে প্রথমেই এই যন্ত্র সরবরাহের ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং শ্রমাভিলাষীকে কাজ করিবার উপযুক্ত সুবিধা দান করিতে হইবে। জাতীয় শ্রমশালার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত শ্রমশালার উচ্ছেদ-সাধন অনাবশ্যক। প্রতিযোগীতায় অক্ষম হইয়া ব্যক্তিগত শ্রমশালাগুলি ক্রমে ক্রমে স্বেচ্ছায় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এবং সেই সঙ্গে দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইহাই ছিল Louis Blancএর মর্মকথা।

যখন St. Simon প্রমুখ মনীষীগণ বুর্জোয়া শাসনের অন্যায়ের মূল উদ্‌ঘাটন করিতে ব্যস্ত ছিলেন তখন সমস্ত দেশই ভিতরে ভিতরে বুর্জোয়া অত্যাচারে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে পুনরায় যে বিপ্লব ঘটিয়া গেল তাহার ফলে রাজবংশের মত বুর্জোয়া শাসনও কোথায় তলাইয়া গেল। এই বৎসরেই ফ্রান্সে প্রথম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই সাধারণ-তন্ত্রের সহিত সমাজতন্ত্রের কোন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে মনে করিলে ভুল হইবে। যদিও সমাজতন্ত্রবাদী-গণের চিন্তাধারা এই আন্দোলনের মূলে কাজ করিয়াছিল এবং ১৮৪৮এর বিপ্লবের সহিত Louis Blanc ঘনিষ্ঠভাবেই যুক্ত ছিলেন তবু এই বিপ্লবকে সমাজতন্ত্রবাদীদের বিপ্লব বলা চলেনা। এই সময় শ্রেণীবিরোধ সম্বন্ধে দেশবাসী বিশেষ সচেতন হইয়া ওঠে নাই। Louis Blancএর জাতীয় শ্রমশালাগুলি সাধারণের বিরোধিতাতেই অচিরে সমাধিলাভ করিল। এবং কিছুকালের মত ফ্রান্সে সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাব একেবারে নির্মূল হইয়া গেল।

ফ্রান্সে যখন সমাজতন্ত্রবাদীদের দল গড়িয়া উঠিতেছিল ইংলণ্ডেও তখন পৃথকভাবে এই মত-বাদের সৃষ্টি হইতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই "ইন্‌ডাষ্ট্রীয়াল রেভলুশনের" ফলে ইংলণ্ডের জীবনধারায় একটা আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল। যেমন একদিকে বড় বড় কল কার-খানা দেশের সমৃদ্ধি সূচনা করিতেছিল তেমনি অপরদিকে এই কলের মালিক ও শ্রমিকের ভিতর একটা অন্যায় প্রভেদ দেশের আব্‌হাওয়াকে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছিল। দেশে ধনোৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধনবিভাগের রীতিও অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছিল। মুষ্টিমেয় মালিকের হাতে ধন স্তূপীকৃত হইতে লাগিল, বিলাসে ও আরামে তাহাদের জীবন মন্থর হইয়া উঠিল, কিন্তু শ্রমিকের ভাগ্যে তাহার উচ্ছিষ্টটুকুও জুটিলনা। তাহার গৃহে আহার নাই, বস্ত্র নাই, নিজস্ব বলিয়া দাবী করিবার কোন সম্পদ নাই। অন্যবিধ কলের মত মালিকের হাতে তাহার জীবনও কলের সামিল হইয়া উঠিল। পশুর জীবনের সহিত তাহার জীবনের একটা প্রভেদ রহিলনা।

কিন্তু পৃথিবীতে দুঃখ যতই থাক্ না কেন সেই সঙ্গে দুঃখমোচনের সম্ভাবনাটাও কখনও একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় না। সেই দুঃখকে লাঘব করিবার জন্য মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করিতে থাকে। "ইন্‌ডাষ্ট্রিয়াল রেভলুশনের" ফলে ইংলণ্ডে শ্রমিকদের ভাগ্যে যখন প্রাণ-পাত পরিশ্রম, অভাব ও অনশন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল তখন এই কলের মালিকদের ভিতর এমন একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যিনি এই শ্রমিকদের উন্নতিকল্পেই তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইনিই রবার্ট আওয়েন (Robert Owen) ইঁহাকেই সাধারণত ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রবাদীদের মন্ত্রগুরু বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গড্‌উইনএর (Godwin) "Political Justice"এ আওয়েনের মতবাদের মূলসূত্রগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। আওয়েন সেই সূত্রগুলিকে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত কাজের ভিতর রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম আজ গুরুকেও ছাপাইয়া গিয়াছে।

গড্উইন্ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকেই সমাজের সমস্ত অন্যায়ের মূল বলিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন। ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজের তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন, ধনের অসামঞ্জস্যের ভিতর সে আদর্শলাভ করা সম্ভব নয়। তিনিও Louis Blancএর মত প্রয়োজনানুযায়ী ধনবিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন। Godwinএর পরে Hall, Bray, Thompson, Hodgskin ইঁহাদেরও অল্পবিস্তর সমাজতন্ত্রবাদী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কারণ পরবর্ত্তীকালের সমাজতন্ত্রবাদীদের "শ্রমিকের শ্রমই সমস্ত ধনের মূল" এই বিশেষ সূত্রটীর আভাস ইঁহাদের সকলের রচনাতেই পাওয়া যায়। চিন্তার দিক দিয়া ইঁহাদের নিকট ঋণী হইলেও রবার্ট আওয়েনের প্রাধান্য আমরা অস্বীকার করিতে পারিনা। কেবলমাত্র ভাবুক হিসাবেই নয় কর্ম্মী হিসাবেও আওয়েন সমাজতন্ত্রবাদী এই আখ্যা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাই সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাসে তিনি একটী বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

"প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ" Benthamএর এই মন্ত্রেই Owen দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুখ বলিতে কেবল ধনলাভ নয়, চরিত্রের অনুশীলনকেই সুখলাভের প্রথম সোপান বলিয়া মনে করিতেন। এই অনুশীলনের শক্তি ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলের ভিতরেই বর্ত্তমান। অনুকূল পরিপার্শ্বের প্রভাবে সকলের জীবনেই ইহা পরিস্ফুট হইয়া ওঠে। তাই আবেষ্টনের পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই 'আওয়েন' সমাজের দরিদ্রতম তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীকে মহত্ত্বে ও ঔদার্য্যে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ব্যবসায়ে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল। অল্প বয়সেই তিনি New Hanark Millsএর ভারপ্রাপ্ত হন। এবং এই কলের শ্রমিকদের লইয়াই তিনি প্রথম আদর্শ উপনিবেশ স্থাপন করেন। Socialism :—Scientific and Utopia তে Engels বলিয়াছিলেন—বিচিত্র জাতের সমাবেশে Owen তাঁহার প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করেন। নৈতিক জীবনে ইহারা প্রথমে অত্যন্ত নিম্নস্তরে ছিল। কিন্তু Owenএর অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিচালনায় তাহাদের সংখ্যাই যে বৃদ্ধি পাইল তাহা নয়, চরিত্রের দিক দিয়াও ইহারা উন্নততর জীবনের অধিকারী হইল। অধঃপতিত শ্রমিকগণ আদর্শ শ্রমিকে রূপান্তরিত হইল।

এই পরিবর্ত্তনের জন্য Owenকে কোন দুরূহ পথ অতিক্রম করিতে হয় নাই। তিনি শ্রমিকদের কেবলমাত্র ধনোৎপাদনের কল হিসাবেই দেখেন নাই। তাহাদের সহিত মানুষের ন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন। এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিদের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। মনিবের সুন্দর ব্যবহার এবং পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থার উন্নতির ভিতর দিয়াই এই আমূল সংস্কার সম্ভবপর হইয়াছিল। Owen New Hanarkএ শিশুদের জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন দুই বৎসর বয়সেই ছাত্ররা ইহাতে প্রবেশ করিত। কথিত আছে যে এই বিদ্যালয় ছাত্রদের এত প্রিয় ছিল যে গৃহে ফিরিতেও তাহাদের আর আকাঙ্ক্ষা হইতনা। Owenএর প্রতিযোগী মালিকগণ যখন শ্রমিকগণের দৈনিক ১৩।১৪ ঘন্টা করিয়া খাটাইত তখন Owenএর কলে খাটিবার

নিয়ম ছিল ১০॥ ঘণ্টা। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাহাতে Owen এর কলের উৎপাদন শক্তি এতটুকু হ্রাস হয় নাই। বরঞ্চ শেষ পর্য্যন্ত এই কলের অধিকারীগণ প্রভূত লাভবান হইয়াছিলেন।

আদর্শ উপনিবেশের কল্যাণে শ্রমিকদের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন ও উন্নতি ঘটিলেও Owen কেবলমাত্র এই সংস্কারেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেছিলেন না। সমাজের ব্যবস্থায় একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন ইহা যতই উপলব্ধি করিতেছিলেন ততই তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৮২১এ তাঁহার "Social system" প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি পুঁজিপতিগণের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি বলিলেন যন্ত্রবিপ্লবের সাহায্যে ইংলণ্ড যে বিপুল ধনোৎপাদনের শক্তিলাভ করিয়াছে তাহা শ্রমিকেরই সৃষ্টি। তাই এই ধনোৎপাদনের যন্ত্রগুলি সর্ব্বসাধারণের অধিকারে এবং সর্ব্বসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই কম্যুনিষ্ট মতানুযায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিতেও তিনি সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াস সফল হয় নাই।

দেশের সমস্ত ট্রেড্ ইউনিয়ান এবং কো-অপারেটিভ সমিতিগুলির ভিতর দিয়া শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করিয়া দেশে কম্যুনিজম্ আনিবেন এই অভিলাষ লইয়াই তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রথমে সমস্ত দেশেই একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং শ্রমিকগণ দ্রুত সংঘবদ্ধ হইতে থাকে। দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের দ্বারা একটা বিপ্লব সৃষ্টি করার কল্পনা সকলকেই উৎসাহিত করিয়া তোলে। কিন্তু এই ধর্ম্মঘটকে সার্থক করিতে হইলে শ্রমিকদের ভিতর যে চেতনা, বিচারবুদ্ধি এবং ঐক্যবোধের প্রয়োজন তাহা তখনও তেমনভাবে জাগ্রত হয় নাই। তাই ১৮৩৩ এ Owenএর নেতৃত্বে যে আন্দোলনের আরম্ভ হইয়াছিল সামান্য আঘাতেই তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। ইহার পর হইতেই Owenএর প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। Engels বলেন Owenএর কম্যুনিষ্ট মনোবৃত্তিই তাঁহার জীবনে এ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিল। যতদিন তিনি বিশ্বপ্রেমিকরূপে শ্রমিকের উন্নতিসাধন করিতে চাহিয়াছিলেন ততদিন সর্ব্বত্রই সম্মানের সহিত আদৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু কম্যুনিজমের অন্তরায়স্বরূপ তিনি যখন ধর্ম্ম, প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূলে আঘাত করিলেন তখনই তাঁহার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল। Owenএর কম্যুনিজমের কল্পনা সার্থকতা লাভ করে নাই। কিন্তু ব্যর্থতা তাঁহাকে কখনও নিরুৎসাহ করিতে পারে নাই। জীবনের প্রারম্ভে তিনি যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন অপূর্ব্ব নিষ্ঠার সহিত তাহা তিনি আজীবন পালন করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় শ্রমিকদের জীবনে যাহাকিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার উপর Owenএর প্রভাব বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফ্রান্সের মত ইংলণ্ডেও সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রভাব জন-আন্দোলনের মূলে ইন্ধন যোগাইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইংলণ্ডে 'চার্টিসম্' (Chartism) নামে যে আন্দোলনের উৎপত্তি হইয়াছিল আপাতদৃষ্টিতে তাহা রাজনৈতিক মনে হইলেও মূলতঃ অর্থনৈতিক সমস্যা হইতেই তাহার উৎপত্তি। ইংলণ্ডের শ্রমিকগণ Peoples'

chartorএ (যাহা হইতে chartism নামের উৎপত্তি) যে দাবী উপস্থিত করিয়াছিল তাহা সমস্তই পার্লামেন্টে নির্ব্বাচন সম্পর্কীয়। কিন্তু চার্টারে কেবলমাত্র রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে দাবী থাকা সত্ত্বেও যেখানে শ্রমিকগণের সর্ব্বাপেক্ষা দুরবস্থা সেখানেই এই আন্দোলন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল। কেবল তাহাই নয় ব্যক্তিগত সম্পত্তির (Private Property) প্রতি চার্টিষ্টগণের বিশেষ বিরাগ ছিল এবং capitalist systemএ শ্রমিক তাহার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য হইতে বঞ্চিত হয়, শ্রমিককে অপহরণ করিয়াই মনিবের লাভের পরিমাণ স্ফীত হইয়া ওঠে এই মতবাদও এই সময়ে প্রচারিত হইতে থাকে।

দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের দ্বারাই চার্টিষ্টগণ তাহাদের আন্দোলন জয়যুক্ত করিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কয়েকবার বিপ্লবের চেষ্টার পরে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলন একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়। এই পতনের জন্য সাধারণতঃ আন্দোলনের নেতাগণের অদূরদর্শিতাকেই দায়ী করা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ ইংলণ্ডের শ্রমিকগণের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। এবং সেই সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

সমাজতন্ত্রবাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের সঙ্গেই ইহার প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটিল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এই যুগের সমাজতন্ত্রবাদীদের ভিতর একটা বিষয়ে অত্যন্ত ঐক্য দেখা যায়। তাহারা যে সমাজের আদর্শ-কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণভাবে ন্যায় ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা এক দেশকালাতীত আদর্শের রচনাতেই মগ্ন ছিলেন। ঐতিহাসিক সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের মতবাদকে কখনও বাস্তবোপযোগী করিতে চেষ্টা করেন নাই। এবং যে সংগ্রামের ভিতর দিয়া এই আদর্শকে লাভ করিতে হইবে সে সংগ্রাম সম্বন্ধেও কোন সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেন নাই। তাহারা মনে করিতেন, যে আদর্শ আমাদের বুদ্ধির নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে তাহাকেই আমরা সানন্দে ও বিনা সংগ্রামেই গ্রহণ করিব। এই ত্রুটীর ফলেই আজ তাহারা স্বপ্নবিলাসী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

ইহা সত্য যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম যুগে সমাজে যে বিপ্লবের কল্পনা করা হইয়াছিল তাহা বড় অসম্পূর্ণ ছিল। দার্শনিক ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক সত্যকে কেন্দ্র করিয়া সমাজতন্ত্রবাদীদের যুক্তিগুলি তখনও দানা বাঁধিয়া ওঠে নাই। শ্রেণী-বিরোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ছিলনা বলিয়া কল্প-ক্ষেত্রে তাহাদের দানের পরিমাণ অধিক হয়। কিন্তু তাহাদের কল্পনা যতই অসম্ভব হউক না কেন তাহারা যে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, সমাজকে যে নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিয়াছিলেন তাহার যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। ইতিহাসের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাহারাই জানেন সমাজে কোন আমূল পরিবর্ত্তন একদিনে সম্ভব হয় নাই। বহুলোকের অপরিণত চিন্তা ও ব্যর্থ-প্রয়াসের ভিতর দিয়াই ইহা সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তীকালের সুসংবদ্ধ নীতি ও কার্য্যপ্রণালীর তুলনায় আজ যাহা ছেলেখেলা বলিয়া মনে হইতেছে তাহাই বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রবাদের মূল-ভিত্তি এ কথাটি আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

যমুনা

শ্রীবেলা দেবী

দেনার দায়ে সত্য সত্যই জলাবাড়ার প্রবল প্রতাপ ভূম্যধিকারী রমাপতি ঘোষাল নফর সেখের গরু বাছুর ক্রোক করাইয়া আনিলেন। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রের মাঝখানে তাতিয়া পুড়িয়া নফর সেখ বাঁধের ধারে বসিয়া নিড়ানি দিতেছিল। এমন সময় নফরের পাঁচ বছরের ছেলে করিম হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত। সব কথা সে গুছাইয়া বলিতে পারিল না। নফর যতটা বুঝিতে পারিল তাহার মোটামুটি অর্থ এই যে, তাহাদের দুধাল গরুটিকে রমাপতি ঘোষাল জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এই গরুটির উপর গ্রামের ব্রাহ্মণদের সকলেরই একটা লোলুপদৃষ্টি ছিল। প্রত্যহ সের পাঁচেক দুধ পাওয়া যায় এবং দুধ রোজ বিক্রী করিয়া এই ক্ষুদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান কোন মতে হইয়া থাকে। রাণাসারের মাতব্বর লোকেরা বলাবলি করে নফর আর এক জন্মে গয়লা ছিল, দেবতার অভিশাপে পৃথিবীতে আসিয়াছে। কি যত্ন সে করে গরুটির জন্য। নিজে না খাইয়া, রৌদ্র-বৃষ্টিতে ভিজিয়া, পাড়া প্রতিবেশীর শত সহস্র মুখঝামটা খাইয়াও সে গরুটিকে লইয়া সুখে-দুঃখে দিন গুজরাণ করে। বারোমাসে সাত মাস দুধ বেচিয়া নফর হাটবাজারে বেসাতি কিনিতে যায়। আর বাকী কয়মাস ধান পাট যাহা পায়, তাহাতে তিন মাসের খোরাকীর বেশী হয় না, তাই মহাজনদের কাছে চড়া সুদে হাত পাতিতে হয়। এমনি করিয়া বছরের পর বছর চলিয়াছে। দেনাও বাড়িতেছে, অথচ পেটের দায়ে না করিয়াও উপায় নাই।

খাটিয়া খুটিয়া যে সে পয়সা উপার্জ্জন করিবে, এমন কথা সে বহুদিন ভাবিয়া দেখিয়াছে। দেশে একপয়সা ধার পাওয়া যায়না। যাহারা কাজকর্ম্ম করায়, বাকী-সাকী করিয়া মাসের পর মাস ঘুরাইতে থাকে, তাগাদা দিয়াও বিশেষ কোন ফল হয়না। বিদেশে যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। একমাত্র স্ত্রী আমিনা, এবং পাঁচ বছরের ছেলে করিমকে দেশে রাখিয়া কোথাও গিয়া যে সে একদিন থাকিবে, এমন ফুরসৎ তাহার নাই। তবে যদি করিম কোনদিন বড়-সড়ো হইয়া দু'চার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে, তখন না হয় একবার ভাবিয়া দেখা যাইতে পারে; সেদিনের কথাও সুদূর পরাহত।

বাজারে নফর সেখের দুধ পাইলে সকলেই এক পয়সা বেশী দাম দিয়া কিনিয়া নেয়, কারণ সে দুধে এক ফোঁটা জল মিশায় না আর তাহার কালো গরুর দুধ বেশ মিষ্টি নাকি এরকম ধরণের একটি কথা গ্রামের ইতর ভদ্রের মুখে সর্ব্বদাই শোনা যায়।

করিমের কথা শুনিয়া নফর দুই চোখে অন্ধকার দেখিল। কতদিন যাবৎ সে ঘোষাল-মহাশয়কে ভাঁড়াইয়া আসিতেছে দেই-দিচ্ছি করিয়া, ঘোষাল আর কতদিন চুপ করিয়া বসিয়া

থাকিতে পারেন। অথচ এত আদরের গরু তাহার আজ চোখের নিমেষে পর হইয়া গেল। তাহার দোষ কি! সেত টাকা-টাকা করিয়া সারা গ্রাম ঘুরিয়া দেখিয়াছে, একটি পয়সাও কেহ সহজে দিতে চায় নাই। এইসব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে নফরের দুই চোখ বাহিয়া আষাঢ় মাসের নূতন মেঘের অজস্র প্রবল বারিধারার মত অশ্রু ক্রমাগত দেখা দিতে লাগিল। রোরুদ্যমান পিতাকে তদবস্থায় দেখিয়া করিম নিতান্ত অবোধের মত ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুমুখের পাটক্ষেতে জন দুই চাষী মজুর কাস্তে হাতে করিয়া একটা বক্না বাছুরকে তাড়া করিতে গিয়াছিল, বাছুরটি তাড়া খাইয়া সে মাঠ ছাড়িয়া আর এক মাঠে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখান হইতে কর্কশ কণ্ঠে অশ্রাব্য ভাষায় জন দুই কৃষক যে ভাবে গালি বর্ষণ করিতেছিল হয়ত বাছুরটির মালিক সেখানে উপস্থিত থাকিলে একটা খুনোখুনি কাণ্ড ঘটিয়া যাইত।

করিমকে অনুচ্চ কণ্ঠে কাঁদিতে দেখিয়া আকবর আলী একলাফে নফর সেখের কাছাকাছি আসিয়া কহিল, কি হইছে মাদবরের পো? নফর মলিন গামছার আড়ালে অশ্রুবিসর্জ্জন গোপন করিয়া কহিল, আর কও ক্যান, আমার যমুনারে লইয়া গেছে।

—কে নিছে মাদবরের পো?

—ঘোষাল মশায়।

—ক্যান?

নফর কাঁদিয়া পুনরায় কহিল, ঘোষাল মশায়ের দোষ কি। একটা পয়সা তিন বছরে সুদ দিতে পারি নাই, করিমটা দেখ লায়েক হইছে, স্কুলে দিতে পারলাম না, বাড়ীতে পরিবারের জ্বর বার মাস আছেই। তারিণী কবিরাজকে ছ'মাসে ন মাসে এক টাকা দিই, এখন কও মিঞা, টাকা কই পাই!

আকবরআলী বিষয়ী লোক, কোন মতে মুখ খুলিয়া কহিল পাঁচকড়া জমি বাটে দিলে দশটাকা আনতে পারো। গাঙ্গুলী মশায়ের নাম জানতো? হরবিলাস গাঙ্গুলী!

নফর জিভ্ কাটিয়া কহিল, তোবা, তোবা না খাইয়া মরা ভালো। জমি বেচুম না। আজ আমার সেই সাতকানি জমি থাকলে কি আর ভয় ছিল। এক এক কইরা সব বেইচ্যা খাইছি না, এমন কাম আর করুম না। বাপ দাদার মাটি......

আকবর আলী আরও খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া চলিয়া গেল। নফর ম্লান মুখে গৃহে ফিরিয়া আসিল। এক বোঝা ঘাস মাথায় করিয়া আনিয়া সে উঠানের এক কোণে রাখিয়া দিল।

হঠাৎ গোয়ালের দিকে দৃষ্টি পড়ায় নফরের ভিতরটা যেন হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিয়া কাটিয়া আর কি হইবে।

ঘোষালের মত চশমখোর লোক এ তল্লাটে আর নাই, একথা তাহার ভালোই জানা ছিল। তবু একবার তাহার কাছে না গিয়া আর উপায় নাই। আমিনা দাবায় পিঁড়ি আনিয়া বসিতে দিল। হুঁকা, কল্‌কে, তামাক, টিকা সবই আনিয়া দিল সে, কিন্তু নফর এক ছিলিম তামাকও খাইলনা

আজ। কোনমতে এক ঘটি জল ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিল, তারপর চোখের জল মুছিতে মুছিতে ঘোষাল বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল।

করিম এতক্ষণ পুকুর পাড়ে একটা আমগাছের নীচে বসিয়া ঝিমাইতেছিল। নফর সেখকে ঘোষাল বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া সে তড়াক করিয়া তাহার পিছু ধরিল। পিতাপুত্রে যখন ঘোষাল-বাড়ী আসিয়া পৌছিল, যমুনা কোনমতে দাঁড় কাছি ছিঁড়িয়া আসিতে পারিলে যেন বাঁচে। সে এমন জোরে হাম্বারব করিতে লাগিল যে রমাপতি ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলেন। বাছুরটা ছাড়া পাইয়া এক ছুটে করিমের কাছে আসিয়া পৌছিল। করিমও তাহার গায়ে, মাথায়, পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

রমাপতির হাতে একটা বাঁশের বাকারী ছিল, তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কিরে বেটা ?

নফর চোরের মত হইয়া কহিল, কর্ত্তা,

—আর সাউথুড়িতে কাজ নেই, টাকা নিয়ে আয়, তখন বোঝা যাবে।

—টাকা কোথায় পাবো...!

কথা শুনিয়া রমাপতির পিত্ত জ্বলিয়া গেল। কোনমতে রাগ সামলাইয়া ব্যঙ্গ করিয়া উঠিলেন, হারামজাদা, টাকা কোথায় পাওয়া যায় আমি বলে দেব নাকি ?

নফর সেখের শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্ করিয়া উঠিল। বলে কিনা হারামজাদা! এই নফর সেখের নামে সারাগাঁয়ে এক সময়ে লোকজনের মনে ডরভয় ছিল। কোনদিন্ যে কাহার সর্ব্বনাশ করিবে তাহার লেখাজোখা ছিলনা। কিন্তু তাহার স্বভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যেদিন আমিনা ঘরে আসিল, এবং মাস কয়েক পরেই যমুনাকে বুড়ীরহাট হইতে কিনিয়া ঘরে আনিল। একমাস না যাইতেই গাঁয়ের লোকে দেখিল, নফর সত্য সত্যই চুরি ডাকাতি ব্যবসা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। সে আজ অনেক দিনের কথা।

নফর পুনরায় কাকুতি মিনতি করিয়া কহিল, আমার যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে আমার যমুনাকে ফিরিয়ে দেন কর্ত্তা।

রমাপতি বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, কে যমুনা! ওরে আমার আহ্লাদের চাঁদরে। যমুনাকে ফিরিয়ে দেন! আর নামের বাহার দেখনা। যমুনা! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। যা, যা, ওসব হবেনা, টাকা নিয়ে আয়ত সব ফিরিয়ে দেব।

—টাকা কোথা পাবো, বলিয়া নফর ফুকারিয়া উঠিল। করিমও সাথে সাথে কাঁদিতে লাগিল। ছেলেমানুষ, সে আর অতশত কি বোঝে। সে বাছুরের গলা জড়াইয়া কত আদর করিতেছিল। রমাপতি বিরাট চীৎকার করিয়া উঠিলেন, টাকা কোথা পাবো ? এবং পরক্ষণেই দুইহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুইটি নফরের মুখের সম্মুখে নাচাইতে নাচাইতে কহিল, সোজা আঙ্‌লে ঘি উঠে কখনো! গরু আমি ফেরত দিবনা। যা, এখান থেকে বেরিয়ে যা!

নফর তথাপি গুম হইয়া বসিয়া রহিল, শেষে রহিমদ্দি পেয়াদা পিতাপুত্রকে একরকম জোর করিয়াই বাহির করিয়া দিল। যমুনা দড়ি ছিঁড়িবার জন্য বিষম টানা হেঁচড়া করিয়া শেষে নিরস্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে হাম্বারবে ডাকিতে লাগিল। সারাদিন একমুঠো ঘাস সে দাঁতে কাটে নাই। বিকালবেলা ছু'চোখ বহিয়া যমুনার ক্রমাগত অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বাড়ীর মদন পাইক কর্ত্তাকে আসিয়া সে খবর দিতেই রমাপতি ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন, বেটা যেমন চশমখোর, ওর গরু আর ভাল হবে কোত্থেকে! মদন জিভ্ কাটিয়া কহিল, কি বলেন কর্ত্তা, এমন লক্ষ্মীশ্রী গরু আমাদের আশেপাশের সাতগাঁয়েও নেই। কি মিষ্টি দুধ দেয়, এইকথা শুনিয়া রমাপতি প্রসন্ন মুখে কহিলেন, তাই নিয়ে এসেছি। নফরকে টাকা ধার দেয়া আর টাকা জলে ফেলা একই কথা, শুধু ঐ গরুর লোভেই ত টাকা দিয়েছিলাম। মদন মনে মনে দুঃখিত হইয়া কোন উচ্চবাচ্য করিল না। নিজের কাজে চলিয়া গেল।

গৃহে ফিরিয়া নফর গুম হইয়া বসিয়া রহিল। করিম একটা আম গাছের নীচে গামছাখানি বিছাইয়া চাৎ হইয়া পড়িয়া কত কি কথা ভাবিতেছিল। আমিনা ইতিমধ্যে বিষম জ্বরের ঘোরে ভুল বকিতেছিল। তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না। এক যমুনার অভাবে সারা সংসারটাই যেন উল্টাইয়া গিয়াছে।

ক্রমে বেলা নামিয়া আসিল, সন্ধ্যা হইতে আর বেশী দেরী নাই। ঘরে একমুঠো চাল পর্য্যন্ত নেই। ছেলেটি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ছটফট করিতেছিল তবু মুখ ফুটিয়া একটি কথা পর্য্যন্ত সে বলে নাই। আজ ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা সে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল।

রাত্রি একপ্রহরের সময় যখন পক্ষী বিশেষের বিকট চীৎকারে আমিনার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল, সে ধীরে ধীরে কোনমতে শরীর ভর করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, তৃতীয়ার চাঁদ পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছে, একটা ছেঁড়া মাদুরের একপাশে মরার মত করিম চাৎ হইয়া অকাতরে ঘুমাইতে-ছিল। কিন্তু নফরকে সে কোথাও দেখিতে পাইল না। বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে যদি তাহার ছায়ার মত কিছু থাকিয়া থাকে। দুর্ব্বল শরীরে কাঁপিতে কাঁপিতে আমিনা বাগানের কাঁচা-মিঠে আম গাছটির নীচে ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল। ব্যথা সে নিশ্চয়ই খুব পাইয়াছিল, কিন্তু অনুভব করিবার মত শক্তি তাহার মোটেই ছিলনা। অঘোর ঘুমে পড়িয়া থাকিয়া করিমও কিছু টের পায় নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ করিম এক লাফে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, যমুনা ছাড়া পাইয়া বাছুরসহ আসিয়া দাবায় একেবারে উঠিয়া পড়িয়াছে। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে "বাবাগো, মাগো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া ডরে ভয়ে কাঁদিতে সুরু করিয়া দিল। বাছুরটি তাহার গা ঘেঁষিয়া কতবার তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, আর যমুনা একবার ঘর আর একবার বাহিরের দিকে ছুটাছুটি করিয়া কি যেন খোঁজাখুঁজি করিতেছিল।

করিমের আর্ত্তনাদে জন দুই লোক—খুব সম্ভব চাষামজুর—ব্যস্তসমস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং ব্যাপার কি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। হারিকেনের আলোতে ঘর বাহির পই পই করিয়া খুঁজিয়া এক করিম ছাড়া আর কাহাকেও দেখা গেলনা। বছিরদ্দি নিজ মনেই বলিয়া উঠিল, মাদবরের পো গেল কই? আর তার পরিবারই বা কোথায়!

মনাই মোল্লা বরা গলায় ছেলেটার দুর্দ্দশা দেখিয়া একটু বিচলিত হইয়া কহিল, চলো দেখি বাগানটার দিকে...এই কথা বলিয়াই মোল্লা হারিকেনের অস্পষ্ট আলোকে পথ দেখাইয়া বাগানের দিকে চলিল, বছিরদ্দি পা টিপিয়া টিপিয়া ছেলেটাকে পিঠে ফেলিয়া লইয়া চারিদিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। খানিকটা দূর যাইতেই বছিরদ্দি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, গরুটা এখানে দাঁড়িয়ে কি করছে আবার? ওই যে আবার কোথায় যায় মনাই! মনাই উবু হইয়া দেখিল, মাদবরের পরিবার অজ্ঞান অবস্থায় একটা গাছের নীচে মড়ার মত পড়িয়া রহিয়াছে, কোন সাড়াশব্দ নাই। লোকজনেরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল। এদিকে করিম "বাবা" "মা" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেছে। তাহাকে দেখিবার মত কেহ নাই। বাছুরটি বার বার আসিয়া তাহার গা ঘেঁষিয়া দাড়াইতেছে, তথাপি করিম নিরুত্তর। অন্য সময় হইলে করিম হয়ত নিজেই তাহাকে তাড়া করিয়া ছুটাছুটি করিত। আজ সে অন্ধকারে পথের দিকে চাহিয়া একদৃষ্টে একটির পর একটি পথিকের আনাগোনা লক্ষ্য করিতেছে, এই বুঝি তার বাপজান ফিরিয়া আসিতেছে। কতলোক যাওয়া আসা করিতেছে কেহই তাহাদের বাড়ীর দিকে আসিতেছে না! হৈচৈ শুনিয়া আসিতেছে আর যাইতেছে!

ভোর না হইতেই গ্রামে রটিয়া গেল, নফর সেখ নিরুদ্দেশ হইয়াছে। রমাপতি উঠানে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র কহিলেন, পালিয়েছে না ঘোড়ার ডিম! দিন কয়েক বাদে ফিরে এলো বলে, তোমরা ঠিক দেখো। ব্যাটা বজ্জাতের ধাড়ী, গরুটাকে পর্য্যন্ত কানে কানে কি শিখিয়ে দিয়ে গেছে, একবার ছাড়া পেলেই চলে আসবি। বাত তিনটে বাজে এখন! অমন মোটা দড়ি দিয়ে খুঁটার বাঁধা যায়, আর কিনা পটপট করে ছিঁড়ে ফেললে।

মদন সায় দিয়া কহিল, কর্ত্তা, না খেয়েই এখানে মারা যেত, তার চেয়ে চলে গিয়েছে, ভালোই হয়েছে; এক কণা ঘাস যদি কাল দাঁতে কেটে থাকে।

রমাপতি উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, আধমরা করে ছাড়লে তবে আক্কেল হ'ত। যেমন নচ্ছার বেটা, গরু ও তার তেমনি,...বলিয়া রাগে গজগজ করিতে ঘন ঘন তামাকু সেবনে নিমগ্ন হইলেন।

এমন সময় আকালী পালান, আহম্মদ চৌকিদার হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, কর্ত্তা, নফরের গরুটা আপনার জন্যই শেষে খালে পড়ে মারা গেল। কি লক্ষ্মীমন্ত গরু ছিল, সারারাত্রি পাগলের মত ছুটাছুটি করে গ্রামময় কিযে খোঁজাখুঁজি করেছে কে জানে। আর নফরের

পরিবারও ভোর রাত্রে...! মাঠে কাজ করতেছিলাম, তিতাই মণ্ডলের মুখে খবরটা শুনে ধড়ে আর আমাদের প্রাণ নাই কর্ত্তা। একবার যাই দেখি সেখানে।

রমাপতি ভয়ে, বিস্ময়ে, দুঃখে কপালে চোখ দুটি ঠেকাইয়া কহিলেন, আাঁ, বলিস্ কি তোরা সব! কি সর্ব্বনাশের কথা রে! শেষে পাপের ভাগী করলে আমাকে।

আকালী পালান চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, কর্ত্তা, আপনারা বড় লোক, আপনারা সবই পারেন। ছোটলোকের আবার প্রাণের মূল্য! দু'দিন বাদে টাকাটা নিলে কি আপনার রাজত্ব ফুরিয়ে যেত নাকি। খোদা আছেন না, তিনিই সব দেখবেন, তাঁর রাজ্যে অবিচার নাই!

আহম্মদ বাবরী চুলের গোছা নাড়া দিয়া কহিল, চলো পালান, এখন গরুটার একটা গতি করিগে। মাদবরের পো একেবারে ধনে প্রাণে মারা গেছে। ছাওয়ালটার মুখের পানে এখন চাইমু কেমন করে, হা আল্লা,...বলিতে বলিতে তাহারা বার কয়েক গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নফরের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

রমাপতি শিরে করাঘাত করিতে করিতে কহিলেন, ওরে মদন শীগগীর যা, শীগ্গীর ডেকে নিয়ে আয় ঈশান পুরুত ঠাকুরকে! ছেলেপেলে নিয়ে ঘর সংসার করি, একটা প্রায়শ্চিত্ত ট্রায়শ্চিত্তর ব্যবস্থা করতে হবে ত! ওরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস, শীগ্গীর যা। শাস্ত্রে বলে গোবধের নাকি প্রায়শ্চিত্ত নেই, কি সর্ব্বনাশ!

তুরস্কে শিক্ষাবিস্তার

উপেন্দ্রকুমার দাশ

মহাযুদ্ধের পর যে কয়টি জাতির হয় নব জন্ম, তুরস্ক তাহাদের অন্যতম। অটোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে কামাল আতাতুর্কের অসাধারণ প্রতিভা কি করে নবীন তুর্কীগণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে তার ইতিহাস আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি, পরাজিত, অবমানিত, অবসন্ন তুর্কীজাতির জীবনে কামাল যে বিপ্লব ঘটালেন তাতে প্রাচীন তুরস্ক গেল তলিয়ে আর তার স্থানে জেগে উঠ্‌ল নবীন তুরস্ক। প্রাণের প্রাচুর্য্যে তার জাতীয় জীবনের অঙ্গে অঙ্গে অদম্য শক্তির স্পন্দন—দৃষ্টি তার সুদূর প্রসারী। সে দেখছে নবযুগের নূতন মানুষের বিরাট জীবনকে, দেখ্‌ছে তার মহত্বকে। সমাজে, রাষ্ট্রে, অর্থনীতিতে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এক কথায় তার সমগ্র জীবনে সে আজ নবযুগকে বরণ করে নিয়েছে। নবীন তুরস্ক ভালবাসতে শিখেছে তার স্বদেশকে। আজ তার সকল কর্মের প্রেরণা দিচ্ছে তার অকৃত্রিম দেশ-প্রেম। তার স্বাজাত্যবোধ আজ ধর্মান্ধতাকে সম্পূর্ণ বর্জন করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সহায়তায় জগতের বুকে প্রতিষ্ঠালাভ করছে।

কামাল আতাতুর্ক তুরস্কবাসীদের জীবনে এই পরিবর্ত্তন ঘটালেন কি উপায়ে। কি উপায়ে তিনি গড়ে তুললেন নবীন তুর্কীকে—অনুসন্ধিৎসুর মনে এই প্রশ্নই জাগে সর্ব্বাগ্রে। যদি এক কথায় এর উত্তর দিতে হয়, তা হ'লে বলতে হয়—শিক্ষা দ্বারা। কামাল একথা ভাল করেই জানেন যে, জাতিকে নূতনভাবে গড়ে তুলতে হ'লে সর্ব্বাগ্রে গড়ে তুলতে হবে তার মনকে, পরিবর্ত্তন আনতে হবে তার চিন্তাধারায়, আর এটি সম্ভবপর হতে পারে একমাত্র শিক্ষার দ্বারা। তাই তিনি সর্ব্বপ্রথমই ব্রতী হলেন শিক্ষাবিস্তারে। কামাল শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করলেন। শুধু তাই নয় তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্যেরও করলেন পরিবর্ত্তন। সুলতানের তুরস্কে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আচার নিষ্ঠ ধার্মিক মুসলমান তৈরী করা আর কামালের তুরস্কে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বদেশ প্রেমিক শক্তিমান মানুষ গড়ে তোলা।

তবে সুলতানের তুরস্কও শিক্ষাসম্পর্কে যুগের দাবীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারেনি। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্ক্রিয়ার ফলে ইউরোপের চিন্তক্ষেত্রে যে বিপ্লব উপস্থিত হ'ল তুরস্কও তার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারলনা। তাই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ থেকেই তার শিক্ষা-বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'ল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তুরস্ক দেশে মক্তব এবং মাদ্রাসা ভিন্ন অন্য বিদ্যালয় ছিল না। এই সব মক্তব মাদ্রাসাতে প্রধানতঃ কোরাণ পড়ান হ'ত। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ব্যাকরণ অলঙ্কার

শাস্ত্র, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও মুসলমানদের আইন পড়ান হ'ত। মক্তব মাদ্রাসাতে তুর্কী ভাষার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এখানে বলা দরকার এই সব মক্তব মাদ্রাসা পরিচালনার ভার ছিল বিভিন্ন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের উপর। এই ছিল শিক্ষাদানের সাধারণ ব্যবস্থা। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। এই সময়ে রাজপ্রাসাদে একটি বিদ্যালয় ছিল এবং সামরিক ব্যবস্থার সংস্কারকল্পে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই রাজধানীতে একটি ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুল ও একটি নৌবিদ্যা শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া ১৮২৭ খৃঃ একটী মেডিকাল স্কুল ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪৬ খৃঃ তুরস্কে শিক্ষা সম্বন্ধে একটি কমিশন বসে। এই কমিশন একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সুপারিশ করেন। এই সুপারিশ অনুসারে অনেকগুলি নূতন স্কুল খোলা হয়। কিন্তু এই সব স্কুলে আগের মতই ইসলাম ধর্মতত্ত্ব এবং দর্শনই প্রধান পাঠ্যরূপে থেকে যায়। ইতিহাস, ভূগোল, তুর্কী ভাষা প্রভৃতি নামে মাত্র পড়ান হ'ত। তবে পরবৎসরই এই সব বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করবার জন্য একটি শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এর পর ১৮৫৭ খৃঃ সরকারী শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়। এখন থেকে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৮৬১ খৃঃ কনষ্টাণ্টিনোপলে সর্বপ্রথম মেয়েদের হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নয় বৎসর পরে মেয়েদের হাইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের জন্য একটি ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৭১ খৃঃ ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এইসব বিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সময়ে বিদেশীরাও তুরস্কে বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। আটোমান সাম্রাজ্যের উপর এই সব বিদেশী বিদ্যালয় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এইসব বিদ্যালয়ের মারফতে ও অন্যান্য নানা উপায়ে পশ্চিম ইউরোপের বিজ্ঞান ও স্বাজাত্যবোধের ভাবধারা তুরস্কে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে আর ক্ষয় করে দেয় প্রাচীন আটোমান আদর্শের মূলদেশ। আমেরিকানরা ১৮৬৩ খৃঃ রবার্ট কলেজ নামে একটি কলেজ স্থাপন করে ও পরের বৎসর বীরুতে (Beirut) তারা একটি মার্কিনী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করে। এর কিছুকাল পরেই স্কুটারিতে মেয়েদের জন্য একটি হাইস্কুল খোলা হয়। এইটিই ১৮৯০ খৃঃ ইস্তাম্বুল উইমেনস কলেজে পরিণত হয়। ১৮৭৯ খৃঃ ইজমিরে ইণ্টারন্যাশানেল কলেজ স্থাপিত হয়।

বলা বাহুল্য খাঁটি তুর্কী বিদ্যালয়গুলিতেও এই সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়। এই পরিবর্ত্তন বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে। ট্রেনিং স্কুলগুলিতে মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান পাঠ্য বলে নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিরও সংস্কার করা হয় এবং বিদ্যার্থীদের ছয়বৎসর কাল পড়াশুনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। পাঠ্যতালিকা থেকে আরবী ও ফার্সী বাদ দেওয়া হয়। কিন্তু কোরাণ পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, অনেক নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে এবং ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

এই সবই পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। তবে এই প্রভাব এ যাবত পরোক্ষভাবে কাজ করে এসেছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কী সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ অধিকতর ব্যাপক ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ নবীন তুর্কী সরকার শিক্ষা বিষয়ে একটী আইন (Law of Uniform Education) প্রণয়ন কোরে তুরস্কের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেন। খিলাফতের উচ্ছেদ ও সুলতান বংশের নির্ব্বাসনের সমসাময়িক এই আইন-ই পাশ্চাত্য পন্থায় তুরস্কের আধুনিক শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ। এই আইনের ফলেই সরকার মক্তব মাদ্রাসাগুলি বন্ধ করে দিয়ে তুরস্কে যুগোপযুগী শিক্ষা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। যাহা কিছু দেশে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ, দেশের বৃহত্তর কল্যাণের পরিপন্থী—কামাল আতাতুর্ক নির্ম্মমভাবে তার উচ্ছেদ-সাধন করেছেন। নবীন তুর্কীর প্রতিভাশালী নেতা কোনরূপ ভাবালুতা বা প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা অভিভূত হননি। এই জন্যই তিনি যখন দেখ্‌লেন যে আরবী বর্ণমালা শিক্ষার দ্রুত প্রসারের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ তখন অবলীলাক্রমে এই প্রাচীন 'জাতীয়' বর্ণমালা বর্জ্জন করলেন। ১৯২৮ খৃঃ আইন প্রণয়ন করে আরবীর পরিবর্ত্তে লাটিন বর্ণমালার প্রচলন করিলেন। আতাতুর্কের এই কাজে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়েছিল এবং তাঁর অনুচরদের মধ্যেও যে অনেকে মনেমনে বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন সে-কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু একটি জাতিগঠনের গুরুদায়িত্ব যার স্কন্ধে তিনি এইসব সাময়িক উত্তেজনায় ভ্রূক্ষেপও করেন না। তিনি সমগ্র জাতির কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে ধীরভাবে কাজ করে যান।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি প্রাচীন তুরস্কে শিক্ষাদানের ভার ছিল কতকগুলি ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উপর এবং ক্রমে এইসব প্রতিষ্ঠানের স্থলে কি করে সরকারী শিক্ষাবিভাগ গড়ে উঠে তারও উল্লেখ করেছি। তুরস্কের বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রীর দফতরের চারটে বিভাগ। এক একটি বিভাগকে বলা হয় এক একটি ডিরেক্টরেট। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ও বৃত্তি-শিক্ষা—শিক্ষার এই চার বিভাগের জন্য চার ডিরেক্টরেট। এ ছাড়াও যাদুঘর, গ্রন্থাগার, সংখ্যাতত্ত্ব, হিসাব ও সাজসজ্জার জন্য আলাদা আলাদা ডিরেক্টরেট রয়েছে। একটি জাতীয় শিক্ষা বোর্ডের (National Board of Education) উপর স্কুলের কার্য্যসূচী নিয়ন্ত্রণের ও গ্রন্থপ্রণয়নের ভার রয়েছে। এই বোর্ড সাধারণভাবে শিক্ষাসচিবের পরামর্শদাতাও বটেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

বর্ত্তমান তুরস্কে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। আইন অনুসারে ছাত্রছাত্রীরা পাঁচবছর কাল লেখা-পড়া করতে বাধ্য। কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে তুর্কী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। তুরস্কের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয়—বর্ণপরিচয়, পঠনক্ষমতা, হস্তলিপি, রচনা, জীবনী, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, প্রকৃতি-পরিচয়, পৌরশাস্ত্র, (civics) চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও শরীর-চর্চ্চা। মেয়েদের বিশেষ করে গৃহস্থালির কাজ ও সেলাই শেখান হয়। ছাত্রেরা যাতে কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিক হতে

পারে তজ্জন্য তাদের নানা সদভ্যাস আয়ত্ব করান, তাদের মধ্যে কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করা ও তাদের সৃজনী শক্তির উদ্বোধন শিক্ষকদের প্রধান লক্ষ্য। নবীন তুর্কী জাতিকে গড়ে তোলবার কাজে এই শিক্ষককেরাই আতাতুর্কের প্রধান সহায়। স্বদেশবৎসল এই শিক্ষকগণ আপনাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। তাই দেখি তুর্কী বালক যাতে স্বদেশভক্ত শক্তিশালী জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠ্‌তে পারে তার জন্য তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করছেন। তুরস্কের বিদ্যালয়গুলিতে সহশিক্ষা প্রচলিত। বোরখা ও পর্দা ছেড়ে আজ তুর্কী মেয়েরা জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ছেলেদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন কৃত্রিম বিচারহীন সঙ্কোচ তাদের গতিরোধ করতে পারছেনা। তুরস্কের নারী আজ আপন শক্তিতে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পেয়েছে। জাতির জয়যাত্রায় আজ পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে। অথচ, নারীর যা বৈশিষ্ট্য তারা একটুও বর্জন করেনি। তুরস্কের বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা কী বিরাট পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারব আমাদের দেশের দিকে তাকিয়ে। তুরস্কের প্রত্যেক জেলায় একটি করে বিশেষ বোর্ড আছে। এই বোর্ডই স্কুল সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ পত্রের বিলি ব্যবস্থা করেন। তুরস্কের গ্রামগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত এইজন্য প্রত্যেক গ্রামেই পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু সব গ্রামেই এরূপ বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়না। সেইজন্য ক্ষেত্র বিশেষে কয়েকখানা গ্রাম নিয়ে এক একটা স্কুল করা হয়েছে। আবার যেখানে এরূপ ব্যবস্থাও কার্য্যকরী হয়না সেখানে ভ্রাম্যমান শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। এঁরা ঘুরে ঘুরে লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করেন। ১৯২৩-২৪ খৃঃ তুরস্কের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে যেখানে ছাত্রছাত্রী ছিল ৩,৪১,৯৪১ জন আজ সেখানে তাদের সংখ্যা হয়েছে ৬০,০০,০০০। বর্ত্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০০০। কিন্তু এতেও স্থান সঙ্কুলান হয় না। তার জন্য কোন কোন স্কুলে দুবেলা ক্লাস হয় অর্থাৎ একই স্কুলে দুটি স্কুলের কাজ করা হয়। এতেই বোঝা যায় শিক্ষাবিস্তারের জন্য তুর্কী সরকারের প্রচেষ্টা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

সরকার জানেন শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষকের উপর; বিশেষ করে শিক্ষা সৌধের ভিত্তি গড়েন যাঁরা সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর। এইজন্য, এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য তারা অনেকগুলি ট্রেণিং কলেজ স্থাপন করেছেন। বর্ত্তমানে ট্রেণিং কলেজের মোট সংখ্যা ২৮। এই কলেজগুলিতে পাঁচবছর পড়তে হয়। ছাত্রেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপন করেই কলেজে ভর্ত্তি হতে পারে। প্রত্যেক ছাত্রকেই শিক্ষামন্ত্রী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত কোন স্কুলে আট বৎসর কাল শিক্ষকতা করতে হয়। এই সব কলেজের পাঠ্যবিষয়ের অতিরিক্ত বিশেষ কোর্স পড়াবার ব্যবস্থা আছে। সেখানে অনেক বিদেশী বিশেষজ্ঞ আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

১৯২৩ খৃঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ৯৬৭২ তন্মধ্যে মাত্র ১এর ৩ ছিল পাস-করা। আজ শিক্ষকদের মোট সংখ্যা ১৩০০০, আর তাদের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও বেশী ট্রেণিং কলেজ থেকে

পাস-করা। এইসব শিক্ষকেরা মাসিক ২৫ ডলার (প্রায় ৮৭৲) বেতনে কাজ আরম্ভ করেন এবং এই বেতন ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে ৮০ ডলার (প্রায় ২৮০৲) পর্য্যন্ত হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা

তুরস্কের মাধ্যমিক শিক্ষা আমেরিকার ষড়বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচবৎসর শিক্ষালাভের পর জুনিয়ার হাইস্কুলে তিনবৎসর ও সিনিয়ার হাইস্কুলে তিন বৎসর মোট ছয় বৎসর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়তে হয়। আজকাল আবার সিনিয়ার হাইস্কুলে আরও একবৎসর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। হাইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাস করলে তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বা কলেজে পড়তে দেওয়া হয়।

আধুনিক হাইস্কুলগুলিতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পড়ান হয়—

১। ভাষা—তুর্কীভাষা ও সাহিত্য, ফরাসী, ইংরেজি, জার্ম্মাণ। যে কোন দুটি ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়।

২। সমাজবিজ্ঞান—সমাজবিজ্ঞান, পৌরশাস্ত্র (civics) ভূগোল, ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যা—ও দর্শন।

৩। জৈববিজ্ঞান (Life sciences), শরীরবিদ্যা (Physiology), জীববিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা।

৪। জড়বিজ্ঞান—রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান ও গণিত শাস্ত্র।

৫। চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত, সামরিক শিক্ষা ও শরীরচর্চ্চা। মেয়েদের এছাড়াও শিশুচর্চ্চা সেলাই ও গৃহস্থালি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে হয়। বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। তুরস্কে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এই তালিকাতে স্পষ্টই দেখা যায় তুরস্কের হাইস্কুলে যা পড়ান হয় আমাদের দেশের ইন্টারমিডিয়েট কলেজেও তার সবগুলি পড়ান হয় না। এই পাঠ্যতালিকার সঙ্গে আমাদের বি,এ, বি-এস্‌সির পাঠ্য তালিকার বরং তুলনা চলে। অবশ্য শুধু তালিকা দেখেই কোন বিষয়ে কতখানি পড়ান হয় তা ঠিককরা যায়না। তবুও একথা বলা চলে যে তুরস্কের মাধ্যমিক শিক্ষার মাপকাঠি (Standard) খুবই উঁচু!

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত। তুরস্কের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয়-বিধ বিদ্যালয়েই চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীত অবশ্য-শিক্ষণীয়, মানুষের জীবনের পরিপূর্ণতার পক্ষে সুকুমার শিল্পের চর্চ্চা যে অপরিহার্য্য এ সত্য তুরস্কের চিন্তানায়কগণ ভাল করেই জানেন। আর সেইজন্যই তাঁরা জাতির শিক্ষাব্যবস্থায় সঙ্গীত ও চিত্রকলাকে অন্যতম প্রধান স্থান দিয়েছেন। আর আমা-দের দেশে? সে কথা বল্‌তে গেলে আর একটা প্রবন্ধ হয়ে পড়ে, কাজেই এখন তুরস্কের কথাই আলোচনা করা যাক্। তুরস্কে বর্ত্তমানে ১০০টী জুনিয়র হাইস্কুল ও চল্লিশটি সিনিয়র হাইস্কুল

আছে। ছাত্রসংখ্যা ১৯২৩-২৪ খৃঃ যেখানে ৫,৯০৫ ছিল আজ সেখানে ৪২,৫০০ হয়েছে। তুরস্কে মাধ্যমিক শিক্ষাও অবৈতনিক আর ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ থেকে এ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

আগে ছাত্রদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই শেখান হত। তার ডিসিপ্লিনেরও ছিল খুব কড়াকড়ি কিন্তু আজ শিক্ষার আদর্শ গেছে বদলে। ফলে আজকাল তুরস্কের প্রত্যেকটী বিদ্যালয় এক একটী জীবন্ত প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেখানে আজকাল যে শিক্ষা দেওয়া হয়, পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে সহযোগে তা সরস তা সবল, জাতির প্রাণধারায় তা পরিপুষ্ট। ছাত্রেরাই জাতির ভবিষ্যত নিয়ন্তা। সেইজন্য গণতান্ত্রিক তুরস্কের ছাত্রদের বিদ্যালয়েই স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তুরস্কের হাইস্কুল এবং ট্রেণিং কলেজের ছাত্রদের অনেকটা আত্মশাসনের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

ছাত্রেরা নিজেদের স্বাস্থ্যোন্নতি, দুর্গত ছাত্রদের সাহায্য, শিক্ষাব্যপদেশে ভ্রমণ, সাহিত্য-সংসদ, সঙ্গীত-সমাজ, নাট্য-সমাজ, বিতর্কসভা, ব্যায়ামসঙ্ঘ, পত্রিকা প্রভৃতির পরিচালনা, এইরূপ নানা কাজে বহুল পরিমাণে কর্তৃত্ব করে থাকে। ফলে অল্প বয়সেই ছেলেদের দায়িত্বজ্ঞান জন্মে, তারা দশজনে মিলে মিশে সাধারণের হিতকর নানা কাজে আত্মনিয়োগ করতে শেখে। এমনি করে গণতন্ত্রের ভিত্তি হয় দৃঢ়।

আমরা আগেই বলেছি তুরস্কের মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই ব্যাপক। সেখানকার প্রত্যেক আধুনিক স্কুলেই বক্তৃতা-গৃহ, বীক্ষণাগার, কারখানা, গ্রন্থাগার ও যাদুঘর আছে। এছাড়া ব্যায়ামাগার তো আছেই। তুরস্কে ছাত্রদের শরীরগঠনের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়।

সিনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকেরা ইস্তাম্বুলের ট্রেণিং কলেজে শিক্ষালাভ করেন। এইসব শিক্ষকেরা যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যবিভাগের বক্তৃতাগুলি শুনতে পারেন সে রকম ব্যবস্থাও আছে। এতে নিজেদের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির সুযোগ পান। হাইস্কুলে ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ-করা লোকও নিযুক্ত করা হয়। হাইস্কুলের শিক্ষক মাসিক ৩৫ ডলার বেতনে কাজ আরম্ভ করেন, এবং এই বেতন বেড়ে বেড়ে অবসর গ্রহণের পূর্বে ১৪০ ডলার পর্যান্ত হয়।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

তুরস্ক সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষারও বিশেষ বন্দোবস্ত করেছেন। তারা বহু কৃষিবিদ্যালয়, যন্ত্রবিদ্যালয় ও বাণিজ্যবিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। এক ইস্তাম্বুলেই উচ্চশ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, একটী উচ্চশ্রেণীর অর্থনীতি ও বাণিজ্যবিষয়ক বিদ্যালয়, একটী উচ্চশ্রেণীর নর্ম্মাল স্কুল, একটী সামুদ্রিক-বাণিজ্য-বিদ্যালয় ও শাসনবিভাগের কর্ম্মচারীদের শিক্ষার জন্য একটী রাষ্ট্রনীতিবিদ্যালয় রয়েছে। এঙ্গোরাতে ১৯২৫ খৃঃ একটী আইন কলেজ খোলা হয়েছে। এছাড়া সেখানে একটী কৃষিবিদ্যালয় অন্যান্য সহরেও অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে একটী বাণিজ্য-বিদ্যালয়, আতাতুর্ক ইনিষ্টিটিউট অব্ এডুকেশন নামে একটী ট্রেণিং স্কুল রয়েছে।

এঙ্গোরাতে ১৯৩১ খৃঃ একটী পোলটি স্কুল এবং ১৯৩২ খৃঃ স্থাপত্য বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। তুরস্কের শিক্ষাসৌধের শীর্ষদেশে রয়েছে—ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়। বিপ্লবের পর একে নূতন ভাবে গড়া হয়। ১৯২৪ খৃঃ একটী স্বয়ং-সম্পূর্ণশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হয়। তখন এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য, শিল্প, ধর্মতত্ত্ব ও ঔষধ-প্রস্তুত-বিজ্ঞান (Pharmacy) এই কয়টি ফেকাল্‌টি এবং তুরস্কের সংস্কৃতি, ভাষা, ইত্যাদি সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষার জন্য একটি (Institute of Turkology) বিদ্যালয় ছিল। ১৯৩৪ খৃঃ বিদ্যালয়টিকে সম্পূর্ণ আধুনিক ভাবে পুনর্গঠিত করা হয়। এই পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করেন একজন সুইস্ বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যে হিটলারি শাসনের দৌলতে প্রথিতযশা অধ্যাপক জার্ম্মাণির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। তুরস্ক সরকার এদের অনেককে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগকে বিশেষ সমৃদ্ধ করেছেন। সবশুদ্ধ প্রায় ৮০ জন জার্ম্মাণ ও অন্যান্য ইউরোপীয় অধ্যাপক ইস্তাম্বুলে কাজ করছেন। নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে খুব উদার ও ব্যাপক করা হয়েছে। এইবারই সর্ব্বপ্রথম লাটিন ও গ্রীক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। একজন রেকটর ও চারজন ডিন্ সাক্ষাৎভাবে ইহা পরিচালনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৫,০০ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে। তার মধ্যে ছাত্রী ৫০০।

গণশিক্ষা

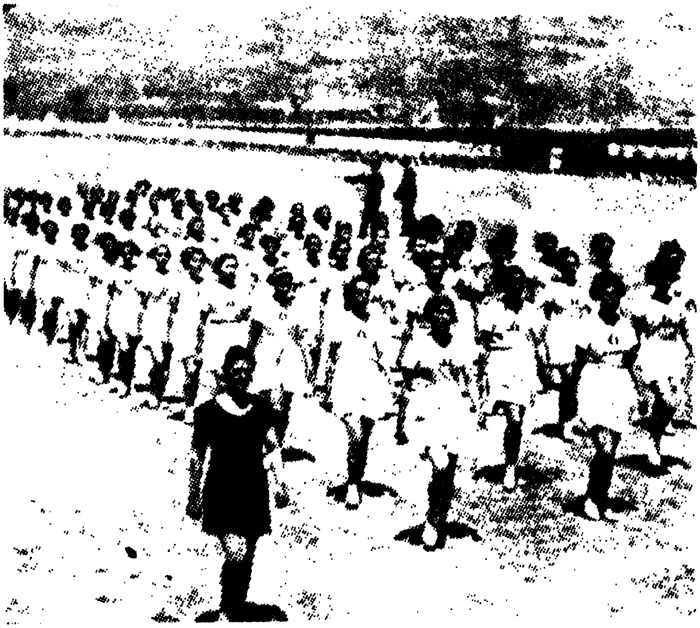
এইসব স্কুল কলেজ ছাড়াও তুরস্কে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান ও সমিতি স্থাপিত হয়েছে। ইহাদের শীর্ষস্থানে রয়েছে তুরস্ক লোক-সাহিত্য-সমিতি (The society of Turkish folklore) ১৯২৭ খৃঃ এঙ্গোরাতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। তুরস্কের লোক-সাহিত্যের আলোচনা করাই সমিতির উদ্দেশ্য। যারা জার্ম্মাণদেশের গ্রীমভ্রাতৃদ্বয়ের গ্রন্থ অথবা সার্বিয়ার Vuk Karadchit এর গ্রন্থ পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন তুরস্কে জাতীয়তার উদ্বোধনে এরকম সমিতির গুরুত্ব কত। ১৯৩১ খৃঃ তুরস্ক-ভাষাতত্ত্ব আলোচনা সমিতি (Turkish Association for Linguistic Studies) স্থাপিত হয়। তুর্কীভাষায় নবজীবনের সঞ্চার কোরে তাকে জনপ্রিয় ও আধুনিক যুগের চিন্তাধারার উপযুক্ত বাহন হিসাবে গড়ে তুলবার জন্য এই সমিতি বিশেষভাবে কাজ করছেন। তবে এই জাতি-গঠন কাজে ইতিহাস-আলোচনা-সমিতির (১৯৩১) প্রচেষ্টাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই সমিতি তুরস্কের ইতিহাস আলোচনা করছেন তুর্কী যুবকযুবতীর মনে স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে গৌরব বোধ জাগিয়ে দেওয়ার জন্য। এই গৌরব বোধই যে জাতীয় উন্নতির প্রধান ভিত্তি তা তুরস্কবাসীদের মনে ভাল করে বদ্ধমূল কোরে দেওয়া হয়। নবীন তুর্কীর মনোভাবের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হলে ইতিহাস আলোচনার এই নূতন ভঙ্গীটি আমাদের ভাল করে লক্ষ্য করতে হবে। কেননা নব জাগ্রত তুর্কী কোন্ পথে চলেছে তার দিকে নির্দ্দেশ করছে তার ইতিহাস।

ইতিহাস-আলোচনা-সমিতি ইস্তাম্বুলে একটী গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। তাতে অনূ্যন ৪০০০ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে। তাছাড়া সমিতি একখানা লোক-প্রিয় সাধারণ ইতিহাস প্রকাশ করেছেন।

তুরস্কের জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতিমূলক যে বিরাট আন্দোলন চলেছে এইসব সমিতি রয়েছে শুধু তার শীর্ষদেশে। আন্দোলনের অন্যান্য অংশের পরিচয় না পেলে তার সমগ্ররূপটী আমরা দেখ্‌তে পাবনা। শিক্ষাকে জনপ্রিয় করবার জন্য বহুবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৩৩ খৃঃ তুর্কী গ্রন্থাগারগুলিতে ২০০,০০০ খণ্ডেরও অধিক গ্রন্থ ছিল। তবুও এ আন্দোলনের সবেমাত্র আরম্ভ সময়ের সংখ্যা। এখন এই সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। এ ছাড়া নানা স্থানে ৯৭০০ বক্তৃতা গৃহ স্থাপিত হয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে এইসব গৃহে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা হয়ে থাকে। ১৯৩৩ খৃঃ ২০,০০,০০০ লক্ষেরও অধিক লোক বয়স্কদের জন্য স্থাপিত জনপ্রিয় বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন কর্‌ছিল। তুরস্কে সব চেয়ে শক্তিশালীদল পিপোল্‌স্ পার্টি (জনসাধারণের দল)। এই দলের চেষ্টায় আজ তুরস্কের নগরে, পল্লীতে পল্লীতে গণশিক্ষা বিস্তারলাভ করেছে। এইদল দেশের নানা স্থানে গণসংসদ (Peoples' Houses) স্থাপন করে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। বর্ত্তমানে এই গণসংসদের সংখ্যা ৫০। সুকুমার শিল্প, নাট্যশাস্ত্র, শরীরচর্চ্চা, সমাজসেবা, গ্রন্থাগার পরিচালনা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে এই সব সংসদ সাধারণে জ্ঞানবিতরণ করছেন। তারা স্থানে স্থানে যাদুঘর প্রতিষ্ঠিত করছেন এবং তুরস্কে প্রস্তুত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী খুলছেন। পুরানো আমলে তুরস্কে তিনটী যাদুঘর ছিল। একটী ইস্তাম্বুলে একটী বারাসতে আর একটী কনিয়াতে। গণতান্ত্রিক তুরস্কে যাদুঘরের বর্ত্তমান সংখ্যা ১৫, এদের অনেকগুলিতে অতি মূল্যবান দ্রব্যাদি রয়েছে।

এছাড়া তুর্কী সরকার বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে স্কাউট আন্দোলনের প্রসারে বিশেষ উৎসাহ দেখাচ্ছেন। মেয়েদের মধ্যে ও এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করেছে।

কামাল আতাতুর্ক তুর্কীজাতিকে নবীনভাবে গড়ে তোলবার সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। তুরস্কে এক নবযুগের সূচনা হয়েছে। মধ্যযুগীয় ধর্ম্মান্ধতা থেকে একটা সমগ্রজাতির চিত্ত আজ মুক্তিলাভ করেছে জাতীয়তা ও বিজ্ঞানের বাস্তব ক্ষেত্রে। একটা প্রচণ্ড বিপ্লবে সমস্ত দেশ তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। কত ভাঙ্গছে কত গড়ছে। তুরস্কের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এই নূতন সৃষ্টির উপযোগী উপকরণই যোগাচ্ছে। ১৯৩৫ সালের পিপোলস্ পার্টি তুরস্কের শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি মূলনীতির উল্লেখ করেন। তাদের কয়েকটী নিম্নে লিখিত হল। ওরা লিখেছেন—আমাদের সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল অজ্ঞতা দূর করা। শিক্ষার প্রত্যেক স্তরেই জনসাধারণকে স্বদেশবৎসল, গণতান্ত্রিক, লোকহিতৈষী ও বাস্তববাদী করে তোলবার দিকেই লক্ষ্য রাখা হবে। যে পদ্ধতিতে শিক্ষা পেলে লোকে ঐহিক জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সেই



এ্যাঙ্গোরাতে ব্যায়ামরত মহিলাগণ

পদ্ধতিতেই পরিচালিত হবে। আমাদের শিক্ষা হবে অতি উঁচু দরের। তাতে কুসংস্কার বা দাসমনোবৃত্তির কোন সংস্পর্শ থাকবেনা। সেবা, দয়া, প্রেম ও জাতীয়তার ভিত্তিতেই শিক্ষা পরিচালিত হবে। দেশের তরুণদের এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হবে যে যাতে করে তারা মনে করবে বিপ্লব ও জন্মভূমির রক্ষার্থ সর্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেওয়াই তাদের সর্বপ্রধান কর্ত্তব্য। আমরা দেখেছি আজ তুরস্কে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কী বিরাট আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। তুর্কী সরকারের শিক্ষাবিভাগের ব্যয় প্রতি বৎসরেই বেড়ে চলেছে। গণতন্ত্রের দশম বাৎসরিক উৎসবে প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক বলেছিলেন—"আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে আমরা সভ্যতার বর্ত্তমান স্তর থেকে উন্নত করব"। আতাতুর্কের এই কথা কাজে পরিণত করতে তুর্কী সরকার উঠে পড়ে লেগেছেন। তুরস্কের এই বিরাট ব্যবস্থায় অনেক ভুল ত্রুটি আছে। কাজে অনেক ভুল ভ্রান্তি



এ্যাঙ্গোরাতে কমার্সিয়াল কলেজে শিক্ষারত মহিলাগণ

হচ্ছে আরও হয়ত হবে। তুরস্কের উৎকট জাতীয়তামূলক শিক্ষা হয়ত কারো কারো কাছে সঙ্কীর্ণ মনে হবে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা ভুললে চলবে না যে তুরস্ক তার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটী নূতন জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। নবীন ভারতবর্ষ তুরস্কের এই প্রচেষ্টার কথা জেনে উৎসাহই লাভ করবে। কেননা আজ ভারতেও নবযুগের পূর্ব্বাভাস সূচিত হচ্ছে তার নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। *

---

* মিঃ হেরি, এন্, হাওয়ার্ডের প্রবন্ধ হইতে উপকরণ সংগৃহীত।

চিত্রবহা

শ্রীকৃষ্ণা ঘোষ

কুলীধাওড়ার একটী ছোট কুঠরীর সামনের অতি নীচু চালায় শঙ্কর গালে হাত দিয়ে বসে আছে। দূরে কলিয়ারীর বিরাট বয়লার'টা আকাশচুম্বী লম্বা চিম্‌নীটার মুখ দিয়ে অজস্র কালো ধোঁয়া আকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শঙ্কর ভাবচে—

হপ্তার নোটিশে তাকে ধাওড়ার এই ঘরখানি ছেড়ে দিতে হবে। কালই তার এখানে শেষদিন।

তারপর,—শুধু-যে তার অন্নসম্বলই নিঃশেষ তা নয়, মাথা গুঁজবার একটা অতি ক্ষুদ্র ঠাঁইও তার সারা বিশ্বে কোথাও থাকবে না।

মনে পড়ে, গ্রামের মধ্যে ছোট্ট মাটীর কুঁড়েটার কথা। অন্নসম্বল সেখানেও তার অতি অল্পই ছিলো। ধনীর জমি চাষ করে, সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে তাকে অর্জ্জন করতে হোতো সামান্য জীবিকা,—কোনো রকমে বেঁচে থাকার সংস্থান। কিন্তু তবু সেই কুঁড়েটার কথা মনে হয়। সেই ছোট্ট একখানা ঘরের ওপরও ছিলো না তার মালিকা'নার দাবী, তা হোক্, সেইখানেই তো তার বাপ্‌দাদা মাথা গুঁজে কাটিয়ে গেছে। আর সেও পারতো তার জীবনটা কাটিয়ে দিতে।

দশবছর আগের তার সেই গাঁয়ের দৃশ্য আজ শঙ্করের চোখের সামনে জ্বল্-জ্বল্ করতে থাকে।

মনে পড়ে সেই দিনটার কথা,—এখনও সে কথা মনে হলে বুকের ভেতরটা আগুনের জ্বালার মতো ধক্ ধক্ করে জ্বলে ওঠে।

গাঁয়ের পথে চলতে চলতে পরাণ বাউরীর আঙ্গিনার প্রান্তে শঙ্কর হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পরাণের মেয়ে কুসুমকে এতটুকু বেলা থেকে সে দেখেচে, অতি সাধারণ মেয়ে। মাঝে কএকটা বছর শুধু কুসুম বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে সহরে কাটিয়ে এসেছে। শঙ্কর শুনেছিলো বটে যে কুসুম স্বামী হারিয়ে বাড়ী ফিরে এসেচে। কিন্তু সে যে এমন তাতো ভাবেনি। সেই অতি সাধারণ মেয়ে কুসুম যখন আজ পূর্ণযৌবনে নারীমূর্ত্তিতে তার সামনে দাঁড়ালো শঙ্করের জীবনে এ যেন এক অপূর্ব্ব আবির্ভাব!

তারপর প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, কারনে অকারণে, পশ্চিমপাড়ার এই রাস্তাটায় চলতে লাগলো শঙ্করের আনাগোনা।

সাহস করে শঙ্কর যেদিন বিয়ের প্রস্তাব করলে, কুসুম সম্মতি দিয়েছিলো কিন্তু সেই সঙ্গে শঙ্করের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে যে শঙ্কর গ্রামের বাস ছেড়ে কুসুমকে নিয়ে সহরে

উঠে যাবে। সহরে কএক বছর কাটিয়ে কুসুমের পক্ষে গ্রাম্যজীবন হয়েছিলো অসহ্য, শঙ্কর বাধ্য হয়ে রাজি হয়েছিলো, সহরে না হোক্ অন্ততঃ সহরের কাছাকাছি কোথাও তারা বাস করবে।

এমনি সময় এলো সম্পুর্ণ অনাহূত সর্দ্দারের আমন্ত্রণ। সর্দ্দার শঙ্করের বিয়ের খরচের জন্যে নগদ পাঁচটা টাকা, নতুনবৌএর জন্যে লাল ডুরে সাড়ী আর ওর নিজের লালপাড় নতুন ধুতি একখানা ওর হাতে গুঁজে দিলে—তখন কয়লাখাদে মাল-কাটার দলে নাম লেখাতে রাজী হওয়া শঙ্করের পক্ষে একটুও শক্ত হলো না।

ঈপ্সিত নারী লাভের সঙ্গে সঙ্গে যখন অপ্রত্যাশিতভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান আর কুলীধাওড়ার ছোট্ট ঘরটাও জুটে গেলো, শঙ্কর তাকে ভাগ্যদেবতার করুণার দান বলে মাথা পেতে নিলে।

ধাওড়ার ঘরে সুরু হয় ওদের নতুন বিবাহিত জীবনযাত্রা। কুসুম রেঁধে বেড়ে খেতে দ্যায়,—শঙ্কর খাদের নীচে কয়লা কাটে।

শঙ্কর কএকদিনেই জানতে পারে, কানাকানিতে শুনতে পায় যে তাদের নতুন দল, মালকাটার দলে যারা নতুন নাম লিখিয়ে সর্দ্দারের সঙ্গে এখানে কাজ করতে এসেচে, এদের জন্যেই নাকি ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে গেলো।

ধর্ম্মঘট, ষ্ট্রাইক্—এসব কথা শঙ্কর বুঝতে পারে না। অনেক কানাকানির পর বুঝতে পারে, আগে যে-সব মালকাটা এইসব ধাওড়ায় থাকতো, এই কলিয়ারীতে কয়লা কাটতো, তারা দলবেঁধে একসঙ্গে কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো।

মালিকের কাছে নালিশ জানিয়ে অভাব অভিযোগ যখন ওদের কোনো প্রতীকার পেলে না, তখন ধর্ম্মঘট করলে।

প্রলোভনে তাদের কতকটা দল ভেঙ্গে যায়, কতকটা নতুন মালকাটা এনে সর্দ্দার পূরিয়ে নেয়।

কলিয়ারীর কাজ চল্‌তে থাকে।

যারা এই সব ধাওড়ার ঘরে বছরের পর বছর সপরিবারে সংসার পেতে বসেছিলো, আজ তারা নিরাশ্রয়—হয়তো বা উপবাসী। পুরাতন যেয়ে নতুন এসে বাসা বাধে। কলিয়ারী যেমন চলছিলো চল্‌তে থাকে।

শঙ্করের মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। আহা! সে এসে না-জানি কতোগুলি মুখের অন্ন অপ-হরণ করেচে।

মন ওর ফিরে যেতে চায় সেই শান্ত গ্রাম্য কুটীরে। ধোঁয়া নেই, কালী নেই, এই একটানা কর্ম্মকোলাহল নেই। কলিয়ারীর সদাজাগ্রত ব্যস্ততায় যেন ওর দম আটকে আসে, হাঁপিয়ে ওঠে।

কুসুম ফিরতে চায় না। সহরের সান্নিধ্য ওর মনে যে পুলক আনে তা ছেড়ে সেই নির্জ্জন প্রায় একঘেয়ে গাঁয়ে ফিরে যেতে ওর মন ওঠে না।

শঙ্কর থেকে যায়।

দরিদ্রের আবার বিবেক! মনে মনেই ভাবে, কার জন্যে নিজের অন্ন নিজের সুখ ছেড়ে যাবো?

নিজেকেই সান্ত্বনা দেয়, আমি গেলেই তো আর যে গেছে সে ফিরে আসচে না! হয়তো আর একজন নতুন লোক আসবে! যার অন্ন গেছে সে তো আর পাবে না। তবে লাভ? ছেড়ে দিয়ে তো কোনো প্রতীকারই হবে না অন্যায়ের!

অতএব---

শঙ্কর পাকাপাকি ভাবেই টিঁকে থাকে।

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু বেঁধে? হ্যাঁ, বেঁধে বৈকি!

কিন্তু অন্নের জন্যে সংগ্রাম, বেঁচে থাকার সংগ্রাম, জীবন-ব্যাপী সংঘর্ষ! মাটীর নীচে কালো কয়লা কেটে কেটে হপ্তার শেষে যাকে হাত পেতে তার দাম নিতে হয়---শুধু বেঁচে থাকার সংস্থানটুকু! একমুঠো ভাতের দামের পরিবর্ত্তে যাকে হপ্তার পর হপ্তা 'রোজ' খাটতে হয়,---আট ঘণ্টা করে পশুর মতো অদম্য পরিশ্রমের পর, পরের কল্যাণচিন্তা, ন্যায়অন্যায়ের চিন্তা, নীতির চিন্তার সময় কোথায় তার? শঙ্কর তবু ধাওড়ার রীতি পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারে না।

তাছাড়া কুসুমের কথাটাও ওকে চিন্তা করতে হয়। ওর সুখের দিকটাও দেখতে হয় তো!

কুসুম কিন্তু থাকে না। কুলীজীবনের রীতিনীতি সে অতি অল্পদিনেই আয়ত্ত করে নেয়। চোখের সামনে দেখতে পায় ওর অতি অবশ্য পরিণাম। হপ্তার শেষে শনিবারে মজুরী পেলে শঙ্কর আরও অন্যদের মতো ক্ষণিকের বিলাস খুঁজবে, হপ্তাভোর একটানা খাটুনির পর একদিনের জন্যে কালো কয়লার বিরাট জঠরের টান ভুলতে চাইবে, আর তারই জন্যে সাতদিনের রোজগার একদিনে মদ খেয়ে নেশার ঘোরে উড়িয়ে দিতে চাইবে! কল্পনায় কুসুম দেখতে পায়,—সেও আশপাশের কুলীরমণীদের মতো খাদে যেয়ে কয়লা বইচে! মাথায় কয়লার বোঝাই ঝুড়ি—পরণের কাপড় কয়লার রঙে কালো—তার গায়ের চিকণ রঙের ওপর কয়লার গুঁড়োর পরদার প্রলেপে পাকা কালো রং!

নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায় কুসুম অতিষ্ঠ হয়ে যায়, শিউরে ওঠে।

তারপর---ক্রমোন্নতি। ধাওড়ার ঘর ছেড়ে কুসুম যেয়ে ওঠে সর্দ্দারের ঘরে। সেখান থেকে ওপাশের বাংলোয়। 'ওভারম্যানের' ছেলেদের আয়া সে!

শঙ্কর? হ্যাঁ, শঙ্কর মদ ধরে। নেশার ঘোরে কয়লা কাটে, হপ্তার শেষে যা পায় সব নিয়ে যেয়ে বসে মদের দোকানে।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস একটানা চলে কলিয়ারীর কাজ! বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই! মাটীর নীচে থেকে অসংখ্য মানুষ পশু গাঁইতি দিয়ে কেটে বেরকরে আনে কালো স্তূপের প স্তূপ ওর যেন শেষ নেই। মাঝে মাঝে প্রতিবাদ করে ওপরের মাটী সশব্দে বসে যায়। মালকাটা মরে। ধাওড়ার কতগুলো ঘর ক'দিনের জন্যে খালি পড়ে থাকে---আবার নতুন লোক

আসে। ওপাশের বাংলোগুলোর ম্যানেজার ওভারম্যানও মাঝে মাঝে বদলী হয়। কিন্তু কয়লা কাটা চলে। দিনরাত্রি একটানা কর্ম্মস্রোত বইতে থাকে।

তারপর নতুন যুগের হাওয়া এসে লাগে এই কলিয়ারীর চিরন্তন পালটায়, মালিকের ক্ষুধা বেড়ে ওঠে আরও, আরও চাই!

কাজের চাপ বেড়ে যায়। মাটীর বুক বুঝি বা থেকে থেকে থর্ থর্ করে কেঁপে ওঠে।

কলের বেগ বেড়ে যায়। গতির মুখে কতো মানুষ ভেসে যায়, কতো ভেঙ্গে পড়ে।

অসন্তোষ জমে জমে ভারী হয়ে ওঠে। শ্রমিক আবার ধর্ম্মঘট করে।

কলিয়ারী নীরব, নিথর, কর্ম্মস্রোত নিস্তব্ধ।

শ্রমিক দলবদ্ধ, দৃঢ় হয়ে থাকে। মালিকের টনক বুঝি বা নড়ে ওঠে।

শ্রমিকে মালিকে বোঝাপড়া হয়। খবরের কাগজে বড় বড় হরফে শ্রমিকের জয়গান প্রকাশিত হয়। শ্রমিকের দাবী সমস্তই মালিক মেনে নেয়। ধর্ম্মঘটী সমস্ত শ্রমিকই কাজে বহাল থাকে।

কিন্তু,---তারপর?

আজ শঙ্কর তাকিয়ে দেখে তার আশে পাশে যারা ছিলো তারা কোথায়?

একদিন যেতে না যেতেই সুরু হয় নোটীশের পালা। সামান্য ত্রুটীতে কোথাও বা বিনা কারণে হয়তো বা কাল্পনিক কারণে ধর্ম্মঘটী শ্রমিক একে একে বিদায় নিতে বাধ্য হয় নতুন লোক এসে তাদের শূন্য স্থান পূরণ করে।

বন্ধুর অগোচরে, নির্ব্বিবাদে চলতে থাকে শ্রমিকের এই পরাজয়!

হপ্তার নোটীশে যখন এই বিরাট কুলীধাওড়া থেকে এতো বড়ো কলিয়ারীর একজন মাত্র কুলী খসে পড়ে, অতি পরিচিত অনাহারের কুটীল গহ্বরটায়---কে তার খোঁজ রাখে?

শঙ্করের পালা। কালই তাকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে হবে।

একবার ভাবে শ্রমিক কি আর জাগবে না? আবার মনে হয় আহা! বেচারারা বহুদিন অনাহারে কাটিয়ে যে সংগ্রামে জয়লাভ করেচে মনে করে কাজ করচে, আবার খেতে পাচ্ছে, তারা কি আবার এখনই ছাড়তে চায়?

এমনি করেই একটী একটী করে অনেকেই ঝরে পড়লো। আজ নতুন লোকে ধাওড়া ভর্ত্তি! এই অবিশ্রান্ত, তীব্র জীবনসংগ্রামে তারাই বা কিসের জন্যে কাজ ছাড়বে? বাঁচার প্রয়োজন তো কারোই কম নয়!

শঙ্কর ভাবে এমন দিন কি আসবে যেদিন শ্রমিককে জয়ের মধ্যেও এমন গোপন পরাজয়ের কালিমা মাখতে হবে না---যেদিন খাওয়ার জন্যে মালিকের কাছে হাত পাতবে না! মালিক শ্রমিকের কাছে---সত্য কর্ম্মীর কাছে, অন্নবস্ত্রের যথার্থ স্রষ্টার কাছে এসে দাঁড়াবে তার মুখ চেয়ে!

শঙ্কর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে উঠে যায় মদের দোকানটার দিকে।

সামনের মাঠটার ওপ্রান্তে, ম্যানেজার সাহেব, তার মেম আর আরও কে কে টেনিশ খেলচে। তাদের উচ্চ কণ্ঠের সুতীব্র হাসির শব্দ কুলিধাওড়ায় এসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ইতিহাসের ব্যাখ্যা

শ্রীপ্রভা ঘোষ

ধরণীর বুকে দলে দলে কত মানবসংঘ তীর্থযাত্রা করতে এসেছে, আবার কালের স্রোতে কোথায় তারা বিলীন হয়ে গেছে। কোন বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, এ পর্যান্ত একুশটি সভ্যতার উদ্ভব নাকি পৃথিবীতে হয়েছিল। আজ তারা কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেন এমন হয়? কেন মানুষ ধরণীকে সৌন্দর্য্য ও সৌষ্ঠবে মণ্ডিত করে তুলেছে? কত নগর ও পল্লী, বিদ্যা ও বিভব, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য মানুষ গড়ে তুলেছে। কি ছিল তার প্রেরণা? কোন্ শক্তি ছিল এর পশ্চাতে? আজকের সমস্যা-সঙ্কুল মানবজীবনের এ-ও একটি বিরাট প্রশ্ন।

ইতিহাস, সে কি শুধু রাজরাজড়ার বিজয় ও হত্যার কাহিনী? অথবা এ শুধু কতকগুলো অর্থহীন ঘটনার শুষ্ক পঞ্জী? এই যে আমাদেরই মাটির ওপরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কত জাতি, কত বহু বিচিত্র ঘটনা, কত রাজা কত সভ্যতার পতন করে গেল, এই যে ছায়াচিত্র, একি অসংলগ্ন অর্থহীন প্রলাপ? কোনই মানে নেই এর?

আজকের দিনে চিন্তাশীল মন এই প্রশ্নই করছে। এর জবাব শুধু বর্তমানকে নয়, ভবিষ্যৎকেও প্রভাবিত করবে।

স্বরে মনি গণ্য ইব সমগ্র ইতিহাসকে বিধৃত করে রয়েছে কতকগুলো শক্তি বা ফ্যাকটরস। খোঁজ করতে হবে তাদেরই। এজন্য চাই অখণ্ড ও সমগ্র ভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি। তাহলেই ধরা পড়বে, ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় একটা গতিশীল প্রবাহ। তাতে বিচ্ছিন্নতা নেই খণ্ডতা নেই।

ইতিহাসকে এমনি ভাবে ব্যাখ্যাত করার প্রচেষ্টা শুরু হয় উনবিংশ শতক থেকে। দার্শনিক হেগেলকেই এবিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা চলে।

ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে-সকল মতবাদ বা থিওরি গড়ে উঠেছে, তন্মধ্যে আমরা প্রধান কয়েকটি এখানে আলোচনা করব। এই মতগুলোকে নিম্নলিখিত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) পরিবেশ

- (১) পরিবেশ-মূলক (Environmental)
  - (ক) ভৌগোলিক ব্যাখ্যা
  - (খ) আর্থিক ব্যাখ্যা
  - (গ) জনসংখ্যাদ্বারা ব্যাখ্যা
- (২) জাতি-মূলক (Racial)
- (৩) মনস্তত্ত্ব-মূলক (Psychological)
  - মনীষী বা মহাপুরুষীয় ব্যাখ্যা
  - যৌন ব্যাখ্যা (Sex Interpretation)

একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন, পরিবেশ বা এন্‌ভায়রনমেণ্ট (Envrionment) এর প্রভাবেই ইতিহাস গড়ে উঠেছে। একে "ইতিহাসের পরিবেশীয় ব্যাখ্যা" Enviromental Interpretation of History) বলা চলে। এই একে আবার তিনটি উপরিভাগে ভাগ করা চলে, যথা— ভৌগলিক ব্যাখ্যা, অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা এবং জনসংখ্যাদ্বারা ব্যাখ্যা।

(ক) ভৌগোলিক ব্যাখ্যা (Geographical Interpretation of History)।

এই মতে ভূগোলই ইতিহাসকে গড়ে তুলছে। অর্থাৎ দেশের নদী. পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র, সমতলভূমি, জলবায়ু প্রভৃতি ভৌগোলিক সংস্থিতি স্থানীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত ও গঠিত করে। এই মতবাদেরও আবার বহু শাখা আছে। এক-একজন বিশেষজ্ঞ এক-একটি নৈসর্গিক সৃষ্টিকেই ইতিহাস গঠনের একমাত্র বা প্রধানতম কারণ বলে স্বীকার করেন। তাঁহাদেরই প্রধান কয়েকজনের মত এখানে আলোচনা করব।

একসময় ছিল যখন মন্তাস্কের (Montesquiea) মতো বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত মনে করতেন, যেখানে উচ্চ পর্ব্বত ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সেখানেই স্বাধীনতা, আর যেখানে বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্র এবং গরম আবহাওয়া সেখানেই স্বৈরশাসন বা ডেসপটিজম। কিন্তু এমনতর মতের পরিপোষক আজকাল বিরল। অবশ্য একথা বহু স্বীকৃত যে নৈসার্গিক অবস্থিতি রাজনৈতিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করে। এতো আমরা চোখের ওপরই দেখছি, কোন রাষ্ট্রের নৈসর্গিক অবস্থিতিদ্বারা বৈদেশিক নীতি কিরূপ প্রভাবিত হচ্ছে।

যদিও গত শতক হইতেই ইতিহাসের ভৌগলিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় আলোচিত হচ্ছে, কিন্তু প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের রচনায়ও এর উল্লেখ দেখা যায়। গ্রীক পণ্ডিত এরিষ্টটল মনে করতেন, গ্রীসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ উহার অক্ষরেখা ও জলবায়ু। এতদ্ব্যতীত সিসারো (Cisero) একুইনাস (Aquinos) এবং বোডিন (Bodin) ও ভৌগোলিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কার্ল রিটারই সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা দাঁড় করান।

কার্ল রিটার (Karl Ritter) (১৭৭৯-১৮৫৯)

রিটারের মতে ভূগোল ও ইতিহাস অনন্য নির্ভরশীল। ভৌগোলিক পরিবেশই এক-একটি জাতির বৈশিষ্ট্য সৃজন করে তোলে। কেবল তাই নয়, মানবজীবনের প্রত্যেক বিভাগই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। রিটার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন, মহাদেশগুলোর আকৃতি বা গঠনের ওপর। এক-একটি মহাদেশের এক-এক প্রকারের আকৃতি বলেই ঐ সকল মহাদেশবাসীর প্রকৃতিও তাহা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েছে। আফ্রিকার সরল উপকূল ভাগের জন্য আফ্রিকা অনুন্নত। অপর পক্ষে যুরোপের বঙ্কিম আকৃতির জন্য সমুদ্র অভ্যন্তরভাগেও প্রবিষ্ট হয়েছে, ফলে যুরোপ শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়ে তুলবার সাহায্য পেয়েছে। আবার এশিয়ার সৈকত রেখা সরল হয়েও অসম এবং এরই নিমিত্ত এশিয়ায় অনুন্নতি ও প্রগতি, সভ্যতার অনুর্বরতা ও প্রসার দুই-ই

দেখা যায়। মহাদেশের আশে-পাশের দ্বীপগুলির গুরুত্ব খুবই বেশি। এরাই সভ্যতার বিকীরণে সহায়তা করে। যেমন ভূমধ্যসাগরের দ্বীপগুলির জন্যই এসিয়া থেকে সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রীসে ও রোমে। আবার দ্বীপময়তার আধিক্য অনুন্নতির কারণ হলেও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেই থাকে। পলিনেশিয়ায় এটা দেখা যায়।

হেনরি টমাস বাক্‌ল্ (Henry Thomas Backle) (১৮২১-১৮৬২)

বাক্‌ল্ লণ্ডনের জাহাজের এক ধনী মালিকের পুত্র ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ কুড়ি বছর তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "ইংলণ্ডের সভ্যতার ইতিহাস" (History of the Civilisation of England) রচনায়ই কাটিয়ে গেছেন। এই সুবিখ্যাত গ্রন্থখানি বঙ্কিমবাবুদের সময়েও এদেশে পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। মানুষের এবং সমাজের কর্মধারা কি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হয় অথবা কোন অপ্রাকৃত ও আকস্মিক প্রভাবে ঘটে থাকে? এই প্রশ্নের জবাবে বাক্‌ল্ স্পষ্টভাষায় লিখেছেন—"ইতিহাসের সমস্ত পরিবর্তন ও মানবজাতির সকল উত্থান ও পতন, মানুষের সুখের হাসি ও দুঃখের কান্না—এ সকলই দ্বৈতশক্তির ফল: বাহ্য প্রকৃতির ওপর মানব-চিত্তের প্রভাব এবং মানব-চিত্তের ওপর বাহ্য-প্রকৃতির প্রভাব—এই দুইশক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও ঘাত-প্রতিঘাতেই ইতিহাস গড়ে উঠছে।"

প্রাকৃতিক শক্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালগুলোকে বাক্‌ল্ চার ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা—জলবায়ু, খাদ্য, মৃত্তিকা এবং প্রকৃতির সাধারণ রূপ। 'প্রকৃতির সাধারণ রূপ' বলতে বাক্‌ল্ বুঝেছেন সুন্দর দৃশ্য, পর্বতমালা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঝড়-তুফান, এমন কি মড়ক পর্য্যন্ত। জলবায়ু, খাদ্য এবং মৃত্তিকার অবস্থা যেমন মানুষের অর্থের উৎপাদন ও বিতরণ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, সেইরূপ প্রকৃতির সাধারণ রূপ (General aspects of nature) মানুষের চিন্তাধারার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রকৃতির সাধারণ রূপের কতকগুলো মানুষের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপিত করে তোলে, কতকগুলো প্রভাবিত করে তার বুদ্ধিবৃত্তিকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাক্‌ল্ ভারতবর্ষ ও গ্রীসের সভ্যতার তুলনা করেছেন। ভারতবর্ষে প্রকৃতির বিস্ময়কর বিরাটত্ব, গ্রীসে প্রকৃতির ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতাই দেখা যায় এবং মানুষের পক্ষে তা উৎকট ভয়াবহও নয়। প্রাকৃতিক এই বৈষম্যের ফলেই ভারতবর্ষীয় ধর্মে শোণিতসঙ্কুল বলিদানপ্রথা ও বীভৎসতা, অপর পক্ষে গ্রীসদেশের দেবতাদের মানবীয় আকৃতিও সুস্থ প্রকৃতি স্বতই চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়। ব্যষ্টিজীবনেও এই পার্থক্য ধরা পড়ে। ভারতে ব্যষ্টি দলিত, গ্রীসে উন্নত। চিন্তাধারার দিক দিয়া ভারতীয়গণ অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ও কবিত্বপ্রিয়, গ্রীকগণ যুক্তিশীল। প্রকৃতির বিশালতা ও বীরত্ব এশিয়ায় যে কল্পনা ও কবিত্ব দিয়েছে, য়ুরোপে প্রকৃতি এ বিষয়ে নেহাৎ কৃপণ।

পরিশেষে বাক্‌ল্ বলছেন, পরিবেশের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পরিস্ফুট আদিম জাতি ও নিম্নস্তরের সভ্যতায়। মানুষ যতই উন্নত ও সভ্য হচ্ছে, ততই সে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব হতে মুক্ত হচ্ছে। পশ্চিম য়ুরোপের ইতিহাস মানবচিত্ত ও সংস্কৃতির ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের ইতি-

বৃত্ত। সভ্যতা যতই অগ্রসর হচ্ছে, মন ততই প্রকৃতির ওপর আধিপত্য ছড়াচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে সভ্যতার মাপকাঠি। উন্নতিশীল সভ্যতার পক্ষে প্রাকৃতিক প্রভাবের চেয়ে মানসিক প্রভাবই অধিকতর কার্য্যকরী। বাক্‌ল্‌কে যারা জড়বাদী বলে প্রতিপন্ন করতে পঞ্চমুখ, বাক্‌লের এই উক্তিতে তাদের কোন যুক্তিতর্কই আর টেঁকে না। প্রকৃতপক্ষে বাক্‌ল্ মনের প্রাধান্যই স্বীকার করে গেছেন। এবং মন ও পরিবেশ দুইয়েরই প্রভাব স্বীকার করেছেন। গোঁড়া ও একদেশদর্শী পরিবেশ-বাদীদের ন্যায় কখনও ভৌগোলিক পরিবেশকেই মানব-ইতিহাস-গঠনের একমাত্র কারণ বলে গ্রহণ করেন নি।

ফ্রেডেরিক্ র‍্যাট্‌জেল (Friedrich Ratzel) (১৮৪৪-১৯০৪)

জর্মন সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে র‍্যাট্‌জেলই যথাযথ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে মানুষ ও পরিবেশ পরস্পর বিরুদ্ধশক্তি নয়, বরং মানুষ পৃথিবীরই অংশবিশেষ। র‍্যাট্‌জেলের দ্বিতীয় মত এই, জাতি ও সমাজ এক-একটি অর্গানিজ্‌ম্ এবং প্রাণীরা নৈসর্গিক পরিবেশের ওপর প্রতিক্রিয়াশীল সমাজ অবয়বী হলেও রাষ্ট্রকেও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্গানিজ্‌ম্ বলে র‍্যাটজেল স্বীকার করেছেন। সুতরাং একই প্রকার ভৌগোলিক পরিবেশ ও জলবায়ু যেখানে যেখানে দেখা যায়, সেই সেই স্থানে একই প্রকার ঐতিহাসিক উন্নতিও লক্ষিত হয়। র‍্যাটজেল লিখেছেন,—বিভিন্ন দেশের মধ্যে যতই দূরত্ব হোক্ যদি তাদের জলবায়ু একই প্রকারের হয়, তাহলে সেই সকল দেশ একবিধ ঐতিহাসিক ঘটনারই রঙ্গমঞ্চ হয়ে দাঁড়াবে। মানুষে মানুষে জন্মগত ও জাতিগত যতই পার্থক্য থাক্, মূলতঃ সে এক।"

এর পর র‍্যাট্‌জেল আলোচনা করেছেন, মানবজাতি কেন দিকে দিকে দলে দলে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। এর তিনি দুটি কারণ নির্দেশ করছেন : মানবজীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির সহিত তার বাসভূমির সংঘাতের ফলেই মানবসমাজ গতিশীল হয়। মানুষের মস্তিষ্ক ও ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা এবিষয়ে একটি বড় শক্তি।

র‍্যাট্‌জেল জলবায়ুকে যেমন একটি বড় প্রভাব মনে করেন, তেমনি দেশের ভৌগলিক গঠন ও সংস্থিতি, ইংলণ্ডের মতো দ্বৈপায়ণতা, হিমালয়ের মতো সংরক্ষণশীলতা, পৃথিবীর জলবিভাগ ও সৈকত-রেখা প্রভৃতিও তাঁর মতে, মানব-ইতিহাসকে কম প্রভাবিত করে না।

এলেন চার্চিল সেম্পল্ (Ellen Churchill Semple) (১৮৬২—)

মিস্ সেম্পল্ আমেরিকাবাসী প্রতিভাশালী সমাজতত্ত্ববিদ। এঁর মতো পণ্ডিত ও পরিশ্রমী শিষ্যা মিলেছিল বলেই র‍্যাটজেলের মতগুলো ইংরেজি ভাষাভাষীদের সহজেই গোচরে এসেছে। সেম্পলের দুখানা বই বিখ্যাত—'আমেরিকার ইতিহাস ও ইহার ভোগোলিক অবস্থা' (American History and its Geographic Conditions) এবং ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব

(Influence of Geographic Environment)। সেম্পল্ র‍্যাটজেলের মতবাদকে অনেক ত্রুটিমুক্ত করেন। বিশেষত র‍্যাটজেল যেখানে সমাজকে অবয়বের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেম্পল তা অস্বীকার করেও গুরুর মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠ করেছেন।

সেম্পলের মতে ভৌগোলিক প্রভাব মানুষের ওপর চার প্রকার প্রভাব বিস্তার করছে (১) পরিবেশের প্রত্যক্ষ ও স্থূল প্রভাব ; (২) মানসিক প্রভাব ; (৩) অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব ; (৪) মানবজাতির বিচ্ছুরণের ওপর প্রভাব। বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে বলেই মানুষ এক-একটি জাতিতে পরিণত হয়ে পড়েছে। এমন কি জন্মও পরিবেশদ্বারাই সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

জলবায়ুর প্রভাবকে ইনি একটি বড় শক্তি বলে স্বীকার করেছেন। গায়ের রং এর সঙ্গে জলবায়ু ও ভূমির উচ্চতার কি সম্পর্ক তাও ইনি আলোচনা করেছেন। যেমন উচ্চ ভূমিতে যারা বাস করে তারা গৌরবর্ণ হয়ে থাকে। তিব্বতের বহুপতিক বিবাহ প্রথার (Polyandry) একটি মজার কারণ ইনি উল্লেখ করেছেন : তিব্বত অত্যন্ত উচ্চ এবং খাদ্যও দুষ্প্রাপ্য।

মনের উপর পরিবেশের যে প্রভাব তা আমরা ধর্ম, সাহিত্য, চিন্তাধারা বা ভাষার অলঙ্কার প্রকরণে দেখতে পাই। পেশা ভাষাকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। যেমন, আফ্রিকায় কতকগুলো গোপালক জাতের মধ্যে গো-পালনের বিভিন্ন ব্যঞ্জক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, অথচ অন্যান্য বিষয়ে তাদের শব্দসংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

জীন জ্যাক্‌স্ ইলাইসী রেক্লাস্ (Jean Jacques Elisee Reclus) (১৮৩০-১৯০৫)

ফরাসীদের শ্রেষ্ঠ ভৌগোলিক ইলাইসী রেক্লাস বার্লিনে কার্ল রিটারের শিষ্য ছিলেন। ১৮৭২ সালের ফরাসী কম্যানার্ড আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁকে নির্বাসিত করা হয়। ইনি নৈরাজ্যবাদী প্রিন্স ক্রপটকিনের সহযোগিতায় "দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের" অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এনার্কিষ্ট ছিলেন বলেই রেক্লাসের মতের দৃঢ়তা ছিল।

রেক্লাসের ভাষায় ইতিহাস = ভূগোল + কাল ; (Time)

ভূগোল = ইতিহাস + দেশ (Space)

মানুষ = প্রকৃতি + চিৎ (Consciousness)।

রেক্লাসের মতে বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশ পৃথক পৃথক কোন প্রভাব বিস্তার করে না। তাপ, শৈত্য, উচ্চতা, বন, সাগর, নদী, হ্রদ, দ্বীপ প্রভৃতি একযোগে মানুষকে প্রভাবিত করছে। এদের কোন একটি দ্বারা বা কেবলমাত্র ভৌগোলিক পরিবেশদ্বারা ইতিহাস ব্যাখ্যা করা নিরর্থক। এদিক দিয়ে রেক্লাসের মত যুক্তিশীল ও অনুগ্র।

হলফোর্ড জন ম্যাকিণ্ডার (Halford John Mackindor) (১৮৬১—)

অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক শক্তিগুলো কি ভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করে, সে সম্বন্ধে ম্যাকিণ্ডার আলোচনা করেছেন। মানব-ইতিহাসে রুসীয়, সাইবেরীয় ও কাস্পিয়ান অঞ্চলের গুরুত্ব সম্বন্ধে ইনি বহু গবেষণা করেছেন। এঁর আলোচনা প্রকারান্তরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন মাত্র।

এলসওয়ার্থ হান্টিংটন (Ellsworth Huntington) (১৯৬৬—)

এলসওয়ার্থ হান্টিংটন একমাত্র জলবায়ুকেই মানব-ইতিহাস গঠনের সবচেয়ে বড় প্রভাব মনে করেন। তিনি এই মতবাদ অত্যন্ত সরলতার সহিত উপস্থাপিত করেছেন। এঁর মতে, কাস্পিয়ান সাগরের তলদেশের ক্রমপরিবর্তন মানবইতিহাসের পক্ষে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি ইতিহাস ঘেঁটে বলছেন, প্রায় বাইশ শ' বছর আগে কাস্পিয়ান সাগর এখনকার চেয়ে দেড় শত ফিট উচ্চ ছিল এবং বিস্তৃতরও ছিল। খ্রীষ্টীয় শতকের সমকালে এর জলরেখা বর্তমানের চেয়ে প্রায় শতেক ফিট নীচে ছিল। এই এতবড় পরিবর্তন কেবলমাত্র জলবায়ুর পরিবর্তন হওয়াতেই সম্ভব হয়েছে। ইনি জলবায়ুর পরিবর্তনকে চার শ্রেণীতে বিভাগ করেছেন এবং অনেক উদ্ভট আলোচনাও করেছেন। জলবায়ুর প্রভাব স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু একে অত্যাধিক বা একমাত্র কারণ বললে গোঁড়ামি ও অতিরঞ্জন হয়ে পড়ে।

লা প্লে (Le Play) (১৮০৬—১৮৯১)

লা প্লে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় একটি বিশিষ্ট স্থান অর্জন করেছেন। তিনি একটি মতবাদ ও একদল খ্যাতিমান্ শিষ্য গড়ে গেছেন। ভূগোল কি ভাবে পরিবারকে প্রভাবিত করে, তার এমন বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর কেউ করেন নি।

হেনরী টেইন (H. Taine)

টেইনের 'ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস' আমাদের অনেকেরই পরিচিত। এই ফরাসী পণ্ডিত ভৌগলিক পরিবেশকে সাহিত্য, ধর্ম ও আর্ট সৃষ্টির সর্বপ্রধান কারণ বলেন।

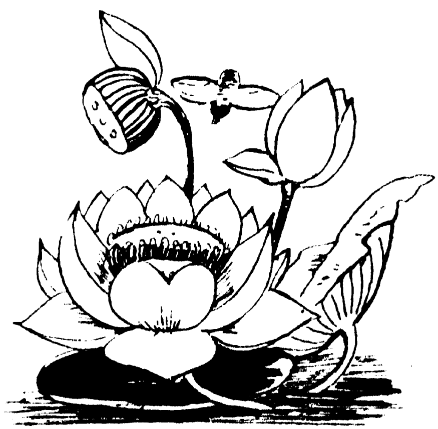
ওপরে যে-সকল সমাজতাত্ত্বিক ও মনীষীদের মত আলোচিত হল, এ ছাড়াও আরো বহু পণ্ডিত এবিষয়ে চুলচেরা আলোচনা করেছেন। এদের মত অনেক সময় যুক্তি ও দৃষ্টান্তের মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও, এরাই পরবর্তীকালের এবং অধুনাবিখ্যাত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার পথপ্রদর্শন করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ মানব-ইতিহাস গঠনের একমাত্র কারণ বা শক্তি নয়, অন্যতম কারণ। পরিবেশ যোগায় উপাদান, মানবচিত্ত তারই সাহায্যে গড়ে তোলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট সৌধ। সক্রিয় ও সিসৃক্ষু মানবচিত্ত জড়া প্রকৃতিকে দিয়ে নব নব রূপ ও সৌন্দর্য্য সৃজন করে চলছে।

সুপ্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক রবার্ট লাউয়ি (Robert H. Lowie) একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে এই সম্পর্কটি পরিস্ফুট করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"সংস্কৃতির সহিত পরিবেশের যে সম্পর্ক তার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পরিবেশ সংস্কৃতির সৌধ-নির্মাতাদের কেবল ইট-সুরকিই যোগায়, কিন্তু শিল্পীর পরিকল্পনা দিতে অক্ষম। একবিধ উপকরণ বহুবিধ কার্য্যে নিয়োজিত হতে পারে, বরং উপকরণের মধ্যে গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় দুই-ই থাকতে পারে। যেমন একটি স্থাপত্যপদ্ধতি একই প্রকার উপকরণ ব্যতীতও রচিত হইতে পারে, সেইরূপ বহুবিধ উপকরণ দিয়েও একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলা যায়। একই ভৌগলিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে। চেতনা (Consciousness) যেমন কতকগুলো খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভাবের সমষ্টি মাত্র নয়, সেইরূপ সভ্যতা ও সংস্কৃতি কেবলমাত্র কতকগুলো পরিবেশদ্বারাই গঠিত হতে পারে না। একটি চেতনশীল চিত্ত যেমন আপন সংহতকারী ও সামঞ্জস্যকারী শক্তিদ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাবগুলোকে সংহত করে, সেইরূপ একটি পরিকল্পনাশীল মন বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে সংস্কৃতির সামঞ্জস্য গড়ে তোলে।"

[ক্রমশঃ]



মানুষ

শ্রী ....

আমরা মানুষ ;—জয়পত্র কপালে লেখা যজ্ঞের ঘোড়া।

কবে থেকে,
ঠিক মনে নেই কবে থেকে,
আমরা চলেছি।
সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে নয়,
শামুকের মতো
পিঠে খোলসের ভার নিয়ে
অতি মৃদু মন্থর গতিতে নয় ;
হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় লাফিয়ে ধেয়ে চলা
অশান্ত আষাঢ় মেঘের মতো
ছুটে চলেছি আমরা।

খোলস যা' কিছু জমে ওঠে,
বাধা দেয় আমাদের চলাকে, গতিবেগকে আনে ঝিমিয়ে
তাকেই আমরা ছিনিয়ে নিয়ে
ফেলে দিই দূর করে'।
ব্যথা বাজে : তবু তা' সয়ে থাকি, ভুলে যাই।

রক্তে আমাদের উন্মত্ত উল্লাস।
এ দেহে তা' ধরেনা, ফেনিয়ে ওঠে, উপচে পড়ে ;—
পুরাণো বোতল ফাটিয়ে তাজা মদের মতো
গড়িয়ে যায় চারদিকে।

আরক্তিম প্রাণ—অপ্রমেয় বীর্য্য !
কে তাকে ধরে রাখবে !
শিরাগুলো নীল হয়ে ফুলে ওঠে—টনটন্ করে।
বর্ষার ভরা নদী কি মানে কূলের বাঁধন !

তরঙ্গিত আলোকোচ্ছল প্রাণ !
দুঃসহ আবেগ !—প্রবল প্রেরণা !
তাইতো মানুষ, ভাঙে মানুষ গড়ে।
করে অবিচার, আনে অনাসৃষ্টি ;
আবার নিজেরই রক্তে ধুয়ে মেজে করে তোলে
ঝক্‌ঝকে সুন্দর,
অপরূপ সুন্দর—অপূর্ব—নূতন।

যজ্ঞ ! এইতো মানুষের যজ্ঞ !
এই যজ্ঞের ঘোড়া আমরা ;
ছুটে চলেছি দিগ্বিজয়ের অনন্ত অভিযানে।
মানুষের জয়পত্র আমাদের কপালে ;
জ্বলছে শুকতারার মতো জ্বল জ্বল করে,
আমের পাতায় সিঁদূরের তাজা প্রলেপের মতো
জ্বলছে লোহিত লাবণ্যে।

একটি ঘোড়া ;—
ছুটল টগবগিয়ে
খুরের ঘায়ে পাথর ফাটিয়ে
পথে পথে আগুণের ফুলকি ছুটিয়ে।
হঠাৎ পড়ল হুমড়ি খেয়ে
আর উঠল্ না ;
অমনি এল নূতন—এল আর একটি !
কপালে উঠল তার সেই জয়পত্র—
মানুষের অমৃত-সাধনার ইঙ্গিত,
প্রদীপশিখার মতো ঋজু
আত্মার মতো ধ্রুব।

এই ইঙ্গিত দিল তাকে জীবনের স্বাদ
তার বাঁচা আর মরাকে করল অর্থপূর্ণ ;
পরিণামী অচেতন প্রকৃতির বুকে বহাল

নিয়ন্ত্রিত প্রগতির ধারা
নিরর্থককে করল সার্থক ।

মানুষের যা কিছু নিজের—যা কিছু তার মাঝে অপূর্ব
তারি আভাস চমকে ওঠে এই ছুটে চলায় ;
ঝলকে ঝলকে*
ঠিকরে পড়ে অন্ধকারের অলক্ষ্য থেকে
আলো আরো আলো
বিশ্বের বুকে মানুষের জয়পত্র বয়ে বেড়ানোর
দুরন্ত আনন্দে ।

যে বুঝল এর মানে—পান করল এ আনন্দরস
সার্থক মানুষ সে ;
সার্থক জীবন তার, অমৃত মরণ ।



স্পেনের আভ্যন্তরিণ অবস্থা

শ্রীবেলা মিত্র

প্রায় দু'বছর আগে গণতন্ত্রী স্পেনকে যখন ফ্রাঙ্কো-হিট্‌লার-মুসলিনীর বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে হয়েছিল তখন কোন গণতন্ত্রের বন্ধুরা তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কান্বিত হোয়ে উঠেছিলেন। কারণ প্রতিপক্ষ দলে ছিল সব বড় বড় অভিজ্ঞ সমরকুশল অফিসার ও অপর্য্যাপ্ত যুদ্ধোপকরণ লাভের সম্ভাবনা। এদিকে ধনতন্ত্রী ডেমোক্রেসীগুলির নিরপেক্ষনীতি পরোক্ষে ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিরই সহায়তা করেছে। কারণ আক্রমণকারী ফ্রাঙ্কো যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ কোরেই কাজে নেমেছিল কিন্তু স্পেনগণতন্ত্র যুদ্ধের জন্য ছিল একেবারে অ-প্রস্তুত। কাজেই এই নিরপেক্ষনীতি বিপক্ষেই গেল তার; ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের এই নিরপেক্ষনীতির ফলেই আবিসিনিয়াকে স্বাধীনতা হারাতে হোয়েছে। কিন্তু এত কোরেও স্পেন গণতন্ত্র মাথা উঁচু করে আছে এখনো একা যুদ্ধ চালাচ্ছে তিন তিনটী ফ্যাসিষ্টবাহিনীর সঙ্গে। কি কোরে এ সম্ভব হোল তার উত্তর পাওয়া যায় স্পেনবাসীর অদ্ভুত ঐক্যে। স্যোসিয়ালিষ্ট পার্টিকে কেন্দ্র কোরে গড়ে উঠেছে এই ঐক্য। কম্যুনিষ্টরাও হাত মিলিয়েছে তার সাথে। মাদ্রিদে কম্যুনিষ্ট পার্টির এক সভায় স্পেন কম্যুনিষ্টদের নেত্রী পাসিওনেওয়ারা দৃঢ়ভাবে সেদিন বলেছেন, এসময় ফ্যাসিষ্ট বিরোধী দলগুলির মধ্যে কোনপ্রকার অনৈক্য দেশের স্বাধীনতা রক্ষার কাজকে অতিমাত্রায় কঠিন করে তুলবে। কম্যুনিষ্টরা জোরালো ভাবেই বলছে



পাসিওনারা

We want the socialist party to be united because we must join with the Socialist Party comrades to form one single party and because we know that if the Socialist Party were to split we could not attain the goal.

এই ঐক্যের কারণ স্পেনবাসী জানে তাদের পিতৃভূমি বিদেশী, ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলি দ্বারা আক্রান্ত। ফ্রাঙ্কোকে শিখণ্ডী রেখে আজ যবনিকার অন্তরালে নয়, অতি প্রকাশ্যভাবেই আক্রমণ চালাচ্ছে হিট্‌লার-মুসোলিনী। ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ সৈন্যই বিদেশী আর যুদ্ধোপকরণ ও টেকনিসিয়ান (Technician) আমদানী হোয়েছে অধিকাংশ বিদেশ থেকে।

এজন্যই স্পেনবাসীর অ-সামান্য বীরত্ব ও প্রচেষ্টাও বারবার ব্যর্থ হোচ্ছে। গণতন্ত্রী সরকার এই সম্মিলিত ফ্যাসিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। গত ১লা মে স্পেন গভর্ণমেণ্ট তার নীতির যে ত্রয়োদশটী সর্ত্ত দেশবাসীর সম্মুখে ধরেছে। তাতে সমস্ত দেশের আন্তরিক সায় আছে।

(১) স্পেনের স্বাধীনতা ও পৃথক অস্তিত্ব সংরক্ষণ।

(২) ১৯৩৬এ যুদ্ধ সম্বন্ধে উপদেশ দেবার অজুহাতে দেশে প্রবেশ কোরে যেসব বিদেশী নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য স্পেনের অর্থনৈতিক ও আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা হোয়ে উঠেছে—তাদের হাত থেকে স্পেনকে মুক্ত করা।

(৩) জনসাধারণের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে সর্ব্বসাধারণের ভোটাধিকার লাভের উপর।



প্রেসিডেণ্ট—আজানা

(৪) ভবিষ্যৎ গণতন্ত্রের স্বরূপ কি হবে তা জাতীয় ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে। যুদ্ধাবসানে সমস্ত স্পেন-বাসীর মতামত গ্রহণ (Plebiscite) কোরে সে জাতীয় ইচ্ছা জানবার ব্যবস্থা করা হবে।

(৫) স্পেন গণতন্ত্রের ঐক্য অক্ষুন্ন রেখে স্পেনের বিভিন্ন প্রদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে।

(৬) স্পেনীয় গণতন্ত্র নাগরিকদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করবে।

(৭) জাতির বৃহত্তম স্বার্থ ও ধনোৎপাদনকারীদের ক্ষতি না ঘটিয়ে—ভবিষ্যৎগণতন্ত্র—ন্যায়ত অর্জ্জিত সম্পত্তির উপর স্বত্ব স্বীকার করবে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ না কোরে শোষণ ও ধন-সঞ্চয় বন্ধ করবে।

(৮) বর্ত্তমানের ভূমধাকারী ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন কোরে দেশের অপর্য্যাপ্ত খনিজ সম্পত্তির উন্নতি সম্ভবপর করবে।

(৯) আইন প্রণয়ন কোরে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা করা হবে।

(১০) স্পেনজাতির সাংস্কৃতিক, দৈহিক ও নৈতিক উন্নতিবিধান করা গণতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে।

(১১) স্পেনীয় সৈন্যবাহিনীকে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে মুক্ত কোরে স্পেন জাতির অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার কাজে নিযুক্ত করা হবে।

(১২) স্পেনগণতন্ত্র যুদ্ধকে জাতীয় নীতি হিসাবে বর্জ্জন করবার সংকল্পের পুনরাবৃত্তি করছে।

(১৩) যে সকল স্পেনিয়ার্ড জাতীয়সংগঠনের কাজে স্পেনগতণন্ত্রকে সহায়তা করবে— তাদের সকলকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হবে।

উপরের এই তেরোটী নীতি সমস্ত স্পেনকে আজ ঐক্যবদ্ধ কোরেছে। স্পেনবাসী জানে কোন্ অধিকার রক্ষার জন্য এ যুদ্ধ—আর এজন্যই চরমতম ত্যাগও তাদের অতিরিক্ত মনে হয়না।

নীতির দিক দিয়ে যেমন গণতন্ত্রকে সমস্ত দেশ আজ সমর্থন করছে তেমন গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের দূরদর্শিতা ও দেশবাসীর সুখসুবিধার দিকে সজাগ দৃষ্টি জগতের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছে।

যুদ্ধজয়ের জন্য—নৈতিক বলের সঙ্গে প্রয়োজন ধনবল ও জনবলের যোগাযোগ। কোন যুদ্ধের পেছনে যেমন নৈতিক সমর্থন চাই তেমনি চাই লড়বার লোক ও যুদ্ধ চালাবার উপযুক্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সুব্যবস্থা। এদিক দিয়ে গণতন্ত্রী সরকারের কাজ প্রশংসনীয়। ১৯৩৮-এর এপ্রিলে স্পেনের ব্যাঙ্ক যে ব্যালান্স সিট বের কোরেছে তাতে দেখা যায় যুদ্ধের সময় অন্য দেশের আর্থিক অবস্থার তুলনায় গণতন্ত্রী স্পেনের অবস্থা বেশ ভালো। ট্রেজারি যে ক্রেডিট দিয়েছে তাতেই যুদ্ধের খরচ মোটামুটি চলে যাচ্ছে। বাইশ মাস যুদ্ধের পরও ট্রেজারির পক্ষে নোট চালানোর প্রয়োজন হয়নি। ব্যাঙ্কের চল্‌তি হিসাবে (Current account) বাড়্‌তি হয়েছে ৭০ কোটী টাকারও উপর।



জেনারেল ফ্রাঙ্কো

যুদ্ধের সুরুতে ট্রেজারির হিসাবে যে ব্যালেন্স ছিল তার চেয়ে নোট চলত ঢের বেশী। আজ অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে; নোট চলে ট্রেজারির হিসাবের অর্দ্ধেকেরও কম।

গণতন্ত্রী স্পেন চিরদিন চুক্তিমত ধার শোধ দিয়েছে; আজও সে বিষয়ে তার এতটুকু গাফিলতি নেই। অন্য যে কোন দেশের সঙ্গে তুলনা করে বোঝা যাবে এতে গণতন্ত্রী সরকারের বাহাদুরী কতটা। যখন কোন দেশ ভবিষ্যতের ভরসা রাখে তখনই সে তার ক্রেডিট্ বাঁচায় এবং চুক্তি রক্ষা করে। গণতন্ত্রী স্পেন যে তার লেন-দেনের চুক্তি ঠিকমত রক্ষা করে চলেছে এতেই বোঝা যায় যে জয়ের আশা সে নিশ্চিতভাবেই পোষণ করে।

গণতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে ট্যাক্স আদায়ও ভাল চলেছে। ১৯৩৮-এর এপ্রিলে ট্যাক্স বেড়েছে দুই কোটী টাকারও ওপরে।

গবর্ণমেন্ট প্রধান ব্যবসাগুলি নিজের আয়ত্বে আনছেন যাতে দেশের বাণিজ্যে বিশৃঙ্খলা না আসে এবং প্রয়োজনীয় জিনিষের অপ্রাচুর্য্য না ঘটে। এজন্যে সরকার তামাকের ব্যবসা নিজের



স্পেনে ফ্রাঙ্কোর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শিশুদিগের বিক্ষোভ প্রদর্শন

হাতে নিয়েছে। বাইরে থেকে তামাক আমদানী করে দেশে চালাচ্ছে। তাছাড়া ক্যাটালোনিয়া কয়েকটা তামাকের কারখানা খুল্‌বার আয়োজন করেছে। যেসব কারখানা আজ অচল তাদের যন্ত্রপাতি এনে এই কাজে লাগানো হবে। সমস্ত আলুর চাষে যে ফসল উঠ্‌বে তা সবই সরকারের হাতে চলে যাবে। যারা যুদ্ধে যোগ দেয়নি তাদের খোরাক বাবদ এ আলু চালান হবে। আলুর মালিক যারা তাদের এ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ সম্মতি আছে।

এ থেকে প্রমাণ হয় গণতন্ত্রী স্পেনের হাতে আজও আছে রসদের ব্যবস্থা, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা ও লড়াইয়ের কাঁচা মাল মসলা। দেশের যেসব জায়গায় যন্ত্রশিল্প উন্নত, লোক সংখ্যা বেশী সেই সব জায়গাই গণতন্ত্রীদের হাতে। লেভাঁতের মত কৃষি-প্রধান অংশগুলো তাদেরি দখলে। ভূমধ্যসাগরের বড় বড় বন্দর ও পিরিনিসের সীমান্তের অনেকটাও আজ গণতন্ত্রীদেরই অধিকারে। এগুলি হাতে আছে বলেই দুনিয়ার সঙ্গে যোগ রাখা এবং ব্যবসা চালান তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। সমস্ত স্পেনের যাবতীয় শিল্পের প্রায় ৮০ ভাগ যোগায় ক্যাটালোনিয়া। মধ্যক্যাটালোনিয়ার পটাস্-খান ও পিরিনিসের হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক শক্তি আজও গণতন্ত্রীদের হাতে। গত মহাযুদ্ধে ক্যাটা-লোনিয়া ফ্রান্সকে জুগিয়েছে লড়াইয়ের মালসমলা। এবারও বিদ্রোহের পর থেকেই সেখানে যুদ্ধ-শিল্প তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গণতন্ত্রী সৈন্যদলের অনেক প্রয়োজনীয় মালমস্‌লার যোগান দিচ্ছে ক্যাটালোনিয়ার শিল্প।

দেশে খাদ্যদ্রব্যের এতটুকু অভাব যাতে না হয় সেদিকে সরকারের ব্যবস্থা প্রশংসনীয় ও দৃষ্টি সজাগ। লেভাঁতে ধানক্ষেতের চাষী শ্রমিকদের সাময়িক কাজে ডাকা হয়েছিল সম্প্রতি পঁচিশ দিনের জন্য—সেকাজ স্থগিত আছে; চাষী শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে ধানবোনার কাজ শেষ করতে। লেভাঁতে ধান ক্ষেত থেকে যে ফসল উঠবে তাতে সৈন্যদলের ও অসামরিক জনগণের রসদ যাতে গত বছরের চেয়েও বেশী হয়।

জনবল যোগাড়ের দিকেও গণতন্ত্রী সরকারের উদ্যম প্রচুর ও অফুরন্ত। সামরিক বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারী হুকুমজারী করেছেন যে অস্ত্রধারী সকল ব্যক্তিকেই কমপক্ষে ছয়মাস সীমান্তে কাজ করতে হবে। ১৯২৩-২৫ সালে সামরিক বিভাগে যারা ভর্ত্তি হয়েছিল তাদের বয়স আজ ৩৩।৩৪ বছর। তাদের সবাইকে ফিরে কাজে ডাকা হয়েছে।

জনসাধারণের ও সৈন্যদলের সুতীক্ষ্ণ সম্মান বোধই সমস্ত পরাজয়কে ঠেকিয়ে রেখেছে। ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদল দেশের কোন অংশ দখল করলে অমনি দল বেঁধে বাড়ী, ঘর ছেড়ে লোক সে জায়গা থেকে সরে যায়। ভিটে মাটি সব পেছনে পড়ে থাকে। আজ ছেলে বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাই জানে কেন এ লড়াই চলছে আর গণতন্ত্রী সরকার হেরে গেলে তাদের কি ক্ষতি ও জিতলে কি তাদের লাভ। এই সদ্যোজাগ্রত জাতীয়তাবোধই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছে ও শেষদিন পর্য্যন্ত সব মারের মুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে আশা হয়।



স্পেনের গণতন্ত্রী মেয়ে সৈনিক

যুদ্ধের বিশৃঙ্খলায় দেশের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা প্রচুর। তাই স্বাস্থ্যরক্ষার দিকেও সরকারের মনোযোগ আছে। দক্ষিণ স্পেন থেকে হাজার হাজার যুদ্ধ-তাড়িত নিরাশ্রয় স্পেনীয়ার্ড ক্যাটালোনীয়ায় (Catalonia) ক্রমে আশ্রয় নিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দেখা দিয়েছে ট্রাকোমা (Trachoma), নামে রোগ। এ অঞ্চলে আগে এ রোগের নাম ও কেউ জানত না। এর সঙ্গে লড়বার জন্য মিয়াজা ক্লিনিকের (Miaja Clinic) সৃষ্টি হয়েছে। সরকার যেদিন বার্সিলোনায় (Barcelona) উঠে এসেছে সেদিন থেকে ট্রাকোমার বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোর চলেছে। মিয়াজা ক্লিনিকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ট্রাকোমা গবেষণাগার।

রসায়ন শিল্প ও ভেষজ শিল্প পরিদর্শনের জন্য এক কমিশন বসেছে। তার ব্যবস্থায় খাটী ঔষধপত্রের উৎপাদন ও যথাযথ বিতরণ হচ্ছে উপযুক্ত মূল্যে।

১৯২৪-২৫ ও ২৬ সালে চিকিৎসা বিভাগে যারা প্রবেশ করেছিল সেই সব ডাক্তার ও অস্ত্র-চিকিৎসকদের ফের ডেকে একত্র করা হয়েছে। তাদের কাজে লাগান হবে। এই ডাক্তারদের মধ্য থেকে প্রয়োজন মত ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ নেওয়া হবে ট্রাকোমা গবেষণাগারের জন্য; আর তার পরিচালনার ভার থাকবে জাতীয় চিকিৎসা বিভাগের একজন সুযোগ্য কর্মকর্তার উপর।

রক্ষণবিভাগের কাজেও কামাই নাই। বার্সিলোনার বন্দরে ১৬টি ও ভ্যালেন্সিয়ার বন্দরে ৮টি আশ্রয় তৈরি হচ্ছে। সেখানে আশ্রয় নিলে বোমার হাত থেকে বাঁচা যাবে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬০ লক্ষ মুদ্রা।

এত বড় লড়াইয়ের ঝক্কি সামলেও গণতন্ত্রী সরকার দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির কথা ভোলে নাই। এই যুদ্ধের ফলে ও ফ্যাসিষ্টদের অত্যাচারে অনেক ছেলেমেয়ে বাপ, মা হারিয়ে অনাথ ও নিরাশ্রয় হয়েছে। এই অসহায় অনাথদের রক্ষা ও লালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে সরকার এক আইন জারি করেছে।

এই আইন অনুসারে যে কোন পরিবার এই অসহায় অনাথদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারে। ট্রেজারি থেকে তখন সেই সব পরিবার বিশেষ পেন্সন পাবে। বাপ মা, হারিয়ে অনাথ ছেলেমেয়েরা এতকাল সরকারী অনাথ আশ্রমে থাকত। পারিবারিক জীবনের স্নেহ ভালবাসা এদের কপালে জুটত না। তাই সরকার এই পোষ্য গ্রহণের বিধি দিয়েছে।

যে সব ছেলেমেয়ের শরীর সুস্থ ও পটু কেবল তাদেরই পোষ্য নেওয়া যেতে পারে। যাদের দেহ অপটু তারা থাকবে সরকারের হেফাজতে। ১৪ বছরের উপরে যাদের বয়স তাদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করা হবে না। যে সব ছেলের মা কিম্বা বাবা বেঁচে আছে তাদের পোষ্য নিতে হ'লে বাবা কিম্বা মা'র অনুমতি চাই। যাদের বাবা, মা কেউ নেই তাদের বেলা অনুমতি নিতে হবে সরকারের কাছ থেকে।



যে কোন পরিবারই এই পোষ্য গ্রহণ করতে পারবে না। যে পরিবারের বাড়ীঘর ভাল, সমাজে যাদের সু-পরিবার ব'লে নাম আছে, যাদের কোন গুরুতর রোগ আছে ব'লে জানা নেই তারাই এই অনাথদের পোষ্যরূপে গ্রহণ করতে পারে।

Delegation of Social Aid এর প্রতিনিধিরা এই পোষ্যদের নিয়মিত খবর রাখবে। পরিবারে তারা সুখে আছে কিনা তাদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষালাভের যথাযথ ব্যবস্থা হয়েছে কিনা সরকার এসব কথা জানতে চায়।

বার্সিলোনায় শীঘ্রই ছেলেমেয়েদের রেস্তোরাঁ খোলা হবে। শ্রমিকদের সন্তানরা সেখানে খাবার পাবে একবেলা এক পেজেটায়; আর অনাথ ও পিতৃহীনদের খাবার মিলবে বিনি পয়সায়।

সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষারও সুব্যবস্থা করা হয়েছে। Bellaplana-তে গৃহপালিত পশু কেন্দ্রে একটি ফারম্ স্কুল খোলা হয়েছে। সেখানে চাষী মেয়েরা বিনা পয়সায় পড়তে পারবে।

এসব থেকে প্রমাণ হয় যুদ্ধের বিক্ষিপ্ততার মধ্যেও গভর্ণমেন্ট জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখ সুবিধাকে বিস্মৃত হন্‌নি। আর এজন্যই গণতন্ত্রী গভর্ণমেন্টের সঙ্গে জনসাধারণের রয়েছে গভীর ও আন্তরিক যোগ। সরকার খুঁজছে সকল দিকে চাষী, শ্রমিক ও সাধারণের উন্নতির পথ, করছে তাদের অর্থ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষালাভের সুব্যবস্থা। জনসাধারণও তাই গণতন্ত্রী সরকারকে আপনার ব'লেই জেনেছে, বুকপেতে দিয়েছে ফ্যাসিষ্ট শত্রুর কামানের মুখে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে। তারা জানে তাকে বাঁচালে সবাই বাঁচ্‌বে। আজ চার্চ্চ প্রভৃতি ধর্ম প্রতিষ্ঠান গুলোও গণতন্ত্রী সরকারের বিরোধিতা আর করে না।

কিন্তু স্পেনের সাম্‌নে আস্‌ছে কঠিনতর পরীক্ষা। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর স্পেন অধিকারের প্রয়োজন জার্ম্মাণির আরো বেড়ে গেছে। ইটালী অষ্ট্রিয়া সীমান্তে জার্ম্মাণ সৈন্য-সমাবেশ, মুসোলিনী সহ্য করছেন একমাত্র স্পেন লাভের আশায়। কাজেই হিটলারের উদ্দেশ্য স্পেনজয় যথাসম্ভব শীঘ্র সেরে ফেলা। বিশেষতঃ ক্যাটালোনিয়া ও পীরানিস্ সীমান্ত ইটালী সৈন্যের অধিকারে এলে হিট্‌লার নিশ্চিন্ত হোয়ে চেকোশ্লোভিকিয়া ও মধ্য ইউরোপীয় দেশগুলির দিকে মনোযোগ দেবার অবসর পাবেন, সহযোগী মুসোলিনী তখন ফ্রান্সের উপর দৃষ্টি রাখ্‌তে পারবেন।

যুদ্ধে জয় লাভ করতে গেলে স্পেনকে আরো শক্তিশালী হোতে হবে, ঐক্যকে আরো নিখুঁত কোরে তুলতে হবে। কারণ পূর্ব্ব-ফ্রন্টে শত্রুপক্ষের জয় হোয়েছে—শত্রুপক্ষ প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করছে—এদিকে স্পেনের যুদ্ধ-শিল্প প্রয়োজনের উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র তৈরী কোরে উঠ্‌তে পার্‌ছে না। তার কাজ চলেছে অতিমাত্রায় ধীরে। তা ছাড়া অধিকতর ঐক্যেরও প্রয়োজন আজ হোয়েছে। এ সম্বন্ধে পাসোনিওয়ারা জাতির প্রয়োজনকেই প্রকাশ করেছেন:—



ক্যাটোলোনিয়ার বোমাবিধ্বস্ত হাসপাতাল

"The Unity we lack to day is a new form of Unity, one which must be far-reaching, more firmly welded, more actual and more effective than hitherto." এক কথায় আজ স্পেনের প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। সমস্ত ফ্যাসিষ্ট বিরোধী দলের আজ গভর্ণমেণ্টকে সহায়তা কোরতে হবে। যাতে জনসাধারণের মধ্য থেকে নূতন নূতন দলকে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য পাওয়া যায়। সমস্ত দেশে এমন ঐক্য গড়ে তুল্‌তে হবে যাতে কোন প্রকার প্রাদেশিক স্বার্থ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাতীয় ঐক্যকে ক্ষুন্ন না করে—ব্যক্তি বা দলবিশেষের স্বার্থ যাতে কোন প্রকারে দুর্ব্বল কর্‌তে না পারে জাতির সম্মিলিত সঙ্কল্পকে।

স্পেনের এ সংগ্রামে ভারতের সমস্ত সহানুভূতি রয়েছে গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্টের পক্ষে। স্পেনের সমরক্ষেত্রে জগতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস তৈরী হোচ্ছে—ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলির হার কি জিত তার উপর নির্ভর কর্‌ছে শুধু ইউরোপের নয় সমস্ত জগতের শান্তি ও স্বাধীনতা।

প্রতিশোধ

শ্রীঊষাবাণী রায়

তুপুর গড়িয়ে এসেচে, কারখানার ঘণ্টা সজোরে বেজে উঠ্‌লো, রুদ্ধ ফটক অমনি সশব্দে উন্মুক্ত হোল, ধ্বনির শেষ রেশটুকু মিলিয়ে যাবার পূর্ব্বেই ভিতরের জন-সমুদ্র উদ্বেলিত হোয়ে স্রোতের মত বের হোয়ে আসতে আরম্ভ করলো! এরাই কারখানার প্রাণ, এদের হাতেই এতক্ষণ কারখানা চলেছে। এরা এখন চলেছে, আপন গন্তব্য স্থানের প্রতি সবার মন, কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই, শক্তি ও নেই। দৃষ্টিতে অপরিসীম ক্লান্তি, শিশুদের চরণে নেই চাঞ্চল্য, নারীগণও স্তব্ধ, তাদের অকারণ উচ্ছ্বাস, হাসি-কোলাহল কোন মন্ত্রবলে রুদ্ধ হোয়ে গেছে। স্বাস্থ্যবান্ বলিষ্ঠ দেহে দেখা দিয়েছে অতি পরিশ্রমের অবসাদ, তুর্ব্বল ও বৃদ্ধ দেহের জীবনী-শক্তি যেন এই চলার শ্রমটুকুও আর বহন করতে পারছে না।

কারখানার গেট পার হোয়েই জনতা বিভক্ত হোয়ে পড়্‌লো, কারো কোন বিদায় সম্ভাষণ নেই যন্ত্র চালিতের ন্যায় ছোট-ছোট দলে ক্রমে ক্রমে চারদিকে সবাই ছড়িয়ে পড়্‌লো, যে যন্ত্র-রাজের এরা এতক্ষণ সেবা করেছে, তিনি যেন এখনও এঁদের উপর তাঁর ছাপ রেখে গেছেন। মানবতার কোন স্পর্শ দেখা যাচ্ছে না। কয়েক মিনিট পরে পথ জনশূন্য তবে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে ও সরাইখানায় জন-কোলাহল শোনা যাচ্ছে।

গ্যাস্‌পার সান্টিয়াগোস্—গ্যাস্‌পারন্ বা জোয়ান গ্যাস্‌পার নামে সবিশেষ পরিচিত। চেহারা নামেরই উপযুক্ত। হাসিমাখা মুখ, উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখে বুদ্ধির প্রকাশ আছে, আবার সহৃদয়তা উদারতারও অভাব নেই, স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি, একবার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই মন প্রফুল্ল হোয়ে ওঠে। সকলের শেষে গ্যাস্‌পার ধীরে ধীরে অগ্রসর হোতে লাগ্‌লো, তু'তিনটী গলি পার হোয়ে বড় রাস্তায় উপস্থিত হোল। রাস্তার একধারে যেখানে একটী সুপ্রাচীন বটগাছ তার ডাল-পালা চারদিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারই ছায়ায় গাছের গুঁড়ির নীচে একজন নারী একটী শিশুকে কোলে নিয়ে বসে ছিল, মুখে তার একাগ্র প্রতীক্ষার ভাব, সাম্‌নে সুন্দর একটী ছোট কুকুর। গ্যাস্‌পারকে দেখে এই অবোলা প্রাণীটি আনন্দ-ধ্বনি করে উঠ্‌তেই তার দৃষ্টি এদিকে ফিরে এল, তখনই অতি সুমিষ্ট হাসি খেলে গেল তার মুখে—বড় সুখের ও তৃপ্তির হাসি। শিশুটীও হাত বাড়িয়ে দিল নবাগতের দিকে। গ্যাস্‌পারের বহুক্ষণের ক্লান্তি যেন এই স্নেহের স্পর্শে ঝরে গেল, হেসে সবাইর সম্ভাষণ স্বীকার করে সে ঐ এতটুকু গুঁড়ির উপরই বসে পড়লো। একহাতে নিল শিশুটীকে, অন্য হাতে কুকুরটীকে আদর করতে লাগ্‌লো।

সাম্‌নে ছোট একটী বাস্কেট, স্ত্রী ক্ষিপ্র হস্তে সেটা খুলে গ্যাস্‌পারের সাম্‌নে খাবার সাজিয়ে দিল, বেশী কিছু নয়, দিনমজুরের সামান্য খাদ্য। গ্যাসপারও তার সদ্ব্যবহার আরম্ভ করে দিল।

এই খাবারের ফাঁকে ফাঁকে চল্‌লো তাদের কথা—সারাদিনের আলাপ। কারখানা-জীবনের বড় মূল্যবান্ বিশ্রাম সময়, কিন্তু শেষ ঘনিয়ে আস্‌তে দেরী হয়না। গ্যাসপার শুনে চলেছে, শিশুটীর কলকণ্ঠের অর্থহীন কাকলী, স্ত্রীর দৈনন্দিন ইতিহাস, আর মাঝে মাঝে আলস্যবিজড়িতকণ্ঠে তার উত্তর দিচ্ছে। কারখানার নির্মম ঘণ্টা বেজে উঠ্‌লো তারও সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল। কুকুরটীকে দু'একটুক্‌রো রুটীর খণ্ড দিয়ে, শিশুটীকে আদর করে গ্যাস্‌পার উঠে দাঁড়াল, কৃপণের ধনের মত স্ত্রীকে আলিঙ্গন কোরে' দ্রুতপদে এগিয়ে চল্ল কারখানার দিকে। আর দেখা হবে রাত্রিতে, কে জানে যন্ত্র-দেবতা এই দীর্ঘ সময় কি ব্যবহার করেন! যাদের স্বামী এই যন্ত্রদেবতার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করে, তাদের হৃদয়ে শান্তি নেই, প্রতিটী মুহূর্ত্ত চিন্তায় আশঙ্কায় পূর্ণ থাকে। তবুও কাউকে ধরে রাখার উপায় নেই। এই যন্ত্রদেবতাকে অস্বীকার কোরলে বর্তমানযুগে অন্ন জোটে না, যুগ-মাহাত্ম্যে সংসার অচল হোয়ে ওঠে।

আবার সেই তোরণ-দ্বার পার হোয়ে গ্যাস্‌পার চলেছে, সেখানেও আবার পূর্ব্বদৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। বিভিন্ন মুখ থেকে জনস্রোত এসে মিলিত হোল এবং বিনা বাক্যে অল্প সময়ের মধ্যে যে যার কাজে লেগে গেল, কোন কথা নেই, কারো হুকুম দেবার দরকার হচ্ছেনা, কেও অন্যদিকে তাকাবারও প্রয়োজন মনে করছে না, তাদের অনুপস্থিতির সময়ে কি হোয়েছে, তা জান্‌তে কৌতূহল নেই, সবই জানা, একনিয়মে একটানা সুরে সব চলেছে, যে যেখানে ছিল, সেখানে এসে একই নিয়মে কাজ আবার আরম্ভ করে দিল। কলের কাজ কারো প্রশ্ন বা উত্তরের অবকাশ রাখে না।

গ্যাসপার একটী বড় ঘর পার হোয়ে গেল, তার উপরে নীচে স্তূপাকৃতি লৌহ, ভিতরে সগর্জ্জনে এঞ্জিন চলেছে, ধূম, ধূলা, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এর ভিতর দিয়েই সে চলেছে। কারখানায় এই ঘরটির মত আর একটী ঘর সামনেই আছে, দুই ঘরের মাঝে যোগাযোগ রেখেছে একটী সরু সেতু। তার পাশেই বিরাট এই চক্র অত্যন্ত তীব্রগতিতে ঘুরে চল্‌ছে। গ্যাস্‌পারের কাজ এই শেষের ঘরটীতে, সে সেতুর মাঝামাঝি এসেচে, এমন সময় অকস্মাৎ একটী তরুণশিক্ষানবীশ ভূত তাড়িতের ন্যায় তার দিকে ছুটে এল, প্রাণভয়ে যেন দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হোয়ে চলেছে, গ্যাস্‌পারকে দেখেও গতি শ্লথ করতে পারেনি। গ্যাস্‌পার নিজেকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত করে একপাশে এসে দাঁড়ালো, সামনে কোনমতে যাবার একটু রাস্তা রইল, কিন্তু ছেলেটী গ্যাস্‌পারের উপর এসে পড়্‌লো। তার দেহে বাধা পেয়ে লম্বাহয়ে প'ড়ে গেল, মাথা বাইরে ঝুঁকে পড়্‌লো। গ্যাস্‌পারও তাকে ধরে উঠাতে চেষ্টা করলো কিন্তু আতঙ্কে ছেলেটী এমন ভাবে তার একহাত জড়িয়ে ধরে টান দিল যে সে তাল সামলানো গ্যাসপারের পক্ষে অসম্ভব হোল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য অন্য হাতে চক্রের পাখী ধরে ফেলেছে, কিন্তু ঘূর্ণায়মান সেই চক্রের গতিতে হাত মড় মড় শব্দে ভেঙে গেল। এ মরণাধিক যন্ত্রণাতেও গ্যাস্‌পার আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হোল না, বালকটীকে এক-হাতেই ধরে ওধারে পৌছে দিল ও তারপরই সেখানে মূর্চ্ছিত হোয়ে পড়ে গেল।

গ্যাস্‌পার হাসপাতালে, তার ডানহাতখানা সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হোয়েছে। চিকিৎসায় গেছে সঞ্চিত পুঁজি, বন্ধুবান্ধবের সংগৃহীত অর্থ ও ধর্ম্মঘটীদের সাহায্যভাণ্ডারের দান। সর্ব্বশেষে গেছে গৃহের মূল্যবান আস্‌বাব ও বস্ত্রাদি। অর্থহীন, কর্ম্মহীন, বিকলাঙ্গ, এমন কত লোক কারখানার কাজে পঙ্গু হয়, তাদের হিসাব কে রাখে, তাদের দিন চলার ভার কে নেবে, তার কোন উত্তর কোথাও নেই।

প্রায় দেড়মাস পরে কারখানার আফিস-গৃহের জানালায় দেখা গেল গ্যাস্‌পারের স্ত্রীকে, স্বামীর প্রাপ্য বেতন নিতে এসেচে। ছোট ঘর, সাম্‌নে খাজাঞ্চি বসেচে, এক ভদ্রলোক সংবাদপত্র পড়ছিলেন, তাঁর প্রতি সকলের সসম্ভ্রম ব্যবহার দেখে তাঁকে কর্ত্তাস্থানীয় মনে হয়। দু'জন কর্ম্মচারী প্রকাণ্ড দু'খানা খাতা খুলে হিসাবে নিবিষ্ট। গ্যাসপারের স্ত্রী এসে দাঁড়াতেই সবাই মুখ তুলে তাকালেন। কেরাণী তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি চাও? অন্য কেরাণীটি গ্যাসপার ও তার স্ত্রীকে চিন্‌ত, সে সদয় ভাবে জিজ্ঞেস করল—গ্যাসপার কেমন আছে? তোমাদের চল্‌ছে কি করে?

প্রথম কেরাণী—আর চলা! একহাতে কাজ করে মানুষের জীবন যেমন চল্‌তে পারে। গ্যাস্‌পারের এ অবস্থার কথা মানুষের কল্পনার অতীত ছিল, এমন শক্তি সাহস ও স্বাস্থ্য, হঠাৎ কি হোয়ে গেল। তা তুমি কি চাও?

গ্যাস্‌পার-স্ত্রী ভগ্ন স্বরে বলল, তার বাকী বেতন নিতে এসেছি। কেরাণী খাতাপত্র দেখে বল্‌ল তার পূর্ব্বসপ্তাহের বেতন কি সে নিয়েছে?

স্ত্রী—"হ্যাঁ,"

এতক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটী সংবাদপত্রখানা রেখে দিয়ে সোজা হোয়ে বস্‌লেন, গ্যাস্‌পারের স্ত্রীর কাতরতা পূর্ণ কণ্ঠস্বর তার চেতনা জাগাতে পারেনি, সেদিকে তাকাবার প্রয়োজনও নেই।

তিনি কর্ম্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেন "গ্যাস্‌পার কবে আহত হোয়েছে?" কর্ম্মচারী উত্তর দিল "গত মাসের বিশ তারিখে, বুধবার দিন দু'টোর সময়।"

ভদ্র লোক উত্তর দিলেন "তাহোলে তো বেশী কিছু হিসেব করারই নেই, পূর্ব্ব সপ্তাহের বেতন নেওয়া হোয়ে গিয়েছে, সুতরাং সোম, মঙ্গল দু'দিন ও বুধবারের অর্দ্ধদিন—মোট আড়াই দিনের বেতন পাওনা আছে, বেশ ওকে এই হিসেবের প্রাপ্য বুঝিয়ে দাও।"

কর্ম্মচারী বিনাবাক্যে গুণে গুণে সামান্য মুদ্রাক'টী তাকে দিয়ে দিলেন। গ্যাস্‌পারের স্ত্রী নীরবে হাত বাড়িয়ে নিল ও অশ্রুরোধের বৃথা চেষ্টা করতে করতে আফিস-গৃহ থেকে বের হোয়ে গেল। তার পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে না যেতেই ভদ্র লোকটী কর্ম্মচারীকে আদেশ দিলেন, 'গ্যাস্‌পারসন যে তারিখে আহত হোয়েছে, সেদিন থেকেই তার কাজ গেছে, খাতায় তার কর্ম্মচ্যুতির তারিখটা লিখে রাখ এবং সে এখন আর এই কারখানার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে না, তাও তাকে জানিয়ে দিও।' তিনি পুনরায় কাগজ খুলে বস্‌লেন। গ্যাস্‌পারের স্ত্রী এসে ক্ষণিকের জন্য যে

আলোড়ন তুলেছিল, তা আবার নিভে গেল। কেরাণীদ্বয়ের সহানুভূতির কোন মূল্য নেই আর্থিক হিসাবে, কিন্তু তবু একই কারখানায় সহকর্ম্মীহিসাবে গ্যাস্‌পারের দুরবস্থায় তারা ব্যথিত না হোয়ে পারল না। যদিও ভদ্রলোকটীর বাক্যের তীব্রতার কারণ স্পষ্টরূপে বোঝা গেল না।

গ্যাস্‌পারের কর্ম্মচ্যুতির কথা চারিদিকে বন্ধু ও সহকর্ম্মীমহলে ছড়িয়ে পড়লো—ক্ষতিপূরণের কথা নেই, ভবিষ্যতের কোন ব্যবস্থা নেই, কারখানার কাজেই অঙ্গহানি, আবার সেজন্যই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হোল। এত অবিচার যেন তাদের ক্ষিপ্ত করে তুল্‌লো, যে কারখানার উন্নতিতে তারা স্বাস্থ্য, সময় ও শ্রম নিঃশেষে দিচ্ছে, এমন এক কথায় সে বিপদের দিনে তাদের ত্যাগ করবে? আজ গ্যাসপারসনের দুর্দ্দশা হোয়েছে, কে জানে কার ভাগ্যে কি ঘটে। এখানে সেখানে ছোট খাট দল বসে গেল—প্রতিকার চিন্তায়, অবশেষে সভা আহ্বান করা হোল—সব বিভাগের প্রতিনিধি মিলিত হোয়ে এবিষয়ে আলোচনা করবে। গ্যাস্‌পারসন্‌ও উপস্থিত থাকবে। নির্দ্দিষ্ট দিনে সভার কাজ আরম্ভ হোল, গ্যাসপারসন সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হোয়ে তার দুর্ভাগ্যের কথা বলে গেল। সে দুর্ঘটনার কথা কারো অবিদিত নেই, কিন্তু এই হস্তহীন হতভাগা বিশালবপু নিয়ে যখন মঞ্চে আরোহণ করলে এমন কেউ ছিল না যে অশ্রু সম্বরণ করতে পারে। গ্যাস্‌পারসন বলে গেল—তার সুস্থ সবল দিনগুলির কথা—কি অপরিসীম পরিশ্রম স্বীকার করেছে কারখানার কাজে, তার স্বল্প অবসরযুক্ত দিনগুলির বৈচিত্রহীন একটানা কাজের ধারা। এগুলি শুধু তারই নয়, প্রত্যেকেরই কথা, এ চিত্রে সকলে নিজেদের জীবন যেন প্রতিফলিত দেখছে। এই তো তাদের জীবনের সত্যিকার রূপ, কাজ শুধুই কাজ, আনন্দ তো মালিকদের প্রাপ্য, তাদের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের দীনতম ব্যবস্থা, তাও মিলে না জীবনের দুর্য্যোগতম মুহূর্ত্তে। সকলে সনিঃশ্বাসে শুনতে লাগ্‌লো—গ্যাস্‌পারসন্ বলে চললো—তার চরম দুর্ভাগ্যের শেষ কথা কটী। তার বলার মধ্যে দ্বেষ ছিল না, যেন সে বলে চল্‌ছে অন্যের কথা—একটী সাধারণ ঘটনা মাত্র। কিন্তু জনমণ্ডলী উত্তেজিত হোয়ে উঠ্‌ল। এখানে সেখানে গুঞ্জন শোনা গেল, বাদ প্রতিবাদের মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটী উচ্চস্বরও কর্ণগোচর হয়। হঠাৎ বয়োবৃদ্ধ একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠ্‌লো, "সইবো না, আমরা এমন অবিচার আর নীরবে সইবো না, অক্ষমদের, বৃদ্ধদের জন্য—যাদের একাজে অঙ্গহানি ঘটেছে, তাদের জন্য মালিকদের ব্যবস্থা করতেই হবে। সারা জীবন আমরা এরজন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে শেষে অকর্ম্মণ্য হোয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াব দু' মুঠো অন্নের জন্য, তার প্রতিকার করতে হবে,—আমরা জোর করেই অধিকার আদায় করব।"

অপর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—না, না, আমরা কারখানার সব যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে দেব আমাদের হাতেই তো সব, সব নষ্ট হোলে কারখানাই অচল হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি—'আমরা চাই, দৈনিক আট ঘণ্টার কাজ, তার বেশী নয়।'

"ঠিক, ঠিক দৈনিক আট ঘণ্টা, দিনে আট ঘণ্টার বেশী নয়।" জনতা গর্জ্জন করে উঠ্‌লো "মাইনে বাড়াতে হবে, ইউনিয়নের নির্দ্দিষ্ট হারে মাইনে বাড়াতে হবে।"

"কিন্তু জিনিষের দাম বাড়াতে পারবে না, ট্যাক্স বাড়াতে পারবে না।"

গোলমাল বেড়েই চল্‌লো, কি মীমাংসা হবে, কেউ বোঝে না, কারো কথা আর কেউ শোনে না, এমনি ভাবেই কি মজুরদের সভার কাজ শেষ হবে? অকস্মাৎ শূন্য মঞ্চের উপর কে একজন আরোহণ করছে দেখা গেল, সকলে সেদিকে তাকাল। সে দুহাত উত্তোলন করে বলে উঠ্‌লো, "ভাই সব এ আবেদনে কিছু ফল হবে না—আমাদের রিক্তহস্তে-ই ফিরতে হবে। দুঃসাহস না দেখালে দুর্লভ ফল আমাদের হাতে আসবে না। বরং আমার প্রস্তাব শোন। আমার জানা তিনটী ডিনামাইটের ঘর আছে। চল আমরা মালিকদের ঘর তা দিয়ে উড়িয়ে দিই, কারখানা উড়িয়ে দিই, যার সাহস আছে এগিয়ে এসো, আমরা কাজ আরম্ভ করে দেব। ধ্বংস ব্যতীত আমাদের মুক্তির পথ নেই, ওদের নির্ম্মূল করে দেব।"

প্রস্তাবের ভয়ঙ্করত্ব যেন সকলকে নির্ব্বাক্ করে দিল। সবাই ভয়ে স্তব্ধ হোয়ে গেল, শাস্তির ভয় না, অন্যায় কাজের ভয়? তবু প্রতিবাদ নেই, অন্তরের অন্তরে সকলেই প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে চাইলো। তাদের অনুচ্চারিত বাণী যেন সভা মণ্ডপ ঘিরে রইল। এতদিনের প্রকাশ হীন ব্যথার মুক্তি অনভ্যাসে আজ কথায় প্রকাশ হোতে পারলো না।

গ্যাসপার হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, দৃঢ় পাদবিক্ষেপে মণ্ডপের উপর গেল—তেজোব্যঞ্জক মুখ, রেখায় রেখায় আত্ম-প্রত্যয়, এ ব্যাপারটি যে তাকে ঘিরেই হচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি নেই, অতি স্বাভাবিক ভাবেই বলে উঠ্‌ল "তোমরা কি চাও ধর্ম্মঘট, হত্যা, লুণ্ঠন, এতে কি অবস্থার উন্নতি হবে? আমরা কোথায় থাকব? বিধবা অনাথদের অর্থ সাহায্য ও পেন্সন? ধর্ম্মঘট করলে আবার নতজানু হোয়ে এদের কাছেই কৃপাভিক্ষা করতে হবে যখন আমাদের শেষ সম্বল ফুরিয়ে যাবে। ডিনামাইট দিয়ে কারখানা উড়িয়ে দিতে চাও, মালিকদের ধ্বংস চাও এ শুধু কাপুরুষের কাজ, হত্যা ও লুণ্ঠনের মাঝে সাহসের পরিচয় কোথায়? তবে প্রতিশোধ চাও, প্রতিশোধের এ পন্থা ত্যাগ কর, তোমাদের হোয়ে আমি এমন প্রতিশোধ নেব, যা কেউ সহজে ভুলতে পারে না।

সভায় মৃদু প্রতিবাদ উঠলো, কিন্তু গ্যাস্‌পারের কথায় এমন আন্তরিকতা প্রকাশ পেল, তাকে কেউ অবিশ্বাস করতে পারলো না। তার উপর প্রতিশোধ নেবার ভার দিতে কারো আর দ্বিধা রইলো না।

পরদিন দেখা গেল গ্যাস্‌পার ভিক্ষার জন্য হস্ত প্রসারিত করে বসে আছে, কারখানার গেটে। গলায় ঝোলানো একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠ খণ্ড—তাতে লেখা আছে "ডন মাটিন পেনালভার কারখানার বিকলাঙ্গ"। দিনের পর দিন তার এভাবে যায়। তারই শ্রমার্জ্জিত অর্থে যারা পুষ্ট হোয়েছে, তাদের সম্মুখে নিজ দুর্ভাগ্যখানি সে তুলে ধরে। মালিকগণের শত আদেশ, অনুরোধ, ভয় প্রদর্শনেও সে স্থান-ত্যাগে সম্মত হয় না। যন্ত্র রাজের পূজারীদের পীড়নের সাক্ষী হোয়ে রইলো তারই দ্বারে এক অত্যাচারিত মানব। *

---

* Jacinto Octavio Picion হইতে অনুবাদিত।

শ্রাবণ মেঘের অন্ধকারে

শ্রীবাণী মিত্র

যে সুর আমারি হারিয়েছিল
শ্রাবণ-মেঘের অন্ধকারে—
শুনছি যেন আজকে তাহা
বাজছে তোমার ছন্দতারে।

সেদিন ছিল এমনি নিশা
আঁধার ঘোরে ঘুমিয়ে দিশা
বাতাস ছিল মাতাল হয়ে
বন-যূঁথিকার গন্ধ ভরে।

সুর যে আমার হারিয়েছিল
শ্রাবণ-মেঘের অন্ধকারে!

আজকে তোমার দুয়ার দিয়ে
বন-যূঁথিকার গন্ধ আসে,
বাতাস যেন উতল হয়ে
ঘোরে তোমার ঘরের পাশে!

উদাস-করা তোমার গানে
আঁখি আমার ঘুম না জানে
দুয়ার খোলো হে প্রিয়তম,
দাঁড়িয়ে আমি বন্ধ দ্বারে—
সুরের টানে এলেম আজি
শ্রাবণ-মেঘের অন্ধকারে

জাতীয় আন্দোলনের ধারা

শ্রীআত্রেয়ী মিত্র

১৯৩০-১৯৩৮

১৯৩০ সালে যখন সমগ্র ভারতে অত্যাচার ও উৎপীড়নে জন আন্দোলনের কণ্ঠরোধ করবার প্রয়াস চলেছিল সে সময় ইংলণ্ডে ভারতের ভাগ্য নিয়ে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রহসন অভিনীত হ'চ্ছিল। দেশের যাঁরা নেতা, যাঁরা তাঁদের জীবন পণ করে দেশের অন্তরে চেতনা সঞ্চার করেছেন—তাঁরা কারাগারে আবদ্ধ হয়ে রইলেন। তাঁদের পরিবর্ত্তে মুষ্টিমেয় রিফর্মিষ্ট লিবারেল ও কম্যুনালিষ্ট ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য ইংলণ্ডে উপস্থিত হলেন। ১৯৩০এ ১২ই নভেম্বর ৮৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে গোল টেবলের প্রথম অধিবেশন হ'ল। এই বৈঠকে মিষ্টি কথার অভাব ঘটেনি। ভারতকে স্বায়ত্ত্বশাসন দেওয়া হবে, ব্যবস্থাপক সভাকে আইনসভার কাছে দায়ী থাকতে হবে এসবই স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'ল। কিন্তু এ সবের ভিতরে একটা মস্ত কিন্তু র'য়ে গেল। ব্রিটীশ গভর্নমেন্ট তার স্বার্থে বিন্দুমাত্রও হানি ঘটতে দেবেনা। তাই সংখ্যালঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষার ধুয়া তুলে নানারকম Safeguards এবং Resrevation সৃষ্টি করে মূল ক্ষমতাটাকে তাদের হাতেই রেখে দিল। অনেক চুলচেরা আলাপ আলোচনা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষকে কার্য্যতঃ প্রকৃত স্বাধীনতা কিছুই দেওয়া হ'লনা।

১৯৩১এ ২১ জানুয়ারী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটী বিশেষ প্রস্তাবে (Resolution) বলা হ'ল, যে বৈঠকে দেশের মতামতকে অগ্রাহ্য করা হ'য়েছে সে বৈঠকের সিদ্ধান্তকে আমরা কিছুতেই স্বীকার ক'রবনা। কংগ্রেস তার আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন করতে সম্মত হ'লনা! এক বৎসর পূর্ব্বে লবণ আইন অমান্যকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী যে আন্দোলনের সূত্রপাত হ'য়েছিল দীর্ঘকাল কঠোর সংগ্রামের পরেও দেশের নরনারী কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে সে আন্দোলনকেই জাগিয়ে রাখলো।

গোল-টেবল বৈঠকে কংগ্রেসকে অস্বীকার ক'রলেও, কেবলমাত্র উৎপীড়নে যে দেশের চেতনাকে গলাটিপে মেরে ফেলা যায় না, সে বোধ বোধহয় ব্রিটীশগভর্ণমেন্টের হ'য়েছিল। তাই কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কয়েকদিন পরেই গভর্ণরজেনারেলের এক বিবৃতি বের হ'ল। তাতে কংগ্রেসের মতামত জানবার জন্য গভর্ণমেণ্ট Working committeeর সমস্ত সদস্যগণকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিলেন।

এই সময়ে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁর এলাহাবাদ বাসভবনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। সদ্যমুক্ত নেতাগণ আনন্দভবনে সমবেত হ'লেন। ইতিমধ্যে গোলটেবলের ভারতীয় সদস্যগন দেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। তাঁরাও কংগ্রেসকে গভর্মেণ্টের সঙ্গে একটা মীমাংসা করবার জন্য প্রার্থনা জানালেন। গভর্মেণ্ট ও কংগ্রেসের ভিতর একটা আলোচনা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কোন্ পক্ষ থেকে আহ্বান আসবে কিছুতেই তা স্থির হ'চ্ছিল না।

গান্ধীজী তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্য ও শান্তিপ্রিয়তার উদাহরণ দেখিয়ে তখনকার গভর্ণর জেনারেল লর্ড আরুইনের নিকট আলোচনার সূত্রপাত করে পত্র দিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজীকে একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা হ'য়েছিল। তিনি কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে ১৭ই ফেব্রুয়ারী গভর্ণরজেনারেলের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ ক'রলেন। আপোষের উপক্রমণিকা হিসেবে দীর্ঘকাল যে তর্কবিতর্ক চলেছিল তার বিশদ ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। আলোচনার ফলে উভয় পক্ষ যে বিশেষ সর্ত্তগুলি মেনে নিয়েছিল সেগুলিই উল্লেখযোগ্য।

গোল-টেবল বৈঠকে ভারতের যে নূতন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা হ'য়েছে সে পরিকল্পনায় কংগ্রেসের মতামত জানতে হ'লে দেশে একটী শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করা প্রয়োজন একথা উভয়পক্ষই স্বীকার ক'রল! ঠিক হ'ল কংগ্রেস তার অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেবে এবং গভর্মেণ্টও এইসম্পর্কে যতরকম অর্ডিনান্স ও আইনজারী করেছে তা রদ ক'রবে। শুধু তাই নয়, অহিংসা আন্দোলনের বন্দীদেরও মুক্তির ব্যবস্থা হ'ল। এবং এই আন্দোলনে যেসব প্রজাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'য়েছে এবং যে সব জায়গায় অন্যায়রকম পুলিশের উৎপীড়ন হ'য়েছে তার প্রতিকারের জন্যও গভর্মেণ্ট স্বীকৃত হ'ল। যে লবণ-আইন অমান্য নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত সেই সম্পর্কে গভর্মেণ্ট ব'ললে দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় এই আইন পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। তবে যেখানে লবণ প্রস্তুত হয় সেখানকার অধিবাসীগণ বিনা ট্যাক্সতেই লবণ নিতে পারবে। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ নিজেদের ব্যবহারের জন্য। এই লবণ তারা অন্য কোন গ্রামের অধিবাসীদের দিতে পারবেনা বা এনিয়ে ব্যবসাও ক'রতে পারবেনা।

পরিশেষে গভর্মেণ্ট ব'ললো যদি কংগ্রেস তার সর্ত্ত রক্ষা করতে অসমর্থ হয় তাহ'লে গভর্মেণ্ট আইন ও শান্তিরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবে।

এই আপোষে বহুবিধ ত্রুটী থাকা সত্বেও কংগ্রেস এটা গ্রহণ ক'রল। দেশকে ক্লেশ দেওয়াই তার লক্ষ্য নয়। দেশকে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার ও অবিচার থেকে মুক্তি দেবে এই তো তার পণ। প্রয়োজন হ'লে সংগ্রাম ক'রতে সে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু এই ক্লেশ হ্রাস ক'রবার যদি সত্যিই কোন উপায় থেকে থাকে তাহ'লে সে উপায় পরীক্ষা করতেও কংগ্রেস নারাজ নয়।

কংগ্রেস তার সর্ত্ত রক্ষায় ত্রুটী করেনি। কংগ্রেসের নির্দ্দেশ সমগ্র দেশবাসী যেমন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিয়েছিল তা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু গভর্মেণ্টের ব্যবহার সর্ত্তানুযায়ী হবার লক্ষণ দেখা গেলনা। এই আপোষের আলোচনার সময় গান্ধীজী লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় মৃত্যুদণ্ডে

দণ্ডিত অপরাধী ভগৎসিং ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের মৃত্যুদণ্ড রহিত করবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। লর্ড আরুইন প্রতিশ্রুতি না দিলেও এ সম্বন্ধে বিশেষ আশার কথাই ব'লেছিলেন। কিন্তু আপোষের পরে মৃত্যুদণ্ড রহিত করা হ'লনা। করাচী কংগ্রেসের অল্প পূর্বেই এই তিন যুবকের মৃত্যুতে সমগ্র ভারত চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। এদের সন্ত্রাসনীতি কংগ্রেস কখনও সমর্থন করেনি। কিন্তু নীতি সম্বন্ধে যত মতভেদই থাক না কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে এরা যে জীবন আহুতি দিতে দ্বিধা বোধ করেনি তাদের সে আহুতিকে দেশবাসী শ্রদ্ধা না ক'রে পারেনা। গভর্মেণ্ট যে কংগ্রেসের সঙ্গে যথার্থই একটা আপোষ ক'রতে প্রস্তুত এদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করে দিলে সে ইচ্ছেটাই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ত। কিন্তু ঠিক তার উল্টো ঘটনা ঘটতেই দেশের চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। ভগৎসিংএর মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর একটী ঘটনাও এসময় অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি ক'রেছিল। ভগৎসিংএর মৃত্যুতে ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ ক'রবার জন্য সমগ্র ভারতে বিশেষ দিবস প্রতিপালন করা হয়। কাণপুরেও সে সময় হরতাল হয়। এই হরতাল উপলক্ষ্য করেই হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর সেখানে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলে উঠল। এই আগুনে যুক্ত প্রদেশের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী তাঁর জীবন অর্পণ ক'রলেন। কাণপুরের ভয়াবহ অবস্থার এ খবর যখন চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ল, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। কিন্তু গভর্মেণ্টের পক্ষ থেকে জাতির এই দুর্দ্দিনে যথোচিত সাহায্য পাওয়া গেলনা। একথা এখানে উল্লেখ ক'রলে অন্যায় হবেনা যে কাণপুরের হাঙ্গামা সম্বন্ধে তদন্ত ক'রবার জন্য কংগ্রেস এক কমিটি গঠন করে। সেই কমিটীর রিপোর্টে হয়তো অনেক অপ্রিয় সত্য ছিল তাই গভর্মেণ্টের কাছ থেকে সে রিপোর্ট প্রকাশের অনুমতি পাওয়া যায় নি। গভর্মেণ্টের বৈরীভাব দূর না হলেও কংগ্রেস তার প্রতিজ্ঞা-পালনে অবহেলা করে নি। অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ অন্তরেই গান্ধীজীকে গোলটেবল বৈঠকে পাঠাবার প্রস্তাব করাচী কংগ্রেসে সকলেই গ্রহণ করেছিল।

কংগ্রেস আপোষের চুক্তি অনুযায়ী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করে দিল। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে ব'লেছেন "আপোষের পরেই আমরা সমস্ত ভারতবর্ষে অসহ-যোগ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার জন্য নির্দ্দেশ দিই। সমস্ত প্রতিষ্ঠানটী অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতার সঙ্গে আমাদের সে নির্দ্দেশ গ্রহণ করেছিল। আমাদের দলে অনেকের নিকটই আমাদের এ সিদ্ধান্ত মনঃপূত হয় নাই, আমাদের দলে সংগ্রামকামী লোকেরও অভাব ছিল না। এবং তাদের উপর আমাদের ইচ্ছা জোর করে চাপাবার কোনই উপায় ছিলনা। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ আমা-দের এই নতুন কার্য্য-প্রণালী একবাক্যে মেনে নিল। অনেকে এই সিদ্ধান্তের দোষ ত্রুটী নিয়ে আন্দোলন করেছে। কিন্তু আদেশ সকলেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিল। কোথায়ও ব্যতিক্রম ঘটে নি। গভর্মেণ্টের ব্যবহারে ঠিক এর বিপরীত মনোভাবই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠল। গভর্ণরজেনারেল গান্ধীজীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট সে প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করতে কোনই তৎপরতা দেখালো না। ১৭ই এপ্রিল লর্ড আরুইনের পরি-

বর্ত্তে লর্ড উইলিংডন শাসনভার গ্রহণ ক'রলেন। এই সঙ্গে ব্রিটীশ গভর্মেণ্টেরও চালের বদল হ'ল।

বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বাঙ্গলা, মাদ্রাজ বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অত্যাচার ও উৎপীড়নের কাহিনী কংগ্রেসকে বিচলিত করে তুলল। সন্ত্রাসবাদের নামে যে উৎপীড়ন চলেছিল সেইটে বাদ দিলেও কংগ্রেসের উপরও কিছু কম অত্যাচার হয়নি। এই অবস্থায় গান্ধীজী গোলটেবল বৈঠকে যেতে অস্বীকৃত হ'য়ে গভর্ণর জেনারেলের নিকট সেই মর্ম্মে এক তার প্রেরণ ক'রলেন। কিন্তু তার কোন সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর এলনা। বরঞ্চ গভর্মেণ্ট ও কংগ্রেসের ভিতর মনোমালিন্য আরো বর্দ্ধিত হ'ল। ১৫ই আগষ্ট Sapru, Jayakar এবং Rangaswami Iyegnar ইংলণ্ড যাত্রা ক'রলেন। কংগ্রেস গোলটেবল বৈঠকে উপস্থিত থাকতে অস্বীকৃত হওয়াতে গভর্মেণ্ট এটাকে চুক্তিভঙ্গ ব'লেই গণ্য করলেন। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক শেষ মুহূর্ত্তে একটা মিটমাট হ'য়ে গেল। গভর্মেণ্ট আগেকার সর্ত্ত মেনে নিতে স্বীকৃত হওয়াতে ২৯শে আগষ্ট গান্ধীজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ড যাত্রা ক'রলেন।

গোলটেবল বৈঠকের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দেশবাসীর কখনই আস্থা ছিলনা। কিন্তু এ বৈঠক যে কতবড় মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত সেটাও তারা পূর্ব্বে ভালো করে বুঝতে পারে নি। কংগ্রেস কেবলমাত্র গান্ধীজীকে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল, কারণ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায় খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা সে ক'রতে চায়নি। সে চেয়েছিল রাষ্ট্রগঠনের মূল ক্ষমতায় ভারতের দাবী জানাতে এবং সে দাবী গান্ধীজীর মতো স্পষ্ট ও সুন্দর করে ব্যক্ত করতে আর কে পারতো। গান্ধীজী ভারতের জাগরণ, সংগ্রাম ও তার আকাঙ্ক্ষার কথা সমস্তই অকপটে প্রকাশ ক'রলেন। কিন্তু তাতে Safeguards ও Reservationএর কোন পরিবর্ত্তন হ'লনা। বিদেশের সঙ্গে আদান প্রদান, দেশরক্ষার ভার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের দাবীদাওয়া রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এ সমস্ত বিষয়েই ব্রিটীশ সাম্রাজ্যনীতিকেই মেনে চ'লতে হবে। যেখানে পূর্ব্ব হ'তেই সমস্ত স্থির হ'য়ে আছে সেখানে কংগ্রেসের মতামত জানতে চাওয়া ভাণমাত্র। এ কেবল রাজনীতির একটা চাল।

১লা ডিসেম্বর বৈঠকের শেষ অধিবেশনে গান্ধীজী ব'ললেন, "তোমরা আমাকে বিশ্বাস ক'রছ, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে আমি এসেছি সে প্রতিষ্ঠানকে তোমরা উপেক্ষা ক'রছ। মুহূর্ত্তকালের জন্যও কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আমাকে তোমরা দেখোনা। বিশাল সমুদ্রে আমি জলবিন্দু মাত্র, সেই বিশাল প্রতিষ্ঠানের আমি একটী ক্ষুদ্র অঙ্গ। যদি আমাকে তোমরা গ্রহণ করো তাহ'লে সেই প্রতিষ্ঠানকেও তোমাদের গ্রহণ ক'রতে হবে। কংগ্রেস আমাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়েছে সেটুকু ছাড়া আমার আর কোন ক্ষমতা নাই। যদি কংগ্রেসের সঙ্গে তোমরা সত্যিই মিলতে চাও তা'হলে তোমাদের সন্ত্রাসনীতি পরিত্যাগ ক'রতে হবে; সে নীতির তোমাদের প্রয়োজনই হবেনা। ভারতের অবস্থার প্রতি তোমরা অন্ধ ব'লেই আজ তোমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সন্ত্রাসনীতি দিয়ে ভারতের সন্ত্রাসবাদীদের দমন ক'রতে হচ্ছে। কিন্তু এই সন্ত্রাসবাদীরা তাঁদের

রক্ত দিয়ে যে কথা লিখে গেল তার অর্থ কি তোমরা কোনদিনই বুঝতে চাইবেনা। কেবল মাত্র খাওয়া পরাইতো আমাদের লক্ষ্য নয়—আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা যদি আমরা অর্জ্জন ক'রতে না পারি তাহ'লে দেশের লোক আজ শান্তি পাবেনা, দেশে তাঁরা শান্তি স্থাপন করবেন এই তাদের পণ।"

বৈঠকে যথার্থ কাজ কিছুই হ'লনা। রাজনীতির মিথ্যা চালে ক্লিষ্ট গান্ধীজী ২৮শে ডিসেম্বর দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। এই সময় সমগ্র ভারতবর্ষে গভর্মেণ্টের দমননীতির ভয়াবহতা প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। সমস্ত প্রদেশগুলিতেই তখন Repressionএর পালা চ'লেছে। বারদৌলিতে পুলিশের অত্যাচারের কোন মীমাংসা হ'লনা। যুক্ত প্রদেশে চাষীদের অবস্থা ক্রমেই ভয়াবহ হ'য়ে উঠতে লাগল। গভর্মেণ্ট তাদের অবস্থার কোনই প্রতিকার ক'রলনা। উপরন্তু গান্ধীজীর প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েকদিন পূর্ব্বে জহরলাল, শেরওয়ানি এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন কারাগারে বন্দী হ'লেন।

১৯৩১ সনে সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদমৎগারেরা কংগ্রেস দলভুক্ত হ'য়েছিল। এ সময় এদলের নেতা আবদুল গফুর খাঁ এবং তাঁর ভাই খাঁ সাহেব এঁদেরও বন্দী করা হ'ল।

গান্ধীজী দেশে ফিরে বিলেতে যে প্রহসন দেখে এসেছেন সেকথা জানালেন। দেশের অবস্থাও তাঁকে শোনানো হ'ল। যে আপোষের সর্ত্ত একপক্ষ কিছুই স্বীকার ক'রলনা সে আপোষরক্ষা করা অপর পক্ষের সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি গভর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগ করা সম্ভবপর নয় বলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রল। ১৯৩২এ আবার ১৯৩০এর আন্দোলনের পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হ'ল। এবারে সংগ্রাম আরো কঠোর, অত্যাচার আরো পীড়াদায়ক। ৪ঠা জানুয়ারী গান্ধীজী ও কংগ্রেসের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট বল্লভভাই প্যাটেল ধৃত হ'লেন। সমস্ত প্রদেশগুলিতে ধর্ষণমূলক অর্ডিন্যান্স জারী করা হ'ল, সভা-সমিতি বেআইনী ব'লে ঘোষিত হ'ল এবং সমস্ত ভারত যেন একটী বৃহৎ কারাগারে পর্য্যবসিত হ'ল। আমাদের আন্দোলনের সেই বিশেষ অধ্যায়ের কথা বই প'ড়ে বা বক্তৃতা শুনে জানবার প্রয়োজন নেই। সে দিনগুলি অতীত হ'য়ে গেলেও তার ছাপ আজো আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। পুলিশের লাঠি বা জেলের বেড়ি যে আমাদের দেশের নরনারীকে বিন্দুমাত্র সন্ত্রস্ত করতে পারেনি সে গৌরব আমরা প্রত্যেকেই অনুভব করছি। দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী থেকে এতদিন আমাদের চৈতন্য আচ্ছন্ন হ'য়েছিল। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে আমাদের ভিতর যে মনুষ্যত্ব জাগ্রত হ'য়ে উঠেছে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার শক্তি আজ আর কারুর নেই।

এই দেশব্যাপী আন্দোলনের ভিতর ১৭ই আগষ্ট প্রধান মন্ত্রীর (Communal award) সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষিত হ'ল। এই বাঁটোয়ারার (award)এর মর্ম্ম—সংখ্যালঘুদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য যে পৃথক আসন থাকা প্রয়োজন

সেকথা কেউ অস্বীকার করবেনা। কিন্তু সেজন্য পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী সৃষ্টি করা মানে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ভারতে যে ঐক্য জেগে উঠেছে তাকেই খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে দেওয়া। রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেই awardএর এই ভয়াবহ ফলের কথা অনুমান ক'রে বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লেন। কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এই awardএর মূলকে এমন জায়গায় রোপন করা হ'ল যে সেই বিষমূল আজো উৎপাটন করা সম্ভবপর হয়নি।

কংগ্রেস ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মের সমাবেশ ঘটেছে। কাজেই যেখানে ধর্ম্মের ধ্বয়া তুলে ভেদনীতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চ'লেছে সেখানে সে বিশেষ কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মতকে প্রাধান্য দিতে পারেনা। কাজেই সে বাঁটোয়ারাকে একদল লোক গ্রহণ করতে প্রস্তুত এবং অপর একদল সেটাই বর্জ্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেখানে সে গ্রহণ বা বর্জ্জন এ দুটোর কোনটাই সমর্থন করতে পারেনা। এ দুয়ের ভিতর একটা মিলন সাধন করা ছাড়া তার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে awardকে মেনে নিলেও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদের সম্বন্ধে এর একটা পরিবর্ত্তন হ'ল। অস্পৃশ্যদের অধিকার রক্ষার জন্য হিন্দু-সমাজকেও পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীতে বিভক্ত করা হ'য়েছিল। এর প্রতিবাদকল্পে গান্ধীজী মৃত্যুপণ ক'রে অনশনব্রত গ্রহণ ক'রলেন। সমগ্র ভারত থেকে নেতাগণ গান্ধীজীর নিকট পুনরায় সমবেত হ'লেন, এবং অনশনের পঞ্চমদিনে হিন্দু সমাজের সমস্তদলের ইচ্ছাক্রমে একটা চুক্তি হ'ল। ঠিক হ'ল আইন সভায় অস্পৃশ্যদের পৃথক আসন থাক্‌বে এবং সেজন্য তাদের পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলী থেকে চারজন প্রার্থী নির্ব্বাচন ক'রে দেবে। এবং সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী থেকে তাদের ভিতরই একজনকে নির্ব্বাচন করা হবে। Award এর সর্ত্ত অনুসারে প্রধান মন্ত্রী এই Poona Pact গ্রহণ করলেন।

১৯৩২এ কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হ'য়েছিল। কিন্তু ধরপাকড় বিধি নিষেধের ভিতরেও কংগ্রেসের কাজ বন্ধ হয় নাই। ১৯৩২এ দিল্লীতে এবং ১৯৩৩এ কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের সদস্যগণ অধিকাংশ পথেই ধৃত হন এবং নির্ব্বাচিত সভাপতিগণও অধিবেশনে উপস্থিত হ'তে পারেন নাই। তবু অস্থায়ী সভাপতির নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়। কলিকাতা কংগ্রেসের অল্প কিছুদিন পরেই একটী বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ১৯৩৩, ৮ই মে গান্ধীজী পুনরায় অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। হরিজনব্রত গ্রহনের পূর্ব্বে নিজেকে শুদ্ধীকৃত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এ অবস্থায় তাঁকে কারাগারে বন্দী রাখতে ভীত হ'য়ে গভর্মেণ্ট তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়। হরিজন সেবার জন্য তিনি যে নিষ্কৃতি পেলেন সে নিষ্কৃতি অসহযোগ আন্দোলনের কাজে লাগাতে অনিচ্ছুক হ'লেন। যে আন্দোলনের তিনি সূত্রপাত ক'রেছিলেন মুক্তির পর তিনি সেই আন্দোলন প্রত্যাহার ক'রে নিলেন। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হ'লে এ আন্দোলনের তিনিই পুনরায় সূত্রপাত ক'রবেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হ'ল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রাদেশিক আইনসভার সাহায্যে গভর্মেণ্ট বহুবিধ দমনমূলক আইন পাশ ক'রেছিল। ভবিষ্যতে যাতে এভাবে আইন পাশ না হ'তে পারে এজন্য কংগ্রেস-আইন সভাতে প্রবেশ করা যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে ক'রল। দেশের এক অংশ যখন তাদের সব সুখ সুবিধা ত্যাগ করে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে তখন অপর অংশ যারা এভাবে সব পণ করে বেরিয়ে আসতে পারেনি, তাদেরও চুপ ক'রে থাকলে চলবেনা। এরা যদি আইন সভায় প্রবেশ করে অত্যাচারের মাত্রা লাঘব করতে পারে তাতে দেশের পক্ষেই মঙ্গল। অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই আইনসভাগুলি যে ভারতের কলঙ্কস্বরূপ হ'য়ে উঠেছিল অন্ততঃ সে কলঙ্ক এরা মোচন করতে পারবে। বিশিষ্ট নেতাগণ সকলেই কারারুদ্ধ। মুষ্টিমেয় যে ক'জন কারাগারের বাইরে ছিলেন তাঁদের নেতৃত্বে ওরা মে রাঁচীতে এক কনফারেন্স হয়। সেখানে কংগ্রেস স্বরাজ পার্টী রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি এবং অন্যায় আইন যাতে পাশ হ'তে না পারে তার অনুমোদন ক'রে প্রস্তাব গ্রহণ ক'রল।

১৯৩৪এ কংগ্রেসের অধিবেশন অক্টোবরে বোম্বাইতে হবে বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। তার পূর্বে পাটনায় কংগ্রেস কমিটীর যে অধিবেশন হয় সেখানকার আলোচনার ফলে দেশের আবহাওয়াই বদলে গেল। অসহযোগ আন্দোলন পরিত্যাগ ক'রে অকস্মাৎ আইনসভায় প্রবেশের আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। এ সময়ও একটা ব্যাপার খুবই উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসে গান্ধীজীর প্রভাব সম্বন্ধে গান্ধীজী অত্যন্ত সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন। যখন কোন প্রতিষ্ঠানে বিশেষ ব্যক্তির প্রভাব প্রধান হ'য়ে ওঠে তখন সেই প্রতিষ্ঠানের নিজেকে চালনা করবার শক্তি এবং দায়িত্ববোধ দুই-ই হ্রাস পায়। একথা গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্যদেশে ডিক্টেটরগণ তাঁদের সেই প্রভাব কি ভাবে বর্দ্ধিত করা যেতে পারে সে চেষ্টাতেই ব্যস্ত। কিন্তু গান্ধীজী এই প্রভাবকে হ্রাস করবার জন্য কংগ্রেস থেকে স'রে দাঁড়ান উচিত বলে মনে ক'রলেন। অনেক অনুরোধ ও প্রার্থনা সত্ত্বেও গান্ধীজী স্থির প্রতিজ্ঞ রইলেন। এবং বোম্বে কংগ্রেসে অত্যন্ত দুঃখ কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে গান্ধীজীর পদত্যাগ গ্রহণ করা হ'ল। অবশ্য এজন্য দেশকে হঠাৎ বিমূঢ় ক'রে দেবার তাঁর ইচ্ছে ছিলনা। প্রয়োজন হ'লে উপদেশ ও পরামর্শ দিতে গান্ধীজী যে কুণ্ঠিত হবেন না সেকথা নেতাদের অজানা রইলোনা। এবং তিনি যে সত্যই দেশের নিকট দুর্লভ হ'য়ে ওঠেননি তার প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত আমরা বহুবারই পেয়েছি।

বোম্বে কংগ্রেসের অল্প পরেই কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রবেশের নির্ব্বাচন আরম্ভ হ'ল। এই সময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে উপলক্ষ্য ক'রে কংগ্রেসী দলের ভিতর একটী বিভাগ উপস্থিত হ'ল। কংগ্রেস বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে গ্রহণ বা বর্জ্জন কোন নীতিই অবলম্বন করে নি। কিন্তু কংগ্রেসের ভিতর একটী বিশেষ দল এই বাঁটোয়ারাকে জাতীয়তার প্রতিবন্ধক হিসেবে সম্পূর্ণ বর্জ্জন ক'রল। এই দলই আনে ও মালবাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস জাতীয় দলে নাম নিয়ে নির্ব্বাচন প্রার্থী হল। এখানে বলে রাখা ভালো যে মূল কংগ্রেস দলের সঙ্গে এই বাঁটোয়ারা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাদের মতের

অনৈক্য ছিলনা। বাঙ্গালাদেশেই এই বাঁটোয়ারার সমস্যা সবচাইতে প্রকট হ'য়ে উঠেছিল। কারণ এখানে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাতে নির্ব্বাচনমণ্ডলীতে ভেদাভেদের সৃষ্টি হওয়াতে বাঁটোয়ারার বিষটুকু বাঙ্গালীর ভাগ্যেই প'ড়েছিল, কাজেই বাঙ্গলা দেশে নির্ব্বাচনে মূল কংগ্রেসীদলের অপেক্ষা জাতীয়দলের প্রাধান্য যে বেশী হবে তাতে সন্দেহ নাই।

দেশের অগণ্য নরনারী যেরকম অপূর্ব্ব নির্ভীকতা এবং তৎপরতার সঙ্গে কংগ্রেসের নির্দ্দেশে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাতে কংগ্রেস দেশের মনে যে কি প্রভাব বিস্তার করেছে সেকথা কারুর কাছে ঢাকা ছিলনা। এই সময়তেই আইন সভার নির্ব্বাচনে কংগ্রেসে প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ানোতে তার ভিত্তি যে কত দৃঢ় সেইটে আরো স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেল। কংগ্রেস জাতীয়দল বাদেই ৪৪টী আসন মূল কংগ্রেসের করতলগত হ'ল। ভুলাভাই দেশাইএর নেতৃত্বে আইনসভায় কংগ্রেস একটী বিশেষ স্থান অধিকার ক'রল। এবং পর পর কতকগুলি প্রস্তাবে গভর্মেণ্টের কংগ্রেসের নিকট পরাজয় ঘট্‌ল। স্বাধীন দেশ হ'লে এই পরাজয়ের পরে গভর্মেণ্টকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হ'তে হ'ত। এখানে তার কিছুই হ'লনা। কিন্তু এতে জনমতের অবস্থাটা বোঝা গেল।

কংগ্রেস উপস্থিতমতো তার সংগ্রামের নীতি পরিবর্ত্তন করলেও কংগ্রেসের প্রতি গভর্মেণ্টের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হ'লনা। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ কর্ম্মীরা মুক্তি পেলেও নেতাদের মুক্তি দিতে গভর্মেণ্ট একেবারেই ইচ্ছুক ছিলনা। প্যাটেল, নেহেরু, গফুর খাঁ, সুভাষবসু এঁরা কারাগারেই আবদ্ধ রইলেন। ১৯৩৫এর প্রথমভাগেও সন্ত্রাসনীতির নামে দমন ও উৎপীড়ন একভাবেই চ'লতে লাগ্‌লো।

এই বৎসর জুলাই মাসে ব্রিটীশ পার্লামেণ্টে নূতন ভারত আইন পাশ হ'ল। এ আইনে কংগ্রেসের কোন সমর্থন ছিলনা। আপাত দৃষ্টিতে কিছু ক্ষমতা দিলেও পূর্ব্বনীতি অনুসারে মূল ক্ষমতার এতটুকুও ভারতকে অর্পণ করা হয় নি। এই আইনের বিশেষ অংশ দুটী—একটী প্রভিন্সিয়াল অটোনমী (বা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব) অপরটি ফেডারেশন (বা যুক্তরাষ্ট্র)।

[ক্রমশঃ]

উপন্যাসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য

শ্রীকল্যাণী সেন

যুগে যুগে মানুষ বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টি করে চিরস্মরণীয়তা লাভ করেছে। অধিকাংশ মানুষের জীবন-মূল নিয়ন্ত্রিত ক'রছে যে সাহিত্য তা'র উদ্দেশ্য কি, এই তর্ক অনাদি কাল থেকে চলে এসেছে, কিন্তু সমাধান আজও হ'লনা।

কারো কারো মত জগৎ ও সমাজকে প্রতিফলিত করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য; অন্যেরা আবার বলেন সাহিত্য কারো দাসত্ব করেনা, আপনার আনন্দে সে আপনি বেড়ে ওঠে, যদি নিজের পথ চলতে চলতে জাগতিক সত্যের হু'একটা ছবি তার অন্তরে ধরা দেয় তো সে জগতেরই সৌভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যিকদের ধ্যানযোগী ও কর্মযোগী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ধ্যানযোগী যিনি তাঁর সাহিত্য সাধনা জগতের পক্ষে উপরি পাওনা, আর যিনি কর্মযোগী তিনি সাহিত্যের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আজকাল যাঁরা প্রচার সাহিত্য লিখছেন তাদের কর্মযোগী বলে অভিহিত করতে পারি, বঙ্গসাহিত্যের গুরু বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন কর্মযোগী। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে আদর্শবাদ যে কতবড় স্থান অধিকার করে রয়েছে সে কথা সকলেই জানে; আর যে সকল লেখক আধুনিক সাহিত্য গড়ে তুলছেন তাঁদেরও প্রচার করবার মত আদর্শ নিশ্চয়ই আছে। প্রভেদ শুধু আদর্শটি ফুটিয়ে তোলবার পন্থায়। এই পন্থাভেদেই সাহিত্যে "আদর্শবাদ" ও "বাস্তববাদ" এই দুটি কথা গড়ে উঠে সমগ্র সাহিত্যের উদ্দেশ্যমূলে আঘাত করছে।

সাহিত্যকে রূপভেদে অনেক সূক্ষ্ম বিভাগে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণভাবে গদ্য ও পদ্য এই দুটিই সাহিত্যের প্রাথমিক বিভাগ। গদ্য দুই জাতীয়—কাল্পনিক ও প্রামাণিক। প্রামাণিক গদ্য—জীবনচরিত, ইতিহাস, প্রবন্ধ, অর্থনীতির পুস্তক ইত্যাদি। আর কাল্পনিক—উপন্যাস, ছোট গল্প, চিত্র।

গদ্য সাহিত্যের প্রথমোক্ত শাখায় বাস্তবিকতার প্রয়োজন স্বতঃসিদ্ধ, প্রশ্ন ওঠে উপন্যাস ছোট গল্প ইত্যাদির বেলা। এগুলির আখ্যায়িকা কল্পিত:—লেখকের স্বাধীনগগনচারিণী কল্পনা কোন নিয়মের অনুবর্তিনী হবে কিনা তাহাই আলোচ্য।

এই আলোচনায় আমাদের দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে :—আমরা কেন উপন্যাস পড়ি, এবং কি ধরণের উপন্যাস আমাদের সবচেয়ে বেশী আনন্দ দেয়। এর উত্তর দেয়া কঠিন, কেননা "ভিন্নরুচির্হি লোকাঃ"। তবে সাধারণ নিয়ম এই যে, যাতে বাস্তবের চিত্র আছে সেইসব উপন্যাসই বেশী জনপ্রিয় হয়।

বাঙ্‌লা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের ধারা আলোচনা করলে এই সত্যটা সম্যক্ প্রতীয়মান হবে। বাঙালী ইংরাজের কাছে উপন্যাস লিখতে শিখেছে। কিন্তু একসময়ে সহসা তা'র জাতীয়তাবোধ সচেতন হয়ে ওঠাতে সে বিদেশীবর্জনের প্রচেষ্টায় নেমেছিল। শ্রীভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আন্দোলনের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন; তিনি ইংরাজি গ্রন্থাদির অনুবাদ এবং অনুকরণ করা ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নসমূহে বাঙালী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার জন্য ব্রতী হ'লেন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পন্থীদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হ'ল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য-পন্থীরাই জয়ী হ'লেন। তাঁদের জয়লাভের অন্যতম কারণ এই যে, আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্য এত অসম্ভব ঘটনাসমূহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে তা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত বাঙালীর মনোরঞ্জন করতে পারলনা। জনমতের ডিক্রিতে প্রাচ্যপন্থীরা দেউলিয়া হয়ে গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্যপ্রভাবের জয়পতাকা তুলে ধরলেন।

সাধারণ সাহিত্যামোদী সাহিত্যের কাছে কি প্রত্যাশা করে সাহিত্যের ইতিহাসের দ্বারাই তা' প্রমাণিত হ'ল কিন্তু আরো একটি গুরুতর এবং সূক্ষ্মতর সমস্যা বাকি রইল। আমরা বুঝলাম যে মানুষ উপন্যাসে অসম্ভবকে চায়না, কিন্তু "সম্ভব", "বাস্তব" ও "আদর্শের" মধ্যে কি সম্বন্ধ তা এখনও নির্ণীত হয়নি।

সাহিত্যে বাস্তব বা Realism বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি বাঙলা উপন্যাসের প্রথম যুগে তার অস্তিত্ব ছিলনা। তখন ইংরাজি সাহিত্যেও সে ভাবটির আমদানী হয়নি, বাঙালী কোথায় তা'র স্বাদ পাবে। আধুনিক উপন্যাসে চিত্রিত নরনারীর জীবনযাত্রার ধারা বঙ্কিমের উপন্যাসের ধারা হ'তে অনেক ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত রাজরাজড়ার জীবনকাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাই সাধারণ দশজনের জীবনে সেসব ঘটনা সত্য নয়। এজন্যে আমাদের অন্তর তা'তে তেমন করে সাড়া দেয়না; এর ভাবরসের ধারায় আমাদের বাণীর তৃষ্ণা মেটে বটে, কিন্তু যা আমা-দের ধূলির ধন, যা আমাদের চোখের জলে ভিজে, সেই নিত্যকার ছোটখাট সুখদুঃখের সহানুভূতি এতে নেই। তাই আজকালকার পাঠকমণ্ডলীর মত এই যে, আমাদের নিজেদের কথা যে সাহিত্যে স্থান পায়না সে সাহিত্য জনপ্রিয় হ'তে পারেনা। এ কথাটা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু বঙ্কিমের সম্বন্ধে কতটা প্রযোজ্য ভেবে দেখা উচিত।

এ কথা সত্য যে বঙ্কিম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন; কিন্তু তিনি শিক্ষকের আসন খুব কমই গ্রহণ করেছেন। তিনি আদর্শবাদী ছিলেন কিন্তু আদর্শের নেশায় মুগ্ধ হ'য়ে তিনি তাঁর শিল্পকলাকে ব্যাহত করেননি। বঙ্কিম কোন পরিপূর্ণ আদর্শ চরিত্র আমাদের দেননি। আদর্শবাদী হয়েও যে তিনি আমাদের সম্মুখে কোন আদর্শ তুলে ধরেননি তার কারণ, তিনি বুঝতেন যে সংসারে পরিপূর্ণ আদর্শ সম্ভাব্য নয়। তিনি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন, এবং বিশ্বাস করতেন জগতে ভগবানের অন্যতম অবতার শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আদর্শ, তাই তাঁর সাহিত্যে এই ধারণাই প্রতিফলিত হয়েছে।

সাহিত্যে বাস্তব ও সম্ভাব্যের অবতারণায় বঙ্কিম যে তাঁর পূর্বকার সাহিত্য থেকে কতকটা অগ্রসর হয়েছিলেন তা' একবার টেকচাঁদের আদর্শ চরিত্রগুলির সঙ্গে তাঁর চরিত্রগুলির তুলনা করলে বোঝা যাবে। টেকচাঁদ যদিও সাধারণ বাঙালী গৃহের ছবিই চিত্রিত করেছেন, যদিও তাঁর উপন্যাসের প্রত্যেক ছত্রে বাস্তবজীবনের ঘটনাবলী চিত্রিত হয়েছে, তবু সে গৃহপরিবারের সুখদুঃখের চিত্র আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠেনা ; অথচ বঙ্কিমের আয়েসা, জগৎসিংহ, সীতারাম, জেবউন্নিসা, মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা, ইন্দিরা, রোহিনী, ভ্রমর সবাই তা'দের জীবন্ত সত্তা নিয়ে এসে আমাদের অভিভূত করে ফেলে।

আজকাল বাস্তব সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তাতে আমরা খুঁজি বঙ্কিম টেকচাঁদের শিল্পাদর্শের শুভ সম্মিলন। টেকচাঁদ যে সাধারণ গৃহের চিত্র দিয়েছেন সেই চিত্রই আমরা দেখতে চাই, কিন্তু আমরা চাই যে তা সত্য হয়ে উঠুক, উজ্জ্বল হয়ে উঠুক বঙ্কিমের অমর প্রতিভা স্পর্শে।

আধুনিক বাস্তবসাহিত্যের আর একটি দিক আছে সত্যের সঙ্গে যা'র কলহ। এই সাহিত্যে অনেক সময়ে মানবজীবনের পঙ্কিলতাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, জীবনের আশা-আনন্দপূর্ণ সরসমধুর যে দিকটা আছে সেটা চাপা পড়ে যায়। কোন উপন্যাসের সমালোচনাক্রমে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাই, মানবচরিত্রের দীনতা ও জঘন্যতাকেই বাস্তবিকতা বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বাঙ্‌লা গ্রন্থটিতে পঙ্কিলতার নামগন্ধ নাই, অথচ বইটির আগাগোড়ায় এমন কিছুই নাই, যাহা সাধারণ নহে, স্বাভাবিক নহে, বাস্তব নহে।" এই যে দিকটার উল্লেখ কবিগুরু করেছেন সেটাই আমাদের শতকরা নব্বই জনের জীবনে সত্য। সামান্য বিত্ত নিয়ে কত শতসহস্র দরিদ্রপরিবারের জীবনযাত্রা চলে যায় ; কত সামান্য কেরাণী, কুলিমজুর, চাষীর সুখদুঃখ, ভাবনাচিন্তা, রোগশোকে ভরা, পারিবারিক জীবন স্নেহভালবাসার সুধারসে সিঞ্চিত হয়ে স্বর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। রোগশোক জর্জরিত মাতৃভূমির এই আনন্দের কাছে নিষ্কণ্টক স্বর্গসুখও হীন মনে হয়। এর মধ্যে মিথ্যা কিছুই নেই। জীবন্ত বাস্তবের সত্তা এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশে ফুটে উঠেছে ; অথচ আধুনিক realism এর রাজত্বে এর স্থান নেই।

অনেকে বলবেন, যে সাহিত্য মানুষের দুঃখকষ্টকে ভুলিয়ে দেয় সে স্বার্থপরের সাহিত্য। শতকরা নব্বইজন যদি আপেক্ষিক শান্তি ভোগ করে তবু যে দশজন সেই স্বর্গে প্রবেশাধিকার লাভ করলনা তা'দের দুঃখ বাকি সকলের সুখের ছবির উপর কালী বুলিয়ে দেবে।

দুঃখী, দীন, আর্তপীড়িত, পাপীপাষণ্ড যারা কে তাদের এমন করল ? এ কি তা'দের পূর্ব জন্মার্জিত কর্মফল ? এ কি বিধাতার লীলাখেলা ? আধুনিক মানুষ উচ্চকণ্ঠে বলবে—"না, আমারই নিষ্ঠুরতার ফল, আমিই এই জন্য দায়ী।"

তাই যদি হয়, তবে সাহিত্যে জগতের বীভৎসতার চিত্রের মূল্য এই যে তাতে মানুষকে তার নিজের আনা এই কুশ্রীতার প্রতি সচেতন করে দেয়। আধুনিক বাস্তবসাহিত্যের অস্তিত্বের এই একমাত্র উদ্দেশ্য।

তাহ'লে আমাদের আবার সেই প্রথম প্রশ্নের পুনরুক্তি করতে হয়। সাহিত্য কি সমাজ-সংস্কারকের দাস? এই কি সাহিত্যের সমগ্র মূল্য? একদিন গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছিল "Art for Art's sake"—শিল্পই শিল্পসাধনার উদ্দেশ্য—সে কথা কি আজ ফেরৎ নেব? একদিন শিল্পের সর্বজয়িত্ব ঘোষিত হয়েছিল, আজ কেউ তা'র স্পষ্ট প্রতিবাদ করছে না বটে, কিন্তু সাহিত্যের মুখ যে ঘুরে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন বলেছিলেন যে লেখনী আর্ত্তত্রাণের জন্য নিয়োজিত না হ'লে তা'র নিষ্ফলা হওয়াই ভাল। আজ কি আমরা বৃত্তাকারে ঘুরে ঠিক সেখানেই ফিরে আসিনি?

আজ আমরা কি আবার বলব "Art for life's sake"? জীবনের আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের এই অঙ্গাঙ্গীযোগ এই নিগূঢ় সম্বন্ধ সর্বজনস্বীকৃত হ'লে শিক্ষাদান সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হবে। তবু আমরা দেখি শিক্ষামূলক গ্রন্থাদির মধ্যে কোন কোনটি সাহিত্য হয়ে ওঠে এবং কোন কোনটি কেবল পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েই থাকে। এই বিভাগ কোন নিয়মানুসারে ঘটে?

সেই লেখকের সাহিত্য সৃষ্টি সফল হবে যিনি তাঁর শিক্ষাটিকে অনুভূতির ভিতর দিয়ে রসোত্তীর্ণ করে নিতে পারবেন। তিনি সত্য উচ্চারণ করবেন, শিক্ষা দেবার জন্য নয়, উচ্চারণ না করে থাকতে পারবেন না বলে। তাঁর অন্তরে যে আগুন জ্বলছে সে ছাইচাপা পড়ে থাকবেনা বলে স্বতঃই আত্মপ্রকাশ করবে। এইরূপ যে উদ্দেশ্যসমন্বিত সাহিত্য তা'কে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে।

মানুষ যেদিন প্রথম সৃষ্টিরহস্যের সম্মুখীন হয়েছে সেদিন হতেই তা'র আদিতম প্রশ্ন—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম".—তা'র প্রতিধ্বনি যুগে যুগে সাহিত্যের পাতায় পাতায় ধ্বনিত হয়েছে—

"কাহারে পূজিছে ধরা অসীম যৌবন উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন?
প্রেম দিলে প্রেম আসে, সে প্রেমের পাথার কোথারে?
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে, কোথা সেই অনন্ত জীবন?"

মানুষ যবনিকার আবরণ ছিন্ন করতে চেয়েছে। জগতে মানবোত্তরের অস্তিত্ব সে বুঝতে পেরেছে বলেই সে পশু নয়। তা'র সাহিত্যে দেবত্বের সাধনা চলেছে। সামনে মহৎকে ও সুন্দরকে দেখে সে আপনার জীবনে মহত্ত্বের ও সৌন্দর্যের অবতারণা করতে চেয়েছে। সেই প্রথম সৌন্দর্যবোধ থেকে সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিল্পকলায় মানবের সৌন্দর্যসাধনা জেগেছে। আমরা

সুন্দর হ'তে চাই, চাই আমাদের পারিপার্শ্বিক যেন সুন্দর হ'য়ে ওঠে, তাই যা কিছু কুৎসিত তা'র বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান।

যে সাহিত্য সৌন্দর্যকে অস্বীকার করেছে, জীবনের উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছেনা, সে সাহিত্য পড়ে মনে হয় কুশ্রীতার জয়পতাকা তুলে ধরাই তা'র উদ্দেশ্য। মানুষকে পশু বলে মনে করাই তা'র ধর্ম। কিন্তু ভাল করে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সাহিত্যের মধ্যেও সেই চিরন্তন প্রশ্নই প্রকটিত হয়েছে। হয়ত সে ভীরুর সৌন্দর্য সাধনায় অক্ষমতার আত্মপ্রকাশ; সে তা'র জীবনে সুন্দরের আবির্ভাব হ'তে বঞ্চিত হয়েছে বলেই হয়ত ক্ষোভে, দুঃখে তা'কে অস্বীকার করেছে। হয়ত সে দুঃখপীড়িতের হাহাকার। জীবনে রোগশোক দারিদ্র্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে স্বীয় দুর্দশার চিত্র এঁকে যেন জগদ্বাসীকে আহ্বান করে বলেছে—"তোলো আমাকে এই নরক থেকে, নিয়ে যাও সুন্দরের রাজ্যে"। শুধু এর পিছনে মানবজীবনের ও তা'র সাহিত্যের এক-তম চিরন্তন আদর্শ লুকিয়ে আছে।

মানবের সৌন্দর্যসাধনায় এই হতাশার সাহিত্যের মূল্য কম নয়; সাহিত্যে যদি জীবনের কুশ্রীতা ব্যক্ত হয় তবে তা'রই প্রদত্ত উত্তেজনা থেকে তা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার শক্তি আসবে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখে এসেছি কেমন করে যুগে যুগে সাহিত্যিকের লেখনীর আঘাতে জর্জরিত হয়ে ধীরে ধীরে বাঙালীর ঘুমিয়ে পড়া বেদনাবোধ জেগে উঠেছে। টেকচাঁদ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় জাতীয় চরিত্রের মদ খাওয়া, দুশ্চরিত্রতা, বিলাসিতা ইত্যাদি দোষসমূহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। "আলালের ঘরের দুলালে" দেখিয়েছেন কি করে ছেলে মানুষ করলে জাতির ভবিষ্যত উজ্জ্বল হ'বে; "আধ্যাত্মিকা"য় দেখিয়েছেন কি করে জাতীয়জীবনে নিষ্কলুষ পবিত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। তারপর আমরা দেখেছি দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী", "জামাইবারিক", "লীলা-বতী" প্রভৃতি, যা'র দ্বারা ক্রমাগত বাঙালীর অধঃপতিত সমাজের উপর আঘাত করা হয়েছে; আর দেখেছি "নীলদর্পণ", যার মধ্যে বাঙালীর শ্লথ আত্মসম্মানকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। অপরপক্ষে মাইকেল জাগিয়ে দিলেন বাঙালীর দেশাত্মবোধ—"নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ—পরপর সদা"। তারপর হেমচন্দ্র পরিপূর্ণ শিল্পের. ধর্মের আদর্শ নিয়ে এলেন, ভূদেব এলেন, বঙ্কিম বিবেকানন্দ এলেন নবঅভ্যুদিত হিন্দুধর্মের জয়ধ্বজা নিয়ে। বঙ্কিম বাঙালীর ধমনীতে বীরত্বের উত্তেজনা জাগিয়ে দিলেন। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে শুধু বঙ্গবাসীকে নয়, ভারতবর্ষের তেত্রিশ-কোটি মূক সন্তানকে দীক্ষিত করলেন। আজও দেখছি রবীন্দ্রনাথ দেশের জীবনের জাতীয়, সামা-জিক, বৌদ্ধিক, ধর্মনৈতিক, আধ্যাত্মিক সকল অংশেই মরাগাঙে নূতন ভাবের জোয়ার এনেছেন। সেদিন পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র দেশের সমাজের দীনদুঃখী, দরিদ্র, পতিত, অত্যাচারিতের ক্রন্দন সাহিত্যের পাতায় পাতায় ধ্বনিত করে তুলেছেন। এমনি করে দেশের সাহিত্যিককুল যুগে যুগে বাঙালীর জাতীয় কু-গুলিকে পরিহার করে সু-গুলিকে গ্রহণ করবার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

উপরি উক্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের মধ্যে ছুটি বিভিন্ন ধারা সম্মিলিত হয়েছে, কু-গুলিকে পরিহার করা এবং সু-গুলিকে গ্রহণ করা। মন্দের কুশ্রীতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া এবং তা'র স্থানে ভালর আদর্শ ফুটিয়ে তোলা।

মন্দটা দেখিয়ে দেয়াই বাস্তবসাহিত্যের বীভৎসতার কাজ, এবং সেই কাজ করেই তা'র কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয়। যেখানে কণ্টকবন ছিল সেখানে নন্দনকানন প্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে প্রথমে জঙ্গল পরিষ্কার করে তারপর সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ রোপণ করতে হবে। সাহিত্যেও ভাঙার কাজ হয়ে গেলে আরম্ভ করতে হবে গড়ার কাজ, এই গড়ার কাজে যে সাহিত্যিক নিযুক্ত হবে সে যেন কুশ্রীতার পূজারী না হয়,—তা'কে সৌন্দর্য্যের আদর্শ তুলে ধরতে হবে। "পরিচয়" পত্রিকায় প্রকাশিত সাহিত্যের আদর্শসম্বন্ধীয় কোন প্রবন্ধের একটি উক্তি এই বিষয়ে বুঝতে সাহায্য করবে—

"বর্ত্তমান সমাজের ভিত্তিভূমিপরে আদর্শ যে সমাজ সুসঙ্গত, তাই সাহিত্যের পরিশীলনের সামগ্রী। সাহিত্যিক তাই পুরোপুরি সমাজসংস্কারক নন, সুসংস্কৃত, সুসমঞ্জস, সুন্দর সমাজের পরিকল্পয়িতা।"

সাধারণের জীবনে সৌন্দর্যের আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে পারবে সেই সাহিত্য যা'র মধ্যে সহজ, সরল আনন্দের উৎস আছে; সেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করবে।

মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে আমরা শরৎচন্দ্রকে প্রথমোক্ত শ্রেণীতে ফেলতে পারি, আর রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয়টিতে। একজন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের জীবনে কত মন্দ আছে, আর একজন ধ্যানচক্ষে দেখতে পেয়েছেন সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ প্রকাশ। একজন সাহিত্যক্ষেত্রে কর্মযোগী। অপরজন ধ্যানযোগী।

যে লেখক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি যদি ভাবেন আদর্শ পরিবারের আদর্শ চিত্র আঁকাই সৌন্দর্য পিয়াসী সাহিত্যের উদ্দেশ্য, তবে ভুল হবে। উদ্দেশ্যসমন্বিত সাহিত্য যদি আত্মসচেতন হয়ে আদর্শ সৃষ্টি করে তবে তা'র মূল্য হ্রাস হ'বে। পরিপূর্ণ আদর্শ এত অসম্ভব বস্তু যে যেখানে তা'র রাজত্ব সেস্থানের সবাই Bernard Shawএর The Statueএর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে "Heaven is the most angelically dull place in all creation".

ইচ্ছা করে উদ্দেশ্য সাধনের প্রাণপণ চেষ্টা করলে উদ্দেশ্য সফল হবেনা। যদি আমার জীবনে কোন মধু থেকে থাকে, আমার হৃদয়ের অমৃতপাত্র যদি উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তবে আমি এক অমৃতময় সংসারের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারব। "পরিচয়" পত্রিকার পূর্বোধৃত প্রবন্ধটিতে এই স্বতঃ-প্রণোদিত সতেজ, সরল, প্রাণবন্ত আদর্শ সম্বন্ধে এইক'টি কথা আছে—

"আদর্শ সংসার স্থাপন করাই আদর্শবাদী সাহিত্যের উদ্দেশ্য সত্য, কিন্তু এ আদর্শ Utopiaর আদর্শ নয়। এই সংসারের নরনারী যে পাপ করেনা তা নয়, পাপের জঘন্য বিকৃতি নেই তা'দের মধ্যে। তুমি, আমি, সবাই যেমন সাধারণত সৎপথেই চলতে চেষ্টা করে থাকি—তেমনি এদেরও

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ভালোর দিকেই। এরা যে প্রলোভনে পড়েনা, স্খলিত হয় না, তা নয়, কিন্তু এরা পরে তা'র জন্য অনুতপ্ত হয় যেমন আমরা সবাই হয়ে থাকি।

"এদের ছবি দুঃখবাদী, মুমূর্ষু, পুণ্যভীত Psychological pervertsএর ছবি নয়। Don Juan এদের আদর্শ নয়, এদের আদর্শ—

"One who never turned his back but marched breast forward,

Never doubted clouds would break,

Though right were worsted wrong would triumph." ইত্যাদি।"

সংসারের দুঃখ দেখে বিদ্রূপ করে থেকে যাওয়া ভীরুর কাজ, অক্ষমের নিষ্ফল আক্রোশ। যে কিছু পায়নি সে যে ধনীর ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষাকাতর হবে তা'তে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু অন্তরের পূর্ণতায় যদি কেউ বলতে পারে "জগৎ সুন্দর" সমস্ত জীবনের সাধনায় সে কদর্যের মাঝে সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারে, সেই আমাদের বরণীয়।

ভাঙ্গার সাহিত্যের প্রয়োজন থাকলেও গড়ার সাহিত্যই উচ্চতর আসন পাবে। বাড়ী তৈরী করবার আগে জঙ্গল সাফ করতেই হবে, কিন্তু যদি তাই বলে ধাঙ্গড়কে স্থপতির সঙ্গে, শিল্পীর সঙ্গে একাসনে বসাই তবু সে ধাঙ্গড়, শিল্পীর মত "কল সকলাপারংগত" হয়ে উঠবে না।

ভারত ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ

শ্রীতমিস্রা দেবী

যে মহান উদ্দেশ্যে জাতিসঙ্ঘ গঠিত হয়, তার ব্যর্থতার কথা বিশ্ববাসীর অজানা নেই। নিপীড়িত ক্ষুদ্র জাতির আর্তনাদে আজ দেশ ও বিদেশের আকাশ বাতাস ছেয়ে গেছে। এর মধ্যে জাতিসঙ্ঘের কথা মনে তোলে একটা প্রহসনের প্রতিষ্ঠা হোয়েছে মনে হয়। শক্তিমান্ জাতির ঔদ্ধত্য জাতিসঙ্ঘ দমন করতে পারে নি, দুর্ব্বলকে রক্ষা করার কোন ক্ষমতার পরিচয় দেয়নি, সাম্রাজ্যলিপ্সা প্রবৃত্তির চরিতার্থতার কোনই বাধা উপস্থিত হয়নি। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের চেয়ে বর্ত্তমানের অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যায় না, শুধু পূর্ব্বে যে ছল কৌশলের কথা সগর্ব্বে জাহির করা হোত এখন তার একটা গূঢ়ার্থ বার করে পরহিতৈষিণার প্রকাশ দেখাতে সকলে ব্যস্ত। জাতিসঙ্ঘ কেহ না মানলেও তার সমর্থন যে কোন প্রকারে পাবার লোভ অত্যাচারী, পররাজ্যলোলুপ জাতিদের কম নয়। যদি এই সঙ্ঘের কোন সার্থকতা থাকে, তবে একমাত্র এইখানেই। সাক্ষাৎভাবে এই প্রতিষ্ঠানটী কোন অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারেনি, যেখানে অসি উদ্যত হোয়েছে, তা অবনমিত হয়নি, তবু লোক চক্ষুর অন্তরালে জাতিসঙ্ঘের একটী মূল্য আছে। ভারতবর্ষ সেখানে প্রতিনিধি পাঠিয়ে কোন অধিকার অর্জ্জন করেনি কিন্তু দুটী বিষয়ে সবিশেষ উপকৃত হোয়েছে। আফিমব্যবসা নিবারণ ও শ্রমিকসমস্যার প্রতিকার।

আফিম ব্যবসা ভারতে ইংরেজশাসনের একটী দুরপণেয় কলঙ্ক ছিল। রাজস্বের আয় বাড়াতে চীনে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আফিম প্রেরণ করা হোত। চীনবাসী এর প্রতিবাদে দু'বার তীব্র সংগ্রাম করেছে, সে যুদ্ধ 'আফিম-যুদ্ধ' নামে আজও ইতিহাসে খ্যাত হোয়ে আছে কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত বৃটীশ শক্তির নিকট তাদের হার মানতে হোয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আফিমব্যবসা অত্যধিক প্রসার লাভ করেছিল। প্রায় সত্তর বৎসর ধরে চীনাবাসীর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের দেশে এই মাদকদ্রব্য চালানো হোয়েছিল, এর ফলে দেশে দুর্নীতির স্রোত এত বয়ে গেছে যে এর বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার পরামর্শের জন্য হেগ সহরে বৈঠক বসেছিল, তখন জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার কথা সুদূরপরাহত ছিল, কিন্তু মহাযুদ্ধের রণ-কোলাহলে একথা সকলে বিস্মৃত হোল।

যুদ্ধের পরে জাতিসঙ্ঘ এবিষয়ে প্রচার চালাতে আরম্ভ করে, এর ফলে বৃটীশ সরকার সুদূর প্রাচ্যে আফিম ব্যবসা পরিত্যাগের নীতি গ্রহণ করে। ১৯২৫ সন হতে প্রতিবৎসর শতকরা দশমাংশ হিসাবে ব্যবসা হ্রাস করা হয় এবং ১৯৩৫ সনে চিরতরে আফিম রপ্তানী বন্ধ হোয়ে যায়। এইরূপে একটী প্রাচ্য দেশ এক প্রাণান্তকারী মাদক দ্রব্যের হাত থেকে রক্ষা পায়। বর্ত্তমানে ভারতের কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশে মাদক দ্রব্য-বর্জ্জন আন্দোলন চলেছে এবং আশানুরূপ না হোলেও

এর কাজ দ্রুতই চলেছে, লীগের প্রভাবে পৃথিবীর জনমত গঠিত না হোলে তাদের সাফল্যলাভের পথে বহু অন্তরায় উপস্থিত হোত।

শ্রমিক আন্দোলন বর্ত্তমানজগতের একটী প্রধান সমস্যা। রাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপনের পূর্ব্বেই এবিষয়ে নানা চেষ্টা চলেছিল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার হয়নি। এবিষয়ে সারা বিশ্বের স্বার্থ জড়িত, কোন একটী দেশ এককভাবে কোন উন্নতিমূলক স্থায়ী পরিবর্ত্তন আনতে পারেনা; কলিকাতার শ্রমিকউন্নতি নির্ভর করে মাদ্রাজ, বোম্বাইএর শ্রমিকের উন্নতির উপর। আবার তাদের মালিকদের চল্‌তে হবে চীনজাপানের দিকে তাকিয়ে নতুবা ব্যবসাবাণিজ্য ধ্বংস হবে, একদেশের ক্ষতিতে অন্যদেশ লাভবান্ হবে সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক কোন প্রচেষ্টা ব্যতীত শ্রমিকদের অবস্থা যথা-পূর্ব্ব থাকতে বাধ্য। বাস্তবিক পক্ষে তা হোয়েছেও। মজুরদের দৈনিক পরিশ্রমের কাল সেজন্যই কোন দেশে হ্রাস করা যায়নি, কারণ তাতে অন্যদেশে কার্য্যকাল হ্রাস না পেলে তাদের দ্রব্যউৎপাদনের মূল্য কম থেকে যাবে সুতরাং তারা কম মূল্যে জিনিষ দিতে সক্ষম হবে, এরূপ ক্ষতি কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ্য করতে পারে না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকে এসব বিষয়ে আলোচিত হওয়ায় সর্ব্বদেশে জনমতই গঠিত হয়েছে এবং বর্ত্তমানে প্রায় সকল কলকারখানায় দৈনিক আটঘণ্টা কাজ নির্দ্ধারিত হোয়েছে। এছাড়া আরও নানা বিষয়ে প্রভূত উন্নতিসাধন করা হোয়েছে। শ্রমিকগণ কাজ করার সময় হত বা আহত হোলে, কোন দৈব দুর্ঘটনায় তাদের শারীরিক ক্ষতি হোলে মনিবের দায়িত্ব আইন অনুসারে স্বীকৃত হোয়েছে। এজন্য বিশেষ বৃত্তি দেওয়া, সাময়িক সহায়তা, চিকিৎসার ব্যবস্থা নানা ভাবে তারা ক্ষতিপূরণ করে থাকেন। নারী ও শিশুদের খনির কাজে নিয়োগ সম্বন্ধেও নানা আইনকানুন প্রণীত হোচ্ছে।

প্রাচ্যদেশের শাসনকর্ত্তাগণ জগতের মতামতের বিশেষ প্রাধান্য দান করে থাকেন। জাতিসঙ্ঘে কোন প্রস্তাব উঠ্‌লে উহা কার্য্যে পরিণত হবার পূর্ব্বেই এরা আপন আপন দেশে তা প্রবর্ত্তিত করেন, এভাবে যেসব পরিকল্পনা বহুদিন যাবং বিলম্বিত হচ্ছিল তাও অচিরে কার্য্যকরী হোয়েছে এবং নূতন উন্নতিমূলক নানা কাজ আরম্ভ হোয়েছে।

রাজনীতির দিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কোনই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি, আবিসিনিয়ার ধ্বংস, স্পেন এবং চীনে যুদ্ধ, নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের ব্যর্থতা তার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ, তবে যেসব ক্ষেত্রে উহা আংশিক সফলতা লাভ করেছে, তাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কতখানি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নষ্ট হোয়েছে তা আরও স্পষ্ট হোয়ে উঠে। *

* নিউবার্ট জার্নাল প্রকাশিত সি, এফ, এণ্ড্রুজ লিখিত প্রবন্ধের ভাব অবলম্বনে।

পুস্তক-পরিচয়

রাজনীতি ও ভারত—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার গুপ্ত প্রণীত, ১৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দুই আনা।

বইখানার নাম ও পৃষ্ঠার সংখ্যা দেখলেই সর্ব্ব প্রথমে মনে হয় যে কত গভীর ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য কত অপরিসর স্থান দেওয়া হইয়াছে। লেখক পলিটিক্সের স্বরূপ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিতে চাহিয়াছেন। প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রে কি প্রকারে বিভিন্ন যুগে বিভিন্নরূপ লইয়া নানা সামাজিক দলের করতলগত হইয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে, তাহার একটা অতি সংক্ষিপ্ত ধারা দেওয়া হইয়াছে, স্থান সঙ্কীর্ণ বলিয়া অর্থনীতির কতকগুলি মতামতের উল্লেখ মাত্র করিয়াই বিরত থাকিতে হইয়াছে, তথাপি এধরণের পুস্তকের উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না, যাঁহাদের অবসর কম, তাঁহারা স্বল্প-কলেবর পুস্তিকার প্রতি অনুরাগী হইয়া থাকেন এবং কিছু জ্ঞান লাভের চেষ্টা করেন। এরূপে ক্রমে জ্ঞান-তৃষ্ণা বর্দ্ধিত হইতে পারে, সে হিসাবে পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিবে।

কবিতা—বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫, মূল্য আট আনা, সম্পাদক—বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেন।

একখানি অতি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা, সুধী-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইবে। সবগুলি প্রবন্ধ-ই কবিতা-সম্বন্ধীয় আলোচনা, সুতরাং কবিতা-লেখক ও সমালোচকগণ এতে বহু তথ্যের সন্ধান পাইবেন। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলা কাব্য গগণের বিশিষ্ট কবিগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-প্রসূত সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং সত্যের বিভিন্নমুখী দিক তাহাদের লেখনীর আলোক সম্পাতে আলোকিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক কবিতা পড়িয়াই দায়মুক্ত হয়, যতটুকু আনন্দ পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জড় জগতের বিজ্ঞান নয়—ভাবরাজ্যের বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে কবিতা সম্বন্ধে কত বিশ্লেষণ যে চলিতে পারে, এই বইখানি তাহার সামান্য পরিচয় দেয়। বাংলা দেশে কবিতার সত্যরূপ উচ্চ-শিক্ষিত মহলেও উদ্ঘাটিত হয় নি। যে বাস্তব ও আদর্শবাদ কবিতার মধ্যেও আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ভাল-মন্দের বিচারালেচনা হয় নাই, যাহা সম্মুখে পাওয়া গিয়াছে তাহাই সাধারণ এবং শিক্ষিত পাঠক শ্রেণীও গ্রহণ করিয়াছেন, কবির নিকট কেহ দাবী উপস্থিত করে নাই। কবি সমাজ-ছাড়া এক সম্পূর্ণ পৃথক গোষ্ঠীতে দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। কাব্য তাঁহার যোগসূত্র না হইয়া দেশের ও দশের সহিত তাহার যোগ ছিন্ন করিয়াছে। মাসিক পত্রিকার এই সংখ্যা খানি এ সব সমস্যা সম্বন্ধে গদ্য ভাষায় যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাও কবিতার ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, রসজ্ঞ ব্যক্তি-ই ইহার যথার্থ গুণ-গ্রহণ করিতে পারিবেন।

এই ত জীবন—শ্রীশচীন সেন প্রণীত, ও ডি, এম, লাইব্রেরী প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সব উপন্যাস দেখা যায়, এখানি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। মামুলী প্রেম কাহিনী ও মনোস্তত্ত্ব বিশ্লেষণই ইহার প্রধান বিষয় বস্তু নয়, বর্ত্তমান বাংলার যুবক সম্প্রদায় নানা সমস্যায় বিব্রত। তাহার আয়ত্বের বাহিরে নানা প্রভাব আসিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে, চারিদিকে হইতে নানা মতবাদ, নানা বিরুদ্ধ শক্তি, অর্থনৈতিক জটিলতা তাহাকে দিশাহারা করিয়া তোলে, যে জীবন কৈশোরের কল্পনা নেত্রে মাধুর্য্যময় প্রতিভাত হইয়াছিল, বাস্তব সংসার ক্ষেত্রে আসিয়া সে পাইল এক রূপ রস হীন জীবন। এই বঞ্চিত যুবক সমাজের মর্ম্মব্যথাই এই বইখানিতে রূপ পাইয়াছে একটী ভাগ্যহীন, ছন্নছাড়া যুবককে অবলম্বন করিয়া। বহু ভাবিবার কথা আছে এখানিতে, দুঃখ করিবারও। কিন্তু প্রতিকারের কোন চেষ্টা নাই, বোধহয় দুঃসাধ্য বলিয়াই নাই। এ সমস্যার মীমাংসার দিক হইতে ইঙ্গিত থাকিলে পুস্তকটী আরো মূল্যবান হইত।

বইখানি সুখ পাঠ্য, ভাষা সাবলীল, নবা-বাংলার নিকট প্রশংসিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুদের রাজ্য শাসন প্রণালী—শ্রীশিশির কুমার বসাক প্রণীত, মূল্য দশ আনা মাত্র।

কিছুদিন পূর্ব্বেও হিন্দুদের আধ্যাত্মিক জাতি বলিয়া প্রচারের একটা উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, বর্ত্তমানে একদল বিশ্বাস করেন যে একমাত্র ধর্ম্মই হিন্দু জাতির বৈশিষ্ট্য ও জীবনের অন্যদিক উপেক্ষা করিয়াও ধর্ম্মকার্য্য লইয়াই তাহার থাকা উচিত। এই বিশ্বাসের ফলে জীবনের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির প্রতি দেশে উদাসীনতা আসিয়া গিয়াছিল এবং ভোগৈশ্বর্য্যের মানদণ্ডে হিন্দুজাতির অবনতি লক্ষিত হয়, কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্ম প্রাণতার সহিত কার্য্য ক্ষমতার যে বিরোধ নাই, একথা প্রাচীন ইতিহাস সাক্ষ্য দান করে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, এই হিসাবে বইখানির প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। তেরটী ছোট ছোট পরিচ্ছেদে রাজ্য শাসনের যতগুলি বিভিন্ন বিভাগ উল্লেখ হইয়াছে, বর্ত্তমানের যে কোন সভ্য জাতির শাসন-প্রণালী ও ঐ মূল বিভাগ-সমন্বিত। প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র ছিল বটে, কিন্তু রাজা অপেক্ষা আইনের মর্য্যাদা অনেক বেশী ছিল, রাজা শুধু সাক্ষীগোপাল ছিলেন না, তাহারও দিনরাত্রির কর্ম্ম-বিভাগ ছিল। অনেক কঠিন সমস্যারও তৎকালীন হিন্দুজাতি যেরূপ সমাধান করিয়াছেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এধরণের আরও নানা পুস্তক প্রকাশ করা প্রয়োজন। লেখক ভবিষ্যতে এদিকে আরও দৃষ্টি দিবেন, আমরা আশা করি।

শরচ্চন্দ্র ও ছাত্র সমাজ—শ্রীমুরারি দে সম্পাদিত

শরচ্চন্দ্র ছাত্র-সমাজে শুধু তাহাদের উদ্দেশ করিয়া বিভিন্ন সভায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, বইখানি তাহার সংগ্রহ। শরৎচন্দ্র বক্তা ছিলেন না এই বক্তৃতাগুলিতে তাঁহার বাগ্‌ বিন্যাসের অপূর্ব্ব কুশলতা নাই, ভাষায় আড়ম্বর নাই—শুধু একখানি সরল হৃদয়ের সুমিষ্ট অভিব্যক্তি। ছাত্র সমাজের প্রতি

তাঁর আন্তরিক দরদ প্রতি কথায় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি ছাত্রদের নিকট অনেকখানি আশা করেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য বোধ, দেশেরও সমাজের প্রতি মমত্ব বোধ জাগাইতে তাহাদের অন্তরে প্রেরণা দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু গুরুর আসনে বসিয়া নয়, বন্ধুর মত আপন সমবেদনাপূর্ণ হৃদয়খানি তাহাদের নিকট খুলিয়া দিয়াছেন ও স্নেহ বাক্যে পথনির্দ্দেশে সহায়তা করিয়াছেন। তাহার জীবনী লেখকদের নিকট এ পুস্তক অমূল্য কারণ তাহার মনের একদিক এই বক্তৃতাগুলি যেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছে আর কোথাও তেমন নাই। এগুলি সযত্নে রক্ষা করা কর্ত্তব্য শ্রীহর্ষ পত্রিকা এজন্য আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। অপর একটী বিষয়ে ও বইখানি সমাদর লাভ করিবে। শরৎচন্দ্রের স্বীয় লেখার ভাব ও বিষয় সম্বন্ধে তাহার নিজের মতামত এই বক্তৃতা-গুলিতেই জানা যাইবে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠে যাঁহারা অনুরাগী, তাহাদের নিকট ইহা কম লাভের কথা নহে। নিজ লেখা সম্বন্ধে অকুতোভয়ে এরূপ মত প্রকাশ খুব কম লেখকই করিয়াছেন। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে চিনিতে ও বুঝিতে এই বইখানি খুব সহায়তা করিবে।

উষা রায়

সমালোচনার জন্য পুস্তক অনুগ্রহ কোরে দুই কপি কোরে পাঠাতে অনুরোধ করা হোচ্ছে — জ: স:।

আলোচনী

মধ্যপ্রদেশে মন্ত্রীসঙ্কট—

মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী সমস্যা নিয়ে সমস্ত দেশময় সমালোচনা ও তর্কের ঝড় উঠেছে। এ ব্যাপারের ঘটনাগুলি এরূপ—মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীসভা ডাক্তার খারে, শ্রীযুক্ত গোলে, শ্রীযুত দেশমুখ, শ্রীযুক্ত শুক্ল, শ্রীযুক্ত মিশ্র ও শ্রীযুক্ত মেটা এই ছয়জনকে নিয়ে গঠিত হয়। এদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় ও মহাকোশলীয় এই দুটী দলের সৃষ্টি হয়। কিছুদিন যাবৎ এই উভয় দলের মধ্যে ব্যক্তিগত মনান্তর ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে—মন্ত্রী নির্ব্বাচন ও বিষয় বিভাগ নিয়ে এই কলহের সূচনা। গত মে মাসের শেষভাগে পার্লামেণ্টারী কমিটির কর্ত্তা সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এর একটা মীমাংসা করতে চেষ্টা করেন। তার ফলে মন্ত্রীরা অতঃপর পরস্পর সহযোগিতায় কাজ করবেন এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি দেবার দুই মাসের মধ্যে বর্ত্তমান মন্ত্রী সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ডাঃ খারে এই আত্মকলহের সমাধান করতে না পেরে শ্রীযুক্ত গোলে ও দেশমুখ সহ পদত্যাগ করেন—অপর তিনজন মহাকোশলীয় মন্ত্রী পার্লামেণ্টারী কমিটীর নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত পদত্যাগ করতে অস্বীকৃত হন। মধ্যপ্রদেশের গভর্ণর মন্ত্রীত্রয়ের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে অবশিষ্ট তিনজন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করেন ও ডাঃ খারেকেই আবার নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করতে আহ্বান করেন। ডাঃ খারে বিপক্ষ দলের তিনজনকে বাদ দিয়ে শ্রীযুক্ত গোলে, দেশমুখ এবং আরো নতুন দুজনকে নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ডাঃ খারে নবগঠিত মন্ত্রীমণ্ডলীসহ পদত্যাগ করেন এবং নিজের অবিবেচনামূলক কাজের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটি ডাঃ খারেকে নেতৃপদপ্রার্থী হতে অনুমতি দেন না। প্রতিপক্ষদলের শ্রীযুক্ত শুক্ল, শ্রীযুক্ত মিশ্র ও মেটা এবং নূতন তিনজনকে নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেন—সংক্ষেপে ঘটনাটি এরূপ। এই ঘটনার জন্য কে দায়ী সে বিষয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, এ ব্যাপারের সম্পূর্ণ দোষ ডাঃ খারের। মহাকোশলের মন্ত্রীদের সহযোগিতা লাভ তাঁর পক্ষে যদি অসম্ভবই হয়েছিল পদত্যাগ করবার আগে পার্লামেণ্টারী কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটির নিকট প্রতিকারের জন্য কেন তিনি উপস্থিত হলেন না। এবিষয়ে আমাদেরও মনে হয়, পদত্যাগ করবার আগে ওয়ার্কিং কমিটীর মতামত না নিয়ে এবং পদত্যাগ করবার পরেও নতুন কমিটি গঠন করে ডাঃ খারে শুধু নিয়মানুবর্ত্তিতাই ভঙ্গ করেছেন

তা নয়, গভর্ণরকে বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ দান করে কংগ্রেসের নীতি ও সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। এই নিয়মানুবর্ত্তিতা ছাড়া কোন বড় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কার্যকরীভাবে শক্তিশালী হওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শুক্ল ও তাঁর সহযোগীদেরও যুক্তদায়িত্বের নীতি এবং স্থানীয় আনুগত্যের দিক দিয়ে পদত্যাগ করাই শোভন ও উচিত ছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। ওয়ার্কিং কমিটির প্রশংসা তাঁরা লাভ করেছেন—পরিষদের কংগ্রেসীদলের ও দলপতির নির্দ্দেশ নিরপেক্ষভাবে চলা যদি এভাবে অনুমোদন লাভ করে তবে নিয়মতান্ত্রিক শাসন অথবা Responsible Government চলতে পারে না। তারপর এ ব্যাপারে পার্লামেন্টারী কমিটিরও ক্রটি রয়ে গেছে। তাঁরা মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রীদের মধ্যে অসন্তোষের কথা জানা সত্ত্বেও কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করেননি—এবং সর্দ্দার প্যাটেল মহাকোশলীয় মন্ত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন, এ অভিযোগও শোনা যায়। এ সব বিষয়েই ওয়ার্কিং কমিটির উপযুক্ত তদন্ত করা উচিত।

সর্ব্বশেষ এবিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটির দায়িত্ব কি? কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে একপ্রকার দ্বৈত আনুগত্যের প্রবর্ত্তন করা হোয়েছে। Responsible Governmentএর নিয়মানুযায়ী কংগ্রেসমন্ত্রীরা পরিষদের নির্ব্বাচিত সভ্যদের নিকটই তাঁদের কার্য্যকলাপের জন্য দায়ী। যতদিন মন্ত্রীগণ পরিষদের বৃহত্তম দলের বিশ্বাসভাজন থাকবেন, ততদিন তাঁদের পদত্যাগ দাবী করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই এবং তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না কোরলে বাধ্য করবারও কোন উপায় নেই। কিন্তু ডাঃ খারের ঘটনাতে আমরা দেখছি স্থানীয় পরিষদের বিশ্বাসভাজন থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বিশ্বাস হারাবার ফলে ডাঃ খারে পদত্যাগ করতে বাধ্য হোলেন। এতে পরিষদের পরিবর্ত্তে ওয়ার্কিং কমিটির নিকট তাঁর কার্য্যকলাপের জন্য তিনি দায়ী প্রমাণ হোল—প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অথবা Responsible Government,এই উভয়ের নীতিই এতে ক্ষুণ্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ ডাঃ খারে সরলভাবে তাঁর ব্যবহারের জন্য দুঃখপ্রকাশ কোরে পদত্যাগ না করলে কি অবস্থা দাঁড়াত—ওয়ার্কিং কমিটি তখন কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন? সাধারণ কোন উপায়ে তাঁকে পদচ্যুত করা সম্ভব হোত না। ওয়ার্কিং কমিটি ডাঃ খারেকে পুনঃ নির্ব্বাচনপ্রার্থী হোতে অনুমতি না দিয়ে জটিলতার হাত থেকে হয়তো উদ্ধার পেয়েছেন কিন্তু তাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হোয়েছে আর এ বিক্ষোভের কারণও রয়েছে; ডাঃ খারে এখনো স্থানীয় কংগ্রেস দলের বিশ্বাসভাজন। এরূপ অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির কি করা উচিত সে বিষয়ে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ কোরে ভবিষ্যতের জন্য সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া উচিত ছিল। ব্যক্তি অপেক্ষা কোন প্রতিষ্ঠান বড়, কিন্তু যখন ডাঃ খারে ও মিঃ নারিম্যানের মত বহুমানিত নিষ্ঠাবান কর্ম্মীরা ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন লাভ করছে না—তখন ওয়ার্কিং কমিটির নিজের কোন ক্রটি বা ব্যক্তিবিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব আছে কিনা তার বিচার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

বাংলার অনাস্থা প্রস্তাব

হক্ মন্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব আনা উপলক্ষ্য কোরে কল্‌কাতার তথা বাংলার আবহাওয়া গত কয়েকদিন অতিমাত্রায় উষ্ণ হোয়ে উঠেছিল। দশজনের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক ভাবে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব আনবার অনুমতি স্পীকার দেন। গত ৮ই আগষ্ট এবিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। কাশিমবাজারের মহারাজার বিরুদ্ধে প্রথম অনাস্থার প্রস্তাব আনা হয়। তপশীল শ্রেণীভুক্ত শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় রায় এই প্রস্তাব আনেন। ভোট গণনায় বিরোধীদলের পক্ষে ১১১ ও সরকার পক্ষে ১৩০ জন দেখা যায়। সরকার পক্ষের ১৩০টি ভোটের ১০৭টি কোয়ালিশন দলের ও ২৩টি ইউরোপীয়ান দলের ভোট। মিঃ সুরাবর্দ্দীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অনাস্থার প্রস্তাব আলোচনার সময় মন্ত্রীদলের আবদার রহমন সিদ্দিকি, বিরোধীদলের উপর কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ আনেন। বিরোধীদল বিশেষ প্রতিবাদ করায়, অধিকার সংরক্ষণ কমিটির উপর বিষয়টি অনুসন্ধানের ভার দেওয়ার পর দ্বিতীয় দিনের সভা স্থগিত করা হয়। পরের দিন অধিকার সংরক্ষণ কমিটির বিবরণ পরিষদে উপস্থিত করার পর মিঃ সিদ্দিকী তাঁর মিথ্যা অভিযোগ সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা বুধবার পর্য্যন্ত চলে। বুধবার রাত্রে ডিভিশন ছাড়াই অনাস্থা প্রস্তাব পরাজিত হয়। মিঃ মুকুন্দবিহারী মল্লিকের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবেরও অনুরূপ ফল হয়। বাকী ৭টী প্রস্তাব আর উত্থাপন করা হয় নাই। অনাস্থা প্রস্তাবের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত দলগুলি ভোট দেন। কংগ্রেস ৫৩ (সম্পূর্ণ সদস্যসংখ্যা) কৃষক প্রজাপার্টি ১৮; স্বতন্ত্র তপশীলশ্রেণীভুক্ত দল ১৫, স্বতন্ত্র প্রজাদল ১৪, ন্যাশানালিষ্ট ৫, ভারতীয় ক্রিশ্চান ২, স্বতন্ত্র লেবারপার্টি ২, এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ১, চা-বাগানের প্রতিনিধি ১। সরকার পক্ষে কোয়ালিশন ৮১, তপশীলভুক্ত দল ৯, মন্ত্রী ১০, ন্যাশানালিষ্ট পার্টি ৪, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ৩ ও ইউরোপীয়ান ২৩।

উপরের তালিকা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে, একমাত্র ইউরোপীয়ান দলের বিরুদ্ধতার ফলে বর্ত্তমান অনাস্থা প্রস্তাব পরাজিত হোয়েছে ও ভবিষ্যতেও হবে। বাংলার স্বার্থ আর বাংলার আয়ত্বাধীন নয়—weightage প্রাপ্ত ইউরোপীয়ানদের খেয়ালের উপরেই সম্পূর্ণভাবে তা নির্ভর করে। ইউরোপীয়ানদলের স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল সরকারপক্ষে ভোট দেওয়ার কারণ বর্ণনা কোরে এক বিবৃতি দেন, তিনি বলেন "ইউরোপীয়ান দলের, সরকারপক্ষের সঙ্গে কোন বিশেষ সম্বন্ধ নেই" তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই প্রদেশে "উত্তম শাসন রক্ষা করা"। তিনি আরো বলেন যে মন্ত্রীমণ্ডল কখনো কখনো সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হোয়েছেন বলে মনে হয়। পরিষদের কাজ তাঁরা অতিমাত্রায় তাড়াহুড়া কোরে অনেক সময় সম্পন্ন কোরতে চেয়েছেন—পাবলিক সার্ভিস কমিশনের রিপোর্টের সন্তোষজনক বিচার হয়নি—এবং বিভাগীয় শাসনেও বহু ক্রটী রয়ে গেছে।

কিন্তু সার জর্জ্জের নিকট এসব ক্রটী অতি সামান্য, কারণ তাঁর মতেই আবার—"অর্থবিভাগ ও নিয়মশৃঙ্খলা বিভাগের কাজ বিশেষ প্রশংসনীয়"। বিভাগ দুটীর নির্ব্বাচন ভালই হোয়েছে।

তবে সরকারপক্ষকে সমর্থন করবার সপক্ষে স্যার জর্জ্জের আশ্চর্য্যতম যুক্তি "নূতন কোন মন্ত্রী মণ্ডল গঠিত হোলে স্বদলত্যাগী বহু সভ্যের তাতে থাকা অনিবার্য্য—এরূপ অবস্থায় ইউরোপীয়ান দল এই মন্ত্রীমণ্ডলকে বিশ্বাস করতে পারেন না"।

ডেমোক্রেসীর এই অত্যদ্ভুত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নেই—দল যদি তার গৃহীত নীতিকে বর্জ্জন করে তবু সভ্যেরা দলত্যাগ করতে পারবে না—বা পারলেও বিশ্বাসভাজন হবার দাবী তাদের থাক্‌বে না এ যুক্তি আর কিছু না হোক, নূতন বটে।

এই অনাস্থা জ্ঞাপনের প্রস্তাব উত্থাপনের ফলে কল্‌কাতায় এক অস্বাভাবিক আশঙ্কাপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। মিঃ হুমায়ুন কবীর ও আরো দুএকজন সভ্যের উপর যে শুধু আক্রমণ হয় তা নয়—গুণ্ডাদ্বারা পথে ঘাটে আক্রান্ত হবার আশঙ্কাতে বিরোধীদলের সভ্যদের পরিষদে রাত্রি যাপন পর্য্যন্ত করতে হয়। "ইসলাম বিপন্ন" এই ধূয়া তুলে দিয়ে বর্ত্তমান মন্ত্রীমণ্ডল যে বিভীষিকার প্রবর্ত্তন করেছেন, বাংলার ইতিহাসে তার উদাহরণ পাওয়া যায় না। নিয়মশৃঙ্খলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সার জর্জ্জের নিকট আমাদের জিজ্ঞাস্য—এই যথেচ্ছাচার নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষারই একটী বিশেষ অঙ্গ কিনা?

সমস্ত দেশের অসন্তোষ ও অনাস্থাকে অবজ্ঞা কোরে এই যে হক মন্ত্রীমণ্ডলী ইউরোপীয়ানদের সহায়তায় মসনদ কায়েমী কোরে নিল এই অবস্থার প্রতীকারের পথ আর কি আছে সে সম্পর্কে কংগ্রেসের নির্দ্দেশের অপেক্ষা দেশ করছে।

সিন্ধুতে মন্ত্রি সঙ্কট—

সিন্ধুপ্রদেশে লয়েড্‌ বাঁধ ও খালকর বৃদ্ধি সম্পর্কে একটী গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হয়। বিষয় দুইটী খাস অঞ্চলের অধীন এবং এ অঞ্চলের ভূমিকর ক্রম বর্দ্ধমান হারেই বৃদ্ধি করা হোয়ে থাকে, তার ফলে প্রজাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। কংগ্রেসী সদস্যগণ স্বতন্ত্র হিন্দু ও সম্মিলিত মুসলিমদল এই কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন এবং মন্ত্রীমণ্ডলীও গভর্ণরকে এ বিষয়ে জানান। গভর্ণর যদি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ কোরে কর বৃদ্ধি করতেন তবে মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাক্‌তো না। মন্ত্রীমণ্ডলীও পদত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। গভর্ণর খাজনা হারের পুনর্নির্দ্ধারণ এক বৎসরের জন্য স্থগিত রেখে আসন্ন মন্ত্রীসঙ্কট বন্ধ করে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধান মন্ত্রী আলাবক্স কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম ও সিন্ধুপ্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চৈৎরাম গিদওয়াণীর সঙ্গে আলাপ কোরে কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করতে সম্মত হন। আসন্ন সঙ্কট এভাবে মিটমাট হওয়ায় সকল পক্ষেরই সুবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশে দাঙ্গা—

কয়েকজন মুসলমান বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্বন্ধে একটী বই প্রকাশ করবার ফলে রেঙ্গুণে ভীষণ এক দাঙ্গা হয়। ফলে ৪০ জন আহত হয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই মুসলমান। সামরিক

পুলিশ এসে দাঙ্গা বন্ধ করে। কয়েকজন হত, বহু লোক আহত এবং গ্রেপ্তার হয়। ভারতবাসীদের প্রতিই দাঙ্গাকারীদের বিশেষ আক্রোশ এই সংবাদে সমস্ত ভারতবাসী অত্যন্ত চিন্তিত হোয়ে পড়েন। প্রেস প্রতিনিধি মারফৎ প্রধান মন্ত্রী এক বিবৃতি প্রকাশ কোরে জানিয়েছেন যে ব্রহ্ম সরকার শান্তি স্থাপনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। এই বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম্ম বিপদাপন্ন এই অজুহাতে একমাত্র ভারতবর্ষেই দাঙ্গাহাঙ্গামা হোতে দেখা যায়—এর বাস্তবিক কারণ কি? অন্যদেশেও তো বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক রয়েছে কিন্তু ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে হতাহত হোতে দেখা যায় না।

বিশ্বশান্তি সম্মেলন—

জুলাই মাসের শেষ ভাগে প্যারিসে বিশ্বশান্তি সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ত্রিশটী দেশের একহাজার প্রতিনিধি ও বহু দর্শক এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পণ্ডিত জওহরলালও বক্তৃতা করেন। শান্তি সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে গিয়ে জওহরলাল বলেন "যুদ্ধের বিলোপ কামনা কোরে কোন লাভ নেই যদি তার মূল, সাম্রাজ্যবাদ দূর করা না যায়। সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র রূপ ফ্যাসিজম নয়। ইংলণ্ড যখন উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বোমাবর্ষণ করে তখনও এই সাম্রাজ্যবাদেরই একরূপ আমরা দেখতে পাই।"—যতদিন এধরণের ঘটনা বন্ধ না হয় ততদিন শান্তি ও ঐক্য সম্বন্ধে ভাল ভাল বক্তৃতায় কোন লাভ নেই।

ভারতের সামরিক ব্যয়—

যুদ্ধের ছায়া সমস্ত জগতের উপরে পড়েছে আর সব রাষ্ট্রগুলি পাল্লা দিয়ে চলেছে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ে কে কাকে এড়িয়ে যাবে। সম্প্রতি কমন্স সভায় সমর সচিব ঘোষণা করেছেন যে সামরিক ব্যয় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড থেকে ৬ লক্ষ পাউণ্ড পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। এর অংশ বিশেষ যে ভারতবর্ষকে বহন করতে হবে তা সুনিশ্চিত। গত ৯ই আগষ্ট এ সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্য মিঃ সত্যমূর্ত্তি একটী মূলতুবী প্রস্তাব আনেন। পরিষদের বিভিন্ন দল, এমন কি ইউরোপীয়ান দলও সামরিক ব্যয় বৃদ্ধিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। ভারত রক্ষার নাম কোরে যে বৃটীশ সেনাদল ভারতে রাখা হয় নামে মাত্র তারা ভারত রক্ষা করে। আসলে সাম্রাজ্য রক্ষা কাজের জন্যই তাদের প্রয়োজন। ভারতরক্ষার জন্যে সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এজন্য বিদেশী সৈন্যবাহিনী না হোলে চল্‌বেনা একথা আমরা স্বীকার করিনা। ভারতরক্ষায় ভারতীয় সৈন্যের ব্যবস্থা করলে খরচ অনেক কম হোত। জাপানের বার্ষিক সামরিক ব্যয় যেখানে ৩০ কোটী টাকা, ভারতের ব্যয় সেখানে ৫০ কোটী টাকা। ভারতের সমস্ত রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ টাকা এজন্যেই ব্যয়িত হয়। এর উপরও আরো ব্যয় বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দেশের মঙ্গল সম্পর্কে নিদারুণ উদাসীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভা—

এবৎসর স্যার আক্‌বর হায়দারী এই সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি সাম্প্রদায়িকতার উল্লেখ কোরে বলেন, বিষয়টী গুরুত্বের ও প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে প্রথম শ্রেণীর

একটী সমস্যা। একজাতীয়ত্ব বোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তিতে এই সমস্যার মীমাংসা হওয়া সম্ভব নয় একথা আমি বিশ্বাস করি না। সকল ধর্ম্মই সহানুভূতি ও পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় অথচ এই ধর্ম্মকে উপলক্ষ কোরেই যত হিংসা দ্বেষ দলাদলি এটা অতি বেদনাদায়ক। তিনি ইতিহাসকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন।

সার আকবরের বক্তৃতার কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন এই বলে যে তিনি হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি হওয়া সত্বেও হায়দারাবাদে হিন্দুদের প্রতি ব্যবহারে উৎকট সাম্প্রদায়িকতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি বাস্তবিক এ কথা সত্য হোয়ে থাকে তবে সার হায়-দারীর বক্তৃতার মূল্য অনেকাংশেই কমে যায়। আমরা আশা করি হায়দারাবাদ ষ্টেটকে সাম্প্র-দায়িকতার দোষ থেকে মুক্ত কোরতে তিনি প্রয়াস পাবেন।

মুস্লিম বিবাহবিচ্ছেদ আইন ও পণ্ডিত সভারকার—

কেন্দ্রীয় সভাতে মুস্লিম বিবাহবিচ্ছেদ আইনের এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হোয়েছে। হিন্দু মহাসভার সভাপতি মিঃ সভারকার সে সম্পর্কে একটী বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। কি কি কারণে হিন্দু-সমাজের পক্ষে এ ক্ষতিজনক সে বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে এতে প্রথমতঃ হিন্দুদের ব্যক্তিগত আইনের উপর অহিন্দুকর্ত্তৃক অধিকার স্থাপন করা হোয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিল মুস্লিম নারীকে অবাঞ্ছিত বিবাহবন্ধন থেকে মুক্তি দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হওয়া সত্বেও এই বিলের ৫ ধারা মুস্লিম ধর্ম্ম ও আইন সম্মত অধিকার সঙ্কুচিত করে মুস্লিম মেয়েদের উপর নূতন শৃঙ্খল চাপিয়ে দিয়েছে। পূর্ব্বে কোন মুস্লিম নারী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলেই বিবাহবিচ্ছেদ ঘটত, কিন্তু এই নূতন আইনে তা সম্ভব হবেনা।

এই বিল কি ভাবে অপহৃত হিন্দু নারীদের পক্ষে ক্ষতিজনক হবে তা বর্ণনা কোরে তিনি বলেছেন—

"সকলেই জানেন যে হিন্দু নারী হরণ কোরে মুসলমান করবার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ও আক্রমণ হোয়ে থাকে। এতদিন পর্য্যন্ত এই অপহৃত মেয়েদের উদ্ধার কোরে এনে শুদ্ধি দ্বারা হিন্দু করায় মুস্লিম আইন অনুসারে স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটত; কারণ মুস্লিম আইনে আছে যে, কোন মুস্লিম নারী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলেই তার স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটবে। এই আইন প্রণয়ণ কোরে হিন্দুদের এ অধিকার থেকে যদি বঞ্চিত করা হয়, তবে যে সব নারীদের জোর কোরে মুসলমান করা হোয়েছে, তাদের অবস্থা পরিবর্ত্তনের আর উপায় থাকে না। এতে দেখা যাচ্ছে অবাঞ্ছিত বিবাহ বন্ধন থেকে মুস্লিম মেয়েদের মুক্তি দেওয়া এ বিলের উদ্দেশ্য নয়—বাস্তবিক উদ্দেশ্য শুদ্ধি আন্দোলন বন্ধ করা।"

তিনি আরো বলেন, "এই একই কারণে এ বিল ক্রিশ্চান ও অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেছে।" তিনি বিলটীকে জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বলেও বর্ণনা করেন। কারণ এর একটী বিশেষ ধারা এই যে, বিবাহিত মুস্লিম নারী বিবাহ বিচ্ছেদের

জন্যে আবেদন করলে তার মীমাংসা কোন মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হবে এবং আপীলের ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের কোন মুসলমান বিচারপতি আপীল গ্রহণ ও মীমাংসা করবেন।

এই ব্যবস্থা দ্বারা বিচার ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার প্রবর্ত্তন করা হোচ্ছে। জাতীয় ঐক্যেরও এ পরিপন্থী। মুসলমানরা যদি এ অধিকার দাবী করেন তবে অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকেও এ অধিকার দাবী করবেন। ফলে যতগুলি সম্প্রদায়, প্রত্যেকটীর জন্য এক একটী পৃথক কোর্টের ব্যবস্থা করা দরকার হবে। এর ফল যে কি হবে সহজেই অনুমেয়।

ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক—

(ক) **যন্ত্রশিল্পের উন্নতি**—গত ১৫শে জুলাইর অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটি বিভিন্ন প্রদেশ গুলিতে শিল্পের উন্নতি সম্ভব করবার জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে বিভিন্ন প্রদেশে বর্ত্তমানে যে সকল শিল্প আছে তাদের উন্নতি ও নূতন শিল্পের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সংগ্রহ বিবরণ ও শিল্পের ভার-প্রাপ্ত মন্ত্রীদের একটী সম্মেলন অনতিবিলম্বে আহ্বান করবার ক্ষমতা কংগ্রেস সভাপতিকে দেওয়া হউক। যাতে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এক কমিটি গঠন কোরে সর্ব্ব-ভারতীয় শিল্পের উন্নতির কোন পরিকল্পনা করা কতদূর সম্ভব তা নির্ণয় করা যায়।

ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবকে আমরা সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করি। আমরা বিশ্বাস করি যন্ত্র-শিল্পের উন্নতি দ্বারা ভারতবর্ষের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দূর হওয়া সম্ভব নয়। কারো কারো বিশ্বাস ব্যাপকভাবে যন্ত্র-শিল্পের প্রসারে অধিকতর লোক কর্ম্মহীন বেকার অবস্থা প্রাপ্ত হবে; আবার অনেকে মনে করেন ভারতের আত্মিক সম্পদ গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত এবং যন্ত্র শিল্পের প্রসারে ভারতবর্ষ তার আধ্যাত্মিকতাকে হারাবে। এই দুই মতের কোনটীই যুক্তিসহ নয়। আমরা সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যেসব দেশ—যেমন আবিসিনিয়া, চীন—নূতন উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেনি তাদের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস কি। উন্নততর ও কালোপযোগী উৎপাদন-পদ্ধতি যারা গ্রহণ করেছে সে সব শক্তির দ্বারা তারা আক্রান্ত ও সহজে পরাভূত হোয়েছে বা হবার আশঙ্কা রাখে। ভারতবর্ষ যদি ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ না করে তবে তার ভাগ্যেও অনুরূপ আশঙ্কা অমূলক নয়। কাজেই এ বিষয়ে দেশকে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ কংগ্রেসকে দিতে হবে। যন্ত্র শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে কোন প্রকার অস্পষ্টতা অথবা দ্বিধা বিশেষ ক্ষতিজনক হবে। ব্যক্তি বিশেষের মতকে সমর্থন করতে গিয়ে দেশের পক্ষে বাস্তবিক প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলজনক ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস যদি অস্পষ্টতা রাখে তবে কর্ত্তব্যের হানি হবে। ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখবার দিন আর নেই সমস্ত জাগতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হোয়ে গেছে। কাজেই ভারতবর্ষের পক্ষে কি উপযোগী বা প্রয়োজন তার বিচার ও নির্ণয়ন শুধু ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের পাতায় নেই—আছে বর্ত্তমান জগতের বাস্তব অবস্থার মধ্যে। সেদিক দিয়ে সব সমস্যার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

(খ) **মিঃ জিন্নার পত্রের উত্তর**—ওয়ার্কিং কমিটি মিঃ জিন্নার চিঠির উত্তরে জানিয়েছেন যে তাঁরা মুস্লিম লীগকেই ভারতের মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকার করতে রাজী নন্। কংগ্রেসের জাতীয়তার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা কোরে এ দাবী গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনার সময় লীগের প্রতিনিধি ছাড়া জাতীয়তাবাদী বা অন্য কোন মুসলমানকে আহ্বান করা হবে না, এরূপ প্রতিশ্রুতিও ওয়ার্কিং কমিটি দিতে পারেন না। প্রয়োজন বোধে যে কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি আহ্বান করবার অধিকার কংগ্রেসের থাক্‌বে।

উপসংহারে কংগ্রেস কমিটি জানিয়েছেন যে, তাঁরা আশা করেন মুস্লিম লীগ ঐ সর্ত্তগুলি বিবেচনা কোরে নিজেদের দাবী এভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন, যাতে আরব্ধ আলোচনা চালানো সম্ভব হয়।

দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস এখনো লীগের শুভবুদ্ধির উপর আশা রাখে—তবে আশা রাখ্‌বার বিশেষ কারণ আছে বলে তো আমাদের মনে হয় না।

(গ) **যুক্তরাষ্ট্র**—ওয়ার্কিং কমিটির বিগত বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে বিতর্ক উঠেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়। এই আলোচনার ফলে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হোয়েছিল তা দূর হয়। স্থির হয় ওয়ার্কিং কমিটির ঐ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন আলোচনা হবে না, কারণ নেতৃবর্গ মনে করেন কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনের পর এমন কোন নূতন অবস্থার উদ্ভব হয়নি যার জন্যে এ সম্পর্কে নূতন কোরে আলোচনার প্রয়োজন হোতে পারে।

বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল—

বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ সরকারী আওতায় আন্‌বার যে নির্লজ্জ চেষ্টা সমস্ত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমতকে উপেক্ষা কোরে চলেছে, তার আর একটী প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর সরকার পক্ষ একটি শিক্ষা বিলের খস্‌ড়া প্রণয়ন করেন। খস্‌ড়াটী গোপন রাখা সত্ত্বেও প্রকাশ হোয়ে পড়ে এবং দেশহিতৈষী সমস্ত হিন্দু মুসলমান মাত্রেই তার তীব্র প্রতিবাদ করেন। এর ফলে মিঃ ফজলুল হক্ ঐ খস্‌ড়া পরিত্যাগ করেন এবং কর্ত্তব্য আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটী সম্মেলন আহ্বান করেন। বহু আলোচনা সত্ত্বেও মীমাংসা সম্ভব হয় নি। কারণ শিক্ষামন্ত্রী আপত্তিজনক বিধানগুলি বাদ দিতে কিছুতেই রাজী হন্ নাই। তবে সে খস্‌ড়া পরিত্যাগ করা হয়।

শিক্ষা বিভাগ আর একটী নূতন বিল্ শীঘ্রই বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে উত্থাপন করবেন। সম্প্রতি তার যে খস্‌ড়া প্রকাশিত হোয়েছে—পূর্ব্বের বিল অপেক্ষা ও তাতে আরো সংস্কার-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু মুসলমান নিরপেক্ষভাবে বাংলার হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই বিলকে বাধা দেওয়া উচিত যাতে শিক্ষা বিভাগের আবহাওয়া সরকারী প্রভাবের দ্বারা কলুষিত না হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন ভাইস চ্যান্সেলার—

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কার্য্যকাল শেষ হোয়েছে। গত শনিবার সেনেটের এক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জ্ঞাপক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সার নীলরতন সরকার, শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের কাজের ভূয়সী প্রশংসা কোরে বলেন "পিতার স্বপ্ন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করা—পুত্র সে স্বপ্ন সফল কোরেছেন।" সার রাধাকিষণ, ডাঃ বিধানচন্দ্র, শ্রীযুক্ত চারু বিশ্বাস অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশ, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ ও কাজের উচ্চ প্রশংসা করেন। অভিনন্দনের উত্তরে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বলেন যে, "বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহানুভূতি, সাহায্য ও সমর্থন লাভ করার ফলেই তাঁর যা কিছু সফলতা সম্ভব হোয়েছে। তাঁদের সামনে বিপদের দিন আসছে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপদ নয় বাংলা তথা ভারতের ও ভারতের বাইরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে বিপদ সমস্ত জগতের উপর ঘনায়মান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সভাগণ যদি নিজেদের অধিকার ও আদর্শ রক্ষা বিষয়ে সজাগ হন তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভয়ের কিছু নেই।" সর্ব্বশেষে তিনি বলেন "বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি ভালবাসেন এই জন্য যে তিনি বিশ্বাস করেন এর মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর মধ্যে একটা নবজীবন আনা সম্ভব।"

চ্যান্সেলার, ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার, খান বাহাদুর মিঃ আজিজুল হককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মনোনীত করেছেন। ৮ই আগষ্ট থেকে তাঁর কার্য্যকাল আরম্ভ হয়েছে। আমরা আশা করি নূতন ভাইস চ্যান্সেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবেন।

ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠদল—

"পাঞ্জাব রিভিউ" পত্রিকায় অধ্যাপক শেট্টী ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রসঙ্গে বলেছেন—"ভারতের মতো আর কোন দেশ, এতগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠদলের গৌরব করতে পারে না। ১৯৩৫ এর ভারতীয় শাসনবিধি দশটী সংখ্যালঘিষ্ঠদল স্বীকার কোরেছে। এগুলি হোচ্ছে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, অনুন্নতশ্রেণী, ভারতীয় আমেরিকান, এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান প্রভৃতি। এই শ্রেণীবিভাগের কোন নীতিগত ঐক্য নেই। বিভিন্ন কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠদল বলে গণ্য হবার দাবী উত্থাপন ও সরকার কর্ত্তৃক অনুমোদন করা হয়। কোনো কোনো দল দাবী স্থাপন করেন তাঁদের অনুন্নত অবস্থার উপর, কোনো কোনো দল আবার তাঁদের ঐশ্বর্য্য, শিক্ষা ইত্যাদির উপর দাবী উত্থাপন করেন—কোনো দল বিগত যুদ্ধে তাঁদের বিশ্বস্ততা ও কাজ এবং সৈন্যদলে তাঁদের মূল্যের উপর নির্ভর কোরে দাবী পেশ করেন। এইরূপে নানা কারণে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলে গণ্য হবার দাবী উত্থাপন করা হয়।

"ভারতীয় সমস্যার আর একটী বৈশিষ্ট্য যে ইউরোপের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি যেমন জাতিগত, ভারতবর্ষে তেমন নয়। এখানে একটী বাদে সব সংখ্যালঘিষ্ঠদলই একজাতিরই অংশ। কোন

দলই বিদেশী নয়। তাদের ভিত্তি প্রধানতঃ সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বা রাজনৈতিক। ইউরোপে এরূপ দলকে লিগ স্বীকার করবে না। রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কারণে কোনোদলকে সংখ্যালঘিষ্ঠদল বলে লিগ স্বীকার করবেনা। এছাড়া জনসংখ্যার এক বিশেষ অনুপাত নাহলে কোনো সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠদল বলে স্বীকার করা হয় না। এই নিম্নতম অনুপাত হোচ্চে শতকরা ২০।

" আসলে ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠের সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা—হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সমস্যা। অন্যান্য সম্প্রদায়েরা দেখাদেখি এখন ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে সংখ্যালঘিষ্ঠদল বলে স্বীকৃত হবার দাবী করছে।"

লেখক উপসংহারে বলেন "হিন্দু মুসলমান সমস্যা আসলে ক্ষমতা লাভের জন্য দ্বন্দ। মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়ার দরুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুসমাজকে ভয়ের চক্ষে দেখে। হিন্দুরাও সর্ব্বভারতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহে নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান।

ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খাকে কেন্দ্র কোরে সমস্যাটীর জন্ম, কাজেই এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই আবদ্ধ। জনসাধারণ এদ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নি। সমস্যাটী প্রধানতঃ সহরগত, গ্রামে এখনো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য রয়েছে।" এই সংখ্যালঘিষ্ঠদের সমস্যা মীমাংসার একটী উপযুক্ত ভিত্তি স্থির হওয়া উচিত এবং সে ভিত্তি যাতে কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন তার জন্য উপযুক্ত আন্দোলন প্রয়োজন।

যুক্তপ্রদেশে কারা-সংস্কার—

যুক্তপ্রদেশের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি কারাসংস্কার সম্পর্কে একটী কমিটি গঠন করেন। সেই কমিটি নিম্নলিখিত রূপ সুপারিশ করেছেন। ৫৫ বৎসরের অনূর্দ্ধ সমস্ত কয়েদীদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং জেলে বেত্রদণ্ড তুলে দেওয়া।

মেয়েদের জন্য একটী পৃথক জেলের সুপারিশ এতে করা হোয়েছে। এবং এর জন্য বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নেওয়া হবে। এদের শিক্ষা দেবার জন্য একটী স্কুল অবিলম্বে স্থাপিত হওয়া দরকার। ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হোলে কাউকে যেন নিযুক্ত করা না হয়। ওয়ার্ডারদের জন্য নির্দ্দিষ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ওয়ার্ডারদের পাশ করতে হবে।

যে সকল বন্দীরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যযুক্ত অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত তাদের "রাজনৈতিক বন্দী" বলে অভিহিত করতে হবে কিন্তু সাম্প্রদায়িক কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনক্রমেই "রাজনৈতিক" আখ্যা দেওয়া চলবে না। অন্যান্য কারণে দণ্ডিত বন্দীদের অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করা হবে—সামাজিক অবস্থা হিসাবে নয়।

কারা বিভাগকে সাহায্য করবার জন্য সরকারী ও বে-সরকারী কর্ম্মচারী নিয়ে একটী উপদেশক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হোয়েছে।

বিগত কয়েক বৎসর রাজনৈতিক কারণে বহুলোক জেলে যাবার ফলে ভারতীয় জেলগুলির আভ্যন্তরিণ অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সকলেই জান্‌তে পেরেছেন ও কারা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনমত গঠিত হোচ্ছে। বাঙ্‌লাদেশের জেলগুলি সম্বন্ধে আমাদের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হোয়েছে তা থেকে নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে বাংলার কারা সংস্কারের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ হওয়া দরকার ও এবিষয়ে তদন্তের জন্য একটী কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। ভারতবর্ষের জেলগুলির নিম্নতম সংস্কার কি হওয়া উচিত এ বিষয়ে নির্দ্ধারণ করবার জন্য কংগ্রেস থেকে একটী কমিটি গঠিত হোয়ে সেই প্রস্তাবানুযায়ী সর্ব্বত্র কারা সংস্কার করবার চেষ্টা করা উচিত।

জাপ-সোভিয়েট সংঘর্ষ—

গত জুলাই মাসে মাঞ্চুকুও ও সোভিয়েট রাশিয়ার সীমান্তে চাং-কু-ফেং নামক স্থান সোভিয়েট বাহিনী অধিকার করে। জাপানী রাজদূত মস্কোতে ২০শে জুলাই এর প্রতিবাদ ও অবিলম্বে ঐ অঞ্চল থেকে সৈন্য বাহিনী সরিয়ে নেবার দাবী জানান। মিঃ লিট্‌ভিনফ্‌ এর উত্তরে জাপ দূতকে জানিয়ে দেন যে "বে-আইনীভাবে" অধিকার করবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার যোগ্যতা সকলের অপেক্ষা জাপানের কম। লিট্‌ভিনফ আরো বলেন যে "জাতীয় সীমান্তের অলঙ্ঘনীয়তা রক্ষা সম্পর্কে লালফৌজ সম্পূর্ণ সচেতন"। এরপর ৩০।৩১শে জুলাই রাত্রিতে জাপানী সৈন্য সোভিয়েট রক্ষীদের উপর গোলাবর্ষণ সুরু করে এবং সোভিয়েট এলাকায় কিছুদূর প্রবেশ করে। সোভিয়েট সৈন্য ঐ জায়গা আবার অধিকার করে। এই অঞ্চলের সামরিক অবস্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজেই আশঙ্কা হোচ্ছিল এর মীমাংসার জন্য জাপ-সোভিয়েট যুদ্ধ অনিবার্য্য। কারণ রাশিয়ার অন্তর-বিপ্লব ও ভালাডিভোষ্টকে সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে সোভিয়েট ও জাপানের সম্পর্ক কখনো স্বাভাবিক হয়নি। "তানাকা মেমোরিয়াল" প্রকাশিত হবার পর এই মনোমালিন্য আরো বেড়ে যায় কারণ এতে ঘোষণা করা হয়—প্রথম এশিয়া ও তারপর সমস্ত পৃথিবীর উপর জাপানের অধিকার স্থাপন করা প্রয়োজন। তখন থেকে রুশ-জাপান সংঘর্ষের ছায়া পৃথিবীর উপর পড়েছে।

তবে এবারকার মত ব্যাপার বোধহয় অতদূর গড়াবে না। সম্প্রতি মাঞ্চুকুও সীমান্তে রুশ ও জাপ সামরিক অফিসারগণ যুদ্ধবিরতিপত্র স্বাক্ষর করেছেন বলে সংবাদ এসেছে। শীঘ্রই সীমান্ত নির্দ্ধারণের জন্য উভয় পক্ষের লোক নিয়ে একটী কমিশন গঠিত হোয়ে কাজ আরম্ভ কোরবে।

বিশ্ব রাজনীতি ক্রমেই জটিল হোয়ে উঠ্‌ছে—রাষ্ট্রগুলির পরস্পর সম্পর্ক এমন যে, যে কোন সময় সামান্য বিষয়কে অবলম্বন কোরে আগুন জ্বলে উঠ্‌তে পারে।

বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি—

গত কমন্স সভায় আন্তর্জাতিক ব্যাপার আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন "শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের

সম্ভাবনা উপস্থিত হোয়ে যাতে বিরোধ না বাধতে পারে তার চেষ্টা করা বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন "কেউ যেন এতে মনে না করেন যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বৃটিশের মর্য্যাদা বা স্বার্থ বিসর্জ্জন দিব।"

বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি দ্বারা বর্ত্তমানে বৃটিশের মর্য্যাদা কতটা রক্ষা হোচ্ছে সন্দেহের বিষয়, তবে স্বার্থ রক্ষা নিশ্চয়ই হোচ্ছে। বৃটেনের পররাষ্ট্রনীতি চিরকাল দুটী জিনিষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোয়েছে তার ভৌগলিক অবস্থান ও পৃথিবী ব্যাপী সাম্রাজ্য।

ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ভারসাম্য ঠিক রেখে নিজের নিরাপত্তা রক্ষা করা আবহমানকাল থেকে বৃটিশ পররাষ্ট্রের একটী নীতি। যখনই কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্র শক্তিশালী হোয়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে বৃটেন সন্ধি কোরেছে বা যুদ্ধ কোরেছে। গত ৪০০ বৎসর ধরে সে এই নীতি অনুসরণ কোরে ইউরোপের রাষ্ট্র ক্ষেত্রে একচ্ছত্র প্রভুত্ব কোরে আসছে। বহি-রাআক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বেলজিয়ামের উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে বা তার স্বাধীনতা বিপদাপন্ন হোলেই বৃটেন বেলজিয়ামের নিরপেক্ষতা রক্ষা কোরতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছে।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশকে নিরাপদ করা বৃটিশ পররাষ্ট্রের দ্বিতীয় নীতি। কতকগুলি বিশেষ স্থান ও বাণিজ্য পথ সম্পূর্ণ অধিকারে রাখাই তার স্বার্থ। কিন্তু ন্যাশনাল গভর্ণমেণ্টের দুর্ব্বলনীতিতে উপরোক্ত দুইটী স্বার্থই ক্ষুণ্ণ হোচ্ছে।

যে কোন মূল্যে শান্তি রক্ষা করতে গিয়ে বৃটেন যে কেবল অন্যের স্বাধীনতা হরণের কারণ হোয়েছে তাই নয়—ভূমধ্য সাগরের পথও হারাতে বসেছে, লিগকে দুর্ব্বল কোরেছে এবং ইউরোপে নিজের মর্য্যাদা হারিয়েছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে যুদ্ধবিরোধী প্রচার সংক্রান্ত বিল—

নানা প্রলোভন সত্ত্বেও উপযুক্ত সংখ্যক লোক বৃটিশ সৈন্য দলে ভর্ত্তি হোচ্ছে না তার জন্য মূল্য দিতে হবে ভারতবাসীকে। ভারতবর্ষে যুদ্ধবিরোধী প্রচার কার্য্যকে দণ্ডনীয় করবার উদ্দেশ্যে নূতন একটী বিল কেন্দ্রীয় পরিষদে উত্থাপিত করা হবে। এ বিলটী বৃটিশ সাম্রাজ্যনীতির একটী অভিব্যক্তি। মত প্রকাশ ও প্রচারের স্বাভাবিক অধিকার সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনের কাছে একে একে বলি প্রাপ্ত হোচ্ছে। যা কিছু সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার পরিপন্থী নৈতিক ভিত্তি তা'র যতই থাকুক না কেন, তার দাবী স্বীকার করা অসুবিধাজনক, কাজেই আইন কোরে তাকে অসম্ভব কোরতে হবে। এই বিলের পরে বাধ্যতামূলক সামরিক আইন জারী কেবলমাত্র সময়ের প্রশ্ন।



পদ্মাপারে অরবিন্দ

[illegible]

জয়শ্রী

সপ্তম বর্ষ | আশ্বিন | চতুর্থ সংখ্যা

যাত্রা

অমিতা দেবী

তমিস্রার পরপার হতে
এসেছে আলোর ডাক্
ধরিত্রীর সর্ব্বহারা দল,
জাগো, জাগো, চিরমূক, আত্মহারা, দলিত, নির্ব্বাক্।
যুগান্তের অন্ধকার কুণ্ডলীর পাকে
যে বন্ধনে বেঁধেছে তোমারে
অধৈর্য্য বিদ্রোহে তুমি ছিঁড়ে ফেল তাকে,
অতন্দ্রিত যাত্রা কর গহন রাত্রির পরপারে।
রক্তে জ্বালি বহ্নির সঙ্গীত,
জ্বলন্ত আনন্দে তুমি
দিগন্তে ছড়ায়ে দাও বিপ্লবের অশান্ত ইঙ্গিত,
দুঃখদগ্ধ সভ্যতার শ্মশানের বুকে,
ঘুচাইয়া বঞ্চিতের আর্ত্ত হাহাকার,
রচি' তোল অনাগত জীবনের সুশ্যামল সৌন্দর্য্য-সম্ভার।

অথাতো পথ-জিজ্ঞাসা

অনিলচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে য়ুরোপে। সেখানে মানুষ আজ অমিত শক্তিতে প্রকৃতিকে শিকলে বেঁধে পোষ মানিয়েছে। কিন্তু আজকে বিংশ শতকের চতুর্থ দশকে দেখতে পাচ্ছি, সেখানকার আকাশ জুড়ে অন্ধকারের ঘটা; যে উজ্জ্বল রশ্মি—বিচ্ছুরণ গত ১০০ বছর থেকে চোখ ঝলসিয়ে দিয়েছে, আজকে সে প্রকাশ মেঘাবরণে ঢাকা পড়েছে। আকাশে রক্তসন্ধ্যার ইঙ্গিত, পৃথিবীর কোনে কোনে আসন্ন ভয়ের আভাস। সভ্য মানুষ আজ ভয়ে মরছে; যে অজ্ঞাতরূপ ভূমিকম্প বিশাল আলোড়নে কেঁপে উঠছে, তার ভয়ে; যে প্রলয়ঙ্কর টর্ণেডো আসন্নপ্রায় হয়ে উঠেছে, তার ভয়ে। চারদিকে অনিশ্চয়তার ছায়া; মানুষের মনে মনে দুঃসহ অশান্তি; মানুষের দিশেহারা চিত্ত আজ প্রশ্নের আঘাতে জর্জ্জর হয়ে উঠেছে; চিন্তায়, চেতনায়, বুদ্ধিতে, কল্পনায় আজ উত্তাল ঝড় উঠেছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে জটিল সঙ্কট। ধর্মে, রাজনীতিতে, পরিবারে, ললিতকলায়, নীতিতে,—সর্ব্বত্র কেবল জিজ্ঞাসার আলোড়ন; কিন্তু সমাধানের প্রশান্তি নেই। মিলটনীয় স্বস্তি বা ভিক্টোরীয় আত্মপ্রসাদ আজ সংশয় ও সংঘর্ষের চাপে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। ইতিহাসের যাত্রাধ্বনি আজ ছন্দহীন কোলাহলের মতো কানে লাগছে; চারদিকে যতো সুর উঠছে, কারুর সঙ্গে কারুর মিলছে না এবং সব মিলে যে বিচিত্র সঙ্গীত বেজে উঠছে সে নিতান্ত বেসুরো ও বেতালা। অদ্যকার 'symphony of history' বা ইতিহাসের ঐক্যসঙ্গীতে ঐক্য নেই, আছে অসঙ্গতি; সামঞ্জস্য নেই, আছে বিরোধ। সমপদী, বিষমপদী নানা পর্য্যায়ের বিপরীত ছন্দে ও তালে ইতিহাসের অগ্রগতি সৃষ্টি করেছে এক বিশৃঙ্খল 'তাল ফেরতা'। নানা মতবাদ, নানা দর্শন, ও নানা তন্ত্রের সংঘর্ষে আজ জীবন হয়ে উঠেছে কঠিন ও কর্কশ হট্টগোলে মুখরিত। একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ বলছেন: "If we turn our ears to Europe, we can hear, without the need of any short-wave radio, as many crises festivals as we like." সম্পত্তি, ষ্টেট, পরিবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র ও স্বেচ্ছাচারতন্ত্র, স্বায়ত্বশাসন ও একনায়কত্ব, পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, ফাসিস্ত-বাদ ও কম্যুনিষ্টবাদ, জাতীয়তা ও আন্তর্জ্জাতিকতা, সামরিক-তন্ত্র ও শান্তিতন্ত্র, প্রগতি-তন্ত্র ও রক্ষণশীলতা—সর্ব্বত্র, সকল ক্ষেত্রে মাথা উঠিয়েছে অন্তহীন সংঘর্ষ ও সঙ্কট (crises)। মাথার ওপর দিয়ে গত বিশ বছর যাবৎ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো গড়িয়ে চলেছে সঙ্কটের (crises) পর সঙ্কট। এমনি সঙ্কট আরো ঘটেছে জগতে; বহু যুগের বহুতর সঙ্কটকে পার হয়ে ইতিহাস আজ বিংশ শতকে উত্তীর্ণ হয়েছে; কিন্তু অদ্যকার গহন সঙ্কটের তুলনা নেই। যুগ যুগান্তরের সভ্যতার ভবিষ্যৎ চেয়ে আছে অদ্যকার সমাধানের দিকে। হয় মানুষ সুন্দর করে বাঁচবে; নতুবা একান্ত করে বিলুপ্ত হয়ে

যাবে। কিন্তু সামনে আজো অস্পষ্ট কুহেলিকা ; পথ বিসর্পিত হয়েছে কোন্ দিকে ? মানুষের প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল অন্ধকার গুহা থেকে ; আজকে Cave থেকে সরাসরি এসে পৌঁচেছে বিংশ শতকের মধ্যবিত্ত জগতের 'Main street'এ। এ সদর সড়কের পরে কী আছে ? একদা যে ছিল Paleolithic মানব, আজ সে দেখা দিয়েছে যন্ত্রযুগের সুসভ্য "Babbit" হয়ে। কিন্তু চারদিকের সংঘর্ষ ও অশান্ত কোলাহলের মাঝে চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে Babbit আজকে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠেছে ; তার জ্রূতে নেমেছে চিন্তার মেঘ ; তার মনে নেমেছে সংশয় ও ভয়ের তুফান। ফলে তার মধ্যবিত্ত নিশ্চিন্ত মন ধরা পড়েছে নৈরাশ্য আর cynicismএর লৌহ-মুষ্টিতে। চারদিকে আজ নৈরাশ্য ও অবিশ্বাস, সংশয় ও cynicism বড়ো বড়ো পা ফেলে বিচরণ করছে। সামনে কোন্ পথ আজ সত্যিকার পথ ?

পশ্চিমদিকে যে সংঘর্ষের ঝড় উঠেছে, আমাদের এই সনাতন দেশেও আজ সে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করেছে ; পশ্চিম সমুদ্রে যে সংশয় ও অনিশ্চয়তার ঢেউ উঠেছে, ভারতবর্ষের প্রাচীন তটেও সে ঢেউ এসে আঘাত করেছে। বিজ্ঞান পৃথিবীকে সঙ্কুচিত করে ফেলেছে ; পৃথিবী আজ হয়ে গেছে নিতান্ত ক্ষুদ্র। ফলে বহির্জ্জগতের যতো স্রোত ও আবর্ত্ত সবই ভারতবর্ষে ঢুকে সৃষ্টি করেছে অসংখ্য কুটিল আবর্ত্ত। এখানেও শুরু হয়েছে বেসুরো সঙ্গীত ও বেতালা ঐকতান। নানা মতের সংঘর্ষ ও নানা দলের সংঘাতে আবহাওয়া আলোড়িত হয়ে উঠেছে। প্রশ্নে, সংশয়ে, অবিশ্বাসে, মানুষের মন হয়ে উঠেছে জর্জ্জর ; গত নয় বছরের ঝড়ঝাপ্টায় সমস্ত পারিপার্শ্বিক বিপর্য্যস্ত হয়ে গেছে ; এই বিপর্য্যয়ের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের জগত থেকে প্রবেশ করেছে অগণিত ধারায় নব নব চিন্তা ও মননা ; সঙ্গে এসেছে বিচিত্র অনিশ্চয়তা ও বিপুল বিরোধ। যারা সমাজের ভবিষ্যৎকে রূপ দেবার স্বপ্ন দেখছেন সেই রূপশিল্পিদের মধ্যেও দল, উপদলের সংখ্যা নেই, এবং তাদের মধ্যে অন্ধ আত্ম-কলহেরও অবধি নেই। মননা নিয়ে, মত নিয়ে যে বিরোধ তাতে স্বাস্থ্যহানি ঘটে না, রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রগতিরও পথ রুদ্ধ হয় না। বরং তাতে ভবিষ্যৎ বিকাশের উপকরণ জমে ওঠে জাতির ভাণ্ডারে ; ব্যক্তিরও জীবনে সঞ্চিত হয় বুদ্ধির পরিতৃপ্তি ও আন্তরিকতার সহজ শক্তি। কিন্তু আজো আমাদের দেশে আদর্শ সর্ব্বত্র দানা বেঁধে ওঠেনি ; মতগুলো রয়েছে অস্পষ্ট নীহারিকার মত এবং মননা রয়েছে প্রকাশ-চেষ্টায় অর্দ্ধস্ফুট। এক্ষেত্রে মতামতের উপরে ভিত্তি করে সুনিয়ন্ত্রিত সংহতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কাজেই বহু-বিভক্ত দল ও উপদলের পরস্পরের মধ্যে যে সম্পর্ক তা' নিয়ন্ত্রিত হয়, মতামত দিয়ে নয়, অন্যান্য ব্যাপার দিয়ে।

কাজেই একদিকে মতামতের সংঘর্ষ ও অনিশ্চয়তা, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন দল, উপদলগুলির অযৌক্তিক কলহ, এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে এ দেশে সৃষ্ট হয়েছে এমন একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া যাতে কেবল সংশয় ও সন্দেহ ও অবিশ্বাসই বেড়ে চলেছে। সবরকম কর্ম্মপ্রচেষ্টার ওপরে এসেছে একটা তীব্র অশ্রদ্ধা ; সকল অনুষ্ঠানের ওপরে এসেছে একটা সংশয়িত বিরুদ্ধতা। Cynicism, নৈরাশ্যবাদ ইত্যাদির অস্বচ্ছ ও আবছায়া প্রভাবে দেশের উদার সবলতা লুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছে।

সর্ব্বসাধারণো এক রকমের Vanity complex জন্মেছে যার দরুণ সংসারের সব কিছুকেই ব্যর্থ বলে, মূল্যহীন বলে তারা আগে-ভাগেই ছাপ মেরে দেয় ও তাচ্ছিল্য করে।

জেরুজালেমের রাজা ডেভিড বলেছিলেন, "behold ! all is vanity and vexation of spirit"...আজকে অবিশ্বাসী মানুষের মুখে এই অশ্রদ্ধার বাণী, এই বিতৃষ্ণার আর্ত্ত বাক্য মুহুর্মুহু উচ্চারিত হচ্চে। মানুষের অধ্যাত্মজীবনে যেমন এ মায়াবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে, সংসারের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, নরনারীর জীবনের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সম্বন্ধেও মায়াবাদীর সংখ্যা অল্প নয়। চারদিকের সংঘাতবহুল পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে সবকিছুর ওপরেই জন্মেছে আমাদের অশ্রদ্ধা। একটা নিরানন্দ 'বৈরাগ্যযোগ' দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বনে-জঙ্গলে, সহরে-গ্রামে, মাটীতে মাটীতে তার শিকড় প্রবেশ করেছে। আমরা বালকবৃদ্ধ সবাই মিলে দু চক্ষুতে "নেতি-নেতি"র সংশয়াবিল চশমা পরে জীবনকে দেখছি। তার ফলে সব কিছুই আমাদের কাছে একান্ত নিস্প্রভ, পাণ্ডুর এবং নিরর্থক বলে মনে হয়েছে। চারদিকে আমরা একটা অস্বস্তিময় পরিমণ্ডল রচনা করেছি এবং তার মধ্যে চিরজীবন নাসিকা কুঞ্চিত করেই পথ চলেছি। ফলে আমাদের কাছে সবই হয়েছে গণ্ডীতে আবদ্ধ, সম্পূর্ণ ও সীমাদ্বারা খণ্ডিত। বেগবান চলিষ্ণুতা ও প্রাণময় অসহিষ্ণুতা আমাদের জীবনে অপরিচিত ; আমাদের কাছে সমাপ্তি এবং স্থিতিই সবচাইতে চরম কথা। নাসিকাগ্রে যে পরিমিত ভূমিটুকু তাকেই আমরা ত্রিভুবন ব'লে মেনে নিয়েছি এবং সেই পরিধির ভিতরে পরমানন্দে বিচরণ করছি। তার ফলে আমাদের এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী বিকশিত হয়েছে যাকে পণ্ডিতেরা বলে থাকেন frog's perspective,' অথবা আমাদের স্বদেশী ভাষায় "কূপ-মণ্ডূকত্ব"।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে আজ এই মনোভাবের বিলুপ্ত হবার দিন আগত হয়েছে। মাথার ওপরে আজ নতুন আকাশ তার অপরূপ সুনীল সৌন্দর্য্য নিয়ে দেখা দিয়েছে। সেখানে উত্তাল সমুদ্র বিসর্পিত হয়ে রয়েছে অনন্তের দিকে। সেখান থেকে আজ আমাদের কাণে এসে পৌচেছে দুর্দ্দম, বন্য ডাক। আমরা চঞ্চল হয়ে উঠেছি। "frog's perspective" আজকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে "bird's perspective"এ। ঝড়ের রাত্রিতে আকাশগামী পাখির দুই চোখে ছেয়ে থাকে যে স্বপ্ন, আজ আমাদের মনে লেগেছে সেই স্বপ্ন, সেই নেশা। আমরা সচেতন হয়ে উঠেছি যে সুদূর উর্দ্ধ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকাতে হবে ; সমগ্রতার প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখতে হবে। তখন দেখা যাবে, এতদিন যাকে বৃহৎ মনে করে গর্ব্ব করেছি, সে মিলিয়ে গেছে ম্লান হয়ে, অতি তুচ্ছ হয়ে। যে ছিলো অতি তুচ্ছ, সে আজ বৃহৎ পটভূমিকায় দেখা দিয়েছে বৃহতের অংশ হয়ে, মহৎ গৌরব হয়ে। যা' একান্ত পরিমিত, একান্ত ক্ষণিকের, তাকে আজ ত্রিকালের ভূমিকায় রেখে মূল্য নিরূপণ করতে হচ্চে। এই বৃহতের ভূমিকায় জীবন ও সমাজকে দেখবার প্রণালী আমাদের দৃষ্টির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে ; এক কথায়, আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী জন্মলাভ করেছে।

চারদিককার অনিশ্চয়তার মাঝে এই একটা নিশ্চিত লাভ আমাদের ঘটেছে যে আজকে আমরা আমাদের সমস্যাগুলোকে বিশ্বজগতের পট-ভূমিকায় দেখতে শিখেছি। অধিকন্তু, সকল

প্রশ্নকে বিচার করতে আরম্ভ করেছি গণসাধারণের দিক থেকে। ১৯শতকে ব্যক্তি হয়ে' উঠেছিল প্রবলতর; সমূহ বা সমষ্টি হয়েছিল নগণ্য। অবাধ স্বাতন্ত্র্যের ফলে কতিপয়ের স্বার্থের পেষণে বহুর কল্যাণের ঘটেছে মৃত্যু; ব্যাপক দারিদ্র্যের শীর্ষদেশে বসে সংহত ও সংকীর্ণ ঐশ্বর্য্য করেছে রাজত্ব। এমন দিন গেছে যখন কেবল ব্যক্তির স্বার্থের দিক থেকে হিসেব করা হ'তো সমাজের ভালোমন্দকে। আজকে সেদিন গত হয়েছে। আজকে সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণের দিক থেকে আমরা লাভ লোকসানের হিসেব করছি। আজকে বল্‌ছি, ব্যক্তি নয়, সমাজ বড়ো; কতিপয় নয়, বহুর হিতসাধনই সত্যিকার নিঃশ্রেয়স এবং এই নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তির একমাত্র পন্থা হলো সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি-প্রথা। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে ঢেলে সাজতে হবে; সকল ধনদৌলত নিয়ন্ত্রিত হবে বহুজনহিতায় ও বহুজনসুখায়। ১৯ শতক যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ হয়ে থাকে, তবে আজকের যুগ হলো সমাজতন্ত্রের যুগ। এ যুগের যুগধর্ম্ম হচ্চে সমাজতন্ত্র, ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র। সমাজব্যবস্থায় এত বড় বিপ্লব ঘটাতে গেলে রাষ্ট্রশক্তির আসা চাই গণ-সংঘের হাতে; এবং এ রাষ্ট্রবিপ্লবকে সম্ভব করবে গণজাগরণ। কিন্তু কঃ পন্থা? গণজাগরণ তথা রাষ্ট্রবিপ্লব আসবে কোন্ পথে? কোন্ কৌশল আজ এ দুরূহ সিদ্ধিকে আন্‌বে? এ প্রশ্নের একমাত্র ঐতিহাসিক উত্তর—সংহতি। সংহতি হলো সেই "কর্ম্মসু কৌশলম্" যাতে অত বড়ো সিদ্ধি সম্ভব হতে পারে। এ হলো এমন একটা যোগাযোগ যাতে বিবিধ শক্তি এসে একটিমাত্র কেন্দ্রে বিধৃত হয়ে উঠতে পারে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রবলতম সাম্রাজ্যবাদের শক্ত ও স্থায়ী কেন্দ্র। এখানে চাই বিশাল সংহতি ও অটুট ঐক্য। এই পরম প্রয়োজনের কথা আমরা সবাই জানি এবং স্বীকার করে থাকি। অথচ আজো এখানে অসংখ্য বিচ্ছিন্ন শক্তি বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, এবং বহুল অনৈক্য এ দেশকে অকর্ম্মন্য করে রেখেছে। আমরা সবাই মিলে তারস্বরে ঘোষণা করছি, 'আমরা ঐক্য চাই'; আমরা United frontকে আবাহন ক'রে ক'রে আকাশকে বিদীর্ণ করছি; অথচ ঐক্য কিছুতেই দেখা দিচ্ছে না, নেপথ্যেই থেকে যাচ্ছে। একদা পৃথিবীতে এমন দিন গেছে যখন ঐক্যের প্রয়োজন তেমন করে তীব্র হয়ে ওঠেনি। যখন অনেক সম্প্রদায় আত্ম-পক্ষকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ মনে করে ঐক্যকে তুচ্ছ করেছে, এমন কি ব্যাহতও করেছে। আজ কালের আবর্ত্তনে সে মনোভাব ঘুচে গেছে; পৃথিবীর সর্ব্বত্র আজ সকল দিক থেকে ডাক এসেছে, ঐক্যের ডাক। কিন্তু সংহতি ঘটচে না কেন?

সংহতিকে গড়ে তুলতে হলে এর দুটো দিক সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। সংহতির ভিত্তি কি হবে এবং সংহতির ব্যাঘাত কোথায়। একদিকে যাদের যাত্রা তারাই একসঙ্গে পথ চলতে পারে। বিপরীত মুখে যাদের গতি, তারা কী করে ঐক্যে মিলবে? সংহতির একমাত্র ভিত্তি হতে পারে চিন্তার সাজাত্য এবং আদর্শের সমতা। যেখানে এ বস্তুর অভাব সেখানে ঐক্য যদিও বা হয়, সে হবে একান্ত অবাস্তব। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির কিংবা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের ষোল আনা সমতা ঘট্‌তে পারে না। এমন অপ্রাকৃত মিল আশা করা

মূঢ়তা বই কিছু নয়। তবে বাস্তব রীতিতে যে টুকু সত্যি সত্যি ঘট্‌তে পারে সে হচ্ছে ভেদাভেদের ভিত্তিতে। মানে, পরস্পরের মধ্যে অবিকল সাদৃশ্য কখনো সম্ভবপর নয়; যা' সম্ভব হয় তাকে দার্শনিক ভাষায় বলা চলে, 'ভেদসহিষ্ণু সাদৃশ্য'। যেখানে চিন্তাক্ষেত্রে ভেদই প্রবল, সেখানে ঐক্য সম্ভব নয়। যেখানে ভেদের চাইতে সাদৃশ্যই তীব্রতর ও ব্যাপকতর, মাত্র সেখানেই সংহতিকে গড়ে তোলা চলে। চিন্তা-সঙ্ঘাতের (ideolovy) সাঙ্গাত্য থেকে কর্ম্মপদ্ধতির সাদৃশ্য জন্ম নেয়। কাজেই চিন্তার সাঙ্গাত্য ও কর্ম্মপদ্ধতির সাদৃশ্যের ওপরে ভিত্তি করেই সংহতির গড়ে ওঠা সম্ভব হতে পারে। একটা কথা উল্লেখযোগ্য। চিন্তাক্ষেত্রে ভেদ থাকলেও যখন ঐক্য সম্ভবপর হতে পারে, তখন স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা আসে, ঐক্যের খাতিরে আদর্শের ক্ষেত্রে আপোষ করা দরকার ও উচিত কিনা। থিওরীর ক্ষেত্রে আপোষ যতই আপত্তিজনক হোক না কেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপোষ বই মানুষের চলে না। বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে purism বা আদর্শের আত্যন্তিক বিশুদ্ধি কোন দিনই সম্ভব হয় না। যারা এসম্বন্ধে অত্যধিক সতর্ক ও অসহিষ্ণু তারা কল্পলোকে বাস করেন, মাটির পৃথিবীতে নয়। লেনিনও এ ছ্যুতমার্গকে সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, ১৮৭৪ সালে Communard-Blanquistরা আদর্শের বিশুদ্ধির মোহে এই ভুল করেছিল। তারা সকল রকমের আপোষকে বর্জ্জন করে বিষম ক্ষতিকে ডেকে এনেছিল। কোন নীতিরই মাত্রাধিক্য কল্যাণকর নয়; বরং অত্যন্ত হলে সব কিছুই যে গর্হিত হয়ে দাঁড়ায়, এ পুরোণো প্রবচনটি চিরকালের খাটী কথা। বাস্তব জীবনে অনেক সময়েই আপোষ করে চল্‌তে হয়। কারণ পুঁথিগত ফর্ম্মুলা বা বিদ্যা সত্যিকার জীবন থেকে বড়ো নয়। বাস্তব জীবনের তাগিদ সকল থিওরী ও সকল বিদ্যা থেকে প্রবলতর, এতে সন্দেহ নেই। তবে আপোষের মাত্রা নির্দ্ধারিত হবে বাস্তব পরিস্থিতির দাবি অনুসারে।

আতিশয্য (Excess) ঐক্যের একটা বড় বিঘ্ন, একথা অতি সহজবোধ্য। প্রত্যেক মানুষ বা সম্প্রদায় যদি স্ব স্ব আদর্শের ষোলআনা বিশুদ্ধিকে অক্ষত রাখতে চায়, তবে কোনো ঐক্যের সম্ভাবনা থাকেনা। ঐক্য মানেই পরস্পরের প্রতি একটা সহিষ্ণু মনোভাব। চিত্তবৃত্তিতে যদি নমণীয়তা না থাকে, আদর্শে যদি স্থিতিস্থাপকতা না থাকে, তবে সেই কাষ্ঠ-কঠিন আদর্শপরায়ণতা বিচ্ছেদ সৃজন করে, মিলন নয়। লেনিনের এই উক্তিটী স্মরণ রাখবার যোগ্য যে:—

"The surest way of discrediting a new political (& not only political) idea, and to damage it, is to reduce it to an absurdity while ostensibly defending it. For every truth, if carried to 'excess'..., if it is exaggerated, if it is carried beyond the limits within which it can be actually applied can be reduceed to absurdity." (Leftwing communism)

এই আতিশয্যের থেকে জন্ম নেয় গোঁড়ামী এবং গোড়ামী চিরকাল হয়েছে সকল রকম ঐক্যের দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধা। আজকে সবাইকেই একথা বুঝতে হবে যে নানা যোগাযোগের

ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমাদের চারিদিকে, তাতে গোঁড়ামিকে বর্জ্জন করবার মতন সাহস না থাক্‌লে কোনোদিকে কোনো আশা নেই। সবাই যদি নিজের চতুঃপার্শ্বে স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল রচনা করে নিজেকে সুদূর ও সুদুর্লভ করে রাখে, তবে পরস্পরের সন্নিধি কোন দিনই ঘটবে না। তাতে লাভ হবে বিচ্ছিন্নতা ও শক্তির নিরর্থক অপব্যয়। এই সর্ব্বনাশা ক্ষতিকে এড়াতে হলে গোঁড়ামী ও আতিশয্যকে ছাড়তে হবে সবাইকে। পরস্পরকে বুঝতে হবে সহানুভূতি দিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে আন্তরিক আদান প্রদান করতে হবে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে। নতুবা একশখানা 'Popular Front' 'National Front' এর সাধ্য নেই যে কেবলমাত্র তারস্বরে ঘোষণা করে করেই বিভিন্ন ও বিবিধ শক্তিকে ঐক্যে সংহত করতে পারে।

ঐক্যের আর একটি ব্যাঘাত হলো আন্তরিকতার অভাব। ক্ষতি করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে ঐক্য, তাতে চিরদিনের দুর্লঙ্ঘ্য অনৈক্যই সৃষ্টি করে থাকে। বিশ্বাসের অভাব যে ক্ষেত্রে রয়েছে সেখানে সংহতির আশা বাতুলতা মাত্র। পরিণামে সর্ব্বনাশ করার মনোবৃত্তি নিয়ে ঐক্যকে খুঁজে বেড়ালে চিরকালের তরে ঐক্যের পথ বন্ধ হয়ে যায় সাময়িক স্বার্থের লোভে এটুকু ভুলে গেলে পরিণামে যে ঠকতে হবে, সেকথা অনিবার্য্য।

"......I want to support Henderson with my vote in the same way as a rope supports one who is hanged......" লেনিনের এই মারাত্মক নীতির ওপর কোনও ঐক্য দাঁড়াতে পারে না। সকল ঐক্যের প্রাণ হলো আন্তরিকতা; এ বস্তুর যেখানে অভাব সেখানে আর যাই হোক ঐক্য হতে পারেনা। একটা যান্ত্রিক সমবায় দ্বারা কোন বৃহৎ সিদ্ধি লাভ হতে পারে না। একথার প্রমাণ ইতিহাস। স্বার্থ-মূলক চুক্তি সততই স্বল্পায়ু হয়ে থাকে; দীর্ঘবিলম্বিত একটা কঠিন সাধনার উপযোগা সংহতিকে গড়ে তোলবার মতো সামর্থ্য তার নেই। হত্যার জন্যে আলিঙ্গন করার যে কূটনীতি তা' চলতে পারে শত্রুর সাথে। সম-পন্থী মিত্রের সাথে এ চাল চাললে সে আত্মহত্যারই সমান হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এতে সংহতির মূলে পড়ে কুঠারাঘাত এবং যে উদ্দেশ্যে সংহত শক্তি গড়ে তোলা, তাই হয়ে যায় ব্যর্থ। তাছাড়া একবার বিশ্বাসের হানি ঘটলে, আর তার পরিপূরণের উপায় থাকেনা। রাজনৈতিক বাজারে বিশ্বাস সব চাইতে বড়ো মূলধন এবং এখানে লোকসান হলে সকল কারবারই হয়ে দাঁড়ায় অচল। তাই সমপন্থী মিত্রের সঙ্গে সহজ ও ঋজু আচরণই লাভজনক এবং এ ক্ষেত্রে তির্য্যক নীতি ও কুটীল দাবার চাল আমদানী করলে চিরদিনের জন্য মিলবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। লেনিনের প্লেহানভ থেকে আলাদা হয়ে যবার মূলেও এই অভিযোগই মুখ্যতঃ কাজ করেছিল। আমাদের দেশেও পরস্পরের মধ্যেকার ব্যবধান ঘুচাতে হলে চাই সহজ ঋজুতা এবং আন্তরিক সান্নিধ্য। ফাঁসির দড়ি যেমন করে মরণোন্মুখের সাথে মিতালী করে, তেমন সহযেগিতা যেন আমাদের ত্রিসীমানায়ও না

আসে। জীবন-মরণকে নিয়ে যেখানে নিত্যকার খেলা খেলতে হয় সেখানে মিলতে না পারলেও মিলবার ছলে যেন চিরবিচ্ছেদের বীজ বপন না করি।

আজকে আমরা ঐক্যের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি; ঐক্যের দাবী করে আমরা প্রহরে প্রহরে হাক দিয়ে ফিরছি। কিন্তু ঐক্য আজো রয়েছে সুদূরপরাহত। কারণ আমরা পরস্পরের কাছে আজো সুদূর। পরস্পরের সঙ্গে আচরণে আমরা মধুর বচনের আদান প্রদান করে থাকি এবং সার্ব্বভৌম মনোবৃত্তি প্রদর্শন করি; কিন্তু বাচনিক মাধুর্য্য ও ঔদার্য্যের আড়ালে আমাদের পরস্পরের যে সম্বন্ধ তাহা যুগযুগান্তের বিষে বিষাক্ত। এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে ঐক্য কি করে আসবে? নতুন যুগের নব মনোভাবের কথা অহরহ আমরা বলছি, কিন্তু পুরাতন মনোবৃত্তির জীর্ণ বাকল আমাদের সর্ব্বাঙ্গে আজো জড়িয়ে আছে, তাকে ছিঁড়ে ফেলতে পারিনি। মতবাদের দিক দিয়ে গোঁড়ামীর আতিশয্য অতি প্রথমেই বর্জ্জন করতে না পারলে কোন দিকেই কিছু হবে না। কারণ এ হলো সংহতি গড়ার প্রাথমিক ভূমিকা। স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মিথ্যা আত্মপ্রসাদ যতদিন চারদিকে মায়ার পরিমণ্ডল রচনা করে থাকবে ততদিন একত্র হবার কোন সেতুই তৈয়ার হবে না। পুঁথির থেকে, জীবন অনেক বড়ো। বিপ্লবের অমোঘ সূত্র ও তত্ত্ব আসবে বাস্তব জীবন থেকে, পুঁথির পাতা থেকে নয়। লেনিন নিজেই বলেছেন যে বিপ্লব শেখাতে পারে এমন কোন পুঁথি জগতে নেই। বিপ্লবের সত্যিকার রূপ যে কি, কোন্ ক্ষণে কোন্ পথে যে তার সত্যি সত্যি আবির্ভাব হবে, সে সন্ধান আজো অজানা। তার আভাসকে ধরা ছোঁওয়া যায়, কিন্তু তার জীবন্ত স্বরূপকে আগে থেকে বোধগম্য করার উপায় নেই। "We do not know and we cannot know which spark...will kindle the conflagration, in the sence of specially rousing the masses..." (Lenin) যেহেতু আমরা জানিনে, সেই হেতু আমাদের গোঁড়ামী ছেড়ে মিলবার পথ তৈরী করতে হবে। বিপ্লবানুকুল যতো শক্তি ছড়িয়ে আছে যেখানে, সকলকেই সমবেত করতে হবে একটা ব্যাপক পীঠভূমিতে। এ কাজ করতে হলে যেতে হবে এমন সব স্থানে, যেখানে মতবাদের ছ্যুতমার্গ থাকলে যাওয়াই সম্ভব হবেনা। সবাইকে মেলাতে হবে এক ভূমিতে এবং এমনকি, আয়োজন করতে হবে "to stir up all, even the oldest, mustiest & seemingly hopeless spheres, for otherwise we shall not be able to cope with our task..."(Lenin) বর্ত্তমান যুগের ব্যাপক অব্যবস্থার মাঝে ঐক্যকে গড়তে হলে মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতেই গড়তে হবে কিন্তু আতিশয্যকে ছেড়ে তার পরিবর্ত্তে অবলম্বন করতে হবে একটা নমন-শীল উন্মুখতা এবং উদার সহিষ্ণুতা। যে সংহতি ব্যতীত গণ-বিপ্লব সম্ভব হতে পারে না, তাকে গড়ে তুলবার মত অনুকূল আবহাওয়া কী করে রচনা করা যাবে, আজকে সকলের সামনে এই সমস্যাই বড়ো সমস্যা। সংহতির পথই আশু বিপ্লবের পথ; সে পথ কেমন করে বাস্তব হবে, এই প্রশ্নের জবাবই সবাইকে দিতে হবে, ইতিহাসের কাছে ও বর্ত্তমান যুগের কাছে।

বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ

শ্রীসুরমা মিত্র

কর্ম্মবাদ প্রায় সকল ভারতীয় দর্শনে একটি অতি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কর্ম্ম-করলেই তার ফল হবে এই বিশ্বাস আমাদের দেশে অনেক চিন্তাধারাকেই প্রভাবিত করেছিল। কর্ম্মের ফল কিছু একটা হয় একথা মানতে গেলেই বল্‌তে হয় যে, যে সকল কর্ম্মের ফল আমরা এই জীবনে দেখ্‌তে পাই না—সেসব নিশ্চয়ই জন্মান্তরে ফলপ্রদ হয়। অতএব কর্ম্মফল মানতে গেলে জন্মান্তর অর্থাৎ মৃত্যুর পরেও যে আবার জন্ম হয়—একথাও মান্‌তে হয়। এইজন্য কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে, একটির সম্বন্ধে কোনও কথা আলোচনা ক'রতে গেলে অপরটির সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন হয়। এই কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরের উদ্ভব কোথা থেকে হ'ল তার অনুসন্ধান ক'রতে গেলে আমরা বৈদিক যুগ থেকেই এর সূচনা দেখ্‌তে পাই। বেদের মন্ত্রগুলির মধ্যে ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে এর উল্লেখ ও আলোচনা পাওয়া যায়—কিন্তু উপনিষদের মধ্যেই কর্ম্মবাদ একটি সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছে এবং পরবর্ত্তী সকল চিন্তাধারাই এবিষয়ে উপনিষদের কাছে ঋণী সেজন্য সংক্ষেপে উপনিষদের মত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে বৌদ্ধ মত আলোচনা ক'রলে আমাদের বোঝার দিক্ থেকে কিছু সুবিধা হয়।

কঠোপনিষদে নচিকেতার আখ্যানে আমরা এবিষয়ে একটি সুন্দর আলোচনা পাই। নচিকেতার পিতা বাজশ্রবস্ ঋষি যজ্ঞ করেছেন ও যজ্ঞের শেষে ব্রাহ্মণদের দক্ষিণাস্বরূপে গাভীদান ক'রছিলেন। নচিকেতা তাঁর একমাত্র পুত্র। তিনি দেখলেন যে পিতা যে সব গাভী দান ক'রছেন সেগুলি বৃদ্ধ, জীর্ণ ও বিকলেন্দ্রিয়। এরকম দানের ফলে প্রত্যবায় হয়, পিতার অমঙ্গল হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি বারবার পিতাকে প্রশ্ন ক'রলেন—"আমাকে কার কাছে দান ক'রবে?" পিতা প্রথম দুই একবার উত্তর দিলেন না, কিন্তু একই প্রশ্ন বারবার করাতে বিরক্ত হয়ে ব'লে ফেল্‌লেন "তোমাকে মৃত্যুর হাতে দান ক'রব"। নচিকেতা অত্যন্ত ক্ষুন্ন হ'য়ে ভাব্‌লেন, আমি কি এমনই অপদার্থ যে শেষে মৃত্যুকে দান ক'রবেন বল্‌লেন? কিন্তু পিতার কথা ব্যর্থ হ'তে দেওয়া উচিত নয়—কাজেই তিনি যমের গৃহেই যাওয়া স্থির ক'র্‌লেন। তাঁর পিতা পরে দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নচিকেতা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে অনুমতি নিয়ে যমের গৃহে গেলেন। যম তখন উপস্থিত ছিলেন না, নচিকেতা সেখানে তিনরাত্রি কোনও আহার গ্রহণ না করে যাপন ক'রলেন। যম গৃহে ফিরে তিনি নচিকেতাকে দেখ্‌লেন—অতিথি অভুক্ত র'য়েছেন, যাতে কোনও অকল্যাণ না হয় সেজন্য তিনটি বর প্রার্থনা ক'রতে বললেন। তৃতীয় বরে নচিকেতা যমকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—"মৃত্যুর পরেও জীবের কোনও অস্তিত্ব থাকে কিনা—এবিষয়ে লোকের সংশয় হয়; কেউ বলেন থাকে,

কেউ বলেন থাকে না—এই সংশয়ের যাতে নিরসন হয় এই বিদ্যা আমি তৃতীয় বরে প্রার্থনা ক'রছি।" যম তাঁকে অনেক অনুরোধ ক'রলেন, ঐশ্বর্য্য সম্পদ্ প্রভৃতি যত কিছু লোভনীয় বস্তু আছে—সব তাঁকে দান ক'রতে চাইলেন, কেবল মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে নিষেধ ক'রলেন—"নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ"। কিন্তু নচিকেতা অটল অচল, তিনি এই প্রশ্নের উত্তর ছাড়া আর কিছুই চান্না—কারণ আর সকলই ত ক্ষণস্থায়ী একদিন না একদিন মৃত্যুরই কবলগ্রস্ত হবে। অবশেষে যম তাঁকে জন্ম-মৃত্যুর পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তার তাৎপর্য্য এই যে আত্মা অবি-নাশী জন্মমৃত্যু-রহিত, নিত্য শুদ্ধস্বরূপ। যারা এই আত্মতত্ত্ব জানে না তারাই বারংবার এই প্রতীয়মান জন্মমৃত্যুর চক্রে নিষ্পিষ্ট হয়। আত্মার কোনও বিকার বা নাশ না থাকলেও যে আপাত-দৃষ্টিতে তার জন্ম মৃত্যু হয় বলে মনে হয়, তার কারণ অবিদ্যা, একমাত্র অবিদ্যার বলেই এরকম মনে হয়।

"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"

এই অবিদ্যাকে দূর করা যায় বিদ্যার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা। যাঁর চিত্ত নির্ম্মল হ'য়েছে, তিনি এই আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হ'লে তবে তাঁর কাছে এই দুর্লভ গহনতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। তাঁকে তর্কের দ্বারা বা বুদ্ধির দ্বারা লাভ করা যায়না—নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥"

সেই যে গহন গোপন আত্মস্বরূপ তাঁকে যিনি তপস্যার দ্বারা যোগের দ্বারা, জান্তে পারেন তিনিই হর্ষশোকাদি থেকে মুক্ত হন।

"তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥"

কেমন ক'রে চিত্তকে পবিত্র করা যায়, শুদ্ধ করা যায়—যার ফলে চিত্ত সেই পরম জ্ঞানের উপযোগী হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ম্মকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, সাধু ও অসাধু, পুণ্য ও পাপ। যে যেমন কর্ম্ম করে সে সেই রকমই হয়, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপং পাপেন"। এই সাধু কর্ম্মের মধ্যে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, তপস্যা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে বলা হ'য়েছে। মিথ্যা, অসংযম প্রভৃতিকে পাপের উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা হ'য়েছে। সৎকর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হ'লে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান সেখানে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে এবং সকল ভ্রান্তি সংশয় ও দুঃখের নিবৃত্তি হয়। উপনিষদের এই কর্ম্মবাদ পরবর্ত্তী যুগে বিভিন্ন চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু মূলতঃ এখান থেকে গৃহীত হ'লেও এই মত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন আকার গ্রহণ ক'রেছে।

বেদ ও উপনিষদের প্রাধান্যের যুগে বুদ্ধদেব সর্ব্বপ্রথম স্বাধীন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন ক'রলেন। স্বীয় সাধনার বলে তিনি সত্যকে যেমন ক'রে উপলব্ধি করেছিলেন—তেমনি ক'রেই তিনি তার প্রচার ক'রলেন। একদিকে চিরাভ্যস্ত শ্রুতির প্রামাণ্যকে অস্বীকার করলেন, আর একদিকে স্থায়ী কোনও আত্মাও তিনি অস্বীকার ক'রলেন। পরবর্ত্তী যুগে তাঁর মতাবলম্বীরা বিভিন্ন ধারায় এই মতকে বর্দ্ধিত ক'রে তুল্লেন। সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী, বিনাশশীল, একটি ক্ষণ বা মুহূর্ত্তের পর আর একটি ক্ষণ উঠে বিলীন হয়, আবার একটি ক্ষণ ওঠে ও বিনষ্ট হয় তারপর আর একটি, এমনি করে কেবল কতগুলি ক্ষণের প্রবাহ ব'য়ে চলেছে, স্থায়ী, নিত্য কোনও পদার্থ নাই। প্রদীপের শিখা যখন জ্বলে—তখন সল্‌তের অগ্রভাগ প্রথমে জ্বলে তখন একটি শিখা, সেটি ভস্মসাৎ হয়, তখন তার মধ্যভাগ জ্বলতে থাকে তখন ত আর একটি শিখা জ্বলে, এম্‌নি ক'রে কত বিভিন্ন শিখা জ্বলতে থাকে। আমরা তাকে একই শিখা বলে মনে করি সেটা কল্পনামাত্র, বস্তুতঃ সেখানে পর পর বহু শিখা জ্বলে। তেম্‌নি আমাদের মনের ব্যাপারকে বিশ্লেষণ ক'রলে দেখি—একটির পর একটি চিন্তা বা ভাব উঠ্‌ছে ও বিলীন হচ্ছে কোনও স্থায়ী "আমিকে" ত সেখানে দেখ্‌তে পাই না। একমুহূর্ত্তে ক্রোধ হচ্ছে, পরে কৌতূহল, পরে উৎসাহ এম্‌নি ক'রে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির (Mental states) একটি ধারা (series) প্রবাহিত হ'য়ে চ'লেছে—স্থির আত্মা ব'লে কেহ সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। এর মধ্যে কোন 'আমিকে 'ত দেখিনা কেবল দেখি ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের বৃত্তি বা ভাব। শিশুকালে যে আমি ছিল, সে দেহ বা মন এখন নেই, আবার এখন যে 'আমি' আছে—সেও ত আবার বার্দ্ধক্যে থাক্‌বে না। এই পরিবর্ত্তন স্থূলভাবে, দেখা যায়ই, ভাল করে ভেবে দেখ্‌লে বুঝতে পারি যে এই পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস প্রতিক্ষণেই ঘট্‌ছে। সমস্ত বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশগুলির একটি সমগ্রতা বা totality কোথাও নেই। বুদ্ধদেব ব'লেছিলেন "পদ্মফুল ত দেখতে পাই না—দেখ্‌তে পাই পদ্মের পাপ্‌ড়ি, তার বোঁটা, তার পরাগ—কিন্তু 'পদ্ম' কই? তেম্‌নি অনেক চিত্তবৃত্তি দেখ্‌তে পাই—আমি'কে দেখ্‌তে পাইনা।' যদি সবই ক্ষণিক, তবে এক ব'লে, স্থায়ী ব'লে কেন মনে হয়, এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে—যে একত্ববোধ কাল্পনিক মাত্র, মিথ্যা, সত্য নয়। এই মিথ্যা কল্পনার মূলে আছে অবিদ্যা। সমস্ত বহির্জগৎও অন্তর্জগৎ এই অবিদ্যার দ্বারা, ভ্রান্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে র'য়েছে। এবং এইজন্যই বাহ্যবস্তুর মধ্যেও "এক" বা স্থায়ী ব'লে প্রতীত হবার যোগ্যতা আছে—এবং মনেও সেই অবিদ্যা অস্থিরকে নিত্য ও স্থির বলেই গ্রহণ ক'রে। এবং এর ফলেই হয় দুঃখ, ক্লেশ ও গ্লানি। যদি জান্‌তে পারি যে সবই ক্ষণিক, পরিবর্ত্তনশীল তাহলে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হবে। কারণ আমি ত' স্থায়ী নই যে ক্ষণে দুঃখের কারণ উপস্থিত হ'য়েছিল সে ক্ষণ'ত চলে গিয়েছে—এখন ত ভিন্ন একটি ক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে। দুঃখ ক'রবেই বা কে—আর কি নিয়েই বা দুঃখ ক'রব? কেমন ক'রে এই অবিদ্যা থেকে বহির্জগৎ ও প্রাণিজগৎ ও অন্তর্জগতের উৎপত্তি হয়েছে এসম্বন্ধেও অনেক আলোচনা আছে কিন্তু এখানে তার অবতারণা ক'রবার প্রয়োজন নাই। মোটের উপর উপনিষদের সঙ্গে বৌদ্ধবাদের বিশেষ পার্থক্য হ'ল এইখানে, যে উপনিষদের মতে স্থিরকে অস্থির বা ক্ষণিক বলে মনে করি বলেই দুঃখভোগ করি,

আর বৌদ্ধরা বলেন যে ক্ষণিককে নিত্য বলে মনে করি বলেই যত দুঃখ কষ্ট আমাদের পীড়িত ও ক্লিষ্ট ক'রে। উভয় স্থলেই এই ভ্রমের মূল কারণ হচ্ছে অবিদ্যা এবং অবিদ্যা দূরীভূত হলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। এই অবিদ্যাকে কি উপায়ে নাশ করা যায়, সে সম্বন্ধে উভয়েই একমত। রাগ দ্বেষ বিবর্জ্জিত যে সাধুকর্ম্ম তার দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হ'লে তবেই সম্যকজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে যে সবই যদি ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে সে ব্যক্তিই কর্ম্মের ফল ভোগ ক'রবে, এ নিয়ম সিদ্ধ হয় কি করে? তার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, এই যে একটি ক্ষণের পর আর একটি ক্ষণ ওঠে এদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। সে সম্পর্ক এই যে পূর্ব্বেরটি থাকে বলেই পরেরটি উৎপন্ন হয়, পূর্ব্ব যদি না থাকে তবে পরটিও হয় না। একে বলে প্রতীত্যসমুৎপাদ, ইদং প্রতীত্য ইদং সমুৎপদ্যতে। পূর্ব্বক্ষণের বলের দ্বারা পরক্ষণ উৎপন্ন হয় ব'লে তার কিছু বৈশিষ্ট্য পরক্ষণের মধ্যে থাকে এম্‌নি ক'রে কোনও এক ধারা বা প্রবাহ অন্য একটি প্রবাহ থেকে পৃথক্ বা ভিন্ন হয়। আমি যেরকম চিন্তা করছি তার ফলে পরের চিন্তা উঠ্‌ছে অপর ব্যক্তি যেরকম ভাব্‌ছে তার পরবর্ত্তী ক্ষণও সেই জাতীয় হচ্ছে, কাজেই আমার প্রবাহটি অন্যের প্রবাহ থেকে ভিন্ন। আমার মধ্যে এক একটি ক্ষণে যা কর্ম্ম হচ্ছে তার ফলে এই প্রবাহের ভিন্ন ক্ষণগুলিও তদনুযায়ী হ'চ্ছে অতএব কর্ম্মের ফল—প্রতি প্রবাহেতেই ঘট্‌ছে। এরই সঙ্গে যে ভ্রমাত্মক 'আমি' বোধটি আছে সে মনে করছে যে সে সেইকর্ম্ম ক'রছে ও ফলভোগ ক'রছে। এইরকমে দেবদত্তের যে ক্ষণপরম্পরা চল্‌ছে—সেখানে প্রতিক্ষণে যে কর্ম্ম ঘট্‌ছে—তার পরের ক্ষণে তার ফল ঘট্‌ছে—এবং দেবদত্ত প্রবাহের ফল যজ্ঞদত্তের প্রবাহকে স্পর্শ ক'রছে না। আমার যে শরীর শিশুকালে ছিল সে শরীর এখন নাই; শরীরের যতগুলি জীবকোষ বা cells ছিল প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়েছে ও তার ফলে নূতন cells উৎপন্ন হয়েছে, এম্‌নি ক'রে সেই শিশুকালের দেহের পরিবর্ত্তে এখনকার দেহ দাঁড়িয়েছে। তবু তাকে যে বল্‌ছি যে সে সেই শিশুরই দেহ, একথা বলা এইজন্যই সম্ভব হয় যে আমার সেই ক্ষুদ্র শিশুদেহেরই ধ্বংস ও উৎপত্তি পরম্পরাক্রমে আজকের পরিণত দেহের উৎপত্তি হয়েছে, সুতরাং এই প্রবাহকে ভ্রান্তিবশতঃ এক ব'লে মনে করি। আমার শিশুকালের যে দুর্ব্বলতা বা ব্যাধি ছিল, তার ফল তাকে অবলম্বন করে যে দেহ উৎপন্ন হ'য়েছে সেই ভোগ করে, এবং অপরের দেহ অপরের দেহের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ অনুযায়ী কর্ম্মফল ভোগ করে, আমার কর্ম্মফল ভোগ করে না। এম্‌নি করে মনের সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে যে, যে মনের যে রকম চিন্তা বা ভাবধারা পূর্ব্বে উৎপন্ন হয়েছিল—পরবর্ত্তী ক্ষণসমূহেও তৎসদৃশ ভাবধারা ওঠে। পূর্ব্বের কর্ম্মফলে পরক্ষণের মন গঠিত হয়। কাজেই স্থায়ী নিত্য বস্তু কিছু না থাক্‌লেও কর্ম্মফলের কিছুই বাধা হয় না। এম্‌নি করে আমাদের এই একই জন্মে বহু জন্মান্তর ঘট্‌ছে। মৃত্যুর সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে মৃত্যুর পর এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আমরা দেখ্‌তে পাই না। পঞ্চভূত বিনাশশীল, কাজেই তা ক্রমশঃ বিকৃত হ'তে হ'তে যে অবস্থায় উপস্থিত হয় তাকে আমরা মৃত্যু বলি—কিন্তু সেই প্রবাহের বিরাম হয় না; এই দেহনাশকে অবলম্বন করে আর একটি সূক্ষ্মদেহের ধারা চল্‌তে থাকে এবং সেই মনের

ধারাও চলে। অস্তিত্বকে অন্তরাভব বলে। পূর্ব্বদেহের কর্ম্ম ও বাসনা প্রভৃতি সবই সেখানে অনুস্যূত হয় ও তদনুযায়ী ভোগ ও পুনর্জ্জন্ম হয়।

মৃত্যুর পরে আর একটি জন্ম হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে অবস্থা তাকে অন্তরাভব বলা হয় একথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। আবার যখন জন্ম হয় সে অবস্থাকে বলে উপপত্তিভব, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যে অস্তিত্ব তাকে পূর্ব্বকালভব বলে, মরণের সময়ে যে অবস্থা তাকে মরণভব বলে। এম্‌নি ক'রে একটার পর আর একটা অস্তিত্বের ধারা, জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্মের শৃঙ্খল চক্রাকারে ঘুরে চ'লেছে। মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্বসম্বন্ধে একটি বেশ সুন্দর গল্প আছে। রাজা পায়াসি এ বিষয়ে তাঁর যা' যা' সংশয় আছে তার নিরসনের জন্য কুমার কস্‌সপের কাছে গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন যে তিনি তাঁর কয়েকটি পুণ্যবান বন্ধুদের অনেক অনুরোধ করেছিলেন যে মৃত্যুর পর যদি কিছু থাকে তবে তাঁরা সে বিষয়ে সংবাদ দিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কেহই মৃত্যুর পরে পরলোকের খবর দিতে আসেন্‌ নি। কুমার কস্‌সপ বল্‌লেন কেউ যখন একবার চন্দনসুবাসিত সুন্দর স্থানে যায় তার কি আবার পূতিগন্ধময় স্থলে ফিরে আস্‌তে ইচ্ছা ক'রে ? তেমনি পুণ্যাত্মারা মুহূর্ত্তের জন্যও এই দুঃখময় পৃথিবীতে ফিরে আস্‌তে চান্‌ না। পায়াসি তখন বল্‌লেন— যে তিনি অনেক পাপীদের ও এই একই অনুরোধ করেছিলেন এবং তারাও কথা দিয়ে রাখে নি। কস্‌সপ উত্তর করলেন—যেমন কোনও বন্দী নিজের ইচ্ছায় যেখানে সেখানে যেতে পারে না পাপী-রাও তেম্‌নি নিজের কর্ম্মশৃঙ্খলে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে থাকে যে তাদের কথা দিয়ে তা প্রতিপালন করা সম্ভব হয় না। পায়াসি আবার প্রশ্ন করলেন, কতগুলি বন্দীকে তিনি একটি পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ করে' তার মুখ খুব ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, এবং তার তলায় আগুন রেখে তাদের মেরে ফেলেছিলেন। পরে পাত্রের মুখ খুলে দেখ্‌লেন তাদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্ম কোনও দেহ সেখানে নাই বা বহির্গত হ'য়েও যায় নি। অতএব মরণের পর যে কিছু থাকে তার প্রমাণ কি ? তার উত্তরে কস্‌সপ বল্‌লেন—যা কিছু সংসারে ঘটে সবই ত চোখে দেখা যায় না। তুমি যখন নিদ্রিত থাকো এবং তোমার মন স্বপ্নে কত জায়গায় বিচরণ ক'রে বেড়ায়, তাকি চোখে দেখতে পাও ? যারা অন্ধ তারা জগতের কোনও রূপ, রঙ্‌ প্রভৃতি দেখ্‌তে পায়না, তাই বলে কি রূপ ও রঙের অস্তিত্ব মান্‌ব না ? যাঁরা জ্ঞানী, বোধিসত্ত্ব, তাঁরা আপন জ্ঞানের বলে, তপস্যার দ্বারা যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন তারই উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, সাধারণ লোক সে বিষয়ে অন্ধের মত। এমনি ক'রে তিনি পরলোক প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে পায়াসির শঙ্কা নিরসন করেছিলেন।

আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে জন্ম ও কর্ম্মের ঘূর্ণীতে জীব ক্রমাগতই নিষ্পিষ্ট হয়। কর্ম্মফল কেমন করে হয়, কিরূপ কর্ম্মের কিরূপ ফল হয় এ সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রে যত আলো-চনা হয়েছে—এরূপভাবে কোথাও হয় নাই কিন্তু এখানে তার উল্লেখ করার অবকাশ নাই। এখন প্রশ্ন হয় যে, এই ঘূর্ণীপাক থেকে কেমন ক'রে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে ? এর উত্তরে বলা হ'য়েছে অবিদ্যা থেকে পরম্পরাক্রমে হয় তৃষ্ণা বা কামনার উৎপত্তি। এই তৃষ্ণার ফলেই লোকে কর্ম্ম করে

এবং ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বন্ধনে জড়িত হ'য়ে পড়ে। এই তৃষ্ণা বা লোভের ফলে আমাদের বস্তুতে রাগ বা আসক্তি হয়। তার ফলে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ আসে এবং বুদ্ধিনাশ হয় বা মোহাচ্ছন্ন হয়---তার ফলে কাজ করি অনেকরকম ; সেই কাজের ফলে মন আরও বেশী কলুষিত হতে থাকে, দুঃখও ঘটতে থাকে। ক্রমশঃ অবিদ্যা আরও ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে। এই রাগ দ্বেষ লোভ প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে যদি কাজ করি তাহলে সে কর্ম্মে কোনও বন্ধন আনে না কিন্তু ক্রমশঃ চিত্ত নির্ম্মল ও স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে এবং তাতে জ্ঞানের বিমল আলোকরেখা প্রতিফলিত হয়। এবং অবিদ্যার নাশ হওয়াতে দেহ ও মনের ক্ষণপরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও নির্ব্বাণ লাভ করা যায়। সুতরাং কর্ম্মের চেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। কিরকম উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কাজ করি তারই উপর কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে। যদি সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই কিন্তু ভাগ্যক্রমে কোনও মন্দ কিছু ঘটে যায় তাহলেও তার পাপ আমাদের স্পর্শ করবে না। কিন্তু মন্দ উদ্দেশ্য থাক্‌লে তার দ্বারা জীবন কলুষিত হবে। এখানেই জৈনদের সঙ্গে বৌদ্ধদের বিশেষ পার্থক্য। জৈনদের মতে কার্য্য অগ্নির মত। অগ্নিতে হাত দিলেই হাত পুড়ে যায়, মন্দ কাজের ইচ্ছা না থাক্‌লেও যদি কাজের ফল মন্দ হ'য়ে পড়ে তাহলে তার ফলভোগ নিশ্চয়ই ক'রতে হ'বে। কিন্তু বৌদ্ধদের মতে তাহা নয়। যদি খেল্‌তে গিয়ে হঠাৎ কারো মাথায় বল লেগে আঘাত পায় তাহলে ক্রীড়কের কোনও পাপ হবে না। পাপ পুণ্য সব মনের বিশুদ্ধি ও অবিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে। এই কর্ম্মপ্রসঙ্গে অনেক আলোচনা হয়েছে—এখানে সব আলোচনা করবার স্থান নাই। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা এই যে, সকল দুঃখের মূলে র'য়েছে তৃষ্ণা বা লোভ। ভগবান তথাগত দুঃখনিবৃত্তির উপায় আবিষ্কার করার জন্য গৃহত্যাগ ক'রে গিয়েছিলেন এবং আজীবন তপস্যার দ্বারা যে তত্ত্ব উপলব্ধি করেছিলেন সেটি এই, যে নির্লোভতার দ্বারা, তৃষ্ণাক্ষয়ের দ্বারা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আড়াই হাজার বৎসর অতীত হ'য়েছে কিন্তু জগতে দুঃখের এখনও শেষ হয় নাই---বরং নানাভাবে নানারূপে এই দুঃখ শত সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছে! কিন্তু মনে হয় ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাণী চিরন্তন কালের সত্যকেই ঘোষণা ক'রছে। আজ আমাদের দারিদ্র্য প্রভৃতি অনেক দুঃখ। আমাদের দৈনন্দিন আয় ৬-পয়সা থেকে ১০ পয়সার বেশী নয়, এ অত্যন্ত কষ্টের কথা সন্দেহ নাই ; কিন্তু যদি ১০ পয়সার জায়গায় দৈনিক আয় ১০ সহস্র টাকাও হয়—তবুও পৃথিবীর দুঃখ নিবারণ হবে না। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক যেদিক দিয়ে যত উপায়ই আবিষ্কৃত হোক্ না কেন, যদি মানুষের মনের গ্লানিভার না কমে, যদি তার লোভ ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বগ্রাসী হয়ে দাঁড়ায়, তবে এ হলাহলের, এ পঙ্ক-ভারের শেষ হবে না, এ মহাদুঃখের কোনদিনই নিবৃত্তি হবে না। অর্থনৈতিক প্রভৃতি উপায়ে আংশিকভাবে কিছু দুঃখের লাঘব হ'তে পারে কিন্তু যে ঈর্ষা দ্বেষের হলাহলে সকল দেশ ক্লিষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে—যে লোভের সংঘাতে মানুষে মানুষে দেশে সমাজে নিদারুণ সঙ্ঘর্ষ চলেছে তার একমাত্র মুক্তির উপায়—চিত্তকে লোভমুক্ত করা, প্রসন্ন ও স্নিগ্ধ করা। আত্মশুদ্ধি না হলে, চরিত্রবল না থাকলে কেবল বহির্মুখ উপায়ে শান্তি ও কল্যাণ কে আবাহন করা যায় না। এর উপায় স্বরূপে

সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্প প্রভৃতি আট প্রকার মার্গের উল্লেখ করা হয়েছে। মৈত্রী করুণা প্রভৃতির আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই প্রবন্ধান্তরে করেছি। সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপ দীর্ঘসাধনার ফলে যখন বোধিসত্ত্বেরা নির্ব্বাণোন্মুখ হ'য়েছেন—কঠোর তপস্যার ফলে সিদ্ধি যখন করায়ত্তপ্রায় তখনও তাঁদের নিজেদের কল্যাণের চেয়েও বিশ্বের কল্যাণ বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে তাদের চিত্তে সংসারের বেদনা নিবিড় হয়ে উঠেছে তাঁরা বলেছেন—যতদিন সকল প্রাণী নির্ব্বাণ বা শান্তিলাভ না করে ততদিন আমাদের নির্ব্বাণ অপেক্ষা করে থাক—তাকে আমরা গ্রহণ ক'রতে পারি না। নির্ব্বাণের উপায়স্বরূপ তাঁরা মৈত্রীসাধনা করেছিলেন কিন্তু পরিশেষে সেই প্রেমই উপেয় বা লক্ষ্যের স্থান অধিকার করেছিল। নির্ব্বাণোন্মুখ সাধক সকল বোধিসত্ত্বের কাছে কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা ক'রেছেন—যেন তাঁরা অনন্তকাল সেই অবস্থাতেই থাকেন, সংসারকে দুঃখনিবৃত্তির শিক্ষা দান করেন, যেন নির্ব্বৃত হ'য়ে না যান, জগৎ যেন অন্ধকারাবৃত না হয়।

"নির্ব্বাতুকামাংশ্চ জিনান্ যাচয়ামি কৃতাঞ্জলিঃ।
কল্পাননন্তাংস্তিষ্ঠন্তু মা ভূদন্ধমিদং জগৎ॥"

সমস্ত বিশ্বসংসারের প্রতি করুণায় যাঁদের চিত্ত আপ্লুত হ'য়ে গিয়েছে, সকলের বেদনায় গ্লানিতে, দুঃখে যাদের চিত্ত আর্দ্র হ'য়েছে তাঁরা কেমন ক'রে সকলের শান্তি, সকলের কল্যাণ বিধান না ক'রে নিজেদের পরম ও চরম প্রার্থনার পরিতৃপ্তি লাভ ক'রবেন? তাই তাঁরা প্রার্থনা ক'রছেন—

অনাথানামহং নাথঃ সার্থবাহশ্চ যায়িনাং।
পারেপ্সূনাং চ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এব চ॥

যারা অসহায় অনাথ, আমি তাদের আশ্রয়, যাত্রিদলের আমি পথপ্রদর্শক। যারা পারগামী আমি তাদের নৌকা, অথবা সেতুস্বরূপ।

দীপার্থিনামহং দীপঃ শয্যা শয্যার্থিনামহং।
দাসার্থিনামহং দাসো ভবেয়ং সর্ব্বদেহিনাম্॥

যাঁরা আলোকপ্রার্থী আমি তাঁদের আলোক বিতরণ করি, যাঁরা বিশ্রামেচ্ছু আমি তাঁদের শয্যাস্বরূপ, যাঁরা দাস চা'ন আমি তাঁদের সেবক।

এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোঽহং যাবৎ সর্ব্বে ন নির্ব্বৃতাঃ॥

—এই যে বিস্তৃত অসীম প্রাণিজগৎ, সেখানে যার যেমন প্রয়োজন, তেমনি ক'রে আমি তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধি ক'রব; যতদিন না সকলে শান্তিলাভ করে ততদিন আমি তাঁদের উপজীব্য সেবার উপকরণ মাত্র। আমার দ্বারা যেন কারো অমঙ্গল না হয় অকল্যাণ না হয়—"অনর্থঃ কস্যচিন্মাভূৎ মামালম্ব্যকদাচন"। যদি কেহ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, ক্রুদ্ধ হ'ন তাতে যেন তাঁদের কোনও অমঙ্গল না হয় কিন্তু তার দ্বারাই তাঁদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হোক, পরম কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হোক্।

"যেষাং কৃদ্ধাপ্রসন্না বা মামালম্বা মতির্ভবেৎ।
তেষাং স এব হেতুঃ স্যান্নিত্যং সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ে॥"

সর্ব্ব জীবের প্রতি, সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি, সুগভীর প্রেমে, করুণায় তাঁদের সমগ্র জীবন বিগলিত হ'য়ে স্নিগ্ধ ধারায় প্রবাহিত হ'য়েছে—সকলের বেদনায় মর্ম্মস্থল থেকে গভীর আর্ত্তি উঠেছে যে আর্ত্তিতে তাঁদের নিজেদের পরম কল্যাণও তুচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিল। সেই সুমহান্ প্রেমের বাণী কোনও বিশেষ সময়ের বা দেশের নয় তা চিরন্তন কল্যাণের বাণী, সকল দেশের, সকল কালের, সকল জাতির শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের বাণী। মহামানবের সাগরতীরে সেই বার্ত্তাই যুগে যুগে নূতন ক'রে আমরা শুনি, নূতন ক'রে উপলব্ধি করি। তারই প্রেরণায় সকল কলুষ, লোভ, গ্লানি ও পাপ ধৌত হ'য়ে যায়—সুগভীর প্রসন্নতায়, মাধুর্য্যে চিত্ত অভিষিক্ত হয়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের কর্ম্মবাদের মধ্যে এই স্নেহ ও করুণার দ্বারা অনুপ্রাণিত কর্ম্মই প্রধান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যে প্রেরণায় শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়' যে প্রেমের আপ্লাবনে মানুষ পরম শ্রেয়ের সন্ধান পায় সেই প্রেমের অনুপ্রাণনায় কর্ম্ম করাই বৌদ্ধ কর্ম্মবাদের মূল কথা। তাই অবহিত চিত্তে একাগ্রভাবে তাঁদের প্রার্থনা ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে

এবং দুঃখাগ্নিতপ্তানাং শান্তিং কুর্য্যামহং কদা।
পুণ্যমেঘসমুদ্ভূতৈঃ সুখোপকরণৈঃ স্বকৈঃ॥

আমার সকল পুণ্যসঞ্চয়ের দ্বারা, আমার নিজের অর্জ্জিত সুখোপকরণের দ্বারা কবে আমি দুঃখানলদগ্ধ সকল জীবের শান্তি আহরণ ক'রতে পারব? এই প্রার্থনা সকল যুগের সকল মহামানবের প্রার্থনা ও পরম কল্যাণের বাণী।

ব্যর্থ সাধনা

রাধারাণী দেবী

"যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাইনা —"

সুদূর সাগর পার হতে ফিরে এলেন স্বামী
সুদীর্ঘ দশ বৎসর বাদে।
উনিশ বৎসরের ছেলেটি আজ
উনত্রিশ বৎসরের পরিণত যুবা।
পত্নী —ত্রয়োদশী কিশোরী এখন ত্রয়োবিংশা তরুণী।
এই দশবৎসর ধরে' স্বামী করেছেন একনিষ্ঠ সাধনা
জ্ঞান আর বিজ্ঞানের।
স্বদেশে ফিরেছেন জীবনের পথে অপরিমিত যশ
আর অর্থ অর্জ্জনের শক্তি নিয়ে।

স্ত্রী ছিলেন এতদিন স্বামীর চিত্তজয়ের জন্য
ঐকান্তিক অভিনিবেশে
নিজেকে নবতর রূপে নির্মাণে নিযুক্তা।
এই সুবিস্তৃত কালের সুদীর্ঘ সাধনায়
উভয়েই আপন আপন প্রয়োজনে আত্মগঠন করেছেন
সমুদ্রের এপার আর ওপারে বসে।

বিদেশ যাত্রা কালে
নব পরিণীত স্বামীর চিত্ত ছিল ক্ষুব্ধ—অপ্রসন্ন—
অমনোরমা ভার্য্যা লাভে।

গ্রামের অসংস্কৃতা বালিকা। সবে মাত্র
পড়তে শিখচে বাংলা নভেল্। দেখেনি স্কুল কলেজের মুখ,
হয়নি ইংরেজী অক্ষরপরিচয়ও ভাল করে!
শ্যামবর্ণা বধূর সলজ্জ চরণপাতে রজত মঞ্জীরের রুণ্-ঝুণ্ ধ্বনি,
অবগুণ্ঠনের আড়ালে জরীমণ্ডিত মস্ত চাকা খোঁপা।
ইংরাজীশিক্ষিত মডার্ণরুচি স্বামীর মনে
এনে দিল তিক্ত বিরাগ।
য়ুরোপ যাত্রার প্রাক্কালে তাই বিদ্রোহের সুরে
বলে গেল স্পষ্টই,—"ওটাকে মানুষ করতে পারো তো
আমার সঙ্গে বন্‌বে। নইলে—
অকারণ একটা জীবন্ত পুঁটুলি ঘাড়ে করে আমরণ
বয়ে বেড়াবার সাধ্য নেই আমার।"

মেয়ের শ্বশুরবাড়ী বাপেরবাড়ী উভয় পক্ষই তাই
সতর্কযত্নে তৈরী করেছেন তাকে
সাগরপারের বিলাতীডিগ্রীধারী স্বামীর
সুযোগ্যা ভার্য্যা রূপেই।

এই দশবৎসরে
পাড়াগাঁয়ের রাণীবালা দেবী পুনর্জন্ম নিয়েচে
কলিকাতা বালিগঞ্জ পল্লীর 'রীণা রয়্' রূপে।
লোরেটোর কৃপায় তার ইংরাজী উচ্চারন অতিনির্ভুল তো বটেই
তার উপরে মেম-গভর্নেসের পালিশে
ইংরাজী বলার ভঙ্গী টান্ সুর প্রভৃতি
অবিকল খাঁটি মেমের মতোই হয়েচে।
শাড়ী যদিচ পরে সে, কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে পেঁচিয়ে তনুদেহে লেপ্‌টে যে,
তাকে আধুনিকছাঁটের স্কার্টের পর্য্যায়ে ফেলা চলে।

অমন জম্‌কালো বিনুনীর খোঁপা, যাকে সোনার চিরুণী আর
মোতির ফুল দিয়ে সাজানো হতো সযত্নে—

সে হয়েচে বরখাস্ত। ছোট্ট মাথাটিতে এখন বব্‌ড্‌ হেয়ার্‌।
দেহের বর্ণ আর স্নিগ্ধশ্যামল নয়,
সতর্ক যত্নে ফুটেছে অতিমার্জ্জিত উজ্জ্বলতা
পিয়ার্স্‌—পণ্ডের ধার করা ফ্যাকাসে রং।
দেহের অনাবৃত অংশ ঘন-পাউডারে সর্বদাই আরঞ্জিত।
ঠোঁটে লিপষ্টিকের কৃত্রিম লালিমা,
অঙ্কিত ভ্রূরেখা, চিত্রিত অক্ষিপল্লব,
আঙুলের নখগুলি পর্য্যন্ত কিউটেক্স্‌ লাঞ্ছিত।
নরম পায়ে আলতার পরিবর্তে অত্যুচ্চ হিল্‌
ফ্যাসানেবল্‌ লেডীস্‌ শু্য।
চোখে নেই সে কমনীয় লজ্জা,—গণ্ডে নেই স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য।
চাহনিতে যৌবনের চটুলতা ও স্বল্প শিক্ষার অত্যুগ্র গর্ব-দীপ্তি;
বিবর্ণ গণ্ডে রঙের রক্তিমা।

সাগর পারে—উগ্র য়ুরোপীয় সভ্যতার চোখ ঝলসানো চাকচিক্য,
অকৃত্রিমের কণ্ঠরোধ ক'রে কৃত্রিমতারই জয়যাত্রা—
স্বামীর চিত্তকে করে তুলেছিল আহত ও নিপীড়িত।
তথাকথিত সভ্যতার কপট কৃত্রিম আবহাওয়ায়
দিনের দিন হৃদয় উঠেছিল হাঁপিয়ে, মন হয়েছিল বিমুখ।
দূর প্রবাসে তাই মনে মনে ভাবতে ভালো লাগত
স্বদেশের মা-বোন-বধূদের স্নিগ্ধ অকৃত্রিম প্রকৃতি।
পড়ার টেবিলে সাজানো থাকতো ফ্রেমে বাঁধানো
তার মৃতা জননীর আলোক চিত্র।
চওড়া কস্তা পেড়ে শাড়ী, সিঁথিতে সিন্দুররেখা,
মুখে চোখে অকপট সরল প্রসন্নতা।
কোনোখানে এতটুকু কৃত্রিমতা এতটুকু বিলাসিতা
এতটুকু বাহুল্যের বালাই মাত্র নেই।
ভাই ফোঁটার দিনে চিঠি পেতে ভালো লাগতো
ছোট বোনটির আর বড় দিদির।

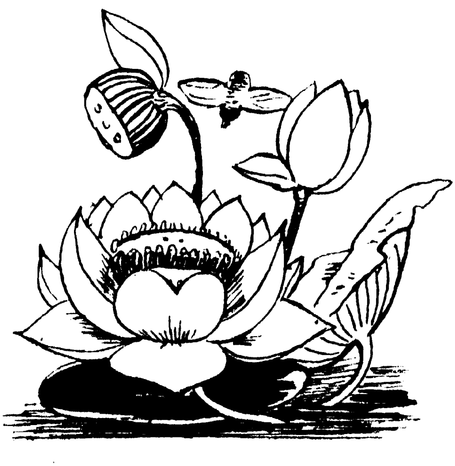
মনে পড়তো—নব পরিণীতা কিশোরী বধূ রাণুর
সলজ্জ আঁখির স্নিগ্ধ চাহনি,—সরম-বিনম্র চলন ভঙ্গী।

দশ বৎসর বাদে—
স্বামী নামলেন হাওড়া ষ্টেশনে বোম্বে মেল্ হতে।
শুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত। প্রসন্ন মুখে শান্ত সৌম্যতা।
বিলাতী সভ্যতার অত্যুগ্র ঝাঁঝ একটুও নেই চলনে বলনে।
প্রত্যাগত স্বামীকে অভ্যর্থনা করে নামিয়ে নিতে
আত্মীয় বন্ধুদলের সাথে ষ্টেশনে এসেছেন—স্ত্রী।
যাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে
এই দীর্ঘ দশ বৎসর কাল অনুদিন অনুক্ষণ
অনুকরণে অনুকরণে
নিজের সমস্তটুকু আত্মসত্তা বিলোপ ক'রে দিয়ে—বেচারী
নিজেকে করেচে বিলাতী ছাঁচে গঠিত
শিল্পীর হাতে যত্নে গড়ে তোলা নিখুঁত মূর্তিটির মতই।

চলায় ফেরায় কথায় বার্তায়, চাউনিতে হাসিতে
ঝরে পড়চে একটা তীব্রতা,—তার পরিচ্ছদে সিঞ্চিত
বিলাতী তীব্র এসেন্সেরই মতো।
সমস্ত কিছুই চলে 'রিণি'র উত্তেজনার উপরে।
একটা বাংলা বলতে দশটা ইংরাজী শব্দ মুখে এসে পড়চে।
বাম করধৃত ক্ষুদ্র ভ্যানিটিব্যাগ হতে
অতিক্ষুদ্র রেশমীরুমালে ঘন ঘন মুছতে হচ্চে
যত্নপ্রসাধিত ললাট কপোল।
দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে একগাছি প্লাটিনামের ঝকঝকে সরু চুড়ি—
বাম হাতে সোণার ক্ষুদ্র রিষ্ট্‌ওয়াচ—শাদা ফিতায় বাঁধা।
সূক্ষ্মস্বরের হাসি সু-উচ্চ ও ছন্দোময়ী,—
দৃষ্টিতে অতিমাত্রায় চপল চটুলতা।
কৃত্রিম অতিস্ফুর্তির লঘু প্রকাশে সর্ব শরীর অনাবশ্যক চঞ্চল।

ইংরেজী প্রথায় হাত বাড়িয়ে স্বামীর করমর্দন ক'রে
ইংরেজী ভাষাতেই স্বাগত সম্ভাষণ জানালে।
স্বামীও করলেন প্রতিসম্ভাষণ।

বিদেশ বাসকালে স্বামী—ভারতে ফিরে
ভারতীয়া পত্নীকে দেখার যে-ছবিটি
মনে মনে এঁকে রেখেছিলেন কল্পনার রঙে
তার একটু কোথাও মিললো না।
ক্লান্ত চিত্তে জাগলো একটি বেদনাগভীর হতাশা
এবং তারও চেয়ে বেশি
নীরব আত্মধিক্কৃতি।



সমাজবিদ্যার বিজ্ঞানায়ন

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু

Auguste Comte সমাজবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর পরে এ প্রয়াস আর বেশী দূর এগোয় নি। সমাজ-জীবনের মূল বৈজ্ঞানিক সূত্রগুলির অনুসন্ধান না ক'রে আজকাল পণ্ডিতরা বাস্তব সমস্যাগুলোর ওপর মন দিয়েছেন। সমাজবিদ্যা ক্রমশ হ'য়ে উঠছে জ্ঞানবিদ্যার একটা পাঁচ-মেশালী, মানব-সম্বন্ধীয় যা কিছু তত্ত্ব বাঁধা কোঠাগুলোর মধ্যে পড়ে না, তাই পড়ছে Sociologyর ফালতু ঝুড়িতে। এর ফলে সমাজবিদ্যা সম্বন্ধে ধারণাটা হ'য়ে উঠছে ধোঁয়াটে এবং যাঁরা সত্যি সত্যি সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান তাঁরাও সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করছেন না।

বিষয়টা গুরুতর। সমাজবিদ্যাকে বৈজ্ঞানিক কাঠামোর মধ্যে আঁটসাঁট করে বসাতে না পারলে অগত্যা মেনে নিতে হয় যে সমাজ ও কৃষ্টি বিজ্ঞানের চৌহদ্দীতে পড়ে না। তাই যদি হয় তবে বাইরের যন্ত্রতন্ত্রে বা মালমসলা বাড়িয়ে বৈজ্ঞানিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নিরর্থক। সমাজ-সংস্কারের বড় বড় পরিকল্পনা (plan) সব ব্যর্থ যদি সমাজের যথার্থ প্রকৃতিটা চিনতে পারা না যায়। বিপদের কথা এই যে আমাদের এই অজ্ঞানতার অবসরে রাষ্ট্রের বাজারে অনেক অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা চালু হয়ে যাচ্ছে যাতে ক'রে হয় ত' কোন দল বা শ্রেণীর উদ্দেশ্য সাধনই হবে, সমাজের কোন মঙ্গল হবে না।

বর্তমান বিজ্ঞানপ্রসূত সভ্যতা এই সঙ্কটের সামনেই দাঁড়িয়েছে। যান্ত্রিক সঙ্গতি ও শিল্পবিদ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু সমাজ হয়ে রইল দিশেহারা। পুরাকালে সমাজ কতগুলো নীতি এবং নির্দ্দেশ মেনে চলতো—অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক বলে নয়, আবহমান বলে। আমরা এই সংস্কারগুলোকে যুক্তির আঘাতে নষ্ট করেছি কিন্তু যুক্তির বলে সমাজবিদ্যার বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ গড়তে পারি নি। কেন হার মানতে হলো? গত একশো বছর ধরে সামাজিক জ্ঞানভাণ্ডার অনেক সম্পন্ন হয়ে উঠেছে। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি সব ত' পদার্থবিদ্যার মত সমৃদ্ধি পেয়ে চলেছে? তবে 'সমাজবিজ্ঞান' কেন তৈরী হবে না?

এই বাড়তি মাল-মশলাই হয়েছে বিপত্তি। বিজ্ঞানকে পরিণত রূপ দিতে হ'লে (যেমন পদার্থবিজ্ঞান ও গতিবিজ্ঞানের বেলায়) আগে অনুসন্ধানের প্রণালীটা আয়ত্ত করতে হয়, তারপর আসে পরীক্ষায় পাওয়া জ্ঞান আর বিজ্ঞানকে কাজে লাগাবার ফন্দীফিকির। সমাজবিদ্যার অগ্রগতি হয়েছে উল্টো। উপাদান বহু জুটেছে, রাতারাতি ফল পাবার ইচ্ছেটাও আছে, কিন্তু অভ্রান্ত প্রণালী

খুঁজে পাওয়া যায় নি, সমাজতাত্ত্বিক নৈর্ব্যক্তিক সন্ধানী না হয়ে হ'তে চেয়েছে সংস্কারক এই হয়েছে তার কাল।

আরো এক বিপদের কথা, সমাজবিদ্যা জড়িয়ে পড়েছিল দর্শনের সঙ্গে। সমাজতাত্ত্বিকরা তাঁদের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে পড়লেন নীতিশাস্ত্র ও দর্শনের অকূল সাগরে। F[illegible]. St. Simonian এবং positivistরা বহু চেষ্টায় সমাজের যে মর্ম্মোদ্ধার করেছিলেন তাকে ইতিহাসের ব্যাখ্যা, নৈতিক দর্শন বা অনাধ্যাত্ম ধর্ম্ম বললেও চলে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে এর প্রতিক্রিয়া চলেছে। সমাজতাত্ত্বিকরা আন্দাজী সন্ধান ছেড়ে বাস্তব জীবন থেকে ফর্দ্দ-তালিকা (statistics) সংগ্রহ করতে লাগলেন, যাতে করে প্রত্যক্ষ ফল পাবার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু এতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীটা আবিষ্কার করার যে আসল কাজ তা এড়িয়ে যাওয়া হলো এবং সমাজের পরিবর্ত্তে সমাজের বহিরঙ্গ হয়ে দাঁড়াল পঠিতব্য বিষয়।

ইঙ্গ-মার্কিন সমাজবিদ্যা এখনো দাঁড়িয়ে আছে আঠারো শতকের নৈতিক বিশ্বাসের ওপর। নৈতিক অনুশাসন এঁদের সমাজচিন্তাকে দাবিয়ে রেখেছে। সমাজবিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে এঁরা গড়েছেন সমাজনীতির ব্যবহারিক প্রতিবিম্ব (pragmatic system of social ethics)। ইউরোপের বেত্তারা বিজ্ঞানপন্থী এবং স্থিতলক্ষ্য। কিন্তু তাঁরা মুস্কিলে পড়েছেন আনুষঙ্গিক বিদ্যাগুলোর ও খোদ সমাজবিদ্যার মধ্যে গণ্ডী টানতে গিয়ে। নৃতত্ত্বের প্রতিযোগিতা এঁরা কিছুতেই রুখতে পারলেন না। জ্ঞানজগতের বেওয়ারিশ জমির ওপর এরা উভয়েই চেষ্টা করেছে যথাসাধ্য দখল চালাতে। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব একই এলাকায় গদি পাতলো, কারণ নর নিয়েই সমাজ। শেষ পর্য্যন্ত একটা কাজ চালানো গোছের রফা হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদ্ আদিম মানুষ আর তার সমাজ ও কৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামান, সমাজতত্ত্ববিদ্ নাড়াচাড়া করেন সাবালাক কৃষ্টি আর বর্ত্তমান সমাজজীবন নিয়ে। নৃতত্ত্বেরই জিৎ হলো, কারণ প্রাচীন উপাদানগুলো নিয়ে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা কতকটা সহজসাধ্য। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা—যেমন Krœber, Wissler, Lowie, Goldenwieser, এদিকে বেশ কাজ করেছেন। সমাজ-বিদ্যাকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে হ'লে এঁদের বইগুলো সাহায্য করবে।

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানের সভায় ঢুকে পড়লো, সমাজতত্ত্ব রইল বাইরে পড়ে, এর কারণ নৃতত্ত্বের সঙ্গে প্রাগিতিহাস বা প্রত্নতত্ত্বের কোন বিবাদ নেই, কিন্তু সমাজতত্ত্বের সঙ্গে ইতিহাসের বনিবনা কম। এ শাস্ত্রটা যখন তৈরী হয় তখন ইতিহাস আছে আসর জুড়ে—বিজ্ঞান হিসাবে নয়, সাহিত্য হিসাবে।

ইতিহাস সম্বন্ধে ধারণাটা আমরা ধার করেছি গ্রীকদের কাছ থেকে, যারা এটাকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটা অঙ্গ বলে মনে করত। বিজ্ঞানের কারবার নিরপেক্ষ (absolute) অনন্ত সত্তা নিয়ে,—ইতিহাস আঁকে কালের ও বিবর্ত্তনের ছবি। Platoর বিশ্বাস ছিল যে বহির্ঘটনা বিকৃতি ও বিবর্ত্তন-সাপেক্ষ, অতএব বিজ্ঞান যতই ওদের এড়িয়ে চলবে ততই হবে এর পরিণতি। রেনাসাঁস যুগের বিজ্ঞেরা এই বিশ্বাসটা বয়ে এনে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং আমাদের ইতিহাসে

এর ছাপ পড়েছে। পণ্ডিতেরা এখনো বলেন ইতিহাস বিজ্ঞান নয়, কারণ বিজ্ঞান হয় সাধারণ বিষয় নিয়ে, বিশেষ ঘটনা নিয়ে নয় যা নিয়ে হচ্ছে ইতিহাসের কারবার। Trevelyan বলছেন গ্রীক আদর্শে ইতিহাসকে একটা কলাবিদ্যায় দাঁড় করাতে, (Clio, a muse), Acton চান ইতিহাস থেকে একটা নৈতিক আদর্শ বা শাসন খুঁজে বার করতে, আর Croce দেখেছেন ইতিহাসকে দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টির সাথে মিলিয়ে (Theory and History of Historiography)।

আধুনিক ঐতিহাসিকের এর কোন পথটাই পছন্দ হচ্ছে না। তাঁরা দাবী করছেন ইতিহাস স্বাধীন, স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে দাঁড়াক। Meyer তাঁর History of Antiquityর ভূমিকায় এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ইতিহাসকে দেখতে চেয়েছেন শিল্পীর দৃষ্টিতে নয়, বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে। কিন্তু তাঁর চোখ আদর্শের ধোঁয়া থেকে মুক্তি পেলেও বিজ্ঞানের আলো নিতে পারে নি। অন্যান্য সামাজিক বিদ্যা থেকে এর পার্থক্য দেখাতে গিয়ে তিনি ইতিহাসের ব্যক্তিপরায়ণতা ও নিয়মনিরপেক্ষতা মেনে ব'সে আছেন। তিনি বলতে চান যে সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মতই কতকগুলো সাধারণ সূত্র বার করতে চায় যার মধ্যেই বিন্যস্ত করা যেতে পারে দৃশ্যমান বিবিধ সামাজিক ঘটনা। কিন্তু ইতিহাসের কোন সাধারণ সূত্র বা কার্যাকারণ সম্বন্ধ নেই—সব ঘটনাগুলোই আকস্মিক এবং মানবেচ্ছাপ্রসূত। গুরুগিরি ছেড়ে এই ঘটনাগুলির নিরপেক্ষ পঠন হোল তাঁর মতে ইতিহাসের আদর্শ।

Bury করেছেন আপত্তি। একি একটা পণ্ডিতী খেয়াল ? ঘটনাসংগ্রহ আর ডাকটিকিট সংগ্রহে তফাৎ রইল কোথায় ? জ্ঞানীর বৈঠকে পাত্তা পেতে হ'লে সমাজবিদ্যার সঙ্গে এর আত্মীয়তা পাতাতেই হবে।

ইতিহাস বিজ্ঞান, না দর্শন, না শিল্প—এ তর্কটার ভেতর মাথা গলাবার আগে দেখা উচিত আধুনিক বিজ্ঞান এবং আধুনিক ইতিহাস এ দু'এর পরিস্থিতি কোথায়। গ্রীক বিজ্ঞানের মত সনাতন সত্যের মর্মোদ্ধার আধুনিক বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়। শুধু কতকগুলো অব্যবহারিক (abstract) নিয়মকানুন আবিষ্কার করাই এর কাজ নয়—আরোহ (induction) এবং পরীক্ষার (experiment) জোরে এ প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনা ও তথ্যকে আয়ত্ত করতে চায়। অধিকন্তু ক্রমবিকাশবাদ এবং জীবতত্ত্বের নবতম পরিণতি এর মধ্যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। প্রাণিবিজ্ঞানগুলো, যেমন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বা পশুতত্ত্ব, এমন কি জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূতত্ত্বও ইতিহাসাত্মক। বিজ্ঞানের সার কথা আজ এই যে নিখিলের স্থিরত্ব নেই, সনাতনী নেই, কালের ছাপ খেতে খেতে বিশ্ব বিবর্ত্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে।

আবার ইতিহাসও শিল্পচাতুর্য্য ও নীতিবচনে সন্তুষ্ট নয়—কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জগাখিঁচুড়ী বলে আত্মপরিচয় দিতেও রাজী নয়। অতীতকে একটা "আকস্মিক ঘটনাসমষ্টিরূপে না দেখে এ দেখছে একটা স্বাভাবিক পরিবিকাশের মূর্ত্তিতে। এ আর এখন রাজনৈতিক চালবাজি আর

সন্ধিবিগ্রহগুলোকে তত দাম দেয় না যত দেয় স্থায়ী সামাজিক আর আর্থিক প্রভাবগুলোকে যা' দ্বারা সাধারণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর একটা জিনিষ এ পেয়েছে নৃতাত্ত্বিকের কাছ থেকে। উনিশ শতকে ইতিহাস রাষ্ট্রকে সমাজের একক (unit) এবং গবেষণার লক্ষ্য বলে মানত, আজকাল ইতিহাস কৃষ্টিকে ব্যষ্টি বলে মানছে। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেয়ে কৃষ্টির ঐক্য ব্যাপক এবং গভীর। এ সূক্ষ্ম বুদ্ধির মাথা থেকেও আসেনি রাষ্ট্রীয় জীবনবীজ থেকেও জন্মায়নি। সমাজসত্তার এইটেই প্রাণ যা থেকে নতুন নতুন সামাজিক পরিবেশ এবং পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে।

জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক ইতিহাস সমাজগতি বা কৃষ্টির বিকাশকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিচ্ছে। ইতিহাস আর বিজ্ঞানের সত্যিকার বিরোধ নেই এবং ইতিহাস ও সমাজবিদ্যা বস্তুত পরস্পর মুখাপেক্ষী। সমাজবিদ্যাকে বাদ দিলে ইতিহাস হয়ে ওঠে শব্দসার এবং অবৈজ্ঞানিক আর ইতিহাসকে বাদ দিলে সমাজতত্ত্বকে হ'তে হয় কতগুলো অব্যবহারিক মতবাদের সমষ্টি। এ পর্য্যন্ত এই ইতিহাস-বিমুখতাই হয়েছে এর দুর্ব্বলতা---এ চেয়েছে ইতিহাসকে এর মতবাদগুলোর অনুগত বাহন করে রচনা করতে। সমাজতাত্ত্বিকদের বড় বড় পুঁথি খুললে প্রায়ই দেখতে হয় নতুন নতুন ঐতিহাসিক 'তথ্য' যা ঐতিহাসিকরা জানেন না—এবং ঐতিহাসিক সমস্যার সহজ সমাধান, যার দিকে ঐতিহাসিকরাই নিতান্ত ভয়ে ভয়ে এগোন।

বাস্তবপক্ষে এ দু'এর প্রণালী ভিন্ন, বিষয় এক। সমাজবিদ্যা গোষ্ঠিজীবনের শৃঙ্খলাবদ্ধ বিশ্লেষণ, ইতিহাস সমাজজীবনের ধারাবাহিক ও বিশদ বর্ণনা। প্রথমটির কারবার সমাজের গঠন নিয়ে দ্বিতীয়টীর কারবার এর বিকাশ নিয়ে। জীবতত্ত্ব এবং জৈব বিকাশের মধ্যে যা সম্বন্ধ এদের মধ্যেও তাই। যেমন গ্রীক সভ্যতা সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে হ'লে, সমাজতাত্ত্বিক খুঁজবে পুররাষ্ট্রের গঠন, পারিবারিক জীবনের আর্থিক ভিত্তি, সমাজের মধ্যে বৃত্তিভেদে শ্রেণিবিভাগ, সমাজব্যবস্থায় দাসপ্রথার স্থান ইত্যাদি; কিন্তু এ সমস্তই করতে হবে ঐতিহাসিকের উপাদানকে অবলম্বন করে, ধারাবাহিকভাবে এবং গ্রীক কৃষ্টির ক্রমবিকাশকে চোখের সামনে রেখে। ঐতিহাসিক তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যগুলিকে বোঝাবার জন্যে উপরোক্ত সামাজিক বিশ্লেষণের সাহায্য নেবেন এবং সমগ্র গ্রীক কৃষ্টির সঙ্গে তার যোগস্থাপন করবেন।

সমাজবেত্তারা এদিকে বিশেষ কিছুই করেন নি। কৃষ্টিমূলের (cultural unit) সন্ধান এবং তার সুসম্বদ্ধ বিশ্লেষণ করেছেন নৃতাত্ত্বিকরা। সমাজবেত্তাদের নজর উঁচু। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোতে চল্‌তি যে আঙ্কিক এবং পারিমাণিক (quantitative) পদ্ধতি, সেগুলোকে কাজে লাগাবার খেয়াল তাঁদের পেয়ে বসেছে এবং ফলে তাঁরা একটী যন্ত্রবৎ (mechanistic) ও জড়বশ (determinist) সমাজবিজ্ঞান খাড়া করেছেন। 'social physics,' 'social energetics' ইত্যাদি কত রকমারি 'বাদ' এলো গেলো, তবু উদ্যোগের বিরাম নেই;—এরা ইতিহাস বা সামাজিক বাস্তবের তোয়াক্কা রাখে না, এগুলোতে আছে কতগুলি অস্পষ্ট ব্যাপক উক্তি, আর এর সূত্রগুলো পদার্থবিদ্যা থেকে ধার করা উপমা ছাড়া আর কিছুই নয়। Carey বলছেন যে সামাজিক বন্ধন

আণব আকর্ষণ সূত্রের (law of molecular gravitation) একটি অঙ্গ। Carver ও Ostwald বলছেন যে কৃষ্টি জিনিষটা সৌরশক্তিকে মানবশক্তিতে পরিবর্ত্তন করবার একটা কল। Winiarsky তর্ক করছেন যে সামাজিক পরিবর্ত্তন thermodynamics এর কানুন মেনে চলে। ঐতিহাসিকের দেখা আছে সমাজের সত্তা কত দুরূহ, জটিল, তাই বেত্তার উপবৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রণালী দেখে তিনি ক্ষেপে গেছেন বিদ্যেটার ওপরেই।

অথচ এ কথাও সত্যি যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মানুষ ও সমাজকে বোঝা যায় না। হাজারো রকমে মানুষের জীবন প্রভাবিত হচ্ছে বাস্তব শক্তিদ্বারা। ঐতিহাসিক গতির নীচে, সভ্যজীবনের বাহ্য কাজগুলির আড়ালে—রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের সঙ্গে সমাজের মূল সম্বন্ধগুলি আর পরিবর্ত্তনের অর্থমুখীনতা। সমাজবিদ্ শুধু সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে কী সম্বন্ধ তাই খুঁজবে না—পরিবেষ্টনের সঙ্গে মানবজীবনের মূল সম্বন্ধটাও খুঁজে বার করবে, কারণ এখানেই হচ্ছে সকল কৃষ্টির গোড়া। এদিককার কাজে সে দাঁড়াবে জীবতাত্ত্বিকের সঙ্গে, ঐতিহাসিকের সঙ্গে নয়—কারণ সমাজকে তার প্রাকৃতিক আবেষ্টন আর অর্থকরী অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিয়ে পড়া, আর জীবাণুকে (organism) তার পরিবেষ্টন ও কার্য্যকলাপের (function) সঙ্গে মিলিয়ে পড়া—দুটোর মধ্যে বেশ মিল আছে।

Le Play তাঁর একটি বইএ (Les Ouvriers Europeens) এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন—যদিও তাঁর সমসাময়িক Marx, Spencer বা Buckleএর মত সম্পূর্ণ জিনিষ তিনি দিতে পারেন নি, এবং অতখানি প্রতিষ্ঠাও তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। Marxএর স্বাবলম্ব (hypothetical) জড়বশ্যতাবাদ না নিয়েও তিনি সমাজের অর্থমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, Buckle কিংবা Ratzelএর চেয়েও যথাযথ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি সমাজ-জীবনে ভৌগোলিক আবেষ্টনের প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন, Herbert Spencerএর মত অর্দ্ধ-বৈজ্ঞানিক, অর্দ্ধ-দার্শনিক ব্যাপকোক্তি না ক'রেও তিনি সমাজ-বিকাশের সঙ্গে জৈববিকাশের সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। তিনি গবেষণা সুরু করেন বিশেষ কোন ভৌগোলিক ও আর্থিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অবস্থিত কতগুলি পরিবার নিয়ে—অর্থাৎ স্থান ও বৃত্তিভেদে সমাজজীবন এবং সমাজ গঠন কেমন রূপ নেয় তাই ছিল তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়। তিনি শ্রমিকজীবন নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ সুরু করলেন—গোটা ইউরোপ থেকে বিভিন্ন স্তরের আদর্শ শ্রমিক পরিবার বেছে নেন। তাঁর অনুসন্ধান সরকারী নথিপত্র ও ফর্দ্দতালিকার সাহায্যে চলে নি—তিনি সরাসরি তাদের ঘরকন্না দেখেছেন—তাদের খরচপত্রের হিসেব নিয়েছেন—এবং এই সব প্রত্যক্ষ উপকরণ দিয়ে পারিবারিক ঘটনা ও তথ্যগুলির অর্থ বার করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস বিজ্ঞানসম্মত হ'লেও পূর্ণাঙ্গ হয় নি। পরিবার ছাড়া সমাজের ব্যষ্টিবাচক (unit) আর যে সব প্রতিষ্ঠান—যেমন গ্রামাগোষ্ঠি, সহর ও মিউনিসিপ্যালিটী এবং জাতি ও রাষ্ট্র সেগুলোকেও ঐ পদ্ধতিতে পড়া উচিত ছিল—এবং আরো উচিত ছিল সমগ্র সমাজের আবহমান কৃষ্টির ও বিকাশের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করা। Le Play পুরোদস্তুর বাস্তববাদী ছিলেন না। সমাজ-

জীবনে নীতি ও ধর্ম্মের বস্তুস্বাতন্ত্র তিনি বহু ক্ষেত্রে স্বীকার করেছেন। কিন্তু এ প্রভাবগুলো তাঁর কাছে স্থির গতিহীন ; সমাজের অন্তর্গত নয়, সমাজ-বহির্ভূত। এখানেই তাঁর আসল গলদ।

কৃষ্টি বলতে শুধু কর্ম্ম ও স্থানভিত্তিক একটা সম্প্রদায়কে বোঝায় না—কতগুলো বিশিষ্ট ভাবের গ্রন্থি একে বেঁধে রাখে একটা নিজস্ব সত্তা দেয়। এখানেই খুঁজতে হবে কালোত্তর শিল্পের উৎস, ঋষির দৃষ্টি' বুদ্ধির দান। এসব বস্তুর বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্দ্দেশ বা মাত্রাগত বিশ্লেষণ (quantitative analysis) চলে না ব'লে সমাজবিদ্ হয় ত' চাইবেন এদের পাশ কাটাতে কিন্তু উপায় নেই। মনের রাজ্যে এই সূক্ষ্মের প্রভাব স্থুল পারিপার্শ্বিকের চেয়ে কম নয়। সমাজবিদ্ অবিশ্যি মুখ্যত দেখবেন সমাজের গঠন বা আকৃতি, যার ভিত হচ্ছে বস্তু এবং চূণবালি ভৌগোলিক পরিবেশ ও আর্থিক বৃত্তি—কিন্তু এই সমাজগঠনকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে যে কৃষ্টির সৌধচূড়া তার দিকে চোখ বুঁজে থাকলেও সমাজবিদের কাজ হবে না। গ্রীক নগরের সামাজিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে হলে দেখতে হবে একদিকে এ যেমন ভূমিজ অন্যদিকে তেমনি Hellenismএর প্রতীক—ঠিক যেমন Athens এর জনপ্রিয় রাজা Erechtheus বিশ্বমাতার সন্তান আবার Pallas Athenের বরপুত্র।

সমাজতত্ত্বের মধ্যে এই দুই ভিন্নগুণ পৃথক্ বস্তুর আবির্ভাবই যত বিপদ বাঁধিয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সন্ধান চলে সমগুণ উপাদানের ওপর, দার্শনিকেরও তাই। কিন্তু সমাজবিদ্‌কে কাজ করতে হচ্ছে দুই অবিচ্ছিন্ন অথচ ভিন্নগুণ উপকরণ নিয়ে।

সহযোগী বৈজ্ঞানিক যখন এগিয়ে চল্লো কদমে কদমে এবং তাঁর সন্ধিৎসা হয়ে উঠল অধীর, তখন সমাজবিদ্ আর তার জটিল উপকরণকে সরল করে নেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। দুটো ভিন্নগতি ধারার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিরূপিত হলো,—একটি হলো উৎস, অপরটী উচ্ছ্বাস।

যাঁরা বস্তুকে উৎস করেছেন তাঁদের গুরু হচ্ছেন Marx। তিনি বলেছেন—"মানবজীবনের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আত্মিক প্রক্রিয়াগুলি নিরূপণ করে, বাস্তবজগতে ধনের উৎপাদন-পদ্ধতি। মানুষের চেতনা তার স্থিতিকে নির্দ্ধারণ করে না, তার স্থিতিই তার চেতনাকে নির্দ্ধারণ করে। আর্থিক ভিত্তির পরিবর্ত্তন হলে সাথে সাথে অতিকায় কৃষ্টিচূড়া রূপ বদলায়" (Zur Kritik der Politischen Oekonomie. Introduction)। কৃষ্টিচূড়া যে জড়ভিত্তিক এবং অর্থনির্ভর একথায় সন্দেহ জাগে না। কিন্তু একথা প্রচার করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি পাওয়া শক্ত যে সমাজের অর্থনিরপেক্ষ প্রভাব নেই। একদিকে এই মতবাদ ছেঁটে দিয়েছে কৃষ্টির সেই সমস্ত অঙ্গ যা সোজাসুজি ওপর কৃষ্টিমূলক শক্তিগুলোর কোন অর্থনীতির ব্যাখ্যায় পড়ে না, অন্যদিকে অর্থাতীতের এলাকা থেকে অনেকটা জমি দখল করেছে অর্থের গণ্ডীর ভেতর।

এই মতের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছেন একদল, ভাবকে বস্তুর উৎস করে। Hegel এবং তাঁর শিষ্যদের কাছে ইতিহাস হচ্ছে নির্বিকল্প চিৎশক্তির (absolute mind) ধারাবাহিক আত্ম-প্রকাশ। নিখিলাত্মার ভাবসংঘর্ষ (Cosmic dialetic) থেকে এক একটী কৃষ্টি বা জাতি বুদ্‌বুদের

মত আসে যায় এবং বাস্তব সভ্যতা এই অন্তর্লীন ভাববস্তুরই (immanent idea) প্রতিচ্ছবি। সমাজতাত্ত্বিকের আসরে আজ Hegelএর এই বিশ্বাসের স্থান নেই। কিন্তু Hegelএর আগে রাজত্ব করেছিল যে যুক্তিমিশ্র আদর্শবাদ—Burke এবং de Maistreএর কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বহু ব্যঙ্গ, আক্রমণ সত্ত্বেও সে তার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হতে দেয় নি। এর মূলে আছে দুটো অটল বিশ্বাস। প্রথম, সমাজ এক অবিচ্ছিন্ন প্রগতির নিয়ম (absulote law of progress) মেনে চলে। দ্বিতীয়, যুক্তিবোধ সমাজকে পরিবর্ত্তন করবার শক্তি রাখে। স্বাধিকার, বিজ্ঞান, যুক্তি, ন্যায়বোধ—এসব কতগুলো নিছক হাওয়াটে কল্পনা নয়—সমাজের প্রগতি ও কৃষ্টির রূপান্তর ঘটাতে এরা সমর্থ। এ মতের প্রভাব যদিও সুধিসমাজে আজও কিছু কিছু আছে তবু বিজ্ঞানপন্থীরা কোনমতেই এঁদের অন্ধবিশ্বাসকে সমর্থন করতে পারেন না। *

Simmel ও Wiese একটা নতুন মধ্যপথ ধরেছেন। সমাজকে তাঁরা বুঝতে চান সরাসরি—বস্তু ও ভাব-নিরপেক্ষ করে,—অর্থাৎ তত্ত্বকে অন্তঃসারশূন্য করে, শূন্যগর্ভ ন্যায়শাস্ত্রে পর্য্যবসিত করে। Emile Durkheimএর হাতে সমাজ হয়েছে স্বয়ম্ভূ—এক স্বাধীন আত্মিক শক্তি—যা হ'তে উদ্ভূত হচ্ছে তার বস্তুজীবন ও ভাবজীবন। এক কথায় সমস্ত সমস্যার জট খুলে গেলো—সমাজবিদ্যা তাল ঠুকে বিজ্ঞানের খাস কামরায় হাজির হলো।

সমাজ-বিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা আয়ত্ত করতে হলে এত অধীর হওয়া চলবে না। যেমন Pareto বলছেন,—কার্য্যকারণ সম্বন্ধটাকে এক তরফা দেখাটা ভুল,—সমাজের বহিরঙ্গ কতগুলি মিশ্র এবং পরস্পর নির্ভরশীল প্রভাব থেকে রূপ নেয়। বাস্তব আবেষ্টন, সামাজিক গঠন, আধ্যাত্মিক কৃষ্টি পরস্পরকে প্রভাবিত করছে, আর সমবেত ভাবে চালাচ্ছে সামাজিক জীবনধারা ;—এর মধ্যে একটাকে সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা ও অন্যগুলোকে কর্ম্ম করা চলবে না।

জাপানী সামুরাই প্রথাটাকে নজর দিয়ে দেখলে এ কথাটা বোঝা যায়। ওখানকার সমাজে এর কার্য্যকলাপ বেশ পরিস্ফুট এবং স্থান সুনির্দ্দিষ্ট। তবু এই অনুষ্ঠানটীর স্বরূপ বুঝতে হ'লে শুধু জাপানী জমিদারতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিকাশ এবং জাপানী সমাজের আর্থিক গঠন বুঝলে চলবে না—যে জটিল নৈতিক বুদ্ধি ও ধর্ম্মবিশ্বাসগুলি এর মধ্যে মূর্ত্তি ধরেছে সেগুলোর খোঁজ নিতে হবে। এর মধ্যে স্বদেশী, কনফুসিয়, বৌদ্ধ সবরকম উপাদানই আছে—যার সঙ্গে জাপান ও তার সামরিক ঐতিহ্যের দূর আত্মীয়তা রয়েছে। এ সব মিলিয়ে যে নৈতিক আদর্শ ও সংস্কৃতির রূপ দেখা যাচ্ছে, তা অতীতের কঙ্কালমাত্র নয়—জাপানী সমাজের মধ্যে এ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে এবং একে বাদ দিয়ে জাপানী রাজনীতি এবং তার চিন্তা ভাবনা বোঝা অসম্ভব।

অতএব সমাজের পাঠ ধর্ম্ম ও দর্শন বাদ দিয়ে চলে না। কেউ কেউ আরো দশ পা এগিয়ে গিয়ে একেবারে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মধ্যে সমাজতত্ত্বের ধ্বজা নিয়ে ঢুকেছেন। তাঁরা বলতে চান—সমাজ

* Pereto এদের বিশ্বাসকে সমাজতত্ত্বের মধ্যে না এনে ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে ঠাই করে দিয়েছেন Trattato di Socialogia generale.

বাদ দিয়ে যখন আত্মিক কৃষ্টি হয় না, তখন "আত্মিক বিজ্ঞানের" (Geisteswissenschaften) স্বাতন্ত্র্যের দাবীও টেকে না। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শুধু সমাজদেহের ক্রিয়া নয়, এদের একটা স্বতন্ত্র নীতি ও লক্ষ্য রয়েছে। সমাজের মাটিতে এদের জন্ম, কিন্তু এদের দৃষ্টি ব্যবহারিক জগতের দিগ্বলয় পেরিয়ে চ'লে যায়। Comteর সময় থেকে আদর্শ-পরায়ণতার চাপে ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের সংস্কার সুরু হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকের খেয়াল চেপেছে ধর্ম্ম সংস্কার করবার,—যেন তাঁদের ছাঁচে ঢালাই ধর্ম্মমত থেকে তাঁদের মনের মত সমাজ তৈরী হবে। বলা নিষ্প্রয়োজন—এটা বৈজ্ঞানিকের রীতি নয়।

বিশ্বময় দেখা যাচ্ছে কার্য্যকারণের যোগসূত্রটী একটা মালার মত—এর সুরু নেই, শেষ নেই। বীজ থেকে গাছ, গাছ থেকে ফল, ফল থেকে বীজ। "আত্মিক বিজ্ঞানের" শিকড় সমাজের বুক থেকে রস টানছে—আবার সমাজকে দিচ্ছে ছায়া, জল, ফল। সমাজবিজ্ঞান ও "আত্মিক বিজ্ঞানের" মধ্যে এই চক্রাকার সম্বন্ধটা বুঝতে পারলেই আর খেয়াল মাফিক ধর্ম্ম-সংস্কার করার উৎসাহ থাকবে না।

গ্রীক রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে জন্মেছিল তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ ও ঔদার্য্যের নৈতিক আদর্শ, কিন্তু এরাই আবার তাদের পুরপ্রতিষ্ঠানের ওপর একটা বিশিষ্ট ছাপ দিয়েছিল। বর্ত্তমান স্বাধিকার- বোধ ও গণতন্ত্রের আদর্শ সম্বন্ধেও তাই বলা চলে। Max Weber দেখিয়েছেন যে পুঁজিতন্ত্র শুধু একটা নির্জলা আর্থিক পরিবিকাশের মধ্যে বেড়ে ওঠে নি। রিফর্মেশনের পর প্রটেষ্ট্যাণ্ট ইউরোপে শিল্প ও সঞ্চয়ের প্রতি ধর্ম্মের যে একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল—সেখান থেকেও এ জীবনের রস টেনেছে। আবার এই রিফর্মেশন—যাকে আমরা ধর্ম্মের যুদ্ধ বা ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামীর যুদ্ধ বলে জানি খোঁজ করলে দেখা যাবে যে আসলে তার উৎস হচ্ছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, জাতীয় রেষারেষি ইত্যাদি।

মনোবিকলন যেমন ব্যক্তির সামনে তার অবচেতন দ্বন্দ্ব ও অবদমন (repression) গুলো মেলে দেয়, তাকে আত্মসচেতন করে, সমাজবিশ্লেষণের বৈজ্ঞানিক রীতিও হবে তেমনি। সমাজকে এ যথার্থ লক্ষ্যের সঙ্গে পরিচিত করে দেবে—এর কার্য্যকলাপের যথার্থ প্রেরণা সম্বন্ধে অবহিত রাখবে—এর সংঘর্ষ-দ্বন্দ্বের স্বরূপ এর কাছে পরিষ্কার করবে। রাজনীতির ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এর বিপরীত ধারা। আমরা সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলিকে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে না দেখে একটা আদর্শের চশমা লাগিয়ে দেখি।

এই আবছায়া দৃষ্টি অতীতে যথেষ্ট ক্ষতি করেছে, কিন্তু ভবিষ্যতে করবে আরো অনেক বেশী। কারণ রাষ্ট্র ক্রমশ সামাজিক জীবনের ওপর তার অধিকার বাড়াচ্ছে। মন্দির, পরিবার, উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান সব একে একে রাষ্ট্রের আওতায় আসছে। এমন কি সমাজের গড়ন, আঙ্গিক সম্বন্ধ, কৃষ্টির দান সব কিছু রাষ্ট্র প্রয়োজনের তাগিদে নতুন করে গড়তে লেগে গেছে। আজ কোন রাষ্ট্রবিদ্ চাইবেন যুদ্ধ বন্ধ করতে, কেউ চাইবেন দারিদ্র্য দূর করতে, কেউ চাইবেন জন্মের হার

নিয়ন্ত্রণ করতে। এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হ'লে যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক মশলা দরকার তা নেই। রাষ্ট্রের ধুরন্ধররা শেষ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বুদ্ধির ওপরই নির্ভর করছেন অথবা বড় জোর বাস্তববাদ ও নীতিবাদের একটা জোড়াতালি দিয়ে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করছেন। Marxএর সমাজতন্ত্রবাদ যে এতটা লোকপ্রিয় হয়েছে তার কারণ এ অন্তত একটা গোটা স্বসম্পূর্ণ সমাজবিদ্যা খাড়া করেছে, যদিও বা তার মধ্যে ত্রুটী বা ফাঁক কিছু থাকে।

জীবতত্ত্ব ও প্রাণতত্ত্ব যেমন ভিষকবিদ্যাকে নবজন্ম দিয়েছে—আমরা চাই সমাজবিজ্ঞান তেমনি রাজনীতিকে রূপান্তরিত করবে। এই নববিজ্ঞানের কাজ হবে বিভ্রান্ত সভ্যতাকে স্বচেতন করা, সমাজের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা। কিন্তু এ কাজ positivistদের মত অধ্যাত্ম ও দর্শনকে বেদখল করে হবে না অথবা নৈতিক ও আত্মিক সম্পদকে উড়িয়ে দিয়েও হবে না। যতদিন পর্য্যন্ত স্থূল ও সূক্ষ্মের মধ্যে সেতু না উঠবে, এ ব্যবধান যতদিন "লম্ফ" দিয়ে উত্তরণ না করে উপায় নেই, ততদিন পর্য্যন্ত একটীকে সূত্র করে বিজ্ঞান দাঁড়াবে না—তা মানুষের দেহবিজ্ঞানই হোক বা সমাজের দেহ-বিজ্ঞানই হোক। এই যুগ্মধারার প্রভাব স্বীকার ক'রে সমাজবিজ্ঞান তৈরী হলেই তা থেকে জন্মাবে রাষ্ট্রনীতির ব্যবহারিক বিজ্ঞান (applied science of politics)—মানুষের ভবিতব্যের ওপর হাত দিতে রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক তখনই হবে অধিকারী।



শিক্ষা, নারীসমাজ ও বয়স্কশিক্ষা *

শ্রীঅনাথনাথ বসু

আমাদের দেশের নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কতদূর হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন হিসাবনিকাশ না করাই ভাল; কারণ ব্যাপারটা অত্যন্ত সুপরিচিত। যে দেশে সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা দশজন মাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ও যে দেশে মেয়েদের শিক্ষালাভ করবার পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে নানা বাধা রয়েছে, সেখানে যে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার সামান্যই হয়েছে এটা অনুমান করা সহজ; এর জন্য কল্পনাশক্তির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। এইখানে একটা কথা বলে রাখি, আমি অক্ষরজ্ঞানের কথাই বলেছি, (কারণ সেন্সসের সময় অক্ষরপরিচয়েরই হিসাব নেওয়া হয়) শিক্ষার কথা নয়; লেখাপড়া জানা আর শিক্ষিত হওয়া সমার্থবোধক নয়। সেন্সসের হিসাবে যারা দস্তখত করতে পারে বা একটা চিঠি যেন তেন প্রকারেণ পড়তে পারে তারাই "লিটারেট" অর্থাৎ অক্ষর জ্ঞা- সম্পন্ন বলে পরিচিত হয়।

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আজ আর নূতন করে প্রবন্ধ রচনা করার দরকার নেই; কারণ অল্প কয়েকজনকে বাদ দিলে দেশের আর সকলেই এ বিষয়ে এখন নিঃসন্দেহ হয়েছেন এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য এদেশে আজ প্রচুর উৎসাহ দেখা গিয়েছে ও এদিকে নানা চেষ্টা চলেছে। তার ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে মেয়েদের ইস্কুল ও ছাত্রীর সংখ্যা কয়েকগুণ হয়েছে এবং বিশ বৎসর আগেকার তুলনায় এখন বহু ছাত্রী ইস্কুল কলেজে পড়ছে। এদের সংখ্যা কি ভাবে ক্রমশ বাড়বে. যেভাবে তারা আজ শিক্ষালাভ করছে প্রয়োজনবোধে কি ভাবে তার হেরফের করা হবে এবং কেমন করে তাদের শিক্ষাকে জীবনের উপযোগী করে তোলা হবে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; আমি বিশেষ করে বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার কথাই এখানে বলতে চাই।

ছোট ছোট মেয়েদের শিক্ষার যে ধারার সৃষ্টি এখন আমাদের দেশে হয়েছে, সে ধারা আপনার বেগে চলবে এবং ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করবে। দেশের লোক সেরূপ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছে, সুতরাং তাদের উৎসাহের অভাব হবে না। কিন্তু বয়স্কা নারীগণের মধ্যে শিক্ষার যথোচিত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে বলে আমি মনে করি না। এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগের অভাব হবার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, মেয়েদের শিক্ষা এখনও আমাদের দেশে অলঙ্করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে; কথাটি কটু শোনালেও

* বয়স্কশিক্ষা শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ adult education.

বলতে হয় যে ছোট ছোট মেয়েদের যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তার মুখ্য উদ্দেশ্যবিবাহের সময় অলঙ্কারের ভার বৃদ্ধি করার জন্য ; স্বর্ণের পরিবর্তে শিক্ষা চলে, সঙ্গে যদি স্বর্ণ থাকে সে তো আরও ভাল কথা ; লেখাপড়া জানা থাকলে বিবাহের সুবিধা হয় ; ছেলেরা আজকাল শিক্ষিতা স্ত্রীর দাবী করেন ; এই ভেবেই অনেক অভিভাবক মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করেন ; সুতরাং মেয়ে প্রকৃতই শিক্ষা করছে কি না, তার মন ও বুদ্ধি মার্জিত হচ্ছে কি না মুখ্যত সেদিকে দৃষ্টি না রেখে, মেয়ে কোন্ ক্লাশে পড়ছে, ক'টা পাশ করছে সেই দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়।

আর একটা কারণেও আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহ অভিভাবকদের মধ্যে দেখা যায় ; মেয়েরা লেখাপড়া শিখে কিছু কিছু উপার্জন করতে পারে, পিতামাতাকে সাহায্য করতে পারে। অবশ্য শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যেও বেকার সমস্যা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে এবং তাদের বেতন কম হতে আরম্ভ করেছে। আগে একটি শিক্ষিতা মেয়ে যত সহজে চাকরি পেত বা যে বেতন পেত এখন তত সহজে চাকরিও পাওয়া যাচ্ছে না, তেমন বেতনও মিলছে না ; এর একটা কারণ, কাজের অভাব। একজন অর্থনীতিবিদ্ বলেছিলেন এদেশের প্রকৃত সমস্যা বেকারের নয়, বেপেশার, পেশার অভাবের শিক্ষিতা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। যে অনুপাতে শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা বাড়ছে, কাজ সেই অনুপাতে বাড়ছে না ; সুতরাং এই সমস্যার সমাধান করতে হলে কাজের সংখ্যাও বাড়াতে হবে। শুধু শিক্ষকতার কাজে কতগুলি মেয়ের স্থান হতে পারে, বিশেষ করে যখন এ সাধারণ শিক্ষারই প্রসার এত সীমাবদ্ধ ? সে যাই হোক্, মেয়ে লেখাপড়া শিখলে এক দিকে যেমন তার বিবাহের সুবিধা হবে, অন্যদিকে সে হয়তো কিছু উপার্জন করতে পারবে, এই ভেবেই যে অনেক পিতামাতা ও অভিভাবক আজ মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই।

যাঁদের বিবাহ হয়ে গেছে, যাঁরা এখন বড় হয়েছেন, তাঁদের বেলায় কিন্তু এরূপ কোন প্রয়োজনের বিশেষ তাগিদ পাওয়া যায় না। প্রথম কারণ এক্ষেত্রে অবিদ্যমান, দ্বিতীয় কারণও বিশেষ জোরলো নয়। গৃহকর্মের অবসরে উপার্জন করার ব্যবস্থা বা প্রথা আমাদের দেশে তেমন প্রচলিত নয়। আমি শুধু তথাকথিত ভদ্র পরিবারের কথাই বলছি না, দেশের জনসাধারণের মধ্যেও অনুরূপ অবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। গরীব লোকের মেয়েরা কিছু কিছু উপার্জন করে সত্য, কিন্তু সেটা সামাজিক প্রথারূপে নয়। যাই হোক মোটের উপর বলা যায় যে বয়স্কা নারীদের শিক্ষা দেবার জন্য বাহির হ'তে কোন প্রয়োজন নেই বলে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়ে নি।

অথচ এক হিসাবে দেশের দিক দিয়ে তাঁদেরই শিক্ষার সব চেয়ে আগে দরকার। একথা তো ঠিক যে মা শিক্ষিতা হ'লে পরিবারের ছেলেমেয়েদের সকলেরই শিক্ষা সহজ হয়ে ওঠে। শিক্ষিত পিতার সন্তান বরং অশিক্ষিত হতে পারে, কিন্তু শিক্ষিতা মাতার সন্তানের বেশি সম্ভাবনা থাকে শিক্ষিত হয়ে ওঠার। পিতা শিক্ষিত হলেও সন্তানের শিক্ষার ভার প্রথমে পড়ে মায়ের উপর ; অন্ন সংস্থানের চেষ্টায় পিতার বেশির ভাগ সময় যায়, তার

অবসরে সন্তানের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়। তাই মায়ের কোলই হয় সন্তানের প্রথম বিদ্যালয়; সেই বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা সে পায় অন্য সকল শিক্ষার চেয়ে তার প্রভাবই হয় বেশি। মনস্তাত্ত্বিকেরা তো আজকাল বলছেন চরিত্র গঠনের বেশির ভাগ উপাদান শিশু সংগ্রহ করে, তার জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরের মধ্যেই; আর সে উপাদান সে পায় মুখ্যত পিতামাতার সংস্পর্শে এসে, কারণ তখন নিজের ক্ষুদ্র পরিবার ও পিতামাতা ছাড়া অন্য কারো প্রভাব বিশেষ করে তার জীবনের উপর পড়তে পারে না; আমাদের দেশে সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বয়সের আগে ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে যায় না, আর এদেশে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ইস্কুল নেই। একথা যে কতখানি সত্য তা শিশুচরিত্রে যাঁর কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে তিনিই জানেন। সুতরাং পিতামাতার শিক্ষার উপর, শিশুর শিক্ষা ও চরিত্র বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য পাশ্চাত্য দেশে নানারকমের নার্সারি স্কুল, কিণ্ডারগার্টেন প্রভৃতি আছে। সেখানে আরও ছোট বয়সের অর্থাৎ দু-এক বৎসর বয়সের শিশুদের জন্যও জনসাধারণের নার্শারি এবং ক্রেশ (creche) আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে ও প্রতিষ্ঠানে খুব ছোট শিশুরাও দৈহিক এবং মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে থেকে ঠিকভাবে বড় হতে শেখে। রুশিয়াতে ক্রেশকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত করা হয়েছে অর্থাৎ সেখানে যেমন ছেলেমেয়েদের জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তেমনি অল্প বয়স্ক শিশুদের জন্যও সরকারী ক্রেশ আছে; গবর্ণমেণ্টের খরচে, গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে সেগুলি পরিচালিত হয়। সেদেশের গভর্ণমেণ্ট শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন বলেই একদিকে যেমন বয়স্ক শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা পারিবারিক জীবনকে শিক্ষিততর করে তুলেছেন, অন্যদিকে পারিবারিক জীবনে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের প্রতিকারের জন্য শিশুর উপযুক্ত শিক্ষার ভারও নিয়েছেন। সেখানে ক্রেশ ও নার্সারি ইস্কুলগুলি এইভাবে পিতামাতা ও অভিভাবকদের শিশুকে মানুষ করার কাজে সাহায্য করছে। ইংলণ্ডে, যুক্তরাজ্যে, ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রুশিয়ার মত এমন ব্যাপকভাবে নয়। অন্য সকল দেশেই এই ধরণের বিদ্যালয়গুলিতে বিশেষ করে ধনী পিতামাতার সন্তানেরাই শিক্ষালাভ করে; কারণ সাধারণত সেগুলি সরকারী শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্গত নয়, আর সুলভও নয়। কিন্তু এসব দেশেও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝতে পারছেন যে, বরং শিক্ষিত ও ধনী পিতামাতার সন্তানের জন্য ক্রেশ বা নার্সারি বা কিণ্ডারগার্টেন না হলেও চলে (কারণ তাদের পরিবারে শিক্ষার উপযুক্ত প্রতিবেশও আছে, এবং শিশুদের শিক্ষা দেবার সামর্থ্যও তাদের আছে) কিন্তু বিশেষ করে গরীব ও অশিক্ষিত পিতামাতার সন্তানদেরই জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। দেশে যারা শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে না এমন গরীব ও অশিক্ষিত লোকই দেশে বেশি, আর দেশ তো তাদেরই নিয়ে।

এই জন্যই সে সব দেশে একদিকে যেমন শিশুশিক্ষার উন্নততর ও পূর্ণতর ব্যবস্থা হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি বয়স্ক নরনারীদের শিক্ষার, বিশেষ করে বয়স্কা নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা হচ্ছে,

এবং সে জন্য নানারূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। (এইখানে বলে রাখা ভাল যে এই দেশগুলিতে সর্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক; সুতরাং বয়স্কশিক্ষার সমস্যা সেখানে আমাদের দেশের মত গুরুতর নয়)।

আমাদের দেশে এখনও প্রাথমিক শিক্ষাই আবশ্যিক করা হয় নি, আর ব্যাপকভাবে ক্রেশ, নার্সারি ইস্কুল প্রভৃতির কল্পনা করাও আমাদের পক্ষে এখন অসম্ভব বলে মনে হয়। তা ছাড়া শুধু প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা দিয়ে আমাদের শিক্ষাসমস্যার সমাধান হতে পারে না। সুতরাং বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা করা ছাড়া উপায় নেই; আর বয়স্কশিক্ষার মধ্যে আগে বয়স্কা শিক্ষার ব্যবস্থাই প্রথমে প্রয়োজন; এর কয়েকটি কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি; নারীগণের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সার্থক করতে হলেও তার দরকার।

বয়স্কদের শিক্ষার কথা তুললেই একটা প্রশ্ন ওঠে, বেশি বয়সে নূতন কিছু শেখা যায় কি না। অনেকের ধারণা বয়সের সঙ্গে মন শক্ত হয়ে আসে এবং নূতন কিছু শেখা কঠিন হয়ে পড়ে; তার কারণ তখন নাকি মেধা, বুদ্ধি প্রভৃতির নূতন কিছু গ্রহণ করবার ক্ষমতা কম হয়ে যায়। কথাটা যে সর্বাংশে সত্য নয়, মনস্তাত্ত্বিকেরা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। বেশি বয়সে মন নানা কাজের ভারে ব্যস্ত থাকে বলে হয়তো তার কিছু পরিমাণ অসুবিধা হয় কিন্তু অন্য দিক দিয়ে বেশি বয়সে শেখার একটা সুযোগ আছে। ছোট ছেলেমেয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, লেখাপড়া করার চেয়ে মেয়ে পুতুল খেলতে, দৌড়ঝাঁপ করতেই ভালবাসে; তা ছাড়া যখন সে লেখাপড়াও শেখে তখন কি শিখবে, না শিখবে সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে বিচার করবার অধিকার না থাকায় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত বিষয় শিখতে বাধ্য হওয়ায় শিক্ষাব্যাপারে তার সহযোগ ও উৎসাহের অভাব ঘটে। বয়স্কের বেলায় কিন্তু এ ব্যাপারটা হয় না। বয়স্কা নারীর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট; তা ছাড়া কি শিখবেন, না শিখবেন সে বিষয়ে তিনি নিজে বেছে নিতে পারেন; সেই জন্যই শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ ও সানন্দ সহযোগিতা পাওয়া যায়। শিক্ষায় উৎসাহের দাম খুব বেশি। যদি ধরেই নেওয়া যায় যে, বয়সের জন্য শেখা একটু কঠিন হয়, তা হলেও এই উৎসাহের জন্যই শেখা সহজ হয়ে ওঠে। সুতরাং বয়স্কশিক্ষা অসম্ভব নয়। অন্যান্য দেশে বয়স্কশিক্ষার চেষ্টা কি রকম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং জাতীয় জীবন পুনর্গঠন করতে সফল হয়েছে সেটা দেখলেও বয়স্কশিক্ষা যে অসম্ভব নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আর আমাদের দেশেও অনেক দিন হতে বয়স্কশিক্ষার যে নানা চেষ্টা হয়েছে তাতেও এই কথাই প্রমাণ হয়।

বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার জন্য নানা রকমের ছোটখাট চেষ্টা আজ এদেশে নূতন নয়; বাংলাদেশে এরকমের চেষ্টা অনেকদিন হতেই হয়েছে। তার জন্য গবর্ণমেণ্ট এককালে জেনানা মিশনের ব্যবস্থা করেছিলেন; বছর পনের আগে সেটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তঃপুর শিক্ষামণ্ডল ও অন্যান্য নানা প্রকারের সমিতি ও সঙ্ঘ হয়েছিল এবং হয়েছে; কিন্তু ব্যাপকভাবে কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নি। তা ছাড়া দেখা গেছে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স্কা নারীগণের যে

শিক্ষার আয়োজন করা হয়েছে সেটা এমন লোভনীয় ও চিত্তাকর্ষক করা হয় নি, যে বয়স্কা মেয়েরা সহজে ও সানন্দে তা গ্রহণ করতে পারেন। (এখানে অবশ্য বলা উচিত যে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য সে চেষ্টাও হয়েছে)। অনেক স্থলেই বয়স্কশিক্ষার নামে শিশুশিক্ষা চালান হয়েছে—অর্থাৎ ছোট ছোট মেয়েদের যেভাবে যে বিষয়গুলি শেখান হয় বয়স্কা নারীদেরও সেই বিষয়গুলি ঠিক একই রকম করে শেখাবার চেষ্টা হয়েছে। সুতরাং এরূপ চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কারণ নেই; কারণ বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বয়স্কা নারীগণকে আজ যে আমরা শিক্ষিত করে তুলতে চাই তার কারণ এই যে, যে সমাজে তাঁরা বাস করছেন সেই সমাজের প্রতি তাঁদের কর্তব্য তাঁরা শিক্ষার সাহায্যে সুন্দরতররূপে ও সার্থকতর ভাবে নিষ্পন্ন করতে পারবেন। জীবনের পথে চলতে চলতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাতে কোনমতে কাজ করা ও জীবনধারণ করা চলে বটে, কিন্তু সে চলা নেহাতই গতানুগতিকভাবে হয়; তাতে সুখ থাকতে পারে, কিন্তু তাতে আনন্দ নেই, অভ্যস্ত পথে চলতে বুদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন হয় না; কিন্তু যদি অভ্যস্ত পথের বাইরে যেতে হয়, তা হলেই বুদ্ধির মার্জনা ও শিক্ষার দরকার হয়। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন; দেশের জীবনধারার পরিবর্তন ও পরিপুষ্টি এবং জাতির উন্নতিসাধনের জন্য শিক্ষা চাই, নতুন করে ভাবা চাই। সেই ভাবা যে সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে হয় না তা নয়; কিন্তু বুদ্ধি যদি শিক্ষার দ্বারা মার্জিত ও সংস্কৃত হয়, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয়ের সাহায্যে যদি নিজের চিন্তাশক্তি সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ হয় তা হলে কাজটা সহজ হয়ে ওঠে। শিক্ষার উদ্দেশ্য মনকে সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা হতে মুক্তি দেওয়া, উদার জ্ঞানের ও চিন্তার রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া। শিক্ষালাভ করার অর্থ সর্বযুগের, সর্বদেশের ও সর্বকালের মনীষার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা। নিজের ক্ষুদ্র গ্রামটিতে একটি গৃহের কোণে ঘরকন্না নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাস করা কি যায় না? সেভাবে বাস করতে যে বেশি কিছু জানা দরকার তা তো নয়। কিন্তু সেভাবে বাস করে মানুষ আনন্দ ও তৃপ্তি পায় না। তাই নরনারীনির্বিশেষে মানুষ জানতে চায়, শিখতে চায়, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করতে চায়; যখন তা সম্ভব হয় না তখন মন হাঁপিয়ে ওঠে, জীবন অতৃপ্তিতে ভরে যায়। তার পর দীর্ঘদিনের অভ্যাসের চাপ যখন মুক্তিকামনার কণ্ঠরোধ করে দেয় তখন মনের মৃত্যু ঘটে।

আমাদের দেশে ঘরে ঘরে সেই অপমৃত্যুর ইতিহাস পাওয়া যাবে।

তা ছাড়া শিক্ষার অভাবে আজ আমাদের সমাজ ও জাতীয়-জীবন দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে; একদিকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভেদ ঘটেছে; অন্যদিকে পরিবারের ভিতরেও নরনারীর মধ্যে অজ্ঞানের প্রাচীর গড়ে উঠে তাদের দুই জগতে নিয়ে গেছে, সে দুই জগতের মধ্যে কোন যোগসেতু নেই। তাই সমাজে ও জাতীয়জীবনে আমরা নারীকে পুরুষের পাশে পাই নি সহকর্মীরূপে; নারীকে আমরা চিন্তা করবার সুযোগ দিই নি, বাহিরে কি হচ্ছে সে সংবাদ তাঁদের হাতে পৌঁছতে দিই নি, তাই আজ ঘরে ঘরে অচলায়তন সৃষ্টি হয়েছে।

বয়স্কা নারীর শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় যে তিনি লেখাপড়া শিখে দুখানা নাটক বা নভেল পড়বেন। আমরা চাই তিনি লেখাপড়া শিখে সকল বিষয়ে ভাবতে শিখবেন, সমাজ, ধর্ম, অর্থ, রাষ্ট্র, পরিবার সকল সম্বন্ধে ভাল করে চিন্তা করতে পারবেন, এবং এই সকল বিষয়ে তাঁর কি কর্তব্য সেটা বেছে নিতে পারবেন। আমার এই কথায় কেউ যেন মনে না করেন যে, আমি শিক্ষার ভিতর দিয়ে তাঁর মনকে তাঁর দৈনন্দিন কাজ হতে দূরে নিয়ে যেতে চাই। এ শিক্ষার উদ্দেশ্য সেরূপ নয়; বরং এই শিক্ষার ফলে তাঁর দৈনন্দিন কাজও যাতে সুন্দরতর এবং সার্থকতর হতে পারে তার ব্যবস্থাও থাকবে। তাই বয়স্কা নারীর শিক্ষার পাঠ্যসূচীর মধ্যে একদিকে যেমন ঘরের কাজের কথা থাকবে, তেমনি সেখানে বাহিরের বৃহত্তর জগতের কথাও থাকবে। সেখানে সূচীশিল্প, আল্পনা, সেবা ও পরিচর্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি আলোচনার ব্যবস্থাও থাকবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে আমরা এই বলতে পারি যে এই শিক্ষা তাঁকে গৃহকে সুন্দরতর করতে শেখাবে, গৃহের কাজে তাঁকে কুশলতর করে তুলবে এবং লিখতে পড়তে শিখিয়ে সংবাদপত্র ও গ্রন্থের সাহায্যে জাতীয় জীবনের সকল প্রকার চেষ্টার সঙ্গে তাঁর চিন্তার ও কর্মের যোগ স্থাপন করবার সুযোগ দেবে।

এতক্ষণ আমি শিক্ষার তত্ত্বসম্বন্ধেই আলোচনা করেছি, এখন কি ভাবে আমাদের আদর্শকে কার্যে পরিণত করতে হবে সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলি, কারণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবার অবসর এখন নেই।

বয়স্কা নারীদের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছেন তাঁদের কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি; এ ধরনের আরও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে; এর জন্য পুরাপুরি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও মহিলা সমিতি, নারীমঙ্গল সমিতি প্রভৃতি গড়ে তুলতে হবে এবং যেখানে যেরূপ সমিতি আছে তাঁদের কর্মপন্থার মধ্যে বয়স্কশিক্ষাকে স্থান দিতে হবে। কিন্তু সাধারণত নগরাঞ্চলেই এ ধরনের সমিতিগুলি দেখা যায়; গ্রামে এধরণের সমিতি বেশি নেই; অথচ গ্রামাঞ্চলেই বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন; তার ব্যবস্থা কি ভাবে করা যায় এই হল সমস্যা।

কিছুদিন পূর্বে লেডি অবলা বসুর আহ্বানে নারীশিক্ষাসমিতির জন্য বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার একটি পরিকল্পনা আমি তৈয়ারি করে দিই। তাতে কি ভাবে এই সমস্যার আংশিক সমাধান হতে পারে তার একটা ইঙ্গিত আমি দিয়েছি। সমিতি আমার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং এই অনুযায়ী কাজও আরম্ভ হয়েছে।

ধীরে ধীরে বাংলার পল্লীঅঞ্চলে নানাস্থানে বালিকাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আমি সেই বালিকাবিদ্যালয়গুলিকে কেন্দ্র করে পল্লীশিক্ষাকেন্দ্র সৃষ্টি করার কথা বলেছি; এগুলিতে একদিকে যেমন বালিকাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে, অন্যদিকে তেমনি বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হবে। যাঁরা বালিকাবিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেছেন, তাঁদেরই উপর বয়স্কা নারীগণের

শিক্ষার ভারও থাকবে। এর জন্য বালিকাবিদ্যালয়ের কাজের সময়ের কিছু পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে এবং সে পরিবর্তন সহজেই করা যেতে পারে। আমার প্রস্তাব সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত বালিকাবিদ্যালয়ের কাজ চলবে এবং ১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বয়স্কা নারীগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে; স্থান কাল ও পাত্রভেদে এই ব্যবস্থার অবশ্য ইতরবিশেষ ঘটবে, তবে মোটামুটি এইভাবে সময় ভাগ করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন বালিকা বিদ্যালয়ের কাজের সুবিধা হবে অন্যদিকে তেমনি বয়স্কা মেয়েদেরও সুবিধা হবে। সাধারণতঃ গৃহের কাজকর্মের শেষে তাঁরা যেটুকু ছুটি পান তা এই সময়-টাতেই; তখনই তাঁদের শিক্ষাকেন্দ্রে আসা সম্ভব। প্রয়োজন হলে বয়স্কশিক্ষার কাজ বিদ্যালয়গৃহে না করে' কোন গৃহস্থের বাড়ীতেও করা যেতে পারে।

শিক্ষাকেন্দ্রের এই অংশের কার্যসূচীকে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে:—(ক) লেখাপড়া; (খ) অঙ্ক ও পারিবারিক হিসাব; (গ) আলাপ-আলোচনা; (ঘ) সূচীশিল্প, আল্পনা ইত্যাদি; (ঙ) স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও পরিচর্যা। এর মধ্যে আর সবগুলির ব্যাখ্যা না করলেও চলে, কিন্তু আলাপ-আলোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। আলাপ-আলোচনাই বয়স্কশিক্ষার প্রকৃষ্টতম উপায়; তারই সাহায্যে ভাবের আদান-প্রদান, চিন্তার বিকাশ ইত্যাদি হবে। শিক্ষয়িত্রী আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে দেশের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি শিক্ষার্থিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন; এর জন্য সংবাদপত্র হ'তে বা নানা গ্রন্থ হ'তে নানা বিষয় তিনি পড়ে শোনাবেন। মোটামুটি ভাবে এইগুলিই শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ হবে। একটা কথা এইখানে বলা দরকার যে শিক্ষয়িত্রীদের এই কাজের জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হবে। প্রথম প্রথম হয়তো কেন্দ্রীয় সমিতিকে তার ভার নিতে হবে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীকে পেলে পরে দেখা যাবে যে পল্লীবাসীরাই সে ভার আনন্দের সঙ্গে বহন করবে।

আমার এই পরিকল্পনা খুব বড় নয়, কিন্তু আমার মনে হয় এইভাবে কাজ আরম্ভ করলে শীঘ্রই অনেকগুলি কেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য এই কাজে বালিকা বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও অন্য সকল রকম প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। এ কাজ একদিনের নয় বা অল্প কয়েক-জনের নয়। এদেশের নারীগণের শিক্ষার ব্যবস্থা সহজে হ'তে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার। এরূপ শিক্ষাব্যবস্থার জন্য দুটি জিনিষের বিশেষ প্রয়োজন—উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর ও উপযোগী সাহিত্যের; এদেশে এই দুইয়েরই বিশেষ অভাব আছে। আজকাল শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষার জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু সেখানে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে শিক্ষার উদ্দেশ্য অল্পবয়সে বালিকাদের লেখাপড়া শেখান; বয়স্কশিক্ষার উদ্দেশ্য ও পন্থা স্বতন্ত্র একথা আমি পূর্বেই বলেছি; শিক্ষয়িত্রীগণের শিক্ষাব্যবস্থায় কিভাবে বয়স্কা নারীদের শেখাতে হয় সে বিষয়েও শিক্ষা দেবার আয়োজন হলে কিছু ফল পাওয়া যেতে পারে। এভার যাঁদের উপর আশা করি তাঁরা এবিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। এইখানে আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ করা উচিত। একটি শিক্ষয়িত্রীই যে সব বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারবেন এটা আমি মনে করি না; এর জন্য ঘুরে বেড়িয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারবেন এমন একদল শিক্ষয়িত্রীর

প্রয়োজন হবে। জেনানা মিশন এককালে এইভাবের কাজ করেছিল; আজও এরূপ কাজ করবার প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কিন্তু শিক্ষয়িত্রীসমস্যাই একমাত্র সমস্যা নয়, উপযোগী সাহিত্যের অভাবও একটি প্রধান সমস্যা। বয়স্কা মেয়েদের উপযোগী অর্থনীতি, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বইয়ের আমাদের বিশেষ অভাব; যা আছে তা উচ্চশিক্ষিতাদের জন্য; সহজ ভাষায় সহজভাবে সেগুলি লেখা নয়। সেগুলি পড়ে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করতে হলে অনেক বেশি লেখাপড়া জানা দরকার। অন্য বইয়ের কথা দূরে থাক বয়স্কশিক্ষার উপযোগী বর্ণপরিচয়েরই বই আমাদের নেই. যা আছে তা হয় শিশুদের জন্য. না হয় পুরুষদের জন্য লেখা, বয়স্কা মেয়েদের উপযোগী করে লেখা নয়। এই উদ্দেশ্যে যা বই লেখা হবে তা বয়স্কা মেয়েদের চিন্তা ও জীবনের প্রয়োজনের উপযোগী করে লেখা দরকার, তার ভাবধারাও সেই মত করে লিখতে হবে। কিন্তু বস্তুত সহজ সরস ও সরল ভাবে লেখা এ রকম বই কই? উপযোগী সাহিত্যের অভাবেই অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে না। এ সম্বন্ধে আমি অন্যত্র কিছু আলোচনা করেছি, এখানে বিষয়টির গুরুত্ব উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম আশা করি দেশের লেখকলেখিকাগণের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হবে।

দোটানায়

শ্রীশান্তিসুধা ঘোষ

(১)

বৎসরখানেক হইল সুশীল কলিকাতায় আসিয়াছে। বাল্যে পাড়াগাঁয়ে, কৈশোরে যৌবনে মফঃস্বল সহরে পাঠ সমাধান করিয়াছে, তারপরে এখন বেকার গ্রাজুয়েট। অগত্যা কলিকাতা না আসিয়া উপায় নাই।

কিন্তু কলিকাতা আসিয়া সে যেন নূতন আলো পাইয়াছে। বেকারত্ব এখনও ঘোচে নাই সত্য, তবে সমাজের রূপ যেন বদলাইতে সুরু করিয়াছে, যাহাতে বেকার বলিয়া আগের মত এখন আর সে নিজে সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ হয় না, পরিবর্ত্তে সমাজপদ্ধতিকেই দায়ী বলিয়া আবিষ্কার করিবার ফলে একটা উগ্র আক্রোশ মনের মধ্যে ঝাঁজিয়া উঠে। কলিকাতার হাওয়ার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে সে আরও বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে—যাহা কিছু এতদিন সে জানিয়া আসিয়াছে তাহার আগাগোড়া ভূল, উচ্চনীচের ভেদ ভুল, নীতিধর্ম্মের ভিত্তি মিথ্যা।

যাহাদের সঙ্গে এখানে আসিয়া তাহার আলাপ, তাহাদের মধ্যে একজনকে তাহার বিশেষভাবে ভালো লাগে। নাম অসিত সেন—লোকে কম্‌রেড সেন বলিয়া থাকে। তাহার একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আছে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবং সেইজন্যই শুধু সুশীল কেন, কলিকাতা তথা বাংলাদেশের অন্যান্যস্থানেও যুবকমণ্ডলীর মধ্যে তাহার বেশ একটি প্রতিপত্তি আছে। সে যখন বক্তৃতা দেয়, তাহার চোখমুখের দৃপ্ত ভঙ্গিমা মানুষকে মাতাইয়া তোলে, সে যখন তর্কস্থলে টেবিলের উপর সজোরে ঘুষি ঠুকিয়া প্রমাণ করিতে থাকে, নীতি, ধর্ম্ম, দর্শনাদি 'যা' বলিয়া আসিয়াছে সকলই মিথ্যা চালিয়াতি, তখন মনে হয়, প্রাচীনের ভিত্তি বুঝি সত্য সত্যই ফাটিয়া চৌচির হইল। অন্যান্য অনেকের মত তাই সুশীলও মুগ্ধ হইয়াছে। প্রায়শঃই একবার অসিতের দর্শন না লইলে তাহার চলেনা।

আজ বিকালেও সেইদিকেই রওনা হইল। অসিতবাবুর বাড়ীতে দৈবাৎ বা যখন তাহাকে পাওয়া যায়, তখনও একা পাওয়া যায়না—সর্ব্বদাই বন্ধু শিষ্য পরিবৃত। সুশীল পৌছিয়া দেখিল, আজও গুটি দুই আছে।

অসিতবাবু সুশীলকে দেখিয়া একবারমাত্র বলিল, "বোসো।" তারপরেই আবার চলিতে লাগিল পূর্ব্বের আরব্ধসূত্রগুলি ধরিয়া বাদানুবাদ।

সুকুমার বলিতেছিল "সমাজের চিরপ্রচলিত ধারাকে পরিবর্ত্তিত করে আপনারা যা প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে চান, তার ভিত্তি কি তবে থাকবে ভোগবাদের ওপরে।"

অসিতবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান ভোগবাদ ছাড়া অন্য কিছুর ওপরে সমাজের ভিত্তি কখনও কোথাও ছিল ?"

সুকুমার বলিল, "নিশ্চয় ছিল। ইউরোপে না থাকতে পারে, অন্ততঃ আমাদের ভারতবর্ষে চিরকাল ভোগকে উপেক্ষা ক'রে ত্যাগকেই সামাজিক কল্যাণের ভিত্তি ও আদর্শ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।"

অসিতবাবু তাচ্ছাল্যভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কদাচ নয়। ও ত্যাগ হচ্ছে কথার বুজরুকি। ও হচ্ছে কতিপয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে চরিতার্থ করবার জন্য বাকী অসংখ্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি"—

অবিনাশ এদিক্ হইতে মাথা নাড়িল, "ঠিক।"

অসিত বলিয়া চলিল, "অন্ন, বস্ত্র, ধন, সম্পৎ থেকে অন্যকে যদি বঞ্চিত করা না যায় তা হলে নিজে ষোলআনা ভোগ করা যায়না এই বুদ্ধিটুকু তাদের মাথায় ছিল বলেই ত্যাগের মহিমা সাধারণের কাছে প্রচার কর্ত্তে তারা পঞ্চমুখ হয়েছিল। দেখুন দেখি, আপনার ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা! তারা রাজত্ব করেছে, দিগ্বিজয় করেছে, বিবাহ করেছে পুরুষেরা বহুবিবাহ করেছে, অর্থ-কামকে জীবনের পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেছে,—ভোগের আর বাকী রেখেছে কি ? ত্যাগ ভারতীয় সমাজের আদর্শ ছিল, এ কথা শিখলেন কোত্থেকে ? পার্থিব সুখভোগ ব্যতীত সমাজজীবন বা ব্যক্তিজীবনের মূলে আর কোনও প্রেরণা নেই। আত্মা ও পরকালের, ধাপ্পাবাজিতে সমাজ ভোলে না। তাই ইউরোপীয়েরাও সে চেষ্টা করেনি, ভারতীয়েরাও না।"

সুকুমার কথাগুলি হজম করিতে স্বীকৃত হইল না। পিতৃপিতামহ হইতে আমদানী যে অভ্রান্ত ধারণা তাহার শিরায় শিরায় পুঁজি হইয়া আছে, তাহা অসিতবাবুর এককথাতেই টলিতে দিল আর কি ? সে নিশ্চিত জানে, ভারতীয়েরা ত্যাগপ্রবণ, ধর্ম্মপ্রবণ জাতি, অসিতবাবু দুইপাতা রুশ-সাহিত্য পড়িয়া পাণ্ডিত্য দেখাইলে কি হইবে ? সুতরাং সুকুমার গম্ভীরভাবে বলিল, "কিন্তু ভোগের ওপরে ধর্ম্ম কখনই টেঁকে না। এবং ভারতবাসীরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। অতএব ভারতীয় সমাজ

নেওয়া হয়েছে।"

অসিতবাবু তাচ্ছাল্যভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কদাচ নয়। ও ত্যাগ হচ্ছে কথার বুজরুকি। ও হচ্ছে কতিপয়ের ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবলভাবে চরিতার্থ করবার জন্য বাকী অসংখ্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি"—

অবিনাশ এদিক্ হইতে মাথা নাড়িল, "ঠিক।"

অসিত বলিয়া চলিল, "অন্ন, বস্ত্র, ধন, সম্পৎ থেকে অন্যকে যদি বঞ্চিত করা না যায় তা হলে নিজে ষোলআনা ভোগ করা যায়না এই বুদ্ধিটুকু তাদের মাথায় ছিল বলেই ত্যাগের মহিমা সাধারণের কাছে প্রচার কর্ত্তে তারা পঞ্চমুখ হয়েছিল। দেখুন দেখি, আপনার ভারতীয়দের জীবন-যাত্রা! তারা রাজত্ব করেছে, দিগ্বিজয় করেছে, বিবাহ করেছে পুরুষেরা বহুবিবাহ করেছে, অর্থ-কামকে জীবনের পুরুষার্থ বলে গ্রহণ করেছে,—ভোগের আর বাকী রেখেছে কি ? ত্যাগ ভারতীয় সমাজের আদর্শ ছিল, এ কথা শিখলেন কোত্থেকে ? পার্থিব সুখভোগ ব্যতীত সমাজজীবন বা ব্যক্তিজীবনের মূলে আর কোনও প্রেরণা নেই। আত্মা ও পরকালের, ধাপ্পাবাজিতে সমাজ ভোলে

ধর্ম্মের নামে পুরুষ নারীকে ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া নিজের জঘন্য স্বার্থপ্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করে; ধর্ম্মের নামে হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে কুকুরের মত ব্যবহার করে, মুসলমান হিন্দুর মাথা ফাটায়। এই তো ভারতবাসীর ধর্ম্মপ্রাণতা! সুশীলের ইচ্ছা হইতেছিল, হাজার কথা সুকুমারকে গরম গরম শুনাইয়া দেয়।

কিন্তু অসিতই সুশীলের মনোসাধ মিটাইল বলিল, "আপনার ধর্ম্মের যদি সে শক্তি থাকে তো ভালো কথা। আমরা স্বচ্ছন্দে পরীক্ষা কর্ত্তে রাজি। কিন্তু দেখুন সুকুমার বাবু, যদি গোঁড়ামি ছেড়ে দিয়ে প্রকৃত সত্যানুসন্ধান কর্ত্তে ইচ্ছুক হন, তবে আমি পরিষ্কার আপনাকে বল্‌তে পারি যে, ধর্ম্মের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নেই। ভগবান্ ও তার ধর্ম্মের জন্ম মানুষের মনের মধ্যে, মানুষের দুর্ব্বলতার প্রয়োজনে তার উৎপত্তি। ভীরু ও দুর্ব্বল মানুষ মনকে প্রবোধ দেবার জন্যে ভগবান ও ধর্ম্ম গড়ে তুলেছে, এবং বুদ্ধিমান চালিয়াৎ প্রবলেরা সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখছে। এই হর্চ্ছে ধর্ম্মের গোড়ার কথা। ধর্ম্ম মানুষজাতিকে আফিমখোরের মত নিস্তেজ করে রেখেছে, এবং যতই আপনারা ত্রিসন্ধ্যা হাতজোড় করে ভগবানের কাছে কাকুতিমিনতি কর্ত্তে থাকুন না কেন, ভগবান্ কখনও দুর্ব্বলের সহায় হচ্ছে না।"

অবিনাশ বলিয়া উঠিল, "থাক্‌লে তো সহায় হবে!"

অসিত বলিল, "সুতরাং আমরা আপনাদের মন থেকে ভূতের সংস্কারের মত এই ধর্ম্মের সংস্কারকে ঝেঁটিয়ে দেবো, দুনিয়া থেকে ভগবানের নাম লোপ করবো, এবং দেখাবো আপনাদের ভগবান যুগযুগান্তর ধরে মানুষকে যা দিতে পারেনি, বরঞ্চ বিধিনিষেধের দ্বারা বঞ্চিত ও প্রবঞ্চিত করেছে, ভগবান্‌কে তাড়িয়ে সেই সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ আমরা মানুষকে দেবো।"

ভগবানের প্রতি দারুণ আক্রোশে অসিতবাবুর কথাগুলি যতই উষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল, ভক্তি-প্রবণ সুকুমার ততই রাগে ফুলিতেছে। আধুনিকতানবীশ এই নরকগুলির মরণান্তে রৌরবেও স্থান হইবে কিনা এই আশঙ্কায় সে প্রায় দিশাহারা হইয়া পড়িল। যুক্তিতে আঁটিয়া উঠিতে পারে না; ইচ্ছা করে, অসিতের গলাটা ধরিয়া ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দেয়, কিন্তু তাহাও সাহসে বা শক্তিতে কুলায় না, অগত্যা নিজেই বাহির হইয়া যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে করিল। টক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "নাঃ চল্লাম। এ সব নীতিধর্ম্মহীন আলোচনা মুখে আনতে আপনাদের লজ্জা হয় না কেন, তাই ভাবি।"

সুকুমার দরজার বাহির হইতে না হইতে তিনজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অসিত নিতান্ত অবজ্ঞাভরে বলিল, "এই তো এখনও আমাদের শিক্ষিত সমাজ; ছ্যাঃ!"

(২)

অনেকদিন কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে, ও কম্‌রেড্‌ সেনের আওতায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহু সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া, নানাবিধ রুশপুস্তক পড়িয়া সুশীল এখন দলের একজন হইয়াছে। এখন প্রচার ও সংগঠন উপলক্ষে মাঝে মাঝে কলিকাতা ছাড়িয়া মফঃস্বলে, সহর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে, ও বাংলাদেশ ছাড়িয়া বাংলার বাহিরে যাতায়াত করিয়া থাকে। সম্প্রতি কি কারণে দেওঘর আসিয়াছে।

সেদিন বিকালবেলা শিবগঙ্গার পার দিয়া সুশীল সহরে ফিরিতেছিল; এমন সময় কাণে আসিল একটু সোরগোল। কে একজন আর্ত্তনাদ করিয়া চেঁচাইতেছে, আর তাহার কাছে একটা ঘোড়ার গাড়ী, দশবারোটি বিহারী ও বাঙ্গালী উহাকে কেন্দ্র করিয়া জটলা ও বচসা করিতেছে। মিনিট ছয়সাত পরেই জটলা লঘু হইয়া মিলাইয়া আসিল, গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল, সুশীল তখন দেখিতে পাইল, একটি কুষ্ঠরোগী রক্তাক্ত বাহু লইয়া পড়িয়া পড়িয়া গোঙাইতেছে। একখানা পা তাহার রোগে খসিয়া গিয়াছে, আর একখানাও রোগগ্রস্ত, হাতের সাহায্যে লাঠি লইয়া কোনমতে হেঁচড়াইয়া চলিত, অকস্মাৎ গাড়ীর চাকার গুঁতায় সে হাতখানা ভাঙ্গিয়া গিয়া হাতের লাঠি ছিট্‌কাইয়া নালার কাছে পড়িয়া রহিয়াছে। সুশীলের মুখ হইতে অস্ফুটে সমবেদনার বাণী বাহির হইয়া আসিল, "ইঃ!" আহত রোগীটির যন্ত্রণা দেখিয়া সুশীলের সত্যই কষ্টবোধ হইল, সমবেত লোকগুলি যে গাড়োয়ানকে বেকসুর রেহাই দিয়া নিতান্ত অবিচার দেখাইয়াছে, তাহাতেও তাহার সংশয়মাত্র নাই। কিন্তু রোগীটির এখন কি ব্যবস্থা করা যায় তাহা কিছু ঠাহর পাইল না। নিজে কুষ্ঠীর সন্নিধানে অগ্রসর হইয়া যে সাহায্য করিবে অতটা সাহসে কুলায় না। নিপীড়িত জনগণের প্রতি নিদারুণ সমবেদনা কাগজে কলমে ও বক্তৃতায় অহর্নিশ প্রচার করিলেও হৃদয়ের দরদ ততটা তীব্র হয় নাই। সুতরাং সুশীল কালবিলম্ব না করিয়া আবার পথ চলিতে সুরু করিবে, এমন সময় দেখিতে পাইল, শ্মশান হইতে কে একটি যুবক মড়া পোড়াইয়া ফিরিতেছিল, আহত কুষ্ঠীকে দেখিয়া সে হঠাৎ থামিয়া দাঁড়াইল।

বৈদ্যনাথজীর দোহাই দিয়া রোগী চীৎকার করিতেছিল, যুবকটি একটু ঝুঁকিয়া তাহাকে কি জিজ্ঞাসা করিল। চীৎকার দ্বিগুণিত করিয়া সে বিকৃতকণ্ঠে তাহার বক্তব্য সুরু করিল, কিন্তু সমাপন করিবার লক্ষণ দেখা গেল না। যুবকটি অধিক বিলম্ব না করিয়া চট করিয়া সঙ্গের শববাহী লোক কয়টার সাহায্যে খাটিয়া ঠিকঠাক করিয়া দুইহাতে কুষ্ঠীকে তুলিয়া তাহাতে শোয়াইয়া দিল। তারপরে খাটিয়ার একটা প্রান্ত নিজের কাঁধে তুলিয়া লইয়া রওনা হইল—বোধহয় হাসপাতাল কিংবা কুষ্ঠাশ্রমের অভিমুখে। সুশীল একটু আশ্চর্য্য হইল, একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, এবং মনে মনে যুবকটিকে তারিফও করিল বটে।

দিনকয়েক পরে সহরে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সুশীল শুনিল, নন্দনপাহাড়ের গোড়ায় কাল সন্ধ্যাবেলা দুইটি মহিলা বেড়াইয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় দুইতিনজন দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া গলায় হার, হাতের চুড়ি, ছিনাইয়া লইতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারে নাই,—ভাগ্যিস্ সুবিমলবাবু আসিয়া পড়িয়াছিলেন তাই রক্ষা! খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি ও কিঞ্চিৎ রক্তারক্তির পরে দুর্ব্বৃত্তগণ পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে। দেওঘরে এমন ব্যাপার বড় একটা ঘটেনা, সুতরাং বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল, এবং সুবিমলবাবুর প্রশংসা লোকের মুখে মুখে চলিল। কথাবার্ত্তায় সুশীল জানিল, সুবিমল বাবু এ অঞ্চলে পূর্ব্ব হইতেই সুপরিচিত, তাহার সাহস ও সাধুতার খ্যাতি নূতন নয়। খোঁজ লইয়া সে টের পাইল, সেদিনকার সেই কুষ্ঠরোগীর পরিচর্য্যায় যাহাকে দেখিয়াছে, সে-ই সুবিমলবাবু। আরও জানিল, সেদিন সে শ্মশান হইতে ফিরিতেছিল, তাহার পত্নীর শবদাহ করিয়া।

কেমন একটু কৌতূহল হইল, সুশীল ভাবিল, ইহার সঙ্গে আলাপকরা চাই। কুষ্ঠরোগীকে নির্ব্বিচারে যে কোলে তুলিয়া লইতে পারে, সে সামান্য দরদী নয়; প্রিয়তমাকে সদ্য শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়াও যাহার হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে না, হীনতম অবজ্ঞাতের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে তখনও উন্মুখ সে সামান্য বীর নয়; দুই তিনজন দুর্ব্বৃত্তের সঙ্গে একাকী নিরস্ত্র লড়িতে যে ভয় পায়না এবং হঠাইয়া দিতে পারে সে কম সাহসী নয়। সুতরাং এরূপ লোককে দলে টানিতে পারিলে মন্দ হয়না।

বাস! খোঁজ করিয়া সুশীল সকালবেলাই সুবিমলের কাছে গিয়া হাজির হইল। সুবিমল তখন বারান্দার পাশের ঘরে বসিয়া উপনিষদ পড়িতেছিল, অপরিচিত আগন্তুককে দেখিয়া জিজ্ঞাসু-ভাবে তাকাইল। সুশীল বলিল, "আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছি। ঘরে ঢুকবো?

সুবিমল বইখানা বন্ধ করিয়া হাসিমুখে বলিল, "আসুন।"

ভদ্রলোকের চারিদিক্কার সুখ্যাতি ও মুখশ্রীর সহাস্য প্রসন্নতা সুশীলকে আকৃষ্ট করিয়া তুলিতেছিল, কিন্তু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া টেবিলের উপরে উপনিষদখানা দেখিয়া মনটা দমিয়া গেল।—এঃ, একেবারে সেকেলে! সকালে উঠিয়া উপনিষদ পড়া, এ আবার কি?

সুবিমল জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই আপনার?"

"বিশেষ কিছু নয়। এমনি আলাপ কর্ত্তে এলাম! লোকমুখে আপনার কথা শুন্তে পাই অনেক তাই।"

সুবিমল শান্তমুখে একটু হাসিল। তারপর আস্তে আস্তে আলাপ সুরু হইল নানাবিধ। জানা গেল, সে এম্, এসসি পাশ করিয়া একটা স্কুল মাষ্টারী লইয়া এ অঞ্চলে আসিয়াছে; ছাত্র পড়ায় আর নিজে একটু পড়াশুনা করে, এই কাজ।

সুশীল প্রসঙ্গক্রমে প্রস্তাব করিল, "আপনার মত লোকের কি এতটুকু কাজে তৃপ্তি আসে? আপনার কাজের ক্ষেত্র আরও অনেক বড় হওয়া উচিত। দেশের কাজে নেমে পড়ুন না কেন?"

সুবিমল বলিল, "সাধ্যমত করি একটু আধটু।"

কি করে, জানিবার জন্য সুশীলের কৌতূহল হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা ভদ্রতাসঙ্গত বোধ হইল না। অতএব সে কথায় কথা ফাঁদিয়া নানাবিধ রাজনীতি সমাজনীতিমূলক প্রসঙ্গ তুলিল। সুশীল দেখিল, ভদ্রলোক রাশিয়াতত্ত্ব অবগত আছেন, মার্কসের পুস্তকাদি পড়িয়াছেন, স্পিনোজা হেগেলের দর্শন জানেন, এবং আরও দুই একটি বিষয়ের আভাস মাঝে মাঝে দিয়া ফেলিতেছেন যে সম্বন্ধে সুশীল নিজে বিশেষ কিছুই জানে না। সুশীলের শ্রদ্ধা বাড়িল; কিন্তু আশ্চর্য্য হইল। তাহার ধারণা ছিল, যাহারা উপনিষদাদি সেকেলে ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া কারবার করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্বের বই তাহাদের পড়াশুনা নিশ্চয়ই নাই। কেননা থাকিলে উপনিষদ্ ভক্ত হইতে পারে না। আরও একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়া সে আশ্চর্য্য হইল,—এই সমস্ত বিষয়ের তর্কবিতর্ক কম্‌রেড্ সেনের সহিত অনেককে সে করিতে দেখিয়াছে, কিন্তু কথায় ভাবে চাহনীতে কোথায় যেন উভয়ের কেমন একটা পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। কম্‌রেড্ সেনের পাণ্ডিত্যের কেমন একটা চাকচিক্য আছে, ভাবের দর্প ও কথার উগ্রতার মধ্যদিয়া তাহা সততই ফুটিয়া বাহির হইতে চায়। কিন্তু সুবিমলের মধ্যে আভাস পাওয়া যায় একটা গভীরতার, কোথাও দম্ভ কিংবা উষ্ণতা নাই।

সুশীল বলিল, "আপনি এত পড়াশুনো করেছেন, কাজ করবার এত শক্তি আপনার, আপনি কেন বৃহত্তরভাবে দেশব্যাপী একটা আন্দোলন গড়ে তুলবার চেষ্টা করুন না? দেশের যা অবস্থা এবং কর্ম্মীর যেরকম অভাব, তাতে আপনার কি এমনভাবে লুকিয়ে থাকা চলে?"

সুবিমল স্নিগ্ধচোখে তাহার দিকে তাকাইয়া বলিল, "সবকর্ম্ম কি সকল কর্ম্মীর সাজে?"

"কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যখন উৎপীড়ন, অত্যাচার, দুঃখ, দুর্দ্দশা চলছে, তখন নিজেকে নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকবার অধিকার কি কারুর আছে? আপনারও নেই।"

সুবিমল মাথা নাড়িয়া বলিল, "যথার্থ কথা। তাই আমার দায়িত্বটুকু বহন করবার চেষ্টা আমি যথাসাধ্য করছি।"

অনেকক্ষণ পরে সেদিনকার মত আলাপের পালা সাঙ্গ হইল। সুশীল অবশেষে বলিল, "চলি তবে। অনেকক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করে গেলাম। নমস্কার!"

সুবিমল হাসিয়া উত্তর করিল, "মানুষ কি মানুষকে দেখে বিরক্ত হয়?"

দুই তিনদিন পরে সুশীল সহরোপান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল; দেখে দূরে সুবিমলের মত কাহাকে ফিরিতে দেখা যায়—সঙ্গে সঙ্গে একদল সাঁওতাল ছেলেবুড়ো। খানিক দূর আসিয়া তাহারা ফিরিল, সুবিমল একা আগাইয়া আসিতেছে।

কাছাকাছি হইতে সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "ওদিকে কোত্থেকে?"

সুবিমল বলিল, "গ্রামান্তরে গিছলাম একটু। একটি সাঁওতাল পল্লী আছে, সেখানে।"

"সাঁওতাল পল্লী! সেখানে কি উদ্দেশ্যে?"

সুবিমল বলিল, "ওদের জন্যে কাজ করবার অনেক আছে।"

লোকটির প্রতি সুশীলের কৌতূহল বাড়িল। ইহার মধ্যে কথার বা কাজের আড়ম্বর কিছুই নাই, অথচ এই কয়দিন সে পদে পদে টের পাইতেছে, ইহার কাজের পরিধি নিতান্ত কম নহে। তবে নিজেকে দশজনের কাছে জাহির করিবার আগ্রহ নাই, অন্যান্য কর্ম্মীদের সঙ্গে এইমাত্র তফাৎ। সুশীলের ইহাকে ক্রমশঃ ভালো লাগিতেছে।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে চলিল। "সুশীল বলিল, আজ বিকেলে আপনার ওখানে একবার যাব।"

সুবিমল একটু থামিয়া বলিল "আজ থাক্। আজ বিবেকানন্দের জন্মোৎসব কিনা, বিদ্যাপীঠে থেকে একটা শোভাযাত্রা বেরুবে। আজ আমাকে বাড়ীতে পাবেন না। কাল যাবেন, কেমন ?"

সুশীলের মনটা আবার দমিয়া আসিল। লোকটি সবদিকে এত সুন্দর, তবু এমন ধর্ম্মঘেঁসা কেন ? যাহারা শিক্ষিত ও সম্যক্ পড়াশুনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন কুসংস্কার কেন থাকিবে ? অন্য কেহ হইলে সুশীল এখনই তুমুল তর্ক জুড়িয়া দিত, লেনিন প্রভৃতি লিখিত পুস্তকের যুক্তি আওড়াইত, কিন্তু সুবিমলের সঙ্গে সেরূপ প্রবৃত্তি হইল না, কারণ সুবিমল ওসব গ্রন্থ পড়িয়াছে, তাহা সে জানে। দ্বিতীয়তঃ, সুবিমলের সান্নিধ্যে কেমন একটি সম্ভ্রমের ভাব মনের মধ্যে আপনা-আপনি জাগিয়া উঠে।

সুতরাং সুশীল শুধু বলিল, "আপনি খুব ধার্ম্মিক মানুষ, না ?"

সুবিমল হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিক জানিনে।"

"আপনি রোজ মন্দিরে যান বোধহয় ?"

"মন্দিরে কি কর্ত্তে যাবো ?"

কথাটা সুশীলের আশ্চর্য্য ঠেকিল। সে বলিল, "তবে বিবেকানন্দোৎসবের দিকে আপনার এত টান কেন ?"

"বিদ্যাপীঠের ওঁরা উৎসব উপলক্ষে একটা আয়োজন করছেন, লোকজনের সাহায্য দরকার। সেইজন্যে যাচ্ছি।"

"যে কোনও অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে কেউ আপনাকে ডাকবে, অমনি তাতে যাবেন ?"

সুবিমল একটু হাসিয়া বলিল, "তা নয়, তবে বিবেকানন্দের জন্মদিনের উৎসবে যোগ দেওয়াটা আমি অন্যায় মনে করিনে। কারণ, বিবেকানন্দ লোক খারাপ ছিলেন না।"

সুশীল অগত্যা পরিষ্কার প্রশ্ন করিল, "আমি জানি আপনি ধর্ম্ম মানেন। কিন্তু কেন মানেন বলুন তো ?"

সুবিমল হাসিল, "ধর্ম্ম কাকে বলে তা কিন্তু পরিষ্কার বলেন নি। সুতরাং বুঝতে পারছি না, মানি কিনা।"

সুশীল বলিল, "অর্থাৎ আপনি ভগবান্ মানেন কিনা ? না, বিশ্বাস করেন যে, এই মেটিরিয়াল জগৎই প্রথম ও শেষ কথা, এর বাইরে বা ভেতরে স্পিরিচুয়াল অস্তিত্ব বলে একটা কিছু নেই ?"

সুবিমল শান্তভাবে বলিল, "ভগবান্‌কে চোখে দেখবার সুযোগ হয়নি, সুতরাং জানি না। তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রথম ও শেষ কথা যে মেটিরিয়াল্ অস্তিত্ব নয়, একথা মানি।"

'নয়' কথাটার উপরে সুবিমল একটু জোর দিল। সুশীল তর্কের মুখে বলিল, "মেটিরিয়াল অস্তিত্ব ছাড়া আর কোনও অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি। সুতরাং পার্থিব জগতের উন্নতি ব্যতীত আত্মার উন্নতি নামক কোনও ভোজবাজিমূলক কাজকে অকাজ মনে করি।"

"আচ্ছা।"

সুশীল হঠাৎ অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। তাহার সজোরে মেটিরিয়ালিজম ঘোষণার উত্তরে প্রতিপক্ষ হইতে যে এমন সহজ স্নিগ্ধস্বরে ঐটুকুমাত্র কথা বাহির হইতে পারে, ইহা সুশীলের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। সে বরাবর জানিয়া আসিয়াছে, ধার্ম্মিক লোকেরা অতিশয় গোঁড়া, ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ দেখিলে তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠে—যেমন সেদিন সুকুমারকেও দেখিয়াছে। কিন্তু ইনি কেমনতর ? বহু কর্ম্মীর সহিত তাহার পরিচয় আছে, কমরেড্ সেনকেও বহু বাক্‌বিতণ্ডা করিতে দেখিয়াছে। কিন্তু স্বমতের প্রতিবাদকে কেহ তো এমন নির্ব্বিকার স্বচ্ছন্দতার সহিত গ্রহণ করে না! যেখানে সুবিমলবাবুর কাছে নিজের মতটি অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবে বলিয়া সুশীল আশান্বিত হইতেছিল, সেখানে হঠাৎ তাহার মনটা যেন এতটুকু হইয়া গেল। সুবিমলের সমতায় নিজের চোখে নিজের কেমন একটা দৈন্য ধরা পড়িল।

তথাপি সাম্‌লাইয়া লইয়া তর্কের জের টানিয়া সে বলিল, "ওরকম করে এড়িয়ে গেলে চলবেনা। আপনার মতবাদকে প্রমাণ করুন।"

সুবিমল একটু হাসিয়া বলিল, "একটা কথা বলি, রাগ করবেন না। সব সিদ্ধান্ত সকলের কাছে প্রমাণ করা যায় না, অন্ততঃ আমার সে সাধ্য নেই। ফোর্থ ক্লাসের ছাত্রের কাছে ভূমণ্ডলের আবর্ত্তনের ম্যাথেমেটিক্যাল্ ও ফিজিক্যাল্ তত্ত্ব প্রমাণ করতে পারবেন ?"

সুশীল একটু অপমান বোধ করিয়া কিছু একটা জবাব দিবার ইচ্ছা করিল। কিন্তু সহসা উপযুক্ত সদুত্তর খুঁজিয়া পাইল না। সুবিমল পুনশ্চ বলিল, "আপনি দেখে থাকবেন, এমন বিস্তর লোক আছে, যারা কম্যুনিজমের নাম শুনলেই ক্ষেপে ওঠে। তার কারণ, তারা সংস্কার কাটিয়ে ভালো করে ও-তত্ত্বকে জানবার চেষ্টা করেনি। এক্ষেত্রেও তেমনি হচ্ছে। ধর্ম্মের মূলতত্ত্বের সঙ্গে যারা পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি, তারাই গোঁড়ামির সঙ্গে আজ এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছে।" একটু থামিয়া, "কিন্তু এর জন্যে রাগারাগি করবার কিছু নেই, কেমন ?"

সুশীল একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "জগৎ জুড়ে ধর্ম্মের ও ধার্ম্মিকের দ্বারা যে অত্যাচার, প্রবঞ্চনা, অকল্যাণ সংঘটিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলে আর কার বিরুদ্ধে কর্ত্তে হবে বলুন ?"

সুবিমল শান্ত হাসিয়া বলিল, "ওগুলোকে তো ধর্ম্ম বলে না!"

আমবাগানের পথ শেষ হইয়া তাহারা প্রায় বিদ্যাপিঠের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। সুবিমল হাসিমুখে নমস্কার জানাইয়া বলিল, "এখন আসি তবে।"

নন্দনপাহাড়ের চূড়ায় অস্তসূর্য্যের সোণালী আলো অপরূপ রং ধরাইয়া দিয়াছে; সেইখানে সুশীল চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

কলিকাতায় আসিয়া অসিত সেনের সন্ধান পাইয়া সে মনে করিয়াছিল, এই আদর্শ পুরুষ। কিন্তু পাশাপাশি আসিয়া আজ দাঁড়াইয়াছে আর একটি—সুবিমল। অসিত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সন্দেহ নাই, কিন্তু সুবিমলের সমগ্র জীবনটিই যেন অসাধারণ। দুইয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য পার্থক্য। কমরেড্ সেনের প্রতিভার মধ্যে তীক্ষ্নতা আছে, কিন্তু তাহা যেন একপেশে, তাহা শুধু মস্তিষ্কের মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়াই কারবার চালাইতে পারে। কিন্তু সুবিমলের প্রতিভার মধ্যে আছে গভীরতা, ইহা শুধু কথা কাটাকাটি করিয়া জয়লাভ করেনা—সমস্ত জীবনখানির পরতে পরতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অসিত বক্তৃতার জালে মানুষকে হার মানাইতে পারে, কিন্তু সুবিমল বাগাড়ম্বরের ধার দিয়াও যায় না, অথচ অলক্ষ্য প্রভাবে মানুষকে জয় করিয়া লইতে থাকে। এ কেমন মানুষ? আড়ম্বর নাই, অথচ কোথাও দৈন্য নাই, তিলমাত্র অসঙ্গতি নাই। সমস্ত দেহে ও মনে শক্তি যেন কানায় কানায় ভরা, অথচ সকল সময় সমস্ত কাজের মধ্যে অসীম প্রশান্তি। সুশীল ভাবিল, এ কেমন করিয়া হয়? সুবিমল ধর্ম্ম মানে, অথচ এত শক্তির আধার সে কেমন করিয়া হইল? লেনিন তো বলিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্ম মানবজীবনে অহিফেনের মত!

সুশীল একবার গা ঝাড়া দিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিল। হঠাৎ চোখে পড়িল, কিছু উত্তরে দূরে এখনও বিরাট পাথরের উপরে সুবিমল একাকী বসিয়া আছে। হাওয়ায় তাহার গায়ের মোটা চাদরখানি পত্‌পত্ করিতেছে, আর সে নিবদ্ধদৃষ্টি চাহিয়া আছে দূরে শালবনছাওয়া গ্রামগুলির মাথার উপরে রঙীন আকাশের পানে। চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু চোখের সমস্ত দৃষ্টি যেন কেমন অন্তর্ম্মুখী হইয়া রহিয়াছে। কি ভাবিতেছে কে জানে? মনে হয়, যেন সমস্ত জগৎ স্তব্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য দূরে সরিয়া আছে, চোখের মধ্যেও আপনার ছায়া ফেলিতে সাহস নাই। সুবিমল সুন্দর নয়, কিন্তু সুশীলের মনে হইল এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য আর কোনও মুখে সে আজ পর্য্যন্ত দেখে নাই। নিশ্চল গাম্ভীর্য্যের মধ্যে অপার্থিব শান্তির ছায়ায় একটী প্রসন্ন শুচি হাস্যচ্ছটা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

সুশীলের মুহূর্ত্তে ইচ্ছা হইল, সুবিমলের কাছে গিয়া বসে। কিন্তু মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল, যে অলৌকিক ধ্যানলোক তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি তাহার নাই; যে অটুট মৌন ও প্রশান্তি সুবিমলকে আলিঙ্গন করিয়া আছে, তাহা ভাঙ্গাইবার অধিকার তাঁহার নাই।

সুতরাং গেল না, বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া আবার ভাবিতে লাগিল, ইহা আসে কোথা হইতে? অসিত সেনের পাণ্ডিত্য আছে, সুবিমলেরও আছে; অসিতের কর্ম্মশক্তি অসাধারণ, সুবিমলেরও অফুরন্ত। কিন্তু সুবিমলের মধ্যে আরও এমন একটি জিনিষ আছে, যাহা অসিতের মধ্যে দেখে নাই।—এ অনাবিল প্রশান্তি এ অপরাজেয় শক্তি, এ মহিমা মানুষ কিসে পায়?

একি—ধর্ম্ম?—

যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন

স্থরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

সমস্ত পৃথিবীব্যাপী আর একটা মহাযুদ্ধ আসন্ন, এ কথাটা আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। ১৯১৪-১৮ সালের ধ্বংসকর যুদ্ধের চেয়েও এ যুদ্ধ আরো অনেক বেশী রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাদায়ক হবে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মারণাস্ত্র আরও বেশী শক্তিশালী হওয়াতে ব্যাপকতা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় এ যুদ্ধ আরও সহস্রগুণে প্রলয়ঙ্কর হবে তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বহু যত্ন ও স্বার্থত্যাগে যুগ যুগ ধরে মানুষ যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে, গত মহাযুদ্ধের সর্ব্বনাশী প্রভাবের কবল থেকে তার যতটুকুও বা রক্ষা পেয়েছে, এ যুদ্ধ বাধলে তাও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই আজ সমস্ত পৃথিবীর প্রগতিকামী শক্তি,—শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র ও যুবশক্তি পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যতন্ত্র ও তার অপকৃষ্টতম রূপ ফ্যাসিষ্টবাদের যুদ্ধলালসার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। গত পয়লা আগষ্ট যুদ্ধবিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কোটী কোটী প্রগতিপন্থী নরনারী সাম্রাজ্যতন্ত্রী ও ফ্যাসিষ্টদের উৎকট লোভের উলঙ্গ জঙ্গীবাদী আক্রমণের প্রতিরোধ করবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছে। কয়েকজন মুষ্টিমেয় ধনিকদের স্বার্থসিদ্ধি করবার জন্য অগণিত নিরপরাধ দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার স্থযোগ আর সচেতন জনসাধারণ দিতে কিছুতেই রাজী নয়। 'গণতন্ত্রের নিরাপত্তা'র মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হওয়ার শাস্তি সমস্ত পৃথিবীর লোক বেশ ভাল করেই পেয়েছে। গত মহাযুদ্ধে তাদের রক্তদানের ফল তারা আজ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে; কাজেই আর একটা বিরাট মহাযুদ্ধের কামানের খোরাক হয়ে কয়েকজন যুদ্ধবিলাসী পুঁজিপতির যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ব্যবসায়ের মুনাফার হার ও ব্যাঙ্কে-জমা টাকার অঙ্ক বাড়াবার মূর্খতা তারা এবারে কিছুতেই করবে না।

গত মহাযুদ্ধের শিক্ষা এই যে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও প্রগতিকামী ছাত্র ও যুবকেরা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরোধিতা করলে যুদ্ধ থামাতে পারে, আর নিজেদের প্রকৃত স্বার্থ সম্বন্ধে অচেতন হয়ে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের স্বার্থের জন্য যুদ্ধকে সমর্থন করলে যুদ্ধ তো থামেই না, বরং পরিণামে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থবিরোধী সংস্কৃতিবিধ্বংসী ফ্যাসিজমের সর্ব্বনাশক উদ্ভবের পথ পরিস্কার হয়। রাশিয়া, ইতালী, ও জার্ম্মেণীর গত যুদ্ধের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী ইতিহাস এই সত্যের প্রমাণ। যুদ্ধের সময় গণ-আন্দোলন সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিল বলেই, একদিকে যেমন লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার পত্তন সম্ভব হয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি এই সাম্যবাদের প্রভাব অন্যান্য বহুদেশে বিস্তৃত হতে দেখে পরস্পরের অপরিমেয় লোভের দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ

গত মহাসমরের তাণ্ডবলীলা সংবরণ করতে সাম্রাজ্যবাদীরা বাধ্য হয়েছিল। আবার অন্যদিকে তেমনি ইতালী ও জার্ম্মেণীর গণ-আন্দোলন ঠিক পথে পরিচালিত না হওয়াতে স্বার্থপর ও লোভী নেতাদের কবল থেকে মুক্ত হতে পারলো না ; সাম্রাজ্যতন্ত্রের সঙ্কটকালে এই সব নেতাদের বৈক্লব্যে সমাজ-বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল ও তার ফলে প্রথমে মুসোলিনী ও পরে হিটলারের গণতন্ত্র—ও সংস্কৃতিবিধ্বংসী ডিক্টেটারী প্রতিষ্ঠিত হল ; অবশ্য এই ডিক্টেটারীর পিছনে রয়েছে পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীর দল,—তাদের স্বার্থের দিকে সতর্ক লক্ষ্য রেখেই ডিক্টেটারী পরিচালিত হচ্ছে ; আর পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী ফল বেকার সমস্যার সুযোগে শ্রেণী-স্বার্থ-সম্বন্ধে অচেতন একদল ভাড়াটে নিম্নমধ্যবিত্ত ও শ্রমিকের সাহায্যে প্রকৃত যুদ্ধবিরোধী গণআন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিপুল বেকার সমস্যার কোন সমাধান ফ্যাসিষ্টবাদের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়, এ জঙ্গিবাদী ডিক্টেটারেরা তা বেশ ভালো ভাবেই জানে। কাজেই একদিকে তারা যেমন সহর থেকে লোকদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে পল্লী উন্নয়নের ভাঁওতা দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে তেমদি যুদ্ধবিগ্রহের রসদ তৈরী করবার কারখানার কাজ বাড়িয়ে দিয়ে শ্রমিকদের অশান্তি দূর করবার চেষ্টা করছে। এতে এই সব কারখানার মালিকদের লাভের অঙ্ক বেড়েই চলেছে। কিন্তু এতো করেও যখন বেকার সমস্যার সমাধান করে উঠতে পারছে না, তখন আর্য্যসভ্যতা ও প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের গৌরবগাথা কীর্ত্তন করে দেশের বেকার যুবকদের যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে গত মহাযুদ্ধের সময়ে ইতালী ও জার্ম্মেণীর গণআন্দোলনের নেতাদের যে মারাত্মক ভুলের জন্য সমাজবিপ্লব ব্যাহত হয়েছিল, তার পরোক্ষ ফলস্বরূপ আবার আর একটা বিরাট যুদ্ধের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হতে চলেছে।

এই সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিষ্ট শোষকের দল ঠিক করে রেখেছে যে বেকার সমস্যার চাপে সমাজবিপ্লবের হাত থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় ভাড়াটে লেখক ও গুণ্ডাশ্রেণীর নেতার সাহায্যে তাদের নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখবার উপায়স্বরূপে ঘটনাচক্রে গণআন্দোলনের বিরোধীশক্তিতে পরিণত এই সব বেকার যুবককে যুদ্ধ করতে পাঠানো। যুদ্ধে জিতলে কাঁচামাল, উপনিবেশ ও ব্যবসার অবাধ ক্ষেত্র হাতে আসবে ও তার ফলে সে দেশের অধিবাসীদের শোষণ করে ও যুদ্ধে মারা যাবার পরেও যারা বাকী থাকবে তাদের সেখানে পাঠিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে, এই আশা নিয়ে জঙ্গিবাদী ফ্যাসিষ্টের দল যুদ্ধোদ্যম পূর্ণমাত্রায় করে চলেছে। যুদ্ধে হারলে বা বেশীদিন ধরে যুদ্ধ চললে দুটো পরিণতি হওয়া সম্ভব ; হয় সে দেশে সমাজবিপ্লব হবে যার ফলে ফ্যাসিজমের উচ্ছেদ হবে, আর না হয়তো এত বেশী লোক যুদ্ধে মারা যাবে যে যারা বাকী থাকবে তাদের একটা ব্যবস্থা পুঁজিবাদের কাঠামো বজায় রেখেই করা সম্ভব হবে। এই দুটো সম্ভাবনার মধ্যে প্রথমটার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা নানা রকম কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে লোকদের সর্ব্বদা উত্তেজিত করছে, যাতে করে একবার যুদ্ধ বাধাতে পারলে দেশের যথাসম্ভব বেশী লোককে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে হত্যা করা যায় তার চূড়ান্ত চেষ্টা করছে।

একদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার আন্তর্জ্জাতিক সাম্যবাদের ভিত্তিতে পরিকল্পিত বৈপ্লবিক কর্ম্মপদ্ধতির ফলে জনসাধারণের অকল্পনীয় অগ্রগতি ও বেকার সমস্যার অস্তিত্ব বিলোপ আর অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে বিপ্লববিরোধী অপকর্ম্মের ফলে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্গতি ও বেকার সমস্যার ভয়াবহরূপ, একদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার শান্তি ও সংস্কৃতির জন্য আন্তর্জ্জাতিক আন্দোলনের প্রসার, অন্যদিকে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধোদ্যম ও সংস্কৃতি ধ্বংসের পৈশাচিক লীলা—এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয়ঃ ? লোভ ও লালসায় অল্প পুঁজিপতির দল ও তাদের ভাড়াটে প্রচারক ও গুণ্ডা ছাড়া আর কাউকে এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করতে হবে না। গণতন্ত্রের মুখোস পরা বিলাতী শোষকের দল মুখে নিরপেক্ষতা দেখালেও কার্য্যতঃ সব সময়েই সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে ফ্যাসিষ্টদের সমর্থন করে চলেছে। এতকাল পৃথিবীব্যাপী শোষণ চালিয়ে এঁরা এখন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের পালায় অভিনয় করতে আন্তর্জ্জাতিক আসরে নেমেছেন ; এই হাস্যকর ও সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বনাশকর কাণ্ড দেখলে আমাদের দেশের একটা পুরোনো প্রবাদবাক্যের কথা মনে হয়, "বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী" !

আজ পৃথিবীতে দুটী পরস্পরবিরোধী শক্তি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে,—একটী হচ্ছে সর্ব্বদেশে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির প্রসারকামী আন্তর্জ্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদ, আর অন্যটী হচ্ছে অন্যদেশের স্বাধীনতা হরণেচ্ছু, গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি বিধ্বংসী সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদ। সাম্রাজ্যবাদীদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকলেও তারা এখন সাম্যবাদ ও সাম্যবাদের প্রধান আশ্রয়স্থল সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে ; যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে পরস্পরের বিরোধ ভুলে 'গণতান্ত্রিক' ব্রিটীশ সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিষ্ট ইতালী, নাৎসী জার্ম্মেণী ও জঙ্গীবাদী জাপান সবাই মিলে কেউ প্রত্যক্ষ আক্রমণ চালিয়ে, কেউবা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে সোভিয়েট ইউনিয়নকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করবে। আবিসিনিয়ার ভাগ্যবিপর্য্যয়, স্পেনের গণতন্ত্র ধ্বংসের অপচেষ্টা, মহাচীনে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের তাণ্ডব, অষ্ট্রিয়ার শোচনীয় পরিণতি, পোলাণ্ড ও হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিষ্টদের প্রভাব বিস্তার, আর এই সব কুচক্রের পেছনে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অদৃশ্য হস্তের ক্রিয়া,—এ সমস্তের মধ্য দিয়ে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে নিষ্পিষ্ট করবার চেষ্টা চলেছে ; আর সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্য ও গোপন "অ্যাণ্টি-কোমিণ্টার্ণ প্যাক্ট" করে সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাবার উদ্দেশ্যে দল পাকাচ্ছে। সুতরাং আজকে স্বাধীনতা ও শান্তিকামী যুদ্ধবিরোধী জনসাধারণকে খুব সতর্ক বিশ্লেষণ করে কর্ম্মপন্থা নির্ণয় করতে হবে। যুদ্ধবিরোধ আন্দোলন নিছক নিশ্চিন্ত শান্তিপ্রিয়তা নয়, এ কথাটা ভাল করে বুঝবার সময় এসেছে ; সাম্রাজ্যতন্ত্রের ধ্বংস ছাড়া পৃথিবীতে সত্যিকারের শান্তি আসতে পারে না। কাজেই যুদ্ধবিরোধ আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের জন্য ব্যাপক গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে বুঝতে হবে। আমাদের জাতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী ; যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের গণআন্দোলনকে যেভাবে ব্যাহত করবার চেষ্টা করছে, কংগ্রেসের একশ্রেণীর

নেতা সেটা দেখেও না দেখবার ভান করাতে সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কা তো আছেই, সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধের প্রস্তাবও কার্য্যতঃ বাতিল হয়ে যাবার অশুভ সম্ভাবনা রয়েছে। আর সব চাইতে সর্ব্বনাশের কথা এই যে এর ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পরাহত হবার এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়বার পথ এতে পরিষ্কার হচ্ছে। সুতরাং যাঁরা যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন চালাবেন তাঁদের গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তন অসম্ভব করে তুলতে হবে ও গণশক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্যতন্ত্র ধ্বংস করতেই হবে। হয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ, না হয়তো সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করা, এ ছাড়া কোন তৃতীয় পথ নাই এবং থাকতে পারে না। যাঁরা আশা করেন যে কোন ঐন্দ্রজালিক তাঁদের জন্য এই তৃতীয় রাস্তাটী বের করে দেখিয়ে দেবেন, তাঁরা জেগে স্বপ্ন দেখছেন। হয় তাঁরা সত্যিই বিচারমূঢ় হয়ে পড়েছেন, আর না হয়তো জেনে শুনে স্বপ্ন দেখবার ভান করে ভারতীয় ধনিকদের বিলাতী ধনিকদের সঙ্গে একটা আপোষ রফা করবার সুযোগ দিয়ে গণশক্তিকে খর্ব্ব করবার ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিবৃদ্ধি করবার চেষ্টায় আছেন। আমরা অবশ্য এখনো আশা করি যে তাঁরা সত্যিই বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং বাস্তব বিশ্লেষণের সাহায্যে অচিরেই পথের সন্ধান পাবেন। শুভস্য শীঘ্রম্।



রানসিম্যানের মধ্যস্থতা

গোপাল হালদার

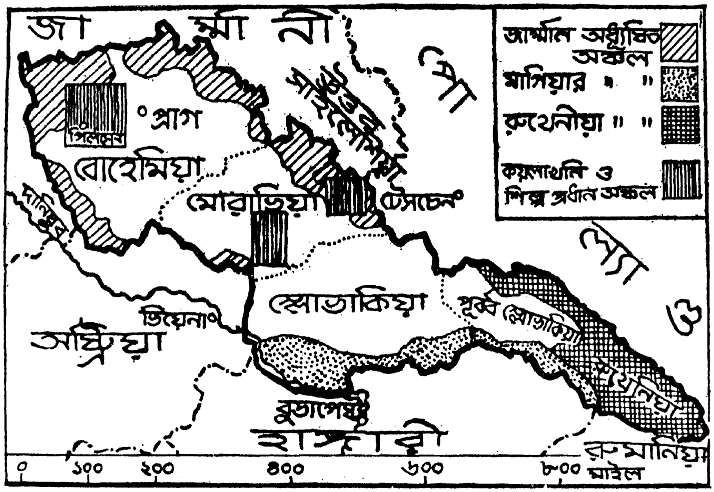
কথাটা বিস্‌মার্কের—'বোহিমিয়া যার ইয়ুরোপও তার।' তখনো চেকোশ্লোভাকিয়া নামে কোনো রাষ্ট্র জন্মে নাই, কিন্তু এই 'ঐতিহাসিক প্রদেশের' উপর যে অন্তত মধ্য ও পূর্ব ইয়ুরোপের ইতিহাস অনেকাংশে নির্ভর করে তাহা বিস্‌মার্ক কেন, তাহারও দুই-এক শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রচালকগণ জানিতেন। বিস্‌মার্ক শুধু সেই জানা কথাটিকেই ভাষায় প্রকাশ করেন। আজ বিশ বৎসরের প্রায়-সাবালক চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের চেক-জাতি প্রতিমুহূর্ত্তে বিস্‌মার্কের কথাটির এই অর্থ মনেপ্রাণে বুঝিতেছে, আর প্রতিনিমিষে যুঝিতেছে বিস্‌মার্কের বংশধরগণের সঙ্গে নিজের অস্তিত্ব, নিজের জীবন, নিজের তিন-তিন শতাব্দীর পরে আয়ত্ত এই বিশ বৎসরের মুক্ত, স্বপ্রতিষ্ঠ জাতীয় সত্তাকে জীয়াইয়া রাখিবার প্রয়াসে। কিন্তু 'বোহিমিয়া যার ইয়ুরোপ তার'—আর চেক্ জাতির কি সাধ্য আছে এই বোহিমিয়া চেক্ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখে, অর্থাৎ ইয়ুরোপের উপরে আপনার অত খানি ছায়া বিস্তার করে?

সেই কথাটিরই মীমাংসা সুরু হইয়াছে জার্ম্মানিতে হিটলারের অভ্যুদয়ের সূচনা হইতে। দিনে দিনে প্রশ্নটি তীব্র হইয়া উঠিয়া আজ একটি অনিবার্য্য সঙ্কটের মুখে আসিয়া পৌঁছিতেছে—একটা উত্তর তার পৃথিবীর নিকটে এবার প্রকাশিত হইয়া পড়িবেই। ব্রিটিশ মন্ত্রী লর্ড রান্‌সিম্যান্ প্রাগে গিয়াছেন—চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বোহিমিয়া মোরাভিয়া-বাসী জার্ম্মান প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতার চেষ্টা করিবেন। অন্য দিকে জার্ম্মান বাহিনীর বিপুল কুচকাওয়াজ চলিয়াছে। কুচকাওয়াজ জিনিষটি বার্ষিক,—কিন্তু তাহার আয়োজনে এবার যুদ্ধোদ্যোগের লক্ষণ বড়ই প্রকট, আর পূর্ব্ব সীমান্তে ব্যাভেরিয়া ও স্যাক্সনিতে তাহার গুরুত্ব সীমান্তের জার্ম্মানরাই ভুলিতে চাহে না, চেকেরা নিশ্চিন্ত হইবে কোন্ ভরসায়? অতএব, বিশ্বাস করিতে হয়, প্রশ্নের একটা উত্তর এবার সন্নিকট, সে উত্তর রান্‌সিম্যানের মধ্যস্থতায়ই হউক আর অস্ত্রের মধ্যস্থতায়ই হউক। দুইটিই চেকদের পক্ষে সমান বিপজ্জনক—কারণ দুয়েরই ফল সম্ভবত এক।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ফাটল

ইহার কারণ এই যে, চেকোশ্লোভোকিয়ার গঠনের মধ্যেই ভাঙ্গনের বীজ লুকাইয়া ছিল, তখনকার দিনে ম্যাসেরিক বেনেশ প্রমুখ মহামনস্বীরা তাহা হয়ত বুঝিতে চাহেন নাই, কিন্তু আজ তাহা সকলের নিকট সুস্পষ্ট। একটি কথাতেই ইহা বুঝা যায়—এ রাজ্যের ১৫,১৮৬,৯৪৪ অধিবাসীর মধ্যে চেকোশ্লোভাকরা সংখ্যায় ৯,৬৮৮,৭৭০ অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৬৩ জন, জার্ম্মানরা সংখ্যায় ৩,২৩১,৭১৮ অর্থাৎ শতকরা ২২'৩২ জন,—ইহারাই সুদেতেন জার্ম্মান। ইহা ছাড়া হাঙ্গেরিয়ানরা

বা ম্যাজেয়াররা আছে ৬,৯২,১২১, অর্থাৎ শতকরা ৪'৭৮ জন। তদুপরি পোল, রুমেনীয় প্রভৃতি আরও কয়েকটি জাতিও আছে। অবস্থাটা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে এই সব নানা জাতির ভৌগলিক বিন্যাসে। বোহিমরিয়া ও মোরিভিয়াতে জার্ম্মান বেশী ; এই অঞ্চলই সুদেতেন ডয়েট্‌শ নামে পরিচিত, জার্ম্মানির সংলগ্ন। এই প্রদেশেরও কিন্তু সবাই জার্ম্মান নয়—৩ লক্ষ ৮০ হাজার আছে চেক। আবার এই প্রদেশদ্বয়ের বাহিরে এই রাষ্ট্রেরই অন্য দুই প্রদেশে, সাইলেসিয়ায় ও শ্লোভাকিয়ায় ৭ লক্ষ ৩০ হাজার জার্ম্মানের বাস। অতএব, শুধুমাত্র জার্ম্মান জাতিকে একত্রিত করিয়া লইবার



উপায় নাই—একই অঞ্চলে চেক, শ্লোভাক প্রভৃতি জাতিও যে জার্ম্মানদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। এই কারণেই চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনায়কদের পক্ষেও সমস্যাটা জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। অঞ্চল বিশেষকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দিলেও সংখ্যাল্পের সমস্যা মিটে না—সুদেতেন ডয়েটশে থাকে চেক-সংখ্যাল্পরা, আর শ্লোভাকিয়ায় সংখ্যাল্প জার্ম্মানরা।

এই বিভিন্ন জাতিকে লইয়াই তবু যে 'চেক জাতীয় রাষ্ট্র' গঠিত হয় তাহার শ্রীসমৃদ্ধি হইল প্রচুর। ভূতপূর্ব্ব অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের শতকরা ৮৫ ভাগ কয়লা ও লিগ্‌নাইট্, ৬০ ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প, ৭৫ ভাগ বয়নশিল্প, ৯৩ ভাগ চিনির কারখানা, দুই তৃতীয়াংশ লৌহ ও ইস্পাত, এখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিকারে। তাহা ছাড়া দেশের কৃষিসমৃদ্ধিও প্রচুর। আবার এই সব শিল্পকারখানার প্রধান কেন্দ্রই হইল সুদেতেন জার্ম্মান-অধ্যুষিত বোহিমিয়া। অতএব, বোহিমিয়া যাহার হাতে তাহার সৌভাগ্য সুনিশ্চয়। বিশেষ করিয়া জার্ম্মান জাতের পক্ষে এই চিন্তাই স্বাভাবিক। একে সুদেতেন জার্ম্মানদের সঙ্গে তাহাদের রক্তের সম্পর্ক, অথচ ওখানকার শাসনে সেই জার্ম্মানদের হাত অল্প ; তাহার উপর ওখানে স্কোডার বিপুল অস্ত্রকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। চেক্‌রা যুদ্ধোপকরণে বলিষ্ঠ ; আর নিজ জার্ম্মানির ড্রেসডেন, ব্রেসলাউ, লাইপ্‌জিগ্, মিউনিখ্ প্রভৃতি জনাকীর্ণ শহর চেক-

সীমান্তের এত নিকট যে, যে-কোনো সময়েই চেক্ যুদ্ধ-বিমান ঐসব শহরের উপর হানা দিতে পারে। চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্বটাই তাই জার্ম্মান জাতের পক্ষে একটা বাধা, একটা দুর্ভাবনা।

এই কথাটি পরিষ্কার হইয়া উঠিল হের হিট্‌লারের আবির্ভাবে। সমস্ত জার্ম্মান জাতিকে তিনি এক জার্ম্মান রাষ্ট্রে একত্রিত করিবার সাধনা লইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন—আর সেই সুবৃহৎ তৃতীয় রাইখ্ বা তৃতীয় সাম্রাজ্যকে পূর্ব্বে বোহিমিয়া শ্লোভাকিয়ার উপর দিয়া, রুশিয়ার উক্রেইন জর্জ্জিয়া এবং রুমেনিয়ার তেলের খনিগুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়া না দিলে,—মধ্য-ইয়ুরোপে ও দানিয়ুব নদীর তীরে জার্ম্মান প্রতিপত্তি স্থির প্রতিষ্ঠা না করিলে,—এই বিধাতা-প্রেরিত জার্ম্মান পুরুষের আত্মার শান্তি নাই। তাঁহার এই লক্ষ্য সিদ্ধ করিতে হইলে সুদেতেন জার্ম্মানদের চেকরাষ্ট্র হইতে ছিনাইয়া আনা দরকার, চেকরাষ্ট্রকে পদদলিত করিয়া তাহার উপর দিয়া "পূর্ব্বাভিযানের" (Drang nach Osten) পথ করিতে হইবে। দুই উপায়ে তাহা সম্ভব—একদিকে চেক রাষ্ট্রের জার্ম্মানদের সহায়ে চেক দেশে গৃহমধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা, সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরি পোল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া চেকদের অতিষ্ঠ করিয়া তোলা; অন্যদিকে সময়মত সশস্ত্র সংগ্রামে চেক দেশ আক্রমণ করা। হিটলার এইরূপেই গত মার্চ্চ মাসে অষ্ট্রিয়া হস্তগত করিয়াছেন। তাহার পরেই তাঁহার এখন কাজ চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যবস্থা।

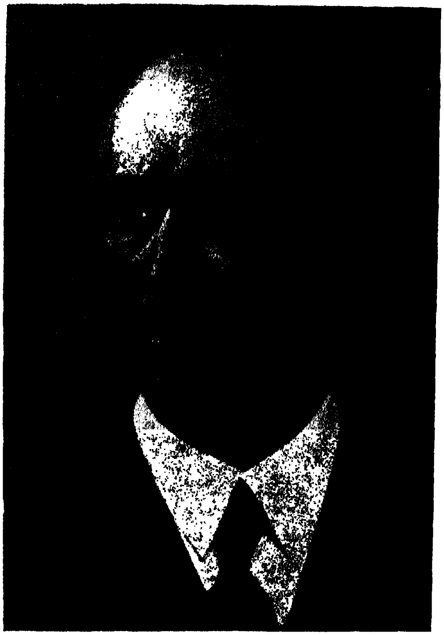
অষ্ট্রিয়ার পতনের পর হইতে সমস্ত ইয়ুরোপ সশঙ্কচিত্তে অপেক্ষা করিতেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্য; চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্ম্মানেরাও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে "ফ্যুয়েরের" আবির্ভাব কামনায়। এক উগ্র জার্ম্মান গরিমা ও স্বাতন্ত্র্যকামনা সেখানে দেখা দিল পূর্ব্বেকার ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রীয় দলগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, রহিল একটি মাত্র দল—হেন্‌লাইনের সুদেতেন ডয়টশ দল। ইহারা সর্ব্বাংশে নাৎসি-আদর্শকে নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করিতে চায়—সুদেতেন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হইবে প্রথমে সুদেতেন স্বরাজ্য, তাহার পর নাৎসি-রাজ্য।

মে'র মেঘ

গত মে মাসে যখন পৌর ও সাধারণ নির্ব্বাচন নিকটবর্ত্তী হয় তখন জার্ম্মান কাগজে যে চেক-বিরোধের রুদ্র গীত বাজিয়া উঠিল, তাহাতে মনে হইয়াছিল বুঝি চেকোশ্লোভাকিয়াও অষ্ট্রিয়ার মতই মরণশয্যায় অবসান লাভ করিতেছে। সীমান্তের এখানে-ওখানে দুই দেশের বাহিনীতে সঙ্ঘর্ষ বাধিতেছিল, পথে-ঘাটে জার্ম্মান ও চেকদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি চলিতেছিল, কোথাও এক-আধটুকু গুলিও চলে। জার্ম্মান কাগজগুলি চীৎকার জুড়িয়া দেয়—'জার্ম্মানকে জার্ম্মান না রাখিলে কে রাখিবে?' সবই প্রায় স্থির—তবু ২১শে মে কাটিয়া গেল—জার্ম্মান অভিযান বন্ধ রহিল। কিন্তু মেঘ কাটিয়া যায় নাই।

সে যাত্রা চেকোশ্লোভাকিয়া বাঁচিল প্রথমত তাহার নিজের সাহসে,—তাহার সৈন্যবল ছিল প্রবল ও প্রস্তুত। দ্বিতীয়ত, তাহার বুদ্ধিবলে—রুশিয়াও ফ্রান্সের সহিত পরস্পর সাহায্যের প্রতি-

শ্রুতিতে পূর্ব্বেই সন্ধি করায় এই দুই নাৎসি-শত্রু ছিল তখন চেক্‌দের সাহায্যার্থে তৈয়ারী। তৃতীয়ত, চেকো-শ্লোভাকিয়া বাঁচিল তাহার আপনার চিত্তবলে—প্রধানমন্ত্রী বেনেশ বা পররাষ্ট্র-সচিব হোজা একটি নিমেষের জন্যও বিচলিত হন নাই, স্থিরচিত্তে বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন—"চেকরাষ্ট্রের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া জার্ম্মান ও অন্যান্য সংখ্যাল্পদের সমস্ত অধিকার আমরা বিবেচনা করিতে তৈয়ারী আছি।" এই সুযুক্তিপূর্ণ আচরণে ব্রিটেনও তখন বার্লিনে বারবার জানাইল—ব্যাপারটার



ডাঃ বেনেশ

সুমীমাংসা করা দরকার। ইহার কারণ, ইয়ুরোপের এই রাষ্ট্রকে হিট্‌লারের হাতে তুলিয়া দিলে সমস্ত ইয়ুরোপ কার্য্যত হিটলারের হাতে পড়িবে ; ব্রিটেন তাহা চায় না। ইহা ছাড়া, ফ্রান্স ও ব্রিটেন সমসূত্রে গ্রথিত ; তাই ফ্রান্স যখন এই ব্যাপারে বাধা দিবেই দিবে, তখন ব্রিটেনের পক্ষে একেবারে সহজে নিরপেক্ষ থাকিবার উপায় নাই। তাই, মে মাসে ব্রিটেনও গৌণভাবে চেকদের বন্ধুর কাজ করিয়াছে।

ইহার পরেই চলিল হোজার সহিত হেনলাইন দলের আলোচনা আর চেক-রাষ্ট্রকর্ত্তাদের 'জাতীয়তা আইনের' খসড়া রচনা। সুবিধা পাইয়া শ্লোভাকরাও তখন স্বাতন্ত্র্য চাহিল। কিন্তু খসড়া প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেই বুঝা গেল তাহা সুদেতেন জার্ম্মেনদের দাবি সর্ব্বাংশে মিটাইতে পারিবে না।'

সে দাবি সম্পূর্ণ মিটাইতে গেলে কিন্তু এই রাষ্ট্র ছিন্নসূত্র হইয়া পড়িবে, তাহার ধীরে ধীরে মৃত্যু ঘটিবে। ২৩শে এপ্রিল কার্লসবাদে হেনলাইন আট দফায় সে দাবি প্রকাশ করেন। যথা—

(১) চেক ও জার্ম্মানদের সমান অধিকার দান;

(২) এই সমান প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি স্বরূপ সুদেতেন জার্ম্মানদের আইনত গঠিত সমাজ বলিয়া স্বীকার করা।

(৩) রাষ্ট্রমধ্যস্থ জার্ম্মান অঞ্চল স্থির করা ও আইনত মানা;

(৪) জার্ম্মান অঞ্চলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দান;

(৫) উক্ত অঞ্চলের বাহিরে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ জাতীয় পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আইনের সাহায্য দান;

(৬) ১৯১৮ হইতে যত অবিচার হইয়াছে তাহার দূরীকরণ ও ক্ষতিপূরণ;

(৭) এই নীতি স্বীকার করা যে, জার্ম্মান অঞ্চলে জার্ম্মান কর্ম্মচারী থাকিবে;

(৮) জার্ম্মান জাতীয়তা ও জার্ম্মান রাষ্ট্রদর্শন গ্রহণ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দান।


রানসিম্যান

ইহার অনেক কথাই এখন ব্রিটেনের ও ফ্রান্সের উপদেশে চেকরা মানিয়া লইতে পারেন, লইতেছেনও; কিন্তু তাহাতেও কি হিট্‌লার সন্তুষ্ট হইবেন? তাঁহার লক্ষ্য যে সে রাষ্ট্রের বিনাশ। হেন্‌লাইন অবশ্য প্রকাশ্যত তাহা চাহেন না; কিন্তু কার্য্যত তাঁহার দাবির-ও অর্থ উহাই। আর সমস্ত জার্ম্মান জাতিরই আজ নেতৃত্ব হিট্‌লারের হাতে। এদিকে চেকদের সর্ত্ত-প্রকাশে দেরী হইতেছে বলিয়া সুদেতেন জার্মানেরা অধীর হইয়া উঠিল। সেই সর্ত্তের আভাষ পাইয়া তাহারা চীৎকার জুড়িয়া দেয়।—তাই চেকদেরই অনুরোধে—জার্ম্মানদেরও সম্মতিতে—চেম্বারলেন লর্ড রান্‌সিম্যানকে বেসরকারী ভাবে মধ্যস্থতা করিবার জন্য প্রাগে পাঠাইয়াছেন।

ব্রিটিশ মোড়লি

মধ্য ইয়ুরোপের আবহাওয়া রান্‌সিম্যানের দৌত্যের অনুকূল নয়। কারণ, জার্মানির যুদ্ধের মহড়ায় চেকরা চিন্তাকুল, সুদেতেন জর্ম্মানরা আরও উদ্ধত ও উল্লসিত। কিন্তু এই মধ্যস্থতার স্বরূপটি শুধু বুঝিবার মত। তাহা হইলেই ইহার ফলাফলও কল্পনা করা চলে।

ব্রিটিশ কাগজগুলি খুশী হইয়াছে—ব্রিটেনের নিঃস্বার্থ পরহিতব্রতের বড়াই করিয়া বলিতেছে, এবার ব্রিটেন আবার ইয়ুরোপীয় রাষ্ট্রনৈতিক মঞ্চে পুনঃপ্রবেশ করিল। 'দ্বীপবাসী' ইংরেজ সাধারণ ভাবে ইয়ুরোপের রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িতে চায় না। কিন্তু, এ যুগে দূরে বসিয়া থাকিলেই নিরাপদ থাকা যায় এমন নয়। "ব্রিটেনের সীমান্ত ডোভারে নয়, আজ রাইনে"—একথা বল্‌ডুইনই বুঝিয়াছিলেন। অতএব, ইয়ুরোপের রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ব্রিটেনেরও অদৃষ্ট আজ বিজড়িত। কিন্তু, ঠিক এই কালেই এই রাজনীতিতে ইংরেজের স্থানটা বড়ই নিচে নামিয়া গিয়াছে। রান্‌সিম্যানের মোড়লি সূত্রে এখন সেই আসরে ব্রিটিশ জাতি আবার দেখা দিতেছেন—বিলাতী কাগজওয়ালাদের ইহাই খুশী হইবার কারণ। কিন্তু ব্রিটেনের বন্ধু ফরাসীর মনোভাব ঠিক এইরূপ নয়। সে একটু বিব্রত বোধ করিতেছে। বৈদেশিক-নীতিতে ফরাসীর আজ ব্রিটিশ সহযোগিতা ও ব্রিটিশ বন্ধুত্ব পরম-কাম্য। আবার জার্মান-বিভীষিকার বিরুদ্ধে চেকোশ্লোভাক্ মৈত্রী ও সোভিয়েট রুশিয়ার মৈত্রীও তাহার পরম ভরসা।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে ব্রিটিশ ও ফরাসীর মোটামুটি মতের মিল ছিল,—ও রাষ্ট্রটীর বাঁচা প্রয়োজন। তবু উভয় বন্ধুর মধ্যে এতদিন ফরাসীই এই দেশ-সম্পর্কে ছিল সর্ব্ব কর্ম্মে অগ্রণী। এবার ব্রিটেন্ সেখানে অগ্রসর হইয়া যাওয়ায় ফরাসী একটু পিছনে পড়িয়া গেল—প্রসিদ্ধ ফরাসী সাংবাদিক 'পার্টিনাক্‌স' ইহা উল্লেখ না করিয়া পারেন নাই। উল্লেখ করিবার কারণও আছে—চেকোশ্লোভাকিয়া রক্ষার জন্য ফরাসীর যতটা আগ্রহ, ব্রিটেনের ততটা আগ্রহ নাই। ব্রিটেনের মনোভাবটা এই—চেকোশ্লোভাকিয়া বাঁচিয়া থাকে, ভালোই; কিন্তু হের হিটলারও মুসোলিনি প্রমুখ প্রবল পক্ষেরও সন্তুষ্টবিধান (appeasement) দরকার। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী চাই—ইয়ুরোপে ইংরেজ ইতালি জার্ম্মান ও ফ্রান্সকে লইয়া চতুঃশক্তির মিলন। ইতিমধ্যে চেকসমস্যার একটা নিষ্পত্তি করা যায় কিনা দেখা যাক্।

মে মাসে হিট্‌লারকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া এখন ব্রিটেন মনে মনে খুব একটা পবিত্র কর্ত্তব্য-পালনের আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছে। নূতন আত্মপ্রসাদ লাভের আর একটা অবকাশ আছে সুদেতেন ডয়েটশ্‌দের দাবী পূরণে চেক্‌দের সম্মত করায়। সে দাবী কি কি তাহা এইমাত্র দেখা গেল, আর সেই দাবী পূরণের অর্থ কি তাহাও সহজেই বুঝা যায়:—তাহাতে চেক্‌রাষ্ট্র সুইৎসারল্যাণ্ডের মত নানা ক্যান্টানে বিভক্ত হইয়া পড়িবে; সুদেতেন অঞ্চলের জার্ম্মানরা কার্য্যত ও প্রকাশ্যে ন্যাৎসি মতবাদ ও নাৎসি আত্মীয়তার সূত্রে জার্ম্মান তৃতীয় সাম্রাজ্যেরই পক্ষপাতী হইবে; আর খণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া সেই পরাক্রান্ত সাম্রাজ্যের পক্ষচ্ছায়ায় আপাতত কোনেরূপে দিন কাটাইবে—যতদিন হিটলার সুযোগমত তাহাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া উক্রেইনের দিকে যাত্রা না করেন। তথাপি ইহাই হইবে ব্রিটেনের পরামর্শ। তাহার যুক্তি হইবে এইরূপ—হেন্‌লাইন স্বাধীনতা চান না, এই রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিতে রাজী। তাহা ছাড়া এখনও তিনি রাষ্ট্রের আর্থিক, পররাষ্ট্রিক ও সামরিক বিভাগে আত্মকর্তৃত্ব কামনা করেন না—এমন কি, হয়ত

চেক্‌দের রুশ-বন্ধুত্বও আপাতত স্বীকার করিয়া লইতে পারেন। আর ইহাতে চেকরা অস্বীকৃত হইলে?—"হেইল হিট্‌লার!"—দেখিতেছে না চেক্‌রা তাহার মহরা?

মধ্যস্থতার মর্ম্মকথা

রান্‌সিম্যানের মধ্যস্থতার মানে ইহাই যে, এই কথা ব্রিটিশ কাগজেও পাওয়া যায়। প্রধান-মন্ত্রী চেম্বারলেনকে প্রশ্ন করিলেও তিনি ইহা স্পষ্টত অস্বীকার করিতে পারেন নাই। ব্রিটেনের মূল পররাষ্ট্রনীতিও এই পন্থাই অনুমোদন করিবে। অবশ্য জার্ম্মেনির এই নূতন আকাঙ্ক্ষা ও নূতন শক্তিবাদ একটা ভাবনার কথা।—কিন্তু তাহার অপেক্ষাও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীরপক্ষে বেশী ভয়ের কথা রুশিয়া ও তাহার গণশক্তিবাদ। বরং সেই গণজাগরণের বিরুদ্ধশক্তি হিসাবে জার্ম্মানিই তাহাদের বন্ধু, ফ্যাশিস্তরাই সমধর্ম্মী। চেম্বারলেন-হ্যালিফ্যাক্সের জার্ম্মান পক্ষপাতও সুপরিচিত—সেদিনও হিট্‌লারের বিশেষ দূত ভিদম্যান্‌ হ্যালিফ্যাক্‌সের নিকট ফ্যুয়েররের বন্ধুত্বের বাণী লইয়া আসিয়াছেন। তাই চেক-সমস্যায় রানসিম্যানের চেষ্টা কিরূপ সমাধান খুঁজিবে, তাহা অনুমান করা যায়। তাহার প্রমাণও ইতিমধ্যে মিলিতেছে। চেকমন্ত্রী হোজা বলিতেছেন—আশ্‌ ও ফালকানো প্রভৃতি চারটি শহরে জার্ম্মান শাসকই জেলা শাসক হইবেন, ঐরূপ সাতটি শহরে পোষ্টমাষ্টারও হইবেন জার্ম্মান। সম্ভবত চেক্‌-এর, বিচার, অর্থবিভাগ ও রেলবিভাগের কর্ত্তৃত্বপদও জার্ম্মানরা পাইবে। এখন বোধহয় রান্‌সিম্যান তিনটি স্বনির্ভর সুদেতেন জার্ম্মান অঞ্চল গড়িবার পরামর্শ দিবেন। উহার চেক সংখ্যাল্পদের জন্য থাকিবে সেই সব রক্ষার ব্যবস্থা অবশিষ্ট চেক অঞ্চলের জার্ম্মান সংখ্যাল্পক যে-সব ব্যবস্থা লাভ করিবে, এইভাবে একটা যুক্তরাষ্ট্রের মত কিছু খাড়া হইবে। অথণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া সুইংসারল্যাণ্ডের মত ক্যাণ্টনে ক্যাণ্টনে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপে হেন্‌লাইনের আটদফা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ না হইলেও মোটের উপর গৃহীত হইবে। আর ফলে বাহ্যত কিছু এই মুহূর্ত্তে না ফলিলেও কার্য্যত ফল একই হইবে

বাটোয়ারার বিপদ

এই পন্থা অবলম্বন না করিয়া কি চেকদের আর অন্য উপায় ছিল মনে হয় না। রানসিম্যানের 'বাটোয়ারা' লইয়া কি বিপদ ঘটিতে পারে তাহা আমাদের বুঝা অসাধ্য নয়। উহাতে অস্বীকৃত হইলে—ব্রিটেনের সদিচ্ছা চেকরা হারাইবে, হেন্‌লাইন্‌ ও তৎপশ্চাতে হিটলার প্রাগে সমুপস্থিত হইবেন। তখন ফরাসীর হইবে বিপদ। এই ব্যাপারে ব্রিটেনের নিকট তখন সহানুভূতি সাহায্য আশা করা চলিবে না, অথচ তাহার বন্ধন ছাড়িয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার সাহায্যে আসিতেও ফরাসী পারিবে কি? কিম্বা সে আসাটা কি সুবুদ্ধির কাজ হইবে? প্রাগ-জয়ে ছয় সপ্তাহ না লাগিয়া যাহাতে দুই সপ্তাহ লাগে, এমন পরিকল্পনা জার্ম্মানরা তৈয়ারী করিতেছেন। সে দুই সপ্তাহ ফরাসীর যুদ্ধার্থে তৈয়ারী হইতেই লাগিবে—রাইন্‌ল্যাণ্ডের বর্ত্তমান সুরক্ষিত অঞ্চলেই সে ততক্ষণ ঠেকিয়া থাকিবে। তারপর প্রাগ-জয় করিয়া যখন সমস্ত সৈন্য লইয়া

হিটলার পশ্চিমে দেখা দিবেন ? অবশ্য ফরাসী বা ব্রিটেনের সাহায্য ভরসা না পাইলেও রুশিয়া চেকদের সাহায্যার্থে প্রস্তুত থাকিবে। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়াছে পোল্যাণ্ড ও রুমেনিয়া। অতএব, সে সাহায্য হয়ত আসিবে আকাশ পথে; না হইলে ঐসবদেশেই রুশ বাহিনীকেও ঠেকিয়া থাকিতে হইবে—চেকদের সাহায্যে আসিতে আসিতে চেকরাজ্যের আর কিছু থাকিবে না। অতএব, চেকদের পক্ষে রান্‌সিম্যানী রোয়াদাদ গ্রহণ না করিলে বিপদ অনেক। আর গ্রহণ করিলেও বিপদের ও বিলয়ের অন্য অধ্যায় সুরু হইবে মাত্র। 'না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি' এমনি উভয় সঙ্কটে পড়িয়াই জাতি গ্রহণ করে।

চেকদের যাহাতে বিপদ সুদেতেন জার্ম্মানদের ঠিক তাহাতেই সুবিধা। রান্‌সিমান তাহাদের সন্তুষ্ট করিতে চাহিবেনই—বারে বারেই নূতন অধিকার যতই জুটুক তাহারা বলিতে পারে—'না'। কারণ, তাহাদের পিছনে হিটলারের বৃহৎ বাহিনী সুসজ্জিত। অপর পক্ষে একবার যে অধিকার চেকরা ছাড়িয়া দিবে, জার্ম্মানরা শতবার প্রত্যাখ্যান করিলেও তাহা আর চেকরা ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। সংখ্যাল্পের এই খেলাও আমাদের সুপরিচিত। রান্‌সিম্যান্‌কে মধ্যে রাখিয়া, হিটলারকে পিছনে রাখিয়া, হেনলাইন্ নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতে পারেন—চেকোশ্লোভাকিয়ার উপায় নাই।

বরং মে-মাসে সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধিলে চেকদের ভরসা ছিল বেশী—তখন চেক বাহিনী সুসজ্জিত ; রুশিয়া ও ফ্রান্স দুইই স্থির সঙ্কল্প, প্রস্তুত ; যতদূর বুঝা যায় ব্রিটেনও তখন জার্ম্মানির সে প্রয়াসে ছিল সন্দীহান্, বিরক্ত। এখন কি আর সংগ্রামক্ষেত্রেও চেকোশ্লোভাকিয়ার সে ভরসা আছে ? জার্ম্মান কুচকাওয়াজের এক ফল এই যে, জার্ম্মানি এখন যে কোনো মুহূর্ত্তে যেখানে প্রয়োজন সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইতে পারে—তাহার প্রস্তুত হইতে সময় নষ্ট হইবে না। অন্যদিকে তাহার শত্রু পক্ষের বিঘ্ন অনেক—সাইবেরিয়া সীমান্তে জাপানের সম্বন্ধে রুশিয়া নির্ভাবনা হইতে পারে না, আর রাইন্‌ল্যাণ্ডের বাধাও ফরাসীর পক্ষে দুরতিক্রম্য।

মনে হয়, চেক জাতি, চেকরাষ্ট্র আর স্বপ্রাধান্য অটুট রাখিতে পারিবে না—ধীরে ধীরে য়ুরোপের মধ্য ও পূর্ব্ব অঞ্চলে নাৎসি প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে—স্বস্তিকার সুবৃহৎ লেখায় অন্যসব পতাকাই ঢাকা পড়িতেছে। রানসিম্যান আপন মধ্যস্থতায় সেই স্বস্তিকা-পতাকাই চেকোশ্লোভাকিয়ায় একটু একটু করিয়া খুলিয়া ধরিতেছেন। মধ্যইয়ুরোপে বৃটিশ মধ্যস্থতার ইহাই স্বরূপ।

আমি-ই কইতে পারিনে সে কথন

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়

কাদায়-ভরা পথ, গাড়ির চাকাগুলো ইতস্তত আঁক কেটেচে ওর বুকে—
জল-ধারার পাশে বাঁধ—
যেথায় মাছ ধোরবার ভিজে জালগুলো শুকোচ্চে,
ভাড়াটিয়ে গাড়িগুলো মন্থরতায় এগুচ্চে—তাদের-ই পাশে চল্‌তে-চল্‌তে
আমি ভাব্‌চি।

আমি ভাব্‌চি আর চাইচি পথের পানে,
বাঁধের দিকে, নির্জীব আকাশের ম্লানিমার দিকে,
সরোবরের ঢালু-তীরের দিকে,
দূরান্তের গ্রামগুলোর মাথায় যে-ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকাচ্চে তার দিকে।
বাঁধের পাশে হাঁটচে এক ইহুদী,
বিষাদক্লিষ্ট তার মুখ, পরণে ছিন্ন পাত্‌লুন।
সরোবর থেকে সফেন-জলোচ্ছ্বাস এসে ঢুক্‌চে
সেতুবন্ধের নিষেধের ফাঁক দিয়ে।

ছোট একটি ছেলে বাজাচ্চে বাঁশি,
বাঁশের বাঁশি।
চম্‌কে-ওঠা বুনো-হাঁসগুলো উড়ে গেচে,
এবং, উড়বার কালে তারা নৈঃশব্দ্যের বুক চিরে তাদের নালিশ
পাঠিয়েচে।

পতনোন্মুখ পুরণো মিলের পাশে
ঘাসের উপর বোসে আছে ক'জন মজুর।
বুড়ো শীর্ণ একটা ঘোড়া টান্‌চে একটা গাড়ি
নেহাৎ গা-ছাড়া ভাবে—তাতে আছে কতগুলো বস্তা।
আর আমি—হাঁ, আমি কিন্তু এ-সবকিছুর সাথেই চিরপরিচিত,
যদিও অতঃপূর্ব্বে হেথায় আমি মোটেও আসিনি!

ঐ যে দালানগুলো—কাছে ও দূরে,—
ঐ যে ছেলেটি, ঐ বন, আর ঐ বাঁধ—হাঁ, এ-সবার-ই সাথে
আমি পরিচিত।

মিল্ থেকে বেরিয়ে আসা মর্ম্মন্তুদ শব্দ,
ধ্বংসে যাওয়া গোলা-বাড়ি ঐ মাঠের বুকে—
এদের আবহে আমি পূর্ব্বেও ছিলাম বর্ত্তমান,
কিন্তু এদেরকে ভুলে গেছি কতোকাল।

এই ঘোড়াটাই তো অমন মন্থর গা-ছাড়া হোয়ে চলতো,
এ-বস্তাগুলোকেই তো বয়ে নিতো সে ;
আর ঐ ধ্বংসোন্মুখ মিল্‌টার কাছে
ঘাসের উপর-ই-তো বোসতো এ মজুরেরা।
ঐ ইহুদী—দাড়িওয়ালা ঐ ইহুদী—ও-ই-তো হাঁটতো অমন কোরে,
আর বাঁধটাও ঠিক এমনি কোরে-ই-তো শব্দ তুলতো।
এ সব কিছুই ঘটেচে—পূর্ব্বেও ঘটেচে—
কেবল, আমিই কইতে পারিনে সে কখন।

Alexis Tolstoy থেকে অনূদিত।

বর্ত্তমান জগতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

ও

তাহার কার্য্য

সুষমা সেনগুপ্তা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলতে আমরা সাধারণতঃ কি বুঝি? যেখানে লেখাপড়া শেখাতে পাঠানো হয়। মোটামুটি ভাবে খানিকটা জ্ঞানার্জ্জন করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। লেখাপড়া শেখা জিনিষটা আমাদের এমন একটা বাতিক বিশেষ হয়ে উঠেছে, যে পথটাকেই আমরা গন্তব্যস্থান ধরে নিয়ে, পথের প'রে এত ঝোঁক দিয়েছি যে গন্তব্যস্থানের দিকে নজর আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ছেলে ইস্কুলে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মা বাপ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ছেলেমেয়ে রোজ রোজ কতটা লেখা এবং পড়া শিখছে। ছেলে যদি পড়া দাগ দিয়ে নিয়ে না এলো বাড়ী, তো বাপ মা অস্থির হয়ে উঠলেন পড়াশুনা কিছুই হচ্ছে না। আমার জনৈকা বান্ধবী আমার কাছে তাঁর মেয়ের শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসায় আমি তাঁকে স্থানীয় মণ্টেসোরী বিদ্যালয়ে দিতে বলি, মা তাঁকে বর্ণপরিচয় শেষ করিয়ে খানিকটা প্রথমভাগ ধরিয়েছিলেন ও কিছু সামান্য যোগ বিয়োগও ধরাচ্ছিলেন এর মধ্যে মণ্টেসোরী বিদ্যালয়ে গিয়ে কই বা গেলো তার বর্ণপরিচয়, কই বা গেলো নামতা মুখস্থ! দিনান্তে মেয়ে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসতো. না বলতে পারতো কি পড়া হল, কিই বা কালকের পড়া? কিছুদিন দেখে মা ধৈর্য্য হারালেন। একি? এতগুলো চক্‌চকে টাকা মাস মাস গুণে দিচ্ছি কি জন্যে? সারাদিন হৈ হৈ, খেলাধূলো কি বাড়ীতে হতে পারে না? আমার কাছে আবার এলেন পরামর্শ করতে. আমি আশ্বাস দিলাম "সবুরে মেওয়া ফলে"। বলাবাহুল্য মা ক্রমশঃ খুসী হলেন। এই যে অসন্তুষ্টি, এর কারণ, আমরা লেখাপড়া শেখাবার আগ্রহাতিশয্যে লেখাপড়া শেখাবার মূল উদ্দেশ্য যাই ভুলে। ছেলে বা মেয়ে যদি ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে যথাকালে ম্যাট্রিক এবং আই, এ, বি, এ ও এম্, এ পাশ করে গেল, মায়ের বুক গর্ব্বে ভরে উঠ্‌ল। হয়ত বা পড়ার চাপে স্বাস্থ্যহানি হল, তাও সইবে, কিন্তু মূর্খতা সইবে না। আজকাল আর একদিকে নজর গেছে, পাশ করে রোজগার করবার ক্ষমতা হল কি না। রোজগার করবার ক্ষমতা না হলে, সে বিদ্যা অসার্থক সে ফার্ষ্ট ই হোক্ বা সেকেণ্ডই হোক।

এখন কথা হচ্ছে শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুই জাতীয় ধারণাই ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃত শিক্ষা বাস্তবিক কতকগুলি তথ্যের সমষ্টি গ্রহণ করা নয়, কিম্বা অর্থোপার্জনের উপায়ও নয়। শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র-গঠন। শূন্য কলস বিবিধ মহামূল্য রত্নসম্ভারে পরিপূর্ণ করে মাটীর নীচে পুঁতে রাখা যেমন অসার্থক; কেবলমাত্র দেশ বিদেশের মহাজ্ঞানী গুণীজনের জ্ঞানরত্ন দ্বারা বৃথা মস্তিষ্ক বোঝাই করে রাখাও তেমনি নিরর্থক। মানুষের মনোবীজ শিক্ষাবারিসিঞ্চনে ফুলে ফলে সৌন্দর্য্যে ভরে উঠে নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিক জগৎকে যেখানে সৌরভে ও তৃপ্তিতে ভরিয়ে তুলতে পারবে সেখানেই শিক্ষার সার্থকতা। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু বাইরের থেকে গ্রহণ নয়, নিজের ভেতর যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বড়, যা কিছু মহৎ সব কিছুকে সুন্দরতর, বৃহত্তর ও মহত্তর করে তোলা ও নিজের মধ্যে যা কিছু ভাল তা পরকে বিলিয়ে দেওয়া।

বর্ত্তমান জগতে দেশে দেশে যে নব শিক্ষান্দোলন চলছে তার মূলনীতি হচ্ছে এই। ছাত্রকে জ্ঞানদানই কেবল শিক্ষকের কর্ত্তব্য নয়, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ছাত্রের জ্ঞানার্জ্জনে সহায়তা করা। মানুষ যদিও প্রকৃতির জীব, তবু প্রকৃতির অন্যান্য জীবের মত মানুষ নিজের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তির বিকাশ প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে খুসী নয়। এ কথা মানুষ বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছে যে মানুষ নিজের ইচ্ছানুসারে সহজাত প্রবণতা গুলিকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করতে পারে, ও নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে যথাসম্ভব নিজের অনুকূলে কাজকরিয়ে নিতে পারে। যেদিন থেকে মানুষ এ খবর জেনেছে, সেদিন থেকে মানুষের আর বিরাম নেই, চলেছে একটানা অন্তহীন চেষ্টা, কেমন করে নিজের মানবজন্ম সার্থক করবে, কেমন করে নিজেকে পূর্ণতর মহত্তর করবে, কেমন করে তার ভেতর যা কিছু ভাল যা কিছু সুন্দর সব বিকশিত করে জগতকে দান করে যাবে। মানুষের চরিত্র যে বাইরের চেষ্টায় খানিকটা বদলানো যায় এ কথা মানুষ যেদিন থেকে জেনেছে সেদিন থেকেই মানব চরিত্র গঠনে চলেছে তার অক্লান্ত চেষ্টা। এখন এই চরিত্র গঠন হবে কেমন করে? মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, কাজেই সমাজকে বাদ দিয়ে তার কিছু হওয়া সম্ভব নয়, নির্জ্জন দ্বীপে একা বাস করলে, হয়ত মানুষ মিথ্যাবাদী, চোর, খুনে, কিম্বা ডাকাত কিছুই হ'তে পারতো না, কিন্তু সেই পাপকলুষহীন চরিত্রের কোনই মহত্ব নেই, কেননা, নির্জ্জনতার মধ্যে মানুষের চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। তার খারাপ দিকটা যেমন চাপা থাকে, তেমনি ভাল দিকটাও ফুটে ওঠে না। সংসারে লোকজনের সংঘর্ষে, ঘটনাবলীর ঘাত প্রতিঘাতে মানুষ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হয়ে গড়ে ওঠে। মন্দ যে মানুষ জানল না তার পক্ষে ভাল হওয়া সহজ, কিন্তু ভালোমন্দ সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করে জয়ী হোয়ে আসতে পারলো তারই মনুষ্যত্ব হলো সার্থক।

এই যে সমাজ, যার ভেতর মানুষের জন্ম এ এক আশ্চর্য্য পদার্থ, এই সমাজ যেমন মানুষের ভেতরকার সবকিছু ভালোকে জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করতে পারে, তেমনি আবার মানুষের স্বাভাবিক স্ফুরণের পথে, পদে পদে বাধার প্রাচীর ও গড়ে তুলতে পারে। মানুষ দিয়েই যদিও সমাজ তৈরি, তবু সমাজের নিজের এমন একটি বিশিষ্ট ইচ্ছা আছে, যার কবল এড়ানো সাধারণ মানুষের পক্ষে

সোজা ত নয়ই, প্রায় অসাধ্য। সমগ্র সমাজের ইচ্ছা যদি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হয় তবে সেটা সকলের পক্ষে ভাল, কেননা সমাজ এড়িয়ে হঠাৎ কেউ অন্যায় করতে পারে না, তেমনি যদি কোন সামাজিক ইচ্ছা মানবের পক্ষে অকল্যাণকর হয়ে দাঁড়ায়, তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই সমাজবন্ধন ভাঙ্গাই মানবের পক্ষে কল্যাণকর হয়। সাধারণভাবে বলতে গেলে সমাজমন রক্ষণশীল। একটা চিন্তাধারা সমাজে চল্‌তি হয়ে গেলে সেটা চট করে বদলানো সমাজের পক্ষে সহজ নয়, তখনই দরকার হয় যুগপ্রবর্ত্তকের, এমন একটা ম র, যার মনের জোর, একা সমস্ত সমাজ-মনের ওপরে উঠে যেতে পারে এবং নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে সমস্ত সমাজ মনের চিন্তাধারার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে। সমাজ মানুষের পক্ষে যত বড় প্রয়োজনীয় জিনিষই হোক না কেন, একথা ভুললে চলবে না, যে মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজের কিছুই হতে পারে না, সমাজের কল্যাণেই মানুষের কল্যাণ, এবং ব্যক্তির কল্যাণ যে সমাজ সংঘটন করতে পারে সেই সমাজই মানুষের পক্ষে কল্যাণকর। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠানই সার্থক হতে পারে না। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত রকম মানব সমষ্টি স্বীকৃত হয়েছে, এবং যার বিধান মানুষ মোটামুটিভাবে মেনে চলেছে সেটা বলতে গেলে তিনভাগে ভাগ করা যায়, পরিবার, রাষ্ট্র এবং সমাজ। পরিবারকে এর তিনটীর মধ্যে স্বাভাবিক আবেষ্টন বলা চলে. রাষ্ট্র বা সমাজ স্বাভারিক কি না এবং কতটা স্বাভাবিক সে কথা তুলে তর্কের সৃষ্টি করতে চাইনা, তবে পরিবারের সঙ্গে তুলনায় অন্য দুটি সমষ্টিকে কম স্বাভাবিক বলা চলে। জন্মের সঙ্গেই এই তিনটি সমষ্টি মানুষকে তার আপনার সম্পত্তি বলে দাবী করে, এবং সেই দাবীর বশে মানুষকে, তার গড়ে ওঠার পথে আপনাপন ইচ্ছা ও প্রভাবদ্বারা একটা বিশিষ্ট পথে গড়ে তুলতে চেষ্টা ও সাহায্য করে। সকলেরই চেষ্টার মূলে নিহিত রয়েছে একটা ইচ্ছা মানুষকে পূর্ণ ও সুন্দর করে গড়ে তুলবে। পরিবারে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজন স্নেহপরবশ হয়ে চায় তাদের ছেলে দশের একজন হোক্, তাদের বংশের গৌরব হোক্। এই বংশের গৌরব একটা বড় কথা, অর্থাৎ ছেলে বংশের ইতিহাসের ধারাটা না ভাঙ্গে এইটাই সবাই চায়, জাতি ও রাষ্ট্র চায়, যে নাগরিক জাতির গৌরব রক্ষা করবে, সমাজ চায় মানুষ আপন সমাজের আইনকানুন মেনে চলুক, বিদ্রোহী সাধারণতঃ কেউ চায় না। পরিবার, রাষ্ট্র বা সমাজ যেখানে মানুষের পরিপূর্ণতার অনুকূল সেখানে বিদ্রোহী হওয়া বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবে কথা হচ্ছে এই যে, রক্ষণশীলতাও যেমন আমাদের রক্তের মধ্যে আছে, বিদ্রোহের বীজও তেমনি আমাদের রক্তের মধ্যেই নিহিত আছে, জন্মের সঙ্গেই মানুষ প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জন্মায়, এবং প্রত্যেকেই চায় যথাসম্ভব নিজের ইচ্ছাশক্তিকে পূর্ণভাবে চালিত করতে, সে পথে বাধা উপস্থিত হলেই মানুষের অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একজনের ইচ্ছাশক্তি যেখানে বহুমানবের সহজ জীবনযাত্রার পথে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে একের ইচ্ছাকে প্রতিহত করা সমাজের কর্ত্তব্য, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের বহুল আলোচনার ফলে এটা দেখা গেছে, যতদূর সম্ভব মানুষের আপন ইচ্ছাশক্তিকে যদি অপ্রতিহত বিকাশের সুবিধা দেওয়া সম্ভব হয় তবেই মানুষের চরিত্রের পূর্ণবিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সহায়ক হয়। এই কথায় আর একটা বড় কথা উঠে

পড়ে, সেটা হচ্ছে মানুষের অন্যায় করবার ক্ষমতা। এটা যুগে যুগে কালে কালে পরীক্ষিত হয়ে গেছে যে মানুষের যেমন ভালো করবার ক্ষমতা আছে, তেমনি অন্যায় করবার ক্ষমতাও আছে, কাজেই মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে অপ্রতিহতভাবে চলতে দেওয়া মানে, এও হতে পারে যে তার যথেচ্ছ অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া। এটা কি সমাজ সহ্য করবে? কখনো নয়, এবং সমাজের পক্ষে সেটা কল্যাণকরও নয়। মানুষের চরিত্র-সংগঠনে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ চালনারও যেমন আবশ্যক, তেমনি সংযমেরও দরকার, তবে পুরাতন শিক্ষা পদ্ধতি এবং নব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে তফাৎ এই যে অন্যায়কে দুইদলই খারাপ মনে করে, তবে পুরাতন দল শাস্ত্র তৈরী করে, ভালো এবং মন্দকে চিরন্তন কালের মত বেঁধে দিয়ে বলতে চান, এটা করো এবং এটা ক'রো না, এতেই সমাজের এবং ব্যক্তির মঙ্গল এর ওপর ব্যক্তির সমালোচনা পুরাতন পন্থীদের কাছে অসহ্য, এ নিষেধের লঙ্ঘন তাদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য। নবীনপন্থীরা একথা বলেন না যে, প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাশক্তি নির্ভুল এবং আপন ইচ্ছাশক্তি প্রণোদিত হয়ে, সে যে কাজ করবে, তাই ভাল। তাঁরা বলেন, ন্যায় অন্যায় প্রতিযুগেই আছে, এবং ব্যক্তিগত অন্যায়ের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করাও যেমন দরকার সামাজিক অন্যায় থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করাও তেমন দরকার, তবে এই অন্যায় এড়াবার উপায় বিভিন্ন হওয়া দরকার। মানুষের মনোবৃত্তির এতটা উৎকর্ষ সাধন হওয়া দরকার যাতে মানুষ আপনিই অন্যায়টাকে অন্যায় বুঝে তার থেকে বিরত হতে পারে। জিনিষটা হয়ত হরে দরে গিয়ে দাঁড়ায় একই, কিন্তু মানুষের চরিত্রের ওপর এর প্রভাব যা হয়, তাতে দাঁড়ায় গিয়ে আকাশপাতাল তফাৎ। ছেলেবেলা থেকে যে মানুষ হয়েছে, এ করতে নেই, ও করতে নেই শিখে ও সমাজের নিষেধকে প্রতিবাদ না করে, তার চরিত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে একটা দুর্ব্বলতা, ভালোমন্দ নির্ব্বিশেষে সব বিধানের কাছে মাথা নত করবার একটা প্রবৃত্তি ও আপনার পরে একটা অবিশ্বাস, ইংরেজীতে যাকে বলা হয় inferiority complex সেই অন্যায়ের সত্যকার গুণাগুণ যদি বুঝে মানুষ নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে, নিজের অন্যায় ইচ্ছাকে প্রতিহত করে, তবে সেই না করায়, তার চরিত্র ক্রমে হয়ে ওঠে সবল থেকে সবলতর নিজের শক্তির প'রে জন্মায় তার আস্থা, তার চরিত্রে আসে সংযম, নিজের প্রবৃত্তিসমূহের সে হয় কর্ত্তা, দাস নয়। তার জীবনে সংগ্রাম যখন আসে, সে জানে কেমন করে তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে, আত্মীয় সহায় এবং উপদেশের অভাবে সে মুহ্যমান হয়ে পড়ে না।

চরিত্রবিকাশের উপায়ের সম্বন্ধে সংস্কারের এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান প্রণালী আজকাল আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে। এ ভাবে স্বাধীন আবেষ্টনীর মধ্যে সহজ ও সাবলীলভাবে চরিত্র গড়ে ওঠবার মত আবহাওয়ার সৃষ্টি না করতে পারলে, ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা দিয়ে মানুষকে গড়ে তোলা যায় না, এজন্য দরকার উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের।

বর্ত্তমান ইউরোপে এই দিক দিয়ে মানুষকে গড়ে তোলবার দিকে আজকাল একটা ব্যাপক-ভাবে চেষ্টা চলছে। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে নিজের ইচ্ছায় চলতে। কতকগুলি ইস্কুল আছে যেখানে কোন বাঁধাধরা কার্য্যসূচী ছেলেমেয়েদের ধরে

দেওয়া হয় না, শিক্ষকরা নিজেরা একটা কার্য্যসূচী তৈরী করে, সেটা ছাত্রছাত্রীদের অবগতির জন্য টানিয়ে দিয়ে, যার যার কর্ম্মস্থলে অপেক্ষা করেন। ছাত্রছাত্রীরা আপনাপন ইচ্ছানুসারে যার যে ক্লাশ ইচ্ছা সেখানে চলে যায় এবং যতক্ষণ ইচ্ছা কাজ করে। ইস্কুলের নিয়মাবলী ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা মিলে তৈরী করে, তবে তারা জানে, যে মুহূর্ত্তে নিয়ম তৈরী হল, সেই থেকেই তারা পড়ল সেই নিয়মে বাঁধা, কোন একটি ছাত্রের সে নিয়ম ভাঙ্গবার ক্ষমতা আর রইল না, যদি কেউ সে নিয়ম ভঙ্গ করে তবে সাধারণ বিচারসভায় তাকে হাজির হতে হবে, এবং সে নিয়মভঙ্গের সে যদি সন্তোষজনক উত্তর না দিতে পারে তবে তাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। অন্যান্য সাধারণ স্কুলের মত এখানেও "গোলমাল করব না" বা "রাত এগারোটার পর আলো জ্বালাবো না" বা "না বলে কয়ে বাইরে গিয়ে কাটাবো না," "লাইব্রেরীতে একেবারে নীরব থাকব" ইত্যাদি নিয়মকানুন থাকে, তবে অন্য জায়গার সঙ্গে এখানে তফাৎ এই যে, এ সব নিয়মের কর্ত্তা ছাত্রছাত্রীরা নিজে, কাজেই এ সব পালনে তাদের দায়িত্ব থাকে ঢের বেশী। ফলে ছাত্রছাত্রীরা স্বাধীন মতামত প্রকাশ, বা ইচ্ছানুসারে চলাও যেমন শেখে, তেমনি নিয়মানুবর্ত্তিতা, যেটা নাগরিকের একটা প্রধান গুণ সেটাও শেখে। অনেকে মনে করতে পারেন যে এ ধরনের স্বাধীনতা দিলে অনেক ছেলে মেয়ে মোটে কোন ক্লাশেই যাবে না, কিম্বা এমন সব আইন তৈরী করবে যাতে স্কুলের শৃঙ্খলা কিছুই থাকবে না। এখানেই আব্‌হাওয়া জিনিষটার প্রভাব দেখা যায়, এবং এখানেই পরিদর্শক শিক্ষকমণ্ডলীর কৃতিত্বের পরিচয়। যেখানে সবাই পড়ছে, সেখানে একান্ত অবাধ্য বালকও বই নিয়ে বসতে চাইবে, একটানা খেলা তাকে ক্লান্ত করে তোলে, বিশেষতঃ যেখানে তাকে অনবরত ওপর থেকে পড়বার কোন চাপ দেওয়া হয় না। আমরা একটা জিনিষ ভুলে যাই যে অনিচ্ছুক ছেলের যে কাজে অনিচ্ছা, সেই কাজে তাকে আমরা অনবরত চাপ দিয়ে, তার অনিচ্ছাপ্রবৃত্তিটাকে শুধু জাগিয়ে নয় আরও তীক্ষ্ণতর করে রাখি। ভালোমন্দ সম্বন্ধে মানুষের একটা সহজজ্ঞান আছে, যেটা তাকে কালে, কালে, যুগে, যুগে ঠিক পথে চলতে সাহায্য করে ; শিশুর মনও সে ক্ষমতা বর্জ্জিতনয় ; তাকে ছেড়ে দিলে সে আপন এবং দশের অমঙ্গল চাইবে না, এবং এক আধটি যদি সমাজ বহির্ভূত মনোবৃত্তি নিয়ে জন্মায়, দশজনের সাহচর্য্যে সেটা ক্রমশঃ ঠিক দিকে চালিত হবে। এই ঠিক দিকে মানব মনকে চালিত করবার চেষ্টা কালে কালে চলছে, তবে এতকাল অভিজ্ঞ লোকেরা কেবলমাত্র আপনাদের অভিজ্ঞতার জোরে নিজের ইচ্ছা, অনভিজ্ঞদের ওপর চালাতে চেষ্টা করেছেন, এখন নবযুগের শিক্ষাপন্থীরা আপনাদের ভুল বুঝে ছাত্রছাত্রীদের সামনে পুরোনো জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং অনাবিষ্কৃত সুবিশাল সৃষ্টির রহস্য খুলে ধরে, নিজে সহায়করূপে পাশে থেকে তার মনের সহজ বিকাশকে সাহায্য করতে চাচ্ছেন। এ ধরণের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করতে গেলে নীরব বা মৃদুগুঞ্জনরত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শিক্ষকের সরব গর্জ্জন কাণে আসে না, দেখা যায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী আপন আপন জায়গায় বসে তার কাজ করছে, শিক্ষক ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করছেন, যে সাহায্য চাচ্ছে তাকে সাহায্য করছেন। নিজে নিজে কাজ করা (self activity) ও তাকে উৎসাহিত করাই বর্ত্তমান শিক্ষাদান প্রণালীর মূলমন্ত্র।

এই তো গেল মোটামুটি ভাবে মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তনের কথা, এ ছাড়া ইউরোপের শিক্ষায়তনগুলি দেখলে একটা জিনিষ চোখে পড়ে যে এগুলি কেবলমাত্র কতকগুলি বাঁধাধরা জ্ঞানদানের একটা অসম্পূর্ণ আয়োজন নয়, এগুলি মানুষ তৈরীর একটা বিরাট কারখানা, এখানে যেমন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানদান হয় তেমনি স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি, সমাজে ও গৃহে নিজের কর্ত্তব্যপালন, ইত্যাদি প্রত্যেক দিকে নজর দেওয়া হয়।

প্রথমতঃ স্বাস্থ্য—আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্যাপক ভাবে যে রকম ভাবে দেশের ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা হচ্ছে তা দেখলে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয়। প্রথমতঃ ছাত্র ছাত্রী স্কুলে ঢোকবামাত্র তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করা হয় এবং প্রত্যেকের একটি কার্ড তৈরী হয়, তাতে তার স্বাস্থ্যের কোন ত্রুটি থাকলে, সেটা নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়, এবং কিভাবে সেটা সংশোধন করতে হবে, সে সম্বন্ধে মাতাকে বিশদ উপদেশ দেওয়া থাকে। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন অন্তর সে বিষয়ে খোঁজ নিতে থাকেন, এবং যাতে মা উদাসীন না হতে পারেন, সে ব্যবস্থা করা হয়। যদি মা গরীব হন, তবে স্কুল থেকে বিনাব্যয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। ৫ থেকে কোথাও সাত কোথাও বা এগারো বৎসর পর্য্যন্ত স্কুলে lunchএর আগে ১০½টা থেকে ১১½টার মধ্যে একটা মাঝামাঝি সময়ে ছেলেমেয়েদের দুধ খাবার জন্য আধঘণ্টা ছুটী দেওয়া হয়, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য বাজারদরের অর্দ্ধমূল্যে দুধ বিক্রীত হয়, তার মধ্যেও যারা বেশী গরীব তাদের বিনামূল্যে দুধ দেওয়া হয়। বেলা ১২টা থেকে ২টার মধ্যে স্কুলে মধ্যাহ্ন ভোজনের ছুটী দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ স্কুলেই স্কুলেই খাবার ব্যবস্থা আছে; ইস্কুলে পড়বার জন্য তাদের স্বাভাবিক খাবার কোন ব্যাঘাত হয় না, বাড়ীতে সবাই প্রাতরাশ সেরে আসে, স্কুলে মধ্যাহ্নভোজন হয়, বাড়ী ফিরে বৈকালিক চা হয়—সেই খাওয়ার খাদ্যমূল্য (food value) উপযুক্ত পরিদর্শক দ্বারা কিছুদিন অন্তর যাচাই করা হয়। এইভাবে ৫ থেকে ১৪ বৎসরে (বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের ফলে) প্রত্যেকটি ইংরাজ বালকবালিকা স্বাস্থ্য ভাল রেখে লেখাপড়া বিনাবেতনে শেখবার সুবিধা পায়। এ ছাড়া প্রত্যেক স্কুলে প্রচুর খোলা জায়গা আছে, সেখানে ছেলেমেয়েরা ব্যায়াম ও খেলাধূলা করবার প্রচুর সুযোগ পায়। ফলে এরা স্বাস্থ্য ভাল রেখেও লেখাপড়া করে, শরীর খারাপ হচ্ছে বলে, লেখা পড়া ছেড়ে ঘরে বসে থাকবার দরকার হয় না।

স্কুলটা যাতে বাড়ীঘরের বহির্ভূত একটা অদ্ভুত জায়গা হয়ে না দাঁড়ায়, যেখানে অধিকাংশ কাল কাটিয়ে এসে দৈনন্দিন জীবনে ছেলেমেয়েরা খাপ খাওয়াতে পারে না, সেইজন্য আজকাল অনেক জায়গায় স্কুলের আবেষ্টনীকে যথাসম্ভব বাড়ীর আবেষ্টনীর মত করে গড়ে তোলা হচ্ছে, একটা প্রকাণ্ড পাঁচ-ছ' তালা বাড়ীর বদলে মস্ত একটা জায়গা নিয়ে, ছোট ছোট বাসগৃহের মত বাড়ী চারদিকে ছড়িয়ে, মাঝে বাগান খেলার জায়গা ইত্যাদি দিয়ে অনেক জায়গায় স্কুল বাড়ী হচ্ছে। স্কুলের ভেতর ছেলেমেয়েদের ঘরের কাজকর্ম্মও এইজন্য শেখাবার ব্যবস্থা আছে, দুই একজায়গায় দেখলাম, ছেলেরা মধ্যাহ্ন ভোজনের পর নিজেরা বাসন মেজে, ঘর

ঝাঁট দিয়ে টেবিল মুছে সব সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিল। নিজের শোবার ঘরের যত্ন করা, বিছানা পাতা, ঝাঁট দেওয়া ইত্যাদি অনেকে নিজেরা করে, এবং সাধারণ কাজগুলো ভাগাভাগি ক'রে করে। এইসব কাজের দ্বারা এরা ভবিষ্যতে ভালো গৃহী এবং গৃহিনী হবার উপযুক্ত হয়, তাছাড়া স্বেচ্ছামূলক নিয়মানুবর্ত্তিতা দ্বারা এরা ভবিষ্যতে উপযুক্ত নাগরিক হবার শিক্ষা পায়।

সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিবার পূর্ণ মানুষ গড়বার ভার এই সব শিক্ষায়তনের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, তাদের প্রভাব এর ভেতর প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে। প্রতি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্র তার প্রত্যেকটি ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করছে এবং সেই কার্য্যে তাদের প্রধান সহায়ক হচ্ছে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি।

স্পাই

গল্প

(অরুন্ধতী দেবী)

সমুদ্রের নীলজল অবিশ্রান্ত আঁছড়ে পড়ছে, তটভূমিতে উঁচু হয়ে উঠেছে বালির রাশি সূর্য্যের তপ্তরশ্মি ঝিক্‌মিক্ করে চোখ ঝল্‌সাচ্ছে তারই ওপর পড়ে'। সেইখেনে আমি এসে বস্‌লাম জেলে-দের স্তূপীকৃত দড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে। বসে থাকা আর বসে বসে দেখা—এই আমার কাজ। অধিক পরিচয় নাই বা দিলাম!

বেলা আর দণ্ডতিনেক বাকী। কিন্তু মনে হচ্ছে প্রচণ্ড মধ্যাহ্ন:—সমুদ্রের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম, খানিকক্ষণ জেলেদের জাল মেরামত দেখলাম, একবার ফিরে তাকালাম বাঁ-হাতি ঐ ছোট্ট বাড়ীটার দিকে।

একটি মেয়ে মন্থরগতিতে বেরিয়ে এলো। গায়ের লাল রঙের ব্লাউজটা সূর্য্যের আলোতে টক্‌টকে হয়ে উঠলো। একান্ত অন্যমনস্ক গতিতে এসে বস্‌লো সে জেলেদের নৌকোগুলোর শুকুতে দেওয়া সারি সারি কাঠের একটাতে হেলান্ দিয়ে, আমার দিকে পেছন দিয়ে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখলাম।

অনেকক্ষণ নিঃস্পন্দ। সায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে থেকে খানিকবাদে একবার পাশ ফিরে বস্‌লো, ডান হাতটা এলিয়ে দিলো কাঠের ওপর।

রাস্তা থেকে কে আমার নাম ধরে ডাক্‌লে। আমি চট্ করে ফিরে বল্লাম, "এই যে! কি খবর? আসুন, আসুন!"

গল্পগুজব কতক্ষণ চল্‌লো, নানা রকমের বিস্তর বাজে কথা। সময় কতটা কাটলো ঘড়ি দেখিনি; হঠাৎ আড়চোখে চেয়ে দেখি, মেয়েটি সেখানে নেই। এদিক্ ওদিক একবার ফিরে তাকালাম, বড় বড় নৌকোগুলোয় ঠেকে দৃষ্টি মাঝে মাঝে কেটে যায়,—দেখা গেল না।

বন্ধুবর সূর্য্যাস্ত শোভার ব্যাখ্যা সুরু করছিলেন, আমি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বল্লাম, "চলুন না, একটু ঘুরে আসি!"

চারিদিকে একবার তাড়াতাড়ি দৃষ্টি হেনে চল্‌তে সুরু করলাম পূবমুখো। মেয়েটি তেম্নি মন্থর গতিতে যাচ্ছিল ঢেউএর কিনারা দিয়ে দিয়ে, আমি চল্লাম উঁচুতে সমান্তরাল রাস্তার পথে।

বেলাভূমিতে জনতার অন্ত নেই, ছেলে বুড়ো, মেয়ে পুরুষ, ভদ্র অভদ্রে একাকার। তারই মাঝখান দিয়ে সে চলেছে একা নিঃসঙ্গ, নিঃসঙ্কোচ, কোনওদিকে দৃক্‌পাত নেই। কারো সাথে কথাটি কইছে না।

যাচ্ছিল পূবের দিকে, একবার ফিরে তাকালে পশ্চিমাকাশের পানে। সূর্য্য লাল হয়ে উঠেছে—আগুনের বদলে সিঁদূর। একটু একটু ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মেঘ বারেক তার মুখের ওপর ঘোমটা টেনে দিচ্ছে, বারেক খসাচ্ছে। মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ালো। যে পথ বেয়ে এসেছিলো সেই পথে আবার ফিরে চল্‌লো—তেম্নি ধীরে, তেম্নি নির্ব্বিকার।

বন্ধুবরকে ইতোমধ্যে আমি বিদেয় করেছি। মিনিট কয়েক সমুদ্রমুখো হয়ে অকারণে দাঁড়িয়ে রইলাম, তারপর আস্তে আস্তে ফিরলাম।

এগোলাম না বেশীদূর। মেয়েটিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। উঁচু বালুর ঢিপি অতিক্রম করে রাস্তা পেরিয়ে সে ঐ বাড়ীর দেয়ালের ওধারে ঢুকে গেল।

সূর্য্য সঙ্গে সঙ্গে ডুব মারলে নীলজলের তলায়।

সকালবেলা।—

সমুদ্রতীরের রাস্তায় এসে পড়লাম আমি আবার।

ওদিক্‌কার ঐ মস্ত হোটেলটার সাম্নেকার বালিতে দেখা যাচ্ছে কার পিঠের ওপর জড়ানো শাড়ীর আঁচল, মাথার আধখোলা খোঁপা। ঐ না?—সূর্য্য উঠেছে জ্বল্ জ্বল্ করে; কপালে হাতটা আড়াল দিয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ সেই-ই বটে।

পাশে একটি বৌ বসে কথা কইছে। একটি ছোট্ট খুকী খানিক দূরে বালুর পাহাড় তৈরী কর্চ্ছে, আবার নিমেষে ভূমিসাৎ করে দিচ্ছে উড়িয়ে। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা গেল বৌটির সঙ্গে গল্প হচ্ছে।

রোদ উঠেছে ঝাঁ ঝাঁ করে। আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অতিষ্ঠ লাগছে। পকেট থেকে একখানা রুমাল বের করে মাথায় বেঁধে ওদের খানিক পেছনে, ওপরে বড় নৌকোটার ছায়ায় বসে পড়লাম।

পরদিন বিকেলবেলা মেয়েটি যথারীতি আবার বেরুলো। যথারীতি আমিও ছিলাম প্রতীক্ষায়। বালি ভেঙ্গে নীচে নেমে সে ধরলো পশ্চিমের রাস্তা। আমিও পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়ালাম, চেয়ে রইলাম যতদূরে দৃষ্টি যায়।

চলেছিলো একা, নির্ব্বাক্। হঠাৎ কে এসে জুটলো। কে আবার? কোলে একটি খোকা না খুকী দেখা যাচ্ছে না? কালোপেড়ে শাড়ী! কালকের সেই বৌটি বুঝি আবার?

আমি এগিয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ ধরে দুজনে একসঙ্গে পাইচারি কর্চ্ছে, গল্প কর্চ্ছে, মেয়েটি হাস্‌ছে।—আমার চোখকাণ খাড়া হয়ে উঠলো। দাঁড়াও না, মজা দেখাচ্ছি! অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

সূর্য্য অস্ত না যেতে মেয়েটি ঘরে ফিরে এলো। আমি এবার আর তার পেছনে গেলাম না এগোলাম সোজা—দেখি বৌটি কোথায় যায়!

ঢুকলো হোটেলে। সঙ্গে তার একটি ভদ্রলোক।—আমি পেছন থেকে ধরলাম তাকে, "মশাই শুনুন ত?" ভদ্রলোক চম্‌কে ফিরে তাকিয়ে বল্‌লেন "আমাকে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

বল্লাম, "আপনার স্ত্রী এইমাত্র যাঁর সঙ্গে গল্প করে এলেন, তিনি আপনাদের কে হন?"

প্রশ্নটা নিতান্তই বোধহয় বেখাপ্পা শোনালো; তিনি কি রকম ভাবে আমার পানে তাকিয়ে বল্লেন, "কে আবার হয়? কেউ হয় না তো?"

আমি গম্ভীরভাবে বল্লাম, "তাহলে আপনার স্ত্রীকে সাবধান করে দেবেন, ওঁর সঙ্গে আর যেন কথাবার্ত্তা না বলেন।"

ভদ্রলোক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। কোনও প্রশ্ন করবার আগেই আমি আবার বল্লাম, "আরও একদিন আমি দেখেছি। মেয়েছেলে বলে প্রথমদিন কিছু বলিনি; ব্যাটাছেলে হলে তখুনি পুলিশে report কর্ত্তাম।—উনি রাজবন্দিনী। বুঝলেন?"

ভদ্রলোকের মুখ শুকিয়ে এলো। অত্যন্ত জড়সড় হয়ে আমাকে বল্লেন. "দেখুন, এবারটি রেহাই দেবেন। আমরা নতুন এসেছি কিছু তো জানি না। তাছাড়া আমার স্ত্রী মেয়েছেলে এসবের বোঝেন না কিছুই। আমি এক্ষুনি তাঁকে সাবধান করে দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আর এমন হবে না।"

"আচ্ছা, খেয়াল রাখ্‌বেন।"

দিনের পর দিন যায়। সে রোজ দুবেলা বেরিয়ে আসে, আমি রোজ দুবেলা দেখি। নুতন কিছুই ঘট্‌ছে না,—কেউ তার কাছে আসে না, সে-ও কথা কয়না কারো সাথে।

সেদিন বিকেলবেলা সে ছিল বালুর ওপর বসে। খানিকবাদে সেই বৌটি যাচ্ছে ঠিক তার সামে দিয়ে। মেয়েটি তার দিকে চেয়ে হাস্‌লো; বৌ চোখের নিমেষে চোখ ফিরিয়ে—যেন তাকে দেখতে পায়নি এমনি ভাণ দেখাবার ব্যর্থ প্রয়াস করে—তাড়াতাড়ি খুকীটাকে সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে ব্যস্ত হয়ে ত্রস্তপদে প্রস্থান করলে। আমি কৌতুক অনুভব করলাম। দেখ্‌লাম মেয়েটি কতক্ষণ তার পলায়নশীল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি ফেরালে।

ঢেউএর ধারে ধারে বেড়ায় আর ঝিনুক কুড়িয়ে হাত ভর্ত্তি করে, কদিন ধরে এই দেখছি তার কাজ। সেদিন দেখলাম কুড়োতে কুড়োতে অনেক দূরে চলে গেছে। আমাকে উঠতে হল।

আস্তে আস্তে পেছন পেছন এগিয়ে গিয়ে খানিক ব্যবধানে দাঁড়ালাম। দেখি, দুটি ছোট ছেলেমেয়ে ছুটোছুটী আর বালি ছেঁড়াছুড়ি কর্চ্ছে, খেল্‌ছে। মেয়েটিরগতি থেমে গেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সস্নেহচোখে তাকিয়ে দেখছে সেই খেলা। খোকাটী গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো প্রায় ওর পায়ের কাছে। ও হেসে হাত ভর্ত্তি ঝিনুক ঢেলে দিলে খোকার হাতের মুঠোয়।

খোকাখুকী ঝিনুক নিয়ে মেতে গেলো ; মেয়েটী ফিরে এলো কথাটী না বলে। সূর্য্যাস্ত-গগনের পানে তাকিয়ে একবার দেখলে, সন্ধ্যে হয় হয়।

কি জানি কেন, আমার দিকে চোখ পড়ে গেলো তার। চোখ পড়লো বল্লে ভুল হবে, চোখ ফেরালো সে ইচ্ছে করেই। অনেকক্ষণ ধরে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো। এই প্রথম। এর আগে আর কোনও দিন তার সঙ্গে আমার চোখের ঠোকাঠুকি হয়েছে মনে তো পড়ে না। তরুণীর চোখের দৃষ্টির তলায় সঙ্কুচিত হবার লোক আমি নই,—পাঠক'সে ভয় করবেন না,—কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম।

কি দেখ্‌লো, কি ভাবলো সে, জানি না। আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে আবার যেম্নি চল্‌ছিলো, তেম্নি চলা সুরু করলো! কপালের চুলগুলো তার হাওয়ায় উড়ছে, মুখে আলো ফেলেছে অস্তরবির রক্তরাগ।

আমি এসে বসে আছি চারটের সময়! ওর আর বেরোবার নামটি নেই। জেলেদের দড়ির ঢিপিতে ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত হয়ে কতক্ষণ যে ধন্না দিয়ে রইলাম, তার আর শেষ হয় না। দুত্তোর!

কতক্ষণ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলাম, খানিক চোখ বুঁজলাম। হঠাৎ যখন চোখ চেয়েছি, দেখি সে ঠিক আমার সাম্নে হাত পনেরো দূরেই বসে। আমাকে দেখেনি বোধ হয়, তাহলে অত কাছে নিশ্চয় বসতো না। আমি এক দৃষ্টে চেয়ে রইলাম। এত কাছে থেকে ওকে আর কোনদিন দেখিনি।

ওর মুখের চোখের প্রত্যেকটা ব্যঞ্জনা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখ্‌ছিলাম পরীক্ষকের চোখ নিয়েই কিন্তু খানিকক্ষণ বাদে হঠাৎ কী রকম যেন আমার লাগলো। ওর মুখময় কী একটা করুণ প্রশান্তি! প্রশান্তি বল্‌ব ?—না শ্রান্তি, না বিষাদ, না আর কি ? বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, ও সারাদিন বসে বসে কি ভাবে ? দিন রাত্রি, সকাল সন্ধ্যা একলামনে কি নিয়ে কাটায় ?

মেয়েটি অনেকক্ষণ পরে একবার নড়ে চড়ে বস্‌লো। ভাবলাম এইবারে উঠ্‌বে বুঝি, কিন্তু উঠলো না—ঠাঁয় বসে রইলো সেইখানে সেই একই ভাবে, যেন পাষাণ প্রতিমা।

রইলাম আমিও বসে। ও বন্দিনী, আর আমি পেয়েছি ওর রক্ষীর পদ ; কিন্তু নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে ওই আমাকে! ও বস্‌লে বস্‌তে হয়, উঠলে আমরাও না উঠে উপায় নেই। খেলা এক মন্দ নয়!

আর সময় কাটে না! ঘণ্টা দু'তিন ধরে এম্‌নি বালির ওপর শুয়ে আছি। একটা অসহায় তরুণীকে সাম্‌নে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্ব্বাধে, নির্ভয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকার সুযোগ পাওয়া খুবই রোমাণ্টিক বটে সন্দেহ নেই ; কিন্তু আর ধৈর্য্য থাক্‌ছে না আমার। মাথা

উঁচিয়ে পশ্চিমের আকাশপানে তাকিয়ে দেখলাম, সূর্য্য ডুবতে আর কত দেরী। মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সময় উৎরে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছি, কি গো সুন্দরি এখনও ফিরবে না ঘরে? হাতকড়া পরতে চাও?

সে যেন হঠাৎতন্দ্রা ভেঙ্গে উঠলো। আকাশের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকালো, তারপরে একবার এদিক্ ওদিক্, তারপরে একেবারে আমার মুখের দিকে। চকিত দৃষ্টিতে আমাকে দেখে নিয়ে মুহূর্ত্তে সে উঠে পড়লো। সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে একবার শেষ দৃষ্টি ফেলে দ্রুত অথচ পরিমিত পদক্ষেপে ঢুকে পড়লো দেওয়ালের গণ্ডীর মধ্যে।

কদিন ধরে লক্ষ্য করছিলাম, আবার একটা কে আঠার উনিশ বছরের মেয়ে ওর কাছে আনাগোনা সুরু করেছে। যখনই সমুদ্রের তীরে ওর সঙ্গে দেখা হয়, তখনই সে ওর সঙ্গ নেয়, ওর সাথে সাথে ঘোরে। একটা বিহিত কর্ত্তে হবে।

সেদিন বিকেলবেলা বন্দী মেয়েটির জন্যে বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করে করে কখন যেন বালির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গলো জেলেদের চেঁচামেচি ও ঝগড়ায়; তাড়াতাড়ি চোখ রগড়ে এদিক্ ওদিক চেয়ে দেখি, মেয়েটি আমার পিছনদিকে বেশ খানিকটা ওপরে বসে, আর সেই আঠার উনিশ বছরের মেয়েটা গল্পগুজব শেষ করে ফিরবে বলে সবে মাত্র উঠে দাঁড়িয়েছে। আমি কটমটিয়ে তাকালাম দুজনের দিকে। কিন্তু বন্দিনী কিছুমাত্র ভড়কালো না, পরিষ্কার চোখে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলো।

ছোট মেয়েটা ততক্ষণে রাস্তা ধরে চলেছে। আমি উঠে পড়লাম। বন্দিনীকে অতিক্রম করে সোজা রাস্তায় উঠে পেছন থেকে তার নাগাল নিয়ে ডাকলাম, "আপনার বাড়ী কোথায়?"

মেয়েটা কেমন ঘাবড়ে গেল। আমি বল্লাম, "আপনি রোজ রোজ ঐ মেয়ের কাছে যান কি কর্ত্তে? জানেন না, ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে মানা?" মেয়েটী থতমত খেয়ে বল্লে "কৈ জানি নে তো?"

"জানেন না! সবাই জানে আর আপনি জানেন না? দেখেন্ কখনো কাউকে ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে? আর যাবেন না ওর কাছে। তাহলে পুলিশে ধরবে আপনাকে।"

মেয়েটী ভীত হোয়ে উঠ্‌লো।

আমি বল্লাম, "চলুন আপনাদের বাড়ী কোথায় দেখিয়ে দেবেন। বাবা আছেন তো বাড়ীতে?"

ঘাড় নেড়ে সে জানালে, আছেন।

রাস্তা দিয়ে মেয়েটী সঙ্গে যেতে যেতে একবার পিছন পানে ফিরে তাকালাম। দেখি, বন্দিনী সেইখান থেকে বসে বসে একদৃষ্টে আমায় দেখ্‌ছে।

দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস। বিশেষ কোনও উপদ্রব ওকে নিয়ে আমার আর হচ্ছে না। রোজ সূর্য্য ওঠবার পরে সে ঘর থেকে বাইরে বেরোয়, সূর্য্য না ডুবতে রোজ ঘরে

ফেরে। কথাও বল্‌তে দেখি না কারো সঙ্গে, কেউ ওর কাছে এগোয় না। একদিন এসেছিল একটা কে ছোক্‌রা, তৎক্ষণাৎ তাকে ভয়ঙ্কর শাসিয়ে দিয়েছি। আর আসে নি।

আজ বিকেলবেলা একলা একলা তেম্নি ভাবে অনেকক্ষণ পায়চারি করে মেয়েটি অবশেষে দাঁড়ালো জলে পা ছুঁইয়ে। ঢেউয়ের ওপর ঢেউ এসে পা দুটোতে অবিরত লুটিয়ে পড়ছে, সে বুকে হাত বেঁধে মাথা উঁচু করে সোজা দাঁড়িয়ে আছে নির্ণিমেষ সাগরের পানে চেয়ে। বেলাভূমি দিয়ে যেতে যেতে একটি প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা ওকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন; তারপরে থেমে জিজ্ঞেস করলেন, "একলা যে? সঙ্গীসাথী কৈ মা?"

মেয়েটি সামান্য একটুখানি হেসে বল্লে, "সঙ্গী নেই।"

"কেন মা? জুটিয়ে নাও না কাউকে?"

ও আর উত্তর দিলো না। একটু হেসে ভদ্রমহিলাকে এড়িয়ে চলে এলো।

চেয়ে চেয়ে আমার আজ মনে হ'ল, সত্যি ওর সমস্ত মূর্ত্তিখানি কী এক পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতার ছবি।

অনেকদিন যায়। ওর রকমসকম চালচলনে সন্দেহজনক দেখা যাচ্ছে না কিছুই, তবু কড়া নজর রাখতে হয়,—সাহেবের হুকুম। ওরও শাস্তি আমারও শাস্তি।

ও হাঁটতে হাঁটতে আজ চলে গেছে অনেকদূর। আমিও চলেছি সাথে সাথে ওপরকার রাস্তা দিয়ে। অবশেষে ও থাম্‌লো,—এইখানে ওর গতির সীমানা, আর পা বাড়াবার হুকুম নেই।

ও বসে পড়লো শেষ সীমানার ঢালু-হয়ে আসা বালুর তটে। আমি অগত্যা খানিকদূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুক্‌নো বালুর প্রান্তরের মধ্যে অকারণে ঝিনুক কুড়োতে লেগে গেলাম।

রাস্তা থেকে একটি পরিচিত বন্ধু আমায় দেখতে পেয়ে এগোল। সে আমায় ভালো করেই চেনে, অর্থাৎ আমার পেশা জানে। জিজ্ঞেস করলে, "কিহে, এই রোদ মাথায় নিয়ে মরুভূমির মধ্যে ঝিনুক কুড়োবার সখ কেন হঠাৎ?"

হেসে বল্লাম, "এমনি।"

"আশ্চর্য্য! বুড়ো বয়সে আবার শিশু হতে সুরু কর্লে নাকি?"

আমি চকিতে একবার মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নিয়ে বল্লাম, "এসো বসা যাক্।"

বস্‌তে বস্‌তেই বন্ধুবরের চোখ পড়লো ওর দিকে। সহাস্যে বলে উঠলো, "ও, তাই বল! এই জন্যে?"

আমি হেসে মাথা নাড়্‌লাম।

বন্ধু আমার পিঠে চাপড়ে বল্লে, "তোমার বরাৎ ভালো।"

বল্লাম না কিছু।

সে বল্লে, "সত্যি নয় ? এমন নিরালা সাগরসৈকতে অমন একটা তরুণীর মুখের পানে অনিমেষে চেয়ে থাকতে পাওয়ার সৌভাগ্য। রাত্রিদিন একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া !"

ওর এই রসিকতা আজ আমার ভালো লাগলো না। বড্ড ভালগার মনে হল। আমি পাঠকের কাছে ভালোমানুষ সাজবার চেষ্টা করছি না, অকপটে স্বীকার কচ্ছি, আমার নৈতিক রুচি এর চাইতে বেশী মার্জ্জিত নয়। অন্যদিন হলে সাগ্রহে এর রসালাপে যোগ দিতাম, হয়ত দিয়েছিও এর আগে কোনও কোনও দিন। কিন্তু আজ পারছি না। কিছুদিন থেকে কেমন যেন একটু একটু করে ওই বন্দী মেয়ে আমার হৃদয়কে স্পর্শ করছে। হৃদয় বলে আমার বিশেষ যে একটা কিছু আছে, এ বোধ বা বিশ্বাস আমার ছিল না কোনকালে। কিন্তু আছে হয়ত। ওর বন্দিত্বের দুর্দ্দশা তাই কেমন একটা সহানুভূতি জাগিয়ে তুল্ছে মনে। পাহারা দিতে হয় তাই দিই ; ওর গতিবিধি শাসন কর্ত্তে হয়, তাই শাসন করি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক্ বাধ্য হয়ে ওকে যতখানি নিপীড়ন আমার কর্ত্তে হচ্ছে, তার তো উপায়ান্তর নেই ; কিন্তু অনর্থক তার বাড়া অপমান ওকে কর্ত্তে আমার স্পৃহা হচ্ছে না।

সেদিন সাগরতীরে যখন এলাম, কোথাও আর ওকে খুঁজে পাচ্ছি না। এপাশে ওপাশে, ওপরে নীচে, যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম ; ওর ঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে ঘুরে গিয়ে খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে কটাক্ষ হান্‌লাম। কোথাও নেই। গেল কোথায় ?

অগত্যা আমি আন্দাজে চল্লাম শ্মশানের পাশের রাস্তা ধরে পশ্চিমপানে। লোকের জনতা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে ; সবাই ছুটেছে সমুদ্র মুখো, এদিকে আসেনা কেউ বড় একটা। অনেক দূরে এগিয়ে এলাম,—ডাইনে জেলেপাড়া, বাঁয়ে শ্মশানের ছোট বড় মঠের চূড়ো দেখা যাচ্ছে, তারপরে শুধুই বালুস্তূপ, আরও ওধারে সমুদ্র।

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ আজ! শাদা ফেনপুঞ্জ যেন কালো পাহাড়ের চূড়োয় বরফের আস্তরণ ! এই নির্জ্জন প্রান্তরে শ্মশানের নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, ওই সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস—দেখতে ভালো লাগছে।

কিন্তু কবিত্ব করবার ধাতই আমার নয় ; সুতরাং বেশীক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হল না, এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে ফিরব ফিরব করছি। হঠাৎ চোখ পড়ে গেল,—অদূরে একটা ভাঙ্গা দালানের ভাঙ্গা পাঁচিলের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে কে ? চিনে ফেলেছি।

অনেক উঁচুতে ওই পাঁচিলটা, বালুর পাহাড়ের একেবারে শিখরসীমায়। নীচে সমুদ্রতট থেকে ওপরে তাকিয়ে দেখলে মনে হয় যেন কোন্‌কালের কোন্ রাজপুরীর দুর্গপ্রাকারের ধ্বংসাবশেষ ! দেওয়ালের ফাটল ভেদ করে ছোট ছোট কাঁটাগাছ বেরিয়েছে, কতগুলো বুনো লতার গায়ে হল্‌দে রঙের কতগুলো ফুল। তারই গায়ে অঙ্গ এলিয়ে হাঁটুর ওপরে হাত দুটো জুড়ে মেয়েটি বসে আছে। আর কোথাও কোনও জনমানব নেই। থাকবার মধ্যে সম্প্রতি আছি শুধু আমি—অলক্ষ্যে, অন্তরালে। দেখে মনে হচ্ছে, যেন সেই উপন্যাসের যুগের শৃঙ্খলিতা রাজবন্দিনী।

বটেই তো! রাজবন্দিনী তো বটেই! তফাৎ শুধু সেকাল আর একাল! কী রকম অদ্ভুত লাগলো।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করলাম। দেখলাম ও শ্রান্ত চোখে অপলকে সমুদ্র দেখছে। অনেকক্ষণ পরে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম না, কিন্তু বুক ফুলে উঠছে দেখলাম।

আমার বুকেও অকস্মাৎ কী দুলে উঠলো জানিনা। ভয়ঙ্কর একটা আবেগ এলো,—অদম্য, সাম্‌লাতে পারছিনা। দু তিন মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করলাম; কিন্তু ঠেকাতে পারলাম না। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলাম ওর কাছে, ওর পাশে।

ওর যেন তন্দ্রা ভাঙ্গলো। মুখ তুলে ও আমার দিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু আশ্চর্য্য! এতটুকু চম্‌কালো না, ভয় পেলো না। কেবল জিজ্ঞাসু চোখে আমার চোখের উপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, তীক্ষ্ণভাবে।

ঘাবড়ে গেলাম আমিই। কেন এসেছিলাম, কি ভেবে—ভুলে গেলাম, অথবা বুঝতে পারলাম না। মনে মনে অপ্রতিভ হয়ে, মুখরক্ষার চেষ্টায় বলে ফেল্লাম, "এতদূরে একা এসে বসাটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না আপনার। চারিদিকে লোকজন নেই, বিপদ আপদ ঘটতে পারে বা দৈবাৎ!"

মেয়েটি ঠোঁটের পাশটা কী রকম করে একটু কুঁচ্‌কে অবজ্ঞাভরে মুখ ফেরালো; আবার চেয়ে রইলো সমুদ্রের দিকে। আমি অপেক্ষা করছিলাম ওর জবাব শুন্‌বার জন্যে? কিন্তু ও কোনও উত্তর দিলে না, একটু নড়ে পর্য্যন্ত বসলো না।

বোকার মত আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। এমন ভয়ঙ্কর অপমান বোধ হলো, যে ইচ্ছে করলো ওকে দুইহাতে দলে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিই। কী স্পর্দ্ধা মেয়েটার! ইচ্ছে করলে এই মুহূর্ত্তে আমি ওকে কী না কর্ত্তে পারি!...

কিন্তু কর্ত্তে পারলাম না কিছুই। বল্‌তে পারলাম না একটা কথাও। অক্ষম ক্ষোভে নিজের মনে গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে দূরে সরে এলাম।

বসে বসে চেয়ে রইলাম সমুদ্রের দিকে অকারণে; সমুদ্র দেখছিলাম না, মনে এলোমেলো করে কী যেন কতগুলো অনুভূতি আস্‌ছে। কী যে ভাবলাম, গুছিয়ে বল্‌তে পারবো না।

অনেকক্ষণ পরে আবার ওর দিকে তাকালাম। ও আমাকে দেখছে না, সাগরের ঢেউগুলোকেও না,—ডান হাঁটুতে কনুই ঠেকিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে মাথা গুঁজে আছে। আমার মনের মধ্যে অপমানের যে আগুন ফোঁস ফোঁসিয়ে উঠছিলো, কেমন হঠাৎ আস্তে নিভে এলো। ওর মৌন প্রতিমার সমস্ত অবয়ব ঘিরে যেন একটা করুণ বেদনার ছাপ। ভারী কষ্ট হলো।

রাগ করছিলাম ওর ওপরে বৃথা। কথা বল্‌তে গিয়েছিলাম, ও কথা বল্লে না। কিন্তু কি করে বল্‌বে, কেনই বা বল্‌বে? ওর কথা কওয়ার অধিকার চারদিক থেকে ধরে বেঁধে সঙ্কুচিত

করেছি আমরাই। বেচারী!—আমার স্ত্রী আছে ঘরে, পুত্রকন্যা আছে, সহর ভরে বন্ধুবান্ধবেরও অভাব নেই, তবু তৃপ্তি হলনা, ওই মেয়েটির সঙ্গে দুটো কথা কইবার অবৈধ লোভ তবু সাম্‌লাতে পারছি না। আর ও? সত্যি, ধারণা কর্ত্তে পারি না।

মাথা নীচু করে ভাবছিলাম।—ওর আগে আরও দুচারজন এমনিতর বন্দীকে এমনিতর সতর্ক পাহারা দিয়ে এসেছি। আবছায়া হয়ে কেমন যেন ভেসে উঠ্‌লো তাদের দুটি একটি পুরোণো মুখ। সবই তরুণ, সবই তাজা প্রাণ!

যৌবনের সমস্ত রক্তবেগের উচ্ছ্বাসকে নিস্তব্ধ করে দমিয়ে রাখবার এই শক্তি ওরা কোথায় পায়?

সকালবেলা সেদিন সমুদ্রতীরে আসতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। বড় রাস্তার মোড় ঘুরে সবে তটভূমির রাস্তা ধরব, এমন সময় সামনে একেবারে মুখোমুখি দেখা ওর সঙ্গে। ও আস্‌ছে রাস্তা দিয়ে এইদিকেই।

ও দেখলো আমাকে। পাশ কাটিয়ে আমাকে অতিক্রম করবার বেলায় ভালো করে একবার তাকিয়ে গেলো।

মাঝখানেই থেমে পড়লাম আমি সমুদ্রতীরে যাবার প্রয়োজন ঘুচে গেছে। সুতরাং মোড়ের কাছে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে ফিরলাম। আস্তে আস্তে পা ফেলে চল্লাম—ওর থেকে হাত তিরিশেক ব্যবধানে পেছনে।

নির্জ্জন রাস্তা, দুধারে ঝাউগাছের সারি। দূরে সমুদ্রের গর্জ্জন ঝাউএর পাতায় প্রতিহত হয়ে শোঁ শোঁ করে ধেয়ে আস্‌ছে, হাওয়া মৃদুতর হয়ে গা ছুঁয়ে যাচ্ছে, বড় মিঠে। একটি দুটি কুলী মাথায় বোঝা নিয়ে মাঝে মাঝে পথ চলাচল করছে, একটা গরুর গাড়ী, রিক্‌শ কদাচিৎ একটা মোটরকার। আর শুধু ও আর আমি।

দীর্ঘপথ—একটানা। ও মন্থরগতিতে চলেছে, চলেছেই—যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা, থাম্‌বার নাম নেই। ওর মেয়েলি চলার ছন্দে পা মিলিয়ে শ্লথপায়ে চল্‌তে চল্‌তে শ্রান্তি ধরে আস্‌ছে আমার।

বাঁদিকে একটা সরু রাস্তা গেছে। হঠাৎ কে সাইকেলবাহী এক ভদ্রলোক সেই রাস্তা দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে বড় রাস্তার মোড়ে ওকে দেখেই সাইকেল থেকে নেমে পড়লো। মেয়েটি একটুখানি সাম্নে এগিয়ে গিছল, বোধহয় পেছন থেকে গলার আওয়াজ শুনেই ফিরে তাকালে। সাইকেলধারী কপালে হাত জুড়ে অভিবাদন দিলে, মেয়েটি প্রতিনমস্কার জানালে। আর মুখ দেখা গেল না, দুজনে বরাবর হেঁটে চললো সাম্নের দিকে আমি পেছনে।

কে হে লোকটা? দেখতে হচ্ছে! মেয়েটীর সাহস তো কম নয়! আমি সঙ্গে আছি জেনে শুনেও আমার চোখের সাম্নে এত বড় স্পর্দ্ধা! পায়ের গতি দ্রুততর করে আমি খানিক

যেতে আবার এদিকে মুখ ফিরিয়ে একটু হেসে কি বলে গেলো।—ও হরি! এযে আমাদের ইনস্‌পেক্টার বাবু !!

আমার মনটা এবং পায়ের গতি কেমন যেন এক মুহূর্ত্তের জন্য থম্‌কে গেল। বন্দী মেয়ের সঙ্গে কী এত সহাস্য গল্প হচ্ছিল ওঁর ?

ঈর্ষ্যা হল।

এই কদিন থেকে মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাটা আবার প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে। সেদিন সেই নির্জ্জন পাহাড়চূড়ায় ভাঙ্গাপ্রাচীরের কাছে ওর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যানের ধাক্কা খেয়ে অবধি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু কেন? আর কারু সঙ্গেই কথা বল্‌তে ওর আপত্তি দেখছি না—আইনী এবং বে-আইনী—(যতক্ষণ না আমি শাসন করে থামিয়ে দিই), শুধু অধিকার নেই আমারই ? পুলিশ! কেন, ইনস্‌পেক্‌টার বাবু তো দিব্বি গল্প করে গেলেন! আর দিনের পর দিন অহর্নিশ আমার আয়ত্তের মধ্যে, আমার চোখের সাম্নে রেখেও একটা কথা কইবার অধিকার নেই আমার। শুধু দুটো কথা,—আর কিছুতো চাইনে, আর কিছু আশা করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই।

সুযোগ খুঁজেছিলাম।—সুযোগ অবারিতই আছে, বাইরে থেকে বাধা কিছুই নেই, অথচ কেমন যেন এগোতে পারছি না। আশ্চর্য্য।

বিকেলবেলা ও নিত্যনিয়মিত বেরুলো। আমি লাইটপোষ্টের গোড়ায় বসে বসে দেখছি। সেই গম্ভীর মৌনমুখ, সেই পরিমিত চলার ছন্দ।

নীচে নেমে গেল। চললো আমার পায়ের তলার তীরভূমি ধরে ওদিকে। চেয়ে ছিলাম অনিমিষে, কিন্তু বড় নৌকোটা আড়াল করে দিলে।

খানিকক্ষণ ধরেই উঠ্‌ব উঠ্‌ব ভাবছি, এখন পেছনে একবার যাওয়া দরকার,—কতদূর চলে যায় কে জানে? হ্যাঁ, দরকার বটেই। আইনেরও, মনেরও। অথচ এই ডবল দরকারের তাগিদেই পা দুটো কেমন জড় হয়ে আস্‌ছে। এগোতে সাহস হচ্ছেনা। বুক দুরু দুরু করছে।

কতক্ষণ ধরে দোদুল্যমান হয়ে বসে থেকে উঠলাম অবশেষে।

দূরে—অনেকদূরে দেখা যাচ্ছে ওর অতিপরিচিত মূর্ত্তিখানি। শাদা শাড়ীর আঁচল হাওয়ায় উড়ছে। শেষ বাড়ীটির কাছাকাছি এসে বালির ওপর বসে পড়লো।

এইদিকেই মুখ করে সমুদ্রের দিকে চেয়ে ছিলো। কি জানি, হয়ত বা দেখলো আমাকে, আস্তে মুখ ফিরিয়ে সাম্নের দিকে তাকালো।

আস্তে আস্তে পা ফেলে ভাবতে ভাবতে আমি এগোলাম। পথে লোক চলাচল হচ্ছে মাঝে মাঝে, দু'একটি চেনা লোকের সঙ্গেও দেখা হয়ে যাচ্ছে। তারা ভাবছে হয়ত আমি পাহারা দিতে চলেছি।

যেখানে বসেছে ও, তার কাছাকাছি এসে একবার সমুদ্রমুখো হয়ে দাঁড়ালাম। কী গিয়ে বলবো ? কী ভাববে ও ?—পিছন ফিরে ওর দিকে একবার তাকাতেই চোখে চোখ পড়লো।

চলে এলাম একেবারে ওর সাম্নাসাম্নি। নেহাৎই একটা কথা সুরু করবার খাতিরে বল্লাম, "অনেকদূর এসে পড়েছেন !"

ও কথা না বলে শুধু আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। অপ্রতিভের মত আমি সাম্নে দাঁড়িয়ে রইলাম। পা দিয়ে অকারণ বালি খুঁড়তে খুঁড়তে খানিক সময় কাটলো। নিতান্ত দুঃসাহস ভরে অগত্যা বলে ফেল্লাম, "বসবো এখানে একটু, কিছু মনে করবেন না।"

ও কিছুই বল্লো না। যেন কথাগুলো আমি সম্ভাষণ করছি হাওয়ার কাছে। রাগ হতে লাগলো, উত্তরের প্রতীক্ষা আর না করে একেবারে বসে পড়লাম।

ভেবে চিন্তে একটু বাদে জিজ্ঞেস করলাম, "শরীর ভালো আছে আপনার ?"

ও আমার দিকে তাকালো শুধু, মাথাটা একটু তুললো কিনা, তাও ভালো বোঝা গেল না। ক্ষুব্ধ হয়ে আমি এবার সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালাম। ও এমনতর কেন ? হতে পারি আমি পুলিশের লোক, তা বলে মানুষে মানুষে একটা ভদ্রতাও নেই ?

সময় কাটছে ? হয়ত পাঁচ মিনিট, কিন্তু মনে হতে লাগ্‌লো পাঁচ ঘণ্টা।

ওর ইচ্ছাকৃত মৌনতার বর্মে বারবার ঠোকর খেয়ে খেয়েও আমার লজ্জা হল না। আবার বল্লাম অত্যন্ত সাহসে ভর করে, "আপনি এত চুপ করে থাকেন কেন ?"

ও এবারনড়ে বস্‌লো ; গম্ভীর মুখখানা গম্ভীরতর হয়ে উঠলো। আমি ভয় পেলাম। আমার চোখের পানে স্থিরভাবে সুতীক্ষ্ণ চোখ রেখে ও বল্লে, "আমার কথা বল্‌বার অধিকার নেই একথা একথা ভালো করে জেনেও কেন আপনি বারবার কথা কইবার চেষ্টা করছেন ? আপনি না আইনরক্ষক ?"

আমাকে থেমে যেতে হল ক্ষণেকের জন্যে। ওর প্রশান্ত মুখ থেকে এই প্রচ্ছন্ন শ্লেষ আমাকে বিঁধলো যেন ছুঁচের মত।

একটুকাল চুপ করে মাথা নীচু রেখে ধীরে বল্লাম, "না—হ্যাঁ—কিন্তু আমার মনে হয়, এভাবে একা একা থাক্‌তে আপনার হয়ত কষ্ট হয়" !

সম্পূর্ণ শেষ না করেই উত্তরের প্রত্যাশায় ওর দিকে চেয়ে রইলাম।

কিন্তু উত্তর এবার পেলামনা দেখলাম, ওর চোখের কোণে দুটো হঠাৎ কেমন যেন ম্লান হয়ে উঠলো। তারপরে গম্ভীর, তারপরে কঠোর, তারপরে আবার শান্ত। আর কিছু নয়। আমার মনটা ভিজে উঠলো।

জবাব না পাওয়া সত্ত্বেও আবার বল্লাম, "পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতে তো আপনার মানা নেই !—"

কি জানি, হয়ত আমার কথার সুরে কোথাও কোনও মাধুর্য্যের সিঞ্চন ছিল, হয়ত আমার শেষ-না-করা অনভিব্যক্ত লাইনটার পেছনে একটু মিনতির সুর বেজেছে. ওর কাণে ধরা পড়েছে হয়ত। ও কেমন যেন অদ্ভুতভাবে আমার পানে জিজ্ঞাসুচোখে তাকিয়ে রইলো। অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলো আমার মুখ আর চোখ। কি যেন বুঝতে চেষ্টা করছে। আমি সঙ্কুচিত হয়ে পড়লাম। কিন্তু আগ্রহে, প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

গম্ভীর নির্ব্বিকার ব্যঞ্জনাহীন মুখে বল্লে, "হুঁ, পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা কওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু সে পুলিশ হিসেবে, মানুষ হিসেবে নয়!" বলে ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো। তারপরে নেমে চলে গেলো যে পথে এসেছিলো, সেই পথে।

আমার হৃদপিণ্ডে কে মোচড় দিল। নির্ব্বোধের মত চেয়ে রইলাম।—চলে গেলো?

কতক্ষণ ভাবলাম না কিছুই অথবা কী যে ভাবলাম বুঝতে পারলাম না।—'মানুষ হিসেবে নয়'—কথাটা কাণের মধ্যে রণরণিয়ে ফিরতে লাগলো, 'মানুষ হিসেবে নয়!'

সমুদ্র গর্জ্জে চলেছে, উত্তাল তরঙ্গপুঞ্জ কেবলই আছড়ে আছড়ে পড়ছে, আমার আছাড়-খাওয়া মন নিয়ে স্তব্ধ হয়ে সেইদিকে দৃষ্টি মেলে রইলাম। চুয়াল্লিশ বছর বয়সে আজ এই প্রথম 'মানুষ' শব্দটা মানুষের রূপ নিয়ে ধরা পড়লো আমার কাছে। এমন করে মানুষের আসন থেকে নাবিয়ে দিয়ে গেল আমাকে, এমন করে জাতিচ্যুত করে দিল ওই মেয়ে?

মানুষ! মানুষ কি নই আমি? মানুষের অধিকার, মানুষের প্রাণ, মানুষের প্রেম ওর কাছ থেকে এতটুকুও দাবী কর্ত্তে পারিনা? আমার আগাগোড়া সমস্ত জীবনটা কি একেবারে যন্ত্র হয়ে গেছে?

চেয়ে দেখ্‌তে পাচ্ছি, ও চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। জনারণ্যের মাঝখান দিয়ে একলা। সূর্য্য ডুবে এলো।

একলা! সত্যি, এত একলা ও! চোখ ফেরাতে পারলাম না ওর ওই নিঃসঙ্গ প্রতিমাখানি থেকে।—মানুষের অধিকার? তাইত! ওর কাছ থেকে মানুষের ব্যবহার প্রত্যাশা করবার কী অধিকার আমার আছে? না, আমার নেই! ওর চারপাশ থেকে মানুষের সমস্ত অধিকার ও আনন্দ যে আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি, ওর জীবনের সমস্ত রস নিঙড়ে চুষে ফেলিছি! এর পরেও আবার হৃদয়ের সাড়া পাবার আশা কেন? রাস্তা দিয়ে চারধারে এত লোক চলে, কেউ ওরদিকে কৌতূহলভরে ফিরে তাকায়, কেউ তাকায় না, কেউ চেনে ওকে, কেউ চেনে না; কিন্তু তারা সবাই একধারে, ও একধারে; তাদের কেউ ও নয়, তারা ওর কেউ নয়। এত হাসি, এত আনন্দ, এত উৎসব-কোলাহল, কিন্তু ওর তাতে এতটুকু ভাগ নেই। পরিপূর্ণ জনতার মাঝখানে ওর সম্পূর্ণ বিজনতা? বছরের পর বছর ধরে এই অমানুষ জীবন কাটাতে কাটাতে আজও যে ও একেবারে পাথর হয়ে যায় নি, ওই আশ্চর্য্য ঠেক্‌ছে! আজও যে বেঁচে আছে কেমন করে তাই ভাবছি। ওর ওপরে আবার হৃদয়ের দাবী? আর সে দাবী করবার স্পর্দ্ধা করি আমি?

নিজেকে চাবুক মারতে ইচ্ছে হল।

ওর গতিশীল করুণ মূর্ত্তিখানি অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে আস্ছে। ইচ্ছে কর্চ্ছে, ছুটেগিয়ে ওকে বলি, 'ক্ষমা করো'।

সত্যি, আমি আজ ওকে আমার হৃদয়ের মধ্যে এমন স্পষ্ট করে অনুভব করছি, ওর জীবনের সমস্ত বেদনা এত নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করছি, আমি নিশ্চয় জানি, আর কেউ কখনও এমনতর করেনি।—শুধু খাওয়া আর পরা, শুধু শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা, এ তো মানুষের জীবন নয়! এর চেয়ে না বাঁচাও ভালো! বড় তীব্রভাবে অনুভব করছি আজ—সংসারের উৎসবের মাঝখানে ওর এ জীবন্ত সমাধি।

আর নীরবে, বিনা প্রতিবাদে, মানুষের লক্ষ্যের আড়ালে এই পেষণ সহ্যকরছে ও অনির্দ্দিষ্ট-কাল ধরে!—কেন? কিসের জন্য?

বুকের মধ্যে কা যে হচ্ছে আমার বোঝাতে পাববো না। ওগো আমার বন্দিনী, তোমায় কত যে ভালোবাসি! তোমায় নমস্কার, তোমায় প্রণাম! এ শাস্তি যারা তোমায় দিচ্ছে, তারা—তারা—শয়তান!

আমি?—আমিও!



সাহিত্যের বামপন্থা

নরেন সরকার

রূপায়ণের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করতে গিয়ে মানুষের মননশক্তি যুগে যুগে বিড়ম্বিত হয়েছে। শিল্পের উদ্ভব, প্রকৃতি এবং পরিণতি সম্বন্ধে অভিন্নমতের একাধিক মুনি নেই। গলার জোরে এবং বলার ভঙ্গীতে এক একজন এক এক পর্য্যায়ে আসর মাতিয়েছেন,--আখেরে হয়ত এইটুকু বোঝা গেছে যে এ বিষয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই, সবই হোলো,—'Tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.' সাহিত্যের ক্ষেত্রে কলরবটা একটু বেশী শোনা যায়, তার কারণ শিল্পের নানান অভিব্যক্তির মাঝে এর পরিসর এত ব্যাপক যে বিশিষ্ট বৈদ্য ও নিকৃষ্ট হাতুড়ে—কারোই এখানে ভীড় করবার স্থানাভাব হয় না। রূপদক্ষ Laurence Binyon তাঁর Norton Lecture-এর সমাপ্তিতে জিজ্ঞাসা করছেন,—কেউ কি নেই যিনি আর্ট-এর কোন সার্ব্বভৌম সংজ্ঞা দিতে পারেন? নিজেই উত্তর দিচ্ছেন,—"I hope not. For what would the aesthetic philosophers do, their occupation gone ?"

সাহিত্য মানুষকে চাইছে, না মানুষ সাহিত্যকে চাইছে—এই হোলো সমস্যার সংক্ষিপ্তসার। সমাধানের প্রধান বাধা—মানুষেরই সত্যিকার রূপ এখনও উদ্ঘাটিত হয়নি। প্রাচীন যুগে ডেল্‌ফীয় oracleএর প্রবেশ দ্বারে লেখা ছিল, "Know Thyself." 'আত্মানং বিদ্ধি'র অনুশাসন এদেশেও শোনা গেছে, মিশরের ভয়াবহ sphinxএর উদ্ভট প্রশ্নও মানুষকে নিয়েই; তবুও মানুষের মনকে মানুষ আজও চিনতে পারে নি। Aristotle যদিও মানসবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন, তবুও সত্যিকার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-সহযোগে মানুষের মনকে চেনবার চেষ্টা যেদিন থেকে সুরু হয়েছে সে খুব বেশীদিনের কথা নয়। এই চেনার সাথে সাথেই মানুষের সঙ্গে সাহিত্য, তথা শিল্পের প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণীত হবে, সাহিত্য-বিচারের পথ প্রশস্ত হবে।

এ কথা নিঃসংশয়েই বলা চলে যে আত্ম এবং বংশরক্ষা—এই দুই প্রধান সঙ্কল্পের ভিত্তিতেই জীবের সঙ্গে প্রকৃতির চুক্তি। চুক্তিভঙ্গের পরিণাম—প্রকৃতির প্রতিশোধ। এই জৈব-প্রচেষ্টা থেকে মানুষেরও রেহাই নেই, তবে ক্রমবিবর্ত্তনের বিশেষ পর্য্যায়ে পৌঁছে মানুষ পারিপার্শ্বিককে এক নতুন আলোয় দেখ্‌তে শিখল। পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জৈবধর্ম্মের পর্য্যায়েই পড়ে, কেন না এর ব্যতিক্রম ঘটলে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা শিথিল হবে, বিলুপ্তির সম্ভাবনা আসবে। কিন্তু মানুষ যে নিছক জৈবপ্রবৃত্তিকে অতিক্রম করে উচ্চতর মনুষ্যধর্ম্মে বিকশিত হবার আয়োজন বহু পূর্ব্ব থেকেই করছে, তার প্রমাণ আমরা গিরিগুহায় আদি মানবের বাসগৃহে পেয়েছি। প্রত্নতাত্ত্বিকের কৃপায় আজ আর অজানা নেই যে মানুষের অনুসন্ধিৎসা রূপায়ণের ভেতর দিয়ে প্রকাশ খুঁজেছে

বহু যুগ পূর্ব্বে। এ যে কেবল প্রবৃত্তির তাড়নায় তা নয়, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এক অভিনব সম্বন্ধের ক্ষীণ আভাস আদি মানবের মনকে হয়ত বা মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে যেতো। তার কেন্দ্রাভিগ মন কেন্দ্রাতিগ হবার জন্যে ছট্‌ফট্ করতো ; এমন কি মৃতের প্রতিও সে এক নতুন কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ পেতো। Cromlech, dolmen গুলোতে তার সাক্ষ্য রয়ে গেছে। মানুষ ক্রমেই বুঝতে শিখ্‌ছিল সে বিশেষ করে সামাজিক জীব। পারিপার্শ্বিকের ছায়া তার মনের মধ্যে পড়লে, পারিপার্শ্বিকের বিচিত্র রূপ তার মনে অনুরণিত হলে, সমগ্রের মাঝে তাকে প্রসারিত ও পরিস্ফুট করতে না পারলে তার সান্ত্বনা নেই, শান্তি নেই। এ ব্যাপারে মানুষের মন একই ধারাকে আশ্রয় করে চলেছে। আজও নিজের অনুভূতিকে, ভাবনাকে সমাজের মাঝে সংক্রামিত করাতেই তার আনন্দ, তার শিল্পের মূল উৎস। মানুষের রূপকারিতাকে বুঝতে হলেই তার সামাজিকতাকে একান্ত করে স্বীকার করা চাই। শিল্পের ক্ষেত্রেও কবি-দার্শনিকের এ কথা সত্যি যে,—'Man has to outlive his life in order to live in truth'—কিন্তু সে জীবনকে অতিক্রম করছে তার গোপন মনের গহনচারী কোন অজানার ইঙ্গিতে নয়,—'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' যে অজানাকে রচনা করতে হয়েছে। এ অতিক্রমের তাগিদ তার সমাজজীবনের ভিতরেই নিহিত রয়েছে। আর্ট হোলো expression, কিন্তু নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে নয়। এ বহিঃপ্রকাশের উদ্দেশ্য সব সময় সুগোচর না হলেও অবর্ত্তমান নয়। 'পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে, যদিও কেউ নাহি শোনে তুই গেয়ে যা গান অকারণ।' কবির কাছে পাখীর গানের মর্ম্মার্থ ধরা পড়েনি। সে দোষ কবির, বৈজ্ঞানিকের নয়। পাখীর পুচ্ছের বর্ণ, কণ্ঠের 'গান' জীব-ধর্ম্মকে কতটুকু অভিব্যক্ত এবং জীবনের ক্রমকে কি ভাবে ত্রাণ করছে তা মুগ্ধ কবি চোখ খুললেই জানতে পারতেন। কালস্রোতের উজান বেয়ে চলবার ধৃষ্টতায় অকারণের পাড়িকে স্তব্ধ হতে দেখলে শোকের কিছু নেই।

Plato তাঁর আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কবিদের প্রবেশ-টিকিট দেন নি। এমন কি কবিগুরু হোমর সম্বন্ধেও তাঁর অনুকম্পা নেই, সাহিত্যের সামাজিক ভিত্তিকে তিনি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতেন বলেই সমাজ জীবনের ওপরে সাহিত্যিকের অসীম প্রভাব তাঁকে শঙ্কিত করেছিল। কবিরা অনুকারক, ঈশ্বরের সাধের সৃষ্টিকে তারা ব্যর্থ অনুকরণের মাঝ দিয়ে লোকের সত্য দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঈশ্বরকে আবৃত করে রাখছে—এই হ'ল তাঁর উষ্মার কারণ। কিন্তু দার্শনিকের অন্তরালে যে অনিবার্য্য কাব্যচেতনা গুমরে মরছিল, সে কবিদের ওপর এ অবিচার সইল না Symposium, Ion আর Phaedrus-এর প্রেমিক কবি তাদের জাতে তুললেন। কিন্তু অনুকারক হিসেবে নয়, আধিদৈবিক উন্মাদনার অনুলিপিকার হিসেবে। কবিকে তিনি সমাজ থেকে টেনে এনে এক কল্পিত জ্যোতির্লোকের স্বপ্নাতুর সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। সত্যসন্ধী দার্শনিক আর ভাবাবিষ্ট কবির দ্বন্দ্ব Plato-র জীবনের এক করুণ ট্র্যাজেডী, কিছুকাল গত হল। Aristotle তাঁর অসমাপ্ত অলঙ্কার শাস্ত্রের মাঝ দিয়ে কাব্যকে আবার নৈসর্গিক এবং সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের আলোয় পরীক্ষা করলেন। কবি পারিপার্শ্বিকের অনুকারক,

কাব্যের চরমোৎকর্ষ ট্র্যাজেডীতে, ট্র্যাজেডীর রসোপলব্ধি মনোবিকারের বিরেচনে (Catharsis)। এই বিরেচন 'মনে বনে বা কোণে' সংঘটিত হবার উপায় নেই। কাব্যের এই উপলক্ষণকে যদি pragmatic (ব্যবহারিক) দৃষ্টিমূলক বলা যায় তবে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় না। Aristotleএর কাব্যবিচারের মূল সূত্র আজও অব্যাহত থেকে কাব্যকে তার প্রাণহীন, বায়ুহীন কল্পলোকের অসার্থক এককত্ব থেকে মুক্তি দিচ্ছে। কমেডী-সর্ব্বস্ব সংস্কৃত কাব্যের অন্যতম ট্র্যাজিক কবি রামায়ণ রচয়িতার কাব্যোন্মেষ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তার তাৎপর্য্য হোলো, কেন্দ্রাতিগ সহানুভূতির মাঝেই কবিতার জন্ম, কিন্তু পাশ্চাত্যের কিংবদন্তী অন্যরূপ। ইংরাজের আদি কবি Caedmonএর যুগে চার্চ্চ প্রবলতম প্রতিষ্ঠানহিসেবে মাথা তুলছে। লোকায়ত চিন্তাধারাকে চার্চ্চ-সর্ব্বস্ব করবার তাগিদ তখন অশেষ। গল্প রচিত হল (যার স্রষ্টা, হয়ত ধর্ম্ম-নিয়ামক Venerable Bede)—Whitby মঠের নিরক্ষর রাখাল বালক দৈবাদিষ্ট হয়ে The Beginning of Created things'এর গান রচনা করেছেন, এবং তাইতেই তিনি AngloSaxon-দের আদি কবি। দেবতার প্রতি সম্ভ্রম জাগাবার এ কৌশল সাহিত্যক্ষেত্রের বাইরেও অনেকবার শোনা গেছে, কিন্তু কারণবাদের বিজ্ঞানেই কাব্যের উৎস খুঁজতে হবে—আবেশের মধ্যে নয়, আবেষ্টনীর মধ্যে। কাব্যের মৃত্তিকা সঞ্চারী আর গগনবিহারী—এই দুই ধারার বিবাদ-কোলাহলে সাহিত্যের আকাশ আজও মুখরিত। সাহিত্যের ব্যোমচারী তরণী যখনি অবহেলিত, অপরিলক্ষিত বাস্তবের পুঞ্জীভূত শক্তি দিয়ে তৈরী উর্দ্ধশির পর্ব্বতের সংঘর্ষে এসে S. O. S. বার্ত্তা পাঠিয়েছে, ত্রাণকামীর হয়ত অভাব হয়নি, কিন্তু 'women and children first' ছাড়া কোন শব্দই কাণে এলো না। নারী এবং শিশু—যারা সুমধুর দুর্ব্বলতার দোহাইয়ে বেঁচে গেল, যুক্তির পৌরুষ দিয়ে নয়।

যে অলঙ্ঘনীয় dialectic পদ্ধতিতে সমাজের বিবর্ত্তন সাধিত হচ্ছে, সমাজের প্রতিচ্ছবি সাহিত্যও তা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আদিম সরলতা এবং সাধারণের অধিগম্যতা থেকে কেমন করে সাহিত্য পেশাদারের হাতে এল, মধ্যযুগে সামন্তপদলেহীর সঙ্গ নিয়ে প্রাসাদে এবং কুঞ্জভবনে ঢুকলো, পরবর্ত্তীকালে ধনতন্ত্রের দুন্দুভি হিসেবে প্রভুদের লীলাখেলার প্রচারক হোলো এবং মহাযুদ্ধের কিছু আগে থেকে সুরু করে কি ভাবে অভিজাত সাহিত্য শরশয্যায় কালাতিপাত করছে তার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করবার স্থান এ নয়। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে আর্থার লন্স্‌লট, শার্লে মেইন-রোঁল্যা, King's Quahir এবং Ramon de la Roseএর দিন নিঃশেষে গেছে। গত দিনের কথা স্মরণ করে সাশ্রুনয়নে "Earthly Paradise" রচনা করতে বসার মধ্যে লজ্জা ছাড়া আর কিছুই নেই। Crusadeএর যোদ্ধা মহারাজ লুইকে সেন্ট্ লুই বানিয়ে তাঁর গুণকীর্ত্তন করবার জন্যে কোনো Joinville জন্মাবেন না। Froissartএর মত সাহিত্য-মহারথী হয়ত আবার আসবেন, কিন্তু অভিজাত সমাজের এবং রাজ সভার ইতিহাস রচনা করা তাঁর পক্ষে অবান্তর মনে হবে।

অনিবার্য্যভাবে জগত এগিয়ে চলেছে অনৈক্যকে সংহত করে নতুন ঐক্যকে বারে বারে প্রতিষ্ঠিত করতে করতে। এই স্রোতে অনিবার্য্যভাবে ভেসে উঠ্তে বাধ্য হয়েছিলেন প্রাসাদ-বিলাসী

Froissartএর পরে সত্যসন্ধী Philippe de Comines এবং তার পরে Villon যাঁকে মানুষে আজও আমল দিয়ে আসছে,—কেননা তাঁর "utterances are so poignantty true" নির্ব্বোধ ভাবালুতাকে কশাঘাত করবার জন্যে আবির্ভাব হোলো নির্ম্মম Rabelais এর। অতঃপর যুক্তিবাদ এবং সন্দেহবাদের লড়াই। Montaigne এর নৈরাশ্যবাদ কালের স্রোতে এসে Descarte এর বিজ্ঞানবাদে বিলুপ্ত হল। Moliere, Racineএর হাতে সমাজ নিষ্ঠুরভাবে পরীক্ষিত হতে লাগ্‌ল। এর পরে এক প্রচণ্ড আবির্ভাব। Voltaireএর সাম্‌নে ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের নাভিশ্বাস উঠ্‌ল, Rousseau আতঙ্কে শিউরে উঠে উপদেশ দিলেন, ফিরে চল আপন ঘরে। এলো ফরাসী বিপ্লব, La Marseillaiseএর দিন, পরের পর্য্যায়ে Compte এবং তাঁর Positivism, যেখানে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। তারও পরে ভাবাবিষ্ট romanticism ও ডিমক্র্যাসীর জোয়ার—ইতিহাসের অতি পরিচিত অধ্যায়। অতঃপর এলো তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের মুখোস উন্মোচন ও নিপীড়িতের জন্যে ভাবপ্রবণ সহানুভূতি। বর্ত্তমান ফরাসী সাহিত্যের ধারা—ফরাসী কেন—যেখানেই সমাজ দ্রুতগতিতে বিবর্ত্তিত হচ্ছে সেখানকার সাহিত্যের ধারা—যে কোন্ লক্ষ্যে ছুটে চলেছে তা বোঝা শক্ত নয়। সমাজের গতিবেগ দুর্ব্বার শক্তিতে সাহিত্যকেও বিপ্লবী, বিশ্লেষণমূলক, বামপন্থী করে নিচ্ছে; যে সব সাহিত্য এই শক্তিকে প্রতিরোধ করে Auld Lang Syne গাইছে তাদের মৃত্যু আমরা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি। এই ঐতিহাসিক ক্রম থেকে কোন সাহিত্যেরই নিস্কৃতি নেই—ইংরেজী সাহিত্যেরও নয়। ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজের সমাজ-জীবন ফরাসীর মত দ্রুতলয়ে চলেনি; অতএব সাহিত্যের বিবর্ত্তনও মন্থরগতিতে দেখা দিয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও, আজকের ইংরাজী সাহিত্যে বিপ্লবের রং পরিষ্কার করেই ফুটে উঠ্‌ছে। প্রাক্-ভিক্টোরীয় যুগের সমৃদ্ধি-লালিত স্বপ্নলীন romanticism, ভিক্টোরীয় নীতি ও ধর্ম্মের মুখোস, ভিক্টোরীয় এডওয়ার্ডীয় সাম্রাজ্যপূজা বৈপ্লবিক ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ে মৃত বা ম্লান হল। Clive আর Kipling স্থিত স্বার্থের জপমালায় পাশাপাশি ঠাঁই পেয়ে স্তুত হচ্ছেন, কিন্তু সমগ্র জাতির মনে আর রং ধরছেনা। চণ্ডীমণ্ডপের অধিষ্ঠাতারা হয়ত বাধপন্থী সাহিত্যের নির্ম্মম সত্যবিশ্লেষণকে 'Latrine literature' বলে শ্লেষ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন, যেমন প্রাক্তন যুগে আরও একবার সাহিত্য-প্রাণের নবোন্মেষকে তাঁরা 'Satanic' বলে বর্জ্জন করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসের শিক্ষা হোলো—এঁদের আত্মবিলোপ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। তবে তাঁরা মৃত্যুকে সহজ করে নিতে পারেন নিজ নিজ রুচি অনুসারে euthanasiaর অনুপান আবিষ্কার করে। রূপকথার গাঁয়ে ঢুকতে পারেন Valhalla কি প্রাথমিক সত্যযুগের কথা স্মরণ ক'রে বিরাম নিতে পারেন মাধ্যমিক ধর্ম্মধ্বজীতার পুনরাবির্ভাবের কল্পিত ছায়ালোকে, অথবা লুকোতে পারেন অচল কোনো আর্টের থিওরীর নিরুপদ্রব আশ্রয়ে। 'Passive suffering' আর্টের বিষয়ীভূত হতে পারে না—এই রোমাঞ্চকর উক্তির পরেই ভাবাত্মক গেলিক্ প্রতিভার প্রতিনিধি Yeats বোধহয় বেরিয়ে পড়লেন ঔপনিষদিক তীর্থ পর্য্যটনে। যাই হোক্—যাঁরা আজকের দিনের দক্ষিণপন্থী সাহিত্যকে তার গভীর

নৈরাশ্যবাদ থেকে উদ্ধার করতে চাইছেন কেবল মনের জোরে—তাঁদের বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের মমতা নেই। এ সাহিত্যের এবং তার উপকরণ উপরিস্তন সমাজের পরিণাম হচ্ছে নতুনতর সাহিত্য এবং সমাজের মধ্যে বিলুপ্তি—কোনো El Doradoর পরিকল্পনা করা মস্তিষ্কের বিভ্রাট ছাড়া আর কিছুই নয়।

সমাজভিত্তিক সাহিত্যের নিজস্ব পদ্ধতি হল বাস্তববাদ। দার্শনিকের বস্তুতন্ত্রবাদের সঙ্গে সাহিত্যিকের বাস্তববাদের যে সর্ব্বৈব একাত্মতা আছে তা নয়। জগৎ সৃষ্টির আদি উপাদান কি, অনুপরমাণুর তাণ্ডব-নৃত্য থেকেই দেহ এবং দেহাতীতের ইতিহাস রচিত হল কিনা, অথবা কোন Life Force, Elan Vital বস্তুর নেপথ্যে থেকে বস্তু এবং জীব-কোষকে রূপায়িত করছে কিনা যাতে করে "বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেণা উঠে জেগে"—সে দুর্ভাবনা সাহিত্যিকের চেয়ে দার্শনিকেরই বেশী। বামপন্থী সাহিত্য শুধু এইটুকু চাইবে যে সাহিত্য সত্য হোক্, সমাজ-প্রগতির দর্পন হোক, মানুষের বিচিত্র জীবনধারার বাস্তব পরিচয় তাতে মিলুক। Browningএর How it strikes a contemporaryতে দেখ্ছি রূপকারকে মানুষ গুপ্তচর বলে সন্দেহ করছে। মানুষ এবং তার সমাজের প্রত্যক্ষ আবেষ্টনীর বাইরে গিয়ে Lotus Eaters দের মহিমা গাইবার সাধ যেন সাহিত্যের না যায়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে ছেদহীন, বিরামহীন সংঘর্ষ-সঞ্জাত মানবসমাজের আভ্যন্তরীণ ঘাত-প্রতিঘাত হর্ষামর্ষগুলোকে অবিকৃত, অকৃত্রিমভাবে বর্ণনা করাই বাস্তববাদী সাহিত্যের লক্ষণ। Romanticism এবং classicismএর দ্বন্দের সঙ্গে এর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই, কেননা বাস্তববাদের অমোঘ শক্তি উভয়ের মধ্যেই দেখা গেছে। ইতালীয় নবজাগরণের কবি তাঁর কল্পলোকের মোক্ষধামে পৌছিবার আগে নরক এবং প্রায়শ্চিত্তপুরে ভ্রমণ করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন রাখালিয়া কবি Virgil। নিসর্গ-কবি Virgil এবং স্বপন-পশারী মহাকবির কল্পবিলাস আপাতদৃষ্টিতে অসমঞ্জস এবং অবাস্তব। কিন্তু Danteর নরক-বর্ণনা জনসাধারণের কাছে এতই বাস্তব মনে হয়েছিল যে দূর থেকে তাঁকে দেখে লোকে ভয় পেতো, বল্তো—Behold the man from hells বস্তুতন্ত্রের দিক থেকে নরক একেবারেই অবাস্তব, কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে সেদিন তা 'বাস্তবিক'—real হয়ে উঠেছিল। Realismএর চাবিকাঠি হল objectivity—প্রমাতা যেখানে প্রমেয়ের নেপথ্যে অবস্থিত রয়েছেন। Subjectivity বা অনুভাবকের স্ব-সর্ব্বস্ব ভাবাভিব্যক্তি বাস্তবিকতার পরিপন্থী এবং প্রবলতম শত্রু। La Vinciর কল্পনা এবং সমালোচকের সাধুবাদ নিয়েই 'বিশ্বের প্রেয়সী' মোনা লিসার হাসির হেঁয়ালি তৈরী হয়েছে। সামান্যা La Gioconda উপলক্ষ্য মাত্র সে কথার মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হই তখনই, যখন শুনি—সামান্যার মুখে অসামান্য হাসিটুকু ফোটাবার জন্যে বাদ্যভাণ্ড এবং নানান উপকরণ দিয়ে দিনের পরদিন শিল্পীকে Giocondaর চতুর্দ্দিকে এক আনন্দের আবেষ্টনী গঠিত রাখতে হয়েছিল। ইংলণ্ডের প্রাক্-এলিজাবেথ্—বা এলিজাবেথ্-জ্যাকোবীয় romanticism বাস্তবিকতাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল,—যার মুখ্য উদ্দেশ্য—হ্যাম্লেটের সেই সাবেক কথাটায় বলা

চলে—'Both at the first and now, was and is to hold, as t'were the mirror upto nature'. উনবিংশ শতাব্দীর romantic revivalএ 'Boar's Head' বা 'Mermaid' tavernএর আবহাওয়া ছিলনা—এর পুরোহিতরা 'inward eye' আর 'Bliss of Solitude'এর মাহাত্ম্যে মশগুল ছিলেন। তবুও এ যুগের romantic কবিদের মধ্যে এক Shelleyই বোধ হয় সত্যিকার অবাস্তববাদী বা আদর্শবাদী। সমাজ কি তাঁর কোন অপরাধ নেয়নি? Arnoldএর কথায় এর জবাব আছে,—"Shelley was an ineffectual angel"—যিনি অন্ধকার অন্তরীক্ষে বৃথায় তাঁর জ্যোতির্ম্ময় পাখা ঝাপটে মরছেন।

বামপন্থী সাহিত্যের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে—এ সাহিত্য প্রচারমূলক। ব্রীড়াবনতা অবগুণ্ঠনবতী কাব্যলক্ষ্মীকে 'লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ ভাগ'এর পণ্যশালায় টেনে আনার পেছনে না আছে যুক্তি, না আছে রুচির পরিচয়—এই হোলো ফরিয়াদীপক্ষের উক্তি। এ পক্ষকে এটুকু মনে পড়িয়ে দেওয়াই যথেষ্ট হবে যে, প্রচার যদি ব্যক্তিস্বার্থকে অতিক্রম করে সমষ্টি-স্বার্থে উত্তীর্ণ হতে পারে তবে তা বিপণি-গন্ধী হয়না, শিল্পধর্ম্মী হয়। কোন চিন্তা বা ভাবকে যদি প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করা যায়, তবে তার অভিব্যক্তি অকৃত্রিম হবেই, এবং অকৃত্রিম বিশ্বাস প্রবলভাবে প্রকাশিত হলেই যদি তা 'প্রোপাগাণ্ডা' হয়, তবে 'মহাগ্রন্থ' (Bible) থেকে আরম্ভ করে লিরিক-প্রতিভার চরমোৎকর্ষ Prometheus Unbound পর্য্যন্ত এ অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। অধ্যাপক দাশগুপ্ত আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে কুইনাইনের মহিমা নিয়ে কাব্য রচনা করতে বসা বাতুলতা। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের তুচ্ছ সামগ্রীকে সম্বল করে শিল্পের বিকাশ হয় কিনা, আরামকেদারাকে উপলক্ষ্য করে লেখা Cowperএর 'Task' রসলোকে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে কিনা—এ তর্কের ক্ষেত্র এ নয়, তবে Murilloর 'Melon Eaters' ছবি যদি শিল্প হিসেবে বিশ্ববিশ্রুত হয়ে থাকে, তা'হলে কুইনাইন তরমুজের মত মুখরোচক নয় বলেই সে কোনদিন কোন শিল্পীর লক্ষীভূত হবেনা তা নয়। জীবনকে সম্বল করেই আর্ট, অথচ জীবনের মঙ্গলামঙ্গলের উপাদানগুলি জীবনকে অভিব্যক্ত করলেও আর্ট আর্ট হবেনা,---pragmatic বা utilitarian বলে হীন থেকে যাবে---এ ছুৎমার্গের লজিক্ নেই।

সাহিত্য শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নিয়ে গবেষণা না করে কবি রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত অর্থেই আমরা তাকে গ্রহণ করি, এবং বলতে দ্বিধা করিনা যে, 'যে দেশে সাহিত্যের অভাব সে দেশের লোক পরস্পর সজীববন্ধনে সংযুক্ত নহে'—তাহারা বিচ্ছিন্ন। সমাজপ্রগতির বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ধারা-গুলিকে এক নিবিড় সংহতির ভেতর রূপ দেওয়া সাহিত্যিকের কাজ। সে হিসেবে সাহিত্যিক দার্শ-নিকও বটেন, হয়ত বা কবির ভাষায় 'unacknowledged Legislators of the World'. সাহিত্যিকের দায়িত্ব—বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজজীবনের মূল ধারাকে আবিষ্কার করা, সে ধারার গতিবেগকে সমৃদ্ধ করা। এমন চিন্তাধারার আবেষ্টনী রচনা করা যাতে সমাজ-প্রগতির অনিবার্য,

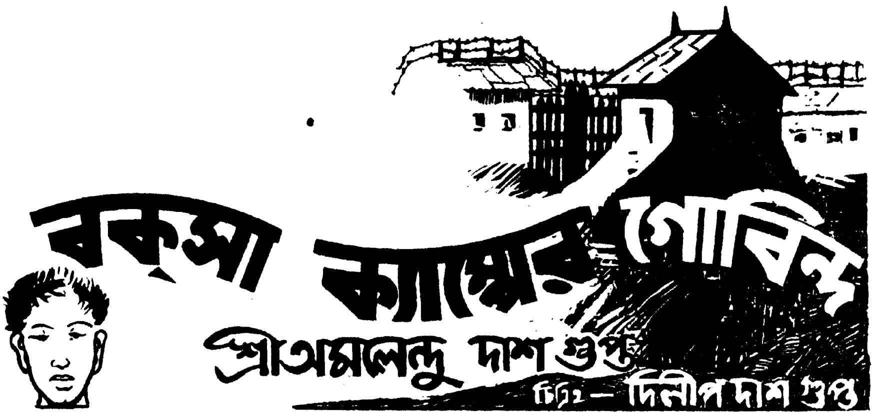
ধারা ব্যাহত না হয়। রোমান্টিক যুগের ভাবসর্ব্বস্বতা, বিশ্লেষণ-বিমুখতা ও ঐকান্তিক আত্মগততায় ক্ষুণ্ণ হয়ে Mathew Arnold কাব্যকে বিশ্লেষণ-পরায়ণ হবার জন্যে জিদ করেছিলেন। কাব্যের কাজ—'Criticism of Life' এবং সমালোচনার কাজ—কাব্যের high seriousnessএর জোগান্ দেওয়া। সমাজেও যেমন, সাহিত্যেও তেমনি—একটা যুগসন্ধি অকস্মাৎ ঘটনা—এমন কি তার বহিঃপ্রকাশও আকস্মিক নয়। Cimabueর Madonna ফ্লোরেন্সের পথে পথে শোভা-যাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হল, আর অমনি শিল্পে এল নবযুগ। Thomsonএর 'Seasons' বন্ধন-মুক্তির সঙ্কেত—এসব উক্তির পেছনে চমৎকারিত্ব আছে, সত্য নেই। সাধারণ মানুষের আকৃতি ধ্যান করে কি ভাবে দেবতার আলেখ্য রচিত হতে লাগল, Fra Lippo Lippiর অভ্যুদয় কেমন করে সম্ভব হল, সে কথা বুঝতে হলে অবশ্য Cimabue বা Giottoকে না চিন্‌লে চল্‌বে না। কিন্তু প্রথমেই সমগ্র রেণেসাঁসএর ঐতিহাসিক পর্য্যায়গুলি জানা চাই। Thomsonএর আমলেও Classicism এর ভেতরে কোথায় আত্মঘাতী গলদ জমছিল এবং পরবর্ত্তী সাহিত্যের প্রস্তাবনা সূচিত হচ্ছিল তার ক্রমিক ইতিহাস রয়েছে, ইতিহাসের শিক্ষাকে হৃদয়গ্রাহী ভাবে সমাজচেতনার সঙ্গে সংযুক্ত করাই সাহিত্যের দায়িত্ব, এবং এ দায়িত্বকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেওয়া সমালোচকের কাজ। Wilde প্রমুখ সৌখীন এস্থেট্‌দের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মুখোস-মাহাত্ম্য (Truth of Masks) বা অসত্যের অবস্থাবিপর্য্যয় ('The Decay of Lying') সম্বন্ধে হর্ষ বা বিক্ষোভ জানবার অবকাশ আর নেই, কেননা—আর্টএর ধারাযন্ত্রে স্নান করলেও যে জীবনের রূঢ়তাকে মুহূর্ত্তের জন্যও পরিহার করা যায়না, একথা ক্রমশঃই ব্যষ্টির জীবনে সত্য হয়ে উঠ্‌ছে। আর্টকে নিরাপদ বন্দর হিসেবে না জেনে দিক্‌-নির্ণয় যন্ত্র হিসেবে জানলে তার স্বরূপ সহজে ধরা পড়বে। যে সমাজ ব্যবস্থায় সাহিত্যের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদা চল্‌তো—'কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু' সে ব্যবস্থার বিলোপের সাথে সাথেই স্থিতিধর্ম্মী দক্ষিণপন্থী সাহিত্যকে রণে ভঙ্গ দিতেই হবে; মনঃসর্ব্বস্ব কলা-কৈবল্যবাদীকেও বল্‌তেই হবে—'এবার ফিরাও মোরে।'

স্বপ্ন

শ্রী........................ ..

কেজো লোকের স্বর্গে জানি ঠাঁই হবেনা কভু
অকেজোদের একটি কোণে স্থান পাবো তো তবু !
আমায় নিয়ে কেজো লোকের পদে পদেই ঠেকা
পথ ছেড়ে তাই সরেই যাচ্ছি গহন কোণে একা
উর্দ্ধশ্বাসে চলছে ছুটে কেজো লোকের রথ
রুটীন বাঁধা সময় তাহার, লোহায় বাঁধা পথ
আমার চলা খুসীর খেলা মানেনা দিনক্ষণ
চললে কেজো লোকের পথে হবেই কলিশন্ ।
তাইতো তারে এড়িয়ে চলে আমার জীবন রথ
সহজ চলার ছন্দে রচি' নিত্যনব পথ ।
কেজো লোকের অষ্টপ্রহর হিসাব দিয়ে ঠাসা
গড় মেলেনা ঢুকলে অকারণের কাঁদা হাসা
কাজ দিয়ে সব ঠাসা তাদের নিরেট জগৎখান
নাইকো ফাঁকা এতটুকুন সর্ষে পরিমাণ !
ঢুকলে ছুটির হাওয়া সেথায়, এক লহমার ভুল,
উল্‌টে যাবে শাস্ত্র-পুরাণ বাঁধবে হুলুস্থুল ।
আমার নাহি কাজের তাড়া, অসীম ছুটী মোর
কাজ ভোলা এই মনের বল মিলবে কোথায় জোড় ?
তাইতো আছি একলা কোণে, একটি ছোট ডেরা
আপন মনের ভুবন-জোড়া স্বপন দিয়ে ঘেরা ।
সামনে আমার শিশু শালের সবুজ প্রাণের খেলা
দুই নয়নে সবুজ আলোর স্বপনখানি মেলা
আকাশ আমায় ঢেকেছে তার পক্ষপুটের ছায়
হালকা মেঘের হঠাৎ খসা পালক ভেসে যায় ।

আমার খেয়াল খুসীর খেলা ক্ষ্যাপা হাওয়ার সাথে
ফুল-ফুটানোর ফুল-ঝরানোর আনন্দেতে মাতে।
ঝর্ণাজলে ভোরের আলো—কচি মুখের হাসি,
ঠিক্‌রে পড়ে সাত রাজার ধন মাণিক রাশি রাশি।
দুলছে হাওয়ায় ক্ষেতভরা ঐ মটর-শুঁটির ফুল
রঙীন্ প্রজাপতি ব'লে হয় যে তাদের ভুল।
দিবস-রাতি ধবলী আর শ্যামলী দুই ধেণু
কোন্ সে রাখাল চরায় বসি বাজিয়ে মোহন বেণু
কোন সে চির-শিশু আপন মনের কুতূহলে
ভাসায় রঙীন্ ঋতুর ভেলা কালের নদীজলে।
সেইতো চির-রাখাল শিশু আমার মনে জুটি
সকল কাজে সারাজীবন আমায় দিল ছুটি।
ঘুমিয়ে স্বপন দেখে সবাই মাটির ধরাতলে ;
কিন্তু যারা জেগেও দেখে আমি তাদের দলে।
কেজো লোকে শুনে বলে, 'ওরে অভাজন
স্বপন দেখে খোয়ালি তোর দামী জীবন-ধন।'
এই জীবনে স্বপ্ন দেখা মিথ্যা নহে ভাই
আমায় যত গুরুজনে শিক্ষা দিল তাই।
লক্ষযুগের এই পুরাণো কাদামাটির ধরা
স্বপন দিয়ে যুগে যুগে নূতন হ'ল গড়া।
এই ধরণীর রঙ্‌টা যখন ফিকে হয়ে যায়
এই জীবনের সোয়াদ পাওয়া যায়না রসনায়
তখন নতুন স্বপন জোগায় নতুন বরণ স্বাদ
স্বপ্ন দেখে তাইতো আমার মেটেনা আর সাধ।



নিমন্ত্রণ পাইয়া আমিও আসিয়া একদিন ক্যাম্পে জমা হইলাম। মাসখানেক হয় বক্সা ক্যাম্পের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সমাপন হইয়াছে কিন্তু ইতিমধ্যেই নিমন্ত্রিতদের দল নরক গুলজার করিয়া লইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া দুইটী কথা বিশেষ করিয়া মনে উঠিল—একটী সরকারের নির্ব্বাচন ক্ষমতা, বাছিয়া বাছিয়া এমন মাল আনিয়াছেন যে তারিফ করিতে হয়, সব কয়টীই এক কারখানায় তৈরী এবং বিশ্বকর্ম্মার হাতুড়ীর ঘা খাওয়া। টিপিয়া দেখিলে ধরা পড়িবে বয়স শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার যতই তফাৎ একের সঙ্গে অপরের থাক না কেন একটী বিষয়ে সকলের বড় পরম সাদৃশ্য রহিয়াছে—প্রত্যেকের মাথায় অল্প বিস্তর একটু একটু ছিট রহিয়াছে। দেখিয়া অতি বড় অন্ধের ও নজরে পড়িবে যে, এদের তৈরী করার আগে মালমশলা ভালো করিয়া চটকাইয়া ছানিয়া লইবার সময়ে খোদ কারিকর খানিকটা ধুতুরার গুঁড়া মিশাইয়া লইয়া ছিলেন। কিন্তু সরকার তাদেরই চিনিয়া বাছিয়া আনিয়া এক গুদামজাত করিয়াছেন—কম আশ্চর্য্যের ব্যাপার নহে। দ্বিতীয় কথাটী এই যে, বাংলার বোধহয় কোন গ্রামই বাদ যায় নাই—রাজার দূত রাজ নিমন্ত্রণ নিয়া না গিয়াছে। আগের দিনে স্বয়ম্বর সভায় এমন করিয়াই নিমন্ত্রণ পাইয়া দলে দলে রাজারা আসিতেন।

আমরাও আসিলাম। কিন্তু রাজা স্মরণ করিলেন কেন—এ প্রশ্নটার জবাব আমরা গ্রাম বাসীরাই যে শুধু দিতে পারিলাম না—তা নয়। সহরবাসী বড় বড় নিমন্ত্রিতরাও বিস্তর ভাবিয়া বড় জোর মাথাটা ঘামে ভিজাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু উত্তরের দিক দিয়া সেই আমাদেরই মত অর্থাৎ তাহারাও জিজ্ঞাসা করেন—"কেন এ আহ্বান ?—"

কিন্তু নরকে পড়িয়া দুদিনেই আর দশজনের মত আমিও ভুলিয়া গেলাম—কেন এ আহ্বান। যে ডাকিয়া আনিয়াছে সেই বুঝুক কেন কি কাজের জন্য আনিয়াছে—অন্যের ভাবনা আমরা ভাবিতে যাই কেন। এবং গেলামও না। আমরা রহিলাম আমাদের স্বভাব লইয়া—হৈ হৈ আড্ডা মাতামাতি দাপাদাপি সমস্ত মিলিয়া সে এক মহাকাণ্ড আর কি। খাওয়া দাওয়া বিলিব্যবস্থার ভার রাজার হাতে—আর আমাদের হাতে রহিল—সময়টাকে ব্যয় করিবার ভার। আমাদের দোষে যেন রাজার উৎসবে ঢিলা না পড়ে—অঙ্গহানি না ঘটে—এই একটীমাত্র লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া আমাদের দিনযাপন চলিতে লাগিল।

সেদিন সময়ের যেন পাখা গজাইয়াছিল হু হু করিয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। কোথা হইতে কে এই দিনগুলিকে আকাশে উড়াইয়া দেয়—এবং কোথায় গিয়া এরা আসে এসব অনাবশ্যক কথা আমরা ভাবিতাম না। অবশ্য দু একজন ছিলেন—তাহারা ঘরের ভক্ষণ করিয়া বনের মহিষ তাড়না করিতেন; সৃষ্টির আড়ালে একটা গূঢ় ষড়যন্ত্র কাজ করিতেছে এটা আবিষ্কার করাই ছিল তাদের কাজ। নরকের আগুনে অনেককালো কয়লা পর্য্যন্ত টক্‌টকে লাল হইয়া গেল, কিন্তু এই কয়টী কতিপয়ের রং কোন আগুনেই মোছা গেল না; সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও কুঞ্চিত ভ্রূ ও ললাট নিয়া তাহারা জাগিয়া রহিলেন ষড়যন্ত্রটা ধরিয়া ফেলিবার জন্য।—প্রাণ যমুনায় সে কি জোর জোয়ার আসিয়াছিল—বক্‌সার বন্দীশালাটার গায়ে যেন নেশার ঢেউ লাগিয়া গেল। এতগুলি পাগল মিলিয়াছে—প্রত্যেকের হাতে রোজ এক একটী আনকোরা নূতন দিন মশালের মত জ্বলিতেছে;—প্রাণের অরণ্যে যেন খাণ্ডবদাহনোৎসবে আগুন ধরাইয়া মাতলামি করিতে আসিয়াছে। আর বিহঙ্গ মেলিয়াছে পাখা—অতএব দিনের আলো থাকিতে থাকিতেই মজাটা পূরা রকমে ভোগ করিয়া নেওয়া চাই—এমনই একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় যেন আমাদের পাইয়া বসিয়াছিল।

বক্‌সা ক্যাম্পে সেদিন আমাদের সমস্ত জীবনযাত্রার সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিলে এই তত্ত্বই পাওয়া যাইত—"নলিনী দলজল জীবন টলমল" এবং "চল্‌রে চল্‌রে চল।"

* *	* *	* *	* *

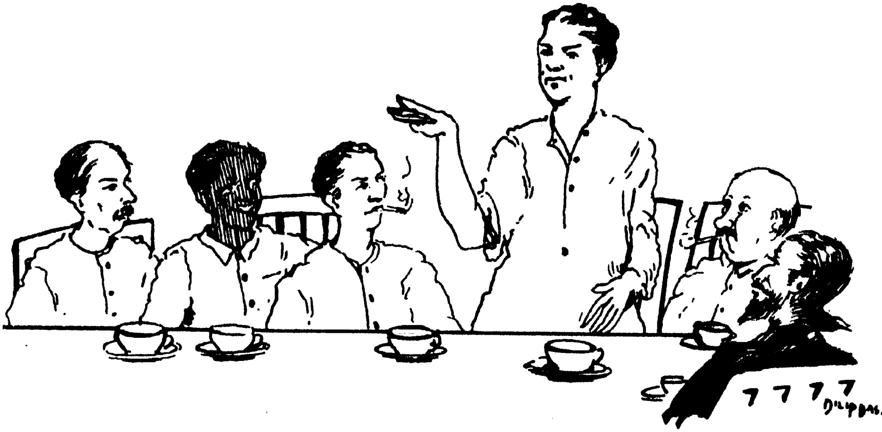
সন্ধ্যায় চায়ের আড্ডাটা ছিল আমাদের Clearance Bankএর মত, সেখানে রোজকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কাণ্ড কারখানাগুলির লেনদেন চলিত। সে আসরে উপস্থিত যে না থাকিত সে হতভাগ্য ক্যাম্পের চলতি স্রোত হইতে পিছাইয়া পড়িত। সুতরাং সন্ধ্যার এই বৈঠকটী বেশ পুরাদমে চলিত কারণ এর সভ্য সংখ্যা সব সময়েই উচ্চে থাকিত—এর কোরামের অভাব কোন দিনই হয় নাই।

একদিন সন্ধ্যায় চা খাইতে একটু দেরী করিয়া ঢুকিয়া ছিলাম। ঢোকার মুখেই উপস্থিত সভ্যেরা অনেকে অভ্যর্থনা করিলেন—এই যে আসুন! আসিলাম এবং আসন গ্রহণ করিতে গিয়া বাধা পাইলাম। ওস্তাদজী, অমর চাটার্জ্জী হাত উচাইয়া আ হা হা করিয়া উঠিলেন বলিলেন, হোথা নয় হোথা নয়, এইখানে আসুন। বলিয়া হাত দিয়া স্থান চিহ্নিত করিয়া দেখাইতে গেলেন,

দেখিলেন সে জায়গাটা ডাক্তার জ্যোতির্ম্ময় শর্ম্মার ভোগদখলে রহিয়াছে। তাহাকে কনুই দ্বারা একটা গুঁতা মারিয়া কহিলেন, সর না ব্যাটা কালোপাতিল, সরে বোস। কালোপাতিল সরিয়া বসিলেন এবং পার্শ্বে টানিয়া আমাকেও বসাইয়া দিলেন। বসিয়া কহিলাম, লালজী চা লে আও। 'এই রে কে আছিস চা দিয়ে যা' বলিয়া অমর চ্যাটার্জ্জী চায়ের রুমের দিকে একটা সশব্দ হাত প্রেরণ করিয়া কহিলেন, ততক্ষণ একটা সিগারেট চলুক, একটা সিগারেট আমার দুই ঠোঁটের মধ্যে ন্যস্ত রাখিয়া তিনি মুখাগ্নিটাও সারিয়া দিলেন। এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া ঘাড়টাকে ঘুরাইয়া আসরটা দেখিয়া লইতে গিয়া দেখিলাম যে, সকলেই উৎসুকদৃষ্টি নিয়া আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। সম্মুখের সিট হইতে খাঁ সাহেব চোখের ইঙ্গিত করিলেন তার অর্থটা ধরিতে না পারিয়া বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চোখটাকে একবার এর পানে আর একবার ওর পানে ফিরাইলাম, অর্থহীন হাসি হাসিতে গিয়াই তা চাপিতে বাধ্য হইলাম। ওস্তাদজী অতি সন্নিকটে ঘেঁসিয়া আসিলেন, বুঝিলাম ইঙ্গিত তাঁরই জন্য। অমর চ্যাটার্জ্জী সবাইকে শুনাইয়া বলিলেন, আর শুনিবার জন্য সকলে রীতিমত প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে, অমলবাবু আপনি কি কেসে? অর্থটা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না কিন্তু তাতে বাদবাকী সবার সশব্দে হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে বাধা হইল না।

"বুঝতে পারলেন না বুঝিয়ে বলছি" বলিয়া অমর চ্যাটার্জ্জী বুঝাইয়া বলিলেন "জিজ্ঞাসা করছি আপনি কোন কেসে ধরা পড়েছেন।" অবাক হইয়া গেলাম এতে হাসির কি আছে। "আপনি খুন চুরি ডাকাতি অথবা বোমা পিস্তলের জন্য এসেছেন, না ত্রিহরণ মামলায়" ওস্তাদজী প্রশ্নটা শেষ করিতে পারিলেন না। সভ্যবৃন্দের উচ্চহাসি ঘরটাকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। চা খাইতে খাইতে ওস্তাদজীর নিকট হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেও আর একবার ব্যাপারটা শুনিয়া লইলেন। ব্যাপারটী সংক্ষেপে এই :

আমাদের রান্নাবান্না ও অন্যানা কাজ কর্ম্মের জন্য বাহির হইতে হিন্দুস্থানী পাচক ও বাঙ্গালী লোকজন আনা হইয়াছিল। (পরে দেউলী, হিজলী ও বহরমপুর ক্যাম্পে জেল কয়েদী দ্বারাই এসব করানো হইত।) গোবিন্দ ছিল এই দলের একজন। দুদিনেই সে ক্যাম্পের ঠাকুর চাকর ও বাবু মহলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। রোগা লোকটী গায়ে একটা খাকি রংয়ের সার্ট পড়িয়া থাকিত, মুখে তার এমনই একটী নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য ছিল যা শুধু থাকার কথা পাথরের দেবতার মুখে। গোবিন্দ কথাবার্ত্তা কম বলিত এবং নিজের মরজি অনুযায়ী চলিত। ধমকাইয়া শাসাইয়া বাবুরা বড় জোর নিজেরা পরিশ্রান্ত হইয়া পরিতেন কিন্তু গোবিন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন দিনই তাকে বিচলিত করিতে পারেন নাই। সেদিন দুপুর বেলা কি একটা কাজে ওস্তাদজী অমর চ্যাটার্জ্জী উপর হইতে নামিয়া চৌকার পাশ দিয়া নীচের একটা ব্যারাকে যাইতেছিলেন, যাওয়ার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তিন নম্বর চৌকার টিফিন ঘরের কাঠের মেঝের উপর ঠাকুর চাকরেরা মধ্যাহ্নের বিশ্রাম করিতেছে। অধিকাংশেই শুইয়াছিল শুধু গোবিন্দ বসিয়া আছে এবং



বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত বাড়াইয়া কহিলেন "ভদ্র মহোদয়গণ—"

কি যেন বলিতেছে। শায়িত শ্রোতার দল বা উপবিষ্ট বক্তা কেহই লক্ষ্য করে নাই যে, বাবু প্রায় দরজার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আলোচনাটা কি চলিতেছে শুনিবার কৌতূহলে ওস্তাদজী চুপ করিয়া দাঁড়াইলেন, শুনিতে পাইলেন গোবিন্দ উবাচ করিতেছে "সব বাবু কি আর সমান। কেউ এসেছেন বোমার মামলায়, কেউ খুনখারাবীতে, চুরি করে এসেছেন এমন বাবুও অনেক আছেন, আর ডাকাতী কেসেও আছেন।" 'তা ছাড়া'—বলিয়া গোবিন্দ একটু সময় নিল শ্রোতাদের মনোযোগ বিশেষভাবে বর্দ্ধিত করিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য। পরে গম্ভীরভাবে বলিল "তা ছাড়া ত্রিহরণ মামলায়ও এসেছেন এমন বাবুও আছেন। সব বাবু কি আর সমান হয় রে---" হিন্দুস্থানী পরশুরাম ও রাম অবতার "ত্রিহরণ" ও আর একি মামলাটা বুঝিতে না পারিয়া বুঝিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলে কে একজন দোভাষী বুঝাইয়া দিল যে, মেয়ে মানুষ চুরি ও তদঘটিত ব্যাপারে ধরা পড়িয়াছে এমন বাবুও এখানে আছেন। "ত্রিহরণ" (স্ত্রী হরণ) ও তেমনি জোরালো ভয়কর শব্দ এই দুইটাকে দুইকাণে লইয়া ওস্তাদজী পালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন---পাছে ব্যাটারা দেখিতে পায়। কোনমতে তিনি ব্যারাকে আসিয়া পৌছিলেন। এবং অতি সল্পসময়েই মুখে মুখে গোবিন্দের এই পরিচয়পত্র ঘরে ঘরে ছড়াইয়া পড়িল। গোবিন্দের এই কীর্ত্তি যেন গোবিন্দকেও হার মানাইয়া দিল অর্থাৎ পূর্ব্ব কীর্ত্তি সব ম্লান করিয়া গোবিন্দ উজ্জ্বলতর ও প্রসিদ্ধতর হইয়া উঠিল।---

ওস্তাদজী শেষ করলেন। তার বলার ভঙ্গীতে এবং বিষয় বস্তুর অপূর্ব্বতায় শ্রোতার দল পরমোৎসাহে অট্ট হাসি হাসিয়া উঠিল। সে হাসির সম্বরণ হইতে সময় লাগিয়াছিল। হাসি যখন সত্যই আসিল তখন ডাঃ জ্যোতির্ম্ময় শর্ম্মা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, বক্তৃতার ভঙ্গীতে হাত বাড়াইয়া কহিলেন "ভদ্র মহোদয়গণ—"

ওস্তাদজী কহিলেন চুপ চুপ, শুনুন সবে।

"ভদ্র মহোদয়গণ আমি একটী প্রস্তাব করিতে চাই"

"করুন, করুন" সমস্বরে সম্মতি দেওয়া হইল।

আমি প্রস্তাব করি যে, গোবিন্দের এই কথাটা যাতে একেবারে মিথ্যা না হয় সে জন্য আমাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের চেষ্টা করা উচিৎ। আমি মনে করি, এই "ত্রিহরণ ও এরজন্য" ওস্তাদজী অমর চাটার্জ্জীই উপযুক্ততম পাত্র। গোবিন্দের কথাটাকে সত্য করার ভার তারই উপর দেওয়া হোক।"

ঘরের মধ্যে যেন একটা পাগলা হাতী ঢুকিয়া সব ওলট পালট ছত্রখান করিয়া দিতেছে চায়ের আড্ডাটা এমনই চেহারা ধারণ করিল। সভা একটু শান্ত হইলে ওস্তাদজী কহিলেন "ও ব্যাটা কালোপাতিল, (শর্ম্মার গায়ের রং সত্যই কালো ছিল, মতি সিং আসিয়াই শর্ম্মাকে ঠেলিয়া সরাইয়া রংয়ের প্রাইজটা দখল করে এবং সেটা আজ পর্য্যন্ত বেহাত হয় নাই হইবে কিনা দেবী ভবিতব্যতাই জানেন।) তুমি কম্বুয়ের গুঁতাটা তবে ভোলোনি।" তারপর সভার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "সত্যই আমি কৃতজ্ঞ যে এই দুরূহ কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন। সত্যই আমিই একমাত্র পুরুষ এখানে আছি যে, এ কাজ করতে পারে।" বলিয়াই পৌরুষ গর্ব্বে বুক বিদারিত করিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দুই একজন ওস্তাদজীকে তাহার ভাগ্যের জন্য ঈর্ষ্যাও করিলেন। গোবিন্দই শুধু বিখ্যাত হইল তা নয় ফলে ওস্তাদজীও চায়ের আসরের সর্দ্দারের পদে আরও কায়েমী পোক্ত হইয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরের ঘটনা। খবর পাওয়া গেল প্যারীবাবু (দাস) রাগ করিয়াছেন, ভোরে টিফিন না খাইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন। পীড়াপীড়ি করিয়াও তার রাগের হেতুটা বাহির করা গেল না গম্ভীরভাবে মুখ বুজিয়াই কাটাইলেন। শেষে এক সময়ে দক্ষিণাদাকে কহিলেন "না, কিছু হয় নি। হয় ঐ ব্যাটা গোবিন্দাকে আপনারা তাড়ান, নয় আমি Hunger Strike করব।"

"গোবিন্দ" শুনিয়াই ওস্তাদজী ও খাঁ সাহেবের চোখাচোখি হইয়া গেল ভাব খানা এই যে, গোবিন্দ যখন জড়িত আছে, তখন নিশ্চয় উঁচুদরের কিছু পাওয়া যাইবে খাঁ সাহেব কহিলেন ওস্তাদ, খবর নিতে হচ্ছে যে।

"সে কি আর বলতে। ব্যাটা বুদ্ধমূর্ত্তি আবার কি আবিষ্কার করল কে জানে।" ওস্তাদজী ও দেশমাৎ খাঁ সাহেব বাহির হইয়া টিফিন ঘরের দিকে গেলেন। দক্ষিণাদা প্যারীবাবুকে আশ্বাস দিয়া গেলেন খবরটা নিয়া তিনি একটা ব্যবস্থা করিবেন আপাততঃ অনশনটা স্থগিত রাখিতে হইবে। প্যারীবাবু অনশন অনাহারে ইত্যাদি মোটেই পছন্দ করেন না, বড় বিপদে পড়িয়াই এই শেষ অস্ত্র সহায় করিতে যাইতেছিলেন ইত্যাদি বলিয়া অনশন প্রতিজ্ঞা মূলতুবী করিয়া রাখিলেন। সন্ধ্যায় চায়ের সভাতে অদ্যকার ঘটনার রিপোর্ট নিম্নলিখিতভাবে ওস্তাদজী



অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন পাঠাইলেন, 'ওখানে কেউ আছে ?'

দাখিল করিলেন এবং প্যারীবাবু ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ায় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত-রূপেই পাশ হইল।

অনিবার্য্য কারণে প্যারীবাবু ভোরের টিফিন ঘরে যথাসময়ে হাজির থাকিতে পারেন নাই। প্রথমে তাহার ইচ্ছা ছিল যে, ভোরের খাবারটা আজ আর গ্রহণ করিবেন না, কারণ গত রাত্রে ভোজনের পরিমাণ একটু গুরু হইয়াছিল, ধাক্কাটা সামলাইয়া নিবার মানসে ভোরের এই লঙ্ঘনটা দিবেন ঠিক করেন। কিন্তু বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করিলেন যে, ভোরের খাবারটা ত্যাগ করা সমীচিন হইবে না। প্রথমতঃ, প্রাপ্য জিনিষ ছাড়িয়া দেওয়া অভ্যাস করিলে মুষ্টি শিথিল হইবার আশঙ্কা আছে, ফলে রাজ্য নিয়া কাড়াকাড়ির লড়াইয়ে তিনি কোন কাজেই আসিতে পারিবেন না। মুঠার যার জোর নাই—তাকে আর যাই বলা যাক যোদ্ধা বলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ সরকারকে সব দিক দিয়াই আক্রমণ করিতে হইবে, তাকে শ্বাস ফেলিবার অবসরটুকু পর্য্যন্ত দেওয়া নাই। তাই খাইয়াই সরকারকে যতটা পারা যায় কাহিল করার নীতি ও অনুসরণ কর্ত্তব্য। তবে রসদ ঘরে আক্রমণ সমান বেগে চালানো চাই—দেখা যাক কতদিন সরকার এই পিণ্ডি যোগাইতে পারে। কথাতেই আছে, ব্যয়ে ব্যয়ে কুবের পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় আর ইংরেজ সরকার। দৃঢ়চিত্তে তাই প্যারীবাবু নীচে পাহাড়ের সিড়ী ভাঙ্গিয়া নামিয়া গেলেন। কিন্তু তখন দিনের সূর্য্য আকাশে অনেকখানি আগাইয়া পড়িয়াছে, আর ঘড়ির ঘণ্টার কাটা নয়টার কোঠায় আসিয়াছে;

টিফিন ঘরে আসিয়া দেখিলেন শূন্যপুরী। লম্বা টানা টেবিলের উপর আসনপীড়ি হইয়া বসিয়া প্যারীবাবু ভিতরের ঘরের দিকে অনুসন্ধানের জন্য প্রশ্ন পাঠাইলেন, 'ওখানে কেউ আছে?'

—আছি।

—কে—?

—আমি।

প্যারীবাবু সুর চড়াইয়া কহিলেন—আমি! আমি তো সব ব্যাটাই বলে। আমি কে বলতে পার না? আজ্ঞে আমি গোবিন্দ।



গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিয়া দেখা দিল

—ও-গোবিন্দ,—প্যারীবাবুর স্বর আপনা হইতে নরম হইল। কলিতে নাম মাহাত্ম্যের কত বড় উদাহরণ।

সময় যায় তবু গোবিন্দ বাহির হইয়া দেখা দিল না। শেষে কি একই সঙ্গে ভোরের চা ও দুপুরের খাবার গিলিতে হইবে। অসহিষ্ণু হইয়া প্যারীবাবু ডাকিলেন "গোবিন্দ?"

—আজ্ঞে।

—কি আজ্ঞে আজ্ঞে করছ। বসে আছি একটু এদিকে আসতে পার না!

পারি কিন্তু একটু ব্যস্ত আছি।

কেন—কি করছ?

—আজ্ঞে, চা খাচ্চি।

আচ্ছা খাও। বলিয়া প্যারীবাবু পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিলেন। ধৈর্য্যরক্ষা করিবার এত বড় উপায় আর দ্বিতীয়টী নাই। সিগারেটের ধোঁয়ায় ভাবনাটাকে হালকা করিয়া লইতে লাগিলেন।

একসময়ে গোবিন্দ বাহির হইয়া আসিয়া দেখা দিল। প্যারীবাবু কহিলেন, খাওয়া হোল?

হোল।

একটু চা খাওয়াতে পার।

পারি।

তবে আমাকে একপেয়ালা চা দেও দেখি।

দেই, বসুন।

প্যারীবাবু বসিয়াই ছিলেন, পা বদলাইয়া বসিলেন। কিন্তু গোবিন্দ চায়ের ঘরে ঢুকিলনা, কোনায় পানের যে সাজসরঞ্জাম ছিল, সেখানে গিয়া পান সাজিতে বসিল। প্যারী বাবুর দৃষ্টি



Good morning, Pyari Babu

গোবিন্দের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল, গোবিন্দ তা জানিতে পারিল কিনা বুঝা গেলনা।

প্যারীবাবু স্বরটাকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া বলিলেন কি করছ?

পান সাজছি।

তাতো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু, বল্লাম না চা দিতে।

তাতো বলেছেন। একটা পান খেয়ে নেই।

নেও—বলিয়া প্যারীবাবু অনুমতি দিলেন।

গোবিন্দবাবু পরিপাটী করিয়া পান সাজিয়া মুখের মধ্যে গুজিয়া লইল। পানের বোঁটায় খানিকটা চূণ লইয়া গোবিন্দ চায়ের ঘরে ঢুকিল। প্যারীবাবু ডাকিয়া বলিলেন, একটু তাড়াতাড়ি কোর।

আচ্ছা।

গোবিন্দ অদৃশ্য হইল। শূন্যঘরে প্যারীবাবু একা বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। কিছু পরে অনেকগুলি বুটের আওয়াজ কাছে ঘনাইয়া আসিল। দরজার সামনে দিয়া সিপাহী বেষ্টিত কমাণ্ডাণ্ট চলিয়াছেন। রুমের দিকে দৃষ্টি দিয়া প্যারীবাবুকে দেখিতে পাইয়া সাহেব বলিলেন, Good morning, Pyari Babu

—morning, বলিয়া প্যারীবাবু প্রত্যাভিবাদন করিলেন। স্নানের ঘরে কলে জল যাইতেছেনা দেখিবার জন্য সাহেব পশ্চাতে একপাল সিপাহী টানিয়া লইয়া আরও নীচে নামিয়া গেলেন।

ঘরে শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল পরশুরাম। প্যারীবাবুকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া থামিয়া দাঁড়াইল।

কোথায় ছিলেন এতক্ষণ ?

আজ্ঞে উপরে।

কি বলিতে যাইয়া প্যারীবাবু দেখিলেন দরজায় রামঅবতার।

এই যে আর একজন। ব্যাটারা থাকিস্ কোথায় ?

রামঅবতার কোনমতে উত্তর করিল—জী ?

একে একে আরও অনেকেই আসিল। এমন কি কালো রংএর কোটটী গায়ে বনবৃক্ষ (নেপালী বাহাদুর সিং) পর্য্যন্ত আসিয়া হাসিমুখে প্রবেশ করিল। সবাই চুপ করিয়া আছে বনবৃক্ষ সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করিল বাবুর চা খাওয়া হইয়াছে কিনা। প্যারীবাবু উত্তর দিলেন না। এমন সময় লালজী আসিল; ফিটফাট চটপটে চেহারা। আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল কি বাবু ?

কি বাবু, আচ্ছা তোরা থাকিস কোথায় বলতো। ঘণ্টাখানেক বসে আছি এক পেয়ালা চা পেলামনা।

বাজার আনতে গেছলাম। তা গোবিন্দকে তো থাকতে বলে গেছি। গোবিন্দ নেই এখানে ?

ছিলতো দেখেছিলাম। আছে কিনা জানিনা।

—বসুন, এক মিনিটের মধ্যে আমি চা করে দিচ্ছি। বলিয়াই চা ঘরে ঢুকিতে গিয়া দরজায় প্রায় গোবিন্দের সঙ্গে ধাক্কা খাইতেছিল। লালজী পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। চায়ের পেয়ালা হাতে গোবিন্দ ঘরে ঢুকিল।

প্যারীবাবু হাত পাতিয়া চা লইলেন। কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়াই মুখতুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি করেছ ?

চা—।

—চা ? চিনি দিয়েছ ?

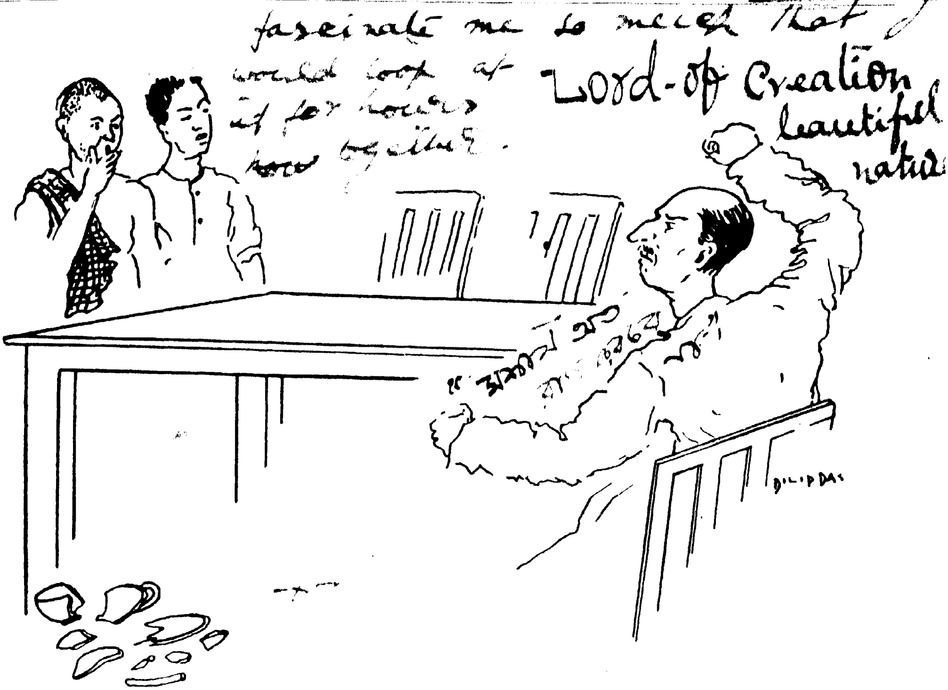
—দিয়েছি সাড়ে চার চামচ।

—হুঁ, দুধ দিয়েছ ?

—কৌটোতে দুধ ছিলনা—চায়ের জল তার মধ্যে দিয়ে যা একটু দুধ পেয়েছি।

—কেন, কৌটার দুধ ছাড়া আর দুধ নেই নাকি ?

—গরুর দুধে চায়ের টেষ্ট বিশ্রী হয়।



চায়ের পেয়ালাটা প্যারীবাবু ছুড়িয়া মারিলেন

"হুঁ", বলিয়া প্যারীবাবু আওয়াজ মুক্ত করিলেন—টেষ্ট বিশ্রী হয়। আচ্ছা, তোমার একটা আক্কেল নেই গরম জলের মধ্যে সেরেক খানি চিনি দিয়ে এনেছ, না দিয়েছ দুধ,—না দিয়েছ চা।"

লালজী শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিল চা দাওনি গোবিন্দ ?

প্যারীবাবু কহিলেন বিশ্বাস না হয় খেয়ে ছাখ। সত্য করে বল চা দিয়েছ ?

গোবিন্দ বলিল—আমি মিথ্যে বলি না। চা দিয়েছি।

—তবে এরকম হোল কেন ?

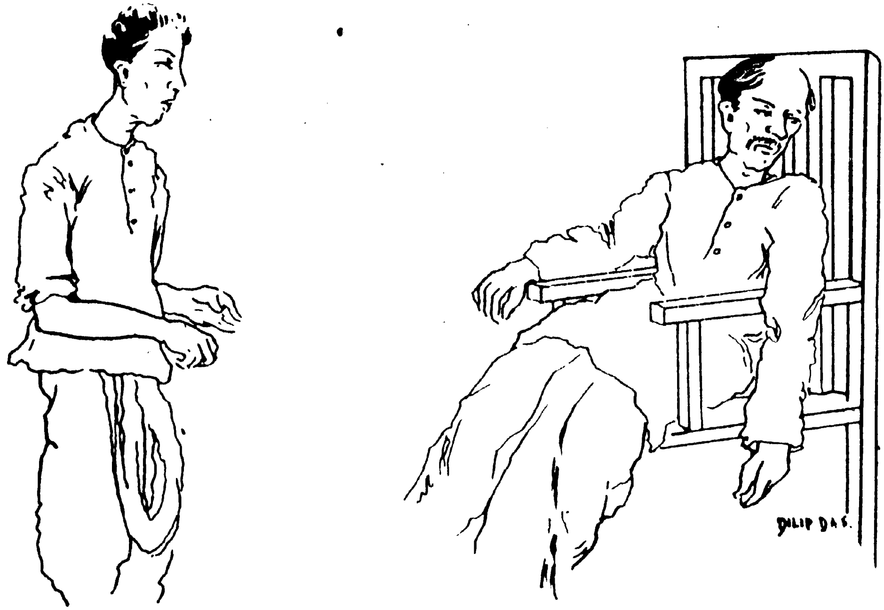
এইরকম হইবার কারণ গোবিন্দ জানাইল—একপেয়ালা চা করবার জন্য আবার একটা নূতন কৌটা ভাঙ্গতে হয়, তাই, তা করিনি। চায়ের সিদ্ধ পাতা অনেক ছিল, তারই খানিকটা নিয়ে সেদ্ধ করে দিয়েছি।"

লালজী বলিল ওটা রেখে দিন, আমি—কথা আর সমাপ্ত করিতে পারিলনা। চায়ের পেয়ালাটা প্যারীবাবু ছুড়িয়া মারিলেন, টেবিলের একটা পায়ায় লাগিয়া পেয়ালা প্লেট সশব্দে চুরমার হইয়া গেল। ঘরশুদ্ধ সবাই চুপ করিয়া ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

গোবিন্দ বলিয়াছিল, সে মিথ্যা কথা বলেনা। কিন্তু সে যে ভয়ও পায়না—তা পরে জানা গেল। এতক্ষণ প্যারী বাবু প্রশ্ন করিয়াছেন। এখন গোবিন্দের প্রশ্ন করিবার পালা।

গোবিন্দ প্রশ্ন করিল বাবু, রাগ করেছেন ?

বাবু নিরুত্তর।



গোবিন্দ প্রশ্ন করিল, বাবু রাগ করেছেন ?

গোবিন্দ আবার আরম্ভ করিল, রাগ করেছেন, তা বুঝতে পাচ্ছি। কিন্তু জিজ্ঞেস করি এই যে রাগ করে পেয়ালাটা ভাঙ্গলেন এতে ক্ষতি কার হোল ?

প্যারীবাবু দেখিলেন , গোবিন্দ তাকে ঠিক পাগল করিবে, নিঃশব্দে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন।

আসিবার সময় শুনিলেন গোবিন্দ উপস্থিত দর্শকদের বলিতেছে, দেখ্‌লি তো শিক্ষিত লোকের ব্যবহার। তোরা হলে তো রাগের ধাক্কায় পেয়ালাটা আমার মুখেই ছুড়ে মারতিস। সাধে কি বলে—শিক্ষা।

গোবিন্দকে তাড়াইবার কথা শুনিয়া সে নিজেই ম্যানেজারের নিকট উপস্থিত হইল। কহিল—আমাকে ডিস্‌মিস্ করবেন না। তাতে নাম খারাপ হয়। আমাকে আগে একটু বলবেন, আমি নিজেই রিজাইন দেব।

সে যাত্রা গোবিন্দ টিকিয়া গেল। কিন্তু মাসখানেক পরে সত্যই সে একদিন ডিসমিসের বদনাম এড়াইবার জন্য রিজাইন দিয়া চলিয়া গেল।

বিক্রমপুরে পদ্মার পারে এক গ্রামে মুদির দোকানে সে কাজ করিত, সেইখানেই সে আবার ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় সে নাকি বলিয়া গিয়াছে আবার যদি সে ক্যাম্পে আসে তবে ডেটিনিউ হইয়াই আসিবে।

গোবিন্দ এখন কোথায় জানিনা। বাঁচিয়া আছে কিনা কে বলিবে। যে রোগা মানুষ এই ধাক্কাধাক্কির সংসারে টিকিতে না পারিয়া রিজাইন করিয়া সরিয়াও হয়তো পড়িতে পারে। বক্সাদুর্গের অনেক স্মৃতিই সময়ে ঝাপসা হইয়া আসিবে একদিন। কিন্তু গোবিন্দ, তার স্বল্পভাষা, ও মুখের বুদ্ধমূর্ত্তির ঔদাসিন্য নিয়া আমাদের মরণ পর্য্যন্ত আমাদের স্মৃতিতে বাঁচিয়া থাকিবে।

* * * *

হু হু করিয়া দুর্গের দিনগুলি কাটিতে লাগিল। তখনও আমাদের মূলনীতি সমান জ্বল জ্বল করিতেছে

"নলিনীদলজল জীবন টলমল"

এবং "চল্‌রে চল্‌রে চল।"

বাস্তবের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জিত রস রচনা।

পারিবারিক জীবন

বিজন সেন

কালের রথচক্রের নীচে পড়ে অনেক জিনিসই ভেঙ্গে যাচ্ছে, আবার অনেক কিছু জীর্ণ অবস্থায় এখনও রয়েছে, কবে ধ্বসে পড়ে ঠিক নেই। ঠিক ধ্বসে না পড়লেও যুগের দাবি মিটাতে গিয়ে তাদের যে নবজন্ম গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পারিবারিকজীবন বৃহত্তর সামাজিক জীবনের অংশরূপে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আজ নতুন মানুষের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এবং জিজ্ঞাসু মনের কাছে ধরা পড়ছে তার বহু গলদ—কোথাও স্পষ্টপ্রতিভাত, কোথাও আপাত মসৃণতায় আবৃত। নানারূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে অনেক ক্ষেত্রে তার ভেতরের চেহারা একেবারে বদলে গেছে, যদিও বাইরের খোলসটা রয়ে গেছে আগেরই মতো। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রে নিতান্ত ফাঁকিকে আশ্রয় করেই পরিবার এখনও পূর্ব্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। যাঁরা নবজীবনের সাধক, নতুন সমাজ-ব্যবস্থার অগ্রদূত, তাঁদের কাছে এই ফাঁকি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে তা বলাই বাহুল্য। অথচ, পারিবারিক জীবনের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য, মাতা, পিতা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্রের স্নেহ, মমতা এবং ভালোবাসায় ঘেরা, বাহ্যিক জগতের প্রাণান্তকর কোলাহল হতে বিচ্ছিন্ন একখানি ক্ষুদ্র নীড়ের আকর্ষণও যে তাঁদের মনে না আছে তা নয়। তাই বার বার তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, কঃ পন্থা?

আধুনিক পারিবারিক জীবনের সব দিক ভালো করে' বুঝতে হলে যেতে হয় প্রাগৈতিহাসিক যুগে, যখন মানুষ আজকালকার মতো সুগঠিত সামাজিক জীবন যাপন করতে সুরু করেনি। আদিম মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে প্রধানতঃ দুটী মত নৃতত্ত্ববিদ্‌দের মধ্যে প্রচলিত। তার প্রথমটী হচ্ছে এই যে তখন মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ, বহু মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীতে মানুষ বিভক্ত ছিল। তখন মেয়েরাই ছিল প্রধান—সব ব্যাপারে তাঁদেরই ছিল কর্ত্তৃত্ব। বিশেষতঃ, ধনসম্পত্তি ছিল তাঁদেরই করায়ত্ত—কাজেই সামাজিক প্রভাবের চাবিকাঠিই ছিল তাঁদের হাতে। তখন আজকালকার মতো বিবাহ ছিল না, যৌন-জীবনে নারীদের ছিল অবাধ স্বাধীনতা। সে ছিল নারী-স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ: ক্রমে চাকা ঘুরতে লাগলো। ক্রমে ক্রমে ধনসম্পত্তি আসতে লাগলো পুরুষদের হাতে, এলো বিবাহ, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের পায়ে পড়লো বেড়ী। সেই বেড়ীই এখন পর্য্যন্ত তাঁরা খুলতে পাচ্ছে না। আজকাল যাঁরা বহু গবেষণাদ্বারা এই মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা কচ্চেন তাঁদের মধ্যে মনীষি ডাক্তার ব্রিফল্টই প্রধান।

আর এক মত জোর করেই বলে না, না, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি সত্যি না। মেয়েদের অর্থনৈতিক দাসত্বের ফলে পরিবারের উদ্ভব হয় নি। তার গোড়ায় আছে নরনারীর প্রেম, মানব-অন্তরের সেই আদি ও গভীর বৃত্তি, যা' মিলনের মধ্যে চিরকাল সার্থকতা খুঁজেছে বলেই বিবাহের আশ্রয় নিয়েছে, পরিবার গড়েছে। অবাধ যৌনমিলন মানুষের গূঢ় প্রকৃতির বিরোধী--সত্যিকার প্রেম একাশ্রয়ী; তাকে উপলক্ষ্য করেই দাম্পত্যজীবন এবং পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই মতের সমর্থকদের মধ্যে ওয়েষ্টারমার্ককে প্রধান বলা যেতে পারে।

গোড়ায় কি করে পরিবারের সৃষ্টি হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে তার তত্ত্ব এখনও অনিশ্চয়তার কুজ্ঝটিকায় ঢাকা, জ্ঞানালোক তাকে উদ্ভাসিত করে তুল্‌তে পারে নি। কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে সমাজের ক্ষুদ্র অংশহিসেবে পরিবার চলে এসেছে বহু যুগ ধরে, এবং শুধু নারীজাতির অর্থনৈতিক দাসত্বের ওপরে ভর করে' তা' হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে এ কথা মেনে নিলে মানবত্বের মর্য্যাদাকে খর্ব্ব করা হয়। প্রভু আর দাসের যে সম্পর্ক তার ভিত অত্যন্ত কাঁচা, যুগযুগান্তের ঝড়ঝাপ্‌টাকে মাথায় করে তা বেঁচে থাক্‌তে পারে না। তার মূলে নিশ্চয়ই আর কোন সঞ্জীবনী শক্তি রয়েছে যা তাকে এতকাল জীবিত রেখেছে।

প্রশ্ন হতে পারে, জীবিত কি রয়েছে? শুধু ওপরের খোলসটা ঠিক আছে, ভেতরটা মরে পচে গেছে। কথাটা মেনে নিয়েও পাল্টা প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ অবস্থায়ও এতকাল বেঁচে আছে কেন? একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি কেন? সাধারণভাবে বলতে গেলে অনেক পরিবারই অপ্রীতি এবং অশান্তির আকর হয়ে উঠেছে, তবু সুখী এবং সার্থক পরিবারও কি নেই? যদি তা থেকে থাকে তবে তা' আছে কিসের জোরে? এ প্রশ্নের একমাত্র জবাব সম্ভব। নরনারীর মধুর আকর্ষণের জোরে, প্রেমের জোরে।

পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য থেকে একথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে বর্ত্তমান পারিবারিক জীবনের গলদগুলিকে আমি ছোট করে দেখছি। আমি জানি এবং যাঁরা চোখ খুলে চলেন তাঁরা সকলেই জানেন যে কতো পরিবারের অভ্যন্তরে কতো অবিচার, অনাচার ও নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করা হচ্ছে। যারা সহ্য করে, তারা অসহায়, কারণ তারা অক্ষম। কতো গৃহের কোণে বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস, বুকেই মিলিয়ে যাচ্ছে। অসহ্য দুঃখের তাড়নায় সাধের জীবনকে কতো জনে নিজের হাতেই শেষ করে দিচ্ছে। তবু আত্মসম্মান নিয়ে পরিবারের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পার্চ্ছে না। এম্‌নি পঙ্গু তারা!

আসলে, যেখানে দু'জন সম্পূর্ণ স্বাধীন নরনারী শুধু প্রাণের টানেই দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়না, সেখানে আর বিবাহটা সত্যিকার বিবাহ থাকে না, হয়ে ওঠে ব্যবসা। নারীদের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ ও সন্তান পুরুষদের ধনসম্পদ, বিলাস সামগ্রী আরো কত কী? কি কুক্ষণেই পুরুষদের হাতে ধনসম্পত্তির অধিকার এসে পড়েছিল! যখনই তারা সম্পত্তির মালিক হল, তখন থেকেই মেয়েদের কাছে এসে তারা বলতে লাগলো 'তোমরা গৃহের ভূষণ, বাইরে গিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করা কি

তোমাদের সাজে ? তোমাদের খাওয়াপড়ার ব্যবস্থা আমরাই করবো, তোমরা শুধু আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করো' বাস্, আর কথা নেই, সরলা অবলারা অমনিই স্তোকবাক্যে ভুলে গিয়ে, অর্থোপার্জ্জন ছেড়ে কোণাবন্দিনী হল। ভাবল, বিনা পরিশ্রমেই যদি সব মিলে, তবে মন্দ কী ? একটু তলিয়ে ভেবে দেখলনা পেলইবা কতটুকু আর হারালইবা কতটুকু! বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ওয়ার্ড নানা যুক্তি ও তথ্য দিয়ে একটা অতি বিস্ময়কর মত প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে মেয়েরা যখন পুরুষের মতই পরিশ্রম করে' জীবিকার্জ্জন করত তখন তাদের দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্যও প্রায় পুরুষের অনুরূপই ছিল। আর যখন থেকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব সুরু হল, তখন থেকেই তারা ঐকান্তিকভাবে দৈহিক কোমলতার এবং মানসিক কমনীয়তার সাধনা করতে লাগল। কারণ তখন থেকে তারা বুঝতে পারল যে জীবনে তাদের সৌভাগ্য নির্ভর করবে কায়িক লোভনীয়তার ওপরে। সেই থেকে আরম্ভ হল তাদের সর্ব্বব্যাপী অধঃপতন। তারা আর মানুষ রইল না, হল শুধুই মেয়ে, পুরুষের সেবাদাসী। তাই জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে তাদের দান অতি নগণ্য। অথচ, মেয়েদের মানসিক শক্তিও যে পুরুষের চেয়ে কম নয় তা, কিছুদিন পূর্ব্বে মস্কোর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয়ে গেছে।

নারীশক্তির এই যে ভীষণ অপচয় এবং তার ফলে মানব সভ্যতার পঙ্গুতা ও অসম্পূর্ণতা,তার থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ পরিবারগুলিকে নতুনভাবে গঠন করা কারণ পূর্ব্বেই বলেছি যে পরিবারহীন যৌনজীবনের নৈরাজ্য সমৃদ্ধতর সভ্যতার সহায়ক নয়, বরং তার পরিপন্থী। ভবিষ্যতের যে নবগঠিত পরিবার তার গোড়াপত্তন হ'বে নরনারী উভয়েরই আর্থিক স্বাধীনতা, নির্ভীক ও মুক্ত মন এবং উচ্চতর জীবনের প্রতি উভয়ের সম্মিলিত আত্মনিবেদনের ওপর। এক কথায় তা দাঁড়াবে প্রেমের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর। প্রশ্ন উঠতে পারে যে যেখানে ভালোবাসার স্বর্ণসূত্রে দু'টী জীবন গ্রথিত হয় সেখানে তীব্র আর্থিক স্বাতন্ত্র্যবোধ কি অশোভন নয় ? অশোভনই বটে, কিন্তু ভালোবাসা যে চিরস্থায়ী হবেই একথা জোর করে কে বলতে পারে ? আর যখন সে মিলনের সূত্রই ছিন্ন হয়ে যায় তখন শুধু একপক্ষের আর্থিক অসহায়তার জন্য তাকে দীর্ঘতর করার চেষ্টায় কি গ্লানিই কম ? এই যে প্রেমহীন দাম্পত্যজীবনের বোঝা টানার প্রাণান্তর গ্লানি এবং অসম্মান তার থেকে রেহাই পাবার জন্যই বিবাহ-বিচ্ছেদের সহজ অধিকার স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই প্রয়োজন। মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা তার বন্ধনহীন বিকাশে,—একথা যদি নারী পুরুষ উভয়ের সম্পর্কে স্বীকার করে' নেয়, তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের সহজ অধিকারকে না মেনে উপায় থাকেনা। প্রশ্ন হতে পারে সে অধিকার যদি নির্ব্বিচারে দেয়া হয় তবে কি তার অপব্যবহার হ'বেনা ? প্রেমের নামে কি স্বেচ্ছাচার প্রশ্রয় পাবেনা ? এই সব সমস্যা মণীষি বারট্রাণ্ড রাসেল তাঁর 'ম্যারেজও মরেল্স' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। আমি জানি মানবমনের নিগূঢ় বৃত্তির রাসায়নিক পরীক্ষা চলে না, সুতরাং সহজ বিবাহ-বিচ্ছেদে ভালোবাসার অপব্যবহারের আশঙ্কা থেকে যায়। তা' হলেও আমি প্রত্যেক নরনারীর জীবনসম্পর্কে স্বায়ত্ত

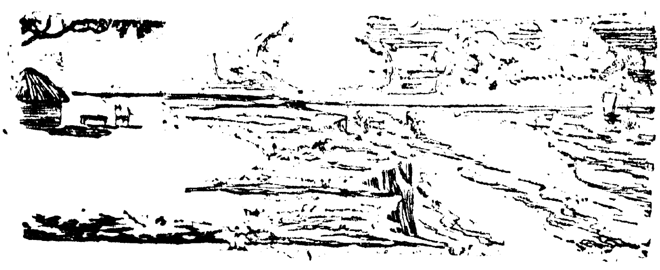
শাসন অধিকারে বিশ্বাসী, কথা উঠ্‌তে পারে সামাজিক জীবনে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অকল্যাণকর হতে পারে। একথায় যুক্তি আছে। তারজন্য সমাজের দিক থেকে উপযুক্ত 'সেফ্‌গার্ডের' ব্যবস্থা হোক কিন্তু সত্যিকার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে কোনভাবে খর্ব্বকরে নয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে আধুনিক রুশিয়াতে যে ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়েছে তাতে দুদিক রক্ষিত হবে বলেই মনে হয়। সেখানে কারো জীবনে চারবারের বেশী বিচ্ছেদের অধিকার নেই। এই জীবনে চারবারের বেশী সাথী বদলানোর মধ্যে চরিত্রের কেমন যেন একটা কুৎসিৎ তারল্য প্রকাশ পায়। সেটা সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

একাধিকবার বিবাহ-বিচ্ছেদ সমাজে প্রবর্ত্তিত হবার আশঙ্কায় যাঁরা শিউরে উঠছেন তাঁরা একটা কথা ভেবে দেখছেন না যে আইন বিধিবদ্ধ হলেই যে সকলে বিয়ে নিয়ে ক্ষণিকের খেলা সুরু করে দেবে তার কোন সম্ভাবনা নেই। একখানি স্থায়ী এবং শান্ত নীড়ের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর অন্তরেই রয়েছে সুতরাং, দুদিন পরে ইচ্ছে করে ভাঙ্গার জন্যই যে তারা গৃহ রচনা করবে সেরকম মনে হয় না। দুঃসহ অবস্থায় না পড়লে কিছুতেই না। বিশেষ করে সন্তানবতী নারীর মাতৃস্নেহই তাকে গৃহে বেঁধে রাখতে চাইবে।

মার্কিন লেখক ফুল্‌সম অনতিপূর্ব্বে প্রকাশিত তাঁর 'ফ্যামিলি' নামক গ্রন্থে পরিবারের ভবিষ্যৎ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে সব দেশেই পরিবার বর্ত্তমান রুশিয়ার আদর্শে গঠিত হ'বে। অনেকটা যে তাই হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যেমন অর্থার্জ্জন, সাধারণভাবে সামাজিক মর্য্যাদা এবং বিবাহ-বিচ্ছেদে নরনারী উভয় পক্ষের সমান অধিকার। গার্হস্থ্য কাজের চাপে নারী-দের উচ্চতর এবং সমাজের কল্যাণকর কাজে আত্ম-নিয়োগ সম্ভব হয় না, এজন্য রুশিয়াতে ষ্টেট্-কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণের জন্য ভোজনালয় এবং পরিচ্ছদ ধৌতবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের দায়িত্ব নরনারী-নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রধান দায়িত্ব। তবু প্রিয়জনকে নিজের হাতে আহার্য্য তৈরী করে দেয়ার যে পরম আনন্দ তার থেকে নারীরা নিজেদের বঞ্চিত করতে চাইবে কিনা তারাই বলতে পারে। আমার মনে হয় চাইবে না। আর যদি জোর করে এই ব্যবস্থা প্রচলিত করা হয় তবে তার ফলে সেবা-উন্মুখ নারীচিত্তকে বুভুক্ষিত করেই রাখা হবে। সেটা কোন মতেই কল্যাণকর অথবা বাঞ্ছনীয় নয়। তবে এই ব্যাপারে যাতে তাদের সময় এবং শক্তি বেশী ব্যয়িত না হয় সেদিকে শুধু তাদের নয়, পুরুষদেরও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন হবে। তারপরে সন্তানের কথা। রুশিয়াতে ছেলেপেলেদের শিক্ষা-দীক্ষার ভার নেয় ষ্টেট্। তাদের থাক্‌তে হয় পাবলিক নার্সারীতে। সম্প্রতি অবিশ্যি সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের খেয়াল হয়েছে যে শৈশবেই ছেলেপেলেদের পিতামাতার স্নেহ-সিক্ত আবেষ্টন থেকে দূর করে নিলে তাদের উপযুক্ত বিকাশ হতে পারেনা। সে অনুসারে এখন ব্যবস্থাও হয়েছে। আমার মনে হয় এও যথেষ্ট নয়। যতোদিন শিশুরা বয়োপ্রাপ্ত হয়ে নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারবে ততোদিন তাদের পিতামাতার সস্নেহ সান্নিধ্য ও তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। কারণ সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক শুধু রক্তমাংসের নয়, তাদের মধ্যে যোগাযোগ

আরও গভীরতর। উপনিষদে আছে সন্তানের জন্যই শুধু পিতা সন্তান কামনা করে না, নিজেকেই পুত্রের মধ্যে বড়ো করে পায় বলেই। অর্থাৎ, সন্তান পিতামাতারই ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ। বৈষ্ণব দর্শনেও আছে আত্মীয় বন্ধুদের সরস সান্নিধ্য ও যোগাযোগ ছাড়া ব্যক্তিত্ববিকাশ সম্ভব নয়। এসব কারণেই মনে হয় বয়স্ক হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি অর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সন্তান ও পিতামাতার বিচ্ছেদ কল্যাণকর হবেনা।

পরিবারের অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে এতো সব জল্পনা কল্পনার পরে স্বভাবতই কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, আমাদের ভারতীয় সমাজের তো এখনও 'ফিউডাল' ও মেডিভাল অবস্থা, ভবিষ্যতের আদর্শসমাজ নিয়ে এখনই মাথাঘামানোর দরকার কী? চারবার বিবাহ-বিচ্ছেদ তো দূরের কথা, একবারের প্রস্তাবেই বর্ত্তমান ভারতের সংখ্যাতীত লোক একেবারে আঁতকে ওঠে। এমন কি, তথা-কথিত অনেক শিক্ষিত লোকও এই মনোভাব থেকে মুক্ত নন। এখন গগনচুম্বী সব আদর্শ নিয়ে জল্পনা কল্পনা স্বপ্ন নিয়ে খেলা করারই সামিল। এসব কথাই বুঝি এবং মানি। তবু ইতিহাস যুগ যুগ ধরে দেখিয়ে দিচ্ছে আজ যা' দু'চারজনের স্বপ্ন, ভবিষ্যতে তা' সর্ব্বসাধারণের বাস্তবজীবনে সত্য হয়ে ওঠে। ইতিহাসের এই সাক্ষ্য না থাকলে আদর্শনিষ্ঠ লোকের বেঁচে থাকাই শক্ত হত।



চীন ও ভারত

শ্রীভ্রমর ঘোষ, এম. এ

খবরের কাগজে যেদিন পড়িলাম ভারত জাতীয় মহাসভা কর্ত্তৃক জাপান-বিধ্বস্ত চীনদেশে একদল ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারী প্রেরণের নিমিত্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ও তজ্জন্য বহু হাজার টাকার প্রয়োজন—তখন আমি মনে মনে হাসিয়াছিলাম। হাসিবার কারণ ছিল না—তাহা নয়। এত হাজার টাকা বরং চরম দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিরন্ন ভারতবাসীকে দিলে দেশপ্রেমের ও মানবপ্রীতির উৎকৃষ্টতর পরিচয় দেওয়া হইত। সুদূর চীনদেশে নিষ্পেষিত-ভারতবাসীর কষ্টলব্ধ অর্থ প্রেরণের সার্থকতা কি? হাসিয়াছিলাম সত্য। কিন্তু মনের দীনতা আমাকে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে দেয় নাই। তৎক্ষণাৎ চোখের সামনে অতীত ইতিহাসের ছবি ভাসিয়া উঠিল।

ভারত ও চীনদেশ শুধু আজ মিলিত হইতে যাইতেছেনা। অতি প্রাচীনতম কাল হইতে এই দুই মহাদেশ অতি সম্প্রীতির সহিত কর বিনিময় করিয়াছে। চীনদেশ ব্যতীত অপর কোনও দেশের ভারতের ন্যায় অতি প্রাচীনতমকাল হইতে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্টি ও সভ্যতার ইতিহাস নাই।

ভারত জাতীয় মহাসভা কর্ত্তৃক এই যে সহানুভূতি প্রেরণ, ইহা ইতিহাসের পট পরিবর্ত্তন মাত্র। এই সহানুভূতি প্রেরণ যদি না হইতো ভারতের পক্ষে তাহাই হইতো আশ্চর্য্যের—তাহাই হইত কলঙ্কের।

ভারতবর্ষ ঐ টাকা নিজের মধ্যে বিলাইতে হয়তো পারিত কিন্তু ভারতের লোক চিরদিন অতি ক্ষুধার সময়ও নিজের মুখের অন্ন অভুক্ত থাকিয়া পরকে হাসিমুখে বিলাইয়া দিয়াছে। নিজে পীড়িত, উৎপীড়িত হইয়া পরকে আশ্রয় দিয়াছে। সুতরাং চীনদেশ ও ভারতবর্ষে বিংশশতাব্দীতে যে সম্প্রীতির আদান প্রদান হইতে যাইতেছে তাহা নূতন নহে বা আশ্চর্য্যেরও নহে। অবশ্য বিশাল চীনদেশে এই মুষ্টিমেয় সাহায্য নগণ্যকর সন্দেহ নাই তথাপি নগন্য হইলেও ইহার মূল্য অনেক।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস খুলিলে ইহার মর্ম্ম কতকটা বুঝা যায়।

বৌদ্ধধর্ম্মদ্বারাই খুব সম্ভব এই দুই মহাদেশ প্রথমে প্রাচীনকালে সংযুক্ত হয়। বুদ্ধের ধর্ম্ম ভারতে গভীররূপে অঙ্কপাত না করিলেও ভারতের বাহিরে ইহার পরিপোষকতা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। সিংহল, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, মঙ্গোলিয় ও তিব্বতের লোক অতি সমাদরে বৌদ্ধধর্ম্মে ধর্ম্মাশ্রিত হন। বুদ্ধের জন্মস্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত চৈনিক পরিব্রাজকগণ পর্ব্বতসঙ্কুল পথাশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না।

ভারতে যখন কুশাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় তখন এই ভারতীয় কুশানদের সহিত চীনদের গোলযোগ বাধিয়া উঠে। কুশানেরা ইউচি নামক সুবিখ্যাত বংশের একটি শাখা মাত্র। ইউচিগণ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিম চীনদেশ হইতে বিতাড়িত হন। উহারা ক্রমে ক্রমে ভারতের দিকে আসিতে থাকেন ও ভারতে কুশান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব দুইশত বৎসর পূর্ব্বে কুশানদের দ্বিতীয় রাজা Kadphisesএর সময় চীনাদের সহিত পূর্ব্ববিদ্বেষজনিত মনোভাবের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও সংঘর্ষ বাধে। সম্রাট Wutir আমলে Chang-Kienএর নেতৃত্বে চৈনিকগণ পশ্চিমদিকে রাজ্যবিস্তারার্থ প্রেরিত হয়—কিন্তু চৈনিকদল তখন বেশীদূর সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু প্রায় ৫০ বৎসর পর পুনরায় সেনাপতি Pan-Chaoএর নেতৃত্বে চীনারা Khotan এর ভিতর দিয়া Caspian হ্রদের তীরবর্ত্তি বিস্তৃতিলাভ করে।

বলে ও সামর্থ্যে কুশানগণ চীনাদের সমতুল্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত Kadphises II চীন সম্রাটের কন্যার পাণিপ্রার্থী হন। কিন্তু এই প্রস্তাব দৃঢ়রূপে প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রস্তাবকারী দূত Panchaoর হস্তে বন্দী হন। ইহাতে Kadphisesর ক্রোধবহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে ও তিনি এক বিশাল বাহিনী চীনদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু পর্ব্বতসঙ্কুল পথশ্রমে সৈন্যগণ পরিক্লান্ত হওয়ার দরুণ অতি অল্পকাল মধ্যেই উহারা চৈনিক সম্রাটের হস্তে পরাজিত হন। তখন চীনদেশে Hoti রাজা। চীনাগণ যুদ্ধের ফলস্বরূপ কুশানদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন যে বিখ্যাত কুশানরাজ কণিষ্ক চীনসম্রাটকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এই চৈনিকরাজকুশানকে সন্ধির জামীন স্বরূপ নিজ রাজ্যে বন্দী রাখেন।

৮৯—১০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে চীনদেশে যতপ্রকার দৌত্য প্রেরিত হইয়াছিল চীনারা সকলই করস্বরূপ গ্রহণ করে।

প্রবলপ্রতাপান্বিত গুপ্তবংশের অভ্যুদয়কালে দেখিতে পাই যে তাহাদের আমলে অনেকবার দৌত্য বা অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল। চীনদেশে এই সকল দৌত্য প্রেরণের ফলে চীন ও ভারতের মধ্যে ভালরূপে ভাবের আদানপ্রদান হইত। খৃষ্ট চতুর্থ শতাব্দী ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে আমরা চীনদেশে এইরূপ ১০টি দৌত্য প্রেরণের সংবাদ পাই। গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রতিপত্তিকালে ফাহিয়ান নামক চীন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে "বিনয়-পিটকের" অনুসন্ধানে আসেন। তিনি প্রায় ৬ বৎসর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে বাস করেন। তিনি পাটলীপুত্র নগরেই প্রায় ৩ বৎসর ও বঙ্গদেশের তমলুকে ২ বৎসর থাকেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে ভারতবর্ষের অনেক সামাজিক রাষ্ট্রীক তথ্য সকল পাওয়া যায়।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে পুনরায় হিউয়েন-সাং নামক আর একজন বিখ্যাত চীনপর্য্যটকের দর্শন ঘটে। তাঁহার লিখিত ঘটনাবলীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য বাহির হয়। হর্ষবর্দ্ধন ফাহিয়ান ২ জনেই ভারতবর্ষকে ভালবাসিতেন। ভারতের দিক দিয়াও তাহাদের আদর যত্নের ক্রুটী হয় নাই।

Sir M.A. Stine এবং অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদগণের মতে Chinese Turkistan একমাত্র গ্রীক্‌, ভারতীয়, ইরাণী ও চৈনিক সভ্যতার মিলনক্ষেত্র।

ফাহিয়ানের পর ভারতবর্ষ হইতেও একদল সন্ন্যাসী চীনদেশে গমণ করেন। তাহাদের মধ্যে প্রধান যিনি ছিলেন —তাঁর নাম ছিল কুমারজীব। চীনদেশের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে কাশ্মীররাজ গুণবর্ম্মণদ্বারা জাভা নিবাসীগণ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। গুণবর্ম্মণ খৃষ্ট ৪৩১এ Nankinএ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

হর্ষের মৃত্যুর পর Wang Hinen-tse নামক একজন দূত প্রায় ত্রিশজন অনুচরসহ হর্ষের রাজধানীতে উপস্থিত হন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার এক দুষ্ট মন্ত্রী কর্ত্তৃক তৎসিংহাসন অধিকৃত হয়। সেই মন্ত্রী তখন সিংহাসনে। Wang Hinen-tseর আগমণে মন্ত্রী মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়েন ও Wangকে আক্রমণ করিয়া তাহার জিনিষপত্র লুণ্ঠন করেন ও Wangএর অনুচরদিগের অনেককে হত্যা করেন। Wang তখন নেপালে পলায়ন করেন। নেপাল তখন তিব্বতের অধীনে করপ্রদানকারী রাজ্য ছিল এবং তিব্বতের রাজা এক চৈনিক রাজকুমারকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। সুতরাং তিব্বতের রাজা Strong-Stan Gampo প্রবল এক বাহিনী প্রেরণদ্বারা হর্ষবর্দ্ধনের সেই অবৈধাধিকারী মন্ত্রীকে ভালরূপে আক্রমণ করেন ও একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া তাহাকে পরিবারসহ চীনদেশে পাঠাইয়া দেন। চীন দেশেই ঐ মন্ত্রীর মৃত্যু ঘটে।

মহাকবি কালিদাস লিখিত শকুন্তলায় আমরা 'চিনাংশুক' নির্ম্মিত পতাকার ব্যবহার জানিতে পারি।

"চিনাংশুক' অর্থ চীন দেশের রেশমী বস্ত্র। সুতরাং কালিদাসের আমলে চীনদেশ ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্যেরও প্রসারতা ছিল—ইহা নিশ্চয়।

সপ্তশতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রাক্কালে চীনদেশে Hiuen-Stung নামক এক প্রবল প্রতাপান্বিত চৈনিক সম্রাটের রাজত্বে চীন সৈন্যগণ আবার পশ্চিম দিকে প্রাধান্যলাভ করে। কাশ্মীরের নৃপতিগণ চীনদেশ হইতে প্রায়ই প্রতিষ্ঠালাভ করিতেন। কিন্তু চীনাদের এরূপ প্রতিপত্তি বেশীদিন রহিল না। কাশ্মীরের পার্ব্বত্যপ্রদেশে আরবজাতির প্রাধান্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চীনাদের প্রতিপত্তি কমিয়া যাইতে লাগিল—ও তৎপরে নেপাল ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় প্রদেশের সহিত চীনদের সম্বন্ধ বলবৎ রহিল না।

সুলতান মহম্মদ সা তোগলকের চীনদেশ আক্রমণ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ১ লক্ষ ঘোড়শোয়ার সুলতান তাহার ভাগীনেয় খুসরু মালিকের নেতৃত্বে চীনদেশে নেপালের মধ্য দিয়া প্রেরণ করেন কিন্তু পথশ্রমজনিত ক্লিষ্টতার দরুণ চীনাদের নিকট হারিয়া যান। অবশিষ্ট যাহারা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহারাও অবশেষে সুলতান কর্ত্তৃক নিহত হন।

ব্রিটিশ রাজত্বে নেপাল ও চীনদেশের মধ্যকার সম্বন্ধ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া দাঁড়ায়। চীনদেশে নেপালে ভালরূপেই আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নেপালরাজ প্রতি ৫ বৎসর অন্তর চীনরাজকে উপহার প্রেরণ করিত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও প্রাচীন চীন ইতিহাসের বাস্তবিক কি সম্বন্ধ ছিল—তাহা কিঞ্চিত দর্শিত হইল।

সুবিধা হইলে বা বারান্তরে মুসলমান ও ইংরাজ আমলে চীন ও ভারত কিরূপে আপনাদের ভাবের আদান প্রদান করিত—দেখান যাইবে।

যাহা হউক যে "Medical Unit Dr Atal এর নেতৃত্বে চীনদেশে প্রেরণ করা হইল—তাহা বাস্তবিকই ভারত ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা হইবে। যদিও দরিদ্র ভারতবাসীর এই প্রেমনিদর্শন বিশাল চীনদেশে—অতি নগণ্যকর হইবে,—তথাপি প্রেমের দান, ক্ষুদ্রই হউক, বৃহৎই হউক, যত অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন—তাহা প্রেমই।

ভারত জাতীয় মহাসভা—জগতের সমক্ষে—ভারতের পুরাতন কৃষ্টি ও সভ্যতার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শত শত বৎসর পরে যে আবার চীনদেশের সহিত প্রীতির আদান প্রদান করিতে যাইতেছে—ইহাতে বাস্তবিকই ভারতের গৌরব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

আশাকরি চীন ভ্রাতাভগ্নীগণও এই Medical Unitকে সানন্দে গ্রহণ করিবে—ও ইহা সম্প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করিয়া—ইহার মূল্য দিবে।



শেষ শিক্ষা

পুষ্পরাণী ঘোষ

সেদিন আমি খুব দেরী করে স্কুলের জন্য রওনা হয়েছিলাম। ভীষণ বকুনী খাব ভেবে আমার খুব ভয় করছিল—ভয় করার আরও বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে মস্তিয়ে হ্যামেল সেদিন আমাদের ব্যাকরণের যে জায়গাটা পড়া নেবেন বলেছিলেন আমি তার একটা অক্ষরও জানতাম না। একবার ভাবলাম আজ আর স্কুলে যাব না, পালিয়ে বাইরে কোথাও চলে যাই। দিনটা কি সুন্দর! চারিদিক কেমন আলোয় ভরে গেছে, বনের ধারে পাখীরা মিষ্টিস্বরে গান গাইছে, খোলা মাঠে কাঠ-কাটা কলের পিছনে প্রুশিয়ান সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করছে। ব্যাকরণের নীরস নিয়মাবলী মুখস্থ করার তুলনায় এসব কত বেশী লোভনীয়! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত প্রলোভন দমন করে স্কুলের দিকেই পা বাড়ালাম। টাউন হল পার হবার সময় দেখলাম যে সেখানকার কাঠের বোর্ডের সামনে খুব ভীড় জমেছে। গত দু'বছর ধরে আমাদের যত কিছু দুঃসংবাদ ও বিপদবার্ত্তা—যুদ্ধে হেরে যাওয়ার খবর, সেনাপতির আদেশাবলী, নতুন সৈন্য সংগ্রহের আদেশ ইত্যাদি সব খবর ওখান থেকেই প্রচারিত হচ্ছিল যেতে যেতে না থেমেই আমি ভাবলাম—না জানি এবার আবার কি খবর এল?

যথাশক্তি দ্রুতবেগে আমি হাঁটছিলাম। কামারশালার পাশ দিয়ে যাবার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে কামার বলল—"অত জোরে জোরে হাঁটতে হবে না খোকা, আর একটু আস্তে গেলেও তুমি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছুতে পারবে।"

আমি ভাবলাম সে বুঝি আমাকে ঠাট্টা করছে তাই উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে মস্তিয়ে হ্যামেলের ছোট্ট বাগানটার ভিতরে ঢুকে পড়লাম।

সাধারণতঃ স্কুল আরম্ভ হবার সময় ভীষণ গোলমাল হয়—রাস্তা থেকেই সে গোলমাল শুনতে পাওয়া যায়। বারে বারে ডেস্ক খোলা ও বন্ধ করার শব্দ, কাণে আঙুল দিয়ে সমস্ত ছাত্রের একসঙ্গে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্থ করা—রুলার দিয়ে শিক্ষকের টেবিল চাপড়ানো—সব মিলে ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আজ একটুও গোলমাল নেই—সব শান্ত নীরব। আমি ভেবেছিলাম হট্টগোলের মাঝখানে লুকিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়বো, কেউ অত লক্ষ্যও করবে না। কিন্তু আমার কপালে আজকেই কিনা সবাই শান্ত, শিষ্ট, লক্ষ্মী হয়ে গেল! জানালার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম আমার পড়ার সাথীরা সবাই যে যার নিজের জায়গায় বই খুলে বসেছে আর মস্তিয়ে হ্যামেল তাঁর সেই ভয়ঙ্কর লোহার রুলারটা হাতে নিয়ে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। অগত্যা আমাকে

দরজা খুলে সকলের সামনে দিয়েই নিজের জায়গায় যেয়ে বসতে হল। বুঝতেই পারছো আমি কি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আর আমার কি রকম লজ্জা করছিল।

কিন্তু কিছুই হলোনা। মস্থিয়ে হ্যামেল আমাকে দেখে কোমল কণ্ঠে বললেন—"যাও তাড়াতাড়ি নিজের জায়গায় যেয়ে বসো—তোমাকে বাদ দিয়েই আমরা পড়া আরম্ভ করতে যাচ্ছিলাম।"

এক লাফ দিয়ে আমি আমার ডেস্কের সামনে যেয়ে বসে পড়লাম। এতক্ষণ বাদে—ভয় একটু কেটে যাওয়ার পর এই প্রথম আমার চোখে পড়লো যে আমাদের শিক্ষক সেদিন তাঁর সব চেয়ে ভাল পোষাকটা পরেছেন—সেই সুন্দর সবুজ রংয়ের কোট, ফ্রিল দেওয়া সার্ট, কালো সিল্কের এম্‌ব্রয়ডারী করা টুপী। এ পোষাকটা তিনি ইনস্‌পেক্‌টর আসার দিন আর প্রাইজের দিন ছাড়া কখনও পরতেন না। তা ছাড়া সমস্ত স্কুলটাকেই কেমন যেন অদ্ভুত রকমের নিস্তব্ধ লাগছিল। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগলো এই দেখে যে পিছনের খালি বেঞ্চিগুলোতে গ্রামের সব লোকেরা এসে আমাদের মতই শান্তভাবে বসে আছে। তিনকোনা প্রকাণ্ড টুপী পরে বুড়ো হসার, ভূতপূর্ব্ব মেয়র, ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার—সকলেই এসেছেন, এছাড়া আরও অনেক লোক। সকলকেই খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। প্রকাণ্ড এক জোড়া চশমা পরে বুড়ো হসার একখানা পুরাণো, ছেঁড়া শিশুশিক্ষা সামনে খুলে বসেছিল।

এই সব অদ্ভুত ঘটনার মানে কি হতে পারে ভাবছি এমন সময় দেখলাম মস্থিয়ে হ্যামেল এসে তাঁর চেয়ারে বসলেন, তারপরে প্রশান্ত, গম্ভীর স্বরে বলতে লাগলেন, "বৎসগণ, তোমাদের পড়ান আজই আমার শেষ—আর আমি তোমাদের পড়াব না। বার্লিন থেকে হুকুম এসেছে যে এবার থেকে আলসেক্ (Alsace) ও লোরাইন (Lorraine)এ কেবল জার্ম্মান ভাষা পড়ান হবে; কাল তোমাদের নূতন শিক্ষক আসবেন। ফরাসী ভাষায় আজই তোমাদের শেষ শিক্ষালাভ, আজ তোমরা সবাই খুব মন দিয়ে শোনো।"

বজ্রধ্বনির মত এই ভীষণ কথাগুলো শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এইবার বুঝতে পারলাম টাউন হলের বিজ্ঞপ্তিতে এই কথাই জানিয়ে দিয়েছে।

ফরাসী ভাষায় আমার শেষ শিক্ষালাভ? হায়! হায়! আমি যে ভাল করে লিখতেই শিখিনি এখনও আর এইখানেই কিনা আমার শিক্ষা শেষ! এতদিন মন দিয়ে পড়া না করে পাখীর বাসায় ডিম খুঁজে আর বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়ানর জন্য আমার খুব অনুতাপ হতে লাগলো। ব্যাকরণ, সাধু সন্ন্যাসীদের ইতিহাস প্রভৃতি আমার যে ভারী ভারী বইগুলোকে এতদিন জঞ্জাল বলে বোধ হত এখন সেগুলোকেই পুরাণো বন্ধুর মত মনে হচ্ছে—সেগুলোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। আর মস্থিয়ে হ্যামেলকেও—তিনি চলে যাবেন, আর তাঁকে দেখতে পাব না—এ কথা ভাবতেই ভুলে গেলাম তিনি কি ভীষণ খেয়ালী আর তাঁর সেই ভয়ঙ্কর রুলারটা আমাদের মনে কি বিভীষিকারই না সঞ্চার করতো।

বেচারী ভদ্রলোক! এই শেষ শিক্ষাদানের সম্মান রক্ষার্থই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোষাক পরেছেন আর এই জন্যই গ্রামের সব বুড়ো লোকেরা পেছনের বেঞ্চে এসে বসেছে। এই আচরণের দ্বারা তারা যে আরও বেশী স্কুলে আসেনি সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করছিল, আমাদের শিক্ষককে তাঁর ৪০ বৎসর ব্যাপী নিপুণ কর্ম্মদক্ষতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছিল এবং যে দেশকে তারা আর আপন বলতে পাবে না—সেই দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাচ্ছিল।

আমি এই সব ভাবছি, এমন সময়ে মস্যিয়ে হ্যামেল আমার নাম ধরে ডাকলেন—এবার আমার পড়া বলবার পালা। হায়! হায়! আমি যদি তখন খুব চীৎকার করে ব্যাকরণের সেই ভীষণ নিয়মাবলী সব নির্ভুলভাবে আগাগোড়া মুখস্থ বলে যেতে পারতাম তাহলে তার বদলে কিনা দিতে পারতাম কিন্তু গোড়াতেই আমার ভুল হয়ে গেল। মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাইতে আর আমার সাহস হল না—কম্পিত হৃদয়ে ডেস্ক ধরে আমি চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম।

মাষ্টার মশায় বল্লেন "ফ্রাজ, আজ আর আমি তোমাকে কিছু বলবোনা--তোমার নিজেরই যথেষ্ট খারাপ লাগছে বুঝতে পারছি। ভেবে দেখ ব্যাপারটা কি রকম হয়েছে--আমরা প্রতিদিনই ভেবেছি যে এখনও ঢের সময় আছে—কাল শিখে নিলেই চলবে—আর তার ফল হয়েছে এই। আলসেক্ এর দোষেই তো হয়েছে এই! শিক্ষালাভ করবার সময়কে সে কেবলই পিছিয়ে দিয়েছে! এখন ঐ বিদেশীরা তো স্বচ্ছন্দেই বলতে পারবে যে--"বল কি। তোমরা তোমাদের ফরাসী বলে পরিচয় দাও অথচ ফরাসী ভাষায় কথা বলতেও পার না?"—কিন্তু দোষ তোমার একলারই নয়—আমাদের সক্কলেরই যথেষ্ট দোষ আছে।"

"তোমাদের মা বাবারা তোমাদের লেখাপড়ার বিষয়ে যত্ন নেননি। লেখাপড়া শেখার চেয়ে তাঁদের ক্ষেতখামার বা কারখানায় কাজ করে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করলেই তাঁরা বেশি খুসী হতেন। আর আমি? আমারও যথেষ্ট দোষ আছে বৈকি। আমিও তো কত সময় তোমাদের পড়তে না বলে আমার ফুল গাছে জল দিতে পাঠিয়েছি। তাছাড়া আমার মাছ ধরার সখ হলেই তোমাদের ছুটী দিয়েছি।"

তারপর একথা সেকথা বলার পর মাষ্টার মহাশয় শেষ পর্য্যন্ত ফরাসী ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। তিনি বল্লেন ফরাসী ভাষার মত অমন সুন্দর সাবলীল, সামঞ্জস্য পূর্ণ, যুক্তিযুক্ত ও মনোহারিণী ভাষা পৃথিবীতে আর নেই। প্রাণপণ চেষ্টা করে এই অনুপম ভাষাকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে--কিছুতেই কোনক্রমেই যেন আমরা এ ভাষা ভুলে না যাই। পরাধীন জাতির পক্ষে মাতৃভাষার পরিপূর্ণ অনুশীলন বন্দীর পক্ষে বন্দীশালার চাবি হাতে পাওয়ার সমান। তারপর তিনি ব্যাকরণ খুলে আমাদের পড়াতে আরম্ভ করলেন। কি আশ্চর্য্য আমি সব বিষয় বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম। তিনি যা কিছু বললেন সবই খুব সহজ ও সরল বলে বোধ হল। আমার মনে হয় আমিও জীবনে আর কখনও এত মনোযোগ দিয়ে শুনিনি আর মাষ্টার মহাশয়ও আর কখনও এত

বেশি ধৈর্য্যসহকারে—এমন প্রাণ দিয়ে বোঝাননি। বোধ হচ্ছিল তিনি যেন তাঁর যা কিছু জ্ঞান সব এই একদিনেই আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে খুসী হতেন।

ব্যাকরণের পর হাতের লেখার ক্লাস আরম্ভ হলো। সেদিন মাষ্টার মহাশয় আমাদের বড় বড় অক্ষরে লেখা নতুন হস্তলিপি দেখে লিখতে দিলেন। তাতে খালি এই লেখা ছিল—"ফ্রান্স-আলসেক, ফ্রান্স-আলসেক্"। আমাদের ডেস্কের সামনেকার দণ্ডে টাঙ্গানো স্কুল ঘর ভর্ত্তি সেই প্রতিলিপিগুলি ছোট ছোট নিশানের মত দেখাচ্ছিল। প্রত্যেকেই এমন গভীর মনোযোগের সঙ্গে শান্তভাবে লিখে যাচ্ছিল যে তা দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়। কাগজের উপর কলমের খসখস শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না। একবার কতকগুলো গুব্‌রে পোকা ঘরের মধ্যে উড়ে এল কিন্তু কেউ সেদিকে দৃষ্টি দিল না। ঘরের চালে কয়েকটি পায়রা মৃদুস্বরে গুঞ্জন করছিল। আমি ভাবলাম—"তারা কি পায়রাদেরও জার্ম্মানীতে গান গাইতে শেখাবে?"

যখনই আমি লেখা থেকে মুখ তুলে মাষ্টার মহাশয়ের দিকে তাকাচ্ছিলাম, দেখছিলাম যে তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে কখনও এটা কখনও ওটা লক্ষ্য করছেন—যেন তিনি এই ছোট্ট স্কুল ঘরটার কোথায় কি আছে মনের মধ্যে গেঁথে নেবার চেষ্টা করছিলেন। একবার ভেবে দেখ ৪০ বছর ধরে তিনি এই জায়গায় এইভাবে জীবন কাটিয়েছেন বাইরে তাঁর সাধের ফুলবাগান আর সামনে ক্লাস। পরিবর্ত্তনের মধ্যে শুধু এই হয়েছে যে চেয়ার, টেবিল, ডেস্কগুলো ব্যবহারে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মসৃন হয়ে এসেছে, বাগানের আখরোট গাছগুলো অনেকটা লম্বা হয়ে গেছে আর যে আঙ্গুরলতা তিনি নিজের হাতে পুঁতেছিলেন সেটা জানালা বেয়ে ছাদে উঠতে আরম্ভ করেছে। এইসব ছেড়ে যেতে আজ তাঁর কি মর্ম্মভেদী যন্ত্রণাই না হচ্ছে। দোতলার ঘরে থেকে তাঁর বোনের বাক্স বিছানা ও অন্যান্য জিনিষপত্র গোছানর শব্দ ভেসে আসছে—কালই তাঁদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শান্তভাবে সকলের পড়া শোনার মত ধৈর্য্য ও সাহস তাঁর ছিল। হাতের লেখার পর ইতিহাস পড়া হল। তারপর শিশুশ্রেণীর ছাত্রেরা তাদের বর্ণপরিচয়ের পড়া মুখস্থ বললো। ঘরের কোণে সবশেষের বেঞ্চে বসে বুড়ো হসার চশমা পরে বর্ণ পরিচয় দেখে বানান করে করে তাদের সঙ্গে পড়া বলতে লাগলো। স্পষ্ট বোঝা গেল যে সে সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছেও গভীর আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেছে। তার ঐ রকম অবস্থা দেখে আমাদের একসঙ্গে হাঁসতে ও কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। সেই দিনের সেই শিক্ষালাভের কথা আমার কি পরিষ্কারভাবেই না মনে আছে!

হঠাৎ গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ১২টা বেজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উপাসনা আরম্ভ হলো। ঠিক সেই সময়েই আবার আমাদের জানলার কাছ দিয়ে প্রুশিয়ান সৈন্যেরা ভেরী বাজাতে বাজাতে ফিরে যাচ্ছিল। মাষ্টার মহাশয় বিবর্ণভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

"বন্ধুগণ—-আমি আজ" এই পর্য্যন্ত বলে আর তিনি বলতে পারলেন না। আবেগে তাঁর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল।

তখন তিনি একটু করে খড়ি দিয়ে বোর্ডের উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষরে লিখলেন—

"Vive la France"

"ফ্রান্স দীর্ঘজীবী হউক।"

তারপর দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কোন কথা না বলে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন, "স্কুল ছুটী—তোমরা যেতে পার।"*

* Alphonse Daudet লিখিত "The Last Lesson" নামক গল্পের অনুসরণে।

আরাধ্যতমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

পুরুষের জয়যাত্রা পৌরুষের অখণ্ড প্রতাপে
রথচক্রতলে তার বিজিত শত্রুর পুরী কাঁপে,
বাহুবলে সন্ত্রাসিত বিধ্বস্ত যে বিদ্রোহ-বাহিনী
ইতিহাসে লেখা থাকে সে অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী,

ইতিহাস লেখেনাক সে দুর্গম জয়যাত্রা পথে
বীরের বাহুতে শক্তি কে জোগায় অন্তরাল হ'তে,
যাত্রার পাথেয় সম নারী দেয় চিত্তে বিজিগীষা
অমর জ্যোতিতে দীপ্ত নিরাশার অন্ধ অমানিশা।

সুন্দরী নারীর মুখে ফুটাইতে সপ্রশংস হাসি—
উন্মুক্ত কৃপান হাতে চলে নর, যুদ্ধ-অভিলাষী,
দুরন্ত দুর্ম্মদ বেগ, দুর্ব্বার মনের উচ্চ আশা
নারীর মাধুর্য্য চোখে, কাণে জাগে সঞ্জীবনী ভাষা।

নরের বিজয়মাল্যে কে জোগায় ফুল্ল পারিজাত,
প্রসন্ন নয়নপাতে কেবা আনে পরম প্রভাত ?
নরের বিজয়-গর্ব্বে নারী সে ভাগ্যের সম্ভাবনা
চিত্ত-চন্দনের অর্ঘ্যে নিত্য হয় তারি আরাধনা

বৈদিক গাথা

আশালতা সেন

১। যে দুইটী বৈদিক-গাথা নিম্নে প্রদত্ত হইল তাহার প্রথমটিতে মানব-হৃদয়ের নিম্নতর স্তর হইতে উর্দ্ধতন লোকাভিমুখী হওয়ার বাসনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। দীনতা হইতে পরম ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হওয়ার দিকে, পাপ ক্ষমা করিয়া পুণ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য দুর্ব্বল সাধক এই স্তরের ভিতর দিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা, যিনি পরম ঐশ্বর্য্যময়, যিনি পবিত্র ও মহান শক্তিশালী, তাঁহারই করুণা প্রার্থনা করিতেছেন। অপর একটিতে নিবিড় অরণ্যানীর ভীম-কাণ্ড সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ একটি কবি-হৃদয়ের আমরা পরিচয় লাভ করি।

এই দুইটী সূক্তের একটিতে আমরা মানব হৃদয়ের আধ্যাত্মিক সাধনার ও অপর একটিতে তাহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধির, এই দুইটী ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে এই সব গাথা চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তখন বহু যুগবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও মানব মনের যে একটি শাশ্বত রূপ আছে, যাহা চারি হাজার বছর পূর্ব্বেও যেমন ছিল, আজিও তেমনি বর্ত্তমান,—সেই শাশ্বতরূপ দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

করুণা ভিখারী

(ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ৮৯ সূক্ত অবলম্বনে)

১। মাটিতে গড়া এ ধরণীর বুকে মাটির দোসর করিয়া মোরে,
সম্পদশালী হে বরুণ-রাজ! বাঁধিয়া রেখোনা কঠিন ডোরে।
দিক্‌দিগন্তরে শকতি-বিহীন পবন চালিত মেঘের মত,
কম্পিত দেহে ভ্রমণ আমি যে করিতেছি হের ইতস্ততঃ।
অক্ষম আমি, কর্ম্ম আমার বিপরীত ফল প্রদানে তাই,
ওগো পবিত্র দেবতা মহান্,—চাইগো তোমার করুণা চাই।

বাস করি' হেথা এইযে শীতল সলিল পূরিতা ধরণী'পরে
তোমার স্তাবক তৃষাতুর তবু তোমার করুণা-সলিল তরে।
মানুষ আমরা চির দুরবল—করে' যদি তাই থাকি হে কভু,
দেবতার যাহা বিরুদ্ধ তাহা, ক্ষমা আমাদের করিও তবু।

তব মনোমত কর্ম্মে শতত অবহেলা কত করেছি হায়,
অজ্ঞান বশে,—আমাদের'পরে হোয়োনাক তুমি বিরূপ তা'য়।
ক্ষমিবারে পাপ,—হিংসা-রহিত স্নেহ-সুকোমল মূরতি ধর,
মহান্ শকতি বরুণ-দেবতা! করুণা করগো করুণা কর।

নিবিড় কানন

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ৪৬ সূক্ত অবলম্বনে)

৩। নিবিড় কানন! নিবিড় কানন! সীমা খুঁজে তব না পায় দৃষ্টি,
ভীত তুমি একা নহ কি?—করনা পল্লীর তরে পথের সৃষ্টি!
বক্ষে তোমার কত জানোয়ার করে বিচিত্র কতনা ধ্বনি,
যেন নানা রবে বর্ণনা সবে করে তব হেন মনেতে গণি।

মনে হয় যেন চরে গাভীদল নিবিড়-কানন বক্ষ-মাঝে
মনে হয় যেন কারো বুঝি তথা মনোরম এক প্রাসাদ রাজে।
অরণ্যে যবে তরুপল্লবে নাচে আলো-ছায়া সন্ধ্যাবেলা,—
মনে হয় কত দ্রুতগামী রথ ছুটিয়া যেনগো আসিছে কাছে।

কিসের আহ্বান?—ডাকিয়া কেহ কি ফিরিছে তাহার গাভীর তরে?
কিসের এ ধ্বনি? কুঠারের ঘায়ে কাষ্ঠ কি কেহ ছেদন করে?
ঘন অরণ্যে থাকে যদি কেহ আলোকে আঁধারে সন্ধ্যাবেলা,
শোনে সে যেন বা চীৎকার কেহ করিছে তথায় উচ্চঃস্বরে!

বন্য পশুরে ভয় যে না করে কেটে যায় সুখে জীবন তা'র,
স্বাদু ফল মূলে অরণ্য তব, অনিষ্ট তুমি করনা কা'র।
কৃষকের হেথা নাহি প্রয়োজন, আপনি আহার যোগাও তুমি,
সৌরভময় নিবিড় কানন হরিণগণের জনম ভূমি।

চিত্রকলায় নারী

যামিনীকান্ত সেন

ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে নারীর স্থান অবিসম্বাদিত। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। তা' ছাড়া পরবর্ত্তী যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে চাঁদবিবি, ভজনক্ষেত্রে মীরাবাঈ প্রভৃতি এদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করে এসেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আধুনিক বিপ্লবের যুগে নারীর সাধনা ও স্বপ্ন



প্রথম প্রয়াস

নীলিমা বিশ্বাস

অটুট আছে কি? দেশসেবায় নারীরা অকুণ্ঠচিত্তে অগ্রসর হয়ে অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশকে স্মরণীয় করে' তুলেছেন। বাঙ্গালীর ত্যাগ ও তপস্যার কথা আজ জগতে জানাবার লোক নেই। অথচ বিস্ময়ের বিষয় অতীতে যেমন তেমনি এযুগেও পূর্ব্বভারতই ভারতের ভাবকেন্দ্র। এখানকার মনের তাঁতেই



অর্চ্চনা।

শান্তি দেবী

ভারতীয় চিন্তার গালিচা তৈরী হচ্চে—এখানকার সাধনাই ভারতময় ত্যাগের হোমানল প্রজ্জ্বলিত করে' অঘটনঘটনপটু প্রেরণা উপস্থিত করছে!

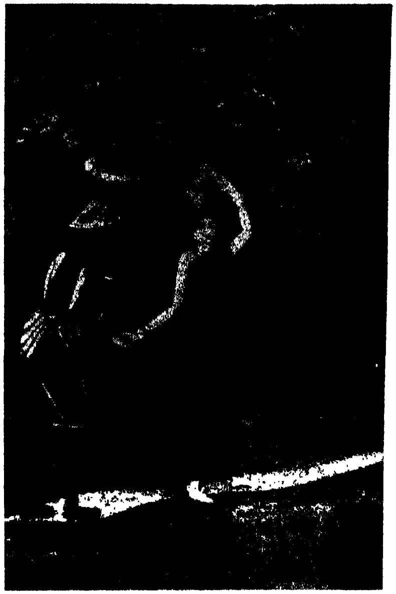
গুপ্তযুগে পাটলিপুত্র, পরবর্ত্তীযুগে গৌড় ও মুর্শিদাবাদ এবং আধুনিকযুগে কলিকাতা ভারতের সহিত জগতের সামাজিকতা স্থাপন করে এসেছে। কলিকাতার নব্য সভ্যতা পূর্ব্বভারতের প্রাচীন ধারাকে বহন করে' এক অভিনব ঐশ্বর্য্য দান করেছে। এদেশে এজন্য জাতি ও ধর্ম্মগত কোন সঙ্কীর্ণতা নেই। বাঙ্গলার মুসলমান বাদসাহরাও রামায়ণ মহাভারত অনুবাদে উৎসাহিত হয়েছে এবং বাঙ্গলার বিচিত্র ও বহুমুখী ছন্দে অধ্যাত্মসৌধ রচনায় অগ্রণী হয়েছেন! বস্তুতঃ গৌড়ের মসজিদগুলি ইসলামীয় জগতে একেবারে নূতন ধারা উপস্থিত করেছে--যা' আর কোথাও হয়নি।

ভারতের আধুনিক সঙ্ঘাতের ভিতর অকুতোভয়ে নারীরা অগ্রসর হয়েছেন এটা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সমবেত সাধনা বা চক্রগত উদ্দীপনায় যে মাদকতা আছে—তা' সামাজিক ব্যাপার, তা'তে ব্যক্তিহৃদয়ের উৎকর্ষ বা সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রস্ফুট করে' তোলেনা। ভারতের অন্যত্রও মেয়েরা রাষ্ট্রজীবনে নেবে পড়ছে—এ সব ব্যাপার অনেকটা ছোঁয়াচে। প্রশ্ন হচ্ছে, বহিরঙ্গ আন্দোলন ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তের গভীরতা ও হৃদয়ের অগ্নিপরীক্ষার কোন আয়োজন দেখা যাচ্ছে কি? সব কিছুরই চরম সৃষ্টি হৃদয়শতদলে। সেখানে কোন নূতন জাগরণ বা শিহরণের বিকাশ প্রস্ফুট হচ্ছে ত?



দেবদাসী

প্রভাস নলিনী ব্যানার্জ্জী



তরুতলে

কিরণবালা সেন

রম্যকলাক্ষেত্রেই সভ্যতা ও শীলতার (culture) লীলা হিল্লোলিত হয়। কৃত্রিমভাবে বা জোর করে' এ জায়গাটি দখল করা যায়না। একটি জায়গায় নিত্যকার কোন ভাবের ঝটিকা প্রবাহিত হচ্ছে কিনা দেখতে হলে সঙ্গীত চিত্র ও মূর্ত্তিকলাদির ক্ষেত্র দেখতে হবে। এ বিচারে বাঙ্গলাদেশের অগ্রগতি অটুট আছে বল্‌তে হয়।

এখানকার নারীজাগরণ রুক্ষ ও কর্কশ বাস্তব ক্ষেত্রের ধূলিতে জর্জ্জরিত হয়ে যায়নি। অসীম মানুষ যেখানে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ সেখানে মুক্তির অনাহত ধ্বনি অহরহ উদ্বেলিত হচ্ছে। স্থূলতর বাক্ মনের অতীত ক্ষেত্রে ঊর্ণনাভের তন্তুজালের মত অনুভূতির চক্র বর্ণের, ধ্বনির ও দৃশ্যের পট পরিবর্ত্তন করছে দিন দিন। যে সব রূপের পাত্রে গ্রহণ করায় অধিকার যাদের হয়নি, সে জাতি মৃত। বাঙ্গলার জাগ্রত চিত্ত আজ বরণ করে নিয়েছে একটা নূতন বার্ত্তাকে। তাইত যতই কুহেলি থাকুক না কেন—সত্যের যেএকটা নূতন রূপসঙ্গম হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

চিত্রকলাক্ষেত্রে একটা বিপ্লব এসেছিল বাঙ্গলা দেশে। এক সময় পল্লীকলার (Folk art) পট ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলঙ্কারিক বস্তু দেশের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করে' রাখত। নব্য সভ্যতার স্পর্শে সে সবের উপর যবনিকাপাত হয়। তারপর ইউরোপীয় পদ্ধতির নূতন আয়োজন ও আবেষ্টনে মণ্ডিত একশ্রেণীর চিত্রকলা, বিরূপ সঙ্গীতকলা, অভিনব সৌধকলা প্রভৃতি ভারতে এসে পড়ে।

নব্য আন্তর্জ্জাতিক রাজধানী কলিকাতায় এসব সমাদৃত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এ সমাদরের ভিতর গলদ ছিল। মোগলাই আবহাওয়া, বৈষ্ণব কবির কীর্ত্তনাদি পূজার্চ্চনার প্রাচীনধারা এতে লুপ্ত হ'তে পারেনি। কাজেই সবটা মিলে একটা অসঙ্গতি বারবার চিত্তকে আঘাত করতে সুরু করে।



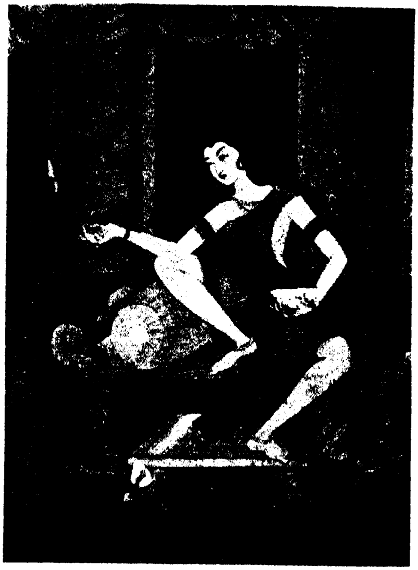
বধূ

নিবেদিতা বসু

চিত্রকলা ক্ষেত্রে এজন্য কয়েকটি ইউরোপীয় সমঝদারদের প্রেরণা ও সহায়তায় এদেশে একটা নূতন পদ্ধতি প্রচলিত হয়। তাতে করে শিল্পীরা মনে করে যেন তাদের মুক্তি হ'ল। সে যা হোক্ নব্য ভারতে সে পদ্ধতিই চল্‌তে সুরু করে। নূতন শিল্পীরা এশ্রেণীর চিত্রকলার সাহায্যে নব ভাব প্রকাশের সুযোগ পান। এ পদ্ধতি মিশ্রপদ্ধতি--ইউরোপের সহিত সামাজিক সম্পর্কটিও এদেশে মিশ্র ব্যাপার ছিল। কাজেই চিত্রকলার পদ্ধতিও সে হিসেবে অসঙ্গত হয়নি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ শিল্পীরা এই পথে সহজেই নেবে পড়েন। তাঁতে করে একটা বৃহৎ শিল্পচক্র গড়ে' উঠে। যে চক্র এখনও বাঙ্গলা দেশ ও ভারতের নানা জায়গায় রঙের জাল বুনতে মশগুল হয়ে আছে। সৌভাগ্যের বিষয় এ ক্ষেত্রে নারীরাও পশ্চাৎপদ হয়নি। নূতন আন্দোলনের জয়পতাকা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার অধিকার মেয়েদেরও হয়েছে। তার পরেও যে দু একটি নূতনতর চিত্রচক্র সৃষ্ট হয়েছে তাতেও মেয়েরা অতি নিপুণ ও মনোহর রচনায় সকলের মনোরঞ্জন করিতেছেন।

নব্যভারতীয় চিত্রকলার প্রাথমিক সৃষ্টিপ্রসঙ্গ উচ্ছসিত আবেগে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সে প্রেরণা সম্প্রতি আর নেই। শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর চিত্রাদি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সে সময়। প্রতিমা দেবী বোলপুরচক্রের প্রতিনিধি হলেও চিত্রকলায় নিজের স্বাধীনতা ও কাল্পনিক ঐশ্বর্য্য প্রমাণিত করিতেছেন। শিল্পীর বিচিত্র বর্ণকুহক সঙ্গীতের বহুমুখী তরঙ্গভঙ্গের ন্যায় চিত্রকে একটা বিশিষ্ট শ্রীদান করে' যা' পুরুষ শিল্পীতেও দুর্লভ। ইদানীং এই প্রতিভাবতী মহিলা চিত্ররচনা বোধ-



প্রিয়

কুমারী নিবেদিতা ঘোষ



দুনিয়ার দেনা

হাসিরাশি দেবী

হয় ছেড়েই দিয়েছেন। প্রতিমাদেবীর সাধনাকে অন্যান্য মহিলা শিল্পী ধারাবাহী করে' অগ্রসর হয়েছে। প্রাথমিক মহিলা শিল্পীদের ভিতর শ্রীমতী শান্তাদেবীর রচনা ও উপভোগ্য সন্দেহ নেই।

মহিলা শিল্পীদের ধর্ম্মবিষয়ক রচনা অতি মনোহর। এ সব চিত্রের সংযত কারুতা ও ধৈর্য্য সহজেই প্রশংসা অর্জ্জন করে। সকল শিল্পীর রচনা আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে। শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাসের প্রথম প্রয়াসে একটা বর্ণের আলঙ্কারিক তান আছে যা' বেশ উপভোগ্য। বাঁশী হাতে এক সুন্দরী প্রথম প্রয়াসের আনন্দে উৎসাহিত হয়েছে। রঙীন আকাশের ছায়া এসে পড়েছে একটি গাছের কুণ্ডলায়িতবঙ্কিম বেষ্টনী বাঁশীকে অভিনন্দন করছে মনে হয়।

শ্রীযুক্তা শান্তিদেবীর, দেবীঅর্চ্চনা বাঙ্গলার একটি উৎসবের ও পূজার প্রতিরূপক স্থানীয় হয়েছে। সরস্বতী দেশের একটা বিশিষ্ট ভাবের প্রেরণাকে মূর্ত্তিমতী করে' তোলে। শিল্পীর চেষ্টা তেমন দূরগামী না হলেও প্রীতিপ্রদ সন্দেহ নেই। প্রভাসনলিনী বন্দ্যোপাধ্যায়ের "দেবদাসী" অতি চমৎকার রচনা। দেবদাসীর সুললিত নৃত্যভঙ্গী. বেগুনী সাড়ী, সবুজ কোমরবন্ধ ও লীলায়িত শুভ্র পুষ্পমাল্যে অতি সঙ্গত হয়েছে। দেহভঙ্গী ও সুনিপুণভাবে এই আবেষ্টনকে সার্থক করেছে।

শ্রীমতী কিরণবালা সেনের গ্রাম্য দৃশ্য সহজ সারল্য ও অনাবিল আয়োজনে একটা গীতিকা-স্থানীয় হয়েছে। সামান্য আয়োজনের ভিতর মানুষের জীবনযাত্রা কিরূপে মুকুলিত হয় তা' এ ছবিতে সুস্পষ্ট হয়েছে। গ্রামের নগ্নশ্রী ও উন্মুক্ত প্রান্তর, দারিদ্র্যের অকুণ্ঠ আত্মদান ও নিস্তব্ধ উৎসর্গের সুর বহন করে বিস্তৃত হয়েছে। শিল্পী এই সামান্য বিষয়ের সাহায্যে একটা অসামান্য সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করেছেন।



সীবনরতা

ভদ্রা দেশাই



প্রার্থনা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

শ্রীমতী নিবেদিতা বসু "বধূ" চিত্রে প্রচুর সোনালী রঙ ব্যবহার করেছেন। মোগল চিত্রকলার রূপ ও রূপকে পূর্ণ হলেও এ ছবিখানি দুঃসাহসিক ব্যাপার। শিল্পী বধূর মুখশ্রীকে গোপন করে আনুষঙ্গিক আবেষ্টন উপস্থাপিত করেছেন। তা'তে একটা রহস্যের সঞ্চার হয়েছে সন্দেহ নেই। কুমারী নিবেদিতা ঘোষের "প্রিয়" সেকালের শুকসারিকার ইতিবৃত্তকে যেন প্রাণদান করেছে। শিল্পীর সহজ আয়োজনও পর্যাপ্ত মনে হয় রেখার কৌলীন্যে ও বর্ণের সংযমে। নব্য প্রাচ্য চিত্রকলা ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত হাসিরাসি দেবীর দান সামান্য নয়। তিনি বহু চিত্র এঁকেছেন। এ সব চিত্রে একটা কঠিন সংযম ও আবিষ্ট একাগ্রতা দেখা যায়। শিল্পীর অনেক চিত্র বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। ইদানীং নারী রচনার ক্ষেত্রে এরূপ প্রতিভা দুর্লভ। শ্রীমতী হাসিরাশির "দুনিয়ার দেনা" একখানি কাব্যস্থানীয় রচনা। এ রচনার লীলায়িত রেখাপুঞ্জ দুনিয়ার দেনার জটিলতাকে উপস্থিত করছে মূর্ত্তভাবে। বস্তুতঃ শিল্পী বিশেষভাবে অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য এবং নবীনতর সৃষ্টিক্ষেত্রের অগ্রণী

হওয়ার অধিকার সঞ্চয় করেছেন নিঃসন্দেহ। ভারতের অন্যত্র নারী শিল্পীদের সাধনা এ সব সৃষ্টির তুলনায় যে দুর্ব্বল তা' শ্রীমতী ভদ্রা দেশাইয় সীবনরতা চিত্রে প্রস্ফুট হবে।

আধুনিক শিল্পীদের ভিতর শ্রীমতী রাণী চন্দ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন "লিনোকাট" ও অন্যান্য চিত্রকলায়। শ্রীমতী নীলিমা দেবী ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (ময়মনসিংহ গৌরীপুর) সম্প্রতি প্রাচ্যচিত্রে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'প্রার্থনা' চিত্রখানিতে শিল্পী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী সুষ্ঠুভাবে তিব্বতীয় মন্দিরের পূজারীতিকে চিত্রাপিত করেছেন। এছাড়া শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ, নিভাননী দেবী, যমুনা দেবী, গৌরী দেবী প্রভৃতির চিত্রেও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও উঁচুদরের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়! এঁদের আঁকা ছবি বারান্তরে দেবার ইচ্ছে রইল।

শ্রীমতী সুনয়নী দেবীর চিত্রকলাও উঁচুদরের সৃষ্টি। শিল্পী পল্লীকলার (Folk Art) একটা বিশিষ্ট শ্রী আয়ত্ত করে, অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রে এদেশে নারীজাগরণ সার্থক হয়েছে।



গ্রন্থ-পরিচয়

The crumbling of Empire—M. J. Bonn

Allen and Unwin, 15S

সাম্রাজ্যের উত্থানপতন ঐতিহাসিক কাল হতে আজ পর্যন্ত চলেছে। শুধু এ উত্থান পতন যদিও মানব ইতিহাসে 'শাশ্বত অধ্যায়ের' একমাত্র বিষয় বস্তু হতে পারে না তবু এর সাথে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত আছে সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতীয় জীবনের ক্রমাবর্ত্তন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রম বিকাশ। কাজেই এ ভাঙ্গা গড়াকে উপেক্ষা করে কোন ইতিহাস রচনা সম্ভব হতে পারে না। এ ভাঙ্গা গড়ার মর্ম্মমূলে কোন্ শক্তি কাজ করেছে তা নিয়ে বহু মতবাদ সৃষ্ট হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থ অবশ্য অর্থনৈতিক বা অনুরূপ কোন মতবাদ সমর্থনের জন্য লেখা হয়নি। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে 'The age of empire breaking is following the age of empire making'. অবশ্য ধ্বংশের গর্ভেই রয়েছে সৃষ্টির অন্তহীন সম্ভাব্যতা—পরিবর্ত্তনের নিত্য সম্মুখগামী গতিবেগ। কাজেই সাম্রাজ্যের উত্থান পতন ও এই নৈসর্গিক নিয়মানুযায়ী হবে সন্দেহ নেই। বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ভেতর যে অবিচ্ছেদ্য আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রয়েছে এ গ্রন্থে তা খুব ভালভাবে দেখান হয়েছে। কিরূপে পাশ্চাত্য জাতিগুলি এসিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি অনুন্নত দেশে 'Peaceful penetration' করতে গিয়ে বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদের পরম পরিণতিকে ডেকে আনল তা' অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলী থেকে দেখান হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হল কোন্ উৎস থেকে? পররাজ্য লিপ্সা, বাণিজ্য বিস্তার, ধনিক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থ, সামরিক শক্তির মদমত্ততা, না, জাতির জন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য—ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার একটু ভ্রান্ত ও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। যদিও প্রত্যেক দেশ খাদ্য ও কাঁচা মালের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তবু বাণিজ্য-বিস্তার শুধু উপনিবেশগুলিকে শাসন ও শোষণের জন্যই সম্ভবপর হয় একথা তিনি স্বীকার করেন না। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা প্রভৃতি অধীনদেশগুলি 'Bled white' না হলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ব্রিটেনের স্থান কোথায় হত এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের 'graceful evasion' অবশ্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে উপনিবেশগুলি যদিও প্রথম অবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থ সিদ্ধির প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, তবু পরিণামে শাসন সংরক্ষণের খরচ বাদ দিয়ে অতি সামান্যমাত্র উদ্বৃত্ত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ইতালীর আবেসিনিয়ায় 'New Holy Roman Empire'এর কথা বলা হয়েছে। তবে

ভারতবর্ষ বা আফ্রিকার স্বর্ণ খনিগুলি ইংলণ্ডের 'loosing concern' কিনা ইহার আলোচনা নেই।

দুর্ব্বল জাতিকে গ্রাস করার চেয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ অনেক লাভজনক বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু ইংলণ্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি 'Super industrialised' দেশে যে ইহা সম্ভব নয় এবং 'Out-door relief'এর জন্য কতকগুলি উপনিবেশের একান্ত প্রয়োজন তাহা গ্রন্থকার ভুলে গেছেন।

তাহার মতে পর রাজ্য-লিপ্সার মূলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের চেয়ে বিজয়ের আত্মপ্রসাদ ও জাতির অহমিকা অধিক বলবতী। জার্ম্মেনীর 'place in the sun' শুধু prestige ও domination দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য একথা কোন বিশেষজ্ঞ দূরে থাক, কোন অজ্ঞলোকেও স্বীকার করবে না।

জাপানের চীন অধিকার করিবার চেষ্টায় কোন অর্থনৈতিক কারণ বা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি নেই, শুধু 'The Japanese themselves see it in the light of an anti-colonial movement, designed to break the domination of the West over the East.' একথা লিখে গ্রন্থকার সাম্রাজ্যবাদীর স্তাবক ও কৃপাপুষ্ট কবি নোগুচির সম গোষ্ঠীতে পরেছেন। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য উপনিবেশগুলি বৃটেনের অধীনে থাকা প্রয়োজন, তবে তিনি স্বীকার করেন 'Colonial co-operation for the purposes of liquidating white man's burden honourably and profitably to all concerned, is an aim well worth striving for.'

বাংলা কাব্যপরিচয়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা—১　মূল্য ২৲

কাব্যের ভেতর দিয়ে জাতীয় জীবন আত্মপ্রকাশ করে। জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পর্য্যালোচনা করতে গেলে তার কাব্যের ক্রমবিকাশও দেখ্‌তে হয়। প্রত্যেক জাতির ভাব ও কর্ম্ম-ধারা কাব্যে এবং সাহিত্যে যেমন প্রতিফলিত হয় তেমন আর কোথাও হয় না। জাতির অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে প্রাণবন্ধনে বাঁধতে পারে তার কাব্য, তার সাহিত্য।

জাতীয় জাগরণের প্রথমেই চাই জাতীয় সাহিত্য। ইহার অভাবে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় জীবন গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই বর্ত্তমানে দেশে যে নবজাগরণ এসেছে তাকে বাংলা কাব্যের মনোময়, প্রাণময় ধারার সাথে পরিচিত করা মানে দেশাত্মবোধকে জাতীয় হৃদয়ে উদ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

এ যুগ সন্ধিক্ষণে কবি কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' জাতীয়তার অশেষ কল্যাণ সাধন করবে।

বাংলা সাহিত্যের বিকাশ হতে আজ পর্য্যন্ত অনেক কবির কবিতা সংগৃহীত হয়েছে—আলাওল, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হতে সুরু করে বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য সেন, জীবানন্দ, জসীমউদ্দিন প্রভৃতি বহু আধুনিক কবিরাও এ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছেন।

সঙ্কলন কার্য্যে অনেক সময় ব্যক্তিগত রুচি এসে পড়ে। ফলে কবিতার বিচার ঠিক কাব্যের আদর্শানুযায়ী হয় না। 'passive suffering' কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে না—এ ব্যক্তিগত অভিরুচিতে Yeats যেমন Oxford Selectionএ বহু আধুনিক কবিদের বাদ দিয়েছেন। তাই এ অসুবিধার কথা কবিবর ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছেন। 'যিনি সাহিত্যের বাছাই করার ভার নেন তাকে অগত্যা ধরে নিতে হয় যে তাঁর রুচি সাধারণ রুচির পরিচায়ক, কিন্তু আর এক দিকে তাঁর রুচির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও সম্পূর্ণ আত্মগোপন করতে পারে না।

কবিবরের ভূমিকাটি অত্যন্ত সারগর্ভ ও সুচিন্তিত হয়েছে। প্রত্যেক সাহিত্যসেবীকে ইহা বিশেষ প্রণিধান সহকারে পড়া উচিত।

আমাদের সাহিত্যসেবা কেন চিরন্তনের ক্ষেত্রে কোন বৃহৎ রূপ প্রকাশ করতে পারে না, কেন ইহার রেখা ক্ষীণ, বর্ণ অনুজ্জ্বল, ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ভূমিকায় কবি লিখেছেন 'বর্ত্তমান যুগের বিরাট বিক্ষুব্ধ ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল থেকে আমরা দূরে আছি, আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশাল ও প্রবল জীবনের ভূমিকার যথেষ্ট অভাব; নব নব বিপ্লবক্ষুব্ধ পরীক্ষার ও সৃষ্টিতৎপর দ্বন্দ্ব-পরায়ণ অধ্যবসায়ের নির্ঘোষ দূরের থেকে শুনে আমাদের মন আকৃষ্ট, তার ধ্বনিকে প্রতিধ্বনিত করবারও চেষ্টা করি, কিন্তু উদ্যোগী হিসাবে বা দর্শক হিসাবে বা স্থানীয় ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে সমাজে বা রাষ্ট্রে সে আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয় নয়। এই জন্য বিচিত্র বিশ্বব্যাপার সম্বন্ধে—আমাদের বাণীর প্রেরণা দুর্ব্বল।

আধুনিক কবিতার উপর সজনীকান্ত প্রভৃতি বহু সাহিত্যিক খড়্গহস্ত। আধুনিক কবিতার মূল্য সম্বন্ধে এরা সন্দিহান। কিন্তু এ সম্বন্ধে কবির উক্তি উল্লেখযোগ্য। কবি বলছেন, 'আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে'।

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি পুরান কবিদের ভেতর জগা কৈবর্ত্ত, বাউল গঙ্গারাম, বিশা ভূঞিমালী প্রভৃতি কয়েকজন অখ্যাতনামাও স্থান পেয়েছেন।

আধুনিক কবিতার ভেতর বুদ্ধদেবের 'শাপভ্রষ্ট', আব্দুল কাদিরএর 'জয়যাত্রা' ও মহীউদ্দিনের 'বুভুক্ষা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরাতন কবিতা ছাড়াও কবির কয়েকটি আধুনিক কবিতা সঙ্কলিত হয়েছে।

কবি নিজেই সঙ্কলনের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করেছেন, সে দিকে বলার তেমন কিছু নেই। তার কবিতার সাথে কবিদের জীবিতকাল ও সংক্ষিপ্ত জীবনী থাকলে বর্ত্তমান সঙ্কলনই সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হত।

শৈলেশ রায়

সম্পাদকীয়

জাতীয় আন্দোলন ও অহিংসা

গত ১৩ই আগষ্টের "হরিজন" পত্রিকায় গান্ধীজী জাতীয় আন্দোলনে হিংসা ও অহিংসা সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট মতামত বিবৃত করেছেন ; রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসানীতির ব্যাপক প্রয়োগ, গান্ধীজীর অপরূপ উদ্ভাবন, সন্দেহ নাই। অদ্যকার যুদ্ধ-জর্জ্জর জগতে অহিংসা-নীতির প্রয়োজন আছে ; মানব সভ্যতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে যে যুযুৎসু বর্ব্বরতা আজ সকল কৃষ্টি ও কল্যানকে মহতী বিনষ্টির পথে পাঠাবার উপক্রম করেছে, তার একান্ত উপশমের জন্যে মানুষকে কোনো না কোনো আকারে এই শ্রেয়স্কর নীতিকে গ্রহণ করতেই হবে ; ম্যাক্ডুগালের (Mcdougall) মতো মনস্তাত্ত্বিক গান্ধীজীর নীতিকে "Toolate" বলে যতোই না কেন উপেক্ষা করুণ। কিন্তু এই অতি-প্রয়োজনীর নীতিটির স্বরূপকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে সুনির্দ্দিষ্ট এবং কার্য্যকরী কোন সমাধান পাওয়া দুষ্কর হয়ে ওঠে। গান্ধীজীর নানা ব্যাখ্যান ও বিবৃতিতে যেন হিংসা-অহিংসা-তত্ত্বটী আরো ঘোরালো হয়েই ওঠে। তাঁর উপযুক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে মজুরদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের কর্ম্মস্থলে যাবার বাধা সৃষ্টি করাটাও বিশুদ্ধ হিংসাত্মক কাজ। এমন কি এক্ষেত্রে পূজিবাদীদের পুলিসের সাহায্য গ্রহণও তিনি সমর্থন-যোগ্য মনে করেন। এতে প্রশ্ন আসে, তবে হিংসা ও অহিংসার মধ্যেকার ছেদ-রেখাটী কোথায়? অহিংসা যখন প্রতিপক্ষকে পরাজিত করবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হচ্ছে, তখন কতোটুকু প্রবলতা সহকারে অহিংসাকে প্রয়োগ কর্লে অহিংসা আর অহিংসা থাকেনা, হিংসাতে রূপান্তরিত হয়ে উঠে, ঐ সমস্যার সমাধান কী ক'রে হবে? রাজনৈতিক ক্ষেত্রের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয় যে অহিংসা, তার সঙ্গে দার্শনিকের অহিংসার পার্থক্য আছে। রাজনৈতিক কর্ম্মপন্থার ভিতরে অহিংসার স্থান নিরূপিত হয় উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভূমি থেকে, বিশেষ কোনো আদর্শসিদ্ধির সৌকর্য্যই এখানে বড়ো কথা। কিন্তু দার্শনিক অহিংসাকে বিচার করেন গভীরতর তত্ত্বের দিক থেকে, তার সন্ধানী দৃষ্টি ব্যবহারিককে অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয় অস্তিত্বের মর্ম্ম-মূলে। রাজনৈতিক কর্ম্মী যে দৃষ্টিতে অহিংসাকে দেখেন, একজন তাত্ত্বিক ঠিক সেই দৃষ্টি দিয়েই ওঁকে দেখেন না। একজন রাজনৈতিক কর্ম্মীর জীবনে অহিংসার যে স্থানও অর্থ, একজন পরমহংসের

জীবনে অহিংসার সেই একই স্থান বা অর্থ নয়। রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম্মের মিশ্রন ক'রে ধার্ম্মিকের দৃষ্টিদিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অহিংসাকে বিচার করলে মূলে ভুল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তার ফলে ধর্ম্ম হলেও, রাজনীতি হবে কিনা সন্দেহ। মহাত্মাজী অহিংসার যে ধরণের চরম ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে কোনো রাজনৈতিক চরমপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য হয় কিনা, সে কথা বিচার্য্য। ভারত-বর্ষের গণ-আন্দোলনে অহিংসা-নীতির বিশিষ্ট প্রয়োজন আছে একথা বহু-স্বীকার্য্য। কিন্তু সেই অহিংসানীতির বাস্তব আকার ও প্রকৃতি কিরকমের সেইটাই আসল কথা। একটা অসম্ভব রকমের নৈতিক চরমমার্গ এক্ষেত্রে অবলম্বন করলে, সে পথ কোটী কোটী জন-গণের বোধগম্য হবে কিনা সন্দেহের বিষয় পিকেটিং বা এবম্বিধ কোনো রকমের প্রবল আন্দোলনই তাহলে সম্ভবহবে না। দার্শনিক দৃষ্টিতে অহিংসা কেবলমাত্র নেতিবাচক ভাব নয়; এর মূল তত্ত্ব আসলে পুরোপুরি অস্তিত্বমূলক। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অবিমিশ্র মৈত্রী ও প্রেমই এই অহিংসানীতির ভিত্তি। অথচ রাজনৈতিক লড়াইএর সময়ে প্রতিপক্ষের প্রতি অফুরন্ত মৈত্রী নিয়ে জনসাধারণ কী করে যে প্রবল যুদ্ধোন্মাদ সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদকে বিনষ্ট করবে, তার কোনো কৌশলই বিবৃত বা ব্যাখ্যাত হয়নি কোথাও। সামান্যমাত্র উগ্রতা উৎপন্ন হলেই যদি মানসিক বা বাচনিক অহিংসানীতিব ব্যতিক্রম হয় বলে গান্ধীজী উত্যক্ত হয়ে ওঠেন, তবে কোনো প্রবল সংগ্রামই চল্‌তে পারে না। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের একটী প্রবন্ধে গান্ধীজী বলেছেন যে শত্রুপক্ষের, তথা, ব্রিটিশের অমঙ্গল কামনা করাও অন্যায় হবে। শত্রু-পক্ষের মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপক্ষের মঙ্গল কী করে যে একই কালে সাধিত হতে পারে, তা বোঝা দুষ্কর। ব্রিটীশের স্বার্থ ও কল্যাণের সঙ্গে ভারতবর্ষের স্বার্থ ও কল্যাণ যে পুরোপুরি বিরোধী, একথা কে না স্বীকার করবে? কাজেই ভারতের মঙ্গলসাধন করার চেষ্টা ব্রিটিশের মঙ্গলসাধনার পরিপন্থী হবে, এ একেবারে অনিবার্য্য সত্য। গান্ধীজীর এই চরম অহিংসা-ব্যাখ্যান উচ্চাঙ্গের হতে পারে কিন্তু এ যে নিতান্ত অবাস্তব, তা বলতেই হবে। অহিংসা সম্বন্ধে এই বাস্তব-সম্পর্কহীন নীতির প্রবর্ত্তন জাতীয় আন্দোলনকে দিশেহারা ও দুর্ব্বল করবে। আমাদের মতে অহিংসা সম্বন্ধে বিশ্লেষণমূলক বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, যাতে করে দেশের কর্ম্মীদের এসম্বন্ধে অস্পষ্টতা দূর হোয়ে সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা জন্মে।

বাংলার রাজনৈতিক বন্দী—

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্বন্ধে বাংলা সরকার যে মনোভাব পূর্ব্বাপর দেখিয়ে আস্‌ছেন তার পরিবর্ত্তনের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছেনা। সম্প্রতি আটক বন্দীও তিন আইনে বন্দীদের মুক্তি উপলক্ষে সরাষ্ট্রসচিব অনেকখানি আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেছেন। বিনা বিচারে যাদের প্রায় দীর্ঘ নয় বৎসর যাবৎ কারাগারে আটকে রাখা হোয়েছে, তাদের ছেড়ে দেবার মধ্যে কৃতিত্ব যে কোথায় বোঝা দুরূহ। প্রায় দেড় বৎসর ধরে এদের মুক্তির জন্য দেশময় বিক্ষোভ ও অসন্তোষ লেগে ছিল। বাংলার অখ্যাত অজ্ঞাত গণ্ডগ্রামে পর্য্যন্ত এদের মুক্তি দাবী কোরে শত শত সভাসমিতি হোয়েছে

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের নির্দ্ধারিত নীতি কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করেননি—ক্রমশঃ মুক্তির যে নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তারই অনুসরণ ও দীর্ঘ দেড় বৎসর ধরে সমস্ত দেশের দাবীকে দলিত করে আজ তাদের মুক্তি দেওয়াতে সরাষ্ট্র সচিব আত্মশ্লাঘা অনুভব করতে পারেন কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞ হবার কোন কারণই দেখছিনা।

বাংলার মন্ত্রীমণ্ডলী রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও ঐতিহাসিক দূরদর্শিতার অভাব পূর্ব্বাপর দেখিয়ে আসছেন। যে কোন সভ্যদেশের ইতিহাসে দেখা যায় কোন বিশেষ অবস্থার সমাবেশে বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদ বা কর্ম্মপন্থার আবির্ভাব ঘটে এবং সেই অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তার রূপ পরিবর্ত্তন হয়। টেরোরিজম এমনি এক বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমিতে আবির্ভূত হোয়েছিল—বর্ত্তমানে সে পটভূমির পরিপূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটেছে। একথা সর্ব্বত্র স্বীকৃত এমন কি এই পরিবর্ত্তন সংঘটনের সমস্ত কৃতিত্ব যদিও সরকার পক্ষ আত্মসাৎ কোরে থাকেন—পরিবর্ত্তন যে হোয়েছে তা তারাও অস্বীকার করেন না। জগতের চিন্তাক্ষেত্রে যে বিপ্লবের সূচনা দেখা যাচ্ছে তার ছায়া ভারতবর্ষের উপরেও পড়েছে কিন্তু সে ভাবী বিপ্লবের সঙ্গে টেরোরিজমের কোন যোগাযোগই নেই—অথচ টেরোরিজমের ভূত বাংলাসরকারের স্কন্ধ থেকে নামছেনা, তার জের টেনে যেন আড়াই শতাধিক রাজনৈতিক বন্দীকে আটকে রাখবার যুক্তিরও অভাব হোচ্ছেনা। এদিকে দমদমও আলিপুর জেলে আন্দামান প্রত্যাগত বন্দীদের অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হোয়ে উঠছে—কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহারের ফলে আত্মসম্মান বজায় রাখা হোয়েছে অসম্ভব। কারা জীবনের স্বল্প সুযোগ-সুবিধার পরিসর দিন দিনই সঙ্কীর্ণতর হোয়ে উঠছে, গুরুতর অসুস্থতায় ও কর্ত্তৃপক্ষের উদাসীনতার খবরে দেশবাসী উদ্বিগ্ন না হোয়ে পারছেনা। ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর ১৭ জন পীড়িত বন্দীদের নাম প্রকাশের প্রস্তাবে সরাষ্ট্রসচিব অসম্মত হন—যদিও তিনি স্বীকার কোরেছেন যে এদের মধ্যে ১৪ জন দীর্ঘ দিন ধরে সাংঘাতিক ভাবে পীড়িত। সম্প্রতি দমদমও আলিপুর জেলের বন্দীরা অনশনের সংকল্প করেছে শুনে আমরা উদ্বিগ্ন থেকেও বিস্মিত হই নাই। গত ২৪শে আগষ্ট আলিপুর জেলের বন্দীগণ তাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য স্বরাষ্ট্রসচিবের নিকট আবেদন করেছেন। এর ফল কি হবে ভুক্তভোগীর তা অজানা নেই। কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি দমদম ও আলিপুরের বন্দীদের সঙ্গে দেখা ও আলাপ আলোচনা করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গেও তাঁর সম্প্রতি তিনদিন এ বিষয়ে আলোচনা হোয়েছে ও শেষদিন দীর্ঘকাল ধরে আলাপ হোয়েছে। এসব আলাপ আলোচনার ধারাও ফলাফল সম্বন্ধে দেশবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মহাত্মা গান্ধীর নিকট থেকে এপর্য্যন্ত কোন বিবৃতি আমরা পাইনি অথচ দেশবাসীর এবিষয়ে একটা কর্ত্তব্য রয়েছে—এই বন্দীদের মুক্তির জন্যে তারা দায়ী—আলাপ আলোচনা যদি শেষ সীমায় এসেও মীমাংসা খুঁজে না পেয়ে থাকে তবে সুস্পষ্টভাবে বন্দীদের ও সর্ব্বসাধারণকে তা জানানো দরকার। মহাত্মা গান্ধী মুক্তি সম্পর্কে সমস্ত আন্দোলন স্থগিত রাখতে অনুরোধ করেছিলেন—আশু মীমাংসার আশায়—তারপর মাসের পর মাস অতীত হোচ্ছে মীমাংসার আশা ক্রমেই ক্ষীণতর হোয়ে

এসেছে কারাপ্রাচীরের মধ্যে বন্দীরাও এই অনিশ্চয়তায় অধীর হোয়ে উঠেছে—এ অবস্থায় দেশবাসী যদি এদের মুক্তিসম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হোয়ে থাকে তবে কেবল যে কর্ত্তব্যের হানি হবে তা নয়, তাদের আত্মসম্মানও গভীরভাবে আহত হবে। এবিষয় আমাদের মত আলাপ আলোচনার ফলাফল দেশবাসীকে অবিলম্বে জানতে দেওয়া এবং মুক্তি আন্দোলনকে সর্ব্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত করা উচিত। আলাপ আলোচনার দ্বারা বাংলা সরকারের উদাসীনতা দূর করা যখন সম্ভব হোলনা— অন্যভাবে এদের সচেতন করবার দায়িত্ব রয়েছে দেশবাসীর। সে দায়িত্ব গ্রহণের উপায় সম্বন্ধে কংগ্রেস সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেবেন আমরা আশা করছি। কংগ্রেস যদি তা করতে অক্ষম হয় তবে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান বলে দাবীর যৌক্তিকতা সম্বন্ধেই শুধু যে যথেষ্ট সংশয়ের কারণ ঘটবে তা নয়, তার নেতৃত্বের মর্য্যাদাও বহুল পরিমাণে ক্ষুন্ন হবে।

সৈন্যসংগ্রহ আইন

সাম্রাজ্যবাদের মুখোস অনাবৃত হোয়ে দিনদিন তার নগ্নরূপ প্রকাশ হোয়ে পড়ছে। জগতের নিষ্পেষিত জনসঙ্ঘ সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ গড়ে তুলতে বিনা দ্বিধায় আর উৎসর্গীকৃত হোতে চাইছেনা। ফলে নানা আইনকানুন কোরে সেই অনিচ্ছাকে ব্যর্থ কোরবার আয়োজন চলেছে সর্ব্বত্র. ভারতবর্ষেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে মিঃ ওগিলভি কর্ত্তৃক নূতন সামরিক বিল উত্থাপিত ও আইন হওয়াতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারপক্ষ থেকে বলা হয় যে পাঞ্জাব গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায় অনুসারে এ বিল উপস্থিত করা হোয়েছে—পাঞ্জাবে নাকি কোন শ্রেণীর বক্তা সৈন্যসংগ্রহের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। এই বিল তাতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশেই রচিত, প্রকৃত শান্তিবাদ প্রচারে কোন বিঘ্ন ঘটাবেনা। প্রশ্ন হোচ্ছে ব্যাখ্যা নিয়ে। "শান্তিবাদ প্রচার" এবং সৈন্যসংগ্রহে বিঘ্ন ও বিদ্রোহ সৃষ্টির চেষ্টার মধ্যে সীমারেখা নির্দ্দেশ করবে কে? ২য় প্রশ্ন হোচ্ছে ভারতীয় সৈন্য কোন্ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে তাইবা নির্দ্ধারণ করবে কে? দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্পষ্টভাবেই বলেছে যে মুখ্যতঃ নিজেদের স্বার্থরক্ষাই কোন ভাবী যুদ্ধে তাদের যোগদানের কারণ হবে। পরবশ ভারতের পক্ষে একথা বলার পথ নেই। তার নিজের স্বার্থ ও সাম্রাজ্যসংরক্ষণ পরস্পরবিরোধী, অথচ তার সৈন্যদল উৎসর্গীকৃত হবে সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার্থে, অর্থাৎ তার নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে। যে সৈন্যদলের ভারতের স্বার্থবিরুদ্ধ যুদ্ধে প্রেরিত হবার পূর্ণসম্ভাবনা রয়েছে সে সৈন্যদলে ভারতবাসীর যোগ দিতে অস্বীকার করা স্বাভাবিক। জনসাধারণকে তথা সৈন্যদলকে এ কথা বোঝানোর অর্থ করা হোচ্ছে বিদ্রোহ প্রচার। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নিজ নিজ মত প্রকাশ এবং প্রচারের যে প্রাথমিক অধিকার প্রত্যেক সভ্যদেশের নাগরিকের আছে তা অতিমাত্রায় খর্ব্ব করা হোয়েছে। ৩য়তঃ এই আইন সমস্ত ভারতবর্ষের উপরে প্রযোজ্য হবে—কিন্তু একমাত্র পাঞ্জাব সরকারের প্রস্তাবানুযায়ী যদি এর প্রবর্ত্তন হোয়ে থাকে তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতিই খণ্ডিত

হবে। কারণ অন্যান্য প্রদেশের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন বোধ সরকারপক্ষ করেননি। মতামত সংগ্রহের জন্য এ বিল প্রচারের যে প্রস্তাব আনা হোয়েছিল তা অগ্রাহ্য করা হোয়েছে এই অজুহাতে যে বিপদ এতই আসন্ন যে মতামত সংগ্রহের অবকাশও নেই; কিন্তু তারপরই পাঞ্জাবে এ বিল সম্প্রতি প্রবর্ত্তিত হবে না, এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ কোরে সরকার নিজেদের পূর্ব্বের যুক্তিকেই খণ্ডন করেছেন। এই বিল সম্পর্কে মুসলিম লীগের কার্য্যকলাপ বিস্ময়কর। মিঃ জিন্না বিলটী সমর্থন কোরে বলেন যে তিনি এর বিরোধীতা করবেন বলেই স্থির কোরেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসপক্ষের যুক্তি শুনে একে সমর্থন করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কোরে মত পরিবর্ত্তন করেছেন। যুক্তিটী মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে সন্দেহ নেই। বিল সমর্থনের সপক্ষে তিনি আরও একটী যুক্তি দিয়েছেন যে ভারতীয় সৈন্যদলের শতকরা ৬০ থেকে ৭০ জনই মুসলমান এবং তারা যদি কংগ্রেসের প্রচারে প্রভাবান্বিত হোয়ে সৈন্যদলে যোগ না দেয় তবে শুধু যে তাদের চাকুরী যাবে তাই নয় বিদ্রোহকরার জন্য শাস্তি লাভও ভাগ্যে ঘট্তে পারে—কাজেই বিলের বিরুদ্ধাচরণ করা অর্থ মুসলমান স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করা। এই সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে—জামিয়াৎ-উল-উলেমা এক ফতোয়া জারী কোরে সমস্ত মুসলমানদের এই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে নির্দ্দেশ দেয়। মিঃ জিন্নার বিকৃত দৃষ্টিতে যাবতীয় ব্যাপারই হিন্দুমুসলমান সমস্যারূপে দেখা দেয়। দেশের ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ ও সমগ্রতার দিক দিয়ে কোন কিছুকে বিচার করবার মত উদার দৃষ্টিভঙ্গীর তাঁর একান্ত অভাব। মুসলীম লীগের দেশের স্বার্থের পরিপন্থী এই ভেদবুদ্ধি সম্বন্ধে মুসলমান সমাজ যত শীঘ্র সচেতন হন ততই মঙ্গল। সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী সরকারও যে এই বিভেদের নীতির পরিপোষকতা করে থাকে সবরকমে, এই সামরিক আইন প্রণয়ন ব্যাপারে তার আর একটী প্রমাণ পাওয়া গেল। সমগ্রভারতব্যাপী সভা-সমিতি করে এই আইন সম্বন্ধে মতামত দেশবাসী জানিয়াছে—কিন্তু এতে কেবলমাত্র বিক্ষোভ প্রকাশ ছাড়া ফল কিছু হবেনা তা আমরা জানি, কারণ জনমতের উপর যে শাসন প্রতিষ্ঠিত নয় সেখানে এর কার্য্যকারিতা সীমাবদ্ধ, তবে আমাদের হাতে এটাই একমাত্র অস্ত্র সে কথা মনে রেখে জনমতকে এর বিরুদ্ধে সংহত ও দৃঢ় করতে হবে।

সরকারী প্রচারবিভাগ

আধুনিক জগতে সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রচার বা Propaganda একটা বিশেষ শক্তিশালী অস্ত্র। এতদিন সকল দেশেই রাষ্ট্র এই অস্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রধানতঃ উদাসীন ছিল। কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবীর প্রধান রাষ্ট্রগুলি এ সম্বন্ধে প্রখরভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে। আধুনিক জগতে গোলা-বারুদ থেকে প্রচারকে কেউ কম শক্তিশালী অস্ত্র বলে মনে করেনা। কাজেই যে কোন শাসনকে সমর্থন করবার জন্য সুগঠিত ও বহু-বিস্তৃত প্রচারবিভাগের অস্তিত্ব রাষ্ট্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ

হোয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের বাংলা সরকারও এ বিষয়ে যে কোন প্রথম শ্রেণীর সভ্য রাষ্ট্র থেকে কম যান না। অন্যান্য রাষ্ট্রের মতন শক্তি, যোগ্যতা ও কৃতিত্ব থাকুক কি না-ই থাকুক, আত্মপ্রচারের বেলায় সকলের সঙ্গে সমান তালে চলবার দুঃসাহস কারুর চাইতে কম নয় এদের। ইতিপূর্ব্বে বাংলা সরকার যে সব পন্থা অবলম্বন করে জনসাধারণকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করেছে, এবং যে উপায়ে জাতীয় সংবাদপত্রগুলোকে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছে সেসব কাহিনীর সঙ্গে সকলেই পরিচিত আছেন। অর্থের দ্বারা, বিজ্ঞাপনের লোভ দেখিয়ে কোন কোন জাতীয় সংবাদপত্রিকাকে যে সরকার পক্ষের প্রচারের মুখপত্রে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে, এ ঘটনা যে কেবল সরকারপক্ষের নীতিজ্ঞানের অভাবকে সূচিত করে তা' নয়; এ আমাদের জাতির চিরকালের কলঙ্ক ও লজ্জার কারণ হয়ে ইতিহাসে থাকবে। তারপরে হকমন্ত্রীমণ্ডলীর প্রচারবিভাগে গঠনের নতুন চেষ্টাও কম আশঙ্কার কারণ নয়! এর জন্যে এক লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়েছে, তাছাড়া সমস্ত প্রচার-বিভাগকে আলাদা করে এনে হকমন্ত্রীসভার অধীনে চালনা করার ফলে এ বিভাগ হয়ে দাঁড়াবে কার্যাতঃ কোয়ালিশান দলেরই প্রচারবিভাগ। এতদ্ব্যতীত অর্থ দিয়ে ও সরকার তরফ থেকে বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজগুলোকে হাত করার প্রস্তাবও অত্যন্ত আপত্তিজনক। গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এই প্রকার অর্থদানের ফলে পত্রিকার স্বাধীনতা খর্ব্ব হতে বাধ্য এবং তাতে করে জাতীয় আন্দোলনের সমূহ ক্ষতি হবে এবং প্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। হকসরকারের এই নূতন প্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন হওয়া দরকার।

অফিসিয়াল রেকর্ডস্ বিল

হক সরকার আবার নতুন এক নাগপাশ প্রস্তুত করছেন বাংলাদেশের সংবাদগুলিকে বাধবার জন্যে। সরকারী দলিল সংক্রান্ত আইনের একটা খসড়া প্রকাশিত হয়েছে ১লা সেপ্টেম্বর। এই আইন চরম স্বেচ্ছাচার-তন্ত্রের একটা লজ্জাকর দৃষ্টান্ত! প্রথম থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছে যে নতুন শাসনসংস্কারে জনমতই সত্যিকার শাসক হবে। কিন্তু যেভাবে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে দিনের পর দিন হাজার পেষণে বিকল করে তোলা হচ্ছে, তাতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন যে গণমতকে গলা টিপে মারবার একটা সুসভ্যতর কৌশল মাত্র সেই সন্দেহেরই উদ্রেক করছে। পূর্ব্বে অনুমতি না নিয়ে গভর্ণমেণ্টের কোন অপ্রকাশিত দলিল বা দলিলের কোন অংশ কেহই প্রকাশ করতে পারবে না। করলে, কেবল প্রকাশকারী লেখক বা বক্তাই শাস্তি পাবে না, আমানতের টাকা ও ছাপাখানা পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত হতে পারবে। আমাদের বিশ্বাস, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যদি কোন সংবাদ, তথ্য বা দলিল প্রকাশ্য দিবালোকে উপস্থিত করার দরকার হয়, তবে সরকারের এই সকল সন্ত্রাসজনক আইন কাউকেও সত্য প্রকাশের কর্ত্তব্য থেকে বিরত করতে পারবে না। বাংলার জনসাধারণ যে এই মধ্যযুগীয় আইনকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেবে, তা' বিশ্বেস করতে ইচ্ছে হয় না।

চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

একটা জাতির সব কিছুর মাপকাটী যখন যোগ্যতা না হয়ে, হয় সম্প্রদায়, তখন বুঝতে হবে সে জাতির ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার। আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে আজ দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ছে ; ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নগণ্য বিষয় নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তারক্তির সীমা নেই ; এ যে কত বড় নির্ব্বুদ্ধিতা তা বলবার নয়। বিরাট জন সাধারণ যুগযুগান্ত থেকে ঘুমিয়ে আছে, দারিদ্র্য, অজ্ঞতায়, দুঃখে। আর মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আমরা চাকুরি নিয়ে কাড়াকাড়ি হানাহানি করে মরছি বৎসরের পর বৎসর। আমরা আগেও বলেছি, আজো বলছি, সাম্প্রদায়িক সমস্যা মধ্যবিত্তদের চাকুরী নিয়ে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের সমস্যা, জনসাধারণের স্বকীয় সমস্যা নয়। কিছুদিন আগে ব্যবস্থাপরিষদে কোয়ালিশনী দল সরকারী চাকুরীর একটা ভাগ বাটোয়ারার বন্দোবস্ত করিয়ে নিয়েছে। শতকরা ৬০টী চাকুরী মুসলমান, ২০টী তপশীলী হিন্দু এবং অবশিষ্ট ২০টী অন্যান্য সবাই পাবে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এতে সম্মতি আছে, কারণ সূক্ষ্ম ভেদনীতি দ্বারা জাতির ঐক্যকে ব্যাহত করবার ব্যবস্থা এই প্রস্তাবে রয়েছে। বাঙ্গালী জাতিকে প্রকারান্তরে তিনভাগে বিচ্ছিন্ন করে হক-মন্ত্রীসভা ব্রিটিশ সরকারের বহুদিনের ভেদনীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করলেন, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে। কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে এ ভবিষ্যৎবাণী করা যেতে পারে, যে নিদ্রিত জনসাধারণ একদিন ঘুম থেকে জাগবে এবং সেদিন আজকার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দের স্থান জাতির জীবনে থাকবে না।

সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে রেক্টর দিবস

গত ৩০শে আগষ্ট সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে রেক্টর দিবস ছিল। ঐ দিবসের উৎসব উপলক্ষে যে শোচনীয় পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছে, তাতে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের সহানুভূতিহীন মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেছে। মানপত্র পড়বার পূর্ব্বে অনুমোদনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে দেখাতে বাধ্য করার মধ্যে যে ডিক্টেটর-সুলভ মনোবৃত্তি প্রকট হয়েছে তা' নিতান্ত আপত্তিজনক। ছাত্রছাত্রীদেরও ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মান বলে একটা জিনিষ আছে কোন কোন কর্ত্তৃপক্ষ সেকথা ভুলে যান্ ; এবং তার ফলেই ছাত্রদের সজাগ মর্য্যাদা-জ্ঞানের সঙ্গে কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার-মূলক অজ্ঞতায় সংঘর্ষ বেঁধে যায়। প্রকাশ এক্ষেত্রে ১৭ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এবং সর্ব্বশেষে গেট বন্ধ অবস্থায় ছাত্রদের ওপরে লাঠীপ্রহার হওয়ায় এই ঘটনার যে লজ্জাকর পরিণতি হয়েছে তা, অবর্ণনীয়। এই ব্যাপার নিয়ে সমস্ত কলকাতা ও সমস্ত বাঙ্গলাদেশের ছাত্রসমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়েছে এবং হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সকল সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে ছাত্রদের এই অপমানের প্রতিবাদ করেছে। টাউন হলের জনসভায় কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের নিন্দা করে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতেও প্রমাণ হয়েছে সর্ব্বসাধারণ ছাত্রদেরই সমর্থন করছে। যেখানে সহজ সহানুভূতি ও সুবিবেচনা প্রয়োজন সেখানে কর্ত্তৃপক্ষের বৃথা

প্রেষ্টিজ ও অকারণ জেদ প্রবল হয়ে উঠলে সংঘর্ষ ও জটিলতা বাড়বে, এ-কথা অনিবার্য্য সত্য। আমরা আশা করি শিক্ষা-মন্ত্রী ফজলুল হক্ সাহেব এবং ভাইস্ চ্যান্সেলর খান বাহাদুর আজিজুল হক্ সাহেব এই দুঃখজনক ব্যাপারের একটা সম্মানজনক সমাধান করবেন। এই ধরনের ব্যাপার নিয়ে সমস্ত বাঙ্গলাদেশের যৌবন-শক্তির মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন ও বিক্ষোভ সৃষ্টি যদি হয়, তবে দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে সে পরিণতি আশঙ্কাজনক হবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কলেজ কর্তৃপক্ষকেও সুবিবেচনার সঙ্গে এই লজ্জাজনক ঘটনার অবসান করতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।





(এচিং) শিল্পী—গৌরী ভঞ্জ

জয়শ্রী

সপ্তম বর্ষ | কার্ত্তিক | পঞ্চম সংখ্যা

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

অনিলচন্দ্র রায়

কিছুদিন হইতে একটা প্রশ্নের গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাইতেছে, যতদিন যাইতেছে ক্রমেই তাহা স্পষ্টতর হইয়া কানে আসিয়া লাগিতেছে। একটা সংশয়াত্মক জিজ্ঞাসা একটা অস্ফুট অস্বীকার যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্ম যাহাকে বলি আমরা, আজিকার আধুনিক জীবনে তাহার কোন প্রয়োজন আছে কিনা, অর্থাৎ একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে, ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই।

কথা উঠিয়াছে, ধর্ম্মকে বাদ দিয়াই চলে। কেবল চলে, তাহা নয়। ধর্ম্মকে বর্জ্জন করিয়া এই যে চলা ইহাই মানুষের সত্যিকারের চলা, আসল চলা, একেবারে পূরা কল্যাণের পথ ধরিয়া সার্থক চলা।

কিন্তু এই যে জিজ্ঞাসা, এই যে বিদ্রোহ, ইহা কেবল ধর্ম্মে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই আসিয়াছে।

মানুষের জীবনকে আজ মানুষের "বুদ্ধি" চ্যালেঞ্জ (challenge) করিয়াছে। জীবনের যত ভালো, যত মন্দ, যত সংস্কার, যত কিছু অনুষ্ঠান, সব কিছুকে সামনে দাঁড় করাইয়া মানুষ আজ নিছক বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করিয়া, পরীক্ষা করিয়া লইতে চায়। গতানুগতিক যে চিরকাল কেবলমাত্র চলিয়া আসিবার দাবিতেই তার পুরাণ পথ বহিয়া চলিতেই থাকিবে, তাহা হইবে না। আজ তাহার গতিকে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে 'Intellect'এর পাহারা, তাহাকে জবাবদিহি করিয়া তবে যাইতে

হইবে। পুরাতন যে কেবলমাত্র অনেকদিন টিঁকিয়া থাকিবার অজুহাতেই আরো টিকিয়া থাকিবার দাবী পেশ করিবে, তাহা আজ চলিবে না। বুদ্ধির পরীক্ষায় যাহারা পাশ করিবে তাহারাই কেবল ভবিষ্যতের দ্বার পথে আগাইবার পাসপোর্ট পাইবে। পুরাতনের রাজ্য ভরিয়া তাই সামাল্ সামাল্ পড়িয়া গিয়াছে,—কে থাকে, কে যায়। পড়িবারই কথা। মহাকাল আজ গা ঝাড়া দিয়াছেন, দিকে দিকে ভূমিকম্প সুরু হইয়া গিয়াছে। বড় বড় ইমারৎ বুঝিবা ভাঙ্গিয়া পরে।

ধর্ম্মে, সমাজে মানুষের হিসাব-নিকাশের কোলাহল আকাশকে মুখর করিয়া তুলিয়াছে,—গোলমালটা কিছুদিন যাবৎ পশ্চিম কোনেই ঘটা করিয়া আসে, আর তাহার ঝড় ঝাপটা আমাদের এই সনাতন পূর্বদিকে আসিয়া ও বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে। আমাদের এই শান্তির দেশে লোকজন সব আজো পরম সুখে নিশ্চিন্ত নিদ্রা যাইতেছে ; কিন্তু যাহারা সজাগ আছেন তাঁহারা উঠিয়া পশ্চিমদিকে কান পাতিতেছেন, আসন্নপ্রায় ঝড়ের চরণধ্বনি দিকে দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে। আমাদের ও আঙ্গিনার গাছে গাছে ডালে ডালে ইতিমধ্যেই বাতাসের চঞ্চল মর্ম্মর সুরু হইয়া গিয়াছে।

এখন কর্ত্তব্য কি! ঘুমাইলে তো চলিবেই না, মহারুদ্রের বেশে তুফান আসিয়া আকস্মিক সর্ব্বনাশের সূচনা করিবে, তখন মাথায় করাঘাত করিবারও সময় থাকিবে না। তবে কি চুপ করিয়া আকাশে তাকাইয়া হিসাব করিবো যে তুফান কবে আসিবে, কখন পৌছিবে? অথবা জল্পনা করিয়া রাত্রি ভোর করিবো যে, তুফান আসিলেও আমাদের সনাতন পবিত্র উঠানে হস্তক্ষেপ করিবে না, প্রতিবেশীর বাগান ভাঙ্গিয়া, পাকাধানের গোলা উজাড় করিয়া চলিয়া যাইবে। যাঁহারা আজ জাগিয়া আছেন, সেই "যামিনীর জাগরুকদল"কে বলিবার সময় আসিয়াছে, "যাহারা আজো নিশ্চিন্তে লেপমুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছেন, স্বপ্ন দেখিয়া হাসিতেছেন, কাঁদিতেছেন, বক্তৃতা দিতেছেন তাঁহাদিগকে ধাক্কা দিয়া জাগাইয়া দিন্।" তাঁহারাও কান পাতিয়া শুনুন যে পশ্চিমে ঝড় উঠিয়াছে, এখানে আসিবার দেরী নাই। ঝড় আসিবার আগে ঘরের খুঁটী শক্ত করিতে হইবে, যাহা ভাঙ্গা, জীর্ণ তাহাকে বদলাইতে হইবে, শক্ত নূতন খুঁটী দিতে হইবে। যে ঘর একেবারে ঘুণধরা, মুমূর্ষু, ভাঙ্গিয়া পড়িবার অপেক্ষায় আছে, সেইখানেই বিপদ লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, মায়া করিলে চলিবে না। নতুবা ঘর চাপা পড়িবার আশঙ্কা। মমতার সময় নাই। পূর্ব্ব পুরুষের চরণধূলি-বিজড়িত, পবিত্র আশ্রয়-নীড়কে ছাড়িয়া যদি পরের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হয়, তবে তাহাও করিতে হইবে। হয়তো বা এ চিরদিনের আশ্রয়, কত সুখদুঃখে কত হাসিকান্নার মায়াতে অনির্ব্বচনীয় হইয়া রহিয়াছে, হয়তো বা কত অতীত স্মৃতি, কত অতিক্রান্ত গৌরব ইহার ধূলা বালিতে, উঠানে রাশি রাশি ছড়াইয়া আছে ইহাকে মহিমান্বিত করিয়া, কিন্তু মানুষের বাঁচিবার দায়, মানুষের দেহ-মন-আত্মার সানন্দে, সবলে, সগৌরবে বাঁচিবার দাবী, জীবনে সব কিছুর আগে। মানুষের ভবিষ্যতের যিনি বিধাতা, মানুষের বর্ত্তমানের যিনি অধিষ্ঠাতা, তাঁহার দাবি অতীত দেবতার সকল দাবি, সকল প্রয়োজনের অনেক উর্দ্ধে,—শুধু আজ নয়, চিরদিন,

চিরকাল। অতীতকালের পুরানো ইটগুলি হইতে বাছিয়া বাছিয়া লইয়াই বর্ত্তমানের বিশাল বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে। অতীতকে অতিক্রম করিয়া তবেই বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যশালী। আর বর্ত্তমানের কঙ্কালকে দেহ দিয়া, রূপ দিয়া গড়িবার যে সাধনা, তাহাও তো ভবিষ্যতের পরিপূর্ণ রূপ-পরিকল্পনাকে সম্মুখে রাখিয়াই সার্থক। সমস্ত বর্ত্তমানকে ছাপাইয়া ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তাইতো মানুষের কাছে এত বড়, এত বিপুল হইয়া দেখা দিয়াছে চিরদিন। অতীত হইতে মানুষের যাত্রা তো এই এক ক্রমকে অনুসরণ করিয়াই সেই আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। অতীতকে ছাড়াইয়া মানুষের জয়যাত্রা আজ বর্ত্তমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যাত্রা কি থামিয়াছে? থামে নাই, শুধু তাহা বর্ত্তমানকে পথে রাখিয়া ভবিষ্যতের অনির্দ্দেশ্য স্বর্ণমন্দিরের দিকে তীর্থযাত্রা করিবে।

হৌক না ভবিষ্যৎ অনির্দ্দেশ্য, হৌক্ না সে তীর্থ অনির্ণেয়, মানুষের যাত্রা থামে নাই হয়তো বা নিবিড় অন্ধকার সে মন্দিরের চূড়াকে জড়াইয়া আছে, হয়তো বা সমুখের পথরেখা গাঢ় কুয়াশার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, প্রভাতের অরুণালোকে তাহাকে এতটুকুও উদ্ভাসিত করে নাই। কিন্তু কতকালের প্রান্তরকে, কত যুগের অরণ্যকে পিছনে ফেলিয়া, কত মন্বন্তর কত যুগান্তরকে পার হইয়া যে যাত্রা সুরু হইয়াছে কোন বিস্মৃত দিনে, সে কি আজ বর্ত্তমানের পঙ্কিল পথ আর ভবিষ্যতের শঙ্কিল যাত্রাকে সমুখে বিসর্পিত দেখিয়াই ভয়ে পিছন ফিরিয়া বসিবে, আর তার পুরাতনকে মাল্য-চন্দন অভিনন্দন করিয়া লইবে? অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়ে সে কি মৃত অতীতের বুকের উপরেই তার চিরবিশ্রামের বাসা বাঁধিবে?

কিন্তু তাহা হয় নাই। মানুষের তীর্থযাত্রা সমুখের ভয়কে এড়াইবার জন্য অতীতের দিকে পশ্চাৎপদ্ হয় নাই। অতীতকে অতিক্রম করিয়া, বর্ত্তমানকে ছাড়াইয়া তাহার রথযাত্রা অবিশ্রাম চলিয়াছে ভবিষ্যের পানে। সমুখে যত কুয়াশাই থাকুক, বিস্তৃত কুহেলিকার মাঝে দৃষ্টিকে মানুষ প্রসারিত করিয়া দিয়াছে—কারণ কুয়াশাকে ভেদ করিতে হইবে। চারিদিকের একাকার অন্ধকারের মাঝে সকল শক্তিকে উন্মুখ করিয়া দিক নির্ণয় করিতে সে লাগিয়া গিয়াছে—পথকে অতিক্রম করিতে হইবে।

যুগে যুগে এই একই অমোঘ পথে একই সুনিশ্চিত গতিতে মানুষের ইতিহাস—ইতিহাস-বিধাতার ইহাই ইসারা। আজ এই ইসারাকে ভুল করিলে কল্যাণকে নির্ব্বাসনে দিতে হইবে। অতীত সত্য সন্দেহ নাই, কিন্তু অদ্বিতীয় সত্য নয়। যত জীর্ণই হৌক্, যত অকিঞ্চিৎকরই হৌক্ অতীতকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহা মানুষের প্রাণ পুরুষের অক্ষম স্থবিরতা, তাহার অচল জড়ত্ব। যাহা জীর্ণ, যাহা মৃত, তাহাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলিয়া দিতেই হইবে; যাহা কল্যাণ, যাহা জীবন্ত তাহাকে ডাকিয়া লইতেই হইবে, সে যদি নূতন পোষাকে, অচেনা রূপ ধরিয়া আসে তবুও।

মানবজাতির চলমান রথ আজ বিংশশতাব্দীর ঘাটে আসিয়া থামিয়াছে,—আবার যাত্রা

সুরু করিবার আগে দম নিতে হইবে। এবং ইতিমধ্যে একবার সমস্ত অতিক্রান্ত পথকে, তাহার পিছনের অতীতকে বিচার করিয়া, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

তাই আজ মানুষ তাহার এতদিনকার জীবনকে তন্ন তন্ন করিয়া যাচাই করিয়া দেখিতেছে,—তাহার যত প্রয়াস, যত সৃষ্টি সব কিছুর মূল্য নিরূপণ করিতে আজ তাহার সমস্ত সত্ত্বা তৎপর। পৃথিবী ভরিয়া জীবনকে লইয়া নাড়াচাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু এ বিশ্লেষণ, এ পরীক্ষার অস্ত্র হইল মানুষের "বুদ্ধি", তাহার Intellect.

দীর্ঘপথে চলিবার ও আত্মরক্ষা করিবার মানুষের দুইটি প্রবল সম্বল তাহার প্রজ্ঞা (Intuition) ও তাহার বুদ্ধি (Intellect)। তাহার যাত্রাপথে কখন কোন ক্ষণে যে ইহারা জাত, বিকশিত, বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, তাহা অনেক অনুমান, অনুসন্ধান করিয়াও জানা যায় নাই। কিন্তু যতটুকু জানা গিয়াছে তাহার ইতিহাস বিচিত্র। জীবনের ক্ষণে ক্ষণে নানা গূঢ় প্রয়াসের মধ্য দিয়া নানা বিচিত্র অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া একদিকে যেমন তাহার প্রজ্ঞা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া, এক পরমাশ্চর্য্য দিব্য দৃষ্টিতে বিকশিত হইয়া, ঘনাইয়া উঠিয়াছে; অন্যদিকে তাহার বুদ্ধি ও বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষে, কঠিন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া শানিত হইতে শানিততর হইয়া উঠিয়াছে। এই দুইকে আশ্রয় করিয়া মানুষের জীবন সম্পদে সম্পদে ভরিয়া উঠিয়াছে, তাহার সবগুলি পাত্র, সবকয়টা ভাণ্ডার, এই দুইটি পরম মিত্রের দানে একেবারে কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

আজ কথা উঠিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কাহার দাম বেশী এবং কাহার দান-ই বা বেশী? কেহ বলিতেছেন, বুদ্ধিই মানুষের পরম আশ্রয়; কেহ বলিতেছেন, প্রজ্ঞা।

তবে কি ইহাদের মধ্যে বিরোধ রহিয়াছে? বিরোধ আছে কিনা জানি না, তবে মানুষ ইহাদের মধ্যে বিরোধ সৃজন করিয়া লইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের পার্থক্য আছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

বুদ্ধি মানুষকে যে হিসাব দেয়, তাহা সহজবোধ্য, তাহার লাভলোকসানের খতিয়ান বুঝিতে মানুষের দেরী হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞা যে হিসাব তাহার দরবারে পেশ করে, মানুষের চোখে তাহা ঘোরালো বলিয়া ঠেকে, যে লাভলোকসানের ফিরিস্তি দাখিল করে তাহা সূক্ষ্ম, দুর্ব্বোধ, তাই মানুষের কাছে এত ধোঁয়াটে বলিয়া বোধ হয়। বুদ্ধি তার যন্ত্রপাতি লইয়া যেখানে মাপজোক করে, জরিপ করে—সেস্থানের পরিধি সঙ্কীর্ণ। প্রজ্ঞার যেখানে কারবার সেখানে সীমাহীন অতল। বুদ্ধি মানুষকে মাটির শক্ত পৃথিবীতে রাস্তা বাতলাইয়া দেয়, কিন্তু প্রজ্ঞায় তাহার ডানায় করিয়া উড়াইয়া লইয়া যায়—অন্তহীন, বাধাহীন নীল আকাশে। বুদ্ধির বিচরণ ক্ষেত্র জ্ঞাত, পরীক্ষিত। সেখানে সে নিশ্চিন্ত নিঃসংশয়তার সহিত observation, experiment এর কাঁধে ভর করিয়া পায়চারি করিয়া বেড়ায়। কিন্তু প্রজ্ঞার পরিক্রমণের ক্ষেত্র যেখানে, সেখানে অজ্ঞাতের অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়া পথের সন্ধান করিতে হয়, সেখানে দাঁড়াইবার কঠিন স্থান নাই।

এই জন্য বুদ্ধির আবিষ্কার যাহা, মানুষ তাহাকে সহজে গ্রহণ করে কিনা সন্দেহ। আর প্রজ্ঞার যাহা নির্দ্দেশ, তাহাকে বিনা জিজ্ঞাসায় গ্রহণ করিতে মানুষের অনেক সঙ্কোচ, অনেক দ্বিধা। প্রজ্ঞার আশ্রয়ে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে ধর্ম্মকে, আর বুদ্ধির সাহায্যে সৃজন করিয়াছে বিজ্ঞানকে। বিজ্ঞান তাই মানুষের প্রিয়তর মানব সন্তান। বিজ্ঞানের দাবী মানব-মনের কাছে তাই অতি সহজে গ্রাহ্য, বিনা দ্বিধায় স্বীকার্য্য।

বুদ্ধির উপর মানুষের নির্ভর দ্বিধাহীন। তাই আজ যে বিশ্লেষণই আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে জীবনের সব ভিত্তিকে, সব সৃষ্টিকে মানুষ কষিয়া লইতে চায় বুদ্ধির নিকষে। বুদ্ধি তাহার পরীক্ষাঘরের দ্বারে লটকাইয়া রাখিয়াছে খুব বড়ো রকমের একটা Sign of Interrogation. বিনা প্রশ্নে নাহি দিব সূচ্যগ্র অধিকার বলিয়া সে মানুষের ধর্ম্ম, সমাজ তাহার ব্যক্তির জীবন, তাহার সমষ্টির জীবন, তাহার বিশ্বাস, তাহার সংস্কার, এক কথায় তাহার সমস্ত সভ্যতাকে challenge করিয়াছে।

তবে কি মানুষের সমস্ত সভ্যতা ভুলপথে আজ এতদূর আসিয়া পড়িল? এত যুগ যুগ ধরিয়া যে পথ সে অতিক্রম করিয়া আসিল, সে কি সবখানিই বিপথ?

আজ এই কথাই বিচার করিবার, বুঝিবার, দিন আসিয়াছে।

মানুষের সভ্যতা! সে তো আজকার কথা নয়। সেই কবে, কোন যুগে জগতের আদিম নরনারী হিংস্রজন্তু সমাকুল বনপথে, অন্ধকার গিরিগহ্বরে বিচরণ করিয়া বেড়াইত; কত মেঘ-মেদুর অন্ধকার আকাশ তাহাদের অনাবৃত মস্তকে অশ্রান্ত বর্ষণ করিয়া যাইত, কত জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর পাখির গান তাহাদের বৃক্ষতলের, গহ্বর-গৃহের জীবনকে মুখর করিয়া তুলিত, সেখানে স্বচ্ছন্দজাত তৃণগুল্ম আর অযত্ন-বর্দ্ধিত পুষ্প-লতা-পল্লব তাহাদের মিলন শয্যা রচনা করিত—আর আকাশ বসুন্ধরা, সূর্য্যচন্দ্র সাক্ষী হইয়া তাহাদের বন্ধনহীন জীবনযাত্রা দর্শন করিত। সে কি আজিকার কথা? তার পরে কবে কোন ক্ষণে তাহাদের বন্যজীবনের অবসান ঘটিল, তাহারা বন কাটিল, পথ বানাইল, বাসা বাঁধিল; কবেই বা তাহারা প্রেমকে শিকল পরাইল বিবাহে, আর স্বাচ্ছন্দ্যকে খর্ব্ব করিয়া গলায় পরিল বন্ধনের মালা! তারপরে সমাজ আসিল, সম্পত্তি আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আসিল কত বিরোধ, কত সংঘর্ষ! কত দুঃখ, কত বেদনার মূল্য দিয়া, কত রক্তপাত, কত প্রাণবিসর্জ্জনের পথে ধীরে ধীরে পা বাড়াইয়া, কত ঝড়, কত দুর্য্যোগের বাধা পার হইয়া মানুষ আজিকার দিনটীতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। তিলে তিলে কত সঞ্চয় জমিয়া উঠিয়া তাহার বিপুল জীবন নির্ম্মিত হইল—কত ক্ষুদ্রের দান, কত মহতের ত্যাগ, কত দুঃখীর অশ্রু, কত সুখীর আনন্দ মিলিয়া জীবনের এই জটিল জাল বোনা হইয়া গিয়াছে—আজ এই যুগযুগান্তরের প্রান্তদেশে আসিয়া মানুষ কি আবার একটি একটি করিয়া গ্রন্থি খুলিতে আরম্ভ করিবে? এতদিনে যে জীবন জমিয়া উঠিল, সে কি কেবল ভুলের উপর ভুল স্তুপাকার হইয়াই রূপ পাইয়াছে? কত গোমুখী হইতে কত স্রোত বাহির হইয়া আসিয়া, কত

দিক হইতে কত সহস্র ধারা মিলিয়া মানুষের এই সুবিপুল জীবনগঙ্গা রচিত হইল, তাহার হিসাব নাই। এ কলনাদিনী কি আবার পূর্ব্বপথে ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আবার গোড়া হইতে যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে? না, ইহার গতিমুখ ঘুরাইয়া একটু রাস্তা বদলাইয়া দিলেই চলিবে।

সমাজজীবন ও ধর্ম্মজীবন, এই দুইটি ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সমস্ত সভ্যতা মানুষকে ধরিয়া আছে। সমাজজীবন বলিতে মানুষের সমষ্টিসম্পর্কিত সর্ব্বাঙ্গীন জীবনকেই বুঝি; তার রাজনীতি, তার সমাজনীতি, তার ব্যবহারনীতি, তার অর্থনীতি—সবকিছুই সমাজজীবনের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম্ম মানুষের অন্তর্জীবনের সূক্ষ্ম কাহিনী, অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্য কথা। সামাজিকতা ও ধর্ম্ম এই দুইকে লইয়াই মানুষ তার পরিপূর্ণ জীবনকে রচনা করিয়াছে; এই দুই জগতের সব চিন্তা, সব অনুভূতিকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের সভ্যতা।

আজ চিন্তাশীল এক সম্প্রদায়—যাঁহারা বুদ্ধিতে আস্থাশীল, তাহারা এতদিনকার পুরাতন সমাজকে একেবারে ভাঙ্গিয়া গড়িতে চাহেন। এখানে ওখানে মেরামতী বা আংশিক সংস্কার করিয়া নয়, একেবারে গোড়া হইতে আঘাত করিয়া করিয়া, আমূল ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আনকোরা নূতন তাজা সমাজ গড়িতে চান। রাজনীতির পুরাণো মাল যে democracy তাহাতে চলিবে না: অর্থনীতির ক্ষেত্রেও যে সম্পত্তি প্রথার উপর সমাজ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে; মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবনেও প্রচলিত বিবাহাত্মক ও পরিবার-তান্ত্রিক সমাজকে পৃথিবী হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে। যে সব অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করিয়া সমাজ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা বুদ্ধির আলো ফেলিয়া সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া রায় দিয়াছেন—এ সব অনুষ্ঠানের অন্তঃসার কিছুই নাই। মানব জাতির কল্যাণের পথকে রোধ করিয়া তাহারা অগ্রগতির বাধা হইয়া রহিয়াছে,—ইহাদের নির্ম্মূল করিয়া তবে পথ পরিষ্কার করিতে হইবে।

এইতো গেলো সমাজের কথা। অন্যদিকে ধর্ম্মকেও তাঁহারা বুদ্ধির test tubeএ ফেলিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। এবং তাহাকেও আবর্জ্জনা বলিয়া dust binএ ফেলিবার জন্য মানবজাতিকে ডাকিয়াছেন। এ আহ্বান যদি কল্যাণের হয়, তবে সাড়া দিতেই হইবে, না দিয়া উপায় নাই।

সমাজজীবনে যে challenge আসিয়াছে, তাহার অর্থ কি, সার্থকতাই বা কি, সে সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা করিব না, কারণ তাহা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়। শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে সে সম্বন্ধেই গুটিকতক কথা আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এ প্রবন্ধ শুধুই আলোচনা—এখানে last word কিছু নাই, কারণ last word বলিবার দিন আজো আসে নাই বলিয়া মানি। যাঁহারা প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী তাঁহারা হয়ত বলিবেন, প্রজ্ঞা ধর্ম্ম সম্বন্ধে last word দিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধির সঙ্গে প্রজ্ঞার বিরোধ কত তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইযাছে। এখানে প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করা হইবে না। কেবলমাত্র বুদ্ধির রাজ্যের পরিধিতে ঘোরাফিরি করিয়াই দেখা যাইবে

কতদূর অগ্রসর হওয়া যায়। এবং ধর্ম্মকে বুদ্ধির দ্বারা যাচাই করিয়াও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে last word না হইলেও penultimate word গোছের কিছু বলা যায় কিনা তাহাও দেখা যাইবে। কিন্তু আগেই বলিয়া রাখা ভালো, এ বলাও আমার নিজস্ব বলা হইবে না। বুদ্ধির রাজ্যে যাঁহারা কর্ণধার বলিয়া গণ্য এমনই দুই চারিজন বৈজ্ঞানিক যাহা বলিয়াছেন, তাহাই চয়ন করিয়া এখানে ধরিয়া দিব। last word হইলেও তাঁহাদের এবং penultimate হইলেও তাঁহাদেরই হইবে।

কথা উঠিয়েছে, ধর্ম্ম শুধুই কুসংস্কার। আফিম যেমন করিয়া মানুষের প্রাকৃতিক, সহজ বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নেশায়, ধর্ম্মও তেমনি করিয়া মানুষের শুভবুদ্ধিকে, কর্ম্মশক্তিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মকে বড় করিয়া মানুষ নিজে হইয়া গিয়াছে ক্ষুদ্র, কল্পিত মিথ্যাকে গৌরব দিতে গিয়া মানুষ সত্যকে করিয়াছে খর্ব্ব। ধর্ম্ম মানুষের অক্ষমতার জয়ধ্বজা, মানুষের দৌর্ব্বল্যের কালো নিশান।

ধর্ম্ম বলিতে কি বোঝা যায়, তাহা স্পষ্ট করিয়া জানা ভালো। ধর্ম্মের আছে দুইটী দিক, দুইটী aspect, একটী তাহার Spirit, অপরটী তাহার Form ; একটী তাহার মর্ম্ম, অপরটী তাহার কোষ। একটী তাহার অন্তর, অপরটী আবরণ। একটী হইতে সৃষ্ট হইয়াছে তাহার দর্শন প্রকরণ, অপরটী হইতে জন্ম নিয়াছে তাহার ক্রিয়া প্রকরণ। যাহা কোষ, যাহা বহিরাবরণ, তাহাই ধর্ম্মের ritualism, যাহা মর্ম্ম যাহা অন্তরঙ্গ, সেটী তাহার philosophy তাহার spiritualism।

বিজ্ঞান ধর্ম্মের এই দুই দিককে আক্রমণ করিয়াছে। তাহার বিরোধ ritualism এর সঙ্গে যেমন, philosophyর সঙ্গেও তেমন। একটীকে যদি একবাণে ঘায়েল করিতে চেষ্টা করিয়াছে অপরটীর প্রতি বিবিধ শরসন্ধান করিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মকে যেমন বিজ্ঞান আঘাত করিয়াছে, বিজ্ঞানকেও তেমনি ধর্ম্ম আঘাত করিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বিরোধ আজ নয়। বিজ্ঞান যখন নূতন আকার লইয়া জন্মে নাই, তখনও মানুষ বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্মকে আঘাত করিয়াছে বারবার।

এখানে শুধু একটিমাত্র প্রাচীন বিদ্রোহের উল্লেখ করিব ঃ শুধু এই জন্য যে প্রায় তিনহাজার বছর আগেও আমাদের এই ধর্ম্মের দেশে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কতবড় বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃহস্পতি, চার্ব্বাকের কথা সবাই জানে। তাঁহাদের মতবাদের কয়টী মূল সূত্র এই ঃ—

(১) পৃথিব্যপ্‌তেজো-বায়ুরিতি তত্ত্বানি (ভাস্করাচার্য্য-ব্রহ্মসূত্র)

(২) (ক) চতুভ্যঃ খলু ভূতের্ভ্যশ্চৈতন্যমুপজায়তে (সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ)

(খ) শরীরেন্দ্রিয়-সংঘাতঃ এব চেতনঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ (ভাস্কর)

(৩) (ক) পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি
স্বপিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥ (স-দ-সং)

(খ) স্বর্গস্থিতা যদাতৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্রদানতঃ
প্রাসাদস্যোপরিস্থানাং তত্র কস্মান্ন দীয়তে॥ (স-দ-সং)

(গ) অগ্নিহোত্রং ত্রয়ীতন্ত্রং ত্রিদণ্ডং ভস্মপুণ্ডকং
প্রজ্ঞাপৌরুষহীনানাং জীবো জল্পতি জীবিকা॥ (নৈ-চ)

স্থূলতত্ত্ব বা matter হইতেই চৈতন্য জন্মলাভ করিয়াছে। আত্মা আর কিছু নয়, দেহইন্দ্রিয়ের সমবায়ের একটা byproduct মাত্র। চৈতন্যও তাই। দৃশ্যলোক ব্যতীত other world কিছু নাই এবং যজ্ঞ তথা সমস্ত বেদতন্ত্র বা ritualism কেবল পুরোহিতদিগের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়, সর্ব্বসাধারণকে exploit করিবার ফন্দী।

চার্ব্বাকের atheism এই কটী মূল প্রস্তাব (proposition) দ্বারা সমস্ত ধর্ম্মের গোড়াকে আঘাত করিয়াছে। আজ আধুনিক নাস্তিক্যতন্ত্র ইহার বেশী কিছু বলে নাই। তাহাদের মূলসূত্র এইগুলিই। কেবল হাজার বছরের অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান ও চিন্তা ইহাদেরই উপর details যোগ করিয়া ইহাকে বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করিয়াছে।

বিজ্ঞান ধর্ম্মকে বুদ্ধির খুরধার অস্ত্রে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেক অংশ বা অনুকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়াছে, এবং তাহার জন্ম ইতিহাস বংশক্রম আদি অন্ত সবকিছুকে অতীত হইতে হাতড়াইয়া বাহির করিয়া এক বিস্তৃত systemএ বাঁধিয়া দিয়াছে। Spencer, Tyler হইতে Fraser, Freud পর্য্যন্ত সমাজতাত্ত্বিকগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহুতর সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব উপস্থিত করিয়াছেন। বিজ্ঞান ধর্ম্মকে নানা angle হইতে searchlight ফেলিয়া দেখিয়া যে সব বোধ দিয়াছে ও দিতেছে, তাহা হইতে অনেকেই মনে করিতেছেন যে, বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মের একেবারের মূলদেশে কুঠারাঘাত করিয়াছে। Spencer ধর্ম্মের জন্মের সন্ধান পাইয়াছেন, সেই বর্ব্বর যুগের আদিম মানুষের কুসংস্কারে।

মানুষ পায়ে পায়ে দেখিল তার দেহের ছায়া, জলে গিয়া দেখিল আপনার প্রতিবিম্ব অমনি অশরীরী জগৎ সম্বন্ধে তাহার সংস্কারও সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। রাত্রির স্বপ্নে সে কত রাজ্য ঘুরিল, শিকার করিল, কলহ করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দিবালোকের সিদ্ধান্ত হইল, তাহার দেহের ভিতরে আছে অদেহী আত্মা ; রাত্রি ভরিয়া দেহের বাহিরে আসিয়া সেই অদেহীরই যত কীর্ত্তি কর্ম্ম, যত ভোগ, যত দুর্ভোগ। কবে সেই আমাদের বর্ব্বর প্রপিতামহের দল তাঁহাদের কুসংস্কার ও কু-সিদ্ধান্তের বোঝা বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, যুগে যুগে সে বোঝার কলেবর বাড়িয়া বাড়িয়া বিপুল আকার ধরিয়াছে এবং আমরা বর্ত্তমান যুগের মানুষ সেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া দুর্ব্বহ ভারকে বহন করিতে আজো প্রাণপাত করিতেছি, মরিতেছি।

বিজ্ঞান ধর্ম্মের এই অতি নগণ্য, অতি অগৌরবের জন্মের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলে, যাহার উৎপত্তি কু-সংস্কার, আজিকার সভ্যতায় তাহার স্থান হইবে কি করিয়া ? যাহার গোড়ায় রহিয়াছে গলদ তাহার প্রতিষ্ঠা সমাজ কখনি স্বীকার করিবে না।

কিন্তু সত্যি কি তাই ?

উৎপত্তি যদি বা অগৌরবের হয়, তবে স্বতন্ত্র মহিমা কি তার প্রাপ্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চিত হইবে ! পদ্মের মৃণালকে ধরিয়া ধরিয়া যদি তার গোড়ায় যাই. তবে পাঁক বই আর কিছু দেখি না। কিন্তু তাই বলিয়া কি পদ্মের স্বকীয় ঐশ্বর্য্যের এতটুকু হানি হয় ?

হয় না। মানুষের জীবনের সবগুলি প্রতিষ্ঠানেরই কি উৎপত্তি অকিঞ্চিৎকর, এমন কি হাস্যকর নয় ? মানুষের নিজের আদি ইতিহাসই বা কি ? বিজ্ঞান নিজেই মানুষের যে ইতিহাস বাঁধিয়া দিয়াছে তাহাতে মানুষের origin লইয়া আজ গৌরব করিবার কিছুই নাই। ডারুইনের কথাই তুলিয়া দিতেছি—

"We must acknowledge, as it seems to me, that man with his noble qualities, with sympathy which feels for the most debased, with benevolence which extends not only to other men but to the humblest creature, with his godlike intellect which has penetrated into the movements and constitution of the solar system—With all these exalted powers—man still bears in his bodily frame the indelible stamp of his lowly origin."

মানুষের এই lowly originকে অতিক্রম করিয়া মানুষ আজ আত্ম সচেতন মহিমায় এতবড় সৌরজগৎকেও জয় করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে চায়। কবে সেই তারার নৃত্য সুরু হইয়াছিল অসীম আকাশের মহাশূন্যের মাঝে ! তারপরে নৃত্যপর তারকাদের দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বাহির হইয়া আসিল গ্রহ, উপগ্রহ ! সূর্য্যের আলোতে কবে আমাদের পৃথিবী-চন্দ্র রোদ পোহাইতে সুরু করিল ! দিনে দিনে কি করিয়া বিস্তৃত পৃথিবী ভরিয়া স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়া প্রাণশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল নব নব সৃষ্টিতে ! Molluse, custacea, Insect, Fish, amphibian, Reptile, Bird, Mammal—একের পর এক সবে দেহ পাইল, তারপরে সর্ব্বশেষে আসিল মানুষ। যে বিরাটপ্রাণ অন্তরাল হইতে আপনাকে এই বিস্ময়কর প্রণালীর উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম স্তরে উন্মোচিত, উদঘাটিত করিয়া তুলিতেছে, মানুষে আসিয়া সে এক অপূর্ব্ব, অভিনব পথে মোড় ঘুরিয়া চলিল। যাহা চলিয়া আসিয়াছিল স্থূলের বিকাশে, রূপ হইতে রূপান্তরে, যে বিবর্ত্তন বহিয়া আসিতেছিল জড়কে অবলম্বন করিয়া, মানুষে আসিয়া তাহা স্থূলত্বের "exaggeration", "cumbrous absurdityকে ছাড়িয়া বহিয়া চলিল সূক্ষ্মের বিকাশের পথে।" "Indefinite march of physical aggrandisement" হইতে আসিয়া বিকশিত হইয়া উঠিল, "Freedom of a more subtle perfection"এ। ইহার পরে মানুষের অভিব্যক্তি দৈহিক ঐশ্বর্য্যকে বর্জ্জন করিয়া মনোজগতের সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর বিকাশের দিকে আগাইয়া যাইবে এবং তাহাতে মানুষ কোন supermanএ রূপান্তরিত হইয়া সাম্রাজ্য বিছাইবে এই সৌরজগতের বুকে—তাহা আজো ভবিষ্যতের গর্ভে। (ক্রমশঃ)

'মিলেছিলো তব দেখা—'

অরুণা সিংহ বি, এ

কবে কোন যুগে, জন্মান্তরে—
মিলেছিলো তব দেখা,
আজিও আঁধারে স্মৃতি জাগে তার—
উজল প্রদীপ রেখা !
উদার আকাশ উষার আভায়,
ঝলোমলো করে কনক শোভায়,
তমসা নদীর তিমির বিদারী
উদার উদয়লেখা,—
মেঘের আঁধারে বিজলীর সম
মিলিলো তোমার দেখা।

সুন্দর তুমি সহাস নেত্রে
কুটির দুয়ারে এলে,
দীন আঙিনায় দেব দুর্লভ
কমল চরণ ফেলে !
বিস্ময়ে ভাবি—থাক্ গৃহকাজ—
অতিথি দুয়ারে আসিয়াছে আজ
এতদিনকার কোন উপহার
দিব সে চরণে ঢেলে,
কী নব বসন পরি লব এই
জীর্ণ সজ্জা ফেলে ?

জনমের পর জনম কেটেছে
তব লাগি' সাধনায়—
কণ্টকাঘাত চরণ, হৃদয়
বারে বারে মুরছায়।

লভি নাই, তবু, কর্ম্মাবসানে,
হেরেছি যে কভু ভরি' রহে প্রাণে,
পূজার অর্ঘ্য ধূপের সুরভি
কোথায় মিলায়ে যায়—
দেউলের দ্বার মোচন করোনি—
হিয়া শুধু মুরছায়!

আশেপাশে এসে যখনি ডেকেছো,
পেয়েছি চকিত দেখা,
আমার ধেয়ানে বাঁধিব এমন
মন্ত্র হয়নি শেখা।
জীবনে দীর্ঘ পথ আছে বাকী
পাথেয় রাখিনু তব ছবি আঁকি',
তিমির ছেদিয়া জাগিবে সে আলো
দীপ্ত উজললেখা
নিকটে পাবার নহো হে সুদূর—
তুমি যে দূরেরই দেখা।



ইংলণ্ডে বৃহত্তর শ্রমিক দল গঠন

নীচে লেনিনের লেখা একখানা চিঠির অনুবাদ ছাপানো হয়েছে। চিঠিখানা লেখা হয়েছে সিল্‌ভিয়া প্যান্‌খার্ষ্ট্‌কে। সিল্‌ভিয়া প্যান্‌খার্ষ্ট্ (Sylvia Pankhurst) ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত মহিলা-নেত্রী এবং সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মী। তিনি ১৯১৯ সনে ইংলণ্ডের দলগুলি সম্বন্ধে লেনিনকে একটা ধারণা দিয়ে তাঁর মত চেয়েছিলেন এই সব দলের ঐক্য সম্বন্ধে। সেই সময়ে ইংলণ্ডের শ্রমিক আন্দোলনেই সাতটা আলাদা আলাদা মতবাদ বা দল ছিল।

যথা :—

(১) পুরোনো ধরণের ট্রেড- ইউনিয়ানিষ্ট দলগুলি (Non-Socialist Trade-unionists)

(২) স্বতন্ত্র শ্রমিক দল (Independent Labour Party)

(৩) ব্রিটিশ সোস্যালিষ্ট পার্টি (British Socialist Party)

(৪) রেভোল্যুশানারী ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট (Revolutionary Industrialists)

(৫) সোস্যালিষ্ট লেবার পার্টি (Socialist Labour Party)

(৬) সোস্যালিষ্ট্ শ্রমিক ফেডারেশান (Socialist Workers' Federation)

(৭) দক্ষিণ ওয়েল্‌স্ সোস্যালিষ্ট্ সংঘ (South Wales Socialist Society)

এর ভিতরে ৪নং দল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরোধী এবং বিপ্লবী কর্ম্মপন্থায় (direct action) বিশ্বাসী। ৬ নং দল প্যান্‌খার্ষ্ট্‌এর নিজের দল। ৫ নং দল তখন বহু শ্রমিকের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল কারণ তারা পার্লামেণ্টী নির্ব্বাচনে যোগ দিয়েছিল। ৪, ৬ এবং ৭ নং দলের উল্লেখ লেনিনের পত্রের ভিতরেও রয়েছে।

এই সবগুলো দলই শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করছিল কিন্তু তখন তাদের মধ্যে প্রধান মতভেদ হচ্ছিল পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে যোগদান করা নিয়ে। কতগুলো দল পার্লামেন্টে যোগ দিয়ে কাজ কর্ব্বার পক্ষপাতী এবং কতগুলো ছিলো যোগ দেবার ঘোরতর বিরোধী। এই নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধের অন্ত ছিল না এবং ঐক্য হয়ে পড়েছিল সুদূরপরাহত। লেনিনের মতে ঐক্যই বড়ো প্রয়োজন এবং সবগুলো দল নিয়ে যদি একটা বড়ো দল নাও সম্ভব হয়, তবু অন্ততঃ দুটো বড়ো দল গড়া সম্ভব হলেও ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ প্রশস্ত হয়। শ্রমিক স্বার্থের প্রতি প্রীতি—এটা সবগুলো দলেরই যদি থেকে থাকে, তবে এই মৌলিক সাদৃশ্যই ঐক্যের ভিত্তি হ'তে পারে। পার্লামেন্ট নিয়ে মতভেদ সত্ত্বেও এই ভিত্তিতে সহযোগীতার প্রবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক বলে লেনিন মত দিয়েছেন। আমাদের দেশেও বর্ত্তমান কালে ঐক্যসাধনের সমস্যাই বড়ো সমস্যা। লেনিনের মতো সার্থক-কর্ম্মা বিপ্লবীর ঐক্য সম্বন্ধে উদার মতামত এ দেশের কর্ম্মীদের চিন্তার ও কর্ম্মের সাহায্য করতে পারে। এই কারণে অনূদিত চিঠিখানার গুরুত্ব আছে।

সম্পাদিকা, "জয়শ্রী"

কমরেড সিল্‌ভিয়া প্যান্‌খার্ষ্ট সমীপেষু,

২৮শে আগষ্ট, ১৯১৯

প্রিয় কমরেড,

আপনার ১৬ই জুলাই, ১৯১৯ তারিখের পত্র মাত্র কালকে পেয়েছি। ইংলণ্ড সম্বন্ধে যে সংবাদ দিয়েছেন তার জন্য অতিশয় কৃতজ্ঞ; আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে, অর্থাৎ আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে, চেষ্টা কোরবো।

একথা আমি জানি যে বহু শ্রমিক-কর্ম্মী নিয়ম-তান্ত্রিকতার বা পার্লামেন্টে যোগ দেবার ঘোরতর বিরোধী। একথাও জানি যে এই সব শ্রমিক অতি সৎ, উদার এবং গণ-সাধারণের সত্যিকার বিপ্লবী প্রতিনিধি। যে দেশে যত পুরাণো ধনতান্ত্রিক সভ্যতা এবং বুর্জ্জোয়া ডিমোক্র্যাসী রয়েছে সেখানেই একথা তত বেশী কোরে সত্য। কারণ পার্লামেন্ট সম্বলিত পুরোণো দেশগুলোতে বুর্জ্জোয়া শ্রেণী অতি নিখুঁতভাবে শিখে নিয়েছে ভণ্ডামির কলানৈপুণ্য আর আয়ত্ত করেছে হাজার রকমে সাধারণ লোকদের ঠকাবার কৌশল। এরা বুর্জ্জোয়া পার্লামেন্টি প্রথাকেই "বিশুদ্ধ গণ-তন্ত্র" বলে চালিয়ে থাকে আর সুচতুরভাবে লুকিয়ে রাখে সেই সব লক্ষ লক্ষ সুক্ষ্ম তন্তুজালকে, যে সব জালে পার্লামেন্ট জড়িত রয়েছে কোম্পানীর কাগজের বাজার এবং পুঁজিবাদীদের সঙ্গে। এরা কলুষিত ও ব্যভিচারগ্রস্ত খবরের কাগজগুলো এবং তাদের সব শক্তিকে হাত ক'রে অর্থ ও পুঁজির বিপুল শক্তিকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগায়।

যে সব শ্রমিক সোভিয়েট শক্তির সমর্থক কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক ভাবে পার্লামেন্টের মধ্য দিয়ে লড়াই চালানোর বিরোধী, তাদেরকে অবজ্ঞা করা উচিত হবে না। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে যদি কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক সঙ্ঘ (Communist International) এবং বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট দলগুলি এদের অবজ্ঞা ক'রে বাদ দেন তবে তারা অপ্রতিকরণীয় ভুল কোরবে। বিষয়টাকে যদি আমরা সাধারণ অর্থে থিওরির দিক্ থেকে বিচার করি, তা' হোলে দেখা যাবে যে একমাত্র এই কর্ম্ম-পদ্ধতিই—অর্থাৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বা সোভিয়েট গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামই—বিভিন্ন দলগুলোকে ঐক্যে মেলাতে পারে, এবং সমগ্র সৎ, উদার ও বিপ্লবীমনা শ্রমিকদের একত্র করতে পারে। বর্ত্তমানে এদের সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। বহু নৈরাজ্য-বাদী (anarchist) আজকাল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে দাঁড়াচ্ছেন; এতে প্রমাণ হয়েছে যে এঁরা আমাদের নিকটতম বন্ধু ও কমরেড এবং এরা শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী; কেবলমাত্র ক্ষণিক প্রমাদবশতঃ এরা এতদিন মার্কসীয় মতবাদের বিরোধী ছিলেন। অথবা আরও সত্যি ক'রে বল্‌তে গেলে বলা যায় যে প্রমাদবশতঃই যে এরা আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন, তা' নয়। বরং দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের যুগের (১৮৮৯-১৯১৪) সমাজতন্ত্র-বাদ মার্ক্সীয় মতবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে সুবিধাবাদে পরিণত হয়েছিল এবং ১৮৭১ সালের প্যারী কমিউন বিদ্রোহের শিক্ষাকে ও মর্ক্সীয় বিপ্লবাত্মক উপদেশকে বিকৃত ক'রে ফেলেছিল বলেই এঁরা আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন

ছিলেন। আমার "State and Revolution" নামক বইতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, সুতরাং এ নিয়ে এখানে আর আলোচনা কোরবো না।

যদি কোনো দেশে কম্যুনিষ্টরা বিপ্লবাত্মক কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েও সোভিয়েটের সমর্থক হয়েও শুধুমাত্র পার্লামেন্টি কাজ সম্বন্ধে মতভেদ থাকার দরুণ একত্র না হতে পারে, তবে সে দেশের অবস্থা কী দাঁড়ায়?

পার্লামেন্টে যোগ দিয়ে কাজ করা না করা সম্বন্ধে মতভেদকে বর্ত্তমান অবস্থায় একেবারেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়; কারণ সোভিয়েট শক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামই হচ্চে আজকাল গণশ্রেণীর পক্ষে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ, সব চাইতে সচেতন এবং সব চাইতে বিপ্লবাত্মক রাজনৈতিক সংগ্রাম। যারা সত্যিকার বিপ্লবী তারা যদি কোন গৌণ বিষয়ে ভুলও করে, তবু তাদের সঙ্গে থাকাই সর্ব্বাংশে ভালো। তবু সরকারী সমাজতন্ত্রী বা সমাজ সাম্যবাদীদের (Social Democrat) সঙ্গে যোগ দেওয়ার কোন মানেই হয় না, যদি তারা সবল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী না হয়; কিংবা যদি তারা কোন ছোট খাট ব্যাপারে সঠিক ও নির্ভুল কর্ম্মপদ্ধতিও অবলম্বন করে, তবু তারা যদি বৈপ্লবিক কাজে অনিচ্ছুক হয় এবং শ্রমিক গণ-সাধারণের মধ্যে বৈপ্লবিক কার্য্যের প্রসারে অসমর্থ হয়, তবে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা অনুচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় নিয়মতান্ত্রিকতার বা পার্লামেন্টে প্রবেশের প্রশ্নটা হলো একটা নিতান্ত খণ্ডিত ও গৌণ বিষয়। ১৯১৯এ জানুয়ারী মাসে বার্লিনে Spartacist দের কন্‌ফারেন্সে জার্ম্মাণ বুর্জ্জোয়া পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে যোগ দেবার জন্য constituent assemblyর প্রস্তাবকে সংখ্যাধিক্যে বিরুদ্ধাচারণ করেও সমর্থন করে রোজা লুক্সেমবার্গ এবং কার্ল লিব্‌নেক্‌ট (Rosa Luxemburg ও Karl Liebnecht) ঠিকই করেছিলেন। সুতরাং দেখা যায় তারা আরো উচিত কাজ করেছিলেন যখন তারা কম্যুনিষ্টরা সামান্য সামান্য ব্যাপারে ভুল করলেও কম্যুনিষ্ট দলের সঙ্গেই থাকা সুস্থির করেছিলেন। তারা যে সমাজতন্ত্রবাদের নিশ্চিত শত্রু Scheidemann ও তার দলবলের সঙ্গে থাকার চাইতে, কিংবা কাউটস্কী ও তাঁর স্বতন্ত্রদলের (Independent party) নীচ, ভীরু, মেরুদণ্ডহীন বুর্জ্জোয়া সংস্কারকদের ও তাদের নীচ অনুচরদের সঙ্গে থাকার চাইতে কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন, তাতে তারা খুব প্রশংসনীয় কাজই করেছিলেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে যোগ না দেওয়া ইংলণ্ডীয় বিপ্লবী শ্রমিকদের পক্ষে গুরুতর ভুল। কিন্তু তবু একটা বড়ো কম্যুনিষ্ট দল গঠনে দেরী হওয়ার চাইতে এই রকম ছোটখাট বিষয়ে ভুল করাও বরং অনেক ভালো। আপনি যে সব বিভিন্ন মতবাদ ও দলগুলির উল্লেখ করেছেন, তাদের সবাইকে নিয়ে শ্রমিকদের একটা বৃহৎ দল গঠন করা এক্ষনি দরকার, কারণ তারা সবাই বলশেভিস্‌ম্‌এর এবং সোভিয়েট গণতন্ত্রের সমর্থক। উদাহরণ স্বরূপ, ব্রিটিশ সোস্যালিষ্ট দলে এমন অনেক আন্তরিক বলশেভিক আছে যারা পার্লামেন্টে যোগ দেওয়া না দেওয়া নিয়ে মতভেদের কারণে ৪নং, ৬নং এবং ৭নং দলগুলির সঙ্গে

এখনই একটা বৃহৎ কম্যুনিষ্ট দলে মিশে যেতে অস্বীকার করে থাকে। আমার মতে এঁরা ইংলণ্ডের বুর্জ্জোয়া পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে যোগ দিতে অস্বীকৃত হ'য়ে যে ভুল করচেন তার চাইতে সহস্রগুণে বড়ো ভুল করবেন যদি তাঁরা বৃহত্তর দল গঠনে অসম্মত হন। আমি ধরে নিচ্ছি যে ৪নং, ৬নং এবং ৭নং মতধারাগুলি একত্রে সত্যি সত্যি গণসাধারণের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং এরা কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের কতকগুলো ছোট ছোট দলের প্রতিনিধি নয়, ইংলণ্ডে সচরাচর যেমন হয়ে থাকে। এ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ শ্রমিক কমিটিগুলি এবং শপ ষ্টুয়ার্ডদের (Workers' committees and shop stewards) বিশেষ কোরে প্রাধান্য ও গুরুত্ব আছে, কারণ আমরা তাদেরই জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করে নিতে পারি।

*　　*　　*　　*

যে সব শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবীরা পার্লামেন্টিয় কার্য্যপদ্ধতিকে অনবরত আক্রমণ করছেন তাঁরা, যেখানে নীতির দিক থেকে বুর্জ্জোয়া পার্লামেন্টিয় কর্ম্মপন্থাকে ও বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রকে অস্বীকার করেন, সেখানে অকাট্য ও নির্ভুল। শ্রমিক শ্রেণীর যে বিপ্লব তা' বুর্জ্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে সোভিয়েট শক্তি ও সোভিয়েট প্রজাতন্ত্রকে জগতের সামনে উপস্থিত করেছে; ধনতন্ত্রবাদ থেকে সমাজতন্ত্রবাদে পরিণতির রূপই হলো সোভিয়েট শক্তি; এই সোভিয়েট হলো প্রোলেটারিয়েটের একচ্ছত্র শাসনের প্রতিমূর্ত্তি। পার্লামেন্টিয় প্রথাকে সমালোচনা করলে স্বভাবতই সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দিকে সাহায্য হয়। কিন্তু শুধু এই কারণেই যে পার্লামেন্টিয় প্রথার সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত তা' নয়। অধিকন্তু পার্লামেন্টিয় প্রথার উৎপত্তির ঐতিহাসিক কারণ কি, তার সীমা ও উপকারিতা কতদূর, কেবলমাত্র পুঁজিবাদের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কত গভীর, মধ্যযুগের তুলনায় এর প্রগতি-মুখীনতা এবং ভবিষ্যৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনায় এর [illegible] স্বভাব—এই সব বিষয় সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা জন্মায় বলেই পার্লামেন্টিয় নিয়মতান্ত্রিকতার তীব্র সমালোচনা করা খুবই উচিত।

কিন্তু ইয়োরোপ ও আমেরিকায় যে সব নৈরাজ্যবাদী এবং সিণ্ডিক্যালিষ্ট (Anarchist Syndicalist) দলের লোক পার্লামেন্টে প্রবেশ করে আন্দোলন করার বিরোধী তারা প্রায়শঃই ভুল করে থাকেন। ভুল করার কারণ হলো এই যে তাঁরা পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনে এবং পার্লামেন্টের ভিতরের কাজে সামান্য রকমের অংশ গ্রহণ করাকেও বর্জ্জন করে থাকেন। এখানে তাদের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার অভাব দৃষ্ট হয়। আমরা রাশিয়ার লোকেরা বিংশ শতকের দুটো বড়ো বিপ্লবের ভিতর দিয়ে এসেছি, আমরা জানি পার্লামেন্টিয় কাজের কতখানি গুরুত্ব বিপ্লবের যুগে থাকতে পারে; এবং আমরা অনুভব করেছি যে সত্যি সত্যি যখন বিপ্লব এসে পড়ে তখন পার্লামেন্টের ভিতর থেকে প্রচার করবার উপকারিতা খুব বেশী। বুর্জ্জোয়া পার্লামেন্টকে নির্ম্মূল ক'রে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠান সব স্থাপন করতে হবে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। রাশিয়া, হাঙ্গারী, জার্ম্মাণী, ও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে একথা নিশ্চিত বোঝা গেছে যে শ্রমিক-

বিপ্লবের সময় এ অবস্থা সব দেশেই ঘটতে বাধ্য। কাজেই শ্রমিক জনসাধারণকে সুশৃঙ্খলভাবে সংগঠন করা, তাদের কাছে সোভিয়েট শক্তির উপকারিতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্ণেই ব্যাখ্যা করা, এই উদ্দেশ্যে প্রচার ও আন্দোলন করা বিপ্লব-পন্থী শ্রমিকদের একমাত্র অবশ্যকরণীয় কাজ। আমরা রুশীয়গণ পার্লামেণ্টের প্রাঙ্গণে সেই অবশ্যকৃত্য কাজটাকে সম্পন্ন করেছি। জারের আমলের জমিদারদের ভূয়া পার্লামেণ্টেও আমাদের যারা প্রতিনিধি ছিলেন তারা জানতেন কেমন করে (পার্লামেণ্টের ভিতরে থেকে) বৈপ্লবিক ও গণতান্ত্রিক প্রচারকার্য্য চালোনো যেতে পারে। ঠিক সেই ভাবেই আমাদেরও এখন বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টের ভিতর থেকেই সোভিয়েটের প্রচার চালাতে হবে। সম্ভবতঃ এক্ষনি কোনো বিশেষ পার্লামেণ্টিয় দেশে একাজ সম্ভব হবে না। কিন্তু সে হলো অন্য কথা। আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সকল দেশের বিপ্লবী শ্রমিকেরা এই নির্ভুল কর্ম্মপন্থাকে আয়ত্ত করতে পারে। যদি শ্রমিকদের দল সত্য সত্যই বিপ্লববাদী হয়, এ দল যদি সত্য সত্যই শ্রমিকদের পার্টিই হয়ে থাকে এবং কেবলমাত্র উচ্চতর শ্রেণীর শ্রমিকদের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে সাধারণস্তরের দরিদ্র শ্রমিকদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যদি এই দল সত্যিকারের 'সঙ্ঘ' (party) হয়ে থাকে (অর্থাৎ শক্তিশালী, সংহত একটা অগ্রগামী বিপ্লবীদের সঙ্ঘ যারা সাধারণের ভিতরে সকল রকমেই বৈপ্লবিক প্রচার চালাতে পারে)—তবে এই রকম একটা পার্টি (party) পার্লামেণ্টের সদস্যগণকে নিশ্চয়ই নিজেদের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখতে পারবে এবং এদেরকে প্রকৃত বিপ্লবের প্রচারক ক'রে তুলতে পারবে, যেমন প্রচারক ছিল কার্ল লিব্‌নেক্ট (Karl Libnecht) এই রকমের পার্টি পার্লামেণ্টে কেবল এমন কতকগুলো সুবিধাবাদী সৃষ্টি করবে না যারা বুর্জ্জোয়া রীতিনীতি, বুর্জ্জোয়া কর্ম্মপন্থা, বুর্জ্জোয়া চিন্তা এবং বুর্জ্জোয়া আদর্শ-বিহীনতার দ্বারা শ্রমিকদের বিপথগামী করবে।

ইংলণ্ডে যদি এক্ষনই এই একতাকে আমরা সৃষ্টি করতে না পারি, বিশেষতঃ সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমর্থকদের মধ্যে পার্লামেণ্টিয় কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে মতভেদের দরুণ যদি ঐক্য এক্ষনি সম্ভব না হয়, তা'হোলে অন্ততঃ দুটো আলাদা কম্যুনিষ্ট দলও এই মুহূর্ত্তে করতে পারলে পূরোপূরি ঐক্যের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছি বলে মনে কোরবো।...এই দুটো দলের মধ্যে একটা দল বুর্জ্জোয়া পার্লামেণ্টে যোগদান করাকে সমর্থন করুক এবং অন্যদল পার্লামেণ্টিয় কার্য্যকে বর্জ্জন করুক, তাতে ক্ষতি নেই। এই সামান্য বিষয়ের মতভেদ বর্ত্তমান অবস্থায় এতই নগণ্য যে এই নিয়ে দুভাগ না হওয়া অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হবে। এমন কি এই ধরণের দুটো পৃথক দল থাকাও বর্ত্তমান অবস্থার চাইতে অনেক ভালো হবে এবং সম্ভবতঃ পরিপূর্ণ ঐক্যের সহায়ক হবে।

* * * *

সমূহবাদীয় অভিবাদনান্তে

এন্‌ লেনিন *

* বীণাপাণি রায় কর্ত্তৃক অনূদিত।

শাস্তি কার ?

উষা রায়

রাফেল কারাগৃহের অপরিসর সেলে চৌদ্দটী মাস কাটিয়ে দিল। আমাদের জীবনের কত চোদ্দ মাস কেটে যায় একটির পর একটী কিন্তু তার কথা ভাব্‌বার পর্য্যন্ত অবসর হয় না, রাফেলের পক্ষে এ ক'টী মাস এক একটী সুদীর্ঘ যুগ মনে হোয়েছে। প্রথম দিনটীর প্রতিটী মিনিট যেন পাষাণের ভার নিয়ে তার ওপর চেপে রয়েছে। দিন আসে কিন্তু দিনের শেষ আর আসে না। চোদ্দ মাসের প্রতি মুহূর্ত্ত যার গুণে গুণে কাটাতে হোয়েছে সে জানে সময় কত ধীর মন্থর গতিতে চলে। রাফেলের অকস্মাৎ বাল্যের একটী কবিতা মনে পড়ে যায়, সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না, এ কথাটী কি তীব্র পরিহাসের মত তার কাছে মনে হয়, কবিদের সাজানো কথা, কে বলে তাঁদের অনুভূতি প্রবল ? এত বড় অর্থহীন কথার প্রকাশ তা হোলে কি করে হয় ? কিম্বা ভাগ্যহীনের পক্ষে সবই সম্ভব, শাশ্বত সত্য ও তার কাছে মিথ্যা হোল ? এই দুর্ভাগ্যকে দেখে যেন সময় হঠাৎ কৌতুক-ভরে থেমে গিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে চরাচরও স্তব্ধপ্রায় মনে হচ্ছে। নিবিড় নিস্তব্ধতা, রাফেল চারদিকে চেয়ে আছে, কোথাও এমন কোন অবলম্বন পায় না, যেটুকু নিয়ে সে অন্ততঃ চিন্তা করে এই জড়তার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারে। সে সজোরে হাত তুলে নালিশ জানাতে গেল, শিকল ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠে তাকে চমকিত করে তুল্‌লো, এর কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। দিনের পর দিন সে এটা বয়ে চলেছে। শিকল তার দেহের অংশ হোয়ে গেছে, ভুলে গিয়েছিল এর কথা, যেমনভাবে নারী ভোলে তার আভরণের ভার। লৌহবেড়ীর এ ধ্বনিও যেন ক্ষণকালের জন্য সে উপভোগ কর্‌ল। এ নিয়েও সে ক্ষণকালের জন্য ভাবতে পারবে। তার জগতের সূর্য্য সেলের ছোট্ট জানালাখানি, মুক্তির জন্য যখন মন বড় ব্যাকুল হয়, ঐ জানালাটীর দিকে সে তাকিয়ে থাকে, খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আলো বাতাসের ইঙ্গিত তাকে বড় উন্মনা করেই তোলে। জানালা দিয়ে নীলাকাশের ক্ষুদ্রখণ্ডটুকুও অবিচ্ছিন্নভাবে সে দেখ্‌তে পায় না। লোহার জালে ঢাকা শুধু নীলাভাটুকু চোখের ওপর ভেসে আসে। অপরাধী সে—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। মানবের দেওয়া সব সুখ থেকে বঞ্চিত হোয়েছে, তার ন্যায্য শাস্তি বলে মেনে নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভগবানের দেওয়া আকাশ বাতাস আলো, তাও কি এম্‌নি নির্ম্মমভাবে কেড়ে নিতে হবে ?

জেলের নিয়মে সেলটী পরিষ্কার করা হয়, কিন্তু কয়েদীর সুবিধা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়। প্রাতঃকালে মেজে অনেক আড়ম্বর করেই ধোয়া হয়, সারাক্ষণ সেই ভিজে ঘরে সে থাকে, সর্ব্বদা দরজা বন্ধ থাকে, কিন্তু ঘর শুকাতে পারে না, একটা কেমন বিশ্রী গন্ধ সকল সময়েই পাওয়া যায়।

বড় নিঃশব্দ তার নিজেকে মনে হয়, এই দেওয়াল একেবারে শুভ্র চূণকাম করা চারদিকে একটুও অপরিচ্ছন্নতার চিহ্ন নাই, এই অতি পরিচ্ছন্নতা তাকে পীড়া দিচ্ছে। আশ্চর্য্য মানুষের সঙ্গ-লাভের বাসনা, ঝুলকালিও যেন সঙ্গীর মত মনে হয়। রাফেল ভাবে জেলে ইন্দুর থাক্‌লেও তার সামান্য খাদ্যের অংশ তাকে দিতে পারতো, সেই তুচ্ছ ইন্দুরটীকে উপলক্ষ্য করে সে আলাপ চালিয়ে বাঁচতো। ঘরে মাকড়সা থাক্‌লে সে তাকে পোষ মানাতো। হায়রে বিড়ম্বনা, মাকড়সা, ইন্দুর থাক্‌লে আবার উল্টো সুর মনে বেজে যে উঠ্‌তো না, কে জানে? একদিন একটী চড়ুই পাখী জানালায় এসে বসেছিল, রাফেল হঠাৎ মনের মধ্যে খুব আনন্দ ও উৎসাহ অনুভব করলো, অপলক নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রইলো, এ ক্ষুদ্র পাখীটী বাইরের জগতের কি বার্ত্তাবহন করে এনেছে, তা যেন তার মুখে পড়্‌তে চেষ্টা করলো, মুক্তির জীব, আলোর জীব, আজ তার জানালায়, সে সান্নিধ্যটুকুতেই যেন মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, এই দীনহীন দুর্ভাগার দুরবস্থা কৃপানেত্রে নিরীক্ষণ করে পাখীটী উড়ে চলে গেল।

রাফেল প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছে, তার বিচারের নথিপত্র সব ম্যাড্রিড্ সহরে গিয়েছে, যদি তার দয়া ভিক্ষার প্রার্থনা মঞ্জুর না হয়, এ পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ তার কেটে যাবে। রাফেল আশা ও নিরাশার দ্বন্দ্বে বিচলিত, এ অবস্থা আরও অসহনীয়। রাফেল বীর, প্রাণের ভয় করে না, কত বিপদে জীবন তুচ্ছ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়ও হোয়েছে, তবু তার অদম্য উৎসাহ একতিলও কমে নি। কিন্তু এই মৃত্যুর প্রতীক্ষা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার, এখানে কর্ম্মের গতি নেই, কোন আশা নেই, আনন্দ নেই, কর্ত্তব্য-সমাপনের কোন তাগিদ নেই, মৃত্যু অনিশ্চিত, মৃত্যুর আগমনও অনিশ্চিত, এই কারা কক্ষে যেন বীর রাফেলকে অতিক্রম করে এক নূতন রাফেলের জন্ম হয়, সে ভয় পায়—অজানা পথে পাড়ি দিতে তার আতঙ্ক উপস্থিত হয়, কল্পনায় তার ফুটে ওঠে মরণের বিভীষিকা, শেষ সংবাদের প্রতীক্ষায় তার অন্তর আশঙ্কায় পূর্ণ হোয়ে যায়। পৃথিবীর আলো বাতাস থেকে বঞ্চিত হোয়ে এর প্রতি তার মায়া শতগুণ বেড়ে গিয়েছে, কবে তার চোখে আকস্মিক চির-অন্ধকারের যবনিকা নেমে সব আঁধার করে দেয়, ভাব্‌তেও সে শিউরে ওঠে। জীবনের দুর্নিবার মোহ তাকে পেয়ে বসেছে। এই মোহ ও মুক্তির সংগ্রামে সে ক্লান্ত হোয়ে পড়েছে।

তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে যায়, কিভাবে এই সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছে কত তরুণকে উপেক্ষা করে, তার ছোট নীড়টী ঘিরে সুখে দিন কাটিয়ে দিয়েছে তারা, অবশেষে এল দুর্দ্দিন, যে গ্রামে সে প্রতিপত্তি নিয়েছিল, সেখানে এক প্রতিদ্বন্দী আসাতে তার খ্যাতি মানমর্য্যাদা বিপন্ন হোল, তার অর্থ-সংস্থানের গুরুতর কারণ দাঁড়ালো।

তারপরে কি ভাবেই যে সে ক্রমে ক্রমে প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িত হোয়ে পড়লো আজও বুঝে উঠ্‌তে পারে না, যার পরিণতিতে সে চরমদণ্ডে দণ্ডিত। রাফেল চায় যত রূঢ় সত্যই হোক্, শীঘ্রই তার প্রকাশ হোক্, কিন্তু অন্তরের ভয়-দুর্ব্বল ব্যক্তি শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিনটি

কেবলই পিছিয়ে দিতে চায়। ধর্ম্মযাজক আসেন, মহামানব যিশুর কথা বলে যান, মানুষের দণ্ডে কিভাবে তার পবিত্র জীবনের সমাপ্তি ঘটে। এই পূত চরিত্রের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে এক সময়ে সে শ্লাঘা অনুভব করে, সেও তো মানবের দণ্ডে দণ্ডিত, এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি তাঁর সমদুঃখভাগী বলে নিজেকে মনে কর্‌তে পারে না।

ইতিমধ্যে একদিন জানা গেল, ম্যাড্রিডে কাজ শেষ হোয়েছে, সংবাদ প্রেরিত হোল, খুব শীঘ্রই সকল সংশয়ের অবসান হবে। কারারক্ষী এসে বলে গেল, তার স্ত্রী শিশু সন্তানটীকে নিয়ে এদেশে এসেচে, তার সঙ্গে দেখার চেষ্টা চল্‌ছে, রাফেলের আর সন্দেহের কোন কারণ রইলো না, সে বুঝে নিলে তার স্ত্রী ঐ সুদূর থেকে যখন নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এসেছে, তখন তার মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই এসেচে, শেষ দেখার জন্য এই চেষ্টা। বিদ্যুতের মত তার অপরিচিত সন্তানটির কথা মনে খেলে গেল, তার কারাবাসের সময় এর জন্ম হোয়েছে, এই নিরপরাধ প্রাণীটার অসহায় অবস্থা তাকে ক্ষণেকের জন্যও উতলা করে তুল্‌লো।

*　　*　　*　　*　　*

পত্র দেখিয়ে জেলগেটের পাশে একটী তরুণী এসে দাঁড়ালো, তার বক্ষে একটী ক্ষুদ্র শিশু। রাফেলের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি। তার চারদিকে ভীড় জমে গেল,কিন্তু শিশুটী সম্বন্ধে ব্যতীত কোন দিকেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই, চারদিকে অন্তহীন গুঞ্জন, কত সমালোচনার কথা সবই বিফলে যাচ্ছে। হঠাৎ দরজা খুলে গেল. আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে কয়েকজন এসে সু-সংবাদ জানালো—রাফেলের দয়া-ভিক্ষার আবেদন মঞ্জুর হোয়েচে। সংবাদের আকস্মিকতায় সে প্রথমে যেন মুহ্যমান হোয়ে পড়লো, সত্যের ধারণা করাও কঠিন হোল। ধীরে ধীরে প্রকৃত ঘটনা তার হৃদয়ঙ্গম হোল. শিশুটীর দিকে তাকিয়ে তার অশ্রু ঝরে পড়্‌লো, এই সৌভাগ্যের জন্য সকলেই তাকে অভিনন্দিত করলো।

রাফেলের স্ত্রী বলে উঠলো, "কবে মুক্তির পরোয়ানা আস্‌চে, কবে ফিরে আস্‌বেন তিনি"?

ভীড়ের মধ্যে কে একজন উত্তর দিল, "মুক্তির কথা মনেও এনো না. প্রাণভিক্ষা পেয়েই কৃতজ্ঞ হও, তার নির্ব্বাসনে সুদীর্ঘ দিন কাটাতে হবে, অমূল্য জীবন রক্ষা পেয়েছে।"

তরুণী স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। মুখে ক্ষণকাল পূর্ব্বের আনন্দের চিহ্নমাত্র নেই, সেই ভাবলেশ শূন্য মুখের দিকে তাকিয়ে এমন কেউ ছিল না যে দুঃখ অনুভব না করে।

কিছুক্ষণ পরে সে বিদীর্ণ-হৃদয়ে বলে উঠ্‌লো, "ভগবান্‌, জীবন রক্ষা পেল, কিন্তু তারপরে? আমার—আমার কি হবে?"

কী নির্ম্মম পরিহাস যে এ কথা কটীর অন্তরালে লুকিয়ে আছে তা যিনি সর্ব্বদর্শী তার কাছে অজানা রইল না। শোকের নিদারুণ ক্ষত মিলিয়ে গেলেও, এর জীবনে আর সুখী হবার অধিকার নেই।

দারিদ্র্য

শ্রী...................................

হে দারিদ্র্য,
তোমার দয়ার চিহ্ন
এই ছিন্ন
জীর্ণ ম্লান শতচ্ছিদ্র
তন্তুসার বস্ত্রের গ্রন্থিতে
লজ্জা নাহি পড়ে ঢাকা।

এই শীর্ণ রোগ-পাণ্ডু বিকলাঙ্গ দেহের ভঙ্গীতে
আলিঙ্গন-চিহ্ন তব আঁকা।
এই শুষ্ক লোল চর্ম
এই নিত্য নিষ্পেষিত মর্ম
লক্ষ কণ্ঠে মর্মন্তুদ তীব্র আর্তরব,—
এই তব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য-গৌরব
এরি মাঝে তোমার উৎসব।

সচ্ছন্দ জীবন-নৃত্যে
সুন্দরের সহজ সাধনা
তুমি সেথা বিঘ্ন আনো, হানো চিত্তে
ছন্দপতনের দুঃসহ বেদনা।
ক্ষণে ক্ষণে তোমার নিঃশ্বাসে
প্রসন্ন আকাশে
বিষ-বাষ্প জমে উঠে'
নিবিড় নিকষ কালো পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার ঘনাইয়া আসে।

যায় টুটে'
ক্ষণিকের সুখ-স্বপ্ন সম
নিরুপম
বসন্তের বরণ-রঙিমা
নিত্য নব প্রকাশের বিচিত্র ভঙ্গিমা।
অপ্রমেয় প্রেমে আর উদার মননে
শুভক্ষণে
যে সুধা সঞ্চিত হ'ল মানুষের অন্তরের কোনে
তুমি তারে নিলে হরি'
পান করি'
আপনি লভিলে অমরতা।
বিনিময়ে অকৃতজ্ঞ হে দুষ্ট দেবতা
মানুষের মুখে
বিষপূর্ণ পাত্রখানি তুলে তুমি ধরিলে কৌতুকে।

নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারে তব
আনো দুঃখ নিত্য নব নব।
অর্থের অলকাপুরে স্থিরাসন যক্ষাধিপতির
সমুদ্যত চরণ-ধূলির
কলঙ্ক-লিখনখানি
দুঃস্থের ললাট-পটে বারে বারে দিয়ে যাও টানি'।
তারি সাথে অন্তরে তাহার
ঢেলে দাও অনির্ব্বাণ জ্বলন্ত অঙ্গার
সে দারুণ দুঃসহ দহনে
মানুষের মনে
যে কিছু আনন্দ আছে—জীবনের দুর্লভ সঞ্চয়.
দেহে আছে নিরাময়
স্বাস্থ্য অনুপম
ভাদরের কূলে কূলে ভরা নদীসম,—

দগ্ধ হ'য়ে সকলি মিলায়
অনাবৃত পাত্র হ'তে কর্পূরের প্রায়।
শুধু শূন্য পাত্র পড়ে রহে ;
মানুষ সে নহে—
মানুষের কদর্য্য কঙ্কাল
সাম্যমন্ত্র সভ্যতার পুঞ্জীভূত কলঙ্ক জঞ্জাল।

হে নির্লজ্জ, তব চির-সহচরী
কুৎসিত সুন্দরী,
দুর্ভিক্ষ তোমার সখা, দোঁহে সম-প্রাণ ;
চির-অকল্যাণ
কলুষ কামনা যত
তব অনুগত।
ইহাদের বলে
দণ্ডে পলে পলে
অগ্রগতি মানুষেরে টানিছ পশ্চাতে
দুই হাতে
নির্জিত পশুরে শুধু তুলিয়াছ উজ্জীবিত করি'
বিশ্বভরি।

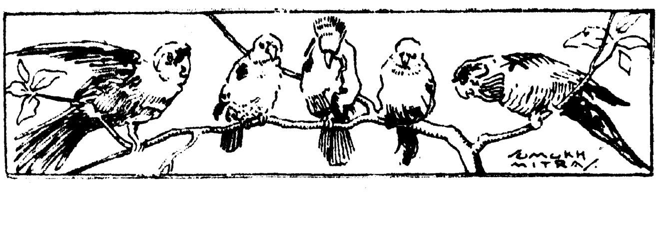
তোমার প্রসাদ-দৃষ্টি হানিয়াছ যাহাদের 'পরে
একমুষ্টি উচ্ছিষ্ট অন্নের তরে
ভিক্ষাপাত্র করে
ক্ষুধাক্ষিপ্ত দিশাহারা
দ্বারে দ্বারে ফিরিছে তাহারা—
নিষ্করুণ নির্গেহ ভিখারী
সুচির-ভূখারী ;

ছুটিতেছে সারি সারি
লক্ষ লক্ষ লজ্জাহীন পথের কাঙাল
যেন পঙ্গপাল ;
দীর্ঘ-দিন খুঁটে খুঁটে
মলিন গলিত ত্যক্ত পূতিগন্ধ যাহা কিছু জুটে
তাই নিয়ে করিতেছে কাড়াকাড়ি নির্লজ্জ পশুর মত
আসন্ন সন্ধ্যায়।
পথপার্শ্বে ধূলিতলে দেহযষ্টি করিয়া বিতত
সতর্ক নিদ্রায়
ক্ষীণ-প্রাণ শিশুটিরে স্তন্যহীন শুষ্কবক্ষে সবলে আঁকড়ি'
যাপে দীর্ঘ বিভাবরী
উপবাসী মাতা অসহায়
শঙ্কিত অন্তর।
সর্ব্ব-রিক্ত কাঙালের এতটুকু সুখ
দেখে তাও পুড়ে তব বুক।

তারপর
লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিতের হৃদি-রক্তে সদ্যস্নান করি'
মরণের হাতে ধরি'
দেখা দাও বিষণ্ণ প্রত্যূষে
লও হরি' শিশুটিরে—জননীর সর্ব্বশেষ জীবন সম্বল—
শূন্য করি শুষ্ক বক্ষতল।
তারি সাথে গণ্ডূষে গণ্ডূষে
লও শুষে'
বিগলিত হৃদয়ের অশ্রুময় শেষ স্নেহবিন্দু
অন্তর মন্থর-ধন শুভ্র পূর্ণ ইন্দু।
সদ্যোমৃত সন্তানের শোকে
চৈত্রের মধ্যাহ্ন-জ্বালা
অগ্নি-ঢালা

অশ্রুহীন চোখে
শুধু একবার
চুম্বিয়া বদন তার
ধূলিতলে যত্নে ঢাকি' মাতা চলে' যায়
কে জানে কোথায়
দুর্গতির কোন্ রসাতলে
তব রূঢ় আকর্ষণ-বলে।
হে দরদী, তব ক্রূর চিত্ত তবু তৃপ্তি নাহি জানে
নিত্য নব লাঞ্ছনায় মানুষেরে হানে।

হে দারিদ্র্য, কুৎসিত দেবতা
তব কীর্তিকথা
ক্রন্দন-কূজিত নিত্য তব পুণ্যনাম
আমি গাহিলাম
অখ্যাত অজ্ঞাত কবি বিংশ শতাব্দীর।
অপরূপ তব জয়শ্রীর
গীতচ্ছন্দে করিনু বন্দনা।
মানুষেরে হানিলে যে নির্ম্মম লাঞ্ছনা
দেশে দেশে কালে কালে
প্রতিভার প্রভাদীপ্ত ভালে
পরাইলে যে কণ্টকমালা, তারি রক্তে লিখা
তোমার আরতি শিখা
আজি জ্বালিলাম
এ দরিদ্র জনমের ঋণ শুধিলাম।



জাপানী বর্ব্বরতা

শ্রীকমলা গুপ্তা

গত মহাযুদ্ধে বিরাট নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও সাম্রাজ্যবাদের আগুন নির্ব্বাপিত হলনা; বরং এর জগদ্দল রথযাত্রা শুরু হ'ল দেশ দেশান্তরে; বিজয়-বৈজয়ন্তী স্থাপিত হল পর্ব্বত-প্রমাণ অস্থি-পঞ্জর ও নরকঙ্কালের ওপর। রথচক্রে দলিত ও নিষ্পেষিত মানবাত্মার কণ্ঠ আজ রুদ্ধ এবং এর উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। এই অন্ধকারের ছায়ায় যে প্রেতলোক সৃষ্ট হয়েছে, তাতে হিংস্রতা ও দানবীয় বর্ব্বরতার এক নগ্নমূর্ত্তি দিন দিন প্রকট হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ নরনারীর রক্তে ও নৃশংস হত্যায় এই প্রেতলোকের উৎসব-ব্যসন অবিরাম চল্‌ছে। অবোধ শিশু, অনাথা নারী ও অসহায় বৃদ্ধ কেউ এই ধ্বংসযজ্ঞ থেকে নিস্তার পায়নি।



চীনা-সৈনিকের বলিদান

জগদ্‌ব্যাপী অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও লাভলোলুপ পঙ্কিলতার সাথে জেগে উঠেছে অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মানবাত্মার চিরন্তন বিদ্রোহ, মহৎ আদর্শ সাধনের সুমহান সঙ্কল্প ও আত্মদানের মহিয়সী প্রেরণা। এই উদ্‌বোধিত দেবত্বের সম্মুখে পশুত্বের নগ্নতা ও কুশ্রীতা যেন আরো বীভৎস হয়ে দেখা দিয়েছে। মহাযুদ্ধের পরেই সাম্রাজ্যবাদ প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতুর মত পশ্চিম আকাশে নেমে এসেছে এবং অশুভ পুচ্ছ বিস্তারে সারা পৃথিবীকে আতঙ্কিত ক'রে তুলেছে। বিভীষিকার স্বরূপ প্রকটিত হওয়ার আগেই আবিসিনিয়া ইতালীর কুক্ষিগত হল। অত্যাচার, অবিচারে দেশ বিধ্বস্ত হল; আকাশ বাতাসকে বিষায়িত করে লক্ষ লক্ষ নরনারীর দেহাবশেষের উপর স্থাপিত হল 'New Holy Roman Empire'.

আজ কয়েক বৎসর যাবৎ স্পেন সাম্রাজ্য-বাদের মূঢ় মত্ততার মল্লভূমিতে পরিণত হয়েছে। লুব্ধ ধনিক সভ্যতা মানবতার শেষ চিহ্নকে লোপ করতে প্রস্তুত। আর্ত্ত ও দুঃস্থের প্রতি এমন নিষ্করুণ বর্ব্বরতা মানবের আদি ইতিহাসেও বিরল। এই অত্যাচার, রক্তপাত ও ধ্বংসের মধ্যেও স্পেনের জাগ্রত জনশক্তি জগতের কাছে প্রমাণ করছে 'দানবের মূঢ় অপব্যয় রচিবেনা কোনো দিন ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়'।

ভারত-সীমান্তও 'ভদ্রবেশী বর্ব্বরতার' এক অভিনব লীলাভূমি হয়েছে। সময়ে অসময়ে আকাশ হতে নিরপরাধ নরনারীর উপর মারকাস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে 'লোকশিক্ষার' এমন ব্যাপক ব্যবস্থা সভ্যজগতে একান্ত বিরল। তাই 'Veneered barbarism'এর কীর্ত্তিগাথা দিন দিন রচিত হচ্ছে পর্ব্বতকন্দরে, গ্রামে গ্রামে, নগর ও উপনগরীতে।

ইউরোপে বিরাট সমরায়োজন চল্‌ছে। যুদ্ধেচ্ছু জাতিগুলি নিজ নিজ ঘর নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। এ সুযোগ নিয়ে জাপান 'সভ্যতা' বিস্তারের কাজ শুরু করল কোরিয়া, মাঞ্চুরোকো ও পরিশেষে চীন মহাদেশে। এ সভ্যতা বিস্তার কিরূপ দ্রুতবেগে ও অমানুষিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে চলেছে তার মর্ম্মন্তুদ কাহিনী দিন দিন প্রকাশ পাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক গৃহহীন, অন্নহীন হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছে। বিধ্বস্ত নগর ও গ্রামগুলি একমহাশ্মশানে পরিণত হয়েছে। নরহত্যায়, লুণ্ঠনে ও রমণীর উপর পাশবিক অত্যাচারে বর্ব্বর জাপানী সৈন্য ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করছে। নিরীহ নাগরিকদের নৃশংস হত্যা দৈনন্দিন অনুষ্ঠানের অঙ্গ। বোমাবৃষ্টির ফলে বহু জনপদ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে।


জাপানী নৃশংসতা দর্শনে ভীত চীনা বালকদ্বয়

ইউরোপে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রচারকার্য্য চালাবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বহু ব্যাপার লোকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যায়। চীনে তেমন কোন অনুষ্ঠান নেই। কাজেই এখানে জাপানের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনী দিবালোকে অতি সামান্যই আসে। বহু অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামের বিলুপ্তির কাহিনী চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়েছে। তবে China Information Committeeর চেষ্টায় বৈদেশিক মিশনারী, চিকিৎসক, সংবাদদাতা প্রভৃতি নিরপেক্ষ লোকের সাহায্যে কতকগুলো খবর সংগ্রহ করা হয়েছে, যার থেকে চীনের বর্ত্তমান অবস্থার সত্যিকার রূপ কিছুটা অনুমান করা যায়। গত ডিসেম্বর মাসে নানকিংএর পতনের পর ১৭ হতে ২০ হাজার তরুণী মেয়ে এবং বয়স্কা নারীর উপর জাপানী সৈন্য পাশবিক অত্যাচার করেছে। প্রায় সমসংখ্যক নারী পাশবিক অত্যাচারে বাধা

দিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। হাজার হাজার শিশু, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ প্রভৃতিকে গুলি করে, প্রহার করে এবং জলে ডুবিয়ে মারা হয়েছে।

পৃথিবীতে এই অত্যাচারের দ্বিতীয় উপমা মিলে না। জাপানী আক্রমণের সাত মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ বর্গ মাইল দেশ এবং ১০ কোটী মানুষ এই যুদ্ধের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে! এই ভয়াবহ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও বিষময় প্রভাবকে চীনের ৪৬ কোটী বর্গমাইল রাজ্যের কোন অংশই এড়াতে পারেনি। সর্ব্বত্র দুঃখ ও ক্রন্দনের রোল উঠেছে এবং শান্তিপ্রিয়, চীনাদের অমায়িক মুখের বিখ্যাত মধুর হাসি অন্ধকারে নিবে গেছে। প্রায় ১৫ কোটী নরনারী অর্থাৎ দেশের এক চতুর্থাংশ লোক এই ধ্বংসের আবর্ত্তে ঘূরপাক খাচ্ছে অসহায়ের



এই চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা চীনা বালিকাকে দেড় মাস জাপানী সৈন্যদের শিবিরে আবদ্ধ থেকে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হোয়েছে।



ব্যায়োনেট্-বিদ্ধ চীনা নাগরিক

মত। ১৫ লক্ষ সৈন্য ও নাগরিক হত বা চিরদিনের তরে আহত ও পঙ্গু হয়েছে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জাপানী সৈন্যদল অবাধ ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠান করতে করতে চলেছে। দিন দিন সেই ক্রমবর্দ্ধমান অমানুষিকতার কাহিনী বেড়ে বেড়েই চলেছে; বাইরের জগৎ তার অল্পাংশ মাত্র জানবার সুযোগ পায়। Tunglichtsun নামক গ্রামে জাপানী সৈন্যরা হুকুম দিয়েছিল gasoline উৎপাদন করে দিতে। দরিদ্র চাষীরা gasoline কোথায় পাবে? অস্বীকৃতির ফলে, ব্যায়োনেটের আঘাতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। Shanyihtsun নামক গ্রামে একদিন এলো জাপানী সৈন্যদল। সঙ্গে নিয়ে এলো ছয়টী মোটর truck বোঝাই চীনা মেয়ের দল। এদের উপরে পাশবিক অত্যাচারের যে কাহিনী এই হতভাগিনীরা বলেছে, তাতে মানুষ বলে জাপানীদলকে বলা

মনুষ্যত্বকে অপমান করা। একস্থানে তিনজন জাপ সৈন্য একটী চীনা তরুণীকে বন্দী করে রেখে তার সারা হাতে পায়ে স্ঁচ ফুটাতে সুরু করলো! ক্ষণেক পরে রক্তের নদী বয়ে চললো। আশ পাশ থেকে বহু দর্শককে ডেকে ভীড় করিয়ে জাপানীরা সর্ব্বসমক্ষে সেই অজ্ঞানপ্রায়া নারীর উপর পৈশাচিক লাঞ্ছনা করলো, দিবালোকে। রাস্তার পাশে মূক অসহায় ধর্ষিতাকে পরিত্যাগ করে তিনজন নারকীয় পশু নিরাপদে স্থান ত্যাগ করলো।

ওয়াংসু নামক গ্রামে ২০০ ঘর চীনা বাস করতো। জাপ আক্রমণের গুজব শুনে সেই স্থানের ভয়ার্ত্ত গ্রামবাসীরা বহু বৃদ্ধ, রুগ্ন ও শিশুদের ফেলে পলায়ন করেছিল। জানুয়ারী মাসের মেঘাচ্ছন্ন প্রদোষে পাঁচ শতাধিক পলাতক চীনা পথে পথে কত শিশু ও কতো অক্ষম নারীকে বর্জ্জন যে করে করে রাস্তা চলেছিল তার হিসেব নেই। মমতার বন্ধন ছিঁড়ে পিতামাতা পথপার্শ্বের ডোবায় পুকুরে কতো সন্তানকে নিক্ষেপ করে গেছে, নিজেদের বাঁচাবার জন্যে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলছে "more than once did I hear 'pa.. ma... I want to go with you...I am not going to cry more.. ma...ma...take me along'...with tears streaming from their eyes, the heartbroken parents found their way along. The groans of of the deserted children slowly died of amidst the roaring of the enemy planes"

কোনো এক গ্রামে জাপানী দখল কায়েমী হবার সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বৃদ্ধদের করা হলো হত্যা আর তরুণীদের করা হল ধর্ষণ। একস্থানে দশজন চীনা তরুণকে শিকলে বেঁধে একটা খড়ের গাদার চারদিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। তাদের মাথা ছিল নীচের দিকে আর পা বাঁধা হয়েছিল ওপরের দিকে। তারপরে এদের বস্ত্র কেরোসিন দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে জাপানীরা অগ্রসর হলো পৈশাচিক bonfire করতে।

কতো শিশু ও বালকবালিকা গৃহহারা হয়ে বাপমাকে ছেড়ে পেশাদার নাটকের দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সংখ্যা নাই। এদের চারিদিকের সকল বন্ধন ছিন্ন হয়েছে কিন্তু এদের বুকে জমে আছে সমুদ্র সমান ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাপানের প্রতি। যেসব নাটকএরা অভিনয় করে বেড়ায় তাদের নামগুলো দেখলেই বোঝা যাবে, এদের নৃত্যগীতও অভিনয়ের পিছনে আছে কোন মনোবৃত্তি। "Arrest the Traitors", "Aid our mobile units", "Solidarity", "On the Firing Line", "The Last Lesson"—ইত্যাদি হচ্ছে এদের অভিনীত নাটকের নাম। যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে অগণিত শিশু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। অগণিত শিশুকে চুরি ক'রে জাহাজ বোঝাই করে Tokyo ও অন্যান্য সহরে চিরজীবনের দাসত্বের তরে পাঠানো হয়েছে। যাদের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত ভালো, তারা ঘুরতে ঘুরতে দৈবক্রমে, ছোট ছোট সহরের আশ্রয়স্থলীতে (Refugee Camps) এসে পড়েছে। এই সব ভাগ্যহারা শিশুদের বাঁচাবার জন্যে হাঙ্কাউ ((Han Kow) শহরে সেদিন এক সমিতি গঠিত হয়েছে; এই সমিতির নাম Society for the care of

War Waifs. এরা চীনের সুদূর দক্ষিণপশ্চিম সীমান্তের জেচুয়ান, ইউনান, ও কোয়াইচাও প্রদেশগুলোতে পলাতক শিশুদের জন্য আশ্রয়পল্লী স্থাপন করছেন। মহিলা নেত্রী ও শিশুমঙ্গল কর্ম্মীদের সাহায্যে হাজার হাজার কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষক, নার্স ও শিশুচিকিৎসককে নিয়মিতভাবে কাজ কর্ব্বার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করা হচ্ছে।

সাংঘাই-হ্যাংচাও রেলওয়ের ধারে একটা বৰ্দ্ধিষ্ণু সহর হলো সুঙ্কিয়াং ((Sung Kiang) এখানকার ঘনসন্নিবিষ্ট বস্তিগুলোতে ১ লক্ষ লোক থাকতো। সেখানে আজ আকাশ থেকে বোমা-বর্ষণের ফলে দগ্ধ শ্মশান সৃষ্ট হয়েছে। চারিদিকে ধ্বংস-স্তূপের মধ্য থেকে দিনরাত ধূমায়িত আগুন উঠছে আর সমস্ত সহর খুঁজলে চোখে পড়ে কেবল অগণিত কুকুর। এরাই এখানকার একমাত্র জীবন্ত অধিবাসী; এবং সংখ্যাহীন মৃতদেহের উপর জীবনধারণ করে এরা দিব্যি মোটা তাজা হয়েছে।



জাপানীদের আদেশানুযায়ী কাজ করতে অস্বীকার করার জন্য এই চীনাবাসীকে জীবন্ত অবস্থায় আগুনে Roasted হ'তে হোয়েছিল।

একজন দর্শক এখানে গিয়েছিলেন এবং এই জনহীন শ্মশানে তাঁর চোখে পড়েছে কেবল মাত্র ৫ জন চীনা লোক। সাংঘাই এবং নানকিংএর মধ্যেকার বিস্তৃত জনপদের সর্ব্বত্র এই একই দৃশ্য চোখে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানব এখান থেকে কী করে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। সাঙ্ঘাই থেকে সুঙ্কিয়াং পর্য্যন্ত ৩০ মাইল রাস্তা মরুভূমির মতো ধূ ধূ করে। এখান দিয়ে যেতে দুদিকে দেখা দেয় কেবল কালো কালো ধ্বংসস্তূপ, পোড়া বাড়ীঘর আর গোলাবাড়ী, আর হৃষ্টপুষ্ট কুকুরের দল। আর রাস্তায় দেখা যায় অগণ্য জাপানী সৈন্য এবং তাদের সঙ্গে বোঝা বোঝা লুটের মাল। অশ্বারোহ-বাহিনীর ঘোড়ার পেছনে চলেছে রিক্‌শা-বোঝাই ট্রাঙ্ক ও স্যুটকেস; খচ্চর বাছুর মোষের ওপরে চলেছে জাপ সৈন্যগণ; সঙ্গে আছে শূকর, মুর্গী ও অন্যান্য পাখী। এ সবই গ্রামগুলো লুঠ করে জোগাড়

করা হয়েছে। এমনি করে হাজার রকমের অত্যাচার স্রোতের মতো বয়ে চলেছে চীনদেশের উপর দিয়ে। গ্রামে, সহরে, বন্দরে, সর্ব্বত্র মানুষের আর্ত্ত হাহাকারের রোল উঠ্ছে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি! লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশু গৃহহারা হয়ে পথে পথে ঘুরছে; তারা তাদের আত্মীয়স্বজনের কোনো সন্ধান পাচ্ছে না। আকস্মিক একটা ভূমিকম্পের মতো যুদ্ধ এসে সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। এই প্রলয়সদৃশ ওলটপালটের ফলে কে যে কোথায় ছিট্‌কে পড়েছে, তার ঠিক নেই। Wuhan সহরে চারদিকের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত প্রদেশগুলো থেকে অফুরন্ত স্রোতে গৃহহীন নারী ও শিশু প্রবেশ করছে। এদের মাথা রাখবার স্থান নেই Wuhan সহরে; অথচ অনাবৃত আকাশের নীচে, মাঠে-ঘাটে, ফুটপাথে দিন কাটাতে থাক্‌লে ঠাণ্ডায় ও অনাহারে এরা দুদিনেই নিশ্চিত মৃত্যুমুখে পড়বে। Wuhanএর মহিলারা তাই এদের ব্যবস্থা করে দেবার ভার নিয়েছেন। তাদের 'Women's War-Aid Association' নামে একটা প্রতিষ্ঠান আছে। সেই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় স্কুল গুলোর কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে স্কুলগৃহে এই গৃহহারাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। আহারের বন্দোবস্তও এই প্রতিষ্ঠানই করবে। কিন্তু এদের আত্মীয়স্বজন কে যে কোথায় আছে, তার কোনো সন্ধান নেই। সংসারের সমস্ত সম্পর্ক এদের ছিন্ন হয়ে গেছে; একান্ত নির্লিপ্ত ও বন্ধন-হীন জীবনের শূন্যতায় এরা দিন রাত্রি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছে ও প্রিয়জনের স্মৃতিতে অশ্রুমোচন করছে। খবরের কাগজের পাতায় এদের করুণ অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। নিরুদ্দেশ আত্মীয়-জনের খবর জানবার জন্যে হাজার হাজার ব্যাকুল বিজ্ঞাপন ও ঘোষণা কাগজে বেরুচ্ছে। কত স্বামী তাদের স্ত্রীর খবর পাচ্ছে না; কত পিতামাতা তাদের পুত্রকন্যার সন্ধান খুঁজে বেড়াচ্ছে; কত সদ্যবিবাহিত দম্পতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে; এমনি করে সমস্ত চীন সমাজে যে অস্বাভা-বিক অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, তা বর্ণনার অতীত। এই নিঠুর যুদ্ধের আক্রমণে ব্যক্তিগত, পারি-বারিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। অশান্তি, আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলায় সমস্ত চীনদেশ আজ শ্মশানের মতো দুঃসহ হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের মধ্যেও চীনদেশের নরনারী আত্মাকে অবসন্ন হতে দেয় নাই। শক্তিকে সংহত করে এবং সমস্ত অভাবকে পরাহত করে আজ সেখানকার অত্যাচারিত জনসঙ্ঘ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক তাদের আত্ম-বিশ্বাসকে পরাজিত করতে পারে নাই; নিশ্চিত মৃত্যুর সামনা-সামনি দাঁড়িয়েও তারা আজ জীবনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে সফল করবার জন্য যুদ্ধ করছে। চীনের সংগ্রামপর নরনারী যদি বাঁচে তবে মানব-সভ্যতার শক্তি নতুন প্রাণ পেয়ে বাঁচবে। আর এরা যদি ধ্বংসের অতলে তলিয়ে যায় তবে সভ্যতা আজ নতুন সঙ্কটে আবদ্ধ হয়ে মুমূর্ষু হয়ে পড়বে।

জাতীয় আন্দোলনের ধারা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীআত্রেয়ী মিত্র

ভারতবর্ষ একটী মহাদেশের মতই বৃহৎ। এখানে নানা জাতি ও ধর্ম্ম ও নানা প্রকার সংস্কৃতির সমাবেশ। এত বড় বৃহৎ দেশকে শাসন করতে হ'লে শাসনকেন্দ্র প্রাদেশিক হওয়া উচিত এবং এই প্রদেশগুলির ভিতর একতা রক্ষার জন্য সর্ব্বোপরি একটী শাসনকেন্দ্র থাকা আবশ্যক। আমেরিকা, রাশিয়া সর্ব্বত্রই এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। নীতির দিক থেকে আমরাও এটা সমর্থন করি। কিন্তু ভারত আইনে এই Autonomy ও Federationএর যে রূপ কল্পনা করা হ'য়েছে সেইটে আমরা কোনমতেই মেনে নিতে পারি না। একেই তো দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং সংখ্যা লঘুদের ধুয়া ধরে প্রকৃত ক্ষমতা ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের হাতেই রয়ে গেছে, তার উপর প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব বলতে আমাদের যেটুকু দেওয়া হয়েছে প্রকৃত পক্ষে সে কর্তৃত্বের কোন অর্থই নেই, মন্ত্রীদের হাতে শাসনভার দেওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতাই সেখানে প্রধান। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আমাদের আরো অভিযোগ যে, এখানে ব্রিটীশ প্রজা এবং দেশীয় রাজাদের ভিতর একটা অন্যায় রকম সহযোগের ব্যবস্থা হ'য়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলিতে প্রজাদের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হ'য়ে থাকে। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে ব্রিটীশ প্রজা ও দেশীয় রাজাদের সমান অধিকার দিলে পদে পদে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাহত হবে, প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রে আমরা সামান্য ক্ষমতাই পেয়েছি। কিন্তু সেই স্বল্প ক্ষমতাকেও কাজে লাগানো সম্ভব। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে জাতীয়তার বিরোধী। ১৯৩৫এ কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইন সভায় প্রবেশ করেছিল। ১৯৩৭এ যখন নূতন ভারত আইন অনুসারে প্রাদেশিক আইন সভাগুলির পুণর্গঠন আরম্ভ হ'ল সেই সভাতেও কংগ্রেস প্রবেশ করল। এদের উদ্দেশ্য হ'ল নূতন আইনে আমাদের অধিকার দেওয়া হ'য়েছে সেইটে যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তাই দেখানো। শাসনতন্ত্রকে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য। কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়া তাদের নীতিবিরুদ্ধ। একদল শাসনভার গ্রহণের অত্যন্ত বিরোধী থাকা সত্ত্বেও দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে কংগ্রেস এ ভার গ্রহণ করাই শ্রেয় বলে মনে করল। কিন্তু এই ভার গ্রহণের পিছনে দুটো সর্ত্ত রইল। প্রথমতঃ কংগ্রেস তার পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে কখনও খাটো করবেনা। তার লক্ষ্যের পথে কোন বাধার কাছেই সে হার মানবে না। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন কারণ না ঘটলে শাসন সম্পর্কে গভর্ণর হস্তক্ষেপ করবেন না। বাম পন্থীদের ভয় ছিল কংগ্রেস যদি শাসনভার গ্রহণ করে তাহলে সে ক্রমেই রক্ষণশীল হয়ে উঠবে। দেশের শাসনতন্ত্রে আমূল পরিবর্ত্তন আনতে

হলে যে বিদ্রোহী মনোভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন তা আর ঘটে উঠ্‌বে না। কিন্তু বৎসরকাল কংগ্রেসী মন্ত্রীত্বে কোন কুফল হয়নি, বরঞ্চ সুফলই ফলেছে। গভর্ণমেণ্টের প্রেরণাতে দেশে জাতীয়তা বোধ আরও বিশেষ করেই জাগ্রত হচ্ছে। কংগ্রেস যে কিছুতেই নত হবে না, নিজের মত রক্ষার জন্য সে যে অনায়াসে শাসনভার পরিত্যাগ করতে পারে যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার মন্ত্রীদের ব্যবহারে সেইটে বুঝতে পেরে বামপন্থীরাও শাসনভার গ্রহণের নীতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে নি। তা ছাড়া প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব গ্রহণ করলেও যুক্তরাষ্ট্রকে কংগ্রেস যে কিছুতেই গ্রহণ করবে না দেশের নিকট সে কথা সে স্পষ্টভাষায় বহুবার ব্যক্ত করেছে। এবার হরিপুরা কংগ্রেসে এই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযানই বিশেষ করে পরিচালিত হয়েছিল। সভাপতির অভিভাষণে এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এবং এই প্রতিবাদ যে কেবল মুখের কথা নয়, যে সংগ্রাম ১৯৩০এ আরম্ভ হয়েছিল প্রয়োজনমত সেই সংগ্রামকেই আরো কঠোরতর করে তোলা হবে সেইটে স্বীকার করা হয়েছে। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের ভিতর যত মতভেদই থাকনা কেন, এই একটী জায়গায় জাতির এই দুর্দ্দিনে সবাই এক হয়ে মিলিত হয়েছে।

আমাদের জাতীয় জীবনের আন্দোলনের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাই যে অভিজাত সম্প্রদায়ের চেষ্টাতেই একদিন এ আন্দোলন জন্মলাভ করেছিল। তারপর বহুকাল অবধি সমাজের উঁচু স্তরেই এ আবদ্ধ ছিল। দেশের সাধারণের সঙ্গে এর বিশেষ একটা যোগ ছিল না। তখন নানাবিধ বক্তৃতা এবং পার্লামেণ্টারী রীতি অনুসারে প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া স্বাধীনতালাভের জন্য প্রকৃত কোন চেষ্টাই হত না। রাওলাট বিল প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদকল্পে গান্ধীজী যখন অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত করলেন তখনই এ আন্দোলন প্রথম জনসাধারণকে স্পর্শ করল, জনসাধারণের জাগরণেই এই আন্দোলনে প্রথম শক্তি সঞ্চার হল। এর পর থেকেই আমাদের আন্দোলনকে যথার্থ জাতীয় আন্দোলন বলে অভিহিত করতে পারি। আজ আমাদের এ কথাটাই ভাল করে বোঝা দরকার যে স্বাধীনতা লাভ করতে হলে সমগ্র ভারতে সেই চেতনা সঞ্চার করতে হবে। দেশের অধিকাংশ লোক যদি মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে তাহলে মুষ্টিমেয় লোকের চেষ্টাতে কখনও স্বাধীনতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর হবে না। কিন্তু যদি সেই মোহ ভেঙ্গে ফেলে সমস্ত নরনারী স্বাধীন হবার আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে তাহলে সেই দুর্ব্বার শক্তিকে রোধ করবার ক্ষমতা কারুর নেই; যে শ্রমিক ও কৃষক সংঘের উৎপত্তির কথা আজকাল আমরা শুনে থাকি তার মূল জনসাধারণের এই চেতনাতে। শ্রমিক ও কৃষকই জাতির মেরুদণ্ড। তাই তাদের সংগ্রামে অনুপ্রেরিত করা, সংঘবদ্ধ করাই আমাদের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু এই নবজাগ্রত চেতনাকে চালনা করা বড়ো কঠিন। আমাদের রাজনৈতিক দাবী ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক দাবীকে বিভিন্ন রাখতে হবে। নাহ'লে অর্থনৈতিক দাবীকে উপলক্ষ্য করে সমাজে যে বিরোধ ঘট্‌বার সম্ভাবনা তাতে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাহত করা হবে। আমাদের প্রধান প্রয়োজন স্বাধীনতা অর্জ্জন। তাহ'লেই আমরা আমাদের আদর্শানুসারে আমাদের

সমাজ ও জীবনকে গঠন করতে পারবো। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আমাদের যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে উঠেছে তাতে আমাদের সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর ঐক্যস্থাপন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল খবরের কাগজে কংগ্রেসের সঙ্গে শ্রমিক ও কৃষক সংঘের বিরোধের কথা আমরা প্রায়ই প'ড়ে থাকি। এই বিরোধের মূলে উভয় পক্ষেই যে ভ্রান্তি আছে তা আমাদের দূর করা প্রয়োজন। হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে এই ভ্রান্তি অপোনয়নের চেষ্টা করা হ'য়েছে। এই প্রসঙ্গে সভাপতি যা বলেছেন তার মর্ম্ম এই যে জনসাধারণের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি সমস্যা আমাদের সামনে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। এর ভিতর শ্রমিক ও কৃষক সংঘের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্বন্ধ একটী প্রধান সমস্যা। কংগ্রেসের ভিতর একদল কংগ্রেসের বহির্ভূত এই প্রতিষ্ঠানগুলির বিরোধী, কিন্তু অপর একদল এদের সমর্থন ক'রে থাকে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভালোই বলি বা মন্দই বলি এদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কংগ্রেসকে এদের মেনেই নিতে হবে, তবে কী ভাবে মেনে নেবে তার মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য স্বাধীনতা। এই সংগ্রামে কৃষক ও শ্রমিক সংঘগুলি অনায়াসেই কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে। তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার জন্য কেবল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিত্যাগ না ক'রে যাতে এরা কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'তে পারে সেজন্য কংগ্রেস কর্ম্মিদের এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত হওয়া উচিত। কৃষক ও শ্রমিক সংঘগুলি যদি সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত নাও হয় তবুও দুয়ের ভিতর সহযোগ থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

জনসাধারণকে কংগ্রেসের আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে তোলার পক্ষে প্রধান বাধা সাম্প্রদায়িকতা। বহুকাল পূর্ব্ব থেকেই এর বিষ আমাদের ভিতর সঞ্চারিত করা হ'য়েছে। এবং আজ আমরা তার ফল ভোগ ক'রছি। কংগ্রেস কোন বিশেষ ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিষ্ঠান নয়। হিন্দুরা ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের ভিতরই জাতীয়তাবোধ প্রথম জাগরিত হয়। তাই কংগ্রেস বিরোধী সম্প্রদায়গুলি একে হিন্দু প্রতিষ্ঠান ব'লেই অবজ্ঞা করতে চেয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস কখনও নিজেকে হিন্দু প্রতিষ্ঠান ব'লে অভিহিত করে নাই। ধর্ম্মের ভেদ স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে অবান্তর, ভারতবাসী হিসেবেই সে সমস্ত জাতিকে চেতনা দিতে চেয়েছে। স্বাধীন ভারতে কেবল হিন্দু বা মুসলমান নয়, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী তার ভিন্ন ধর্ম্মমত সংস্কৃতি রক্ষা করবার অধিকার পাবে। কংগ্রেসের সমস্ত নীতি জাতীয়তার পরিপোষক হিসেবেই গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে, ধর্ম্মকে সেখানে কখনও প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। তবু একদল ব্যক্তি যখন ধর্ম্মমতের ধুয়া তুলে কংগ্রেসের আদর্শকে সঙ্কীর্ণ ব'লে অভিহিত ক'রছে তখন কংগ্রেস সেই অপবাদ মিথ্যে প্রমাণ করবার জন্য কতকগুলো বিষয়ে সংখ্যালঘুদের অন্যায় দাবী মেনে নিতেও অস্বীকৃত হয় নাই। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই কংগ্রেসের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য লাভ ক'রতে হ'লে হিন্দুদের যদি মুসলমানদের কাছে ক্ষতি স্বীকারও ক'রতে হয় তাতেও তারা অস্বীকৃত হবে না। মুসলমানদের সব দাবীই তারা মেনে নিতে রাজী আছে

কিন্তু ছুটো সর্ত্তে। প্রথমত মুসলমানরা যে দাবী ক'রবে তাতে তাদের যত সুখ সুবিধাই হ'কনা কেন সে দাবী স্বাধীনতাসংগ্রামকে কোনরকমে ব্যাহত ক'রবে না। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানরাও কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ক'রতে প্রস্তুত হবে। কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ক'রছে তা সম্ভব কিনা বলা যায় না। সম্প্রতি বোস-জিন্নার সঙ্গে যে আলোচনা হ'য়ে গেছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে মিলনের আশা আছে ব'লে মনে হয়না কিন্তু মিলনের পথে যত বাধা বিঘ্নই থাকুনা কেন স্বাধীন ভারতের পক্ষে এ মিলন যে একান্ত প্রয়োজন, এ মিলন না ঘ'টলে যে ভারত কখনও স্বাধীন হ'তে পারবে না একথা মনে রেখে আমাদের হিন্দু ও মুসলমানের প্রীতির বন্ধন দৃঢ় ক'রতে হবে। কেবল সভাসমিতি আবেদন নিবেদনে কোন ফল হবে না। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করবার জন্য আমরা যদি একাগ্রমনে জনসাধারণের সেবা করি তাহ'লে জনসাধারণ হিন্দুই হ'ক বা মুসলমানই হ'ক সে সেবাকে তারা উপেক্ষা ক'রতে পারবে না। এই সেবার ভিতর দিয়েই মিলনের যোগসূত্র স্থাপিত হবে। অবশ্য জাতীয়তার পরিপন্থী দলের অভাব নেই। উভয় সম্প্রদায়ের ভিতরেই এই মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রিশকোটী লোকের তুলনায় সাম্প্রদায়িক লোকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। দেশের অন্তরে যদি আমরা মিলনের সুর ধ্বনিত ক'রে তুলতে পারি তাহলে এই মুষ্টিমেয় লোকের ফাঁকা চীৎকারে আমাদের কোন ক্ষতিই হবেনা। কিন্তু এখনও জনসাধারণ এ বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ওঠেনি। ফলে ফাঁকা চীৎকারটাই বিকট হ'য়ে আমাদের কানে ঠেকছে। এই মিথ্যাকে আমাদের জয় ক'রে নিতে হবে।

কংগ্রেস যে স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা ক'রে থাকে তার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। স্বাধীনতা লাভ মানে এই নয় যে ইংরেজের পরিবর্ত্তে সেই তক্তে ব'সে ভারতবাসী রাজা শাসন করবে। তাতে দেশে অত্যাচার ও অবিচার লাঘব হবেনা। দেশের লোকের হাতেই দেশের লোকের উৎপীড়ন চ'লবে। তাই বিদেশী শাসকের হাত থেকে দেশকে মুক্তি দেওয়াই কংগ্রেসের লক্ষ্য নয় তার লক্ষ্য আরো মহৎ। সর্ব্বপ্রকার অন্যায় শাসন ও শোষণ থেকে সে ভারতবাসীকে মুক্ত ক'রবে। আমরা পরাধীন ব'লেই যে উৎপীড়িত হচ্চি তা নয়। রাজনৈতিক বৈষম্যের জন্যই হ'ক বা অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্যই হ'ক সমস্ত দেশেই একের পীড়নে অপরে পিষ্ট হচ্ছে। একদিকে যেমন পীড়ন চ'লেছে তেমনি অপরদিকে এর হাত থেকে জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য নানাবিধ তত্ত্বেরও উদ্ভাবন হ'চ্ছে। এর ভিতর সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণ ক'রে থাকে। সর্ব্বপ্রকার বৈষম্য দূর ক'রে মানুষের ভিতর সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় ক'রে তুলবে সেই আদর্শেই এরা অনুপ্রাণিত হ'য়েছে। কেবলমাত্র রাজনৈতিক অধিকার আমাদের স্বাধীন করে তুলতে পারে না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার না থাকলে আমরা কখনই যথার্থ স্বাধীন হ'তে পারিনা। এই সমাজতন্ত্রবাদীরা সর্ব্বপ্রকার ভেদনীতির বিরোধী, তাই এরা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী। তাই এদের প্রতিপক্ষ হ'ল আজকালকার Fascist, Nazi প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতবর্ষে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই অল্পবিস্তর আছে।

এর ভিতর সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন ধ'রেই কংগ্রেসের ভিতর একটী সাধারণ দল এবং একটী সমাজতন্ত্রীদলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছিল। আপাতদৃষ্টিতে এ বিভিন্নতা জাতীয়তার পরিপন্থী ব'লে মনে হ'তে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। স্বাধীন ভারত কল্পনা ক'রতে গেলেই কেবল ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ নয় সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের অন্যান্য রূপ আমরা কল্পনা না ক'রে পারিনা। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যাগুলি পরস্পর জড়িত। এবং একের পরিবর্ত্তনে অপরের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই কংগ্রেসের মত একটী বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর অর্থনৈতিক সমস্যাকে কেন্দ্র ক'রে যে একটী বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। জহরলাল, সুভাষ বসু এঁরা সমাজতন্ত্রী দলের অন্তর্ভুক্ত না হ'লেও স্বাধীন ভারত যে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শানুসারে গঠিত হবে এ বিষয়ে তাঁরা একমত। অবশ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কাম্য, তারপর অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন আনতে হবে সেকথা মনে রাখা সঙ্গত।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রদলের প্রথম অধিবেশন হয়। তারপর থেকে কংগ্রেসের উপর এদের প্রভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হ'চ্ছে। গত দুই বৎসর যাঁরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন, সমাজতন্ত্র দলভুক্ত না হ'লেও এ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত কারুরই অজ্ঞাত নাই। কাজেই এঁদের নির্ব্বাচনে সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবই বিশেষ ক'রে টের পাওয়া যায়। অন্যান্য বিষয়ে কংগ্রেসের সাধারণ দলের সঙ্গে বিরোধিতা থাকলেও কংগ্রেসের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য স্বাধীনতা সংগ্রাম। সমস্ত দলের ভিতর যে ঐক্য থাকা প্রয়োজন এ কথা সকলেই স্বীকার ক'রে থাকেন। হরিপুরা কংগ্রেসে মাসানির নেতৃত্বে বামপন্থীরা এই নীতিকেই বিশেষ ভাবে মেনে নিয়েছে।

এই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার যোগাযোগ যতই আমাদের নিকট স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্ছে ততই বিশ্বের সঙ্গে একাত্মবোধ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হ'য়ে উঠ্ছি। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি ইংরাজের শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে সেকথা মিথ্যে নয়। কিন্তু এ ছাড়াও বিশ্বের সঙ্গে আমাদের আর একটী বড় যোগ আছে। আমাদের সংগ্রাম কেবল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই নয় আমাদের সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধনমদমত্তদের নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে। কাজেই প্রাচ্যেই হ'ক বা পাশ্চাত্যেই হ'ক, Spain এই হ'ক বা চীনেই হ'ক সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও আজ একসূত্রে গাঁথা হ'য়ে গেছে।

আমাদের যাত্রা

[Vladimir Mayakovsky]

অনুবাদক : **হরপ্রসাদ মিত্র**

•

জড় পথে হানো বিদ্রোহী পদাঘাত,
উদ্ধত শির উচ্চে তুলিয়া রাখো।
আনিব বন্যা আমরা দ্বিতীয় বার,
ভাসাব সকল গ্রহের নগরগুলি।
বহু বরণের দিন কাটে ধীরে-ধীরে,
কালের চক্র চলিতেছে মন্থর,
গতি-রেই মোরা জানিয়াছি ভগবান,
হৃদয়ে নিয়ত উঠিছে ঢক্কারব।
'বুলেট্'-বোলতা করিবে কি দংশন?
মোরা গাহি গান আঘাতের উত্তরে।
তুলনা-বিহীন পোষাকের সোনা রঙ,
বজ্রের রব বাজিছে কণ্ঠস্বরে॥
সবুজে ছোপাও বিস্তৃত প্রান্তর,
গালিচায় ঢাকো, ওগো তৃণ, দিনগুলি!
ইন্দ্রধনুর যোয়ালে, আকাশ, বাঁধো—
অশ্বের মতো দ্রুতগতি বৎসরে॥
ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখ কি ক্লান্তি হোথা;
আমরা গাহি না স্বর্গের কোনো গান।
হে দীক্ষাগুরু, জানাও ঈশ্বরে হে—
সশরীরে মোরা স্বর্গে উঠিতে চাই॥
খুসির খেয়ালে কর-হে মদিরা পান,
রক্তে বন্যা আসিল বসন্তের!
স্পন্দিত হিয়া হোক্ আজি দুরু-দুরু
মুখর হ'য়েছি মহা আনন্দে আজ॥

জিজ্ঞাসু মানব

জিতেন্দ্রচন্দ্র গোস্বামী

মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞানের পরিধিরেখায় দাঁড়াইয়া পশ্চাতের দিকে চাহিলে অসীম বিস্ময়ে আবিষ্ট হইতে হয়। মূলসূত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ক্ষণে ক্ষণে—আজিকার অজ্ঞাত বস্তু কাল হইয়া পড়িয়াছে জ্ঞাত ও পরক্ষণেই অবজ্ঞাত। এমনই করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে জানা হইতে অজানার সুদুর্গম আলোকতীর্থের অভিসারে যাত্রা মানুষের।

অপূর্ণজ্ঞান বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার দ্বারা জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে যে বিজ্ঞানের (science) সাহায্যে মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞাতব্য, সৃষ্টির রহস্যকে অধিগতের পর্য্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছে। বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের এই কৃতিত্ব (achievement)এর স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। বস্তুবাদীর নিজস্ব অস্ত্রাগার হিসাবে বিজ্ঞানকে জড় ও আদর্শবাদের পরিপন্থী বলিয়াই জনসাধারণের বিশ্বাস কতটুকু যুক্তিসহ তাহা সন্দেহ করিবার সময় আসিয়াছে। মানুষের সম্যক জ্ঞানলাভের ব্যাপারে বিজ্ঞান কতটুকু সাহায্য করিতে সক্ষম এবং জড়বিজ্ঞানের নিজস্ব আকৃতি ও প্রকৃতিই বা বিংশশতাব্দীতেও গতানুগতিকভাবে জড় ও অনড় হইয়াই রহিয়াছে কিনা তাহারও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।*

একথা অনস্বীকার্য্য যে ব্রহ্মাণ্ডে অপ্রাণ জড়বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ ব্যাপারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সুস্পষ্টতর ও অপেক্ষাকৃত যুক্তিসহ হইয়াছে। একটী গ্রহের প্রবীণত্ব, অবস্থান, আকৃতি, গতি ও গঠনের উপাদান নির্দ্দেশ করিয়াছে বিজ্ঞান অনেকটা অবিশংবাদিতরূপে। বস্তুর মৌলিক উপাদান যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক বস্তুকণিকা, তাহারও সুসঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা লাভ করিয়াছি। কিন্তু এই জড়ের রাজ্য হইতে চেতনের সীমানায় আসিবামাত্র বৈজ্ঞানিক সত্যের অপ্রতিবাদিত্বের গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়। মৌলিক সূত্রগুলি নিয়াই বাধে বিসম্বাদ এবং পক্ষ-প্রতিপক্ষের দ্বন্দ্বের সমন্বয় সম্ভবপর হয় না।

হ্যা, মূলসূত্র নিয়াই গোল বাধে। অচেতন পদার্থের সহিত চেতনের পার্থক্য প্রধানতঃ এইখানে যে, যে অংশ সমুহের সমষ্টি মিলিয়া অচেতন পদার্থের সৃষ্টি সেই অংশের প্রকৃতি নির্ব্বিশেষে বস্তুটিরই প্রকৃতি সূচনা করে। কিন্তু চেতন পদার্থ সম্বন্ধে এই কথা খাটিবেনা "সমগ্রতা" বা Wholeness "নিজস্বতা" বা individuality চেতন পদার্থের গুণ। প্রাণীরাজ্যের মানসিক ও অতিমানসিক অংশের কথা বাদ দিয়া শুধু দৈহিক কার্য্যকলাপটুকুর কারণও শুধু পদার্থবিষয়ক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জ্ঞান দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। জড়ের ধর্ম্মের চাইতেও গূঢ় ও গভীর

---

* এ সম্বন্ধে লেখক "আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ধারা" প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন।

"উদ্দেশ্য" (purpose) বা "উদ্দেশ্যমূলক সঙ্গতি" (purposive order)কে স্বীকার করিতেই হয়। জড়ের ধর্ম্মে এই "উদ্দেশ্য" (purpose)কে অস্বীকার করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে কোন বাধা নাই তাই চেতনের রাজ্যেও দৃশ্যমান ঘটনানিচয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া অনেক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ও শরীর বিদ্যাবিদ্ নির্ভাবনায় চেতনের এই নূতন ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, চেষ্টা চলিতেছে, জড়ের প্রকৃতিকে আরও সম্পূর্ণভাবে জানিবার, যাহা দ্বারা চেতনের অজ্ঞেয় উদ্দেশ্যবাদের সাহায্য না নিয়া ও অচেতন ও চেতনকে অভিন্নভাবে একই থিয়োরীর মধ্যে শুধু বস্তু সংজ্ঞা দ্বারা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যমূলক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে প্রফেসর Whitehead সুন্দর কথায় ব্যঙ্গ করিয়াছেন "Many a scientist has patiently designed experiments for the purpose of substantiating his belief that animal operations are motivated by no purposes. He has perhaps spent his sparetime in writing articles to prove that human beings are as other animals so that "purpose" is a category irrelevant for the explanation of their bodily activities, his own activities included. Scientists animated by the purpose of proving that they are purposeless constitute an interesting subject for study."

Random variation বা যদৃচ্ছা পরিবর্ত্তন ও struggle for existence বা জীবন সংগ্রামএর মধ্য দিয়া চেতন পৃথিবীর ক্রমবিকাশ হইয়াছে একথা যে যুক্তিসহ নয় তাহাতে সন্দেহের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু সৃষ্টির প্রকাশ হইয়াছে বলিলে হয়তো বা কোন রকমে একটা চলনসই কারণ বলিয়া মানা সম্ভব হইত। কিন্তু যেখানে evolution বা ক্রমবিকাশকে প্রত্যক্ষ করিতেছি সেখানে জাগতিক বিধানের পশ্চাতে একটা উদ্দেশ্যকে স্বীকার করিবার ইচ্ছা অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয়তঃ, শুধু টিকিয়া থাকিবার (survival) প্রয়োজনই যদি একমাত্র প্রশ্ন সেখানে কয়েক রকমের নীচুস্তরের জীবই ত সৃষ্টিবিধানে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। এমন কি, এমন কথা বলাও অসমীচীন হইবে না যে, শুধু টিকিয়া থাকার যোগ্যতা বিচারে ক্ষুদ্র-প্রাণ চেতন জগতের আবির্ভাবেরই বা সার্থকতা কোথায়? জড় প্রস্তরখণ্ড শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকিয়া থাকার পরীক্ষায় অধিকতম যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদেরা তাই Random variations ও struggle for existenceএর দুর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া নূতন সেনানিবাসের সন্ধান করিয়াছেন এবং "Vital force" "Entelechy" "Notism" ইত্যাদির অস্পষ্টতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ তরুণ প্রাণিবিদ্ J. B. S. Haldane একটা "emergent"এর সন্ধানে আছেন কিন্তু তাহা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের চাইতে বিস্ময়-মুগ্ধ মনের কল্পনাবিলাস বলিয়া প্রসঙ্গান্তরে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

চেতন জগতের কেবলমাত্র জৈবিক অধ্যায় লইয়াই বৈজ্ঞানিকের সমস্যার অন্ত নাই। জড়ের জ্ঞান দিয়া চেতনকে জানা যাইতেছে না, তাইতে দুইদিক হইতেই প্রয়োজনবোধে বৈজ্ঞানিকের

জ্ঞানের আক্রমণ চলিয়াছে—প্রথমতঃ জড় জগত সম্বন্ধে জ্ঞানের সম্প্রসারণ, দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ নূতন করিয়া চেতনের রাজ্য সম্পর্কে অন্যনিরপেক্ষ জ্ঞান সঞ্চয়।

জড় হইতে চেতন পর্য্যন্ত ধারাবাহিক জ্ঞান অপূর্ণ রহিয়াছে—সন্দেহ নাই, তাহার চাইতেও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে চেতন হইতে মনোরাজ্যের জ্ঞান—মনের অতীত আত্মিক জ্ঞানের কথা প্রবন্ধের বহির্ভূত বিষয়। হয়ত জড়ের রাজ্য বিভিন্ন—চেতনের রাজ্য বিভিন্ন—এবং মনের রাজ্য এই দুইয়ের চাইতে স্বতন্ত্র—এই মতকেই স্বীকার করিয়া লইয়া ত্রিবিধ রাজ্যের পরস্পর নিরপেক্ষ জ্ঞান আহরণ চলিবে, নতুবা জড় ও চেতনের রাজ্যে অভিন্নতা ও মনোরাজ্যের নিরপেক্ষতা স্বীকার করা যাইবে; অথবা সৃষ্টির জড়, চেতন ও মনোরাজ্যের মধ্যে একই মূলসূত্র অভিন্ন হইয়া আছে—এই তিন প্রকারভাবে জ্ঞান আহরণ করা যাইতে পারে। Emergent Evolution মতের বিশ্বাসবাদীরা মনে করেন "Both life and mind are emergent properties of certain aggregates. A complete knowledge of the constituents of these aggregates would not enable us to predict that, in combination, they would manifest the properties of the life or mind: At various stages of material complexities radically new properties emerge." একটা রাসায়নিক উদাহরণ নিলেই কথাটা পরিষ্কার হইবে। যেমন ধরা যাউক—অম্লজান ও উদ্‌জান সহযোগে জল উৎপন্ন হয় কিন্তু অম্লজান এবং উদ্‌জানের প্রকৃতির জ্ঞান হইতে জলের প্রকৃতির কোন আভাসই পাওয়া যায় না। বিবরণটা অযৌক্তিক নয় কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিয়া উহাকে মানা চলে না। জানিতে পারা যাইবে না কখন কিভাবে কি হইয়া যাইতে পারে ইহাই যদি থিয়োরী হয় তাহা হইলে purposive order, final cause হইতে উহার দূরত্ব কি খুবই বেশী? বরঞ্চ ইহার বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীই বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদীর গ্রহণযোগ্য যে, জানা উহাকে যাইবেই শুধু সময়সাপেক্ষ। আপাততঃ আমাদের 'বস্তু' সম্বন্ধে জ্ঞান অপূর্ণ অথবা ভুল পথে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। এ পথে আরও অগ্রসর হইলে বা ঠিক পথে পরিচালিত হইলে জড়, চেতন ও মানস রাজ্যের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যে ধারাটি রহিয়াছে তাহা প্রমাণিত হইবে (continuity) এবং ধারাবাহিকতাবিরোধী অসংলগ্ন মতবাদের ক্ষেত্র ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্হিত হইবে। 'মানসিক' ক্রিয়াকলাপকে যাহারা 'মানসিক' বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি নহেন তাঁহারা বলেন 'মন'কে শুধু শুধু প্রক্ষিপ্ত না করিয়াও তথাকথিত মানসিক কার্য্যকলাপের কারণ নির্দ্দেশ করা চলে। তাহাদের মতে মন বলিয়া কোন প্রত্যক্ষ অগোচর সত্ত্বা নাই—যখন বলি আমরা কিছু চিন্তা করিতেছি অথবা উপলব্ধি করিতেছি তখন তাহা না বলিয়া একথা বলা চলে যে আমাদের দেহ এক প্রকার আচরণ করিতেছে। Dr. Broad এই আচরণবাদ or Behaviourismএর যুক্তিস্বল্পতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "preposterously silly theory", Behaviourism মানসিক কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় নাই সত্য কিন্তু একদিক দিয়া ইহার আবির্ভাব বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়তা করিয়াছে। কতগুলি

শুদ্ধ দৈহিক movementকে আমরা মানসিক বলিয়া জানিতাম—যেমন হাঁচি, চোখ মিটমিট করা ইত্যাদি। তাহারা যে প্রতিক্রিয়া (reflex) হইতে উদ্ভূত সে জ্ঞান আমাদিগকে দিয়াছে আচরণবাদ এবং সহজ reflex এর অগোচরে conditioned (আপেক্ষিক) reflex সম্বন্ধে সন্ধান দিয়াছে ইহারাই। এই অবিশুদ্ধ (মিশ্র) reflex অবলম্বন করিয়া নতুন জ্ঞান আহরণের চেষ্টা চলিতেছে, Pavlov এর experiment এর ফলে দেখা গিয়াছে শুদ্ধ মানসিক প্রক্রিয়া বলিয়া কিছুই নাই প্রতিবন্ধক (Inhibitory processes) দ্বারা নিয়তই প্রভাবিত হইতেছে মানুষের মনোস্তত্ব তথা তাহার বহিরভিব্যক্তি—Dr. Watson শিশু মনোস্তত্বেও এই reflexএর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। একদিক দিয়া ইহার চরম বিকাশ হইয়াছে এবং Behaviourist রা আজ একথাও বলিতে সুরু করিয়াছেন মানুষের মন এমনই নমনীয় জিনিষ (plastic) যে ঠিক মতন (conditioning) প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের ব্যবস্থা করিতে পারিলে একটী শিশুকে যে কোন রকমভাবে গড়িয়া তোলা যায়—কবি, দার্শনিক, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক বা খুনী, চোর—যাহা ইচ্ছা, Kohlerএর শিম্পাঞ্জী পরীক্ষায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে মানুষ—ইতরজন্তুতে ও এই condioned reflex কাজ করিতেছে।

একটী সক্রিয় মনকে স্বীকার করা নিয়াই দ্বন্দের অন্ত নাই, তার উপরে মনোবিকলনবাদীরা এই প্রত্যক্ষ মনের অগোচর আর একটী অবচেতন মনের সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও মতের সাম্য রক্ষিত হয় নাই। Brenerএর শিষ্য ফ্রয়েড গুরুর মত সংস্কার করিয়া নিজের মতের প্রাধান্য বিস্তার করিলেন—Repression বা অবদমন মনোবিকলনের মূল বলিয়া গণ্য হইল। দুঃখপূর্ণ স্মৃতি শুধু নয় অবচেতনের মনিকুঠরীতে এমন সব নির্জ্জিত অপূর্ণ ইচ্ছা গুদামজাত হইয়া আছে যাহা মনে পড়িলেও আমাদের লজ্জার অবধি থাকে না। জাগ্রত চৈতন্য তাহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিয়াছে মাত্র কিন্তু সেই বন্দিনিবাসের সতর্ক পাহারার বিরুদ্ধে উহারা অবিরাম সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে—সুবিধা পাইলেই হুড়মুড় করিয়া আত্মঘোষণা করিয়া ফেলে। স্বপ্নযোগে এই মনোপাতালের অদৃশ্য ইচ্ছাসমূহ ছদ্মবেশে চৈতন্যের পবিত্র ও নিষিদ্ধ মহলে প্রবেশ করে। মহামতি ফ্রয়েড্ সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে যে motive force লক্ষ্য করিলেন সেটী হইল Repressed sex বা অপূর্ণ যৌন প্রবৃত্তি বা Libido। কিন্তু মনোবিকলনবাদী Adler (এখন আর মনোবিকলনবাদী নহেন) সেখানে কারণ নির্দ্দেশ করিলেন (will-to-power) স্বপ্রাধান্য এবং মনোবিকলনের গোড়ার কথা অবদমন (Repression)কেই অস্বীকার করিলেন। তিনি বলেন, "The driving force of life is the urge to acquire power and superirity over one's fellows."এ সম্পর্কে প্রফেসর ইয়ুংএর (prof. Jung) মতে অমিলটাও উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে "Libido is an undifferentiated life force from which all instincts derive. In the infant it assumes the instinct of nutrition. It is only much later that its assumes the sexual form." Adlerএর মতই অবচেতন মনের রাজ্য বন্দী ভাবনার কারাগার বলিয়া

স্বীকার তিনি করেন না। ব্যক্তি বিশেষের মনের সর্ব্বাঙ্গীন বৃদ্ধির অভাব হইতেই অবচেতন মনের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। তিনি মানুষকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করেন Extroverts ও Introverts। প্রথমোক্ত দলের অনুভূতির আতিশয্য ও চিন্তার দৈন্য দেখা যায় দ্বিতীয় দলের চিন্তার আতিশয্য ও অনুভূতির অভাব। এবং উভয়ক্ষেত্রেই অবজ্ঞাত চিন্তা ও অনুভূতি প্রত্যক্ষের অগোচরে অবচেতনের আওতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। অবস্থাবিশেষে স্বভাবতঃ চিন্তাশীল ব্যক্তির অধিকতর অনুভূতির প্রয়োজন হইলে কিংবা স্বভাবতঃ অনুভূতিপ্রবণ ব্যক্তির অধিকতর চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হইলে একটা অন্তঃসংগ্রামের সৃষ্টি হয়।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ হইতে দেখা যায় মনোবিজ্ঞান এখনও এমন পর্য্যায়ে আসিয়া পৌঁছায় নাই যেখানে তাহার ফলাফল দেখিয়া বিচার করিয়া উহাকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা চলে। শুধু সম্ভাব্যতার দ্বারাই মতবিশেষের গ্রহণযোগ্যতা নির্দ্দেশ করা যায় মাত্র কিন্তু এত বিভিন্ন মত ও সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে উহাদের প্রত্যেকেরই তুল্যরূপ উপোযোগিতা যে জোর করিয়া ছাড়া কাহারও স্বপক্ষে কিছু বলিবার নাই।

মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা—প্রশ্ন বিশেষের সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে গভীরতর জিজ্ঞাসা মানুষকে পীড়িত করিয়া তুলে। এমনইভাবে প্রতিজ্ঞা, বিপরীত প্রতিজ্ঞা ও এতদুভয়ের সমীকরণ মানুষের চিন্তাধারার নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে অনাগত মহত্তর সঙ্গতির উদ্দেশ্যে।



কেহ নাই যার

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

এক সময়ে পিন্টুর বাপ মা সবাই ছিলো, কিন্তু তবু সে সুখের চেহারা কখনো দেখেনি। দেখেনি যে, তা সহজেই অনুমেয়। ভগবানের কলঙ্ক ও অভিশাপ নিয়ে তার জন্ম।

দিনের পর দিন যায়। একঘেয়ে, বিবর্ণ জীবন ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলে—কোন ব্যতিক্রম হয় না তার। রোজ সর্দ্দার এসে পিন্টুকে একটা কাঠের বাক্সের গাড়ীতে করে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়। আর সহরের পথে পথে পিন্টুকে নিয়ে সারাটা দিন ঘুরে ফিরে। পিন্টুকে দিয়ে মানুষের কৃপা কুড়ানো ওর ব্যবসা। পিন্টু, পিন্টু জন্মেচে তার জীবনটাকে এম্‌নি রসিয়ে রসিয়ে অপচয় কর্‌বার জন্যে। সে এসেছে সর্দ্দারের প্রাণের সল্‌তেটা সঞ্জীবিত রাখবার জন্যে। একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিয়ে সে জন্ম নিয়েচে, মানুষের জন্যে আত্ম-উৎসর্গ কর্‌তে এসেছে সে।

এমনি দুর্ব্বিসহ দুঃখের ভেতর দিয়েই ওর দিন যায়। দিনের পর দিন যায়। কিন্তু একটি দিন তার জীবনে এসেছিলো, একটি মুহূর্ত্তের বিচ্যুতি হয় তো। কোন উচ্চকিত, আনন্দ-ঝল্‌মল মুহূর্ত্ত ওকে একটি দিনের জন্যে অতি আপন জনের মতো ভালবেসে উঠেছিলো গুঞ্জন করে। উঠেছিলো বৈ কি! হ্যাঁ, অনেক সময় অসম্ভবও সম্ভব হয়। একটি আশ্চর্য্য সুন্দর অধ্যায় তার জীবনের পৃষ্ঠা থেকে হঠাৎ একদা উন্মোচিত হয়ে পড়েছিলো। চল্‌তে চল্‌তে তার জীবনে এসেছিলো একটা বিশ্বাসাতীত বিস্ময়।—একে কেন্দ্র করেই হলো আমাদের কাহিনী।

সেই দিনটি আজও ভুল্‌তে পারেনি সে। হ্যাঁ, সেই গ্রীষ্মের একটি দিন। মাথার ওপরে প্রচণ্ড সূর্য্য, রাস্তার পিচ্ গরমে তেতে উঠেচে। হ্যাঁ, এম্‌নি একটি দিন সে দু'দিন উপোস করে দুর্ব্বল, ক্লান্ত, পঙ্গু দেহটাকে বহন করে ফের ভিক্ষার জন্যে পথে নাম্‌লে। অভ্যাস মতো পিন্টু কাঠের লাঠি গাছিতে ভর করে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলেছে ভিক্ষায়। পিন্টু এখন নিজেই ভিক্ষায় বার হয়। কেউ তাকে আর বোঝার মতো পথে পথে টেনে বেড়ায় না। অবিশ্যি, একটু কষ্ট হয় তার, তা হোক্‌গে। সেজন্যে সে ভাবনা করে না। দুঃখ, দুঃখ সবারই ত আছে। দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করেই তো মানুষ বেঁচে আছে।

যাক্, সে আর এমন কি, কাঠের লাঠি। ভর করে তাকে চল্‌তে হয়—এই যা। তবু সে বেশ আনন্দেই সারাটা দিন ভিক্ষে করে বেড়ায়। উঃ, সে কী কষ্ট, কী ভীষণ যন্ত্রণা! আজো সে ভুল্‌তে পারেনি সর্দ্দারের কথা। কি নির্দ্দয়ই না ছিলো লোকটা—যেন যমদূত। সেই প্রচণ্ড রদ্দুর, যেন দেহ পুড়ে কালি হয়ে যায় এর উপরে,—সবার উপর এই নির্ম্মমতা, সর্দ্দারের মায়ালেশ-হীন এই নিষ্ঠুর ব্যবহার! দুঃখে ও ক্ষোভে তার মন ধোয়াটে হয়ে আসে। আজ, আজ একবার

সর্দ্দারকে হাতের কাছে পেলে সে দেখ্‌তো।..... আস্তে আস্তে সে রাস্তাটা পার হয়ে এলো। তারপর তার শীর্ণ, ময়লা হাতখানা যান্ত্রিকভাবে মেলে ধর্‌লো জনৈক পথিকের পানে।

কিন্তু লোকটি সেদিকে ফিরেও তাকায় না।

পিণ্টু ছোট একটি শ্বাস ফেলে আবার পথ চল্‌তে থাকে। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চল্‌তে থাকে। একটি পয়সাও পেলে না সে, একটি পয়সাও। এতো লোক পথ আসা যাওয়া করে অথচ কেউ তাকে একটি পয়সা দিলে না। বিষণ্ণ মনে পিণ্ট পথ চল্‌তে লাগলো জনতা, যানবাহন আর কোলাহলের মধ্যে। একটা রেঁস্তোরার দোরে এসে সে কখন যে দাঁড়িয়েচে, সে নিজেই জানে না। অপলক চোখে সে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। প্লেটে কতো কি খাবার রয়েচে—মাংস, চপ্‌ রুটী ইত্যাদি। আর সবাই পরম আনন্দে তা ভক্ষণ কর্‌চে। পিণ্টু লোভাতুরের মতো সেদিকে চেয়ে থাকে। কী মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আস্‌চে! তার জিভে জল আসে। খেতে না জানি কী চমৎকার লাগে! আঃ এক টুক্‌রো, এক টুক্‌রো মাংস যদি কেউ তাকে দিতো। অনেক খাবার তো নষ্ট হয়ে যাচ্চে, একটু তাকে দিলে কী হয়?......হ্যাঁ, সে খেয়েচে চপ্‌, সাহেবদের বাড়ীর বেড়ালের মুখ থেকে কেড়ে সে একদিন চপ্‌ খেয়েচে। আহার্য্যের খোস্‌বয়ে তার মনে আবেশ জাগে। রিমঝিম্‌ বাজনা বাজতে থাকে তার মাথায়। একটা সূক্ষ্ম সক্রিয় অনুভূতি ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সহসা, সে সম্বিৎ ফিরে পেলো। যেন সে আকাশ থেকে খসে পড়্‌লো।

যাঃ যা বেটা, এখান থেকে ভাগ, পিণ্টুকে লক্ষ্য করে ষ্টুয়ার্ট মুখ খিঁচিয়ে ওঠে: হাঁ করে দেখ্‌ছিস্‌ কী?

আমাকে, আমাকে দু'টি খেতে দাও না—যেন তার অজান্তে তার অশরীরী আত্মা কথা কয়ে উঠ্‌লো।

যা-যা-বেটা, ভাগ এখান থেকে—আবার সেই কণ্ঠস্বর: এটা অন্নসত্র নয়।

ভেতর থেকে কে একজন গলা খাঁক্‌রি দিয়ে ওঠে।

একবার হতভম্বের মতো পিণ্টু ষ্টুয়ার্টের মুখের পানে মুহূর্ত্তের জন্যে তাকায়। অবশেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেখান থেকে সে সরে পড়ে। একটা দুর্জ্জয় অভিমান আর ক্ষোভ হয় ওর ষ্টুয়ার্টের উপর: সে পথে দাঁড়িয়ে। সকলের পথ। তাতে তার কী? ভালই তো, সে ভালই করেচে। সে দাঁড়াবে। কে তাতে কী করতে পারে।...সে পথ দিয়ে আস্তে আস্তে চলেচে—ইতিমধ্যে পায়ের তলার পথ আরো তেতে উঠেচে। আঘাতের পর আঘাত—এমনি আঘাত সে রোজই পাচ্চে—এতে কোন আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, এমনি নিঃসঙ্গতার, দুঃসহতার ভেতর দিয়েই ওর জীবনের রথ চলেচে এগিয়ে। এমনি নিদারুণ হতাশ আর ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে হয় তো আরো অনেক জায়গায়ই ঘুরতে হয়েচে, উপেক্ষা আর অবহেলা পেয়ে পেয়ে, তার ক্লান্ত দেহটাকে টেনে বেড়াতে হয়েচে অনেক জায়গায়—যাক্‌, সে খবর দিয়ে আমাদের কাজ নেই। সেই একঘেয়ে

বিরক্তিকর জীবনের ইতিবৃত্ত লিখ্‌তে বসিনি আজ। এইটুকু বল্‌তে হয়েচে শুধু ওর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার জন্যে। অবিশ্যি এতে কতটুকু বা তার পরিচয় দেওয়া হলো! আমি জানি, ওর পরিচয় দিতে গিয়ে আমি আজ শুধু ব্যর্থই হয়েচি।

* * * * *

এই পল্লীটা একেবারে নীরব। শুধু দালানের ছায়ায় বসে কয়েকটী মেয়ে ছেলেতে মিলে খেলা করচে। পিন্টু ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো। অবসাদ আর ব্যর্থতায় আজ তার মনটা ধূসর, ভারাক্রান্ত।

কি বল্‌ছিলাম,—হ্যাঁঃ এই তো সেই গ্রীষ্মের দুপুর! এই সুখস্মৃতিকে নিয়েই, এই ঘটনার আবর্ত্তেই হলো আমাদের গল্প।

এই, এমন সময় একটি ছেলে বল্লে: তোর চোখ একটা কাণা নাকি, অমন করে চেয়ে আছিস্ যে—।

মাগো, কী ভয় করে।

একটা গুঞ্জন সুরু হলো।

পেঁচার মতো কী বিশ্রি থেবড়া নাক?

একটি মেয়ে নাক সিটকে উঠ্‌লে:

ঈস্, কী ভোট্‌কা একটা গন্ধ বেরুচ্চে ভাই গা থেকে।

যা বেটা, এখান থেকে পালা।

এমনি কতো কথা, কথা নয় যেন হুল। যেন অঙ্গার, লাল জ্বলন্ত এক এক টুকরো অঙ্গার কে ওর চোখে মুখে ছুড়ে মার্‌লে।

পিন্টু কোন উত্তর দিলে না। বোকার মতো হি হি করে হেসে উঠ্‌লো মাত্র।

দুপুরের আকাশ তখন রিক্ত, মেঘলেশহীন। একটা ঝিরঝিরে হাওয়া বইচে। আর পার্কের ধারের বড় কৃষ্ণচূড়া গাছটি যেন বেদনাভরে কাঁপ্‌চে, অলস স্বপ্নে ঝিমোচ্চে।

* * * * *

এমন সময় নীল বাড়ীর জানালার পরদাখানা একটু ফাঁক হয়ে আসে। একটি কিশোরী মেয়ে জানালার শিকে ভর করে এসে দাঁড়িয়েচে।

পিন্টু মেয়েটির দিকে চাইলে। মেয়েটীর পুষ্পপেলব হাতে সোনার চুড়ি সোণালী আলোয় ঝলমল করচে। একখানা বাসন্তী রঙ্‌এর সাড়ী পরণে,—ফিন্‌ফিনে সিল্কের ফুরফুরে আলস্য ওর তনুলতা ঘিরে বিরাজ করচে। বিনুণী সাপের মতো দুল্‌চে পিঠে। ভেসে আস্‌চে অঙ্গরাগে সুরভি মদির একটা গন্ধ—কি সুন্দর মেয়েটি, অমন রূপবতী কন্যা হয়তো সে জীবনে আরো দেখেচে, কিন্তু—কিন্তু অমন মমতা মাখানো চোখ সে দেখেনি কখনো!

মেয়েটিকে দেখ্‌লেই যেন লক্ষ্মীর মতো মনে হয়। কেন যেন এই মেয়েটিকে দেখে ওর মনে একটা আশার সঞ্চার হয়। আনন্দের অগ্নিশিখা জ্বলে ওঠে ওর আত্মার গোপনতম গুহায়।

সে আজ পাবে, সে আজ হবে না এখান থেকে বিমুখ। এক্ষুনি মেয়েটির প্রসন্নদৃষ্টিতে উজ্জ্বল, উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বে ওর ব্যর্থ দিন। কিন্তু কী বলে চাইবে, কী বল্‌বে সে? এখানে বল্‌বার ভাষা মূক হয়ে আসে একটা অজ্ঞাত অনুভূতির রাজ্যে।

* * * * *

এই, মেয়েটি এবার শুধালে, তোমার নাম কি?'

এতোক্ষণে সত্যি সত্যি মেয়েটি ওর সঙ্গে কথা বল্‌লে। আহা কি মিষ্ট স্বর, যেন ফুলের কানে কানে ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো।

আমার,...আমার নাম? যেন সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারচে না। এম্‌নি ভাব।

মেয়েটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

একটু চুপ্‌চাপ্‌।

কি ভেবে পিণ্টু জবাব দিলে:

আমার, আমার নাম...ভোম্বল দাস,...হি হি. হি হি, পিণ্টু ফের হেসে উঠ্‌লো—অর্থহীন হাসি।

একদফা হাসি।

মেয়েটিও সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে, তার মুক্তোর মত দাঁত ঝিক্‌মিক করে ওঠে হাসিতে মুহূর্তের জন্যে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ্‌। দু'জনেই চেয়ে আছে দুজনের দিকে গভীর বিস্ময়ে।

কিশোরী মেয়েটি বার বার আড় চোখে পিণ্টুর পিঠে ঝুলান ঝুলিটির পানে কুতূহলী দৃষ্টি মেলে দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

এই, মেয়েটি ফের শুধায়, তুমি বুঝি বাজিকর?

পিণ্টু নির্ব্বোধের মতো মাথা নাড়ে।

কি-কি বাজি জান, এক টাকাকে পাঁচ টাকা করতে পার, পিক্‌লু মণির নাচ দেখাতে পার?... এই অদ্ভুত জীবটাকে দেখে ওর রূপকথার জুজুর কথা মনে পড়ে। একটা অকারণ রহস্যের কুহেলিকা ঘনিয়ে আসে ওর চোখে।

টাকা, টাকা। কোথায় পাবে সে টাকা! একটি আধ্‌লাও সে আজ পায় নি। আর, আর এই যে কিসের নাম—দূর ছাই সে নামটাও মনে মনে উচ্চারণ করতে পারচে না!...

একটা বাজি দেখাও না? যা তুমি জান, মেয়েটি কথা বল্‌লে।

হুঁ, বাজি, আচ্ছা দেখাচ্ছি।

উভয়ের মনেই একটা আনন্দ কৌতূহল।

অদ্ভুত একটা ভঙ্গী করে হঠাৎ পিণ্টু মুখ ভ্যাংচে উঠ্‌লো।

ফের একদফা হাসি।

পিণ্টুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আনন্দে মেতে উঠ্‌লো শিশুর দল।

পিণ্টুর মনটিও নাড়া দিয়ে ওঠে একটা অজ্ঞাত অনুভূতিতে। কেন, কেন এই শিহরণ, সে বুঝতে পারচে না কেন তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌চে! সে ভুলে যায় তার ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা।

আস্তে আস্তে উজ্জ্বল, সোণালী মুহূর্ত্তগুলো গড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে, চুপচাপ্।

মোড় ফিরে যায় কথার।

আরো নিস্তব্ধ হয়ে আসে পল্লীটা, আরো নিঃসঙ্গ হয়ে আসে তাদের দু'জনের উপস্থিতি।

এই, রোজ তুমি এম্‌নি ভিক্ষে করো?

কোন উত্তর খুঁজে পায় না পিণ্টু।

তোমার মা আছে, বাবা? ছোট মেয়েটি পুনর্ব্বার শুধালে। তুমি থাক কোথায়?

আমি, আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াই।

মেয়েটির চোখে এবার অজস্র বিস্ময় ঘনিয়ে আসে মুহূর্ত্তের জন্যে।

বেলা গড়িয়ে পড়ে।—

কি করে তোমার দিন যায়? মেয়েটির মনে দুঃখ হয়, আহার্য্যের প্রাচুর্য্য আর ঐশ্বর্য্যের বাহুল্যের মধ্যে ওরা বেঁচে আছে। আর, আর এই লোকটি!

দিন, দিন আমার চলে যায়—কোনদিন পেলে খাই, নইলে না। বেশ, বেশ চলে যায় আমার দিন।—যেন সন্ন্যাসীর মতো উদাসীন ওর কণ্ঠস্বর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আচ্ছা, আজ কী খেয়েচো?

বেদনার আভা দেখা দেয় পিণ্টুর মুখে।

কিছু খাওনি বুঝি? মেয়েটি সহানুভূতিতে আর্দ্র হয়ে আসে।

কোন উত্তর খুঁজে পায় না পিণ্টু। সে খায়নি, সে খায়নি আজ দুটো দিন হল পুরোপূরি। কিন্তু তাই বলে সে আজকের এই সোণালী মোহটা মাটি করে দিতে পারে না তুচ্ছ সুখদুঃখের কাহিনী বলে।

এম্‌নি কথার পর কথা গড়িয়ে চলে মন্থর গতিতে, অজান্তে।

এক সময় পিণ্টু বলে, দিদিমণি, একদিন আমার এই দুঃখ থাক্‌বে না। সে হাস্‌লে—বিষণ্ণ হাসি।

মেয়েটি হতবাক্ হয়ে যায়, কিছুই যেন সে বুঝতে পারচে না। আবার সবই যেন সে

বুঝ্‌চে, যেন হেঁয়ালী মনে হচ্চে তার কাছে সব কিছু, আজকের দিনটা ওর কাছে এসেচে যেন রূপকথার মায়াপুরীর রহস্য নিয়ে।

* * * * *

দিদিমণি, সে আবার বলে : এইবার যাই, বেলা পড়ে এলো—এই ব'লে পিণ্টু লাঠি ভর করে উঠে দাঁড়ালো। এবং পরক্ষণেই খুটখুটু করে পথ চল্‌তে থাকে।

ইতিমধ্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেশ কতকটা পথ অতিক্রম করে গেচে সে।

এই, এই শোন। সেই স্নিগ্ধ, সুন্দর মেয়েটি তাকে ডাক্‌চে।

পিণ্টু ফিরে তাকায়।

এই একটু আসতো। মেয়েটি হাতখানা লীলায়িত করে ইঙ্গিত করে। মেয়েটির কথা শুনতে ওর ভারী ভাল লাগে, যেন বাঁশীর মতো স্বর। সে আস্তে আস্তে আবার নীল বাড়ীর জানালার কাছে এসে দাঁড়ায়।

এই নাও। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে একটি টাকা দিতে যায়।

একটি টাকা, চক্‌চকে, রূপালী।

পিণ্টু, পিণ্টু স্তব্ধ, বিস্মিত, বিমূঢ় হয়ে যায়। এক পয়সা নয়, দু পয়সা নয়,....একটি টাকা। সে স্থির, নিশ্চল, স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

এই নাও। ফের বল্লে মেয়েটি।

পিণ্টু ওর শীর্ণ, ময়লা হাতখানি যান্ত্রিকভাবে শুধু মেলে ধর্‌লে।...

দেখ, মাঝে মাঝে এদিকে এসো। মেয়েটি এদিক ওদিক চেয়ে বল্লে।

পিণ্টু কাঁপচে। মেঘ জমেচে ওর মনে।

তোমায় ওরা খেপায়, না? ওরা ভারী দুষ্টু! আচ্ছা, আব তোমাকে কিছু বল্‌বে না, আমি বারণ করে দেব'খন।

একটি মুহূর্ত্ত। এমন একটি মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে সমাজ, সংসার মিথ্যা, মিথ্যা এই জীবনের কলরোল—এমনি একটি মুহূর্ত্ত—যখন মানুষে মানুষে থাকে না বিভেদ।

আচ্ছা, যাই—তুমি এসো, আর একদিন এসো বুঝ্‌লে?

মেয়েটি অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গীতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

একটা ধূসর পরদায় যবনিকা পড়ে।

* * * * *

অন্ধকার গাঢ়তরো হয়ে এসেচে, ঝুপ্‌সি ডালপালায় সমাচ্ছন্ন গাছতলায়; একটা গ্যাস্‌ লাইট্‌ দূরে মিট্‌মিটে জ্বল্‌চে। নিস্তব্ধ চারিদিক, নিস্তব্ধ পৃথিবী। প্রেতায়িত অন্ধকারের দীর্ঘশ্বাস বইচে রাত্রির পাঁজ্‌রা ভেদ করে। এমন সময় সহসা একটি রাত্রিচর পাখী নিশীথের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ডেকে উঠ্‌লো, শিরীষ গাছের ডালে ডেকে উঠ্‌লো একটি পেঁচা। পিণ্টু শিউরে

উঠ্‌লো সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো নিমেষের জন্যে। অবশেষে আবার সেই ভয়াবহ স্তব্ধতা, নিঝুম অন্ধকার। আর সে অন্ধকারে বসে বসে ভাব্‌চে, কি হবে, কি হবে ওর বেঁচে। কেন সে আছে এই পৃথিবীর বুকে? কেন, কিসের মোহ! সে বেঁচে আছে কেন এই জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াবার জন্যে। মানুষের কৃপার কাঙালী হয়ে কেন এই জীবনের জের টেনে যাচ্চে--নিঃসঙ্গতার দুঃসহতা ওকে ভারী আবরণের মতো রুদ্ধশ্বাসে চেপে ধরে। এই একঘেয়ে জীবনকে কেন সে ব'য়ে বেড়াচ্চে, কেন? কে আছে, কার জন্যে সে বেঁচে আছে।..... এর চেয়ে ওর জীবনের রঙ্গমঞ্চে ও যবনিকা টান্‌তে চায় এবার।... .উঃ, কি দুর্বিসহ এই জীবন!

* * * * *

অনেকদিন হয়ে গেচে। তোমরা কেউ বল্‌তে পার এখন সে কোথায়, সেই কুশ্রী, কুরূপ ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্ট জীবটী? পিন্টু, পিন্টুর খবর তোমরা কেউ রাখ না। আমি জানি, আমি জানি, কত লোক আসে যায়—কে তার খবর রাখে? আর পিন্টু? এই বেওরিশ্ বস্তুটির কেই বা খোঁজ নেয়? এখন পিন্টু হয়তো ওর পঙ্গু, পরিশ্রান্ত দেহটা কোন ছায়া সুনিবিড় গাছের তলায় এলিয়ে দিয়েচে। কিন্তু এমনি একটা গ্রীষ্মের দুপুরে একদিন সে কোন নীল বাড়ীর জানালার কিনারে দাঁড়িয়েছিলো, তা আমরা জানি। আচ্ছা, এরপর কী সে গিয়েছিলো কখনো নীলবাড়ীর জানালার কিনারে কিম্বা তার পাশ দিয়ে? হয় তো গিয়েছিলো, হয় তো সে একটি দিনের সুখস্মৃতির জের গিয়েচে আজীবন। কিন্তু তা নিয়ে আর গল্পের জের টানা যায় না। পিন্টুকে দিয়ে আমার বড় দরকার। কেউ বল্‌তে পার সে এখন কোথায়, কোথায় গিয়েচে!

কিন্তু সেই গ্রীষ্মের দুপুরের পর আর তাকে কোথাও দেখা যায়নি।



চীনা বাহিনীর জননী

অনুবাদক—নরেন্দ্রনাথ সরকার

টেং আন্-টেহ

আদর করে যাঁকে "চীনা বাহিনীর জননী" ব'লে ডাকা হয়, সেই ৫৮ বছরের বুড়ী ম্যাডাম্ চাও য়ু-টাঙ্ ফিরে এসেছেন চীনের সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত রাজধানী হ্যাংকোতে; তাঁর চাই আরও অস্ত্র, আরও গোলা-বারুদ, আরও খাবার আর পোষাক। উত্তর চীনে জাপানী আক্রমণকারীদের রোখবার জন্যে যে বড় বড় চীনা বাহিনী লড়াই করছে তাদের প্রয়োজন এই সব জিনিষের।

জরার প্রকোপ এড়িয়ে ম্যাডাম্ চাও আজও বলিষ্ঠ ও দৃঢ় রয়েছেন। তাঁর বাড়ী দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াতে। এই প্রদেশেরই সায়ুআঙ্গ্ জেলায়, আনটুঙ্গ্ থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে এঁর ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ স্বামী একদা একজন অবস্থাপন্ন কৃষিজীবী ছিলেন। ৪২টী বছরের স্বদেশ-প্রেমের ইতিহাস—জাপানীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের ইতিহাস—স্পষ্ট ক'রে লেখা রয়েছে চাও এর রৌদ্রেজলে গড়ে-উঠা গণ্ডদেশের ওপরে গভীর ক'রে আঁকা রেখাগুলির মধ্যে, আর তাঁর ঠিকরে পড়া চোখের আগুনে সুপ্রকট হচ্ছে অফুরন্ত সংগ্রাম শক্তি।

চীনের ক্ষিপ্রগতি বাহিনীকে ম্যাডাম চাও বলে থাকেন "আমার যোদ্ধৃদল।" যদিও এ বাহিনীর অধ্যক্ষ তাঁর রণনিপুণ ও সাহসী পুত্র—সেনাপতি চাং হ্সুয়েহ্-লিয়াং এর মুকডেন উত্তর-পূর্ব্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র,—চাও টুঙ্গ্, তবুও ম্যাডাম চাও এর "আমার" কথাটাকে বিশেষ অসঙ্গত বলা যায় না, কেননা ৩০,০০০ কৃষক ও গ্রামিককে সমবেত করে তাদের তেজোদৃপ্ত সৈন্যবাহিনীতে পরিণত করার মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত কৃতিত্ব কম নয়।

ইতিহাসে অতুলনীয়া এই বৃদ্ধা বীরাঙ্গনা তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে মিলতে অচিরে উত্তর প্রদেশে যাত্রা করবেন। ১৯৩২ সালে— জাপানীদের মাঞ্চুরিয়া দখলের ঠিক একটী বছর পরে—এই মহীয়সী মহিলা ব্যক্তিগতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন; যুদ্ধ এবং জয়লাভ—এই তাঁর সঙ্কল্প।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের চীন-জাপান যুদ্ধের সময়ে ম্যাডাম্ চাও প্রথম জাপানী সৈন্যদের সংস্পর্শে আসেন। সে সময় তাঁর বয়স ১৪। আক্রমণকারীরা তাঁর জন্মস্থান সিয়ুআঙ্গ্ নগর অধিকার করে। পুনরায় ১৯০৪-৫ সালের রুষ জাপান যুদ্ধের সময়ে, তাঁর বিবাহের **অনতিকাল** পরে, জাপানীদের পুনরাবির্ভাব হয়।

উভয়ক্ষেত্রেই, জাপানী সৈন্যের সংস্পর্শ তাঁকে যে অভিজ্ঞতা দেয়, তা' থেকে তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয় যে চীন সম্বন্ধে জাপানের অভিপ্রায় ভাল নয়। তিনি তাঁর প্রতিবেশীদের পুনঃ পুনঃ

অনুরোধ করেন যেন তারা তা'দের সন্তান সন্ততিকে বিদ্যালয়ে পাঠায়, যেন তারা তাদের মেয়েদের পা বেঁধে রেখে বিকলাঙ্গ না করে। এতদিন আগেও তিনি ভবিতব্যের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিলেন—জাপানীদের সঙ্গে এক ঘোর যুদ্ধ অনিবার্য্য।

১৯৩১ সাল নাগাদ ম্যাডাম্ চাও চার পুত্র আর তিন কন্যার জননী। কঠিন শ্রম আর ভাল ফসলের গুণে তাঁর স্বামীর সম্পত্তি এক শ্রীবৃদ্ধিশালী জমিদারীতে পরিণত হয়েছিল। দুর্দ্দিনের অবসানে তাঁদের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত অনায়াসেই চলেছিল। এমন সময়, অকস্মাৎ মুক্ডেনে তাণ্ডব সুরু হ'ল ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে এবং জাপানীরা রেলপথের দুধারে বড় বড় সহরগুলো অল্পকালের মধ্যেই দখল করল।

৩৫ বৎসরের মধ্যে তৃতীয় বার সিয়্আঙ্গ্ জাপানের পদানত হ'ল। প্রবঞ্চনার মারফতে চীনা মনকে জয় করবার সঙ্কল্প নিয়ে, তাদের অনুমোদন লাভ করবার উদ্দেশ্যে, জাপানীরা চীনের গ্রামে গ্রামে ঢুকে কেক, মিষ্টান্ন, এবং কখনও কখনও নগদ টাকা সভায় সমবেত লোকদের মাঝে বিতরণ করতো; এই সব সভায় জাপানী বক্তারা ওজস্বিনী ভাষায় নিজেদের সহৃদয়তা আর মহৎ উদ্দেশ্যের বাণী চীনা চাষীদের মাঝে বিতরণ করতে থাকলো। কতক লোক যে এই প্রবঞ্চনার ফাঁদে ধরা পড়েনি তা' নয়।

১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারীতে ম্যাডাম্ চাও এর পুত্র চাও টুঙ্গ্ ছ'জন স্কুলের সহপাঠী নিয়ে পাইপিঙ্গ্ থেকে ফিরে এল। জাপানী সৈন্যেরা মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে যাবেনা এ কথা ভাল করে বুঝে তারা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে এমন একদল সেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করল।

ম্যাডাম্ বল্লেন, "আমার সব সম্বল আমি তোমার হেপাজতে দিলুম। শুধু এই সর্ত্ত রইলো, যে জাপানীরা চীনের মাটি পরিত্যাগ করে যাওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার সংগ্রামের বিরতি হবে না।"

অতএব কিছুই অমীমাংসিত রইল না। পাশের এক সহরে তখনও একদল চীনা সৈন্য বসান ছিল। এ-সহর রেল লাইনগুলো থেকে বেশ কিছু দূরে। এই সৈন্যদলের কাছ থেকে দশটি বন্দুক চেয়ে নেওয়া হল। অস্ত্রগুলি হাতে নিয়ে সাতটি যুবক শত্রুর বিরুদ্ধে আকস্মিক এবং অতর্কিত আক্রমণের অভিযান সুরু করল। পাহাড়ের ওপরে তাদের আস্তীন, বিদ্যুৎবেগে তারা নেমে আসে এবং আক্রমণ চালায় ছোট ছোট জাপানী সেনাদলের ওপরে—যখন তারা ঐ পথ দিয়ে চলে যুদ্ধের রসদ নিয়ে।

অচিরেই এরা চতুষ্পার্শের চীনা চাষীদের চোখে বীর বলে গণ্য হ'ল। মাস অতিক্রান্ত না হতেই এদের দলে হাজারেরও বেশী লোক এসে ভিড়্লো। ম্যাডাম্ চাওয়ের বাড়ী হল এদের প্রধান আড্ডা এবং রসদের সব চেয়ে প্রধান কেন্দ্র। যুদ্ধে আহত স্বেচ্ছাসৈনিককে শুশ্রূষা করবার জন্যে এখানেই আনা হত

বহুদিন পর্য্যন্ত জাপানীদের টনক নড়েনি। অবশেষে ১৯৩৪ এ তারা পুনরায় ম্যাডাম্ চাও এর গ্রামে এসে হাজির হল এবং কৃষকদের এক জনসভায় আহ্বান করল। শত শত লোক ছুটে গেল, কিন্তু নতুন কিছু ঘট্‌ল। এবার আর কেক নেই, মিষ্টি নেই, নগদ টাকাও নয়। পরিবর্ত্তে, পাঁচজন বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন লোককে গ্রেপ্তার করে অশেষ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হল।

দেশময় হুলুস্থুল পড়ে গেল, দলে দলে চাষীরা এসে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে পুষ্ট করতে লাগ্‌ল। ম্যাডাম চাও এর বাড়ী যে তাদের সংগঠন ও সংরক্ষণে কতটুকু সাহায্য করেছে তা আর জাপানীদের কাছে গোপন রইল না।

১৯৩৪ এর ৫ই ফেব্রুয়ারী দিনটি চাও পরিবারের মন থেকে মোছবার নয়। এই দিনেই এঁদের বাড়ী খানাতাল্লাসী হ'ল, অবশেষে দেওয়া হ'ল আগুনের মুখে। ম্যাডাম্ চাও এবং তাঁর বৃহৎ পরিবারের প্রায় ৩০ জন লোককে এক সারিতে দাঁড় করান হ'ল গুলির আঘাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ, চাওদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। গৃহ ভস্মীভূত হওয়ায় তারা সিয়ুআঙ্গ সহরে এলো। সেখানে তারা চীনা ছেলেমেয়েদের জন্য হু'টো স্কুল খুললে। আর তাদের বাড়ীতে গোপনে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে প্রচার কার্য্যের উপকরণ তৈরী চল্‌তে লাগ্‌ল।

এই বছরেরই ২৫শে জুলাই নাগাদ এই গুপ্ত চক্রান্তের খবর চীনা বিশ্বাসঘাতকেরা জাপানীদের কাণে পৌঁছে দেয়। পাঁচশো জাপানী সৈন্য স্কুল দু'টোকে ঘেরাও করে এবং ম্যাডাম্ চাও, তাঁর স্বামী, তাঁদের তিন মেয়ে আর ছোট ছেলেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সমগ্র পরিবারটিকে গাড়ীতে বন্ধ করে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তিন দিন ধরে নানান ভাবে বিচার চল্‌তে লাগ্‌ল।

"আপনারাই বলুন, আমার দ্বারা কি আপনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার জন্যে স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব? চেয়ে দেখুন আমার শরীরের দিকে, বিবেচনা করুন আমার বয়স।" ম্যাডাম্ চাওয়ের মুখ থেকে সহসা এ প্রশ্নের দাপটে জাপানী জজেরা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। এর সুযোগ নিয়ে তিনি কৌশল করে এক চাল চাললেন।

তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে যারা শত্রুর কবলে ফেলে দিয়েছিল সেই বিশ্বাসঘাতক চীনাদের নির্দ্দেশ করে তিনি বললেন, "জেনে রাখুন, এরা গুপ্তচর। জাপানী সৈন্যের প্রতিটি চলা-ফেরার খবর এরা পৌঁছে দিয়েছে। এদেরই দৌলতে চীনা স্বেচ্ছাসেবকেরা বারে বারে জাপানী সৈন্যদের ওপরে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার সুবিধা পেয়েছে। এদের প্রাণদণ্ড হলেই গ্রামে গ্রামে শান্তি ফিরে আসবে।"

কৌশল কাজে লাগল। চীনা বিশ্বাসঘাতকেরা কেউই তরবারির মুখ থেকে রেহাই পেল না। ম্যাডাম্ চাও সপরিবার মুক্তি পেলেন। জাপানীদের উদ্দেশ্য, তাঁকে নিজেদের কাজ করিয়ে নেওয়া। তাঁর ওপর ভার দেওয়া হ'ল, গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষীদের কাছে জাপানী সেনা-দলের দয়া দাক্ষিণ্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা।

মাঞ্চুরিয়া থেকে জাপানের এই সুযোগ পেয়ে ম্যাডাম্ চাও, তাঁর স্বামী, তিন কন্যা এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে গোপনে ডাইরেনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে টিয়েনাসিন্‌গামী এক জাহাজে উঠলেন। তাঁরা পাইপিঙ্ এ থাকা স্থির করলেন, চাও টুঙ্গ্ ও তাঁদের আর দুই ছেলে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে মাঞ্চুরিয়াতেই রইল।

পাইপিঙ্ এ দিন কাটানো ক্রমেই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠতে লাগল। বন্ধুবান্ধব এবং দেশ-প্রেমিক সঙ্ঘগুলির আর্থিক সাহায্যই তাঁর পরিবারের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়াল। এরই মাঝে তিনি লিয়াওনিঙ্গ্-কিরিন প্রান্তে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কাজকর্ম্মের সঙ্গে সংযোগ রাখতে লাগলেন। তাঁর পুত্র চাও টুঙ্গ্ এই প্রান্তেই এক বিরাট সৈন্যদলের দ্বিতীয় অধিনায়ক হিসেবে কাজ করছিলেন।

১৯৩৭ এর মে মাসে চাও টুঙ্গ্ চিকিৎসার জন্যে পাইপিঙ্ এ আসেন। আসার অনতিবিলম্বেই, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে খবর পান যে জাপানীরা পাইপিঙ্ অধিকার করার পরিকল্পনা করছে। তৎক্ষণাৎ চাও টুঙ্গ্ চীনা সৈন্যের মহানায়ক চিয়াঙ্গ্ কাইশেকের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নানকিঙ্গ রওনা হলেন।

১৯৩৭ এর ৬ই জুলাই চাও টুঙ্গ্ পাইপিঙ্ এ ফিরলেন। পরের দিনই লুকৌচিয়াও এর ব্যাপারটা ঘটে গেল; চীন জাপানের রেষারেষিটা ধোঁয়ার আকার ছেড়ে একেবারে শিখার আকারে জ্বলে উঠ্‌ল। যে কোন সময় গুরুতর প্রয়োজন আস্‌তে পারে, এই ভেবে তিনি বিলম্ব না করে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে লাগলেন। ২৯শে জুলাই পাইপিঙ্ এর পতন হল। দু' সপ্তাহ পরে, চীনা সৈন্যদের পরিত্যক্ত অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তিনি তাঁর লোকজন সঙ্গে করে পশ্চিমের পাহাড় আর পাইপিঙ্-হ্যাঙ্কো রেলপথের পশ্চিম অঞ্চলে চলে গেলেন।

এই মুষ্টিমেয় চীনা গরিলা (অতর্কিত আক্রমণকারী)র দল ইতিমধ্যে ৩০,০০০ হাজারের বাহিনীতে পরিণত হয়েছে; জাপানীদের সুসজ্জিত রক্ষী-সেনাদলের ওপরে এসে এরা বারে বারে আপতিত হয়েছে। এদের প্রথম উল্লেখযোগ্য অস্ত্র সংগ্রহ হলো পাইপিঙ্ এর দক্ষিণ-পশ্চিম সহরতলীর "ফার্ষ্ট হোপাই মডেল্ প্রিজন" থেকে।

এই জেলখানার ৭০০ কয়েদীকে নৃশংসভাবে হত্যা করবার দুরভিসন্ধি জাপানীরা পোষণ করে—এ খবর চাও টুঙ্গ্ এর কাণে পৌছল। তাই এক অন্ধকার রাত্রে তিনি তাঁর অনুচরদের এই জেলখানা আক্রমণ করবার আদেশ দিলেন। ফলে, দুটি ভারী মেসিন্-গান্, ছটি হাল্‌কা,

মেসিন্-গান্ এবং গোটা কতক বন্দুক আর পিস্তল তাঁদের হাতে এসে পড়্ল। ৭০০ কয়েদিদের মধ্যে বেশীর ভাগই জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য তাঁর দলে যোগ দিল।

এই সময়টাতে যে ম্যডাম্ চাও চুপ করে বসে ছিলেন তা নয়। চার সপ্তাহের মধ্যে তিনি অন্ততঃ ৩০ বার পশ্চিম পর্ব্বত অঞ্চলে যাতায়াত করেছেন, এবং প্রতিবারেই তাঁর পুত্রের বাহিনী পুষ্ট করবার জন্যে নতুন স্বেচ্ছাসেবক সঙ্গে নিয়ে গেছেন অথবা রসদের অভাব লক্ষ্য করে রসদ পাঠিয়েছেন।

জাপানীদের বুঝতে বিলম্ব হল না যে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক, গোরিলা-বাহিনীর নেতা চাও টুঙ্গ্ এর মা, পাইপিঙ্গ্ সহর আর পশ্চিম পর্ব্বতের মধ্যে যাতায়াত করছে। অতএব তারা প্রত্যেক নগর তোরণে স্ত্রী সিপাই মোতায়েন করলে এবং মাঞ্চুরিয়া থেকে আসছে এমন চীনাদের ওপরে বিশেষ নজর রেখে এক আদম শুমারি সুরু করে দিল।

ম্যাডাম্ চাও বুঝলেন টানা-জল ক্রমেই গুটিয়ে আসছে, স্থির করলেন—পলায়নটা অনায়াসসাধ্য থাক্তে থাক্তেই পালাতে হবে। সেপ্টেম্বর মাসে একদিন তিনি স্বামী আর এগারো বছরের এক ছেলেকে নিয়ে পাইপিঙ্গ্ ত্যাগ করলেন। উত্তর হোনানের চিকুঙ্গ্শান্ পাহাড় পর্য্যন্ত তিনি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর বড় মেয়ে লি-জেস্ তখন ঐখানেই স্কুলে পড়্ত।

অল্প কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পরই তিনি পশ্চিম পাহাড়ে ফিরলেন। যেখানেই তিনি যান, সেখানেই জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের বাণী ছড়ান। তাঁর উদ্দীপনায় চঞ্চল হয়ে চাষীরা তাঁর অধীনে জড়ো হতে লাগল। তিনি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করেই পুত্র চাও টুঙ্গ্ এর হাতে সঁপে দিতেন।

বয়স ষাটের কাছাকাছি হলেও, জাপানের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালাবার অটল সঙ্কল্পে ম্যাডাম্ চাও ইস্পাতের মত কঠিন। তিনি আশাবাদী এবং নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেন যে পরিশেষে চীনের জয় অবশ্যম্ভাবী, মহাচীনের সন্তান-সন্ততি আবার তাদের অপহৃত শান্তি ও সমৃদ্ধিকে পুনঃরুদ্ধার করবেই।

"চীনা গরিলা-বাহিনীর জননী" এ উপাধি ম্যাডাম্ চাও সম্বন্ধে আশ্চর্য্যভাবে খাটে। তাঁর প্রথম এবং তৃতীয় পুত্র ১৯৩২ থেকেই দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর দলে রয়েছেন। দ্বিতীয় চাও টুঙ্গ্ আজ ৩০,০০০ হাজার যোদ্ধার অধিনায়ক। পুত্রবধূ, অর্থাৎ চাও টুঙ্গ্ এর স্ত্রী স্থির মস্তিষ্ক অস্ত্রধারিনী হিসেবে নাম করেছেন।

জাপানীদের কবল থেকে একবার শ্রীমতী চাও অদ্ভুতভাবে রক্ষা পান। ২০০ গোরিলায় গঠিত এক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তিনি উত্তর হোনান এর ওয়াইসিয়েন এ ছিলেন, এমন সময়ে ১,০০০ সৈন্য দিয়ে গড়া এক জাপানী বাহিনী ওয়াইহুয়েই অধিকার করে চতুর্দ্দিক থেকে ওয়াই-সিয়েন এর দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

যুদ্ধ এবং রক্তপাত ঘটল। চীনা দলের ৫৩ জন মারা গেল, ১২ জন ধরা পড়ল, ১৫ জন সামান্য আঘাত পেল। অবরুদ্ধ ও অন্যান্য চীনা বাহিনীর সংযোগ বিচ্যুত হয়ে পড়ায় এই দলের বিধ্বস্ত হবার আশঙ্কা রইল। অবস্থা এমন সঙ্গীন দাঁড়াল যে "চাচা আপন বাঁচা" ছাড়া আর কোন নীতিই সেখানে প্রযোয্য রইল না।

ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে তিনি হঠাৎ বুঝলেন যে তিনি নিঃসঙ্গ। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন যে দশ পনের পা তফাতেই ছ' জন জাপানী সৈন্য তাঁর নাগাল পাবার জন্যে ছুটছে। তিনি পিস্তল বার করলেন। একমাত্র পিস্তলের গুলিই অনুসরণকারীদের হঠিয়ে রাখল। তাঁকে জীবন্ত ধরার জন্য জাপানীরা উঠে পড়ে লেগেছিল।

যতদূর তাঁর মনে আছে, তাঁর এক গুলিতে একটি জাপানী সৈনিকের জীবনান্ত হয়। আঁধার ঘনিয়ে আসছিল, পোড়া বারুদের ধোঁয়ার ঘন আস্তরণ যুদ্ধক্ষেত্রের ওপরে ঝুলছিল। এক ঘাটের নিকটে এসে তিনি তাতে ঝাঁপ দিলেন। জাপানী সৈন্যরা চলে যাবার আগে পর্য্যন্ত তিনি ঘাটের মধ্যে নীচু হয়ে রইলেন।



বিরোধের মূল

প্রভাসচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, পি, আর, এস্,

আজকাল সকলেরই মুখে যুদ্ধের কথা। যুদ্ধ কবে এবং কার কার মধ্যে বাধবে, কতদিন ধরে চলবে, কি ভাবে, কতদিনে শেষ হবে এ প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করবেন। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় জগতের আরামপ্রিয় স্বপ্নবিলাসী নরনারীর কাছে এসব কথা তেমন গুরুতর হয়ে ওঠেনি, বিশ্বব্যাপী সমর ও শক্তির ওপর যে প্রত্যেকেরই যথাসর্ব্বস্ব নির্ভর করবে অনেকে বুঝেও বোঝেন নি, দেখেও দেখেন নি; "আর সকলে লড়াই করে মরুক, তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না, আমরা যেমন আছি তেমনই থাকব," এই ভাবের কথা অনেকেই বলতেন! আজও সে রকম কথা অনেকেই বলবেন, অনেকেরই এই রকম মনোবৃত্তি আছে। তবু আগামী এবং উপস্থিত যুদ্ধ সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে; অনেকেই এবিষয়ে অনেক জল্পনাকল্পনা করবেন, অনেক কথাই বলবেন! সব জিনিষটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

আগে দেখা যাক যুদ্ধ কার কার সঙ্গে হচ্ছে বা হবে। আগে ছিল রাজায় রাজায় যুদ্ধ, এখন দেশে দেশে যুদ্ধ হয়ত বা "জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ;" এখনো আমরা অনেকেই কথায় কথায় বলে থাকি ফরাসী জার্ম্মাণী যুদ্ধ, অথবা জার্ম্মাণে রুশে যুদ্ধ; যেন প্রত্যেক জার্ম্মাণ প্রত্যেক ফরাসীর শত্রু, প্রত্যেক জার্ম্মাণের সর্ব্বনাশেই প্রত্যেক ফরাসীর স্বার্থ; প্রত্যেক নরনারীর অন্তরের মধ্যে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বিষ চিরকাল রয়েছে, চিরকাল থাকবে, সুতরাং পাশাপাশি দুই দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই শত্রুতার ভাব থেকেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে এবং চিরকাল চলতে থাকবে, যেন যুদ্ধেই দেশের পরম কল্যাণ—এই ভাবের কথাও শোনা যায়। এখন আসল জিনিষটা বোঝবার একটু চেষ্টা করা যাক।

বারবার দেখা গেছে যে যুদ্ধে হারই হোক বা জিতই হোক, জনসাধারণের কখনো কোনো উপকার হয় না; অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার যে অবস্থা তাতে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলা খুবই সহজ, দেশের বিরুদ্ধে দেশকে, ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ধর্ম্মকে, জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে; কয়েক শতাব্দী ধরে এই রকমই হয়ে আসচে; জনসাধারণের যে রকম স্বভাব, এতদিন পর্য্যন্ত তারা ক্ষেপেছে, মেরেছে, মরেছে, অবশেষে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে; এতদিনের এত যুদ্ধের পরেও তাদের কোন স্থায়ী উপকার দেখা যাচ্ছে না। প্রত্যেকবারই যুদ্ধাবসানে রণক্লান্ত বিধ্বস্ত সর্ব্বহারারা সমস্ত বিদ্বেষ হিংসা ভুলে আবার অকপটভাবে প্রকৃত শান্তির জন্যেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, শান্তিতেই তাদের স্বার্থ, যুদ্ধেই তাদের সবচেয়ে বেশী লোকসান. শিক্ষাস্বাস্থ্য, কৃষিবাণিজ্যশিল্প, সভ্যতা ও সমৃদ্ধির সমস্ত উপাদানই নষ্ট হয়ে যায়, তাদের বহুদিনের সঞ্চিত সমস্ত ঐশ্বর্য্যই মাত্র কয়েকজনের হাতে গিয়ে জমা

হয়, বেকারদের সংখ্যা বেড়ে যায়, সবদিক থেকেই দেশ বলতে আসলে যাদের বোঝায় সেই সাধারণ নরনারীর জীবন যাত্রার ধারা আরো নীচে নেমে যায়।

বিভিন্ন দেশের এই সাধারণ নরনারীর মধ্যে বাস্তবিক কোনো স্বার্থের বিরোধ নেই, থাকতে পারে না, প্রত্যেক দেশেরই ধনিকেরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই এই মস্ত বড় বিরোধটা বাধিয়ে তুলেচে। আমাদের উপকারের জন্যে ত তাদের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা, তাদের কৃষিশিল্পবাণিজ্য নয়। কিসে সবচেয়ে মুনফা হয়, কিসে আর সকলকে হটিয়ে দিয়ে, দাবিয়ে রেখে নিজেরা সব কিছু একচেটে করে নিতে পারে এইই তাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাই প্রত্যেক দেশের ধনিকেরা অন্যান্য সমস্ত দেশের সমৃদ্ধির কেন্দ্রগুলি কেড়ে নেবার জন্যেই এইসব দেশের বিরুদ্ধে নিজেদের দেশের সর্ব্বহারাদের ক্ষেপিয়ে তুলেচে, অথচ যুদ্ধে জিতলেও তারা নিজেদের দেশের জনসাধারণের জন্যে কিছুই করবে না; এদেরও পুরোপুরি ভুলিয়ে রেখে সমস্ত সম্পদ থেকে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত করাতেই যে তাদের স্বার্থ। শান্তির সময়ে এদের হাতে সর্ব্বহারাদের যে দুর্গতি হয় যুদ্ধের সময়ে বিদেশীদের হাতে তার চেয়ে খুব বেশী হতে পারে না। অথচ বর্ত্তমান সভ্যতার এমনই অবস্থা যে যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপটা বারবার প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েও তার সম্বন্ধে একটা মোহ মনে থেকেই যাচ্চে; দেশের নামে বিদেশীদের বিরুদ্ধে সাধারণকে ক্ষেপাতে ধনিকেরা যেমন চেষ্টা করতে থাকবে জনসাধারণও তেমনই সহজে ক্ষেপতে রাজী। ঈর্ষা ও প্রতিহিংসার বিষ তাদের মধ্যে একবার ঢুকিয়ে দিলে তারা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে ওঠে। তাদের সমস্ত শক্তিকে একত্র করে তারা সহজেই আত্মহত্যায় মেতে ওঠে।

এই ভাবেই কোনো একটা দেশের সমগ্র নরনারীর সঙ্গে আর একটা দেশের সমগ্র নরনারীর মধ্যে বিরোধ এই উভয় দেশের ধনিকেরাই বাধিয়ে দেয়; অথচ এই দুই দেশের ধনিকদের নিজেদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে খুব বেশী সহযোগীতা দেখা যায়; প্রত্যেক দেশের ধনিকদের প্রথম চেষ্টাই হচ্চে স্বদেশের সর্ব্বহারাদের নানারকম মিথ্যে ধাপ্পা দিয়ে, নানারকম ওজর দেখিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার জন্যেই যে তাদের এই অসীম দুর্দ্দশা সে কথা বুঝতে না দেওয়া; তাদের শত্রু যে কেবল বিদেশে নয় দেশেও, তাদের তথাকথিত দেশনেতারাই যে তাদের সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্চেন, তাদের চিরকালের জন্যে আরো তীব্রতর দাসত্বে বেঁধে রাখবার জন্যেই ব্যবস্থা করছেন এই কথা জানতে না দেওয়া। সর্ব্বহারাদের যেমন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হচ্চে, তেমনই তাদের নিজেদের মধ্যে যতরকমে পারা যায় তীব্র শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়ে রেখে তাদের সর্ব্বতোভাবে দুর্ব্বল করে ফেলবারও ব্যবস্থা হয়েছে।

যুদ্ধ বাধলেই ধনিকদের লাভ; যুদ্ধোপকরণ বিক্রী করেই সবচেয়ে বেশী মুনফা; শ্রমিকদের সর্ব্বপ্রকার আন্দোলন, সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিস্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখবার সম্পূর্ণ সুযোগ; দেশের নাম করে সবচেয়ে বেশী সুদে অপরিমিত টাকা ধার দেবার শুভলগ্ন; নিজেদের সর্ব্বধ্বংসী ক্ষমতাকে আরো বেশী ভীষণ তীব্র করে তোলবার সবচেয়ে ভাল উপায়।

মুনফার জন্যে ব্যবসায়ীরা যেমন স্বদেশীদের বিদেশীর বিরুদ্ধে ঠেলে দিচ্চে, তেমন স্বদেশীয়-সৈন্যদের সমূলে নষ্ট করবার জন্যে বিদেশীদের কাছে চড়া দামে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী করেছে ও করচে; দেশের নামে শত্রুদের অনেকগুলি প্রদেশ আর উপনিবেশ কেড়ে নিচ্চে, সেখানে নিজেদের দেশের শ্রমিকদের ক্রীতদাসের মতই খাটিয়ে নিচ্চে, আর সমস্ত লাভ নিজেদের হাতে রাখচে; যুদ্ধের পর প্রত্যেক দেশেই শ্রমিকদের বেতন কমাবার অথচ তাদের খাদ্যের মূল্য খুব বেশী বাড়াবারই ব্যবস্থা করচে; সংবাদপত্রে, বেতারে, বক্তৃতায় সমস্ত উপায়েই হিংসার বিষ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্চে। লোকের ধারণা যে এইসব কারবারীরা দেশেরই উপকার করচে, তাদের ঐশ্বর্য্য দেশেরই ঐশ্বর্য্য। এরচেয়ে ভ্রান্ত ধারণা খুব কমই আছে। তাদের ঐশ্বর্য্য কখনো দেশের প্রকৃত উপকারে লাগে না; যখনই দেশের খুব বেশী সঙ্কটের সময় আসে তখন তাদের সমস্ত সোনা বিদেশে পাঠিয়ে দেয়; দেশের দারুণ দুর্দ্দশার সময়েই ট্যাক্স্ দিতে আপত্তি করে। অনেক সময় বিবিধ উপায়ে ফাঁকি দেয়; বেশী মুনফার জন্যে বিদেশেই টাকা খাটায়, তার কোনো অংশ দেশে ফিরে আসে না।

ধনিকেরা এই কথাই প্রচার করবার চেষ্টা করচে যে অতিরিক্ত লোক বৃদ্ধির জন্যেই দেশের এই বর্ত্তমান অর্থ কষ্ট, এই ভীষণ বেকার সমস্যা; ব্যবসায়ে এই চিরস্থায়ী মন্দা; সেই জন্যেই তারা মজুরদের বেতন কমাচ্চে, চাকরী থেকে ছাড়িয়ে দিচ্চে, জনহিতকর সর্ব্ববিধ ব্যবস্থার ক্রমোচ্ছেদের চেষ্টা করচে; শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতিতে ব্যয় কমাচ্চে; আসলে কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষের উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশঃই খুব বেশী বেড়ে চলেচে, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাইতে অনেক বেশী পরিমাণেই বাড়তে থাকবে; বিজ্ঞানের সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের সাহায্য নিতে পারলে, নতুন যন্ত্রপাতিগুলির উপযুক্ত ব্যবহার হলে অতি সহজেই বিশ্বমানবের সমস্ত চাহিদা মেটাতে পারা যাবে, সমাজের পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা এত বেশী বেড়ে গেছে যে সকলের মধ্যে তার কিছু অংশ বণ্টন করে দিলে প্রত্যেকেরই ভাগে প্রচুর পড়বে, কারো কোনো অভাব থাকবে না। সকলেই পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর জীবন ভোগ করতে পারবে।

কিন্তু সকলের মধ্যে বণ্টন করে দেবার জন্যে ত ধনিকেরা উৎপাদন করচে না। তারা চাইছে মুনফা। বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হবে, উৎপাদন যতই বাড়তে থাকবে, তাদের লোভও ততই অসীম হয়ে উঠবে; উৎপাদন বেশী হলে জিনিষ পত্রের দাম কমে যাবে (তাতে জনসাধারণের সুবিধা হবে) ধনিকের মুনফা কম হবে; সেইজন্য প্রথম চেষ্টা হবে উৎপাদন কমাবার; এবং উৎপন্ন পণ্য ধ্বংস করবার। বরং বিদেশে জলের দরে বিক্রী করবে; কিন্তু দেশের লোককে দেবে না।

মুনফা নিয়ে প্রথম বিরোধ বাধচে একই দেশের মধ্যে ধনিক ধনিকে; প্রত্যেকেই চাইবে উৎপাদনের খরচ কমিয়ে অপরের খরিদ্দারকে নিজে কেড়ে নিতে. সমস্ত ব্যবসা একচেটে করে নিতে। খরচ কমাবার সবচেয়ে সহজ উপায় মজুরদের কাজ থেকে জবাব দেওয়া এবং খাটুনী বাড়িয়ে দেওয়া তারপর বড় বড় কারবারীরা নিজেদের মধ্যে একজোট হয়ে আরো বড় বড় একচেটে কারবার

ফাঁদচেন, উদ্দেশ্য সমস্ত ছোটখাট কারবারগুলির বিচ্ছেদ। এইভাবে আরো অসংখ্য লোকের অন্ন যাচ্চে। তারপর এই রকম বড় বড় একচেটে কারবারীদের দল পরস্পরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছেন, প্রত্যেকটি দলই চাইচেন অপর সকলকে বঞ্চিত করে নিজেই সমস্ত বাজারটি দখল করে বসবেন। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কথাই এই যে এখন ধনিকেরা প্রত্যেকেই সর্ব্বদা অপর সকলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত ; এইভাবে যে কতবেশী সামাজিক বিরোধ ও শত্রুতা কতবেশী অপচয় ও সব রকমের বিপুল ক্ষতি বেড়ে চলেচে তার কোনও ইয়ত্তা নেই ; বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্র হতে ক্রমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়চে, আরো বেশী প্রবল হয়ে উঠচে ; বিরোধেই যে ব্যবস্থার উদ্ভব, বিরোধেই যার পরিপুষ্টি, বিরোধেই তার পরিণতি। সুতরাং বর্ত্তমান ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিন কোনো প্রকারের শান্তির আশা সুদূর পরাহত।

যেমন একই দেশের মধ্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, প্রত্যেক কারবারী ও ব্যবসায়ী সঙ্ঘের সঙ্গে অন্য সঙ্ঘের বিরোধ অনিবার্য্য, তেমনই একই নিয়মে দেশের সঙ্গে দেশেরও আর্থিক এবং অন্যদিকে বিরোধ অপরিহার্য্য, সেই বিরোধ কেবলই বাড়তে থাকবে। এবং অবশেষে তাতে সমস্ত বিশ্বেরই কল্যাণ ও শান্তি নষ্ট হতে থাকবে, সমস্ত পৃথিবীর পণ্য ক্রমে ক্রমে অল্প কয়েকজন ধনিকের হাতেই পুঞ্জীভূত হতে থাকবে, তারাই সমস্ত বিশ্ব মানবের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে, তাদেরই হাতে এদের সমস্ত ভাগ্য ; অথচ মুনফাই এদের একমাত্র কাম্য, মুনফার জন্যেই এরা সমস্ত রকমের চেষ্টা ও সকল ব্যবস্থা করতে থাকবে, আর মুনফা পাওয়া যেতে পারে মাত্র একটী উপায়ে অর্থাৎ বিশ্বমানবকে আরো বেশী করে বঞ্চিত করে। টাকার রাজত্ব যেমন বেড়ে চলেচে, জনসাধারণের সম্পূর্ণ দাসত্ব ও তেমনই তীব্র হতে থাকবে। বিরোধ যতই বাড়তে থাকবে মুনফাও ততই বেশী পাওয়া যাবে, তাই বিরোধকে চিরস্থায়ী করে রাখাতেই ধনিকদের স্বার্থ ; ধনিকেরা যেমন সর্ব্বদাই শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করচে, সর্ব্বদাই তাদের আরো বেশী দরিদ্র, আরো বেশী অসহায় করে ফেলতে চেষ্টা করচে, তেমনই শ্রমিকদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে এবং এই বিরোধকে আরো বেশী ভীষণ করে তুলে তাদের সর্ব্বাঙ্গীন শক্তি ক্ষয়ের উদ্যোগ করচে।

(ক্রমশঃ)

পলাতক

বিজয় সেন গুপ্ত

সকলে সহিছে ঘরে বেদনার বহ্নি হুতাশন ঃ
আমাদের ঘরে উঠে সুরের তুফান !
উচ্ছ্বসিত, উল্লাসিত মোরা গাই গান।
প্রদীপ পুলকে দোলে—
ঘুম-ভাঙা স্বপ্ন-রাঙা নয়নের কোলে।

বাতায়নে চেয়ে দেখো বেদনায় বিবশা ধরণী ;
ব্যথা, নহে বিলাসের আনন্দ বিপুল,
যেথা বন্ধ্যা প্রাণ বন্যা বন্ধনে আকুল।
নাহি নাহি আর আশা ঃ
দিগন্ত দোলায়ে জাগে মৃত্যু সর্ব্বনাশা !

প্রাণ হেথা প্রাচুর্য্যের উত্তরিয়া চলে যায় সীমা ;
হেথায় উচ্ছ্বাস আনে সঙ্গীত-কল্লোল,
পরিহাসে প্রাণে দেয় মরণের দোল।
নৃত্য জাগে দিবানিশি
পূর্ণিমার প্রাণ হেথা প্রেমে গেছে মিশি।

কে দেখিবে সীমান্তের পরপারে নূতন পৃথিবী !
কে সহিবে সংগ্রামেতে পাবকের জ্বালা ?
তার চেয়ে সুরে ভরো জীবনের ডালা।
ভোলো, আপনারে ভোলো
স্বপ্ন ভরা তন্দ্রালসে মৃত্যুদ্বার খোলো।

ফাঁকি

সুধাংশু চৌধুরী

নরেন টিঁকিয়া গেল। টিঁকিবার আশা সে করে নাই, ইচ্ছাও ছিল না। বাহিরে থাকিয়া করিবে কি? যাহারা অর্ডিনান্সে গেল, নরেন তাহাদের মনে মনে হিংসা করিল। জীবনটা তখন বাহিরে কঠিন বেশী, জেলের ভিতরে সোজা। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সহজ কঠিনের হিসাব অন্য প্রকার। অতএব নরেনের ব্যক্তিগত অসুবিধার দিকে গভর্ণমেণ্ট ফিরিয়াও দেখিল না, তাহাকে বাদ দিয়া একে একে তার বন্ধু বান্ধবদিগকে অর্ডিনান্সে ধরিয়া নিল।

নরেন চা খাইল, আর খবর শোনে আজ সুবোধকে ধরে, কাল অজিতকে, পরশু হেমেন্দ্রকে। নরেন ভাবে, একে একে আমার শাখা প্রশাখাগুলি কাটিয়া নিল।

কিন্তু চায়ের দোকানী ইহা সত্ত্বেও নরেনকে সহানুভূতি করিল না। তাগাদা দিল, মুখ বাঁকা করিল। নরেনের ইচ্ছা হইল, গণকঠাকুরের কাছে সে হাত দেখায়। জানিয়া লয়, তার জীবনে ব্যাপারখানা ঘটিবে কি? কিন্তু ওটা কুসংস্কার। সুতরাং সে হাত দেখাইল না, ওদিকে কোথাও হাত ও পাতিল না। সহরটা রোজ ভোর বেলা বুড়ী ঠাকুরমার মত নরেনকে কঙ্কাল মুখের স্নেহ হাসি দেখাইতে লাগিল। নরেনের কলিকাতা যাওয়ার পয়সা নাই—কেবল নদীর পারে সে রোজ দেখিয়া আসে এক্‌স্‌প্রেস্‌ ষ্টীমারটা নদীতে দক্ষিণমুখী চলিয়াছে।

ষ্টীমার দেখিয়া নরেনের কেবলই মনে পড়ে, তিন বছরের আগের কথা। তিন বছর আগে একদিন এই ষ্টীমার ঘাট ছাড়িয়া চলিয়া গেলে, নরেনের চোখ ফাটিয়া কান্না আসিয়াছিল। অবশ্য সেটা ছেলেমানষী!

তিনবছর সে ছেলেমানষী করে নাই। কিন্তু যাহারা ছেলেমানষী করিতে দেয় নাই, তারা আজ আশে পাশে নাই। তারপর সমস্ত জিনিষটা তাহার নিকট ধরা পড়িল সেইদিন, যেদিন নরেন তাকে-তোলা তিন বছর আগেকার হিসাবের খাতাটা নামাইয়া দেখিতে সুরু করিল।

সে খাতাটায় কেবলই প্রতিমার নাম। অর্ডিনান্সে যে বন্ধু বান্ধব দল চলিয়া গেল, তাদের একজনের নামও সে খাতায় ঠাঁই পায় নাই। তাহারা পরে আসিয়াছে, লোকসানের দিনের বন্ধু বান্ধব সব। প্রতিমা ছিল নরেনের জীবনের লাভের দিনের ছাত্রী। তারপর জীবনে লোকসানের ভাঁটা লাগিলে, বন্ধুবান্ধবরা জুটিল, ছাত্রী চলিয়া গেল, ..একদিন খুলনা এক্‌স্‌প্রেসে উঠিয়া।

কলিকাতায় কি ঘটনা হইয়াছিল কে জানে, দেশব্যাপী তখন চারিদিকে যে প্রকার গণ্ডগোল, তাহাতে না ঘটিতে পারে এমন কিছুই নাই। আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপে ঘসা লাগে, আর দৈত্য "কি হুকুম" বলিয়া আসিয়া দাঁড়ায়—অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্স তৈরী হয়, প্রয়োগ হয়—দেশের যৌবন উজাড় হইয়া যায়।

এহেন দিনকালে নরেনের মত মানুষ যদি নদীর পাড়ে গিয়া বসিয়া থাকে, কিংবা যদি খুল্‌না-গামী এক্‌স্‌প্রেস্‌ ষ্টীমারটাকে ডাকিয়া বলে, তিন বছর আগে যাকে এখান থেকে নিয়া গিয়াছ ওাকে আমি ফেরৎ চাই, তাহাতে দোষ নাই। সময়ের মাহাত্ম্যে সব চলতি আইনকানুন রদ হইয়া গিয়াছে যে।

তারপর একদিন লঘুনীলরঙা একখানা খামের চিঠি পিয়ন নরেনের হাতে দিয়া গেল। নরেন তাহা পাইয়া চা খাইতে ভুলিয়া গেল, নিবিয়া গেল তার হাতের সিগারেট্‌। খুলিতে গিয়া হাত কাঁপিল, ভাবিল অঘটন বুঝি ঘটিয়াছে।

বাস্তবিকই তাই। চিঠি, আর কারোর নয়, প্রতিমা'র। উপরে ছাপানো, প্রতিমা রায় বি, এ, হেড্‌মিষ্ট্রেস্‌। কিন্তু লেখা আরও সাংঘাতিক। লিখিয়াছে, সে খুল্‌না হইতে পরের দিন সহরে পৌঁছিতেছে, অতএব নরেন যেন অবশ্যই ষ্টেশনে থাকে। নরেনের মনে খুসিটা উপ্‌চাইয়া পড়িয়া মাটি স্পর্শ করিতেই দুশ্চিন্তা হইয়া দেখা দিল। প্রতিমা আসিতেছে, কেন? মনের বৈজ্ঞানিক গঠনটায় বেশ একটা ঝাঁকানি লাগিল।

সিগারেট্‌ পুনরায় ধরাইয়া সে রওনা হইল বাসার দিকে, তখন বেলা প্রায় দুপুর। নিজের ঘরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে যে দৃশ্য তার চোখে পড়িল, তাহা আর কিছুই নয়, গত তিন বছরের ইতিহাস ঘরের চারিদিকের আবর্জ্জনায়, ঘরের বেড়ায়, টেবিলে, বিছানায়, জামাকাপড়ে সেই ইতিহাসের বিবরণ। একটা মহাভারততুল্য ব্যাপার প্রক্ষেপের পর প্রক্ষেপ পড়িয়া তাহা যেমন হইয়াছে আয়তনে বড়, তেমনি মূল জীবনটাকে তার একদম ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

মা ছিল রান্না ঘরে। অসীম মায়ের দায়িত্ব আর কর্ম্মভার। নরেনের তাহা চক্ষে পড়িল। পকেটে ছিল চিঠিটা, বুঝিল দ্রব্যগুণে চোখের দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে। অনেকদিন অবধি কিছু লেখে নাই, বুঝিল আসিয়াছে লেখার সুসময়। অর্ডিনান্সে ধরা পড়ে নাই, বুঝিল দৈবের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

নরেন মাকে জানাইল, প্রতিমা আসিতেছে। সংবাদ পত্রের পাঠকের মতো মা অব্যাকুল রহিল। নরেন বুঝিল বস্তুর বাস্তবিকই একটা স্বাধীন সত্ত্বা আছে।

যখন নরেন বিকালে বাহির হওয়ার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, তখন মা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রতিমা আস্‌ছে কেন, কি সে করে, কোথায় আছে ইত্যাদি।

মুদ্রাযন্ত্রের মধ্য থেকে যেমন ছাপা হইয়া কাগজ বাহির হয় তেমনি নরেনের মুখ থেকে উত্তর ক'টা বাহির হইল। মা সংবাদগুলি শ্রবণ করিলেন।

পরের দিন ভোর বেলাই ষ্টীমার। নরেন ষ্টেশনে গেল। বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতেছিল। শরতের নির্মেঘ প্রভাত। নীলাকাশে সূর্য্য উঠিল, যেন প্রাচীন বীর পুরুষের ঢালে স্বর্ণগোলক বসানো, তাহা হইতে আলোক ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া চক্ষু ধাঁধিঁয়া দিতেছে।

নরেনের মনের অস্বস্তিটা যেন আকাশ ও পৃথিবীর লড়াই কিংবা যেন তিন বছর আগের অতীত আর তিন বছর পরের বর্ত্তমানের দ্বন্দ্ব।

ষ্টীমার আসিল। লোকজন সব নামিয়া গেল। নরেন এক পাশে দাঁড়াইয়া ষ্টীমার হইতে নামিয়া আসা ভীষণ নীরব লোকযাত্রা দেখিতে ছিল। ষ্টীমার ঘাটের কোনো ধ্বনি তার কাণে পৌঁছিতেছিল না।

সহসা তার কানে আসিল, এই যে নরেন বাবু—

শব্দের একটা ঝড় বহিয়া গেল।

তথাপি সোজা থাকিয়া নরেন কহিল, এই যে, চল। গাড়ী করা, গাড়ীতে উঠিয়া উভয়ের বিশ্রাম। ফাঁকে প্রতিমা একবার কহিল, আপনার চেহারাটা যেন একটু খারাপ হ'য়ে গেছে। নরেন স্বীকার করিল, এবং প্রতিমাকে কহিল, পুলিশ স্পাইরা চারিদিক্‌ থেকে আমাদের দেখছে—

প্রতিমা কহিল, ওদের ও রোগ...নরেন গাড়োয়ানকে হাঁকিয়া কহিল, গাড়ী চালাও।

গাড়ী বাসায় পৌঁছিতে বেশী দেরী হইল না। প্রতিমা নামিয়া কহিল, 'আগে আগে যান্‌, আপনার বাসা তো চিনি না।'

নরেন কহিল,...এই তো প্রথমবার আসা আমার মাও তোমাকে কোনো দিন দেখেননি, তবে নাম শুনেছেন অনেকবার—

নরেনের বাসায় কৌতূহল পাত্তা পাইত না। ছোট ছেলেমেয়েদের যেটুকু ছিল, তাহাও ক্ষীণ ধরণের এবং ভয়গ্রস্ত। মায়ের কাঁধে রান্নাঘর, আর মামা...অবসরগ্রাহী চাকুরিয়া, পরকাল মানেন না, সংসারে যাহা জানিবার সব তিনি জানিয়াছেন, জ্ঞানী ব্যক্তি, কিন্তু অকর্ম্মা।

নরেনের সম্পর্কে নিরাশ হইয়া তিনি এবং নরেনের মা'ও ইদানীং নরেন সম্পর্কে প্রত্যেক ব্যাপারেই নিরাশ হইয়াছিলেন।

অপরিহার্য্য একটা অসুবিধা বা ব্যাঘাতরূপেই তাঁরা প্রতিমার আগমনটাকে গ্রহণ করিলেন, এবং চুপ করিয়া রহিলেন।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর, নরেন প্রতিমাকে লইয়া নিজের মনে বসিয়াছিল। বিকেলের ষ্টীমারে প্রতিমা যাইবে, ষ্টীমার সাড়ে ছ'টায়। তখন বেলা দুটা, অতএব ঘণ্টা চারেক সময় মাত্র ছিল। কিছু ঘটিতে পারে, অন্ততঃ নরেনের এমনি ধারণা হইয়াছিল। গত কাল প্রতিমার নীল খামে ভরা চিঠি হাতে আসার পর হইতে নরেন সম্ভব অসম্ভবে ভেদজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

নিজের তরফ থেকে কিছু বলিবার ছিল না। একটা অপরাধে তার মন ভরিয়া ছিল, কিন্তু কি যে অপরাধ তাহা ঠিক পাইতেছিল না। রাজবন্দী বন্ধুদের একেক জনকে নিজের স্থানে দাঁড় করাইয়া সে দেখিল,—দেখিল, কেহই এ অবস্থায় নূতন কিছু করিতে পারিত না।

এক পারা যায়, নিজের জীবনের জন্য খানিকটা সুপারিশ করা। কিন্তু আত্মাভিমান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেও ঘা লাগে।

প্রতিমা নরেনের টেবিলের বইগুলি নাড়িতে চাড়িতেছিল। তাহা বন্ধ করিয়া কহিল, কি করবেন ঠিক ক'রেছেন জীবনে ?

নরেন কহিল, এ প্রশ্ন উঠ্‌ত না যদি জেলে যেতাম। বাইরে আছি ব'লেই কি কৈফিয়ৎ দিতে হবে ?

প্রতিমা কহিল, বাইরে থাকা পর্য্যন্ত কৈফিয়ৎ দিতে হবে বৈ কি ?

নরেন দেখিল কোনো সাফাই গাওয়া চলে না। মনকে যাচাই করিয়া সে তো আগেই বুঝিয়াছিল, কোথায় যেন ভীরুতা আছে, তাই পুলিশ রেহাই দিয়াছে, কিন্তু সেটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, প্রতিমার এই কথায়।

সেই ভীরুতার চরম সীমা হইতে, নরেন টের পাইল, তার মন দুঃসাহসিক বেগে যাত্রা করিয়াছে। দেহটা ততখানি বেগে অবশ্য ছুটিল না, তথাপি নরেন টের পাইল, একেবারে হঠাৎই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, আরও টের পাইল, সে দণ্ডায়মান অবস্থায় বলিতেছে, আমি বুঝেছি, এ প্রকৃতির ষড়যন্ত্র...তুমি তাঁরই দূতী...জেলের বাইরে প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র হ'তে দূরে থেকেছি, অথচ ভাণ ক'রেছি যেন কর্ম্মক্ষেত্রে ডুবে আছি,...সেইজন্য আমার জন্যে অর্ডিনান্স জুটল না, জুটলে এসে তুমি—কিন্তু জানো, আমি এখনও সবল হ'তে পারি, দৃঢ় হ'তে পারি।

প্রতিমার বোধহয় অর্থবোধ হইল না। কিন্তু বুঝিল, অবস্থার চাপে পড়িয়া, অনেক কথা মানুষের মুখ দিয়া বাহির হয়, অভিধানে যাহার মানে নাই।

কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া নরেন অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছিল। অপর কেহ শুনিল না, নরেন শুনিতে পাইল, অতি সাবধানে উচ্ছ্বাসের শূন্য হইতে নামিতে গিয়াও, কতোবড় একটা শব্দ হইয়াছে। সে শব্দে দৈহিক ব্যথা বোধ হইল না। খাঁচার বাঘের চোখে মাঝে মাঝে যে আরণ্য দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া যায়,...তেমনি একটা দীপ্তি নরেনের দেহ মন থেকে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল,...সে যথাস্থানে বসিয়া একটা হাই তুলিল।

প্রতিমার আলাপও, অভিধানে যে সকল শব্দ পাওয়া যায় তাহারই মধ্যে অবতরণ করিল।

রিষ্টওয়াচ দেখিয়া প্রতিমা কহিল, এবারে কাউকে গাড়ী আনতে পাঠান।

গাড়ী আসিল। প্রতিমা কহিল, চলুন ষ্টেশনে। ষ্টেশন সম্বন্ধে একটা দার্শনিক আলাপকে রোধ করিয়া, নরেন হাসিমুখে ষ্টেশনে চলিল।

তাহার চোখের সাম্‌নে সেই তিন বছর আগের যাওয়ার দৃশ্যটা ভাসিতেছিল। প্রতিমাকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়া, নরেন যখন নামিয়া আসিল, তখন মুখের অসাড় নিম্নভাগে তার হাসি আঁকা, আর চোখে তার জল।

———

বাংলার সেকালের মেয়েদের কথা

আশালতা সেন

'সেকাল' শব্দটি কালজ্ঞাপন সম্পর্কে একটি বেশ সুবিধাজনক শব্দ। আমরা অনায়াসেই এই শব্দটির আশ্চর্য্য শক্তিতে নিজেদের বাল্যকাল হইতে 'প্রলয় পয়োধিজলে' মৎস্যাবতারের আবির্ভাব কাল, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিম অবস্থা পর্য্যন্ত সমগ্র কালটাকেই সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারি। আর সেই জন্যই আমরা যখন 'হায়রে সেকাল' বলিয়া গভীর দুঃখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকি ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে 'সেকালের মেয়েদের' গুণপণার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা আমাদের শৈশবে ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া আবৃত্তিকারিনী দিদিমাতাদের হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যযুগে আবির্ভূতা সতী, সাবিত্রী প্রভৃতি সমস্ত মহীয়সী মহিলাবৃন্দকেই যুগপৎ স্মরণ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হই। ইহা একটা বড় কম সুবিধার কথা নহে!

কিন্তু ইহা খুব সুবিধার কথা হইলেও আমি আজ একটু অসুবিধার পথই বাছিয়া লইয়া এই অতি প্রশস্ত ও বিপুল 'সেকাল' কে একটু ক্ষুদ্রতর গণ্ডিতেই আবদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলাম। অর্থাৎ সেকালের মেয়ে বলিতে আমি আজ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর ইত্যাদি যুগের মেয়েদের কথা বলিতে যাইতেছি না। কাজেই আমি প্রথমেই সর্ব্বজন বন্দিতা ও নিত্যপরিকীর্ত্তিতা সতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি লোকললামভূতা ললনাকুলকে সসম্ভ্রমে প্রণাম জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি যে আমার এ প্রবন্ধে তাঁহাদের নিতান্তই স্থানাভাব। যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বত্রই এত বেশী স্থান লাভ করিয়া থাকেন যে এখানে স্থানাভাবের জন্য তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও আসিয়া যাইবে না।

আবার 'সেকালের মেয়ে' বলিতে আজ আমি আমাদের বাল্যকালে 'রূপকথার ঝাঁপি' লইয়া সমাসীনা পিতামহী ও মাতামহীবৃন্দ,—যাঁহারা নাকি নবীন বয়সে দেড়হস্ত পরিমিত ঘোম্‌টাতে বদনকমল আবৃত করিয়া রন্ধনশালায় বসিয়া ধোঁয়ার ছলনা করিয়া ক্রন্দন করিতে বাধ্য হইতেন এবং প্রবীণ বয়সে সেই সুদীর্ঘ অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণ উন্মোচন পূর্ব্বক সুবৃহৎ নথচক্র ঘূর্ণিত করিয়া সম্মার্জ্জনী হস্তে বীরাঙ্গনা বেশে আমাদের মাননীয় দাদামহাশয়দের 'সায়েস্তা' রাখিবার অধিকার অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেন, সেই প্রবলা অবলাকুলের গুণপণাও কীর্ত্তন করিতে যাইতেছি না। যেহেতু তাঁহাদের গুণপণার কথা (বস্তুতঃই বলিবার মত তাঁহাদের অনেক গুণপণাই আছে সন্দেহ নাই) আমাদের স্মৃতিতে এখনও এত উজ্জ্বল যে তাহাকে আপাততঃ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের বিষয়ীভূত না করিলেও কিছুই আসিয়া যাইবে না! সে যাহা হউক এখন প্রকৃত প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাক্‌।

(২)

বাংলার 'সেকালের' অর্থাৎ তাহার দূরবর্ত্তী অতীতকালের বিষয়ে কিছু লিখিতে যাওয়া মোটেই অনায়াসসাধ্য নয়। অথবা কেবল বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষ ও বিরাট হিন্দুজাতির সম্পর্কেই বোধ হয় একথা বলা যায়। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে রাজ্য ও রাজার উত্থান পতন অথবা সামাজিক অবস্থার ভিতর দিয়া জনসাধারণের জীবন যাত্রা কাহিনী বর্ণনা করা অপেক্ষা ধর্ম্মান্দোলন সম্পর্কীয় ব্যাপারেই হিন্দুচিত্ত তথা হিন্দু গ্রন্থকারদের হৃদয় অধিকতর আকৃষ্ট হইত। আর এই সব ধর্ম্মসম্পর্কিত ব্যাপার অবলম্বন করিয়া যে সব গ্রন্থ রচিত হইত তাহার মধ্যে গ্রন্থকারের প্রয়োজন মত যাহা উল্লেখ করা দরকার হইত সেই অনুসারেই তাঁহারা এমন অনেক কথা হয়ত লিখিতেন যাহার ভিতর দিয়া ঐতিহাসিক তথ্যও কিছু কিছু গ্রন্থের ভিতর আসিয়া জুটিত। কিন্তু ধর্ম্মমূলক বলিয়াই আবার তাহাতে এত সব অলৌকিকত্বের সমাবেশও করা হইত যে তাহার মধ্য দিয়া ঠিক্ ঐতিহাসিক রূপটিও ধরা কঠিন।

কাজেই কেবল বাংলা কেন সারা ভারতবর্ষেই সুদূর অতীতে কত রাজ্যের উত্থান ও পতন ও কতই না বিচিত্র ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে—কিন্তু তাহার কোনও ইতিহাস নাই। ইহা খুবই সত্য যে আমরা মুসলমান রাজত্বের আমল হইতেই ভারতবর্ষের অনেকটা ধারাবাহিক ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিয়া থাকি এবং কর্ণেল উডের রাজপুতকাহিনী হইতেই আমরা ভারতবর্ষের অন্ততঃ একটা অংশের কতকটা ইতিহাস ও বীরত্ব কাহিনীর সহিত পরিচিত হই। মনে পড়ে বাল্য জীবনে এই কর্ণেল উডের পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'রাজস্থান' পাঠ করিয়া প্রাণে কত উৎসাহ ও উদ্দীপনারই না সঞ্চার হইত এবং ভারতবর্ষের অন্ততঃ কোনও স্থানে কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও যে এইরূপ সব বীরত্ব ও মহত্ত্বে সমুজ্জ্বল নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা ভাবিতে হৃদয় গৌরবে ভরিয়া উঠিত। কিন্তু বাংলার কথা? তখন কিন্তু মনেও করিতে পারিতাম না যে বাংলাতেও কখনও অনুরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়া থাকিতে পারে। এই বাংলার বুকেও ঐরূপই বহু শক্তিশালী নরনারীর আবির্ভাব হইয়া থাকিতে পারে। কেননা সে সম্বন্ধে কোনও-রূপ ধারণা থাকিবার মত কোনও ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী আমরা পাই নাই।

বাংলার সাহিত্যের দিক দিয়া আলোচনা করিলেও আমরা ঠিক সেই পূর্ব্বলিখিত একই ব্যাপার দেখিতে পাই। অর্থাৎ ধর্ম্মমূলক উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বাংলাতে বহু 'মঙ্গল' গ্রন্থ রচিত হইয়াছে এবং তাহা হইতেও ইহাই দেখা যায় যে গ্রন্থ রচয়িতার সংখ্যা যে বাংলাতে নেহাৎ কম ছিল তাহা নয়। কিন্তু তাঁহাদের মনোবৃত্তি মোটেই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের মনোবৃত্তি নয়।

কাজেই আধুনিক যুগে যাঁহারা বাংলার ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে সে কাজ খুবই কঠিন হইয়াছে। আবার এই সব ঐতিহাসিক গবেষণাকারিগণ বহু পরিশ্রম

করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহার মধ্যে আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি সে কথা, অর্থাৎ মেয়েদের কথা এত কম যে তাঁহাদের যে কোনও কালে কোনও রূপ অস্তিত্ব ছিল তাহা উপলব্ধি করিয়া ওঠাই মুস্কিল।

আর সেজন্যই আমাদের 'একালের' ও সুদূর রামায়ণ-মহাভারতের সমসাময়িক 'সেকালের' মাঝখানে কোথাও যে আর কোনও নারী জন্মগ্রহণ করিয়া কোনওরূপ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকিতে পারেন তাহাই যেন আমাদের মনে হয় না। পৌরাণিক পর্য্যায়ভুক্ত মেয়েদের মধ্যে অবশ্য বাংলার একটি কল্পনা ও রূপকে সমাচ্ছাদিতা বন্দনীয়া নারীমূর্ত্তি আমাদের সমক্ষে 'মনসা-মঙ্গলে'র ভিতর দিয়া উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে পুণ্যদীপ্ত শক্তিময়ী মূর্ত্তি বেহুলার। এই মূর্ত্তি পৌরানিক হইলেও বাংলার নিতান্তই নিজস্ব। বাংলার জনসাধারণের হৃদয়ে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আভিজাত্য গর্ব্বিত সংস্কৃত সাহিত্যের সীতাসাবিত্রী প্রভৃতি মহীয়সী মূর্ত্তিরই সমকক্ষতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু বেহুলার কাহিনী এত বেশী দেবত্বের আচ্ছাদনে আবৃত করা হইয়াছে যে তাহাতে ঐতিহাসিক তথ্য যদি কিছু থাকিয়াও থাকে তবুও তাহাকে ঐতিহাসিক চিত্ররূপে অঙ্কিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি খুঁজিয়া ফিরিয়াছি বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে ঐতিহাসিক নারীমূর্ত্তি। আর সেই খোঁজার ফলে সামান্য যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

(৩)

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। প্রায় ১৬০০ বৎসর আগেকার কথা। বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজিয়া এই সময় একটি বঙ্গরাজকুলবধূর সাক্ষাৎলাভ করিলাম। তাঁহার নাম কুমার দেবী। কুমার দেবী লিচ্ছবি রাজদুহিতা ছিলেন, মগধ ও বঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছু কাল পূর্ব্ব হইতেই এই লিচ্ছবি কুল খুব প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিল এবং ইঁহাদের রাজ্য শাসনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় যে সেই সুদূর প্রাচীনকালেও লিচ্ছবি রাষ্ট্র একটি বিশেষ উন্নত ধরণের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল। লিচ্ছবিগণ শিক্ষা দীক্ষা নৈতিক চরিত্র. বলবীর্য্য ও একতা প্রভৃতি গুণে ভূষিত ছিলেন এবং তাঁহাদের ভিতর নারীর স্থান ও সম্মান ও অত্যন্ত উচ্চদরের ছিল। কুমার দেবী সম্বন্ধে ইতিহাসে এইটুকু জানিতে পারা যায় যে নিজ পিতৃরাজ্যে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লিচ্ছবিগণের সহিত যুক্ত হওয়ার দরুণই চন্দ্রগুপ্ত নিজরাজ্যের প্রভূত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগরে (বর্ত্তমান পাটনা) তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। এইস্থানে ইহাও বলা প্রয়োজন যে প্রাচীন ইতিহাসে বাংলা ও মগধের ইতিহাস একই, কেননা ইহা বহুকালই একই রাজ্যভুক্ত ছিল। ৺রাখাল দাশ বন্দ্যোপাধ্যায় তাই বলিয়া গিয়াছেন যে তখনকার সেই ঐতিহাসিক যুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। এই সেদিনও বঙ্কিমচন্দ্র যখন "সপ্তকোটি কণ্ঠ কল কল নিনাদে করালে" রচনা করিয়াছিলেন তখন এই বৃহত্তর বাংলাকেই তাহার ভিতর দিয়া

অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার" সঙ্গীতে "উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা" ইত্যাদিও এই বৃহত্তর বাংলাকে স্মরণ করিয়াই রচিত হয়।

সে যাহা হউক প্রথম চন্দ্রগুপ্তের স্বনামধন্যা মহিষী কুমার দেবী নিজ পিতৃরাজ্যের ন্যায় পতির সাম্রাজ্যেও যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আমরা ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারি যে চন্দ্রগুপ্ত রাজকীয় সুবর্ণ মুদ্রাতে নিজ মূর্ত্তির পার্শ্বে সাম্রাজ্ঞী কুমার দেবীর মূর্ত্তিও অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা সহজেই বুঝা যায় যে কুমার দেবীর গুপ্তসাম্রাজ্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁহার বিশেষ সহকারিতাও ছিল। প্রকৃত পক্ষে শক্তি না থাকিলে কেহই স্থায়ী সম্মান লাভ করিতে পারে না। কাজেই কুমার দেবীর এইরূপ সম্মানলাভ তাঁহার বিশেষ শক্তিমত্তারই পরিচয় প্রদান করে। আবার অপর দিকে হৃদয়ের উদারতা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রকৃত শীলতা না থাকিলে পুরুষের পক্ষে নারীকে উপযুক্ত মর্য্যাদা প্রদান করা সম্ভব হয় না। সেই দিক দিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ সাম্রাজ্ঞীকে সেই ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বে, আমাদের এই 'সংস্কৃতি ও প্রগতি' অভিমানী 'একাল' হইতে বহু দূরবর্ত্তী 'সেকালে'ও এই যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার পক্ষেও কম প্রশংসার কথা নহে।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার দেবীর পুত্র প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত। সমুদ্রগুপ্তের পত্নীর নাম দত্তদেবী। তাঁহার সম্বন্ধে শুধু এইটুকু জানা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত উত্তরা পথ ও দাক্ষিণাত্যে বহু রাজ্য জয় করিয়া যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন তাহার দক্ষিণা দানের জন্য এক নূতন রকমের সুবর্ণ মুদ্রা তৈয়ারী করান। সেই মুদ্রার একদিকে যজ্ঞের অশ্ব ও অপরদিকে তাঁহার মহিষী দত্ত দেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। ইহা ঠিক কি ভাব হইতে করা হইয়াছিল তাহা বুঝা যায় না। মোটের উপর ইহা রাজকীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ স্বরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু কোনও রাজকায় কর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ স্বরূপে সমুদ্রগুপ্তের নিজ মূর্ত্তির সহিত তাঁহার মহিষীর মূর্ত্তিও অঙ্কিত থাকার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (ইনি বিক্রমমাদিত্য নামে বিখ্যাত ছিলেন) পত্নী ধ্রুবস্বামিনীর কেবল নামোল্লেখ ছাড়া আর কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীগুপ্তার কথা কিছু উল্লেখযোগ্য। প্রভাবতীগুপ্তার বাকাটক বংশীয় কুমার নাগার পুত্র মহারাজা রুদ্রসেনের সহিত বিবাহ হয়। প্রভাবতী গুপ্তার নিজ তাম্রশাসনে এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তিনি রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী ছিলেন ও তাঁহার পুত্র দিবাকরসেন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। প্রভাবতীগুপ্তার নিজ তাম্রশাসনপ্রাপ্তি দ্বারা ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে সেই সময়কার অন্যান্য রাজবংশীয়া ললনাদের অপেক্ষা তাঁহার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তিনি স্বীয় পতিকুলেও বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তও তাঁহার রাজকীয় সুবর্ণমুদ্রায় নিজ রাজমূর্ত্তির

সহিত তাঁহার দুইজন রাজ মহিষীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া ছিলেন এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম পাওয়া যায় না। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর নাম অনন্তদেবী। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে কুমারগুপ্তের দ্বিতীয় মহিষী অনন্তদেবী শক্তিশালিনী নারী ছিলেন ও রাজকীয় কার্য্যে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র অনন্তদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিলে প্রথমা মহিষীর অবমাননা করা হইবে ইহাই মনে করিয়া তিনি রাজকীয় মুদ্রাতে নিজ মূর্ত্তির সহিত উভয় মহিষীর মূর্ত্তিই অঙ্কিত করিয়া বিশেষ সুবিবেচনার সহিত উভয়েরই সমান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

অনন্তদেবীর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অধঃস্তন বংশীয় রাজা আদিত্যসেনের শিলালিপিতে তাঁহার মাতা শ্রীমতীদেবী ও তাঁহার পত্নী "পরম ভট্টারিকা রাজ্ঞী মহাদেবী" কোন দেবীর সম্বন্ধে এই বিবরণ পাওয়া যায় যে তাঁহারা উভয়েই মঠ নির্ম্মাণ, জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দেওঘর বৈদ্যনাথদেবের মন্দিরেও প্রাচীরসংলগ্ন একখান খোদিত লিপিতে আদিত্যসেনের সহিত কোন দেবীর নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে আদিত্যসেনের মহিষী 'পরম ভট্টারিকা' কোন দেবী নিজ স্বাভাবিক গুণাবলীর জন্যই সেই সময়ে একটি বিশেষ মর্য্যাদার আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সকল রাজমহিষীদের কথা ছাড়া বিভিন্ন রাজবংশীয় আরও কয়েকজন রাজ মহিষীর নাম এই সময়কার বাংলার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। কিন্তু কেবলমাত্র নামোল্লেখ ভিন্ন তাঁহাদের সম্পর্কে আর কোনও বিবরণই দেখিতে পাই নাই। তবে কিনা ইহা বলা অসঙ্গত নয় যে যেখানে নামেরই কোনও উল্লেখ পাওয়া দুর্ল্লভ, সেখানে কেবলমাত্র নামোল্লেখ দ্বারাও মনে করা যাইতে পারে যে হয়ত তাঁহাদের কোনও বৈশিষ্ট্য ছিল।

(৪)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর বাংলাতে পাল রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। এই বংশের রাজত্বকালীন আমরা বাংলার একটি অসাধারণ শক্তিশালিনী নারীর সাক্ষাৎ লাভ করি। তাঁহার নাম রাণী ময়নামতী। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহার স্বামী মাণিকচন্দ্রের মৃত্যু হয়। পালবংশীয় রাজা দ্বিতীয় ধর্ম্মপাল এই সুযোগে মাণিকচন্দ্র ও ময়নামতীর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচন্দ্রের রাজ্য হস্তগত করেন। ইহাতে রাণী ময়নামতীর সহিত ধর্ম্মপালের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। গোবিন্দচন্দ্রের শ্বশুর রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহায়তা নিয়া রাণী ময়নামতী পুত্রের রাজ্যোদ্ধারে যত্নবতী হন। গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থিত ছিল এবং এই অঞ্চলে মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর গান পূর্ব্বে খুবই প্রচলিত ছিল। ময়নামতীর গানে তাঁহার পিতৃরাজ্য বিক্রমপুরে ছিল বলিয়া জানা যায়। এইসব গানে রাণী ময়নামতীর যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাতে তাঁহাকে একটি অপূর্ব্ব মানসিক শক্তিসম্পন্না নারী বলিয়া আমরা দেখিতে পাই। তিনি প্রথম জীবনে যে পুত্রের হৃত রাজ্যোদ্ধারের জন্য প্রবল

শত্রুর বিরুদ্ধতা করিয়া বিপুল সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন, পরবর্ত্তী জীবনে আবার সেই পুত্রেরই সন্ন্যাসগ্রহণে সহায়তা করেন। গোবিন্দচন্দ্র একাদশ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তৎপর দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী রাজা রাজেন্দ্র চোল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। গোবিন্দচন্দ্র এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হন ও সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করেন। এই সময় আবার আমরা তাঁহার জননী ময়নামতীকে তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের সহায়তাকারিণী স্বরূপে দেখিতে পাই। এই সময় বাংলাতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং জাতি পাঁতি ও পদমর্য্যাদার প্রাধান্য খুবই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। বলবীর্য্যগর্ব্বিতা রাণী ময়নামতী যে মানসিক বলে একদিন শত্রুকে প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই মানসিক বলেই তিনি আবার সমস্ত আত্মাভিমান ও পদমর্য্যাদা পরিত্যাগ করিয়া এক নীচজাতীয় বৌদ্ধ সাধককে গুরুপদে বরণ করেন। গোবিন্দচন্দ্রের জীবনে তাঁহার এই শক্তিশালিনী জননী যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। তাঁহারই আদেশে রাজা গোবিন্দচন্দ্র জনৈক ডোম জাতীয় বৌদ্ধাচার্য্যকে গুরুরূপে বরণ করেন। যোগীবেশধারী পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সহিত কথোপকথনের ভিতর দিয়া জননী ময়নামতীর গভীর তত্ত্বজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। ময়নামতী গোবিন্দচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কোথায় উৎপত্তি হইল পৃথিবী সংসার
কোথায় রহিল পুনঃ কহ সমাচার
মরণ কিবা হেতু জীবন কিরূপ
ইহার উত্তর যোগী কহিবা স্বরূপ।"

গোবিন্দচন্দ্র উত্তর দিতেছেন,—

"শূন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি,
আপনি জল স্থল আপনি আকাশ
আপনি চন্দ্র সূর্য্য জগৎ প্রকাশ।"

ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের এই উপাখ্যান কেবলমাত্র পৌরাণিক উপাখ্যানের রাজ্ঞী মদালসার সহিতই তুলনাযোগ্য। মদালসার উপাখ্যানে আছে যে তিনি তাঁহার পুত্রদের শৈশব দোলায় দোলাইবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই 'তত্ত্বমসি' (তুমিই সেই) এই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতেন এবং এই ব্রহ্মবাদিনী জননীর কাছে বাল্যাবধি আধ্যাত্মিক সাধনায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই সন্ন্যাসগ্রহণ করিতেন। ইহাতে মদালসার স্বামী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া তাঁহাকে এইরূপ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীর অনুরোধে মদালসা কনিষ্ঠ পুত্র অলর্ককে রাজনীতি-কুশল করিয়া গড়িয়া তুলিয়া রাজ্য পালনে নিযুক্ত করেন। পরে এই

অলর্কও শত্রু হস্তে পরাজিত হইয়া জননী মদলসা নিজ মৃত্যুকালে তাঁহাকে যে কবচ প্রদান করিয়া যান তাহার ভিতরে রক্ষিত একটি শ্লোক পাঠ করিয়া বৈরাগ্যলাভ ও সন্ন্যাসগ্রহণ করেন বলিয়া মদালসার উপাখ্যানে লিখিত আছে।

আমরা রাণী ময়নামতীর জীবনে এই পৌরাণিক উপাখ্যানটি একটি ঐতিহাসিক সত্য স্বরূপে দেখিতে পাই। পার্থিব সম্পদে পুত্রকে ঐশ্বর্য্যশালী করিবার জন্যই জননীকে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে দেখা যায়। কিন্তু জননী হইয়া পুত্রকে সন্ন্যাসে প্ররোচনা দিতে পারেন ইহা খুবই দুর্ল্লভ ব্যাপার। আমরা ময়নামতীর জীবনে সেই দুর্ল্লভ ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। রাণী ময়নামতী একই জীবনে প্রয়োজন অনুসারে একদিন পুত্রের হৃতরাজ্য উদ্ধার করিয়া তাহাকে পার্থিব সম্পদশালী করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আবার সেই পুত্রেরই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাহাকে আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর দিয়া পরম শান্তির পথ প্রদর্শন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এরূপ অসাধারণ মানসিক শক্তিশালিনী নারীর দর্শনলাভ করা কম গৌরবের কথা নহে। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে রচিত ময়নামতী ও গোবিন্দচন্দ্রের গান গুলিতে তাঁহাদের জীবনে অনেক বিশ্বাসের অযোগ্য অলৌকিকত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কিন্তু মূল ঘটনাটি যে একটি সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ-পরিচয়

Social & Cultural Dynamics—3 Vols.

—Pitrim Sorokin. American Book Company ; Allen & Union. 21s. each.

Sorokin আমেরিকার একজন বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্; হারভার্ড ইউনিভারসিটির সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক, জাতিতে রুশ; ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর দেশ ত্যাগ ক'রে আমেরিকায় চলে যান। তাঁর জীবন বৈচিত্র্যবহুল। সংবাদপত্র ফেরী করে তাঁর বাল্য জীবন সুরু হয়। পরে বিপ্লবীদলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় তিনি লেখাপড়া শেখেন। রুশ বিপ্লবের সময় কেরেন্সকী গবর্ণমেণ্টে তিনি একজন সভ্যরূপে গৃহীত হন। ঐ গবর্ণমেণ্টের পতন হ'লে তিনি রাশিয়া থেকে পলায়ন করেন। বর্ত্তমানে আমেরিকান নাগরিকরূপে আছেন। ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক মহলে তিনি সুপরিচিত। শ্রদ্ধেয় বিনয়কুমার সররকার মহাশয় ১৯২৮ সাল হতে এই তরুণ সমাজবিদ্ সম্বন্ধে নানা সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখে তাঁর অমূল্য গ্রন্থগুলির উপর ভারতীয় পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আস্‌ছেন। Social & Cultural Dynamics তিনখণ্ডে গত বৎসর বের হয়েছে; প্রতিখণ্ডে ৫০০ শত বা ততোধিক পৃষ্ঠা; শেষ বা চতুর্থ খণ্ড এখনও অপ্রকাশিত। ইহা সমাজতত্ত্বের একটি magnum opus বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। এ গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা Sorokin, শুধু যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ্ হিসাবে আপনার দাবী সপ্রমাণ করেছেন তা নয়। সমাজবিদ্যার ভিত্তিমূলও অনেকাংশে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর অনন্যসাধারণ বিদ্যাবত্তা ও বহুমুখী প্রতিভা গ্রন্থের প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠককে অভিভূত করে। ইহার বিশাল ও গভীর ব্যাপকত্ব বাস্তবিকই অত্যাশ্চর্য্য বলে মনে হয়।

Oswald Spengler এর পর সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, নৃত্য, সঙ্গীত, প্রভৃতিকে এমন অখণ্ড, সমগ্র দৃষ্টিতে দেখার এরূপ প্রচেষ্টা অন্য কোন সমাজবিদ্ করেছেন কিনা সন্দেহ। জ্ঞানবস্তু অপেক্ষা যদি জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানের আবেগ মানব মনে অধিক অনুপ্রেরণা দেয় তবে এ গ্রন্থত্রয় চিরকাল বিদ্বৎসমাজে আদর লাভ করবে।

কোন্ দার্শনিক আদর্শের প্রেরণায় এ মহৎ চেষ্টা ভূমিকায় বিবৃত লেখকের মানসিক অবস্থা থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়।

I am not ashamed to confess that the world war & most of what has taken place after it were bewildering to one who, in conformity with the dominant currents of social thought of the 20th century, had belived in progress, revolution, socialism, democrcay, scientific positivism & many other 'isms' of the same sort. For good or ill I fought for these values & paid the penalty. I expected the progress of peace, but not of war, the bloodless reconstruction of society, but not bloody rovolution, humanitarianism in a nobler guise, but not mass murders ; an even finer form of democracy but not autocratic dictatorship ; the advance of science, but not of propaganda and authoritarian dicta in lieu of truth ; the manysided improvement of man but not his relapse into barbarism...And yet what then appeared to be absolutely impossible has indeed happened ?

এরূপ মোহমুক্ত মন এবং একটি বিশেষ দার্শনিক আদর্শ নিয়ে তিনি যথাসম্ভব নির্লিপ্ততার সহিত সমাজবিদ্যার এক কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন যার ভেতর সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি মানব সভ্যতার যাবতীয় সৃষ্টির সমাবেশ ও সমন্বয় সম্ভব হতে পারে। তাঁর মতবাদ দুদিক থেকে সমালোচনা করা যেতে পারে। প্রথমতঃ মূল প্রতিজ্ঞাগুলির যেভাবে সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ ও পর্য্যায় নিরূপণ (definition & classification of fundamental hypotheses) করা হয়েছে তা সর্ব্বসম্মত হতে পারে না। এখানে ব্যক্তিগত অভিরুচি ও শিক্ষাজাত দৃষ্টিভঙ্গী একভাবে না একভাবে এসে পড়ে। কাজেই সংজ্ঞাগুলি সবার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তবে সংজ্ঞা বাদ দিয়ে কোন প্রতিপাদ্য বিষয়ের সূচনা হতে পারে না। গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি abstract science গুলিরও কিছু minimum hypotheses আছে। সমাজ বিদ্যায় এ minimum maximumএ উঠতে বাধ্য। কারণ সমাজ শুধু 'Bloodless dance of Categories' নয় এবং ইহাকে কখনই কয়েকটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার ভেতর নিরুদ্ধ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ দার্শনিক নির্লিপ্ততা গ্রন্থকারের পক্ষে কতখানি সম্ভব হয়েছে তা বিবেচ্য। স্বীকার করতে হবে, এদিকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি নির্লিপ্ততা রক্ষা করতে পারেননি। গ্রন্থের আদ্যন্ত তাঁর আদর্শাঞ্জনে রঞ্জিত। এজন্য গ্রন্থকারকে দোষ দেওয়া যায় না। সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বহুদূরে পর্ব্বতকন্দরে নিষ্ক্রিয় নির্লিপ্ততা অভ্যাস করা চলে, কিন্তু যে সমাজের ভেতর একটা বিরাট বেগের উৎক্ষেপ বিক্ষেপ নিরন্তর চলেছে, প্রত্যেক মানুষের জীবন যেখানে সমস্ত মানুষের উদ্বেল জীবনের আঘাত প্রতিঘাতে কাজ করছে সেখানে নির্লিপ্ত থাকা কোন সক্রিয় মনের পক্ষে সম্ভব নয়।

আবার সমাজবিদ্যায় 'নৈর্ব্যক্তিকতা' সম্পূর্ণ অসম্ভব। কায়ার সাথে যেমন রয়েছে ছায়া, ব্যক্তির সাথে তেমন ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না, অনেক সময় আলোকিত করে। কাজেই গ্রন্থকারের নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব মোটেই দোষনীয় নয়।

ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে Sorokin মস্ত ভুল করেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী

প্রাচ্যবিদ্‌দের মতবাদ নিয়ে তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা একান্ত ভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার বোধ হয় গত অক্টোবরের Calcutta Reviewতে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা ও প্রত্যুত্তর দিয়েছেন।

এ পুস্তক এত বিশাল ও ব্যাপক যে সংক্ষেপে দুচার পৃষ্ঠায় তার সারাংশ বিবৃত করা একেবারে অসম্ভব। এতে অনেক অসম্পূর্ণতা থাকবে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক নিজে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ব্যাপ্ত ও বিবৃত করে এক অখণ্ড সমগ্রতা বিদ্যমান রয়েছে। এ সমগ্রতার যোগসূত্রগুলি বুঝতে হলে গ্রন্থকারের অনুসৃত 'logico-meaningful method of understanding' দরকার। কোন জিনিষ সম্বন্ধে জানতে হলে বা তাকে বুঝতে হলে তার ভেতরকার ন্যায় ও অর্থগত সঙ্গতি উভয়ই দেখতে হয়। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী এই দুই বৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর ফলে মানুষের সাহিত্য, দর্শন, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ভেতর একটা সামঞ্জস্য ও সমন্বয় বিদ্যমান থাকে।

'শুধু এ logico-meaningful' মননবৃত্তি দ্বারাই সমাজ ও তার গতিশীল পরিবর্ত্তন পরম্পরাকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়।

ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি নিছক জড়বাদ (Materialism) বা ভাববাদের (Ideationalism) আশ্রয় নেন নি। জড় ও জীবকে দুই বিভিন্ন সত্বা হিসাবে মেনে নিয়েছেন।

ইতিহাসের মূলে 'unvarying constancy of the same factor' তিনি স্বীকার করেন না। অল্পবিস্তর pluralistic ব্যাখ্যার তিনি পক্ষপাতী। ৪র্থ খণ্ডে (যা খুব সম্ভব এখনও অপ্রকাশিত) ইতিহাসের দার্শনিক ব্যাখ্যা ও সমাজবিদ্যার methodology সম্বন্ধে আলোচনা হবে। কাজেই এ বইখানা বের না হওয়া পর্য্যন্ত ইতিহাসকে তিনি কোন্ সত্বা বা সত্বাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করবেন তা বলা যায় না।

গ্রন্থগুলি এ ভাবে ভাগ করা হয়েছে ঃ

১ম খণ্ড—Fluctuations of Forms of Art

২য় খণ্ড—Fluctuations of systems of Truth, Ethics and Laws

৩য় খণ্ড—Fluctuations of social relationships, war and revolution.

সভ্যতা ও সংস্কৃতির 'logico-meaningful content'কে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—The Ideational, the Sensate and the mixed. আবার পঞ্চম শ্রেণী বিভাগে অনেক sub-groups আছে—যথা সক্রিয় (active) অথবা নিষ্ক্রিয় (passive) Ideational, সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় Sensate এবং এদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত বিভিন্ন mixed type। এর ভেতর Idealistic (যাতে জড় ও ভাববাদের প্রকৃত সামঞ্জস্য আছে) সব চেয়ে প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও সৃজনশীল।

Ideational type—পারলৌকিক ভাবাপন্ন। ফলে হয় শান্ত নিষ্ক্রিয়তা (passive quietism) না হয় সক্রিয় (active mysticism) Sensate type—বহির্মুখী ও ইন্দ্রিয়সর্ব্বস্ব। ইহার পরিণতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতায়, ধনিকের অত্যুগ্র আত্মসর্ব্বস্বতায়, না হয় কমিউনিষ্ট বস্তুতন্ত্রতায়।

কৃষ্টি হচ্চে Idealist mixed typeএর ;—নিছক Ideational অথবা Sensate নয়, উভয়ের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। ইহা জীবনে আধ্যাত্মিকতার যথোচিত মূল্য স্বীকার করে। তবে দেহ ও বাস্তবকে উপেক্ষা ক'রে নয় বরং আধ্যাত্মিককে এদের ভিত্তির ওপরে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে।

এভাবে সংজ্ঞা নিরুপণ করে তিনি সামাজিক পরিবর্ত্তনে unilinear না cyclic process চলেছে তা অনুসন্ধান করেছেন।

রৈখিক (unilinear) ক্রমবিকাশকে তিনি সুরুতেই বাতিল করে দিয়েছেন। অতীত ইতিহাস হতে সামষ্টিক পদ্ধতিতে (Statistical method) বহু ঘটনা সংগ্রহ ও সমাবেশ করে তিনি দেখিয়েছেন যে Spengler প্রভৃতি সমাজবিদ্‌গণ যে অর্থে cyclic ব্যবহার করেছেন ঠিক সে অর্থে সমাজবিজ্ঞান cyclic রীতির নয়। ৫০০ শত বৎসর পর পর সভ্যতার উত্থান পতন হবে সামাজিক পরিবর্ত্তনে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। চক্রাবর্ত্তনের ভেতর যে পর্য্যাবৃত্তি (periodicity) আছে তার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থিতি কাল নেই।

উপসংহারে তিনি বলেছেন যে বস্তুসর্ব্বস্ব ইউরোপীয় সভ্যতা চরম পরিণতি লাভ করেছে। তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী ও অদূরবর্ত্তী। বহু সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের পর ইউরোপীয় সভ্যতা আবার Idealistic প্রাণ সঞ্চারণে পুনর্জন্ম লাভ করবে ; নিম্নে উপসংহার হতে তাঁর বক্তব্য কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করে আলোচনা শেষ করতে চাই।

'We are seemingly between two epochs: the dying Sensate culture of our magnificent yesterday and the coming Ideational culture of the creative tomorrow. We are living, thinking and acting at the end of a brilliant six-hundred-year-long Sensate day. The oblique rays of the sun still illumine the glory of the passing epoch. But the light is fading and in the deepening shadows it becomes more and more difficult to see clearly and to orient ourselves safely in the confusions of the twilight. The night of the transitory period begins to loom before us and the coming generations, perhaps with their nightmares, frightening shadows, and heart-rending horrors. Beyond it, however, the dawn of a new great Ideational culture is probably waiting to greet the men of the future.

—শৈলেশ রায়

মীরাবাঈ—শ্রীঅনাথনাথ বসু, মূল্য ১৲ টাকা, ২য় সংস্করণ ১৩৪৫ সন।

ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ভক্ত কবিদের গীতিকাব্যগুলোর দিকে আজকাল শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়েছে। তুলসীদাস, নানক, মীরাবাঈ, দাদূ, কবীর ইত্যাদির কাব্য একদিন সমস্ত ভারতবর্ষের গণসাধারণের চিত্তকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল; সেই সঞ্জীবনের ফলে একদিন এদেশের জাতীয় জীবনে স্নিগ্ধ ফসল ফলেছিল এবং চারদিককার তর্কমুখর কোলাহল ও নির্জ্জীব জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে শান্ত-মধুর গাম্ভীর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে বুঝতে হলে এই গৌরবোজ্জ্বল যুগের ইতিহাসকে জানতে ও বুঝতে হবে। অথচ এই কবিদের জীবনের ও কাব্যের ইতিহাস তো দূরের কথা, তাঁদের কাব্যগীতিগুলোর সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সঙ্কলন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে নেই। বাংলাদেশে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের অনুসন্ধিৎসা ও প্রচেষ্টা এ সম্বন্ধে অনেকটা আলোকপাত করেছে সত্য কিন্তু আজো সকল কবিদের কাব্যের ভালো সংগ্রহ-গ্রন্থ দুর্ল্লভই আছে। ক্ষিতিবাবুর কবীরের কাব্য সঙ্কলন চিরদিন আদর্শ স্থানীয় হয়ে থাক্‌বে সন্দেহ নেই। মীরাবাঈয়ের গীতি সঙ্কলনখানা প্রকাশ করে অনাথ বাবুও আমাদের সবাইর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

অনাথবাবুর সঙ্কলনখানা পেয়ে আমরা আনন্দিত হয়েছি। মীরাবাঈয়ের সুন্দর-মধুর গানগুলো বাংলাদেশে সকল শ্রেণীর প্রিয় হয়ে উঠেছে। এই কারণে একখানা ভালো সঙ্কলন-গ্রন্থ আজকের দিনে খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাব্য হিসেবেও মীরাবাঈয়ের গানগুলোর শাশ্বত মূল্য রয়েছে। তাছাড়া মধ্যযুগীয় কবিদের মধ্যে মীরার গীতিকবিতার মতো জনপ্রিয় ও সর্ব্ব-প্রচলিত কবিতা আর কোন কবিরই কাব্য নয়। এই দিক থেকে মীরাবাঈয়ের কবিতার এই সংগ্রহ গ্রন্থখানিও জনপ্রিয় হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। বইখানা সুদৃশ্য হয়েছে এবং অনুবাদও অতি সুপাঠ্য হয়েছে।

এই সংগ্রহ-গ্রন্থখানা সম্বন্ধে দু'একটা বিষয়ে গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মীরার গীতিকবিতাগুলোর অনেকগুলিরই নানারকমের পাঠান্তর প্রচলিত রয়েছে। সেই পাঠান্তরগুলো ফুটনোটে দিয়ে দিলে পাঠকদের ও গায়কদের সুবিধে হোতো। যথা:—৫নং গীতি মীরার বিখ্যাত "তুম্‌হারে কারণ" গানটার ষষ্ঠ লাইনের ("হঁস কর তুরংত বুলাবো") অন্য একটা পাঠান্তর রয়েছে "তুয় চরণকে পাস বুলাবো"। তেমনি ৩০নং "সুনী মৈঁ হরি আবন কী আবাজ" গানটারও ষষ্ঠ লাইনের ("উমগ্যো......বরসে") পাঠান্তর রয়েছে "বরষে বাদরোয়া মেহা বোলৈ" ইত্যাদি। শেষ লাইনেরও অন্য পাঠ রয়েছে "মীরাকী চিত ধীর ন মানৈ" ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ গীতি কবিতাগুলো পর পর যে পর্য্যায়ে সাজানো হয়েছে তার পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে কী নীতি অবলম্বন করা হয়েছে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমাদের মতে একটা বিশিষ্ট নীতি অনুসারে গানগুলোর পর্য্যায়ক্রম সাজালে বোঝবার সুবিধে হোতো। যেমন ঐতিহাসিক কাল অনুযায়ী কবিতার পর্য্যায় স্থির করলে কবির

চিত্তের বিকাশ-ক্রমকে বোঝবার সহায়তা হয়। অনাথ বাবু অবশ্য বলেছেন, ভারতের সাধক ভক্তদের জীবনকথাকে ভারতবর্ষ কোনদিনই সন তারিখের পর্য্যায়ে ভাগ করে দেখেন নি। দেখেন নি, এ আমাদের পরম দুর্ভাগ্য এবং এই দুর্ভাগ্য হেতুই আজকেও আমাদের অন্ধকারে হাতড়ে মরতে হয় তথ্যের সন্ধানে। কেবলমাত্র সাধকের বাণীই তাঁর জীবনের সমগ্র সাধনার ইতিহাসকে প্রকট করতে পারেনা। সাধকের জীবনের ইতিহাস, তাঁর সামাজিক পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ও সংঘাত ইত্যাদি সকল তথ্যের সাহায্যেই তাঁর সাধনার সত্যিকার মর্ম্মকথা উদ্ঘাটিত হতে পারে। এই কারণে ঐতিহাসিক ও কালগত পর্য্যায়ভাগেরও প্রয়োজন আছে। অনাথ বাবুর সঙ্কলনের ভবিষ্যত সংস্করণে আশা করি এ বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

—রেণু সেন

চিত্তছায়া—শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—ব্রজেন্দ্র মিত্র এণ্ড কোং

বর্ত্তমান জগতের আবর্ত্তসঙ্কুল জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে কাব্যেরও রূপ বদল চলছে, ভাষায়, ভাবে, ছন্দে, বিনা-ছন্দে ও বিভিন্ন প্রকাশবৈচিত্র্যে। আধুনিক কাল তার আধুনিকতার ছাপ রেখে যেতে চায় কাব্যের উপরেও আপন কারিকুরিতে। ফলে স্বদেশে বিদেশে নব নব পন্থা অনুসারী কবিতার সৃষ্টি সুরু হোয়েছে, তার সেগুলো কোনটা বা টিঁকবে কোনটা বা টিঁকবে না কালের মানদণ্ডে। মৈত্রেয়ী দেবীর কবিতায় উগ্র আধুনিকতার গন্ধ নেই, কবিতাগুলি সুমিষ্ট, সরল ও রসে ভরা, ছন্দে সাবলীল ও গীতিমুখর। ছন্দের পরে তাঁর দখল আছে। এই সূর্য্যালোকিত পৃথিবী তার বিনম্র সুন্দর চিত্তের পরে যে ছায়া ফেলেছে কবি তারই গীতে বন্দনামুখর। জানি কাব্য শেষে কবির ছোট্ট নিবেদনে 'সভ্যজগত থেকে বহুদূরে আমার অরণ্যবাস থেকে আজ একবছর ধরে চিত্ত-ছায়াকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি' তাঁর কবিতায় সেই সভ্যজগত হতে সুদূর অরণ্যবাসের ছায়া পড়েছে চিত্তের পরে, বইখানিতে তারই আভাস। বর্ত্তমান জাগতিক কলকোলাহলময় সমস্যা ও সংগ্রাম নয়, শান্ত মধুর বেদনার বিস্ময় ও পরম অনুভূতি এই বিশ্বের চারিদিকে যে 'সুগম্ভীর রহস্য অতুল' তা তাকে বিহ্বল করেছে, প্রকৃতির নব নব আনন্দ ও প্রকাশ কবির মতই তাঁকে স্পর্শ করেছে কিন্তু তিনি মানুষকেও বিস্মৃত হন নি—

"প্রতি মানুষের মুখে যবে চাই মনে হয় যেন আছে
অন্তবিহীন তপস্যা তার অন্তর মাঝে।" (নিবেদন)

কিন্তু ভোরে জাগা ছোট বালিকার মত অপরূপ বিস্ময় তার চোখে তারই পরিচয় যেনো তার কবিতার ছন্দে, সুদূর হতে যেনো একটু স্পর্শ একটু ইঙ্গিতের আভাস আনন্দের দোলা রয়ে রয়ে বলে যায় এই জাগতিক বস্তুতান্ত্রিকতাই সব নয়—

"নিত্য নিত্য
যে অপূর্ব্ব মধুর দোলায়
দুলায়ে দুলায়ে মোরে বাঁধন খোলায়

উতলা শ্রাবণরাতে স্নিগ্ধ মধ্যমাসে
যার তীব্র স্পর্শখানি চিত্তে ভেসে আসে.
উছল উতলরস বেদনা বিধুর
তবু নাহি ধরা যায় তবু সে সুদূর।" (অপরূপ)

প্রতিটি কবিতার বিশ্লেষণের স্থান এ নয়। এতে তার কবি গোলাপের রাগরক্ত ঐশ্বর্য্য না থাকলেও যুঁই ফুলের সুমিষ্ট গন্ধ পাওয়া যায়। এযুগে কোন গ্রন্থ রবীন্দ্রপ্রভাব বিমুক্ত হওয়া অসম্ভব সুতরাং এখানেও তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

—বীণাপাণি রায়

আধুনিক সাহিত্য

অমিতা দেবী

সাহিত্য জীবনের প্রতীক। জীবনে যাহা কিছু আছে সব কিছুরই অবিকৃত প্রতিরূপ সাহিত্যে থাকিবে। দর্পণে যেমন করিয়া বস্তুর ছায়া প্রতিফলিত হয়, সাহিত্য তেমনি করিয়া ধরিয়া দিবে বাহিরের জগত ও জীবনের হুবহু চিত্র। সাহিত্য হইল ব্যক্তি ও সমাজের জীবনের প্রকাশক দর্পণ। ইহারই নাম সাহিত্যের বস্তু-তন্ত্র। আধুনিক যুগের সাহিত্য হইবে বস্তুতান্ত্রিক, ইহা এই যুগের বহু মানবের দাবী। জীবনকে ছাড়িয়া সাহিত্য কেবলি শূন্য আকাশে উড্ডীন হইবে, এমনতর উর্দ্ধমুখীনতা আধুনিক মানব সহ্য করিতে পারে না। কারণ আধুনিক মানুষ বস্তুপরায়ণ এবং সে বস্তুও হইবে স্থুল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, এবং ওজনদার। সেই কারণে সাহিত্য কেবলি শিকড় বিস্তার করিবে মাটীর দিকে, যেমন গাছপালা করিয়া থাকে। গাছের যে আকাশমুখী উর্দ্ধগতি তাহা সাহিত্য বর্জ্জন করিবে এবং অবিরাম একটানা নিম্নগ প্রয়াসে সাহিত্য মাটীর তলের অন্ধকার রাজ্য হইতে সংগ্রহ করিবে তাহার বাঁচিবার প্রাণরস। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য বলিতে অনেকেই আজি এই পৃথিবী-পর সাহিত্যকে বোঝান, যে সাহিত্য কঠিন মাটী এবং তাহার স্থুল ধর্ম্মকে লইয়া কারবার করে।

বিংশ শতকে মানুষের জীবনও যেমন হইয়া উঠিয়াছে স্থুলধর্ম্মা তেমনি সাহিত্যও হইয়া দাঁড়াইয়াছে স্থুল জীবনের আত্যন্তিক ইতিবৃত্ত। মানুষের স্থুলদেহের মোটা মোটা সুখ দুঃখ ও উত্তেজনার কাহিনী, মানুষের রক্ত মাংসে গঠিত স্থুল সত্তার মর্ম্মকথা, ইহাই আজিকার সাহিত্যের বিষয়বস্তু। মানুষ কেবলি দেহ ; মানুষের সকল আত্মবিকাশ ঘটিতেছে এবং ঘটা উচিত, কেবলি দৈহিককে কেন্দ্র করিয়া। মানুষের মধ্যে যে চেতন সত্তা সূক্ষ্ম চিৎলোককে ছাইয়া নিত্য বিরাজমান রহিয়াছে, সেই দেহাতীত উর্দ্ধ লোকের সংবাদ সাহিত্যে আজ পাওয়া যাইবে না, কারণ সেই সূক্ষ্ম লোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আজিকার মানব সংশয়াকুল। মানুষের জীবন যেমন আজ পূর্ণরূপে বহির্ম্মুখী, তেমনি সাহিত্য আজ নিশ্চিতরূপে জড়ধর্ম্মা।

মানুষের পরিপূর্ণ স্বরূপের অংশ হিসাবে দেহ একটা নিঃসন্দেহ সত্য ; দেহকে বাদ দিয়া যেমন মানুষ অসত্য ও অবাস্তব, তেমনি দৈহিক ধর্ম্মকে অস্বীকার করিয়াও মানবধর্ম্ম হইয়া পড়ে অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম। যুগে যুগে মানুষ যখনই দেহকে তুচ্ছ করিয়া বিদেহীকে লইয়া অযৌক্তিক ও মাত্রাহীন মাতামাতি করিয়াছে, তখনই তাহাকে এই একদেশপরায়ণতার জন্য গুরুতর দাম দিয়া তবে ফিরিতে হইয়াছে। দেহ আংশিক সত্য মাত্র, ষোলআনা সত্য নয়, একথাও যাঁহারা ভুলিয়া যান তাহাদেরও এই বিস্মৃতির প্রায়শ্চিত্ত একদিন করিতেই হয়। একদিকে পাল্লা অতিরিক্ত ভারী হইলে, অন্যদিকে ভারপূরণ করিয়া তবে সমীকরণকে সম্ভব করিতে হয়। এই তত্ত্বটীকে ভুলিয়া

গিয়া এক এক যুগ এক এক দিকের পাল্লায় অত্যধিক ভার চাপাইয়া বসে ; ফলে পরের যুগকে ভারসমতা রক্ষা করিতে অপর পাল্লার দিকে অত্যধিক ঝুঁকিতে হয়। যুগে যুগে এই ছন্দেই ইতিহাসের গতি বিচিত্র পথে ক্রমাগত আন্দোলিত হইয়া চলিয়াছে।

বিংশ শতক, বিশেষ করিয়া যুদ্ধের পরের যুগ, মানুষের জীবনে প্রবর্ত্তন করিয়াছে অতি-মাত্রায় দৈহিকতা। সাম্রাজ্যবাদীয় বণিক সভ্যতা অক্টোপাসের মতন মানুষ ও মানুষের জীবনকে জড়াইয়া ধরিয়াছে চারিদিক হইতে; ভোগলোলুপতা মানবমনকে বাঁধিয়াছে দুশ্ছেদ্য বাঁধনে। উপকরণের লোভ দুর্দ্দাম হইয়া উঠিয়াছে এবং চঞ্চল উত্তেজনা মানুষকে ঘোড়দৌড় করাইয়া ছুটাইয়া বেড়াইতেছে পৃথিবীময়। এই ভোগোন্মত্ত চঞ্চলতা সাহিত্যেও বাসা বাঁধিয়াছে এবং আধুনিক, অর্দ্ধ-আধুনিক ও অত্যাধুনিক সকল রকমের সাহিত্যেই এই অস্থিরতাকে সর্ব্বত্র বিকীরণ করিতেছে। কিন্তু চাঞ্চল্যের প্রতিক্রিয়া আছে, সেই প্রতিক্রিয়া আনে অবসাদ ও তামসিকতা। যুদ্ধের পরের সমাজের তাই দেখিতে পাই একটা ঘনায়মান নৈরাশ্য এবং অবসন্ন নিস্তেজতা। সাহিত্যেও প্রকাশ পাইতেছে সেই স্তিমিত অবসাদ ও তামসিক জড়ত্ব। অতিরিক্ত ভোগোন্মাদ মানুষের শক্তিকে করিয়াছে জীর্ণ, কল্পনাকে করিয়াছে ভীরু ও দুর্ব্বল। "সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তি তেজঃ", এই হইলো অত্যধিক চাঞ্চল্যের পরিণাম। আজিকার সাহিত্যে তাই দেখি দুইটী বিপরীত ধর্ম্মের সমাবেশ। একদিকে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে তীক্ষ্ণ চাঞ্চল্য ; অন্যদিকে ঘনাইয়া আসিয়াছে নিদারুণ অবসাদ। অদ্যকার সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে এই চাঞ্চল্য (restlessness) এবং এই অবসাদের (boredom) মর্ম্মান্তিক চিত্র। বণিক সভ্যতা মানবজীবনকে পরিণত করিয়াছে মরুভূমিতে; সেখানে শুষ্কতা ও মরীচিকা দিক্ দিগন্তকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সাহিত্যও তাই আজ আঁকিতেছে "Waste land"এর শ্মশানদৃশ্যের ছবি। যে জগতের বাষ্পহীন, বায়ুহীন, উত্তপ্ত আবহাওয়ায় মানুষের অন্তরাত্মা নিঃশ্বাসপাত করিতে পারিতেছে না, সেই জীর্ণ মৃতপ্রায় জগতের করুণ জীবন-কথা রক্তাক্ষরে ছাপা হইতেছে অত্যাধুনিক সাহিত্যের পাতায় পাতায়। লরেন্স (D. H. Lawrence) ইলিয়ট (T. S. Elliot), হাক্সলি (A. Huxley) প্রমুখ সাহিত্যিক দিক্পালগণ আজ বণিকসভ্যতার মৃত্যুকালীন দীর্ঘশ্বাসকে সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন, করিতেছেন। এই উত্তেজিত চাঞ্চল্য ও স্তিমিত অবসাদের ফলে মনোজগতে যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে সেই ভাঙ্গনের রূপকে ছাঁকিয়া তুলিয়াছেন জয়েস্ (James Joyce) তাঁর বিপুল সাহিত্যে ; যেমন আঁকিয়া ধরিয়াছেন প্রুস্ত্ (Marcel Proust) তার মনোবিকলনমূলক পুঁথির পত্রে পত্রে। আমেরিকার ড্রেসার (Theodore Dreiser), ডস্ প্যাসস্ (Dos Passos), লুই (Sinclair Lewis) ইত্যাদি সকলেই যে জগৎকে লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, সে হইলো বণিক-সভ্যতার 'Waste land', ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও ভোগ-সর্ব্বস্বতা আজ জীবনকে করিয়াছে জর্জ্জর ; ফলে সাহিত্যও হইয়াছে ভোগতান্ত্রিক ; কারণ অদ্যকার সাহিত্য হইল বস্তুতান্ত্রিক। বাস্তবজগত যদি হইয়া থাকে মরুভূমি, তবে সাহিত্যও হইয়াছে মরুভূমির সাহিত্য।

"Here is no water but only rock
Rock and no water and the sandy road......"

সাহিত্য আজ এই হতাশার বাণীকে প্রচার করিতেছে, কারণ জীবন হইয়াছে এই হতাশার শ্মশান।

নূতন সমাজের প্রতীক্ষায় আজ মানুষ ক্লান্ত চক্ষু মেলিয়া বসিয়া আছে। নূতন জীবনের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের স্বপ্ন আজ মানুষ দেখিতেছে এই দিগন্তব্যাপী শ্মশানের মধ্যে বসিয়া। যেদিন সেই নূতন জীবন ও নূতন মানবসমাজ ধরণীতে বিকশিত হইয়া উঠিবে, সেইদিন সাহিত্যও দেখা দিবে নবতর সমৃদ্ধিতে ও নূতনতর পরিপূর্ণতায়। দৈহিকতার আত্যন্তিক মোহকে এবং আত্মিকতার অতিরিক্ত বিমূঢ়তাকে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ সেদিন স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণ মানব ধর্ম্মকে জীবনে বরণ করিবে এবং দেহ ও আত্মা দুইকে নিয়া মানব-সাহিত্য রচনা করিবে বিশালতর পরিপূর্ণতাকে। সেদিন অত্যাধুনিক সাহিত্যের এই একপেশে অন্ধতা ঘুচিবে এবং সাহিত্য কেবলি মাটীতে শিকড় বিস্তার করিবে না, আকাশ পানেও অজস্র ডালপালা ছড়াইয়া সুদূরকে আয়ত্তে আনিবার সাধনা করিবে।

সম্পাদকীয়

আসন্ন সমর ও ভারত

১৮১৪ সন থেকে ১৯১৪ সন পর্য্যন্ত একশ বছর ধরে, ইতিহাস অনিবার্য্য গতিতে দ্রুত পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে আস্‌ছে। এই একশ বছরে য়ুরোপ, তথা, সমস্ত পৃথিবীর পৃষ্ঠপট কল্পনাতীত-রূপে বদলে গেছে। বিপ্লব থেকে বিপ্লবান্তরে জগৎ উত্তীর্ণ হচ্চে এবং আজকার তুনিয়া যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে মানবসভ্যতার সমস্ত ভবিষ্যৎ আশ্চর্য্য রকম ঘোলাটে হয়ে দেখা দিচ্ছে। ১৮১৪ থেকে ১৮৭০ এক যুগান্তর এবং ১৮৭০ থেকে মানব-ইতিহাস যেদিন ১৯১৪ সনে এসে পদার্পণ করলো সেদিন কে জান্‌তো আরো কতো বিচিত্র পথে কতো বিচিত্রতর রূপান্তর প্রতীক্ষা করে আছে। ১৯১৪ থেকে ১৯৩৮ ২৪টা বছরের মধ্যে কী অসম্ভব বিপর্য্যয় না ঘটলো! এবং এই চব্বিশ বছরের শেষের কটা বছর ধরে ইতিহাসের কী বিশৃঙ্খল ও বিপর্য্যস্ত আবর্ত্তনই না চলেছে দিনের পর দিন। য়ুরোপে হিট্‌লারের আবির্ভাব সমস্ত বর্ত্তমানকে ভেঙ্গে চুরে অকথ্য ওলটপালট সৃজন করেছে। রাইন্‌ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, একে একে এই আবির্ভাবের মর্ম্মান্তিক ফল ভোগ করছে। এইবার এলো চেকোশ্লোভাকিয়ার পালা।

গত কয়েক বছর ধরে যে বিপুল আয়োজন চলেছে যুদ্ধের জন্য, যে অসম্ভব গতিতে সকল পক্ষ অস্ত্র শাণিত করছেন দিনের পর দিন, তাতে এই মরণায়োজনের অব্যর্থ ফল একদিন ফলবেই একথা নিশ্চিত। আর সেই সম্ভাবনার ফলবতী হবার ভয়াবহ দিন যে আর বেশী দূর নয়, এ কথাও আজ স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে পারিপার্শ্বিকের নিত্য নূতন আলোকপাতে। কোথায় গেলো যুদ্ধের পরের সেই নবজাত যুদ্ধবিদ্বেষ! কোথায় সেই যুদ্ধ-বিরাগ থেকে জাত ক্ষণিক আদর্শবাদ। ভার্সাই সন্ধি টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে; অশেষ সতর্কতায় ও অনেক চাতুরীর সহযোগে যে জটীল ভারসাম্য ইউরোপীয় রাজনীতিতে গড়ে উঠেছিল, আজ নিত্যনব ঝড়ের আঘাতে সে সাম্যও ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে।

অর্থসঙ্কট চারদিকে ঘনিয়ে এসেছে; আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য খণ্ডিত হয়ে, খর্ব্বিত হয়ে বিলুপ্তির পথে পা বাড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ নিজের চারদিকে মাকড়সার মতন সূক্ষ্ম জাল বুনে বুনে নিজেরই নিষ্কৃতির পথকে রুদ্ধ করে চলেছে; আপন বেগে তার নিজের বিনষ্টির পথ সে সযত্নে তৈরী করে নিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী আত্মকলহ নিশ্চিত বেগে যুদ্ধকে ডেকে আন্‌ছে; আজকেও বিগত দিনের মতো সকল ট্র্যাজেডীর অভিনয় ঘটছে য়ুরোপের লীলাভূমিতে এবং সে শোকাবহ অভিনয়ে অনিচ্ছায় অংশ নিতে বাধ্য হচ্চে জগতের অন্যান্য রাজ্য ও শক্তিগুলো। য়ুরোপ তুটো বিরোধী

সমবায়ে বিভক্ত হয়ে পরস্পরকে আঘাত করবার জন্য সাজসজ্জা করছে, আর, নির্ব্বিরোধী জনসাধারণ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে দেখছে এই আসন্ন প্রলয়ের আয়োজন। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে সভ্য মানবজাতি দিন গুনছে, কবে আস্‌বে সেই চরম ক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে ভারতবর্ষ কী করবে ?

পৃথিবীর এমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্যের সঙ্গে আজ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে জড়িত। সমস্ত য়ুরোপের তন্তুজালের মধ্যে ভারতবর্ষ আটকে পড়েছে, কারণ ব্রিটিশ রাজনীতির সূত্রের পিছনে ভারতেরও ঘরে বাইরের সকল নীতি বাধা আছে। অদ্যকার বিরোধে যে শক্তি বিজয়ী হবে তারই ওপরে নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ ভারতের কল্যাণ অকল্যাণ। রোম-বার্লিন যূথ যদি আজ ফরাসী-সোভিয়েট-চেক সমবায়কে পরাজিত করে, তবে গণতন্ত্রের হবে পরাভব এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের বর্ত্তমান গদীয়ান দল প্রবল হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল এক অসহ্য শাসন-ব্যবস্থাকে কায়েম করবে এই ভারতে। চেম্বারলেন-হ্যালিফক্স শাসন কার্য্যতঃ ও ভাবতঃ বার্লিনের সহায়ক ও সমধর্ম্মা। বার্লিনের বিজয়ে প্রতিক্রিয়া হবে বিজয়ী এবং ভারতের গণশক্তির গলায় পড়বে নব নব অত্যাচারের ফাঁস। যে নতুন চেতনার উদ্বোধন ঘটেছে মূক ও মৃতপ্রায় জনশক্তির মধ্যে, তাকে হত্যা করা হবে বিষ-বাষ্পে,—গ্যাসে, গুলিতে এবং ট্যাঙ্কের প্রভাবে। বহু কষ্টে, বহুকালের চেষ্টায় গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি যে সমবায় ও মৈত্রী গড়ে তুলেছিল গত কয়েক বৎসরের মধ্যে, তার ভেতরে আজকে হিট্‌লারের করাল ছায়া পড়েছে এবং সে সমবায়ে আজকে অগণিত ফাটল ধরেছে। অবস্থাবিপর্য্যয়ে আজ ফরাসী অসহায় ও বিভ্রান্ত ; একদিকে ইংলণ্ডের চঞ্চল-চিত্ত স্বার্থপরায়ণতা, অপর দিকে বার্লিন-রোমের ক্রমবর্দ্ধমান প্রাবল্য ও একক সোভিয়েট রাশিয়ার অনিশ্চিত সমর-সামর্থ্য এই তুইয়ের মধ্যে পড়ে ফরাসী অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়ে উঠেছে এবং অবস্থার নাগপাশে বদ্ধ হয়ে তার রাজনীতিতেও মারাত্মক দৌর্ব্বল্য ঢুকেছে।

গত তুতিন বছরের মধ্যে হিট্‌লার ইউরোপের ভারসাম্যকে উল্‌টে পাল্‌টে নতুন করে গড়েছে ; আজকে ১৯৩৮ সনে কোথাকার জল এসে কোথায় দাঁড়িয়েছে তা' হিসেব করলে বিস্ময় লাগবে। চেক রাজ্যকে স্বাতন্ত্র্য সহ বাঁচতে দিলে "তৃতীয় রাইখের" ভবিষ্যৎ মরণের বীজ হয়তো গোপনে এখানে বাড়তে পারে ; এই সম্ভাবনাকে সমূলে নষ্ট করবার প্রয়োজন বার্লিনের আছে। সুবিধে হয়েছে এই যে বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া অঞ্চলে জার্ম্মাণ লোকসংখ্যা অত্যধিক। সমস্ত চেক রাজ্যে শতকরা বাইশ তেইশ জন জার্ম্মাণ রয়েছে। কাজেই এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে এবং সমস্ত সভ্য শক্তিগুলির যুদ্ধভীতির সুবিধে গ্রহণ ক'রে হিটলার এমন একটা আবহাওয়ার চাল সৃষ্টি করেছে যে চেক ও তথা ফরাসী আজ সংশয়ে ও তুর্ব্বলতায় টলমল করছে। এই বিপর্য্যয়ের মৌলিক কারণ হলো ব্রিটিশ স্বার্থান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা। চেম্বারলেন মন্ত্রীসভা গোপনে গোপনে হিট্‌লারের সমর্থক ও সকল রকমের গণতান্ত্রিক শক্তিবৃদ্ধির বিরোধী। বার্লিনের শক্তিবৃদ্ধি ঘট্‌লে গণশক্তি বা গণবিদ্রোহ মাথা তুলতে পারবে না কোথাও ; তাছাড়া মুসোলিনীর অত্যধিক প্রাবল্যের একটা বড়ো রকমের প্রতিদ্বন্দ্বীও য়ুরোপে দাঁড়ায় যাতে য়ুরোপের শক্তিসাম্য পছন্দমত রূপ নেবে এবং,

ভারত সাম্রাজ্যের পথে রোমের একছত্র আধিপত্যও অনেকখানি খর্ব্ব হবে। ভারত সাম্রাজ্যকে বাঁচাবার জন্য এবং জগতে গণবিদ্রোহকে দাবিয়ে রাখবার জন্য, এই দুই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই রোম-বার্লিনের সঙ্গে মিতালী চেম্বারলেন কোম্পানীর প্রয়োজন। কিন্তু ফরাসীর সঙ্গে যে প্রেম তাকেও বিসর্জ্জন দেওয়া চলে না। রোম-বার্লিনের অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটলে পাল্লা একদিকে ভারি হয়ে যায়; অতএব ফরাসী-সোভিয়েট পক্ষেও কিছুটা ভারবৃদ্ধির দরকার আছে। ইংলণ্ড ফরাসীকে সমর্থন করে সেই ভারবৃদ্ধির সহায়তা করছে। ইংলণ্ডের এই দুমুখো নীতি তার পররাষ্ট্রনীতিতে আন্তরিকতার অভাবকেই সূচিত করে। এখানে কোনো আদর্শ বা out look এর বালাই নেই; আছে কেবল স্বার্থান্ধ, সংকীর্ণ দৃষ্টি এবং অবস্থার হীন দাসত্ব বা opportunism. ফলে সমস্ত য়ুরোপীয় রাষ্ট্রনীতিতে কোন বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যময় স্থিতিশীলতা গড়ে উঠতে পারেনি। এর জন্যে ইংলণ্ডের স্বার্থবুদ্ধি সর্ব্বাংশে দায়ী।

সুদেতেন জার্ম্মাণ দলের নেতা হেনলাইনের ২৩শে এপ্রিলের কার্লস্‌বাদ দাবীগুলির আটটী দফা যাতে চেক সরকার গ্রহণ করে তার জন্য আগষ্ট মাসে রান্‌সিমানের প্রাণপণ চেষ্টা চল্‌তে থাকে। ইংলণ্ডের চাপে প'ড়ে ডাঃ বেনেস বাধ্য হয়ে রাণসিমানের দাবী মেনে নেন; কিন্তু ইতিমধ্যে কতকগুলো দুর্ঘটনা ঘটার জন্য সুদেতেন নেতারা বেঁকে বসলেন যে এই ব্যাপারের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কোনো আপোষের কথাবার্ত্তা চলতে পারবে না। চেক সরকারের দৌর্ব্বল্যের সুযোগ এবং ইংলণ্ডের সমর্থন পেয়ে সুদেতেনদের দাবীর মাত্রা দিনে দিনেই চড়ে যেতে থাকলো। ১২ই সেপ্টেম্বরের নূরেমবার্গ বক্তৃতায় হিট্‌লার দাবী আরো বাড়িয়ে দিলেন এবং জার্ম্মাণীর আসল মতলব ব্যক্ত করলেন। সুদেতেন অঞ্চলকে একেবারে স্বাধীন করে দিতে হবে এবং চেক রাষ্ট্রকে জার্ম্মাণীর কবলে ছেড়ে দিতে হবে। এই ঘোষণার ফলে সুদেতেন অঞ্চলে চাঞ্চল্য, উত্তেজনা ও দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর হেনলাইন হিট্‌লারের দাবীর প্রতিধ্বনি ক'রে ইস্তাহার জারী করেন। ইতিমধ্যে জার্ম্মাণীতে সমরসজ্জা ও সৈন্য সমাবেশ সুরু হয়ে যায় এবং চারদিকে আতঙ্কের ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। চেম্বারলেন স্বয়ং দৌড়াদৌড়ি করেও হিট্‌লারের চড়া সুরকে নামাতে পারলেন না; বরং ফিরে এসে চেক রাজ্যকে বার্লিনের গ্রাসে সঁপে দিয়ে য়ুরোপে কবরের শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এদিকে মুসোলিনীও হুমকী চালালেন জার্ম্মাণীকে সাহায্য করবেন বলে। দালাদিয়ের এবং বনেটকে ডেকে চেম্বারলেন এক রকম ভয় দেখিয়ে রাজী করালেন চেক রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ সাধনে; হিট্‌লারের হাতে চেক রাজ্য না দিলে ইউরোপে শান্তি হবে না। ফরাসী এই ষড়যন্ত্রে বাধ্য হয়ে রাজী হলো এবং ১৮ই সেপ্টেম্বরের লজ্জাকর ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব চেক রাষ্ট্রের কাছে উপস্থিত করা হলো। এই প্রস্তাব অনুযায়ী যে সব জায়গায় অর্দ্ধেকের বেশী লোক সুদেতেন জার্ম্মাণ সেই সব স্থান বিনা সর্ত্তে ছেড়ে দিতে হবে এবং দরকার মতন চৌহদ্দী নির্দ্দেশ করা হবে আন্তর্জ্জাতিক কমিশনের সাহায্যে। সুবিধে মতন জার্ম্মাণ বা চেক জাতীয় লোকদের অভিরুচি অনুযায়ী তাদের বাসস্থান পছন্দ করে নিতে দেওয়াও হবে। পরিবর্ত্তে চেক রাজ্যকে

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হবে। চেকোশ্লোভাকিয়া যদি আত্মবলি দিতে রাজী হয়, তবে সবাই মিলে তাকে এই মহৎ ত্যাগের জন্য আশীর্ব্বাদ ও আশ্বাস দান ক'রে ঔদার্য্য এবং নীতিপরায়ণতার একটা বড়ো রকমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে; এতে আশ্চর্য্য কিছু নেই; কারণ ইংলণ্ডের যা' কিছু কর্ম্ম বা অকর্ম্ম সবই "জগদ্ধিতায়" অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এ কথা কে না জানে?

চেক রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ ঘটবে যদি ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাবকে স্বীকার করতে হয়। রাষ্ট্র হিসেবে তার স্বতন্ত্র শক্তি, এমনকি সত্যিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত, লুপ্ত হয়ে যাবে। তবু এই সর্ব্বনাশকে স্বীকার করে নিয়েই চেক সরকার এই প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। বেচারা চেকোশ্লোভাকিয়া! আরো যে সর্ব্বনাশ তার করা হবে না, এই ভূয়া আশ্বাসেই সে খুশী; কিন্তু এতেও নিস্তার নেই; ২৩শে সেপ্টেম্বর হিট্‌লার আবার এক নতুন দাবীপত্র পাঠিয়েছে চেম্বারলেনের মারফত চেক রাষ্ট্রের কাছে। কতকগুলো নির্দ্দিষ্ট স্থান থেকে সমস্ত চেক সৈন্য, পুলিশ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সরিয়ে আনতে হবে এবং ঐসব অঞ্চল ১লা অক্টোবরের মধ্যে বর্ত্তমান সামরিক ও আর্থিক ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখে জার্ম্মানীর হাতে তুলে দিতে হবে। এর ওপরে আরো কতকগুলো অঞ্চলে শীগগীরই মত সংগ্রহ করা হবে (plebiscite) ঐস্থানের অধিবাসীরা, চেক বা জার্ম্মান, কোন শাসনের অধীনে বাস করতে চায়। এমনি করে পর্দ্দার পর পর্দ্দা কেবল দাবী বেড়েই যাচ্ছে, বুভুক্ষার উপশম হবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তবে এবারকার মতো সম্প্রতি আগুন জ্বল্‌বে না হয়তো, কারণ হিটলার, মুসোলিনী, দালাদিয়ের এবং চেম্বারলেন এই চার মহারথী আবার একটা আপোষের কথাবার্ত্তা সম্প্রতি শেষ করেছে মিউনিকে (Munich)। কথাবার্ত্তার ফলে হয়তো বা কিছুদিনের জন্যে আগুন স্তিমিত হয়ে থাকলো; হয়তো বা নিজের সর্ব্বস্ব হারিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া শুধু একটা ছায়াময় অস্তিত্ব বজায় রেখে এবারকার মতো বিস্ফোরণকে কিছুদিনের জন্য পিছিয়ে দিতে পারলো। কিন্তু আগ্নেয়গিরির নীচে যে আলোড়ন চলেছে, তাতে আজ হোক, কাল হোক একদিন আকস্মিক বিস্ফোরণে—প্রলয় নেবে আসবেই আস্‌বে। এবং সে প্রলয় জন্ম নেবে সাম্রাজ্যবাদী বুভুক্ষার ভেতর থেকে একথাও নিশ্চিত। জার্ম্মানীর প্রাচ্যাভিযান (Drang Nach Osten) একদিন পা বাড়াবে রাশিয়ার অভিমুখে এবং সেই অভিযান থেকেই যে ভবিষ্যৎ সঙ্কট পৃথিবীতে নেবে আস্‌বে না, তাও কেউ বলতে পারে না।

আজকে ভারতবর্ষের সামনে দুর্ভেদ্য সমস্যা। মহাত্মা গান্ধীর মতানুযায়ী একেবারে নিরপেক্ষ থাকাও যেমন তার পক্ষে সম্ভব হবে না, তেমনি পণ্ডিত জওহরলালের ইচ্ছানুসারে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে ফাসিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য করাও হবে নানা জটীল অবস্থাকে ডেকে আনা। ইংলণ্ড যদি ফ্যাসিস্ত সমবায়ের সহায়তা করে তবে ভারতের সম্মুখে যে সমস্যা আস্‌বে তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন করে দেশে আবার একটা বিপ্লবাত্মক কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করবার প্রয়োজন ঘটতে পারে; কংগ্রেসকে এখন থেকেই পথের কথা ভেবে রাখতে হবে। কেবল মুখের সহানুভূতি দেখিয়ে চুপ করে

দ্রষ্টা হয়ে বসে থাকা সহজ কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিস্ফোরণকে ভারতের স্বরাজ উদ্ধারের কাজে লাগাতে হ'লে তার জন্য সুনিশ্চিত কর্ম্মপন্থা বা প্রোগ্রাম তৈরী করা চাই। সব কূল রক্ষা কর্ব্বার উদ্দেশ্যে কতকগুলো অস্পষ্ট কথার ধোঁয়া সৃষ্টি করবার কৌশল কংগ্রেসের জানা আছে। অদ্যকার সঙ্কটের মুহূর্ত্তে কংগ্রেসকে সাহসিক ও সবল নীতির পরে দাঁড়িয়ে দেশবাসীকে আহ্বান করতে হবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

জাতীয়তা, না প্রাদেশিকতা?

আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে সংঘর্ষের আর অন্ত নাই। ঘরে বাইরে অজস্র বিরোধ আমাদের জীবনের সকল প্রগতিকে ম্রিয়মান করে রেখেছে। সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একমুখী কোরে আমরা সংহত মহিমায় অত্মপ্রকাশ কোরবো, এমন সম্ভাবনা আজো সুদূরাৎ সুদূর বলে মনে হচ্চে। আজ অর্দ্ধশতাব্দি যাবৎ কংগ্রেস একজাতীয়তার আদর্শ প্রচার করছে; কিন্তু আজো আমাদের জাতীয়তাবোধ নানা খণ্ডিত চেতনা ও গণ্ডীবদ্ধ সংকীর্ণতা দ্বারা ব্যাহত হচ্ছে। প্রাদেশিক স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা আজো আমাদের জাতীয় সংগ্রাম জর্জ্জরিত; তাই সমস্ত উদার আদর্শপরায়ণতার অন্তরাল থেকে মুহুর্মুহু উকি দিচ্ছে "খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারতের" শোচনীয়, কলহ-জীর্ণ মূর্ত্তি। গত কয়েক বছর যাবৎ রকম-বেরকমের অন্তর্বিরোধ দিনে দিনে প্রবলতর আকার ধারণ করেছে এবং ইদানীন্তন এই বিচ্ছিন্নতা অতিমাত্রায় লজ্জাকর পরিণতি লাভ করেছে।

সবাই জানে, সাম্রাজ্যবাদ সর্ব্বত্র নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে ভেদনীতির সাহায্যে। ১৯শ শতকে যে সাম্রাজ্যবাদের অভিযান সুরু হয়েছিল পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে, তার বজ্রমুষ্ঠিতে আজ ধরা পড়েছে এসিয়া ও আফ্রিকার বিস্তৃত রাজ্যগুলি। এইবজ্রমুষ্ঠিকে চিরস্থায়ী করবার জন্য সাম্রাজ্যবাদ সর্ব্বত্র বপন করেছে বিষাক্ত ভেদবুদ্ধিকে। মানুষের শুভ সম্বিৎ ও ঐক্যবুদ্ধিকে বিনষ্ট করবার কূট কৌশলই হোলো সাম্রাজ্যবাদের মারণ অস্ত্র। এই অস্ত্রকে আজ বিংশ শতকে প্রয়োগ করা হচ্ছে আরো গভীরতর কুটিলতায় ও সূক্ষ্মতর ক্রূরতায়। আয়ার্ল্যাণ্ড, প্যালেষ্টাইন, ভারতবর্ষ সর্ব্বত্র এই একই অস্ত্রের বিভিন্নতর প্রয়োগ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতবর্ষে নতুন শাসনতন্ত্র সাম্রজ্যবাদীয় কূট কৌশলের অভিনব দৃষ্টান্ত। অতি সূক্ষ্ম জাল বিস্তার ক'রে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের জন্য এক ভয়াবহ ফাঁদ পেতেছে আর বিশ্বাসী ভারতবর্ষ অসন্দিগ্ধ চিত্তে এই ফাঁদে পা বাড়িয়েছে। একদিকে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ এবং অন্যদিকে বর্ণহিন্দু-তপসীলি হিন্দু বিরোধ হোলো এই সাম্রাজ্যবাদী, ভেদনীতিপর কূট কৌশলের প্রত্যক্ষ ফল। নতুন শাসনতন্ত্রের ফাঁদে পা দিতে গিয়ে আমরা আজ এই ভেদ-বিচ্ছেদের দুশ্ছেদ্য জালে আটকে গেছি। এর ওপরে আবার 'Provincial autonomy'র নতুন মোহে আমাদের শুভবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে এমন আত্মহারা করে দিয়েছে যে আমরা অতি সহজেই পরস্পরকে আঘাত হান্‌তে আরম্ভ করেছি।

আমাদের এ চেতনা হয়নি যে এ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে এক নূতন 'apple of discord' আমাদের সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলে আমাদের বৃহৎ ঐক্যকে পণ্ড কোরবার এ এক সূক্ষ্মতর ভেদ-নীতি ; এ কথা আমরা ভুলে গেছি ; তার ফলে আজ আমাদের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, প্রাদেশিক সংঘাতের অন্ত নেই। বাঙ্গালী-বিহারী, বাঙ্গালী-আসামী, বাঙ্গালী-উড়িয়া, হিন্দী-মারাঠী, অন্ধ্-তামিল,—ইত্যাদি বহু বিচিত্র সমস্যা আমাদের পথকে কণ্টকিত করে তুলেছে। এ সকল সমস্যার গোড়ার তত্ত্বকে না ধরতে পারলে ভারতবর্ষের জাতীয়তা কোন দিন মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করবে না।

ইদানীন্তন বাঙ্গালী-বিহারী প্রশ্ন অতি তীব্র আকারে দেশের সন্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের আজকালকার সমস্যাগুলির মধ্যে এই সমস্যা আজ এক জটিলতম সমস্যা হিসাবে আলোড়িত করছে। এর সমাধানের সর্ব্বভারতীয় প্রভাব বহু-বিস্তৃত ভাবে জাতীয় জীবনকে আঘাত করবে, এ কথা নিশ্চিত। কিছুদিন আগে পি, আর, দাশ মহাশয়ের বিবৃতি, বিহার সরকারের ও শ্রীযুক্ত সচ্ছিদানন্দ সিংহের বিঘোষণা বিহারী-বাঙ্গালী সমস্যার সকল দিক্‌কে প্রকট করেছে। বিহার আর বাংলার আওতায় থক্‌তে চায় না ; বিহার কেবল বিহারীদেরই দেশ এবং সেখানে বাঙ্গালীকে প্রভাবশালী হতে দেওয়া হবে না। এই মনোভাবের পীড়নে আজ বিহারী বাঙ্গালীর ওপরে সন্দিগ্ধ ও অমিত্রভাবাপন্ন হয়ে উঠ্‌ছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখলে দেখ্‌তে পাই যে অতি প্রাচীন যুগ থেকে বিহারী-বাঙ্গালীর সহযোগীতা এই দুই প্রদেশকে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। হিন্দুযুগে ও বৌদ্ধযুগে বিহার ও ও বাংলার স্বাতন্ত্র্যের ছেদরেখা মিলিয়ে গেছিল ব্যাপক ঐক্যে ; মুসলমান যুগে পর্য্যন্ত শাসনে, সংগঠনে, সংস্কৃতিতে বাংলা ও বিহার একই গ্রন্থিতে গাঁথা। ১৭৬৫ সালে ১২ই আগষ্ট ক্লাইভ একই সঙ্গে বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর ফর্ম্মান পেয়েছিলেন শাহ আলম থেকে। ইংরেজ আমলেও ১৯১২ সন পর্য্যন্ত প্রায় দেড়শ বছর বিহার-বাঙ্গলা একই শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত হয়ে সহযোগিতা করেছে। ১৯১১ সনের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের দিল্লীর দরবারে ঘোষণার ফলে ১৯১২ সনের ৩০শে মার্চ্চ থেকে বিহার সর্ব্বপ্রথম বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ রূপে জন্মগ্রহণ করলো। সেই থেকে বাংলার প্রতি সন্দেহ ও বিমূখতার আবহাওয়া বিহারে সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই আবহাওয়াও বিহার ও বাংলার মধ্যে বিভিন্ন া সৃষ্টি করলেও বিচ্ছেদ সৃজন করতে পারেনি। আজকে তথা-কথিত এই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন এই বিচ্ছেদকে সমারোহ করে ডেকে আনছে এবং ২৫ বছরের মধ্যে আজ প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধি যে উৎকট হয়ে জেগে উঠেছে তার সমস্ত কৃতিত্ব হোলো সাম্রাজ্য-বাদীয় নতুন শাসনব্যবস্থার।

আজকে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাও প্রাদেশিকতার জয়গান শুরু করেছেন। এদিকে কংগ্রেসের চির-বিঘোষিত আদর্শ হলো প্রাদেশিকতার উর্দ্ধলোকে এক অখণ্ড ও অবিচ্ছিন্ন ভারত-বর্ষকে গঠন করা। প্রাদেশিক বুদ্ধিকে পরাজিত না করলে সেই অখণ্ড ভারত চিরকাল সকল

সম্ভাব্যতার বাইরে থেকে যাবে। শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ মহাশয় এই সরল ও প্রবল তত্ত্বটীর প্রতি আঙ্গুলিনির্দ্দেশ করে জাতীয়তাবাদের মুল তথ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। "......We must break through the provincial crust if we are to reach the crust of all India nationalism. Is India one country and one nation or many countries and many nation's ?"—মহাত্মা গান্ধীর এই উক্তিটীর মধ্যেই সর্ব্বভারতীয় জাতীয়ত্বের মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে। ১৮৪৫ সনের প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেণ্টের ঘোষণা, ১৯১৯ সনে অমৃতসর কংগ্রেসের প্রস্তাব, করাচী কংগ্রেসের বিঘোষণা, এবং ১৯৩১ সনে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির বোম্বাই অধিবেশনের ঘোষণা,—সর্ব্বত্রই কংগ্রেসের একভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির নিঃসন্দেহ ও প্রবল পরিচয় রয়েছে। অথচ বিহার সরকারের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট সম্বন্ধীয় নীতি এবং বিশেষ কোরে ১৯৩৮ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারীর Brett Circular এই একভারতীয়ত্বের মূলে কুঠারাঘাত করছে।

এই প্রসঙ্গে বিহার সরকার যে নূতন শাসনতন্ত্রের ২৯৮ ধারার, Schedule VII এবং কংগ্রেসের করাচী প্রস্তাব ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখার অবতারণা করেছেন, তাতে প্রাদেশিক সংকীর্ণ বুদ্ধিকে কুতর্কের ঝড় তুলে ঢাকা দেবার মনোবৃত্তিই প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষতঃ অন্যান্য প্রদেশ ও বিশেষ কোরে বাংলাদেশের নজীর তুলে আত্মপ্রথা সমর্থনের চেষ্টা হাস্যকর। বাংলায় অকংগ্রেসী মন্ত্রীরা যেহেতু ডোমিসাইল আইন রেখেছে, সেই হেতু বিহারের কংগ্রেসীরাও একে বজায় রাখ্‌বে এযুক্তি গ্রাহ্য কর্ব্বার যোগ্য নয়। তারপরে "Eligibility" ও "Preference" এই দুটী শব্দকে নিয়ে বাগ্‌বিস্তার ও অর্থের চাতুরী দেখানো নিছক চূণকাম কর্ব্বার প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই নয়। "Eligibility for a post is one thing and the preference given to a cadidate for any particular post is quite a different thing." এঁরা বলতে চান যে কংগ্রেসের করাচী বোম্বাই প্রস্তাব জাতি-শ্রেণী নির্ব্বিশেষে সবাইকে নির্ব্বাচনযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে কিন্তু নির্ব্বাচনযোগ্যদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব করবার অধিকার কংগ্রেস ক্ষুণ্ণ করেননি। এই পক্ষপাতিত্ব করবার লোভ এদের উদার চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে বলে এরা এক ভারতীয়ত্বের আদর্শকে জলাঞ্জলি দিতেও আপত্তি করছেন না। যে ঐক্য-বুদ্ধি থেকে শ্রীযুক্ত পি, আর, দাশ বলেছেন, "...I do not think that you can possibly decide in favour of policy of provincialism which, as has often been pointed out, is worse than communalism..." একে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষে দেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে ; তার ওপরে এই প্রাদেশিকতার বিষ যারা আজ ছড়াচ্ছেন, আইনের কুব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এবং "preference"এর অধিকারের দোহাই দিয়ে, তারা ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় করে তুলছেন।

যে মনোবৃত্তি থেকে একদিন "Jewish pogrom"এর উদ্ভব হয়েছিল, যে মনোবৃত্তি আজ পৃথিবীময় ইহুদী-বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এবং আর্য্যজাতির পক্ষপাতিত্বের উগ্র সুর তুলেছে, যে মনোবৃত্তি

আজ নিগ্রো lynchingএর জন্য দায়ী, যে মনোবৃত্তি একদিন নারীজাতিকে অবজ্ঞা ক'রে পুরুষের প্রতি preferenceএর অধিকার দাবী করেছে, সেই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিরই অপর মূর্ত্তি হলো আজকের এই প্রাদেশিক preferenceএর সংকীর্ণ অধিকারের দাবী। এমন দিন দ্রুতগতিতে পৃথিবীতে, তথা ভারতবর্ষে আস্ছে, যেদিন এই সংকীর্ণ মনোভাব অচল হয়ে যাবে। অদ্যকার জটীল জগতে কেন্দ্রীভূত ও ঐক্য-বদ্ধ শাসনতন্ত্র ব্যতীত ভারতবর্ষের বাঁচবার পথ নেই। সেই অখণ্ড ভারতবর্ষকে সংগঠন করতে হলে প্রাদেশিক মনোবৃত্তিকে খর্ব্ব করতেই হবে।

•

রাজনৈতিক বন্দী ও সরকারী ইস্তাহার

প্রায় দেড় বৎসর আগে গান্ধীজীর সঙ্গে হক সরকারের যে দীর্ঘায়িত আলোচনা শুরু হয়েছিল, তার উপর অবশেষে যবনিকাপাত হয়েছে। এই দীর্ঘদিনের নিষ্ফল কথাবার্ত্তার ক্ষান্তি ঘটেছে গত ২৫শে সেপ্টেম্বরের সরকারী ইস্তাহারের প্রকাশে। আমরা হক সরকারের শোচনীয় মনোভাব ও দুর্ব্বল ভীরুত্বে কথা বরাবরই জানতাম; কাজেই এই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভার কাছে কোনো সম্মানজনক সমাধানেরই প্রত্যাশা রাখিনি। গত ১৯৩৭ সনের এপ্রিল থেকে হক-নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভার বহ্বারম্ভ যখন বাগাড়ম্বরের ধূলিজালে বাংলাদেশের আকাশকে ছেয়ে ফেলেছিল, তখনই আমরা নিশ্চিত আশঙ্কা করেছিলাম যে এ বহ্বারম্ভ লঘুক্রিয়ায় পর্য্যবসিত হবেই হবে। তবু গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের যাদু এবং তাঁর উদার আবেদনের প্রভাব এই তথাকথিত popular মন্ত্রীদের সামান্য একটু সহানুভূতির ঢেউও তুলতে পারে কিনা তা দেখবার জন্য কৌতূহলী হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। এ ছাড়াও হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত এই বিরাট দেশের বিপুল জনসঙ্ঘ যে তীব্র দাবী দিনের পর দিন উত্থাপন করেছে, সেই দাবীকে চক্ষু বুজে অগ্রাহ্য করবার মত মূঢ়তা কোনো ভারতীয় মন্ত্রীসভার থাক্‌তে পারে কিনা, তাহা পরখ করে দেখবার কুতূহলও আমাদের ছিল। তারপরে গান্ধীজী অত্যধিক উদারতায় যে সকল রকমের আন্দোলনকে স্থগিত রেখেছিলেন; তার মর্য্যাদাও রক্ষা করবার মতন সুবিবেচনা ও ঔদার্য্য এদের নেই। যে মন্ত্রীসভার সমস্ত সত্ত্বা ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের মায়ায় প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, তার কাছে কোনো রকমের মানবতা ও হৃদয়বত্তার আশা করা দেশবাসীর একান্ত অর্ব্বাচীনতা হয়েছে সন্দেহ নেই। একটী বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্বের আবেদন, একটা সমগ্র জাতির অসঙ্কোচ দাবী এবং প্রতিপক্ষের ঔদার্য্য,—এ সমস্তই এই সরকারী হৃদয় হীনতায় ঠেকে বিফল হয়ে গেল। গান্ধীজীর ও রাষ্ট্রপতির বারবার আলোচনা ও পত্রের আদান প্রদান সবই বৃথা হয়েছে, কিন্তু সরকার পক্ষের জিদ্ ও আত্মম্ভরিতা অটুট রয়েছে। গুরুতর অসুস্থদের শীগগীর ছাড়া হবে; ১৮ মাস সাজা খাটবার বাকী আছে যাদের তারা গুরুতর অপরাধী না হলে তাদেরকেও ছাড়া হবে। কিন্তু কোন্ তারিখে, কতদিনের মধ্যে ছাড়া হবে, তার কোন নির্দ্দেশই ইস্তাহারে নেই। "forthwith" এবং "as soon as possible" ইত্যাদি অস্পষ্ট ভাষার সাহায্যে ছাড়বার সময় সম্বন্ধে অনির্দ্দেশ্যতাকে বজায় রাখা হয়েছে। আর ১৮ মাসের

বেশী যাদের বাকী আছে, তাদেরকে একটা Advisory কমিটীর পরামর্শ অনুসারে যাকে যখন সমীচীন মনে হবে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই পরামর্শ কমিটীর ৯জন সভ্য থাক্‌বে যার মধ্যে কংগ্রেসদল, কোয়ালিশন দল, য়ুরাপীয়ান দল, তপশীলী দল, লিবারেল দল, ইত্যাদি সব দলেরই লোক থাক্‌বে। তারপরে সরকারের নীতি সম্বন্ধে ইস্তাহারে সেই সব মামুলী কথার চর্ব্বিতচর্ব্বণ করা হয়েছে যে কথা হাজারবার পুনরুক্ত হয়েছে হাজার রকম উপলক্ষে। বিনা বিচারে আটক রাখার সমর্থনে 'Emergency'র দোহাই পাড়া হয়েছে; আদালতে শাস্তিপ্রাপ্তদের না ছাড়বার পক্ষে নজীর দেখান হয়েছে রামদাস পণ্টলু এবং পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর উক্তি থেকে। এরা হিংসামূলক অপরাধে অপরাধীদের ছাড়বার বিরোধী। তাছাড়া রাজনৈতিক কয়েদীরা "ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ"কে ছেড়েছে কিন্তু তাদের অনুতাপ দেখা যাচ্ছে না। "Prerogative of mercy" সহজে কাজে লাগানো উচিত হবে না, বিশেষতঃ এতে কোনো বিশেষ দলের সুবিধে হয়ে যাবে বলে এদের ছেড়ে দেওয়া আরো অনুচিত। সম্ভবতঃ কংগ্রেসী দলের কথাই এখানে বলা হয়েছে।

এমনি অর্থহীন কথার জাল বুনে বুনে সরকারী হৃদয়হীনতা ও আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তিকে ঢাকবার চেষ্টা ইস্তাহারের ছত্রে ছত্রে রয়েছে। Emergency কাকে বলে, কখন উদ্ভব হয়, কতোদিন পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে, ইত্যাদি প্রশ্ন সুবিধা মতন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অথচ সমস্ত রাজনৈতিক অবস্থার ও চিন্তাভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও Emergency দূর হলো না। নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন উপলক্ষে ঢাক ঢোল বাজিয়ে শান্তির বাণী প্রচার করা হয়েছে এবং নবযুগের আগমনী গান গাওয়া হয়েছে; অথচ Emergency নামক বিপজ্জনক অবস্থাটী আর কাটে না। আমাদের হতভাগ্য দেশে সরকারী দৃষ্টিতে Emergency হয়ে দাঁড়িয়েছে এক চিরন্তন বিপদ। তারপর রামদাস পণ্টলু এবং হৃদয়নাথ কুঞ্জরু নামক ব্যক্তিদ্বয় কি বলেছেন তাতে আমাদের popular মন্ত্রীসভা উচ্ছ্বসিত সমর্থন দিচ্ছেন কিন্তু দেশের হাজার হাজার চিন্তানায়ক ও কর্ম্মীরা এবং কোটী কোটী জনসাধারণ যে এদের মুক্তি দাবী করেছে, সেই অসুবিধাজনক অপ্রিয় কথাটীর কোনো উল্লেখই নেই। অনুতাপের প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, কারণ এ প্রশ্ন একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক মতামতের দ্বারাই রাজনৈতিক কর্ম্মীদের বিচার হয়ে থাকে; "ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ"কে যদি কোন কর্ম্মী বর্জ্জন করে থাকে তবে তাঁর মতামত ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কোনোই সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অথচ তবুও 'repentence'এর দাবী করে সরকার যে কেন এত বাড়াবাড়ি করেছেন, তা বোঝা দুষ্কর। সরকার যে পদ্ধতিতে ছাড়বার প্রস্তাব করেছেন, তাকে দেশবাসী কোনো দিনই সমর্থন করতে পারবে না। ব্যক্তিগতভাবে যাকে যাকে সমীচীন মনে করা হবে তাকে ছাড়া হবে; এই নীতি অতিমাত্রায় ভীরু ও এর পেছনে কোন বলিষ্ঠ পরিকল্পনাই নেই। পৃথিবীর রাজনৈতিক মহলে চিরকালের রীতি হল এই যে রাজনৈতিক জীবনের গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটলে বা নতুন কোন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হলে রাজনৈতিক কয়েদীদের মতামত-

ব্রিটিশ সরকার অবিশ্রান্ত ঢক্কানিনাদ করেছেন। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ৮টী প্রদেশে শাসনভার বাহ্যতঃ গ্রহণ করেছে এবং তদুপরি রাজনৈতিক বন্দীদের কর্ম্মপদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীরও নবতর বিকাশ ঘটেছে। এই সব যোগাযোগগুলি এমন একটা আবহাওয়া সৃজন করেছে যাতে রাজনৈতিক বন্দীদের না ছেড়ে দেওয়া অন্ধ গোঁড়ামী ও স্বার্থপূর্ণ জেদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। যা হোক তথাকথিত 'popular' শাসনপ্রণালী যে বিদেশীর স্বার্থ-পরিচালিত যন্ত্র মাত্র তার হাজার প্রমাণ হাজার রকমে পাওয়া গেছে। এই বন্দীদের ব্যাপারে এটা আরো প্রকট হোলো, এই মাত্র। মুখোস খুলে গিয়ে এবার সত্যিকার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এতে আর কিছু না হোক, অন্ততঃ এই উপকারটুকু হবে যে দেশবাসী এবার পরনির্ভরতাকে বর্জ্জন ক'রে স্বাবলম্বী হবে। মহাত্মা গান্ধী যে সর্ব্বপ্রকারের আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের মনোরঞ্জন করেছেন, তার সমর্থন কোনো দিক দিয়েই করা চলে না। দীর্ঘ দিন ধরে বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের কণ্ঠরোধ করে রাখা হয়েছে, এতে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার হিসেব হয় না। আজ আর বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের সংহত ও অমোঘ দাবীকে বিপুল আকারে উপস্থিত করতে হবে, যে দাবীকে অস্বীকার করবার শক্তি কোনো মন্ত্রীসভারই নেই। আমাদের আশা আছে কালবিলম্ব না করে কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করবে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্যে। রাষ্ট্রপতিকেও আমাদের অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনি দেশের সমস্ত শক্তিকে এই সুমহৎ প্রচেষ্টায় সংহত করে সর্ব্বভারতীয় এক বিশাল আন্দোলনের ভিত্তি পত্তন করুন অবিলম্বে।

দেশীয় রাজ্যে নাগরিক স্বাধীনতা

মধ্যযুগীয় সামন্ত-তন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত রয়েছে। দেশীয় রাজ্যগুলি সেই অতীত যুগের শোচনীয় সাক্ষ্য হিসেবে আজো বিদ্যমান। এই সব রাজ্য ভারতের সকল রকমের প্রগতির বিরোধী শক্তি হয়ে আজো মধ্যযুগীয় অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে ডুবিয়ে রেখেছে। সকল রকমের গণ-আন্দোলনের পথে এরা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। দরিদ্র ও অজ্ঞ নরনারীকে এরা যুগের পর যুগ মানুষের মতো ক'রে বাঁচবার অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখেছে। অথচ সেই সর্ব্বনিম্ন অধিকারটুকুকে দাবী করবার সকল রকম পথই সযত্নে রুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। আজ বিংশ শতকের পশ্চাৎ-সমরীয় যুগেও ভারতবর্ষে লক্ষ লক্ষ নরনারী পাঁচশ বছরের আগেকার জীর্ণ সমাজব্যবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, এ সংবাদ আশ্চর্য্য হলেও সত্য। তবে কিছুদিন থেকে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের মধ্যে আধুনিক যুগোপযোগী আত্মচেতনা অমোঘ শক্তিতে জেগে উঠেছে। কংগ্রেসের প্রভাব সেখানে নতুন আশা এবং উদ্যমকে জন্ম দিয়েছে। কিন্তু দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষ এই নতুন চেতনাকে ভয়ের চক্ষে দেখ্‌তে আরম্ভ করেছেন এবং অঙ্কুরেই এই নবজাত শিশু-শক্তিকে গলা টীপে মারবার আয়োজন করছেন। ফলে এই সব দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বত্র অত্যাচারের স্রোত

বয়ে চলেছে এবং নামমাত্র স্বাধীনতা যতটুকু ছিল তাও স্বেচ্ছাচারী কর্ত্তৃপক্ষের পীড়নে ছায়ার মতন মিলিয়ে যাচ্ছে।

কিছুদিন থেকে দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে যে সব রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় সর্ব্বত্রই গণশক্তিকে সমূলে নষ্ট করবার জন্য স্বৈরাচার উদ্যত হয়ে উঠেছে। ত্রিবাঙ্কুর, কাশ্মীর, উড়িষ্যা, হায়দ্রাবাদ, আলোয়ার, মহীশূর ইত্যাদি রাজ্যে সকল রকম প্রাথমিক স্বাধীনতাকেই শ্বাসরোধ করে বিনষ্ট করা হচ্চে। দুনিয়ার সর্ব্বত্র এবং ভারতবর্ষে যখন সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার নতুন রূপায়ন আরম্ভ হয়েছে, গণশক্তি যখন নবলব্ধ চেতনায় জয়যাত্রা সুরু করেছে, সেই বন্ধন-মুক্তির উদার যুগেও ভারতবর্ষের একটা বড়ো অংশে চলেছে মনুষ্যত্বের নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা। কিন্তু বেশী দিন নেই; মধ্যযুগীয় অচল স্বৈরাচার অচিরে বিলুপ্তির গহ্বরে ডুবে যাবে। গণশক্তি সর্ব্বত্র জেগে উঠে আত্মপ্রতিষ্ঠা করছে। সভাসমিতিতে, আন্দোলনে, সংগ্রামে, সকল স্থানেই জন-জাগরণ বহুমুখী রূপে আত্মপ্রকাশ করছে। মহীশূরে এবং ত্রিবাঙ্কুরে তারা জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়েছে। কাশ্মীরে এবং আলোয়ারে কৃষকেরা জমিদারী অর্থ শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। সব জায়গায় প্রজামণ্ডল এবং ষ্টেট কংগ্রেস কমিটী গঠিত হয়ে জনমতকে সংহত করছে। নীলগিরিতে প্রজামণ্ডলের নেতৃত্বে আড়াই মাস ধ'রে অদম্য সংগ্রাম ক'রে জনসাধারণ জয়লাভ করেছে। সেখানে মধ্যযুগীয় শোষণ এবং অত্যাচারের প্রতিকারের পথ হয়েছে। উড়িষ্যায় ২৬টী দেশীয় রাজ্যের প্রায় ৪০ লক্ষ লোক মুক্তির সন্ধানে জেগে উঠেছে। উড়িষ্যার ধেনকানল রাজ্যেও বিপুল আন্দোলন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ২রা সেপ্টেম্বর প্রজামণ্ডল কৃষকদের দাবীর লিষ্ট গঠন করে কিষাণসম্মিলন আহ্বান করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাজদরবার মুখে সহানুভূতি দেখিয়ে কার্য্যতঃ ১১ই সেপ্টেম্বর প্রজামণ্ডলের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট সহ ১৪ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করে এবং জনতার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে; অসহায় নরনারীর ওপর হাতী, ঘোড়া, ও মোটর চালিয়ে দিয়ে লাঠীর সদ্ব্যবহার করে। গুলিও চলে স্থানে স্থানে। প্রজামণ্ডলকে বেআইনী ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে।

কাশ্মীরে হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাই একযোগে স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে আজাদ পার্কের বিরাট সভায় জননেতা শেখ মহম্মদ আবদুল্লা ও তাঁর ছ'জন সাথীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সভা নিষিদ্ধ না থাকা সত্ত্বেও। এরা সার্ব্বজনীন ভোট, স্বায়ত্ত্বশাসন, এবং সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীনতার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে এবং রাজদরবারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সূচনা করেছে। এমনি করে সবগুলো দেশীয় রাজ্যে মধ্যযুগীয় স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন উত্তাল হয়ে উঠেছে, তখন ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এই সংগ্রামের অংশ নিতে অস্বীকৃত হয়ে নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত করেছে। সর্ব্বভারতের এক পঞ্চমাংশ লোকের নিদারুণ সংগ্রামের সময় কংগ্রেস প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাশ করে কেবল মৌখিক সহানুভূতির বাণী প্রেরণ করছে। হরিপুরায়ও সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে কংগ্রেস এই সব দেশীয় রাজ্যের সংগ্রামের দায়িত্ব নেবে না। ওখানকার সংগ্রাম ওখানকার লোকদের নিজেদের দায়িত্বে সমাধা করতে হবে। কংগ্রেস

সর্ব্বভারতীয় আদর্শের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে ; স্বরাজ হলো সকল ভারতের স্বরাজ। আট কোটী নরনারী প্রাণ দিয়ে, রক্ত দিয়ে এই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করছে এবং বৎসরের পর বৎসর করুণ আবেদন পাঠাচ্ছে ; অথচ এই আবেদনে কংগ্রেস কর্ণপাতও করছে না। এতে কংগ্রেসের সর্ব্বভারতীয় প্রতিনিধিত্বের হানি হচ্চে বলে আমাদের বিশ্বাস। স্বরাজ যেমন সর্ব্বভারতের একই স্বরাজ, স্বাধীনতার সংগ্রামও তেমনি সর্ব্ব ভারতের একই সংগ্রাম। দেশী সামন্তরাজারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হয়ে তাদের যুদ্ধে বন্দুক কামানের খোরাক সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ চিরকাল করেছে। ১৯১৪ সনে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আজ আবার পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে যুদ্ধের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে ; লড়াই কবে বাধে ঠিক নেই। আবার সামন্ত রাজন্যবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের "recruiting sergeant"এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে ; আবার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আহুতি হয়ে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ হারাবে ; এই শোচনীয় ও সঙ্কটপূর্ণ পরিণতিকে ঠেকিয়ে রাখতে হলে এই সব দেশীয় রাজ্যে বিরাট গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্থায়ী দুর্গ, এই রাজ্যগুলি, জাতীয় শক্তির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে এবং জাতীয় সম্পদ ও শক্তি যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে না। আজকে সব চাইতে বড় প্রয়োজন সারা ভারতব্যাপী এক সংঘবদ্ধ বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলা। ভারতবর্ষকে দ্বিধা-বিভক্ত করে দুই অংশের জন্য দুই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে জাতীয় সংগ্রামের শক্তিক্ষয় ও হানি অনিবার্য্য। কংগ্রেসকে অবিলম্বে সর্ব্বভারতীয় আন্দোলনের ও সংগ্রামের নেতারূপে জগতের আসরে অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস বারম্বার এই কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হচ্চে এবং দেশীয় প্রজামণ্ডল ও ষ্টেট-কংগ্রেসের সংগ্রামের অংশ নেবার দায়িত্ব থেকে পশ্চাৎপদ হচ্চে। এবারও নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি দিল্লী অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করেছে, কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত কোনো ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করবে না। কংগ্রেসের এই ঔদাসীন্য সত্যি সত্যি দুর্ব্বোধ। অহিংস নীতি যতদিন কংগ্রেসের মূল নীতি থাক্‌বে, ততদিন কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ না ক'রে সামন্তরাজাদের হৃদয় গলাবার সাধনা করতে থাকবে। মধুর যৌক্তিকতা কিংবা সকরুণ আবেদনের দ্বারা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের হৃদয় দ্রব করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করবার স্বপ্ন এককালে কংগ্রেস দেখ্‌তো। আজ সেই স্বপ্নকে কংগ্রেস বর্জ্জন করে লড়াই করে ন্যায্য অধিকার ছিনিয়ে নেবার সাধনা সুরু করেছে। কিন্তু দেশীয় রাজন্যদের সম্বন্ধে আবার সেই পুরোনো নীতিকে কংগ্রেস গ্রহণ করে স্বকীয় দৌর্ব্বল্যেরই পরিচয় দিচ্ছে। দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের সমর্থন করলে রাজন্যবৃন্দ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবে, এই ভয়ই যদি কংগ্রেসকে ঔদাসীন্যের নীতিতে প্রবর্ত্তিত করে, তবে সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের বেশীদিন থাক্‌বে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। রাজন্যবর্গের মন দ্রব করে তাদের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত স্বাধীনতায় কংগ্রেস প্রজাবৃন্দকে সুখ-স্বর্গে উন্নীত করবে সহজে ও বিনা সংঘর্ষে ; এই কল্পনা ও আশাকে পোষণ করা মানেই ইতিহাসকে অস্বীকার করা এবং ইতিহাসের অমোঘ ইঙ্গিতকে অবজ্ঞা করা। এই দুর্ব্বল নীতিকে বিসর্জ্জন দিয়ে কংগ্রেস যদি বলিষ্ঠ ও নির্ভীক পন্থায় স্বাধীনতার যুদ্ধকে পরিচালনা না করতে পারে, তবে ৩৫ কোটী নরনারীর সাধনার মূর্ত্ত প্রতীক স্বরূপ সত্যিকার নেতা হয়ে কংগ্রেস

স্বরাজ অর্জ্জন করবার যোগ্যতা কোনদিন লাভ করবে, এ সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আমরা কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে এই সর্ব্বনাশা নীতি বর্জ্জন করে সর্ব্বভারতীয় নেতৃত্বে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুরোধ করছি।

কংগ্রেসের সংস্কার

২৪শে সেপ্টেম্বরের "হরিজনে" মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন, চারদিক থেকে তাঁর কাছে নালিশ এসেছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। কংগ্রেসের মধ্যে সর্ব্বত্র "অসত্য, হিংসা এবং দুর্নীতির" প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এবং এই অশুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে সত্যিকার কাজ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কয়েকখানি পত্র গান্ধীজী "হরিজনে" উদ্ধৃত করেছেন যাতে এই সব দুর্নীতির বিস্তৃত বিবরণ আছে। কংগ্রেসের নতুন নির্ব্বাচন উপলক্ষে সর্ব্বত্র ভূয়া কংগ্রেস সদস্য করা হচ্চে; নিজের পকেট থেকে চার আনা পয়সা দিয়ে স্বপক্ষের লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্চে এবং যাদের হাতে কংগ্রেস কমিটী আছে তারা মিথ্যা হিসাব দাখিল করে কংগ্রেসকে টাকা পর্য্যন্ত ফাঁকি দিচ্ছে। অনেক সময় এমন সব মিথ্যা নামে সভ্য করা হচ্চে যে নামের বাস্তবিক কোন লোকই নেই। এমনই নানা রকমের কৌশল ও দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে বহু দল বা লোক কংগ্রেস কমিটীগুলিকে নিজেদের কবলে আটকে রাখছে। যাদের হাতে অফিস আছে সাধারণতঃ নানা রকম ক্ষমতা ও সুবিধা তাদের আয়ত্তের মধ্যে থাকে। যদি সেই ক্ষমতা বা সুবিধাকে তারা আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তবে সহজে এই কলঙ্কের প্রতিকার হওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত নালিশ যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কংগ্রেসের সত্যি সত্যি দুর্দ্দিন এসেছে বলে মনে করতে হবে। বিষয়টী অত্যন্ত গুরুতর এবং এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত অনুসন্ধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আজকাল আমরা নতুন আদর্শ ও নতুন মনোভাবের কথা পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই শুনতে পেয়ে থাকি। সবাই বলছেন দল, উপদলের প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গেছে; আজ বৃহৎ আদর্শ নিয়ে বৃহত্তর দল গঠন করবার সময় এসেছে। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখতে পাওয়া যায় আজো সেই পুরোনো সঙ্কীর্ণতার পচা মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে অহরহ দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করছে। দখল করবার ও আত্মসাৎ করার মনোবৃত্তি আজো আমাদের কাঁধে ভূতের মতো চেপে আছে। যে যেখানে পারছে সেখানেই স্বকীয় দৃঢ়মুষ্টিকে দৃঢ়তর করবার চেষ্টায় লেগে গেছে। এর জন্যে কোনো অসৎ পন্থাই অন্যায় বলে গণ্য হয় না। মুখে সমাজতন্ত্র ও আন্তর্জ্জাতিকতার বুলি আওড়িয়ে আমরা ব্যক্তির প্রাধান্য বা দলের প্রাবল্যকে যেন তেন প্রকারেণ বাঁচিয়ে রাখবার সাধনায় দিন কর্ত্তন করি। সহরে ও গ্রামে সর্ব্বত্র এই মনোভাব দেশের কর্ম্মীদের ওপরে অক্টোপাসের মতন আপনার সহস্র জাল বিস্তার করেছে। এই মনোভাবের প্রসার হওয়ার দরুণ সততই নালিশ শুনতে পাওয়া যায় যে কংগ্রেস কমিটীর কর্ত্তৃপক্ষ অনেক স্থানে সভ্যসংগ্রহ করবার রসীদ বই অপর দলীয় লোকদের হাতে দিতে চান না। যদিও বা রসীদই বই দেওয়া হয়, তবু অপরদলের সংগৃহীত সভ্যের নামগুলো কোনো না কোনো উপায়ে বা ছুতায় বাতিল করে দেবার চেষ্টা করেন। এই নিয়ে মনোমালিন্য ও

অন্তর্ব্বিরোধের অন্ত নেই। গত এক বছরের মধ্যে বহু স্থানে, বাংলায় এবং বাংলার বাহিরে, কংগ্রেসের নির্ব্বাচন নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে। এমন প্রদেশ বাকী নেই যেখানে এসব হয়নি বা এসব নেই। বাংলা দেশেও এই নিয়ে রক্তারক্তি না হয়েছে এমন নয়। দখল করবার মনোবৃত্তিকে আমরা সবাই প্রকাশ্যে ঘৃণা ও নিন্দা করে থাকি; কিন্তু আমরাই আবার গোপনে দখল করবার আয়োজন করে থাকি, ছলে, বলে বা কৌশলে। এ শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার কি এক কথায় বলা দুষ্কর।

আমাদের পরাধীন দেশ; দীর্ঘদিনের পরবশ্যতায় আমাদের জাতীয় চরিত্রে অনেক অসঙ্গতি জমে উঠেছে। রাজনীতিতে অনেকেই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা অন্যায় মনে করেন না। কিন্তু আমাদের মতে, শত্রুপক্ষের সঙ্গে চাতুরী, যুদ্ধরীতির অনুমোদিত হলেও আত্মপক্ষের সঙ্গে মিথ্যা ব্যবহার সকল রকমেই সর্ব্বনাশকে ডেকে আনে। যেখানে পরস্পরের ওপরে নির্ভর করেই দুঃখের পথে মানুষ অভিযান করে থাকে, সেখানে পরস্পরকে প্রতারণা করলে আত্মপ্রতারণা বই আর কিছু সিদ্ধ হয় বলে মনে করিনে। যেখানে দুঃখব্রতই জীবনের মূলমন্ত্র সবাইর, যেখানে বিদেশীর সঙ্গে স্বাধীনতার লড়াই পরাধীনের, সেখানে সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি বৃহৎ সংহতিকে চিরদিনই দূরে সরিয়ে রাখবে। কাজেই দখল করবার মানসিকতা নিয়ে স্বাধীনতার যুদ্ধকে এগিয়ে দেবার কল্পনা যাঁরা করেন তাঁরা ভ্রান্ত। কিন্তু এই সামান্য তত্ত্বটুকু যে আমরা কেউ বুঝিনে তা নয়; সবাই বুঝি, অথচ তবু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সেই পুরোনো পথেই চল্‌তে থাকি দুচোখ বুজে। বড়ো বড়ো কথা ছড়িয়ে বেড়াই, অথচ ছোট গণ্ডীর মোহ কাটিয়ে উঠতে পারিনে। এই অবস্থায় আদর্শপরায়ণতা ও সত্যিকার সেবাবুদ্ধি না থাকলে মৌলিক কোনো প্রতিকার হবে না। তবে সাধারণভাবে বিধিনিষেধের সহায়তায় যথাসম্ভব এই দুর্নীতির পথরোধ করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

কিন্তু গান্ধীজী যে উপায় নির্দ্দেশ করেছেন এই দুর্নীতির সংস্কারের জন্য, তা' আমাদের কাছে নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হয়। খদ্দর পরিধান, ৫০০০ গজ সূতা কেটে দেওয়া ইত্যাদি দ্বারা দুর্নীতি দূর কী করে করা যাবে বোঝা যায় না। নির্ব্বাচনসংক্রান্ত দুর্নীতি দূর করতে হলে এমন একটা ব্যবস্থা (Machinery) সৃষ্টি করতে হবে যার কাজই হবে জাগ্রত চক্ষুকে সর্ব্বক্ষণ দুর্নীতির সন্ধানে উদ্যত রাখা। গভর্ণমেণ্টের পরিচালিত কাউন্সিল ইত্যাদির নির্ব্বাচনে যথাসম্ভব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়ে থাকে; কংগ্রেস নির্ব্বাচনের শুদ্ধি-রক্ষার জন্য কোনো এমন ব্যবস্থা নেই যাতে দুর্নীতিকে বারণ করা চলে। অবশ্য যে কোনো নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, ত্রুটী কিছু না কিছু থাকবেই। তবে সাধ্যায়ত্ত সকল উপায় অবলম্বন করলে দুর্নীতির প্রসার বহুলাংশে কমে যাবে। সেইটুকু লাভই যথেষ্ট মনে করা যেতে পারে। কিন্তু খদ্দর পরিধানের সঙ্গে দুর্নীতি ও অসততার কোন সম্বন্ধ নেই বলে মনে করি। খদ্দর পরেও মানুষ মিথ্যা সদস্য সংগ্রহ করতে পারে এবং ৫০০০ গজ সূতা কেটে দিয়েও মানুষ অসৎ উপায়ে কংগ্রেস কমিটী দখল করবার চেষ্টা করতে পারে। কাজেই দুর্নীতি দূর করে কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর সংস্কার সাধন করবার আমরাও পক্ষপাতী; কিন্তু দূর করবার উপায় সম্বন্ধে গান্ধীজীর নির্দ্দেশের কোনো যৌক্তিকতা

আমরা দেখ্‌তে পাইনে। আমরা কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি, দুর্নীতির সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান করে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে।

আসামে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা

আসামে কংগ্রেস শাসনকার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। যে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা আসামের সকল রকমের প্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে এতদিন দেশের অপরিমেয় অনিষ্ট করছিলো, তার পতনে দেশের লোক হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। আসাম দীর্ঘকাল থেকে স্বেচ্ছাচারের দুর্গস্বরূপ। সেখানকার চা বাগানের মালিকদের স্বৈরাচার পৃথিবীতে সর্ব্বত্র জ্ঞাত। সেখানে অজ্ঞাত পার্ব্বত্য রাজ্যের কোনে কোনে বছরের পর বছর যে অমানুষিক অত্যাচার দরিদ্র ও অসহায় চা-মজুরদের উপর হয়ে থাকে তার আংশিক খবরও সভ্য জগতে প্রকাশিত হয় না। জন্তু জানোয়ারের মতন এই সব ভাড়াটে মানব অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করে চিরজীবন দাসত্ব করে কাটিয়ে দেয়। এদের জন্য আইন, আদালত, বিচার, পুলিশ, এককথায় সভ্যজগতের কোনো কল্যাণকর ব্যবস্থাই আসামে সৃষ্ট হয় নি, কারণ এ সবের উপকারিতা থেকে এরা চিরদিন বঞ্চিত অর্থ ও অভিজ্ঞতার অভাবে। নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হবার পর থেকে, যা' কিছু সামান্য কল্যাণ দরিদ্রের জন্য অনুষ্ঠিত হতেও পারত, তা'ও হয়নি। কারণ প্রথম থেকেই প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদের হাতেই শাসনযন্ত্র ছিলো। সাদুল্লা মন্ত্রীসভা এই দীর্ঘকালের মধ্যে কোনো জনহিতকর কার্য্যেরই সূচনা করেন নি ; বরং সাম্প্রদায়িকতার বিষ নানা পাকে প্রকারে ছড়িয়েছেন। এতদিন পরে এদের পতন হওয়ায় দেশের সকল শ্রেণীর লোকই খুশী হয়েছে সন্দেহ নেই। এখন আশা করা যেতে পারে যে, শ্রীযুত বারদোলোই অচিরে জনহিতকর বিধি ব্যবস্থার প্রণয়ন করে দরিদ্র গণশক্তির দুঃখমোচন করবার চেষ্টা করবেন। আসামে চাবাগানগুলির দিকে সত্বর দৃষ্টি দেওয়া দরকার, যাতে সেখানে মনুষ্যোচিত পারিপার্শ্বিক গড়ে তোলা সম্ভব হয় দরিদ্র ও অজ্ঞ কুলীদের জন্য।

এখানে বাংলা দেশের কথা স্বতঃই মনে পড়ে। যে বাংলা দেশ শিক্ষায়, সভ্যতায়, উন্নতিতে সারা ভারতের অগ্রণী ছিলো, সেখানে আজ এক প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীসভা জাতির অগ্রগতির সকল আশাকে নির্ম্মম পেষণে বিনষ্ট করছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষে সমস্ত দেশকে আজ বিষাক্ত করে হক্‌-মন্ত্রীমণ্ডলী বাংলাদেশের অপ্রতিকরণীয় অনিষ্ট সাধন করছেন। কংগ্রেসের দূরদৃষ্টির অভাবেই আজ এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সন্দেহ নেই। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করবার নীতি আজ কংগ্রেস গ্রহণ করেছে ; কিন্তু গত বছর নতুন শাসন প্রবর্ত্তনের সময়ে প্রথম থেকেই যদি কংগ্রেস এই নীতিকে স্বীকার করে মিশ্র মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করবার অনুমতি দিতো, তবে বাংলাদেশে আজ প্রগতিবিরোধী মন্ত্রীমণ্ডল আদৌ অধিকার পেতো না। আজ কংগ্রেস সেই নীতিই স্বীকার করে নিয়েছে ; অথচ অনেক পরে, যখন সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। যাহোক, আজ আসামে যে জাতীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে তাতেই সকলের আনন্দের কারণ হয়েছে। আশা করি নিয়মতান্ত্রিকতার পাঁকে আবদ্ধ হয়ে এই নতুন মন্ত্রীসভা অকর্ম্মণ্য জীবন যাপন করবে না ; যাতে দেশের সত্যিকার

কল্যাণ হয় তেমন সংস্কারমূলক বিধিব্যবস্থা সাহসের সঙ্গে প্রবর্ত্তন করে কংগ্রেসের আদর্শকে কার্য্যে পরিণত রাখতে ত্রুটী করবে না।

বাংলার জেল-জীবন

কিছুদিন আগে বাংলা গভর্ণমেণ্টের এক বিবৃতি খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েচে। তাতে জানানো হয়েছে যে জেলের তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের নানাদিক দিয়ে উন্নত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্তে রাখা হয়েছে। তাদের ঢেকী ছাঁটা চাল দেয়া হয়, প্রচুর মাছ, মাংস, টাট্‌কা তরিতরকারী, গুড় ইত্যাদি দেওয়া হয়। তাছাড়া অসুস্থদের জন্য অতিরিক্ত দুধ ইত্যাদি দেওয়া হয়; মাছ মাংস যারা খায় না তাদের জন্যে প্রচুর সবজীর ব্যবস্থা করা হয়। এসব খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার ওপরে আবার খেলাধূলার নানারকমের বন্দোবস্তও আছে।

যাদের বাংলাদেশের জেলখানা সম্বন্ধে ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা জানেন যে এখানকার জেলখানায় কী নিষ্ঠুর অবস্থার মধ্যে অগণিত কয়েদী বছরের পর বছর কাটায়। জেলখানায় সংশোধন তো দূরের কথা, মানুষ কিছুদিন বাসের পর উত্তরোত্তর পশুর পর্য্যায়ে অবনমিত হতে থাকে। এমন এক নির্ম্মম যান্ত্রিক ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট এদেশে সৃষ্টি করে রেখেছে যে এখানে এলে মানুষ ভুলে যায় যে সে মানুষ। কথায় কথায় নানা রকম বেরকমের জুলুম এখানে জীবনকে অতিষ্ঠ করেই রেখেছে; রোগে, শোকে কোনো সান্ত্বনা নেই, চিকিৎসা নেই, শান্তি নেই। কাগজে কলমে বন্দোবস্তের বর্ণনা পড়লে মনে হয় জেলগুলোতে আরামের অন্ত নেই; স্বাস্থ্যময় পারিপার্শ্বিকে প্রচুর সুব্যবস্থায় কয়েদীরা পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করে। অথচ এসবই আমলাতান্ত্রিক প্রচার বই আর কিছু নয়; কাগজে কলমে সব কিছুই কেতাদুরস্ত এবং নিখুঁত। ভিতরের জীবন অজ্ঞতা অন্ধকার ও দুঃখে অসহ। অন্যায় পদে পদে ঘট্‌ছে কিন্তু কোনো প্রতিকার নেই। জেলের দেয়ালের বাইরে এখানকার মর্ম্মান্তিক কাহিনী কখনো প্রকাশিত হতে পারে না। এখানকার জীবন সম্বন্ধে ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেউ ধারণা করতে পারে না। অথচ গভর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর দিব্যি প্রচারের জোরে লোকের মনে ধাপ্পার সৃষ্টি করে চলেছেন। আমরা সরকারের এই আত্মপ্রচারের প্রতিবাদ করি এবং নিরপেক্ষ বেসরকারী কমিটির দ্বারা তদন্তের দাবি করি। তবেই জেল-জীবনের সত্যিকার ছবি সর্ব্বসাধারণের গোচর হবে। নতুবা নয়। গভর্ণমেণ্টের সে সাহস আছে কি?

ভ্রম সংশোধন—

আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত 'পদ্মপত্রে অশ্রুবিন্দু' ছবিটি শ্রীযুক্তা উমা দত্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'শান্তি কার?' গল্পটি বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত।

জ: স:

জয়শ্রী

সপ্তম বর্ষ | অগ্রহায়ণ | ষষ্ঠ সংখ্যা

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান

অনিলচন্দ্র রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিত পর)

মনোজগতে যে জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐশ্বর্য্যকে বিবর্ত্তিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহাতেই মানুষের অক্ষয় গৌরব—তাহা তাহার যতই lowly origin হোক না কেন। একথা সম্ভব কিংবা স্বীকার্য্য যে, হয়তো মানবের বাল্যকালের কুসংস্কারের ভিতর হইতেই আজিকার জ্ঞানবিজ্ঞান, এবং সত্য। সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানবমনের ক্ষণে ক্ষণে যে সংস্পর্শ ঘটিয়াছে তাহাতেই মন ক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়া সৃষ্টি করিতে সুরু করিয়াছে। মানুষের সব সৃষ্টি হয়তে বাঁচিয়া নাই,—পারিপার্শ্বিকের চাপে প্রয়োজনহীন সৃষ্টিগুলি লোপ পাইয়া যাহা বাকি থাকিল, বাঁচিয়া রহিল, তাহাই মানুষের কুবেরভাণ্ডারকে বানাইল।

সেই আদিযুগের বর্ব্বর প্রপিতাগণের মন প্রকৃতির যত কিছু বিরাট প্রকাশকে দেখিয়া বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিত। শুধু তখন কেন,—চারিদিকে অপরূপের যে লীলাচাঞ্চল্য তাহা দেখিয়া আজও কি বিস্ময়ের অবধি আছে মানুষের? অপার নীল আকাশে দুই চক্ষুকে মেলিয়া দিলে কি বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা থাকে? সকাল বেলার রক্তিম সূর্য্য দুপুর বেলায় নীলিমার অনন্ত বিস্তার, রাত্রির চাঁদ, আকাশভরা তারা আর গ্রহের মেলা,—বিস্ময়ের কিনারা কোথায়? কাল বৈশাখীর তুফান, বিদ্যুতের মাতামাতি, মেঘের বর্ষণ, বন্যার প্লাবন! বিস্ময়ের কি অবধি আছে? বিস্ময়ের পর বিস্ময়! অন্ত নাই, অবধি নাই!

বিস্ময় জাগাইল কৌতূহল, কৌতূহল আনিল জিজ্ঞাসাকে। জিজ্ঞাসা হয়ত আনিল কুসংস্কার, কিন্তু সাধনাকে ও আনিল। আর সাধনা আনিল সভ্যতাকে। কুসংস্কার হয়তো initial fillip, first start দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সভ্যতার পথ বরাবর চলিয়া আসিয়া আজিকার সভ্য সংস্কারে, আজিকার বিজ্ঞানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ধর্ম্মও হয়তো কুসংস্কারেই সুরু হইয়াছিল, তাহার পরে দিনে দিনে তাহার যাত্রা কত বিস্ময়কর পথকে অতিক্রম করিয়া আজিকার তীরটীতে আসিয়া উপনীত হইল, অতীতের কুসংস্কার আর অজ্ঞতার অজুহাতে তাহার সবটুকুই মিথ্যা হইয়া যাইবে ?

নহে নহে নহে। মানুষ চিন্তাজগতে, অনুভূতির জগতে যে বিশাল সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাই ধর্ম্মের আসল গৌরব। তাহার আদিম যুগের কুসংস্কার নয়, তাহার naturel-worship নয়, তাহার ghost-worship নয়, তাহার fetish-worship নয়,—তাহার দর্শন, তাহার সূক্ষ্ম চিন্তা সমষ্টি, তাহার গভীর অনুভূতি, এ সবই তাহার ক্ষতিহীন গৌরব। কুসংস্কারে তাহার আদি জন্ম খুঁজিয়া পাইলেও তাহার তাহাতে লজ্জিত হইবার কিছু নাই।

বয়স অনুসারে বিজ্ঞান ধর্ম্ম হইতে জুনিয়র, ধর্ম্ম সিনিয়র ; কিন্তু জন্মের পর হইতেই এই নবজাতক বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অগ্রজকে বারবার আঘাত করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধ ঘোষনায় আফশোষ করিবার কিছু নাই। কারণ ইহাতে বিজ্ঞানের প্রচুর প্রাণ-ধর্ম্মেরই পরিচয় পাই। প্রাণের ধর্ম্মই আঘাত, প্রতিঘাত, সংগ্রাম, প্রতিদ্বন্দ্ব। বিজ্ঞানের এ মারকে দুঃখ করিবার, ভয় করিবার কারণ নাই ; ধর্ম্মের প্রাণ শক্তি থাকিলে সে বাঁচিবে, নতুবা তাহাকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে স্বয়ং ধর্ম্মরাজও পারিবেন না।

পরিণামে যাহাই হোক, সে ভবিষ্যৎ জানে। আসল কথা হইতেছে এই যে, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সংঘর্ষ চলিয়াছেই। তাহাদের ধ্বস্তাধ্বস্তি যুগের পর যুগ ধরিয়া চলিয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইল এই যে, বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞান কি ধর্ম্মকে পরাজিত করিবে, "মহতি বিনষ্টি"র পথে পাঠাইবে ? না, তাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া হাত মিলাইবে ? এ দুইয়ের প্রতিদ্বন্দ্ব কি মিত্রতায় আসিয়া বিরাম পাইবে না ?

ধর্ম্ম, বিজ্ঞান যে রাস্তা ধরিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাকে একটু অনুসরণ করা যাউক। অন্য দেশের কথা আনিব না ; আধুনিক বিজ্ঞান পশ্চিমের আবিষ্কার, এজন্য পাশ্চাত্যের ইতিহাসকেই trace করিব। ষোড়শ শতাব্দী হইতে দূরে যাইতে হইবে না।

16th centuryকে বলা যায়, আলোড়ন-বিলোড়নের যুগ। Whitehead নাম দিয়াছেন "Age of Ferment" এই যুগে Christianity ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং চারিদিকের বিক্ষোভের মাঝে জন্মলাভ করিল Modern Science. কত আজব সংস্কার, অদ্ভুত ধারণা মানুষের মনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। সব শাস্ত্র, সব প্রতিষ্ঠান এ যুগে খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। ৫৩৫ সনে Cosmas নামে এক সন্ন্যাসী এক ভূগোলতত্ত্বে লিখিয়াছিলেন, পৃথিবীটা একটা

parallelogram; তাহার length তাহার প্রস্থের দ্বিগুণ। এসব আষাঢ়ে শাস্ত্র তো অনেক আগেই গিয়াছে। এখন পুরাণো Ptolemic Astronomyকে সরাইয়া Copernicus আসিলেন তাঁহার Helliocentric Astronomy লইয়া—সূর্য্যই আমাদের সৌরজগতের মধ্যমণি। Copernicus-এর De Revolutionibus বাহির হইল ১৫৪২তে। Bruno Copernicusকে সমর্থন করিলেন, প্রচলিত Christianityকে অস্বীকার করিলেন। ১৬০০তে Inquisition তাঁহাকে পোড়াইয়া মারিল কিন্তু নবজাত বিজ্ঞানকে দাবাইয়া রাখিতে পারিল না। শতাব্দী শেষ হইবার আগে বিজ্ঞান অনেকখানি অগ্রসর হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে Algebra, Trigonometry, Physics, Botany, Anatomy ইত্যাদির ভিত্তি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে।

17th century আসিতেই বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইল অনেক বড় বড় মহারথী। এ যুগ হইল Whiteheadএর ভাষায় "Age of Genius." Harvey তাঁহার blood circulation সম্বন্ধে ১৬১৬ সনে বিবৃত করিলেন London College of Physiciansএ। গ্যালিলিও আসিলেন তাঁহার Laws of motion লইয়া এবং ১৬৪২তে Inquisition তাঁহাকেও হত্যা করিয়া বিজ্ঞানের martys করিয়া দিল। Huyghens দিলেন তাঁহার Undurlatory theory of Light; তারপর আসিলেন Newton, পৃথিবীর জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়িয়া গেল। Gravitation আসিল; পরে Corpusculer theory of Light আসিল। Newtonএর Principia ছাপা হইল ১৭০০তে। Robert Boyle আনিলেন Atomistic Chemistry, Descartes, Pascal, সৃষ্টি করিলেন Analytical Geometry, যাহা হইতে সূচনা হইল আধুনিক Mathematicsএর। 17th Centuryর ভাণ্ডার অগণ্য সম্পদে করিয়া উঠিল। এদিকে দর্শনের রাজ্যেও Descartes নূতন Metaphysics সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার Discourse of Method (1637) ইউরোপকে আত্মা সম্বন্ধে অবহিত করিল, তাঁহার 'Meditations' আত্মার অশরীরিত্ব (immaterialiaty) ঘোষণা করিল। Occasionalism আসিল Genlinex Melebrancheএর সঙ্গে; ঈশ্বর ঘোষিত হইল একটু জোরের সহিত। এর পরেই Spinoza, Locke, Leibnitzএর আবির্ভাব।

সপ্তদশ শতাব্দী মানুষের বুদ্ধি বিকাশের দীপ্ত যুগ। এই যুগ Modern Mathematics এর উদ্ভবের যুগ; প্রকৃতিতে (Natureএ) আত্ম-নিমজ্জনের যুগ, চিন্তাতে কল্পনায় অবাধ rationalismএর যুগ বিজ্ঞানের সহিত দর্শনের বিচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছে সত্য—কিন্তু বিরোধ তত জমিয়া উঠে নাই।

বৈজ্ঞানিক এই যুগে প্রকৃতির অপরিসীম ঐশ্বর্য্য, পরমাশ্চর্য্য লীলাবৈচিত্র্য দেখিয়া মুগ্ধ, আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সমস্ত সত্ত্বা তখন প্রকৃতির অপার রাজ্যের মধ্যে ডুবিয়া, তলাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির স্তরে স্তরে তাহার অনুসন্ধিৎসু কৌতূহলাক্রান্ত মন পাক খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ তাহার প্রথম অনুরাগের মুগ্ধ, আত্মবিহ্বল অবস্থা। ইন্দ্রিয়াতীত দর্শনের দিকে,

ধর্ম্মের দিকে নজর দিবার, মাথা ঘামাইবার অবসর তখন বৈজ্ঞানিকের নাই। এ যুগে বৈজ্ঞানিকও এক দর্শন গঠন করিলেন, তাহার নাম Mechanistic Philosophy of Nature. Matter মানে সব কিছু, যার দেশকালে location আছে; দৃশ্যমান জগৎ শুধু "a succession of instantaneous configuration of matter." কাজেই পরতত্ত্ব লইয়া বৈজ্ঞানিক আর এ যুগে বিব্রত নয়। Whitehead বলিতেছেন, "Can we wonder that the scientists plead their ultimate principles upon a materialistic basis, and thereafter ceased to worry about philosophy ?"

কিন্তু এখনও বিজ্ঞানের বিরোধ তেমন প্রবল হয় নাই। বিজ্ঞান এখনও আত্মস্থ হইয়া আছে, এখনো দিগ্বিজয়ে বাহির হয় নাই। বুদ্ধি এখনও আসিয়া বিশ্বাসকে "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া challenge করে নাই। বিশ্বাস আজো তার দুর্গে আরামে নিদ্রা যাইতেছে—আসন্নপ্রায় scientific avalanche—যাহা পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ভাসাইয়া গড়াইয়া আসিতেছে,—তাহার শব্দ এখানো তাহার দুর্গে পৌঁছে নাই। এই যুগের সাহিত্যেও Miltonকে বিশ্বাসের জয়গান গাহিতে শুনি,—

—"May I assert Eternal Providence
And justify the ways of God to men"

পুরাতন জগৎ তার শেষগান গাহিয়া লইল। ইহার পর আর নিশ্চিন্ত নিদ্রার অবসর থাকিবে না। "Paradise lost is the swansong of a passing world of untroubled certitude."

তারপরে 18th Century. বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখি,—আধুনিক Mathematical Physicsএর First Period. Newtonএর Principia হইতে Lagrangoর Mecanique Analytique (1787) প্রকাশিত হওয়া পর্য্যন্ত সময়কে Modern Mathematicsএর প্রথম যুগ বলা যায়। দ্বিতীয় যুগ হইল ১৭৮৭ হইতে ১৮৭৩ সন পর্য্যন্ত;—১৮৭৩ সনে Clark Maxwellএর Electricity and Magnetism বাহির হয়। Manpertis, Laplace, Carnot ইত্যাদি সব এই যুগের লোক; বিশেষ করিয়া ফরাসী দেশেই Mathematical Physicsএর বিকাশ দেখি এই যুগে।

18th centuryতে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের বিচ্ছেদ বড় হইয়া দেখা দিল। সংঘর্ষ বিরোধ ও প্রবল হইয়া দেখা দিল। Berkeley ১৭০৯ সনে তাহার New Theory of vision এবং ১৭১৩ সনে তাঁহার Principles of Human knowledge বাহির করিলেন। Subjective Idealism যেদিন ঘোষণা করিল, বহির্জগৎ কেবলমাত্র percept বা অনুভূতির সমষ্টিমাত্র সত্যিকারের অস্তিত্ব ইহার নাই,—সেইদিন বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের বিরোধ পুরোপুরি হইয়া দেখা দিল। তারপরে Human scepticism আসিয়া একদিকে যেমন ধর্ম্মকে আঘাত করিল, তেমনি বিজ্ঞানকেও অস্ত্রাঘাত করিল। causalityকে মাত্র sequenceএ দাঁড় করান হইল; ঘটনার সঙ্গে ঘটনার association

মাত্র আছে, তাহাদের ইহার অধিক অব্যর্থত্ব কিছু নাই। এইবার বিজ্ঞানের ভিত্তিতে কুঠার পড়িল—তাহার গোড়ার ঘরে আক্রমণ চলিল। যদি causalityর অব্যর্থত্ব না থাকে, তবে বিজ্ঞানের সমস্ত কর্ম্মপন্থা সমস্ত procedure হইয়া দাঁড়ায় একান্ত মূলহীন, একান্ত ভিত্তিশূন্য। কিন্তু বিজ্ঞান এ challengeকে ভ্রূক্ষেপও করিল না—নিজের postulate লইয়া নিজের পন্থানুযায়ী কাজ করিয়া চলিল।

এই যুগেই দর্শন শাস্ত্রে Kant Fichte, Schelling ইত্যাদি মহারথী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত Transcendentalism মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল।

তারপরে 19th Century। দর্শন ও বিজ্ঞান এই যুগে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মুখোমুখী দাঁড়াইয়াছে। মানুষের জীবনের ইতিহাসে—Whitehead বলিতেছেন—এই যুগ একটা Gem ইহার আলো অনাগত ভবিষ্যতের পথকে অনেকদিন ধরিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়া থাকিবে। মানুষের বুদ্ধি, মানুষের চিন্তা যেন সহসা কতকালের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বন্যার মত দুই কূল ছাপাইয়া সংসারকে ভাসাইয়া দিল। নিত্য নব নব আবির্ভাব, দিনে দিনে নূতনতর আবিষ্কার আকাশ বাতাসকে যেন surcharge করিয়া দিল।

19th Century বিজ্ঞানের অপরাজেয় গৌরবের যুগ। বিজ্ঞান এ যুগে সবগুলি দেয়ালকে ভাঙ্গিয়া জীবনের পরিধিকে অসীমে বিস্তারিত করিয়া দিল। মানুষের দুই চোখের সম্মুখে দিগন্ত-বিস্তৃত চক্রবাল ধূ ধূ করিতে লাগিল। উনবিংশ শতাব্দীর সব চিন্তা, সমস্ত জগৎ দাঁড়াইল আসিয়া New Scienceএর উপর। Science আর Technology এ যুগের যুগল জয়—ললাটিকা। গত শতাব্দীতে যে বীজ অন্তরালে লুকাইয়া ছিল, এই যুগে তাহা বিরাট বনস্পতি হইয়া দেখা দিল। James Watt তাহার Steam Engineএর পেটেণ্ট লইয়াছিল ১৭৬৯এ, এবং ফরাসী বিপ্লব ও তাহার নিশান উড়াইয়াছিল—গত শতাব্দীতে। কিন্তু গত শতাব্দীর সম্ভবনা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিল বাস্তব হইয়া। Idea of atomicity, idea of conservation of energy, idea of evolution,—চিন্তাজগতে নূতনের বিরাম নাই, কেবলি একের পর এক করিয়া আসিতেছে। ১৮৫৯ সনে ডারুইন তাঁহার Origin of Species বাহির করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষেয় জীবনে যত সংস্কার, যত পুরাতন বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

দর্শনের রাজ্যেও এযুগে বিজ্ঞানের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িল। "মানুষ" দেখা দিল প্রত্যক্ষ দেবতা হইয়া ; পরোক্ষ অদৃশ্য দেবতা মানুষের চিন্তার বাহিরে আড়াল হইয়া গেল। ফরাসী দেশে আধুনিক Humanism আত্মপ্রকাশ করিল। Auguste Comte ঘোষণা করিলেন,

"By the great conception of Humanity the conception of God, will be entirely superseded."

"সবার উপর মানুষ সত্য।" ঈশ্বরানুগতির যুগকে কাটাইয়া মানুষ আজ বিজ্ঞানের যুগে পৌঁছিয়াছে। মানুষ আজ সাবালক হইয়া আত্মমহিমায় সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। যদি কাহাকেও

পূজা করিতে হয় তবে মানুষকেই—কারণ "তাহার উপরে নাই।" মানুষ আবির্ভূত হইল "Humanity" হইয়া, "Great Being" হইয়া। উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানালোকিত পূজার বেদীতে ধূমধাম করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইল "Humanity"কে। "দেবতা" তাড়িত হইল। তাব আর প্রয়োজন নাই। মানুষ যতদিন নাবালক ছিল, ততদিন তার regencyর প্রয়োজন ছিল আজ মানুষের বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্ম্মচ্যুতির নোটীশ আসিল। "Regency of God during the long minority of Humanity" আজ চিরদিনের তরে শেষ হইয়া গেল।

তারপর Spencer ও শুনাইলেন synthetic philosephyর তত্ব। দৃশ্যমান পৃথিবী matter-motionএর খেলা; যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং যাহা কিছু ঘটিবে সবই matter-motionএর পারস্পরিক ঘাতপ্রতিঘাতে এবং evolntionএর ইন্দ্রজালে। কিন্তু Energy আসিল কোথা হইতে? খুঁজিতে খুঁজিতে Spencer যখন অতীন্দ্রিয়ের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সভয়ে চক্ষু বুজিয়া তাহাকে এড়াইলেন, যবনিকার অন্তরালে যদি থাকেইবা কোন প্রচ্ছন্ন শক্তি, তবে সে অজ্ঞেয়, অনির্ণেয়, মানবের প্রয়োজনের হাটে তার কোন মূল্য নাই। সে অজ্ঞাত, অবিজ্ঞেয়। বিশ্ব সংসারের লাভলোকসানের কারবারে মানুষ জীবনের সুখে দুঃখে সংগ্রামে তার স্থান নেই। Agnosticism ধর্ম্মকে অস্ত্রাঘাত করিল।

এদিকে বিজ্ঞান যেমন নিত্য নব নব বিস্ময়ে জগৎকে চমকাইয়া দিতেছিল, দর্শনও তার কণ্ঠস্বরকে চড়াইয়া তুলিল Hegel, Schopenhauer, Hamilton এবং Caird ভ্রাতৃদ্বয়, Haldane, Green ইত্যাদি নব Anglo-Hegelianদের বাণীতে। কিন্তু দর্শন-বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব যে পরিণতির পথেই থাক না কেন, প্রচলিত ধর্ম্মাচার ও ঈশ্বরবাদের (Traditional Theism) অবস্থা একান্ত সঙ্গীন হইয়া উঠিল। একদিকে বিবর্ত্তনবাদ (Evolution) অন্যদিকে অজ্ঞেয়বাদের (Agnosticism) চাপে ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়া উঠিল।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি হইতেই ধর্ম্মকে বিধিমত ধরাশায়ী করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। Spencer যেমন ধর্ম্মকে দরজা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বন্ধু, থাকিতেও পারো, কিন্তু বাহিরে"। তেমনি Haeckel তাঁহার Materialismএ Ether-God এর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ধর্ম্মকে ঘায়েল করিতে। তাঁহার Gaseous Vertebrate বলিয়া ব্যঙ্গোক্তি, তাঁহার বৈজ্ঞানিক জড়বাদের পৃথিবীময় প্রসার,—সবই আজ একান্ত পুরানো হইয়া গিয়াছে; কিন্তু যে যুগে একদিন এই সব মতবাদ ও ব্যঙ্গোক্তি আকাশস্পর্শী অহমিকার সৃজন করিয়াছিল বৈজ্ঞানিকতার বাষ্পে তখন আবহাওয়া ভরপূব; মানুষের মন তখন নবলব্ধ শক্তির মাদকতায় আচ্ছন্ন; দুই চোখে নূতন জ্ঞানের নেশা লইয়া মানুষ হয়তো সেদিন ভাবিয়াছিল, Riddle of the Universeএর সব গ্রন্থিভেদ আসন্নপ্রায়। কিন্তু বিংশশতাব্দী আসিয়া সব উলটাইয়া দিবার উপক্রম করিল।

বিংশ শতকে বিজ্ঞান তাহার পূর্ব্ব-সীমানা ছাড়াইয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। যে দেশে আসিয়া বিজ্ঞান পদার্পণ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেকার জগতের একেবারে অপরিচিত,

অকল্পিত। বৈজ্ঞানিকের লেবরেটরী আজ নূতনতর দৃষ্টি, গভীরতর visionএর বিশাল সম্ভাবনাকে চক্ষুর সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়া ধরিয়াছে। একদিকে যেমন দেখি সংঘর্ষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, বিরোধ তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে দেখি মানুষের দিব্যদৃষ্টির সম্মুখে নিত্যনূতন জগতের দ্বার খুলিয়া যাইতেছে।

মানুষের জীবনে আজ দুঃখ বেদনা স্তূপাকার হইয়া জমিয়া উঠিয়াছে, জীবনসংগ্রাম দিনে দিনে দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, পারিপার্শ্বিকের নির্ম্মমতা মানুষকে পিষিয়া মারিতেছে। ফলে প্রচলিত সমাজবিধি, ধর্ম্মবিধি সবকিছুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর স্পষ্টতর, প্রবলতর হইয়া দেখা দিতেছে। মানুষ আজ অন্ন চায়, বস্ত্র চায়, দাঁড়াইবার কঠিন মাটী চায়; দুর্ব্বোধ অনিশ্চিতের জন্য তাহার আজ লেশমাত্র আকর্ষণ নাই; সুদূর পারত্রিকের তরে তাহার লোভ নাই, ঐহিকের সুতীক্ষ্ণ দাবী তাহার কাছে আজ অমোঘ; দুর্দ্দান্ত স্থূল বুভুক্ষা তাহার নাড়ীতে নাড়ীতে দাবানল জ্বালাইয়াছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক জল্পনার অবসর তাহার কোথায়? ছয় হাজার, সাত হাজার বছর মানুষ ধর্ম্মের জন্য, অতীন্দ্রিয়ের উদ্দেশ্যে তাহার সময়, শক্তি, চিন্তা, কামনা এককথায়, তাহার সর্ব্বস্ব অকৃপণ উদারতায় দান করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু আর নয়; আর সে ধর্ম্মের পিছনে ছুটাছুটী করিবে না; ধর্ম্ম মানুষের আত্মাকে অবসন্ন দীনতায় জীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তাই তাহার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান জগতের আজ এমন দয়াহীন অদম্য বিদ্রোহ।

"Man will not give religion two thousand years or twenty centuries more to try itself and waste human time. Its time is up; its probation is ended;...... ...Mankind has not aeons and eternities to spare for trying out discredited systems,"

—William James এই কয়টি কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, বর্ত্তমান দুনিয়ার empiricist mindএর ইহাই হইল চরম কথা, এবং ধর্ম্মের প্রতি আধুনিক মনের attitude সম্বন্ধে বলিতেছেন,

"It is an absolute No, I thank you!"

কিন্তু ধর্ম্মকে সবিনয়ে দরজা দেখাইয়া দিলেও ধর্ম্ম কি গেল?

না, ধর্ম্ম যায় নাই। সেই উনবিংশ শতকেও নয়, বিংশ শতকে ত নয়ই।

১৯শ শতকে Evolntionএর গোড়ার দিকে হাতড়াইতে গিয়া ডারুইনকেও স্বীকার করিতে হইল, "Laws impressed on matter by the creator," তাঁহার কথাই তুলিয়া দিতেছি,—

"There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the creator into a few forms or into one; and that whilst this planet has gone cycling on according to the fixed laws of

gravity from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved." (Origin of species)

Matterকে তন্নতন্ন করিয়া ও lifeএর হদিশ পাওয়া যায় না, উভয়ের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান তাহা কমে না। যাহার আবিষ্কারে মানবমনে বিপ্লবের ঝড় বহিয়া গেল, সারা দুনিয়া হইতে আস্তিক্যবুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইল, সেই "tough mind" বৈজ্ঞানিক mechanist বলিতেছেন,

"In what manner the mental powers were first developed in the lowest organisms is as hopeless an enquiry as how life itself originated." (On Descent of Man).

বিংশশতকের চিন্তাধারা মানুষকে কোথায় লইয়া চলিয়াছে তাহারই একটা দিক অনুসরণ করিব এখানে। দর্শনশাস্ত্রের দিকটা বাদ; তাছাড়া সাইকোলজি, বায়োলজি ইত্যাদি নববিজ্ঞানের নিত্যনব রহস্যের উন্মোচন আজ জগতে যে নানাদিকে নানা avenue খুলিয়া দিতেছে, তাহাও এখানে আলোচ্য নয়। New-Physics আজ বিজ্ঞানরাজ্যে সেরা বিজ্ঞান, সব scienceএর শিরোমণি। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সবার চাইতে সূক্ষ্মতম ও নির্দ্বন্দ্ব পরিণতি হইয়াছে নব Physicsএ। বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ধর্ম্মকে কি চোখে দেখে বা দেখিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহাই এখানে কিছু আলোচনা করা যাইবে।

আধুনিক যুগে Dogmatismএর উপর দাঁড়াইয়া থাকিবার উপায় নাই। তা সে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের হৌক, আর দর্শনের ক্ষেত্রের হৌক। Fetish পূজার দিন আজ গত হইয়াছে, চিরকালের জন্য। মানুষের মন পাঞ্জাব মেলের চাইতেও বেশী বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, নিত্য নব রাজ্যের দরজা খুলিয়া। ত্রিশ বছর আগেকার জ্ঞানবিজ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞান আসিয়া inside out করিয়া উল্টাইয়া দিতেছে এবং চিন্তার জগতে যেখানে ছিল নিশ্চিত বিশ্বাসের ও নিযুক্তিক dogmatismএর আস্তানা সেখানে আজ নব্য জ্ঞানতন্ত্র লণ্ডভণ্ড করিয়া topsy-turvyর সৃষ্টি করিতেছে।

আমাদের সম্মুখে যে বিপুল জগৎকে দেখি, তাহাকে চেনা বই বিজ্ঞানের অন্য কোন কাজ নাই। বিজ্ঞান অদৃশ্যের পিছনে ছোটে না, অনিশ্চিতের তোয়াক্কা রাখে না। যাহা নিশ্চিত, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহা লইয়াই বিজ্ঞানের কারবার। এই চোখে দেখা জগৎটাকে ছাড়া অন্য কোন আত্মিক জগতের খবর রাখিবার বালাই বিজ্ঞানের নাই। কিন্তু এই চোখে-দেখা স্পষ্ট জগৎটাকে বিজ্ঞান-তছনছ করিয়া পরীক্ষা করিল, বিশ্লেষণ করিল,—তাহার প্রত্যেকটী অণুপরমাণুকে, তাহার প্রত্যেকটী পাতানড়া জল পড়াকে বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি লইয়া মাল মশলা লইয়া খানাতল্লাসী করিল,—কিন্তু অন্ত পাওয়া গেল কি?

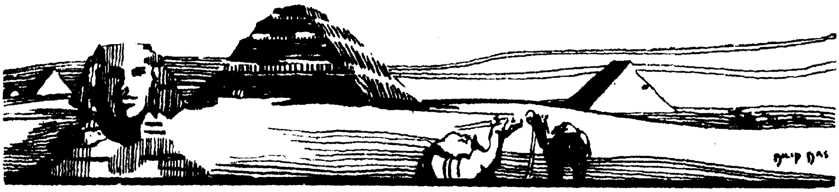
(ক্রমশঃ)

চিঠি

মৈত্রেয়ী দেবী

স্বপ্নময় কৈশোরের অর্দ্ধস্ফুট চেতনার তলে
সলজ্জ গুণ্ঠনে ঢাকা বাসনার দীপখানি জ্বলে
সে শিখা নিষ্কম্প নহে, বাতাসে বাতাসে
কভু তীব্র হয় কভু ক্ষীণ হয়ে আসে।
সুকোমল চিত্ততলে কি ফুটিতে চায়
সংখ্যাহীন বন্ধ টুটে সংকোচে শঙ্কায়।
অর্থ তার জানি নাই বুঝিনি উদ্দেশ
উদ্বেলিত চিত্ত মাঝে মত্ত সুখাবেশ—
হে বন্ধু মনে কি আছে শঙ্কিত অন্তরে,
সেদিন ধরেছি হাত একান্ত নির্ভরে।
কোন্ স্বর্গ সুধা নামে প্লাবি চিত্তভূমি
আমি যাহা বুঝি নাই বুঝেছিলে তুমি।
অর্থহীন আবেগের অনন্ত বেদনা
ব্যাপ্ত করি দিত যবে মুর্চ্ছিত চেতনা।
যৌবনের জয়ধ্বনি ক্রন্দনের মত
হৃদয় ভাসায়ে দেহে তরঙ্গিত হোত।
হে বন্ধু মনে কি পড়ে সেই বেদনার
আমরা ছিলাম সাক্ষী দুজনে দোঁহার।
অলস মধ্যাহ্নে কত নিভৃত কূজনে
নিদ্রাহীন বহুরাতে বসেছি দুজনে।
তারপরে কত দিন গেল কত রাত
নতুন জীবনে এলো নতুন প্রভাত,
সেদিনের তুচ্ছ কথা তুচ্ছ তার সুর
একদিনও মনোমাঝে আনে কি মধুর
কৈশোরের সেই স্বপ্ন, বিস্মৃত সে বাণী
তোমার আমার সেই স্নেহ জাল খানি।

আমার ভাণ্ডারে সখি, সঞ্চয় যে ক্ষীণ
জীবনের পাত্র হতে একটিও দিন
হারালে সবে না মম, ভয় তাই বুকে
যা পেয়েছি পাছে তাহা ভুলি কোনো সুখে।
যত দূরে যায় দিন তত তার সুর
বাজে মোর কাণে কাণে অমৃত মধুর
হে বন্ধু ভুলোনা তারে ফেলোনা হারায়ে
জীবনের প্রান্ত হতে দু'হাত বাড়ায়ে
তুলে নাও, সেই স্মৃতি সেই রাত্রি দিন
অপূর্ব্ব সখীত্ব সেই দীপ্ত অমলিন।
সত্য যাহা তাহা যেন উড়ে নাহি যায়
অলক্ষ্য মুহূর্ত্তে কোনো কালের হাওয়ায়



বিবাহে বিপ্লব

অমিতা দেবী

সমাজ-জীবন লইয়া আজ কথা উঠিয়াছে। কথা উঠিয়াছে যে সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে। যে সমাজে আমরা, আধুনিকরা ও আধুনিকারা, দিনযাপন করিতেছি সেই সমাজ পুরাণো হইয়া উঠিয়াছে। যে শান্তি মানুষের চিরকালের কাম্য সেই শান্তি আমাদের জীবনে আসে নাই। যে শক্তি সমাজের সকল ব্যক্তিকে—পুরুষকে ও নারীকে প্রবল প্রাণশক্তিতে 'দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও মেধাবী" করিয়া তুলিবে, সে শক্তি আজো উৎসারিত হইয়া উঠে নাই সমাজ-ব্যবস্থা হইতে। বরঞ্চ ব্যক্তি এবং সমাজ এই দুইয়ের জীবনেই উঠিয়াছে অশান্তির ঝড়। দুইয়ের জীবনই হইয়া উঠিয়াছে অবসাদে নিস্তেজ এবং সন্দেহে চঞ্চল। বহুদিন হইতেই অসন্তোষ এবং অশ্রদ্ধা জমিয়া উঠিয়াছে সকল ব্যবস্থার আড়ালে আড়ালে। কিছুদিন হইতে অধৈর্য্য বিদ্রোহ সকল বাধাকে ডিঙ্গাইয়া বন্যার মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে দেশে বিদেশে। বিগত যুদ্ধের পূর্ব্বে হইতেই এই বিদ্রোহ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে ইহা তুমুল কলোচ্ছ্বাসে সমাজের সকল দিক্‌কে আক্রমণ করিয়াছে এবং ঢেউএর পর ঢেউ আসিয়া অবিশ্রান্ত আঘাত হানিতেছে পৃথিবীর সকল অগ্রণী সমাজকে। ১৯৩৮ সনে পৃথিবীর প্রায় সকল মানব-সমষ্টি দ্রুত আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতে সুরু করিয়াছে।

বিবাহ সমাজের অতি প্রাচীন অনুষ্ঠান। পরিবারও তেমনি একটী অনুষ্ঠান যার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। বিবাহ এবং পরিবার, এই দুইয়ের যোগ অতি গভীর। এই দুইয়ের উৎপত্তি কবে, কেমন করিয়া হইল তাহা লইয়া মতভেদ রহিয়াছে ; এবং ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিমাণ সম্বন্ধেও মতদ্বন্দ্বের সীমা নাই। কিন্তু উৎপত্তির ইতিহাস যাহাই হোক ইহাদের পরস্পরের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিবাহকে কেন্দ্র করিয়াই পরিবারের উৎপত্তি হোক কিংবা পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই বিবাহের আবির্ভাব হউক, একথা নিশ্চিত যে বিবাহ এবং পরিবার-প্রথা এই দুইএর সমবায়ে সমাজ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে বহুদিন হইতে। বিবাহ হইল সেই গ্রন্থি যাহা নর-নারীকে একটা বিশেষ ধরণে বাঁধিয়া দিয়াছে। গ্রন্থি কোন যুগে বা কোন দেশে শিথিল হইয়াছে, কোন কালে বা কোন স্থানে শক্ত হইয়াছে। কিন্তু শিথিল হোক, শক্ত হোক, বিবাহ ও পরিবারকে ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান সমাজের বাহিরের কাঠামোটা দাঁড়াইয়া আছে। ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ফলে বিবাহ যে রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে একথাও বলা চলে যে সামাজিক জীবনের মর্ম্মস্থলে বিবাহ অতি গুরুতর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বিবাহ-প্রথার পরিবর্ত্তন ঘটিলে সামাজিক জীবনের সর্ব্বত্র সেই পরিবর্ত্তনের আঘাত তীব্রভাবে লাগিবে এবং সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে আমূল বিপ্লব ঘটিয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশেই বিবাহ-

প্রথা বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নানা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের ভারতবর্ষেও বিবাহ-প্রথার নানা বিচিত্র রূপান্তর ঘটিয়াছে বিবিধ যুগে।

কিছুদিন হইতে প্রচলিত বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে মানুষের সংশয় জন্মিয়াছে এবং বিবাহপ্রথাকে পরিবর্ত্তন করিবার দাবী চারদিক হইতেই শোনা যাইতেছে। এই পরিবর্ত্তনের দাবীর পশ্চাতে মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং ব্যাপক যুক্তি রহিয়াছে এবং আরো রহিয়াছে সমাজ-বিবর্ত্তনের অমোঘ নীতি। সমাজের বিবর্ত্তন ঘটিতেছে প্রতি মুহূর্ত্তে; নদীর স্রোতের মত বহিয়া চলিয়াছে মানুষের জীবন নানা জন্মান্তরের পথে। এই অবিচ্ছিন্ন গতি সমাজজীবনের সহজ ধর্ম্ম এবং এই গতিকে আশ্রয় করিয়াই সমাজ পা বাড়াইতেছে রূপ হইতে রূপান্তরে। জীবনের সকল পরিনামের মর্ম্মকথা হইল এই অবিশ্রান্ত অশান্ত বেগবত্তা এবং এই সচল গতিরই ছন্দে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে সমাজজীবনের সহস্রমুখী বিচিত্রতা। এই গতির আঘাতে কোথাও ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে জীর্ণ পুরাতন. কোথাও বা গড়িয়া উঠিতেছে আনকোরা নূতন। তাই সমাজতাত্ত্বিক গিডিংস্ (Giddings) বলিতেছেন; The first law of life is a law of motion. In society, as on the street, the preliminary duty is to 'move on'..." যে সমাজ পথেই ঘর বাঁধিয়া বসিবে চতুর্দ্দিকের চলিষ্ণু জীবনস্রোত তাহাকে বর্জ্জন করিয়া আগাইয়া যাইবে; সকল গতিকে হারাইয়া সে পাইবে অচল জড়ত্ব এবং জড়ত্ব আনিবে নিশ্চিত মৃত্যুকে। জীবনের লক্ষণ চলিষ্ণুতা, মৃত্যুর ধর্ম্ম স্থাণুত্ব।

সমাজের জীবনও তাই অহরহ নিত্য নব নব পথে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, ভাঙ্গা-গড়ার দ্বৈত ছন্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে অশ্রান্ত চলার সঙ্গীত। সমাজের প্রত্যেকটী প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি সচল ভঙ্গিমায় নিত্য নবজন্ম পাইয়া নতুন রূপ ধারণ করিতেছে। কোনটী ভাঙ্গিয়া যাইতেছে খান খান হইয়া, কোনটী বা নতুন শক্তিতে সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতেছে। তাই বিবাহ, পরিবার, সম্পত্তি, ধর্ম্ম, ইত্যাদি সবগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আজ যে পরিবর্ত্তনের দাবী উঠিয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে বিবর্ত্তনের অব্যর্থ রীতি, 'law of motion'.

সমাজ-জীবনের প্রত্যেকটী অঙ্গ অপর অঙ্গের সঙ্গে রহিয়াছে জড়িত ও যুক্ত হইয়া; এমন কোনো অংশ নাই যেখানে অপর অংশগুলির সহিত যোগ-সূত্র বিদ্যমান নাই। সমাজজীবনের সবগুলি অঙ্গ যেমন পরস্পরের সহিত অন্তরঙ্গ সম্পর্কে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে. তেমনি সমাজও আবার হাজার সূত্রে জড়াইয়া রহিয়াছে সমাজের বাহিরের বিরাট প্রকৃতির সহিত। মানুষের সঙ্গে নিবিড় যোগ রহিয়াছে মানবেতর প্রাণীজগতের এবং সমস্ত প্রাণীজগৎ অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত ও জড়িত হইয়া আছে জড়জগতের সঙ্গে।

বিশ্বব্যাপী এই সংযোগের মধ্যে কোনো অংশের সাধ্য নাই যে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র রীতিতে চলে। সমাজ জীবনেও এই সার্ব্বজনীন সত্য চিরকাল প্রযোজ্য। সমাজের আছে নানা দিক ও (aspect) বিবিধ প্রকাশ। ব্যক্তির জীবন যেমন নানা বিচিত্র শক্তি

ও প্রবৃত্তির ক্ষেত্র, তেমনি সমাজের জীবনও বহুমুখীন বিবিধ গতি ও আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা-স্থল। সমাজ এই বিবিধ গতির ও শক্তির সংঘাতের ফলে নানা পথে জীবনকে বিস্তৃত করিয়া দেয় এবং সমাজের এই বহুবিধ বিস্তার ও বিকাশকেই আখ্যাত করি 'সভ্যতা' বলিয়া। মানুষের সভ্যতা হইল মানুষের বহুবিধ আত্মবিস্তারের সমষ্টি-গত রূপ। নানা ভঙ্গীতে ও অসংখ্য ছাঁদে মানুষ নিজেকে ফুটাইয়া, ফলাইয়া তুলিতেছে যে অপরূপ সমৃদ্ধিতে, সেই ক্রম-সঞ্চিত সমৃদ্ধিকেই বলি সভ্যতা। মানব-সমাজ আত্মবিস্তার করিয়াছে তাহার অর্থনীতিতে, তাহার পরিবারে, বিবাহে, রাষ্ট্রে, বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে, নীতিতে, আইনকানুন এবং শিল্পকলায়। জীবন দ্রুতগতিতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এই সব বিভিন্ন দিকে ও বিচিত্র পথে। কিন্তু এই সব বিভিন্ন প্রকাশ পরস্পর হইতে বিভিন্ন হইলেও বিচ্ছিন্ন নয়। সম্পূর্ণ নিরালম্ব ও খণ্ডিত বিকাশ কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব নয় এবং একের গতি ও জীবনের সঙ্গে অপরের জীবন ও গতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। জীবনের সকল দিকই পরস্পরের উপরে নির্ভরশীল, একের ক্ষতি-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও ক্ষতি-বৃদ্ধি সততই ঘটিতেছে। একে অন্যকে প্রভাবিত করিতেছে, পরিবর্ত্তিত করিতেছে এবং পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে জন্ম লইতেছে নিত্য নতুন সংস্কৃতির নব নব রূপ। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ F. Mueller- Lyer নাম দিয়েছেন 'Inter-functional law'.

অর্থনীতি, বিবাহ, পরিবার, ধর্ম্ম, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রই পরস্পরকে পরস্পর আঘাত করিতেছে এবং তাহার ফলে সকলেই সকলের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইতেছে। "The field of inter functional relationship is extraordinarily large and complicated, for every sociological function is dependent on every other in some way." (Mueller-Lyer) সুতরাং এক ক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন ঘটিলে, অপর সকল ক্ষেত্রেই সমান্তরালভাবে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ঘটিলে, সেই বিপর্য্যয়ের প্রভাব বিবাহে, পরিবারে, ধর্ম্মে, সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন ঘটাইবে। তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বিপ্লব ঘটিয়া গেলে, তাহার ছায়া পড়িবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এবং ফলে সমাজের অর্থনৈতিক জীবনেও আসিবে অনিবার্য্য বিপ্লব। সমাজ জীবনের এক ক্ষেত্র সততই বেষ্টিত, আবরিত এবং বিধৃত হইয়া রহিয়াছে অপরাপর ক্ষেত্রগুলি দ্বারা। এই অর্থে এক ক্ষেত্রের পারিপার্শ্বিকই (environment) হইল অপরাপর ক্ষেত্রগুলি। কাজেই আশে পাশে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেলে, অপর প্রত্যেকটী ক্ষেত্রকে সত্বর ঘর সামলাইয়া লইতে হয়। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়। পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিবার নীতিই হইল সমগ্র জীবনের বিবর্ত্তনের নীতি। এই নীতিকেই হার্বার্ট স্পেন্সার (H. Spencer) নাম দিয়াছেন 'Law of adaptation' বা পারস্পরিক সামঞ্জস্যের নীতি। সমস্ত বিশ্ব সংসারের সকল বিবর্ত্তনের মূলে রহিয়াছে এই মৌলিক নীতি। এই নীতির ব্যত্যয় ঘটিলেই সমাজে আসে বিপ্লব। সমাজ জীবন নিজেকে বিকশিত করিয়া চলিয়াছে সমগ্রভাবে ; এক

অখণ্ড ছন্দে সমষ্টি জীবন পলে পলে পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হইতেছে। সকলের পৃথক ছন্দের অবদানেই এই সমগ্রতার ছন্দ গড়িয়া উঠিতেছে, সকলের পৃথক সুরের সমবায়েই এই বিচিত্র ও পরিপূর্ণ ঐক্যতান বাজিয়া উঠিয়াছে। কোনো একটীমাত্র ছন্দ স্বতন্ত্রভাবে ও পৃথক ভঙ্গীতে আপনাকে ছন্দিত করিয়া তুলিতে গেলেই ঘটে ছন্দ পতন, এবং সমাজ জীবনে এই ছন্দপতনের নামই যুগান্তকারী বিপ্লব। কাজেই অর্থনীতিতে হৌক, বিজ্ঞানেই হৌক, রাষ্ট্রে হৌক, বিবাহে বা পরিবারে হৌক, যেখানেই কোনো কারণে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেখানেই সমান তাল রাখিয়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্ত্তন ঘটানো দরকার হয়। এই পরিবর্ত্তন কোনো আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটনা নয়, ইহা হইল সমাজ বিবর্ত্তনের নিষ্ঠুর প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে স্বীকার যে সমাজ করিবে না সে সমাজের দুর্গতি অনিবার্য্য। হয় সে সমাজ বিলুপ্তি ও বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যাইবে, নতুবা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে সে সমাজ নির্ম্মম ধ্বংসের উপরে ভবিষ্যৎ জীবনের নতুন ভিত্তিকে স্থাপন করিবে। ইতিহাসের এ অমোঘ রীতি।

গত শতাব্দী হইতে পৃথিবীর মানব সমাজে বিচিত্র ভাঙ্গন গড়নের যুগ আসিয়াছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইতেছে এবং ফলে একদিক অন্যদিকের সঙ্গে তাল না রাখিতে পারায় বহু ক্ষেত্রেই ছন্দপতনও ঘটিয়া যাইতেছে। চারদিকে নানা অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে এবং জীবনে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা মাথা উঠাইয়াছে। বিবাহ পদ্ধতির ক্ষেত্রেও চারদিকে বিশৃঙ্খল ওলট পালট সুরু হইয়াছে। সমাজের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে গভীর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হওয়ার ফলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতির সেই নতুন অভ্যুদয়ের সঙ্গে খাপ খাইতেছে না। কাজেই বর্ত্তমান বিবাহ ও পরিবার আধুনিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিতান্ত বেসুরা ও খাপছাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বিবাহ পদ্ধতিকেও সংস্কার ও পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে। যুগে যুগে এই পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া মানব সমাজ জীবনের গতিকে অব্যাহত রাখিয়াছে এবং বিবাহ পদ্ধতির নানা বিচিত্র রূপ ও রূপান্তর দেশে ও কালে এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে।

একদল লোক চিরকাল এই পরিবর্ত্তনকে বাধা দিয়া আসিয়াছে, চিরদিন এই অনিবার্য্য গতিকে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। নতুনের দুঃসহ অভ্যুদয়কে তাহারা সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া গতানুগতিককে আকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবার সাধনাই তাহারা করিয়াছেন। পুরাতন বস্ত্রকে বর্জ্জন করিয়া নতুন বসন গ্রহণ করিবার যে সাধারণ স্বাস্থ্যনীতি তাহাকে তাহারা জীবনে স্থান দেন নাই। বিবাহ পদ্ধতিতে গভীরতর পরিবর্ত্তনের যুগ আসিয়াছে। রক্ষণশীল সম্প্রদায় এই কথাটাকে স্বীকার না করিলেও সমাজ অব্যর্থ নীতিতে আপনার আত্মবিস্তারের পথ বানাইয়া লইবে। পারিপার্শ্বিকে যে পরিবর্ত্তন ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে তাহার ফলে বিবাহ পদ্ধতিতেও পরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। স্পেন্সারের মতে, "man needed one moral constitution to fit him for his original state, he needs another to fit him for his present state, and he has been, is and will long continue to be, in process of adaptation."

৫

আজ এই সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ডাক উঠিয়াছে চারিদিকে। এই ডাকে সাড়া দিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। শিক্ষা বিস্তার এবং আর্থিক ব্যবস্থার বিপ্লব ঘটিয়াছে বিজ্ঞানের দৌলতে। এই বিপ্লবের ফলে বিবাহ-পদ্ধতি ও পারিবারিক জীবনেও বিপ্লবের আহ্বান আসিয়াছে। এই বিপ্লব না ঘটাইলে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্ম হইতে পারিবে না। পৃথিবীর স্থানে স্থানে মানব জাতির মানসলোকে যে ভবিষ্যৎ সমাজের অর্দ্ধজাত রূপ জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে, সেই সমাজকে বাস্তবলোকে ভূমিষ্ঠ করিতে হইলে বিপ্লব আনিতে হইবে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি, পরিবার পদ্ধতি এবং সমস্ত জীবন-পদ্ধতিতে। কিন্তু এই বিপ্লবের রূপ কি ?

আমরা সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখি সমাজ বিবর্ত্তনের একটা ছন্দ রহিয়াছে, যে ছন্দে জীবন চিরকাল ধরিয়া আন্দোলিত হইতেছে। সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যক্তিকে লইয়া; ব্যক্তির জীবনকে বিকাশের পথে লইয়া যাইবার জন্যই সমাজ; কিন্তু ব্যক্তির ষোলআনা স্বাতন্ত্র্যকে খর্ব্ব করিয়া তবেই সমাজ আপনার আদর্শকে সার্থক করিতে পারে। ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ চিরদিনই একটা সূক্ষ্ম ও চঞ্চল সামঞ্জস্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছে। ব্যষ্টির অধিকার ও সমষ্টির অধিকার এই দুইয়ের সীমারেখা স্থায়ীভাবে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। একথা ঠিক যে ব্যষ্টির স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের প্রয়োজনই ব্যষ্টির জীবনের সেরা কথা, কিন্তু একথাও সমান সত্য যে ব্যষ্টির জীবনকে আংশিকভাবে খর্ব্বিত না করিলে সমষ্টির জীবন গড়িয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু কোথায়, কোন্ সীমায় যে ব্যষ্টির রাজ্যের সীমা শেষ হইল এবং সমষ্টির রাজ্যের সীমানা সুরু হইল, তাহার মীমাংসা চূড়ান্তভাবে হওয়া সম্ভব নয়। এই কারণে সীমানা লইয়া ব্যক্তি ও সমষ্টি এই দুইয়ের বিরোধ প্রত্যেক যুগেই প্রখর হইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিহাস এক এক যুগে এক এক রকমের মীমাংসার সাহায্যে সাময়িক সমাধান করিয়া করিয়া আগাইয়া চলিয়াছে। কোনো যুগে যেমন ব্যক্তি প্রবলতর হইয়া সমাজের ক্ষমতাকে হ্রাস করিয়া আনিয়াছে, তেমন পরবর্ত্তী যুগে সমাজ আবার প্রবলতর শক্তিতে ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিয়াছে। কোনো যুগে যদি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রবলতর হইয়াছে, তবে পরবর্ত্তী যুগ আবার সমাজ-তন্ত্রকে সিংহাসন দান করিয়া ভারসাম্য রক্ষা করিয়াছে। এমনি দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া সমাজ-বিবর্ত্তন অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, চঞ্চল গতিতে। পেণ্ডুলামের (pendulum) দোলার মতো বিপরীত গতির মধ্য দিয়া কালের যাত্রা চলিয়াছে যুগের পর যুগ। বিবাহপদ্ধতিকে বুঝিতে হইলেও এই দ্বন্দ্ব-আবর্ত্তিত গতির তত্ত্বকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

বিবাহের ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় কোনো যুগ যদি বিবাহ-ব্যাপারে ব্যক্তিকে ব্যাপকতর স্বাধীনতা দান করিয়া থাকে, তবে পরবর্ত্তী যুগে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিয়া সমাজ-শাসনকে প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। ব্যক্তির ক্ষমতা যখন অতিরিক্ত আতিশয্য প্রাপ্ত হয়, তখন সেই আতিশয্যের চাপে জীবনের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। তখন সেই বিনষ্ট ভারসাম্যকে পুনরুদ্ধার করিতে পরবর্ত্তী যুগে ব্যক্তির ক্ষমতাকে ও অবাধ স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে হয়। আবার সমাজের বন্ধন যখন কঠিন আড়ষ্টতার চাপে স্বাধীন বিকাশের পথকে রুদ্ধ করিবার উপক্রম করে তখন,

সমাজকে ভাঙিয়া ব্যক্তির মুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন আসে। বিবাহব্যাপারে ১৮ শতক এবং ১৯ শতক সমষ্টি-তন্ত্রের যুগ। বিবাহে ব্যক্তির রুচি, ব্যক্তির স্বাধীন মননা ও ঈষণাকে সমাজ কঠোর শাসনে খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছিল। সমাজের প্রভাব ছিল তখন অপ্রতিহত, প্রতাপ ছিলো দুর্ব্বার। যে যুগকে আমরা Victorian (ভিক্টোরীয়) যুগ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি, সেই যুগের বিবাহব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের অবাধ অবকাশ ছিলো দুর্লভ। সমাজ-শাসনের কঠোর লৌহ-শিকলের বন্ধনে ব্যক্তির জীবন হইয়া উঠিয়াছিল দুর্ব্বহ; ব্যক্তির মন মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ না পাইয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। ফলে ঐতিহাসিক গতির অনিবার্য্য রীতিতে বিংশ শতকে ব্যক্তির বিদ্রোহ মাথা উঠাইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিংশ শতকে বিবাহ-ব্যাপারে সমাজের হস্তক্ষেপ সহ্য করিবার মনোভাব আজ প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। যুদ্ধের আগেই এই বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিয়াছিল; যুদ্ধের পরে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নিদারুণ বিদ্রোহ বিশাল আকার লইয়া আবির্ভূত হইয়াছে এবং সমাজকে ভাঙিয়া চুরিয়া ব্যক্তির অপ্রতিহত স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠা করিবার উপক্রম করিয়াছে। বিবাহ-ব্যাপারে এই যুগ হইল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা Individualismএর যুগ। ইতিহাসের নীতি অনুযায়ী Pendulum আজ ঝুঁকিয়াছে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের দিকে। নর-নারীর সম্বন্ধের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ও অধিকার নাই। বিবাহ নিতান্তই ব্যক্তির রুচি ও ব্যক্তির অভিলাষের ব্যাপার। এখানে সমাজের বা অপর কোন পক্ষেরই কর্তৃত্ব স্বীকৃত হইবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "য়ুরোপে সমাজ-বিপ্লব দেখা দিয়েছে। সেখানকার সমাজের মধ্যেই তার স্বাভাবিক কারণ বর্ত্তমান। সেখানকার স্বভাবের নিয়মেই তার একটা নিষ্পত্তি হবে।" (বিচিত্রা—আষাঢ়, ১৩৩৭) সমাজ-বিপ্লব আসিয়াছে য়ুরোপে, তার কেন্দ্র হইল স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধের ধ্রুবত্ব সম্পর্কিত প্রশ্ন। ব্যক্তির রুচি ও অবস্থা অনুসারে বিবাহ সম্বন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কি না এবং ব্যক্তির অভিরুচি অনুযায়ী এই পরিবর্ত্তন সাধন করিবার অধিকার ব্যক্তির আছে কিনা। যাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের গোঁড়া সমর্থক তাহারা বিবাহ-ব্যাপারে অবাধ পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করিতেছেন এবং তাহাদের মতে নর-নারীর সম্পর্ক কেবলি মাত্র দুইজন সম্পর্কিত ব্যক্তির স্বতন্ত্র ব্যাপার। চরমপন্থী মতবাদ বিবাহকে একেবারে সমূলে বিলুপ্ত করিয়া সমাজে ব্যক্তির মোটামুটি অবাধ ও অসীম স্বাধীনতাকে প্রবর্ত্তন করিতে চাহে। রক্ষণশীল দল আবার আজো ১৮ এবং ১৯ শতকের কঠোর সমাজ-শাসনকে অব্যাহত রাখিয়া ব্যক্তিকে খর্ব্ব করিয়া রাখিতে চাহেন। এই দুই চরম পন্থাকেই ইতিহাস বর্জ্জন করিবে আপনার ভারসাম্যকে রক্ষা করিয়া চলিবার অব্যর্থ নীতিতে। এই দুই চরমপন্থাই একদেশদর্শী এবং অনৈতিহাসিক। যাহারা প্রচলিত বিবাহকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহেন অক্ষত ও অবিকৃত তাহারা যেমন একপেশে গোঁড়ামীর সমর্থক, যাহারা বিবাহ-পদ্ধতিকেই মূল সহ উৎপাটন করিয়া ব্যক্তির অবাধ যৌন স্বাধীনতাকে প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন তাহারাও আতিশয্যকে আসন দান করিতেছেন। আতিশয্য সমাজসাম্যকে ভারচ্যুত করে এবং

লেনিনের ভাষায় ইহাকে 'Infantile disorder' বলিলে দোষ হয় না। পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়, কারণ ইতিহাসের তাহাই ইঙ্গিত। বিপ্লব অনিবার্য্য এবং চিরকাম্য একথা ঠিক, কিন্তু সকল বিপ্লব ও পরিবর্ত্তনের পিছনে সমাজরক্ষার ও বিকাশের উপাদান ও সম্ভাবনাকে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে নতুবা বৃথা ধ্বংস অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিবে। Prof. Giddingsএর ভাষায় "But the moving on must be developmental; mere change is not evolution but confusion."

গান

অনুরূপা দেবী

যে সুর বাজে তোমার একতারাতে, বাজাও আমার চিত্ত বীণায়,
সে প্রেম প্রাণে উঠুক জাগি, যে প্রেম তোমার বিশ্ব জাগায়
দাঁড়াও তুমি হে অপরূপ, আমার মাঝে আড়াল করে
আমার মনের মলিনতা স্পর্শে তোমার পড়ুক ঝরে,
জীবন আমার পূর্ণ করো, তোমার প্রেমানন্দের বিমল ধারায়।

পথের বুকে

রেণু সেন

অনেক দিন জীবন এক নিভৃত বাঁধা ধারায় চলেছে। হঠাৎ কল্‌কাতা এসে তার জনতা, তার উৎক্ষেপ বিক্ষেপ, তার ধাবমান চাঞ্চল্য, কল্লোলিত কর্ম্মপ্রবাহ এসব কিছুতেই যেন ধাতস্থ হচ্ছিল না। তার উপর চারিদিকের অনাত্মীয় আবেষ্টনী। ফলে ধীরে ধীরে এক নিদারুণ নিঃসঙ্গতা বেড়ে যাচ্ছিল।

এক মেসে উঠেছি। বিশেষ আলাপ পরিচয় কারও সাথে হয় নি। সবাই আপন কাজে অথবা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। ভোরে সবাই খুব দেরিতে উঠে। তারপর তাড়াহুড়া করে নাকে মুখে কিছু গুঁজে বেরিয়ে পড়ে। সন্ধ্যায় ফেরে। দেহ মন দুই থাকে কর্ম্মক্লান্ত, আনন্দহীন, অবসাদগ্রস্ত। কাজেই ইচ্ছা থাক্‌লেও কেউ কারো সাথে আত্মীয়তা করার সুযোগ পায় না।

ক'দিন যাবত শরীরটা যেন কেমন লাগছিল। নানা জায়গায় ঘোরাঘোরি করে সে অস্বস্তি বোধটা আরো বেড়ে গেল। সন্ধ্যায় একদিন ফেরার পথেই ট্রামে বেশ জ্বর হল। কোন মতে মেসে এসে লেপ কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লুম। সারা রাত্রি মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, শরীরে আগুনের দাহ। এভাবে ক'দিন কাটল। জ্বর ছাড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

অসুখের একটা বিশেষ দান এই যে ইহা অনেক সময় কোন কোন মানুষের চিত্তবোধকে সর্ব্বানুভূ করে তোলে। যে সব জিনিষ বা ঘটনা কোন দিন দৃষ্টিপথে আসে না বা মনের উপর কোন ছাপ রাখে না শুধু বর্ণহীন, শব্দহীন নিত্য-নৈমিত্তিকতার স্রোতে ভেসে বেড়ায়, তারাও যেন সে সময় অন্তরের ভাবানুষঙ্গে মণ্ডিত হয়ে নানাভাবে রূপায়িত ও রসায়িত হয়ে উঠে।

মেসের একটি ছোট কোঠায় আছি। জিনিষ পত্রে সারা ঘর ভরা। কোনমতে মেঝের উপর ২।৩টি বিছানা পাতা চলে। দিনের বেলা প্রায় একাই শুয়ে থাক্‌তে হয়। মাঝে মাঝে কেউ আসে, এটা সেটা করে দিতে, বা কেমন আছি জিজ্ঞেস্ করতে। তারপর চলে যায় আপন আপন কাজে। ইচ্ছে হয় একটু বস্‌তে বলি, পর মুহূর্ত্তেই সঙ্কোচ আসে। নীচে পায়ের শব্দ শুনলে মনে হয় কেউ আমাকে দেখ্‌তে আস্‌ছে। একটু আন্তরিক সামীপ্য, একটু সহমর্ম্মিতা পেতে মন একান্ত ইচ্ছুক। নির্জ্জন নিঃসঙ্গতাবোধ কিছুতেই যেন যেতে চায় না।

ঘরে এলোমেলো কত জিনিষ পড়ে আছে এক রঙা সামান্যতার অন্তরালে। কোনদিন এদের অন্য দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা করি নি। আজ সকলে নূতন ভাবে নূতন রূপে আমার কাছে এসেছে। আমিও সর্ব্বগ্রাহী দৃষ্টিতে এদের দেখছি; অন্তরের রুক্ষ শূন্যতা এদের রূপ-ছোঁয়ায় দূর করছি।

মাথার কাছেই কেলেণ্ডারটা। অন্য দিন শুধু তারিখ জানতে একে খুঁজেছি। আজ ১৯৩৮ সাল দেখেই মন কোন্ সুদূর অতীতে চলে গেল। মানবতার প্রতি সুগভীর দয়া ও সুবিশাল সহানুভূতি নিয়ে কোথায় কিভাবে এক মহাপ্রাণ জন্ম নিয়েছিল; আরো কত কি।

ক'দিন হয় জ্বর ছেড়েছে। আজ ভাত খেয়েছি। ঘরের বদ্ধ আয়তনে আর মন থাক্‌তে চায় না। বাহিরের বর্ণনৃত্য আলো বাতাস, উদার বিস্তৃতি আমাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টান্‌তে লাগল। কোন মতে বিছানা ছেড়ে উঠেই বেরিয়ে পড়লুম। শরীর বড় দুর্ব্বল। পা চল্‌তে চায় না, কিন্তু মন অদম্য। নিকটেই একটা পার্ক ছিল। সে দিকে চল্লুম। দোকান পাট,-ট্রাম বাস ছোট বড় বাড়ী কিছুই যেন আজ চিরাভ্যস্ত, চিরপ্রত্যাশিত, মনে হল না। সবাই আজ নূতনত্বে রসাক্রান্ত, সবাই আজ সজীব ; সবাই প্রত্যক্ষ, ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ।

ফুট পাতে নানা ব্যাধিগ্রস্ত একদল ভিখারী বসে থাকে। তাদের ছোট ছেলে মেয়েরা 'বাবু একটা পয়সা' বলে হাত বাড়াল। পকেটে সামান্য কিছু ছিল। দিয়ে পার্কে ঢুকে পড়লুম। রাস্তায় লোকজনের ভিড় খুব বেশী। হাট্‌বার সামর্থ্যও তেমন নেই। ভিতরে ঢুকে ঘাসের উপর বসলুম। চারিদিকে স্নিগ্ধ, জীবন প্রদ, সুনবীন শ্যামলতা সৌন্দর্য্যের নিত্য উৎস খুলে দিয়েছে। আমি বসে বসে তাই উপভোগ করছি। দূর হতে শিশুদের হাস্যোচ্ছ্বাস প্রাণের অজস্রতা নিয়ে আমার কাছে আসছে, আমাকে উদ্‌জ্জীবিত করছে।

আকাশ বিরাট বক্ষপট মেলে দিয়েছে। সুনীল বিস্তৃতি। তাতে অগণ্য আবর্ত্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের অশ্রান্ত, অনাদ্যন্ত প্রবাহ চল্‌ছে, কোন অনন্ত সম্ভাব্যতাকে লক্ষ্য করে। কে জানে এ অনন্ত অবিশ্রাম গতির পরম পরিণতি চরম স্থিতি কিনা ?

একটু রাত্রি হয়েছে। শীতও লাগ্‌ছে। উঠে ধীরে ধীরে মেসের দিকে রওনা হ[illegible]। রাস্তায় খুব ভিড় জমেছে। সাম্‌নে অনেকগুলি ভীষণ ভারী বস্তা বোঝাই করা একটি গাড়ী দুটো মোষে প্রাণপণে টান্‌ছে। কিছুতেই এগুচ্ছে না; রাস্তার মুখ এতে রুক্‌ড্‌ হয়ে গেল। পিছু হতে 'হট, হট' বলে বাসওয়ালারা হর্ণ বাজাচ্ছে। রুদ্ধ গতি জনতার চিৎকার ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে গাড়োয়ান নির্ম্মমভাবে মোষ দুটার উপর লাঠি চালাতে লাগল, একটু এগিয়ে যাওয়ার জন্য। লাইনের উপর ট্রাম আস্‌ছে, সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। চারিদিকের উত্তেজনা ও সারা দিনের প্রাণান্তক পরিশ্রমে মোষ দুটাও ক্ষেপে গেল। মরিয়া হয়ে গাড়ীটা টেনে লাইনে আসল। ঘর্ঘর শব্দে ট্রাম এসে পড়ল। ধাক্কার চোটে একটা মোষ আহত হয়ে ছিট্‌কে গেল। এক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ রাস্তার কর্ম্মকোলাহল ছাপিয়ে উঠে দিগন্তের বুকে মিশে গেল। মুহূর্ত্তের জন্য চারিদিক স্তম্ভিত, শান্ত, নিরস্ত ও নিঃস্পন্দ। তারপর আবার চাঞ্চল্য, একটানা গতি।

রাস্তায় রক্ত গঙ্গা। আমার আর দাঁড়ান সম্ভব হল না। দেশে দেশে, যুগে যুগে, চিরলাঞ্ছিত চিরদলিত জীবাত্মার পুঞ্জীভূত বেদনার বাণী যেন এই মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তস্বরে ধ্বনিত হয়ে আমার প্রাণে বাজছে। মোহাবিষ্টের মত মেসের দিকে ফিরছি।

রাত্রিতে আর ঘুম হল না। সকালে আবার ভারাক্রান্ত মনে পার্কের দিকে চল্‌ছি। দমকলে রাস্তায় জল দিচ্ছে। ও জায়গায় এসে দেখি সব রক্ত ধুয়ে গেছে। জীবন-নাট্যের যে এক বিষাদময় অভিনয় কাল এখানে হয়েছিল তার কোন চিহ্ন আজ পথের বুকে নেই।

বর্ত্তমানের শৃঙ্খলিত সাহিত্য

মন্মথকুমার চৌধুরী

স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে প্রোমেথিউস্ চেয়েছিল মানব জাতির মনকে জ্ঞানের আলো বিকীরণে উদ্ভাসিত করে তুলতে—ফলে তাকে বরণ করে নিতে হ'লো বন্দীত্বের কঠিন শৃঙ্খল। গোটা মানব জাতির স্তিমিত চেতনায় যাঁরা ছড়িয়ে দিলেন বন্ধন মোচনের স্ফুলিঙ্গ, শোষণকারী রাষ্ট্রের ভয়াল রূপকে যাঁরা উদ্ঘাটন করলেন জগতের সাম্‌নে—প্রোমেথিউসের মতোই তাঁদের নীরবে সইতে হ'লো রাষ্ট্রের কঠোর নির্য্যাতন। ফ্যাসিজমের অভ্যুদয়ের সঙ্গে মানুষের জাগরণের উন্মেষকে নিরুদ্ধ করবার চেষ্টাই সব চাইতে হিংস্র হয়ে উঠেচে। আধুনিক সাহিত্যে, অচিরধ্বংসশীল ক্যাপিটেলিজম নৈরাশ্য এবং হতাশার সুর শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠেচে এবং আগামী বিপ্লবের স্পষ্ট ইঙ্গিত আধুনিক সাহিত্যে ফুটে উঠেচে বলেই, ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র নির্ম্মম শাসনে নিরুদ্ধ করে দিতে চাচ্ছে সমস্ত প্রগতিশীল মতবাদকে। স্ফুর্ত্তির সহজ এবং স্বচ্ছন্দগতি হারিয়ে সাহিত্য আজ পঙ্গু।

ক্যাপিটেলিজমের প্রথম অধ্যায়ে সাহিত্যের প্রসার এবং সমৃদ্ধির কথা অনস্বীকার্য্য। এর কারণ ক্যাপিটেলিজম তার উন্নতিশীল পর্য্যায় অতিক্রম করে তখনও স্থিতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াপন্থী হয়ে উঠেনি—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ক্যাপিটেলিজম বিপ্লবাত্মক অধ্যায় অতিক্রম করে ফ্যাসিজমের রুদ্রমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করলে—সংস্কৃতির সাথে তখনই এর সংযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। শিল্পকলার সাথে ধনতন্ত্রবাদের বিরোধ হয়ে উঠ্‌লো তীব্রতর, বুদ্ধিজীবীরা জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফ্যাসিজমের পরোক্ষ দয়ার' পর নির্ভরশীল হয়ে উঠলো—অর্থনৈতিক দাসত্ব তাদের সাবলীল রসসৃষ্টিকে করলে ক্ষুন্ন, স্বাধীনচিন্তার অবরোধের ফলে সাম্প্রতিক সাহিত্যের পরিণতি হ'লো ফ্যাসিজমের প্রতিধ্বনিতে।

ফ্যাসিজমের পাণ্ডারা কঠিন আদেশের ভঙ্গীতে শিল্পীকে বলচেন—"সংগ্রামকে উপেক্ষা করে কোন সাহিত্যই রচিত হ'তে পারে না। ফ্যাসিজমের জীবন-মরণ যুদ্ধে কারো নিরপেক্ষ থাকবার উপায় নেই। There are no neutral zones, write as we demand, or you will be destroyed. মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাহিত্য-শিল্পীরা চেয়েছিলেন একখানি আরাম-রমণীয় নীড়—জীবন সংগ্রামের কোলাহলের উর্দ্ধে, প্রাত্যহিক ধরণীর ধূলিমলিন স্পর্শের বাইরে সাহিত্য সৃষ্টির নির্জ্জন আকাশ—কিন্তু ফ্যাসিজম তাঁদেরকে শান্তির নিরাপদ পরিবেশ থেকে নিয়ে আসতে চাইলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কলরব মুখরিত প্রাঙ্গণে। Goebbles তাই আর্টিষ্টদের শাসিয়ে বলচেন—"It would be naive to suppose that revolution will spare art, that the latter will be able to lead its form of existence as a sleeping beauty somewhere alongside of the epoch or in its backyards." কোন সত্য সাহিত্যই জীবনকে অনাদর করে রচিত হ'তে পারে না। কারণ সাহিত্য আসলে জীবনেরই প্রতিরূপ এবং

সাহিত্য যে শুধু সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলনে সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয়—সাহিত্যের অন্তরে রূপায়িত হয়ে উঠে অনাগত ভবিষ্যতের ছবি। ফ্যাসিজমের প্রসারের পর যে অসন্তোষের আগুন সমাজের স্তরে স্তরে ধূমায়িত হয়ে উঠেচে, অচির ভবিষ্যতের যে বিপ্লব বহ্নি যে কোন মুহূর্ত্তে লাভা স্রোতের মতো আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঠামোকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারে ; সাম্প্রতিক সাহিত্যের সেই আগতপ্রায় ভবিষ্যত এবং ধূমায়িত বিপ্লবের ছায়াপাত থেকে বিমুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। গোয়েবোল্‌সের মতো আমিও বিশ্বেস করি যে, জীবনকে উপেক্ষা করে অবসরভোগী সমাজের খেয়াল চরিতার্থতা করবার সময় এবং সুযোগ আধুনিক সাহিত্যের নেই। বর্ত্তমান সাহিত্যেরে রাজনীতি, সমাজনীতি এবং অর্থনীতির প্রভাব অতিক্রম করে গড়ে উঠা প্রায় অসম্ভব। কারণ সাহিত্যসৃষ্টির মূলে রয়েচে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এবং আবেষ্টনীর যুক্তপ্রেরণা। কিন্তু ফ্যাসিজমের সাথে আর্টের বিরোধ বেঁধেচে আগামী যুগের বাস্তবতা নিয়ে। সমাজতন্ত্রবাদের দ্রুতবিস্তারের ফলে প্রায় সকল দেশেই নির্য্যাতিত মানুষের বুকে জেগেচে যে বিপুল উদ্দীপনা, নতুন রাষ্ট্র এবং সমাজ গড়ে তুলবার জন্যে যে দুর্ব্বার শক্তির প্রক্রিয়া চলছে ফল্গুধারার মতো,ফ্যাসিজমের পাণ্ডারা আগামী যুগের এই সুনিশ্চিত পরিণতির ক্ষীণতম আভাস থেকেও সাহিত্যকে দূরে রাখতে চান। ইতালী এবং জার্ম্মেণীতে ফ্যাসিজমের অক্টোপাস হিংস্র উন্মত্ততায় গ্রাস করেচে তার সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে। সাহিত্যের পূত মন্দিরে আজ সুরু হয়েচে ফ্যাসিজমের ভীষণ কালাপাহাড়ীপণা। সেখানে সাহিত্যিকরা পরিণত হয়েচে ফ্যাসিজমের অন্ধ ক্রীড়ণকে। কবি, শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ রয়েচে—তাঁদের রচনার মধ্যে ফ্যাসিস্ত সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের প্রচার ছাড়া আর কিছুই স্থান পাবে না। গ্রামোফনের মতো তাঁদের প্রতিধ্বনি করতে হবে হিট্‌লার এবং মুসোলিনীর স্তুতিগান।

কার্ল রেডিক্, Mario Carliর 'An Italian of the Times of Mussolini এবং আরও ক'খানা বই এর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দেখিয়েচেন—কী অন্যায় ভাবে আজ ফ্যাসিজম্ জীবন-শিল্পীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত সাহিত্যসৃষ্টির' পর প্রচারের তুষারস্তূপ চাপিয়ে দিয়ে বলচে—তোমাদের রচনার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠবে ফ্যাসিজমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ছবি—কবি ও শিল্পীর বীণায় বেজে উঠবে ফ্যাসিজমের জয়গাথা।

জার্ম্মেনীতে আমরা শুধু ইহুদী বিতাড়নের সংবাদই শুনেচি— সাহিত্য এবং শিল্পকলার 'পর জার্ম্মেন ফ্যাসিস্তদের যে দৌরাত্ম্য চলেচে—তার বিশদ বিবরণ দিয়েচেন Radik. জার্ম্মেন রাষ্ট্র একদল চারণ সাহিত্যিক গড়ে তুলেচে, যাদের একমাত্র বুলি "Land, Blood, the Nation." Radik দৃষ্টান্তস্বরূপ Johst এবং Benumelburg'র নাম করেচেন। ক্যাপিটেলিজম্ আজ আপাত মনোহর 'ইজমে'র আবরণে আত্মরক্ষায় মরীয়া হয়ে উঠেচে। ক'মাস আগে তুর্কীর বিখ্যাত কবি নাজিম খিক্‌মতের গ্রেপ্তারের কথা পড়েছিলুম। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, জার্ম্মাণী এবং ইতালীর অন্যায় সাম্রাজ্যলিপ্সার বিরুদ্ধে তিনি স্পেনের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে কবিতা লিখেছিলেন। তুর্কীর ফ্যাসিস্ত গুপ্তচরের চক্রান্তে তাই নাজিমের স্থান হ'লো বন্দীশালার অন্ধকোঠায়। তুর্কীকে যিনি

সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে শুনিয়েছিলেন স্বাধীনতার দৃপ্তবাণী—ফ্যাসিস্ত প্রভাবের ফলে আজ তাঁকে বন্দীত্বের শৃঙ্খল পরে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্চে। "পথের দাবী"কে অঙ্কুরেই স্তব্ধ করে দেবার মাঝে কি ফ্যাসিস্ত দৌরাত্ম্যের পরিচয় পাওয়া যায় না? রবীন্দ্রনাথের লেখা বলেই বোধ করি "চার অধ্যায়" রাজরোষের ঊর্ণনাভ এড়িয়ে গেল। সুতরাং একটা বিষয় খুবই স্পষ্টীকৃত হয়ে উঠেচে যে ফ্যাসিজম আজ প্রচণ্ড আকর্ষণে মানব সভ্যতাকে মরণ-গহ্বরের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। বুদ্ধিজীবীদের 'পর এই বর্ব্বরতার পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ফল রীতিমত মারাত্মক। টমাস মানের বহিষ্কার, কার্ল ফন অসিয়েৎস্কির পর অমানুষিক অত্যাচার নাৎসী গুণ্ডামীরই উদাহরণ।

অধুনা কবি নোগুচির পত্র সভ্য জগতকে আকস্মিক আঘাতে সন্ত্রস্ত করে তুলেচে। একদা যিনি ছিলেন মানব হিতৈষণার উপাসক—তাঁ'র এই সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বুদ্ধিজীবীদের শোচনীয় অধঃপতনেরই অগ্রসূচনা। রবীন্দ্রনাথ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেচেন—".. কূটযুক্তিজালের পেছনে রয়েচে স্বদেশভক্তির বিকৃত আদর্শ; সেই আদর্শে বিভ্রান্ত হয়ে বর্ত্তমান যুগের "বুদ্ধিজীবীরা" তাদের আদর্শবাদের গর্ব্ব করে এবং তাদের দেশের জনসাধারণকে ধ্বংসের পথ অবলম্বনে বাধ্য করে।...... ফাঁকিবাজিকে আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করে, প্রত্যক্ষ দায়িত্ব এড়ানোকে আমি আধুনিক বুদ্ধিজীবিগণ কর্তৃক মানবতার প্রতি কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করি...।"

ফ্যাসিজমের আবেষ্টনীতে সাহিত্যের লীলাচঞ্চল প্রাণধারা স্তিমিত এবং ক্ষীণ হয়ে আস্‌চে—স্বতঃউচ্ছ্বসিত রসের নির্ঝর ধারা আপনার পরিক্রমার সহজ ছন্দ হারিয়ে হয়ে উঠেচে অতিমাত্রায় শীর্ণ। এ শুধু একটা নিছক সেন্টিমেন্ট নয়—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য।

সভ্যতার প্রত্যেক ধাপে গড়ে উঠে তাঁর আনুষঙ্গিক রাষ্ট্র, সমাজ এবং সাহিত্য। ক্যাপিটেলিজমের উন্নতিশীল পর্য্যায়ে তার সব চাইতে বড়ো গর্ব্ব ছিল—সে শিল্পীকে দিয়েচে মুক্তি—মহারাজা, পুরোহিত এবং চার্চের বন্ধন থেকে মুক্ত করে আর্টিষ্টকে করেচে স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীন—দিয়েচে তাকে কল্পনার স্বচ্ছন্দ পাখা মেলে দেবার প্রচুর অবকাশ। ফিউডেল ব্যবস্থার পর ধনতন্ত্রবাদই সভ্যতার অগ্রগতির অনুকূল বলে এর পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যের হয়েছিল চরম স্ফুরণ। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে ক্যাপিটেলিজম্ পরিণত হলো শোষণকারী শক্তিতে, নবযুগের প্রগতিশীল ভাবধারা'র সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলতে পারলে না ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং সমাজ। যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগে তাই সামাজিক অনুশাসন এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে বিপ্লবী ভাবধারার এক বিরাট সংঘাত সুরু হয়েচে। অদূর ভবিষ্যতে যে সংস্কৃতিগত বিপ্লবের সঙ্কেত দুলে উঠেচে সাম্প্রতিক জীবনের বিক্ষুব্ধির অন্তরালে, শ্রেণীহীন সমাজের যে প্রোজ্জ্বল অরুণিমা উঁকি দিয়েচে বিচলিত পৃথিবীর ধূসর দিগন্তে—মর্ত্ত্যমেঘের প্রান্তে প্রান্তে আগামী প্রভাতের নবারুণোদয়ের যে স্বর্ণচ্ছটা—ফ্যাসিজম অস্বীকার করতে চেয়েছে সেই দুর্ব্বার বিপ্লবের বিপুল প্রাণশক্তিকে। তাই আধুনিক রাষ্ট্রের বর্ব্বর দমননীতির ফলে সাহিত্যের সুকুমার আত্মা আজ মুহ্যমান। ফ্যাসিজমের আওতায় যে সত্যিকারের সাহিত্য সৃষ্ট হতে পারে না—তার একটা যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েচেন Warner,--"......material stagnation

of capitalism brings it about that fewer and fewer scholars, scientists and technicians are required for the process of production. Being no longer able to represent itself as a progressive force, capitalism can no longer invite the support of the general ideas of cultur and progress."

(The Mind in Chains)

কোন যুগেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে উঠে না—এর মূল রয়েচে সমাজ জীবনের গভীর তলদেশে। সুতরাং কোন সত্য সাহিত্যই জীবনকে উপেক্ষা করে রচিত হ'তে পারে না—এবং যদি বা নিছক স্বপ্নবিলাস নিয়ে কোন সাহিত্য রচিত হয়, তবে তা' আধুনিক মর্ম্মতন্ত্রীতে অনুরণিত করে তুলতে পারে না সমধ্বনির তরঙ্গ। এখানেই সাহিত্য হিসেবে তা'র বিরাট ব্যর্থতা—কারণ সাহিত্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি--কতখানি গভীর ভাবে তা' পাঠকের মনে আবেদন জানালে--কতটুকু সার্থকতায় সে রচনা পাঠকের অন্তরকে রসের ঝর্ণা ধারায় আপ্লুত করে দিলে।

ফ্যাসিজমের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্য কেন যে আপনার সহস্রধারায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠচে না, তা'র মূল কারণ—লেখকের পরে রাষ্ট্রীয় 'স্যাংশন' জারীতে। ফ্যাসিজমের বর্ব্বরতায় শিল্পীর সত্য চেতনা আজ মূর্চ্ছিত, তা'র সৌন্দর্য্যবোধ বিকৃত—তা'র সৃষ্টির উন্মাদনায় ছড়িয়ে পড়েচে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের দারুণ ভয়ার্ত্তি। রূপদক্ষের দৃষ্টিকে আজ বর্ত্তমানের বিক্ষুব্ধ জীবন সমুদ্রকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের তটপ্রান্তে প্রসারিত করবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা নেই। ফ্যাসিজমের অক্টোপাসে জীবন-শিল্পীর সৃষ্টিশীল মন স্তব্ধীভূত। সুতরাং এর আওতায় কোন প্রতিভাবান্ সাহিত্যেকেরই. আপনার প্রখর স্বাতন্ত্র্যে দেদীপ্যমান হয়ে উঠবার সুযোগ নেই। অন্তর যেখানে শাসনে অভিভূত, সত্যদৃষ্টি যেখানে আহত, চারণ সাহিত্য ভিন্ন সেখানে কোন সতেজ এবং সাবলীল সাহিত্যসৃষ্টির প্রত্যাশা করাই মূঢ়তা। সাহিত্যিকদের পর 'স্যাংশন' দিয়ে তাঁদের আত্মপ্রকাশকে স্তব্ধ করা চলতে পারে—কিন্তু শাস্তির ভয় দেখিয়ে তাঁদের দিয়েও সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। আর্টিষ্টের মন যেখানে ফ্যাসিজমের প্রতি ঘৃণায় সঙ্কুচিত, যে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রে ধ্বংস সম্বন্ধে আটিষ্ট এক রকম সুনিশ্চিত—সেখানে ত concentration camp'র বিভীষিকায় তাঁকে দিয়ে ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের জয়গাথা রচনা চলবে না—কারণ "Art, great art, is truth and life."

বর্ত্তমানের পঙ্গু সাহিত্যকে যদি আবার ছন্দ ও ছটা, রস এবং রচনার স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তিতে বিকশিত করে তুলতে হয়—তবে শিল্পীকে আজ মুক্তি দিতে হ'বে, ফ্যাসিস্ত দানবের করাল গ্রাস থেকে। বন্ধন মোচনের যে সংগ্রাম রাশিয়াতে জয়যুক্ত হয়ে উঠেচে—যে নিষ্ঠা এবং ত্যাগের ফলে নিপীড়িত মানুষের দেহ এবং মন থেকে খসে পড়লো পরাধীনতার শৃঙ্খল—শ্রেণীহীন সমাজ রচনার সেই কঠোর সংগ্রামে শিল্পীকেও নিরপেক্ষ থাকলে চলবে না। কারণ এই মুক্তি সংগ্রামের পর সমগ্র মানব জাতির সংস্কৃতি সাধনা এবং সাহিত্যের ভবিষ্যত নির্ভর করচে। এই স্বাধীনতার সমরের আবর্ত্ত থেকেই আগামী যুগের সাহিত্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে তা'র জয়শ্রীমণ্ডিত রূপ নিয়ে—নবযুগের জ্যোতিরুদয়ের প্রথম বিচ্ছুরণে সহস্র পাঁপড়ি মেলে বিকশিত হয়ে উঠবে সৃষ্টির লীলাকমল।

কল্পন-পরিক্রমা

ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়

—এক—

ঐ যে বনস্পতি—ওকে ঘিরে-ঘিরে উড়চে মক্ষিকার দল,
বুন্‌চে রহস্যে-ভরা আলোর জাল ;
আমার "য়্যাকাশিয়া-"বনের গন্ধ গেচে ছড়িয়ে
ঐ পরিক্রমার আবর্ত্তনে।
ওরা মোটেও স্থির হচ্চেনা, দৃষ্টির আড়ালেও যাচ্চে না,
ওরা যেন হাওয়ার রেখা-পথে রথ-চক্রের ঘূর্ণন—ক্ষণে-ক্ষণে
চমক্-ছড়িয়ে-যাওয়া ঘূর্ণন ;
যেন ওদেরকে ভারী-সুগন্ধের বিলাসী-যাদু
নিবিড় জড়িমায় রেখেছে জড়িয়ে।

—দুই—

আমি নির্নিমেষে দেখ্‌চি—দেখেদেখে সংচিৎ হারা-হেন ভাবচি—
ওদের গতি আর আমার চিন্তার ধারায় সুর মিলিয়ে ভাব্‌চি—
সত্যি—না অপার্থিব কোন্ মহাবৃত্তের আবর্ত্তে
অদৃশ্য কোন্ মৌন-রাখীর আবন্ধে
কী সূক্ষ্মতম যোগাযোগে আচে যুক্ত হোয়ে
ঐ কল্পন-পরিক্রমা আর আমার আকাঙ্ক্ষা !
অভীপ্সা যতো, সুগন্ধের-ই প্রায়, আচে লুটিয়ে অন্তরের
মর্ম্মকোষে, সাধারণত থাকে যারা পলাতকের মতো দূরে।

—তিন—

চমক্ দিয়ে-দিয়ে সঞ্চরি' যাও জ্যৈষ্ঠের মর্ম্মরে—
ওগো আমার গ্রীষ্ম-তাপ-হরা প্রেয়সী-কল্পনা !
সকল বনভূমি সানন্দে দিক সাড়া
ঝলোমলো তোমাদের পাখার গানে !
গন্ধের অবলেপনে, আলোর ঝরণায়,
আকাশের শূন্যে তোমাদের ঐ গূঢ়-সংকেতনী-পরিক্রমণ
থাকুক বেঁচে দিনমান ; তারপর আরো ঘনিষ্ঠতর কোরে
এই পরিক্রমাকে নেবো জেনে, নিশীথে, ঘুমের ঘনিমায়।

Edmund Gosse-র "Circling Fancies"-এর গদ্যানুবাদ।



ভারতীয় নারী শ্রমিক

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

এক বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন ভারতবর্ষের উপরে সংঘটিত হোচ্ছে—আর এই সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের তীব্রতার মধ্যে—যান্ত্রিকশিল্পের প্রসারহেতু ভারতীয় জীবনের অর্থনৈতিক দিকে গত কয়েক বৎসর ধরে যে বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন চলেছে তার সুদূরপ্রসারী ফলকে আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করি না।

ভারতের অর্থনৈতিক জীবন এখনো কৃষিপ্রধান থাকা সত্বেও এই পরিবর্ত্তনের শক্তি এত প্রবল যে সুদূরতম গ্রামেও এ বিস্তৃত হোয়ে, সামাজিক সম্বন্ধ, আচার ব্যবহার, অভ্যাস ও পারিপার্শ্বিক জীবনকে প্রভাবান্বিত কোরেছে।

এরূপ একটী বিরাট সামাজিক পরিবর্ত্তন পুরুষ অপেক্ষা বেশী মাত্রায় না হউক অন্ততঃ পুরুষের অনুরূপ মাত্রায় মেয়েদের জীবনকে প্রভাবান্বিত করবে এ স্বাভাবিক। Industrial Revolution যে সামাজিক পুনর্গঠন এনেছে তার প্রভাব আমাদের শ্রমিক মেয়েদের উপর পুরুষের চাইতে বেশী গভীর হোয়েছে। এই পরিবর্ত্তনের সামাজিক ও নৈতিক মূল্য যা-ই নির্দ্ধারিত হোক না কেন এর অর্থনৈতিক দিক্ অস্বীকার করা একেবারেই চলে না। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি নতুন সমস্যার উদয় হোয়েছে নারী পুরুষ উভয়ের পক্ষেই যা বিদ্যমান। এ ছাড়া নারী শ্রমিকদের কতকগুলো বিশেষ সমস্যাও দেখা দিয়েছে। নারী শ্রমিকের অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের একটী চিত্র আমি পরবর্ত্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দিতে চেষ্টা করেছি।

ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ ছিল—তবে তার সমস্ত ঐতিহাসিক অতীত আলোচনায় দেখা যায় সে একটী শিল্পপ্রধান কেন্দ্রও ছিল।

খৃষ্টীয় যুগের বহু পূর্ব্ব থেকে ভারতীয় বাণিজ্যের সূচনা। Herodotus ও Megasthenes এর লেখায় আমরা ভারতীয় রেশমের উৎকৃষ্টতার উল্লেখ দেখ্‌তে পাই। Plinyর লেখাতে—ইম্পিরিয়াল রোমে ভারতীয় শিল্পের চাহিদা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। এরূপ উচ্চ স্তরের শিল্পপ্রধান দেশের শিল্পজীবনে মেয়েদেরও অংশ থাকাই স্বাভাবিক; যদিও তাদের স্থান কি ছিল সে সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৩২১-২৯৬ খৃঃ পূঃ) ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রাচীনতম পুস্তক। সমসাময়িক একটী আদর্শ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গঠনের বিশদ বিবরণ এই চমৎকার বইটীতে পাওয়া যায়। এরূপ প্রাচীন বইতে শ্রমিক আইন অথবা নারী শ্রমিকের সুবিধাজনক আইন ইত্যাদি আশা করা যায় না তবে ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এই অর্থশাস্ত্রে আমরা রাষ্ট্র যে মেয়েদের কাজের

ব্যবস্থা কোরতো তার উল্লেখ দেখি। বেতনভোগী ভাবে শস্যক্ষেত্রে, বস্ত্রবয়নশিল্পে সূতাকাটুনী ও শুশ্রূষাকারিণী ও আরো নানা কাজে তারা নিযুক্ত হোত। দ্বিতীয় পুস্তকের ২৩ অধ্যায়ে বস্ত্রবয়ন বিভাগের পরিচালকের নিকট থেকে কাজ পেয়েছে এমন মেয়েদের একটী সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া যায়। পরিচালকের কর্ত্তব্য ছিল লোক নিযুক্ত করা। এদের মধ্যে বিধবা, আতুর স্ত্রীলোক, বালিকা, সন্ন্যাসিনী, বৃদ্ধা, রাজবাড়ীর পরিচারিকা, অর্থদণ্ড দিতে অক্ষম স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করবার কথা উল্লেখ আছে। কাজে উৎসাহিত করবার জন্য সূতার তারতম্য অনুসারে বেতন নির্দ্দিষ্ট হোত এবং যারা প্রচুর পরিমাণে সূক্ষ্ম সূতা কাট্‌তে পারতো তাদের পুরস্কার দেওয়া হোত। স্ত্রীজোলাদের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা হোত। বর্ত্তমানে নারী শ্রমিককে শুধু যে অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসতে হয় তাই নয় পারিবারিক জীবনে গোপনীয়তার সঙ্গত দাবীও অগ্রাহ্য হয়। কৌটিল্য বর্ণিত রাষ্ট্রে কিন্তু তা হোতনা। নীচের উদ্ধৃতাংশ তার সাক্ষ্য দেবে। "যারা বাড়ী থেকে বের হয় না, যাদের স্বামী প্রবাসে, যারা আতুর অথবা অপ্রাপ্তবয়স্ক তারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যখন কাজ [illegible] বাধ্য হয় তখন বস্ত্রবিভাগের পরিচালকের মধ্যস্থতায় উপযুক্ত শালীনতা রক্ষা কোরে তাদের কাজ দেওয়া হবে।" এতে প্রমাণ হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা শিল্পকেন্দ্রগুলিতে নৈতিক সমস্যার সমাধান কতটা বিচক্ষণতার সঙ্গে করেছিলেন।

আরো একটী উদ্ধৃতাংশ থেকে দেখা যাবে যারা কাজের জন্যে ঘরের বাইরে আসতে বাধা হোত তাদের জন্য কি ব্যবস্থা ছিল। "যে সব মেয়েরা সকালবেলা বয়নবিভাগে উপস্থিত হোতে পারবে তারা তাদের সূতার পরিবর্ত্তে মজুরী পাবে, যদি পরিচালক বেতন দিতে দেরী করে বা তাদের ঠকাতে চেষ্টা করে তবে সে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।"

মেয়েদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে রাষ্ট্র যে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল তারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ২য় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখি যে অসহায় স্ত্রীলোকদের সন্তান জন্মের পূর্ব্বে ও পরে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাজা করতেন। অর্থশাস্ত্রের এসব লেখা থেকে স্পষ্ট হয় যে তখনকার প্রচলিত শিল্পে মেয়েদের একটী বিশেষ স্থান ছিল ও তাদের জন্য যথোচিত যত্ন নেওয়া হোত। মেয়েরা কাজ বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারতো ও উপযুক্ত মজুরী পেতো—এতে একাধারে পারিবারিক জীবন এবং কুটীর শিল্পের যা আদর্শ অর্থাৎ শিল্পীর ব্যক্তিগত অভিনিবেশ—উভয়ই অক্ষুণ্ণ থাকতো। পরিচিত আবেষ্টনে শিল্পীর অভিনিবেশ রক্ষা ও গৃহকর্ম্ম সম্পাদন দুইই সম্ভব হোত। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক বিক্ষোভ, বৈদেশিক আক্রমণ ও অরাজকতা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সামাজিক ব্যবস্থা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ছিল।

দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ থেকে মুসলমান রাজত্বকালের ইতিহাসে দেখা যায় যে হিন্দুরাজত্ব কালের মত এ সময়েও ভারতবর্ষে বৈদেশিক বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। কাপড়, কাগজ, চিনি, ধাতু ও চামড়ার জিনিষের উল্লেখ দেখা যায়—প্রতি শিল্পের বিভিন্নপ্রকারের জিনিষ বাজারে উপস্থিত করা হোত—তা থেকে খুব উঁচুদরের শিল্পজীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারখানারও উল্লেখ দেখা যায় যার মজুর

সংখ্যা সহস্র সহস্র ছিল, এগুলি সাধারণতঃ রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাষ্ট্র পরিচালিত কারখানা ছিল। তবে সাধারণ পণ্যদ্রব্য পূর্ব্বযুগের বহুবিস্তৃত কুটীরশিল্পের মধ্য দিয়েই তৈরী হোত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজনীতি ও বাণিজ্যের এক হৃদয়হীন সমাবেশ করবার পূর্ব্বে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন তার পুরাতন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছিল। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কারখানা গুলি গড়ে উঠবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের গ্রাম্যজীবনে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব ক্বচিৎ দেশের সামাজিক জীবনে মূলগত বিশৃঙ্খলতা আন্‌তো। ভারতবর্ষের কারখানা-পূর্ব্বের অর্থনৈতিক অবস্থা তিনটী দিক্ থেকে বিচার করা যায়। (১) একান্নবর্ত্তী পরিবারের অর্থনীতি (২) গ্রামের অর্থনীতি (৩) ভারতের লিখিত ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে সহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলির সাধারণতঃ অসম্বন্ধ অর্থনীতি। যদিও একান্নবর্ত্তী পরিবারের অর্থনৈতিক দিক বর্ত্তমানে অর্থনীতি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে না কারণ এখানে উৎপন্ন বস্তু ও সেবা বাণিজ্যের জন্য নয় ব্যবহারের জন্যে—তবু জাতির উৎপাদিকা শক্তি যখন এভাবে ব্যয়িত হোত তখন একে বাদ দেওয়া চলে না। যে সব জিনিষ ও সেবা আজকাল দরিদ্রতম ব্যক্তিও বাজারে ক্রয় কোরে থাকে পুরাতন ব্যবস্থায় পরিবারের জন্য পরিবারের মধ্যেই তা উৎপন্ন হোত। সূতাকাটা, কাপড়বোনা, ধানভানা, মাখনতোলা, আচার মোরব্বা ইত্যাদি তৈরী করা, ঔষধ, গুড়, চিনি তৈরী, গমপেষা, ঘি তৈরী ও আরো নানাধরণের প্রয়োজনীয় জিনিষ পরিবারের মেয়েদের শ্রমদ্বারা উৎপন্ন হোত। অপেক্ষাকৃত দুঃস্থ যারা তারা এসব প্রস্তুতে সাহায্য করতো, গরু চরাতো, কৃষি ও গৃহনির্ম্মাণ ইত্যাদি কোরতো। অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের আদান প্রদান চল্‌তো। এরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাজখালি, কাজের ঘণ্টা, মজুরী, উপযুক্ত আবেষ্টন ইত্যাদির প্রশ্ন উঠ্‌তো না। তখন স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের একান্নবর্ত্তী পরিবারের আয়ে কোন না কোন দাবী ছিল যার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হোত। একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথাতে বর্ত্তমানের social insurance এর সকল সুবিধা পাওয়া যেতো—উপরন্তু social insurance এর অতি প্রকট দানশীলতার উগ্রতা এতে থাকতো না। এই ব্যবস্থায় অত্যাচার ছিল না তা নয় তবে প্রাত্যহিক আহারের জন্য সারবন্দী হোয়ে Queneতে দাঁড়ানোর যা অসম্মান তা হোত না।

গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনে সামাজিক অর্থনীতিগত কতকগুলি ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাই। একের শ্রমোৎপন্ন বস্তু গ্রামের গোষ্ঠীর দ্বারা গৃহীত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। কাজেই উৎপন্ন দ্রব্যের আধিক্য অথবা বাজার অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল না। অলিখিত এক চুক্তিব্যবস্থার নিয়মে পরস্পরের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় চল্‌তো। গ্রাম্য অর্থনীতি আজকালকার বৃহৎ পরিমাণে উৎপাদন (mass production) ট্রাষ্ট প্রভৃতির মত লাভজনক অবশ্য ছিল না—কিন্তু অপরপক্ষে বহুদূরস্থিত বাজারের বা অজ্ঞাত মহাজনদের উপরেও শ্রমিকদের নির্ভর কোরতে হোত না। রেললাইন যখন গ্রামগুলিকে কারখানাজাত জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য করলো—গ্রামের স্ব-সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক জীবনের সীমা তখন ভেঙ্গে গেল। বাহ্যিক চাকচিক্য ও মূল্যের সুলভতায় কতক শ্রেণীর

জিনিষ গ্রাম্য প্রতিযোগীকে স্থানচ্যুত করলো। তাঁতি অকস্মাৎ দেখ্‌লো তার ক্রেতা নেই—আবার কারখানাজাত বস্ত্রের নেতারা ক্রমে দেখ্‌লো ক্রীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বে তাঁতি যে সব জিনিষ নিত সে সব জিনিষ আর বিক্রী হোচ্ছেনা। এরূপে গ্রাম্য অর্থনীতি তার ভারসামঞ্জস্য হারালো। এতে কর্ম্মহীনতা ও বাজারের অভাবে গ্রামগুলি ক্রমশ: দ্ররিদ্র হোতে লাগ্‌লো।

বাণিজ্যপথে অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের সহরগুলি প্রায়ই বাণিজ্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র হোয়ে উঠেছিল—ব্যবসায়ী ও খরিদ্দার বহুসংখ্যায় এসব কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে সবদিকে এই সহরগুলিকে প্রাণবন্ত রাখতো। চতুষ্পার্শ্বের যে বহুসংখ্যক লোক এখানে আকৃষ্ট হোত তাদের এতে পরোক্ষভাবে কাজ পাবার সুযোগ ঘট্‌তো। যানবাহন চালানো, গৃহনির্ম্মাণ, বস্ত্রনির্ম্মাণ, ক্রীড়াকৌতুকের ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত কাজ ও আরো নানা প্রকার ছোট ছোট ব্যবসা এই কেন্দ্রগুলিতে বেশ চল্‌তো। এসব ব্যবসার কোনটাই খুব বিস্তৃত আকারের ছিলনা—আর আধুনিক কালের মত কোন বিশেষ ব্যবসায়ে নিপুণতা অর্জ্জননীতি (specialization) এতটা প্রবল হয়নি যাতে বেকারেরা এক ব্যবসা থেকে ব্যবসান্তরে যেতে পারতো না। কাজের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় সম্ভবতঃ ছিলনা—কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী কাজে লেগে থাকবার কুফল ক্বচিৎ দেখা যেতো। অধিকাংশ স্থানেই শ্রমিকেরা বাসস্থান ও আহার পেতো—কাজেই যদিও তাদের মজুরী কম হোত অথবা বহুদিন বাকী পড়ে থাক্‌তো তবু বিশেষ কষ্ট পেতে হোতনা। স্বতন্ত্র শ্রমিক হিসাবে মেয়েরা ক্বচিৎ নিযুক্ত হোত। সাধারণতঃ তারা পুরুষদের সাহায্য করতো। কাজেই তাদের মজুরী, কাজের সময় ও বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা আজকালের মত এত প্রবল ছিলনা। একান্নবর্ত্তী পরিবারে কাজ অনুযায়ী মজুরীর নীতিতে (piece rate system) কাজ করবার মত বহু শিল্পী পাওয়া যেতো। ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের এরূপ সীমাবদ্ধ ও স্বসম্পূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যন্ত্রশিল্পঘটিত বিপ্লব (Industrial Revolution) বিদেশী বাণিজ্যের দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ কোরে এমন এক ধ্বংসের শক্তি নিয়ে উপস্থিত হোল—যা এদেশের ইতিহাসে অজ্ঞাত ছিল।

এই যান্ত্রিক শিল্পের আবির্ভাবের সঙ্গে নারী শ্রমিকের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটলো। সহর এবং কল্‌কারখানার কেন্দ্রগুলিতে লোকসমাগম হোতে লাগ্‌লো—ফলে সর্ব্বত্র প্রাচীন পারিবারিক জীবন শিথিল হোয়ে যেতে লাগ্‌লো—হয় সাক্ষাৎভাবে কারখানার মজুরীর আকর্ষণে, অথবা বিদেশী জিনিষের আবির্ভাবে গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন ভেঙ্গে যাওয়াতে বেকার হওয়ার দরুণ। কৃষিক্ষেত্রেও এই পরিবর্ত্তনের সংঘাত অনুভূত হোয়েছিল। বিভিন্ন শস্যের পারস্পরিক মূল্য ও প্রয়োজনীয়তার পরিবর্ত্তন এলো সে অনুযায়ী কৃষিকাজও পরিবর্ত্তিত হোল। কারখানা, রেললাইন তৈরী, পয়ঃ-প্রণালী নির্ম্মাণ, রাস্তা নির্ম্মাণ, খনির কাজ, জঙ্গল কাটা অথবা চাবাগানের কাজে পুরুষেরা বহুদূরবর্ত্তী স্থানে যেতে লাগ্‌লো। স্ত্রীলোকেরা এবং অনেক সময় সমস্ত পরিবার পুরুষদের সঙ্গে নতুন কর্ম্মকেন্দ্রগুলিতে যেতে আরম্ভ কোরলো এবং শ্রমিকদের পক্ষে সম্পূর্ণ এক নতুন অবস্থা ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো।

১৮৮০ থেকে কারখানার শ্রমিকদের একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী গড়ে উঠ্‌লো। এ যুগের আরম্ভে মাত্র কয়েকটী কারখানা ও তার কয়েক সহস্র মাত্র কর্ম্মী ছিল। ১৯১৫ পর্য্যন্ত কারখানার সংখ্যা এতটা বৃদ্ধি পেলো যে কারখানার শ্রমিকদের অস্তিত্ব অনুভূত হোতে লাগ্‌লো। প্রথমদিকে শ্রমিকদের উৎপাদনের উপায় হিসাবে কেবল দেখা হোত, কাজের সময় ছিল দীর্ঘ, থাক্‌বার ব্যবস্থা ছিল অনুপযুক্ত, মানবতার দিক্ দিয়ে দেখ্‌বার দৃষ্টিভঙ্গীর ছিল একান্ত অভাব। যুদ্ধের সূচনায় শিল্পের প্রসার এমন প্রবল হোয়ে উঠ্‌তো যা পূর্ব্বে কখনো ঘটেনি। লাভের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেতো এবং কৃষি ও কারখানায় মজুরের চাঁহিদা অসম্ভব বেড়ে যেতো। কারখানার মালিকেরা তখন মজুরদের দিকে এতদিন যতটা দৃষ্টি দিয়েছে তা অপেক্ষা বেশী মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে কোরলো। কাজের অবস্থাতে উন্নতি ঘটাবার জন্য ধর্ম্মঘট কার্য্যকরী অস্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হোতে লাগ্‌লো। যুদ্ধকালে এবং তারপরও কিছুদিন শ্রমিকও তার নানা সমস্যা ভারতের সামাজিক ইতিহাসে স্থায়ীভাবে দেখাদিল। যুদ্ধের সমাপ্তি ও ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে জগতের বৃহত্তম বাণিজ্যমন্দার (trade depression) যুগ আরম্ভ হোল। এর ফলে শ্রমিক সমস্যা আন্তর্জাতিক রূপ গ্রহণ করলো এবং ভারতবর্ষে ১৯২২এর কারখানা আইনের সংশোধন ব্যবস্থা ১৯২৩ এর নূতন খনির আইন ১৯২৩ এর শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (Workmen's Compensation Act) ও ১৯২৬ এর ট্রেড্‌ইউনিয়ান য়্যাক্ট প্রচলিত হোলো। ভারতীয় শ্রমিক সম্পর্কে Royal Commission শ্রমিকদের জীবন ও কাজের প্রতি বিভাগের জন্য কতকগুলি আইন প্রণয়ন করেছে।

সংখ্যাতালিকা থেকে কারখানার শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ভাল বোঝা যাবে। এই বৃদ্ধির বিভিন্ন দিক্ নীচের তালিকাতে দেখা যাবে, আলোচ্য বিষয় সংক্রান্ত তালিকা দেবার পূর্ব্বে সকল প্রকার ব্যবসাতে নিযুক্তদের একটী সাধারণ সংখ্যা তালিকা দিলে কলকারখানা সংক্রান্ত সংখ্যার তুলনা সম্ভব হবে। ১৯০১এর census report এ আমরা নিম্নলিখিত বিভাগ দেখ্‌তে পাই।

কৃষিসংক্রান্ত শ্রমিক	৩১,৫০০,০০০
কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত মালিক	২৭,০০০,০০০
কৃষিকর্ম্ম নিযুক্ত রায়ৎ	৩৪,০০০,০০০
ভূস্বামী	৩,২৫০,০০০
অন্যান্য ব্যবসায়	৬,২৫০,০০০
যন্ত্রশিল্প, বাণিজ্য, মালবহন ও খনির কাজে	২৬,০০০,০০০
ভৃত্য	১১,০০০,০০০

কারখানায় স্ত্রী শ্রমিক

১৯২২-১৯৩২এর মধ্যে কারখানা ও সেই সঙ্গে কারখানার মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সে সম্পর্কে ভারতের স্ত্রী মজুরদের অবস্থা নীচে উদ্ধৃত তালিকায় পাওয়া যাবে।

বৎসর	কারখানার সংখ্যা	গড়পড়তা শ্রমিক সংখ্যা	স্ত্রীমজুরের সংখ্যা
১৯২২	৫১৪৪	১,৩৬১,০০২	২০৬,৮৮৭
১৯২৩	৫৯৮৫	১,৪০৯,১৭৩	২২১,০৪৫
১৯২৪	৬৪০৬	১,৪৫৫,৫৯২	২৩৫,৩৩২
১৯২৫	৬৯২৬	১,৪৯৪,৯৫৮	২৪৭,৫১৪
১৯২৬	৭২৫১	১,৫১৮,৩৯১	২৪৯,৬৬৯
১৯২৭	৭৫১৫	১,৫৩৩,৩৮২	২৫৩,১৫৮
১৯২৮	৭৮৬৩	১,৫২০,৩১৫	২৫২,৯৩৩
১৯২৯	৮১২৯	১,৫৫৩,১৬৯	২৫৭,১৬১
১৯৩০	৮১৪৮	১,৫২৮,৩০২	২৫৪,৯০৫
১৯৩১	৮১৪৩	১,৪৩৮,৪৮৭	২৩১,১৮৩
১৯৩২	৮১৪১	১,৪১৯,৭১১	২২৫,৬৩২

উপরোক্ত তালিকা প্রমাণ করছে যে কারখানাতে স্ত্রীমজুরের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তালিকা থেকে এও দেখা যায় যে স্ত্রীমজুরের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কারখানাতে স্ত্রীমজুরের শতকরা হার প্রায় সমান ছিল। এও দেখা যায় যে স্ত্রীমজুরদের শতকরা হার ১৯২৯এ সর্ব্বোচ্চে উঠেছিল, এবৎসর স্ত্রীশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৫৭, ১৬১ অর্থাৎ সমস্ত মজুরদের শতকরা ১৭৭ অংশ। তারপর থেকে স্ত্রীমজুরদের সংখ্যায় নিয়মিত হ্রাস দেখা যায়। একথা এখানে উল্লেখকরা প্রয়োজন যে বিভিন্ন প্রদেশে স্ত্রীমজুরের সংখ্যায় বিশেষ তারতম্য ছিল। ১৯২৯এ বিভিন্ন প্রদেশে মোট মজুরের কত অংশ স্ত্রীমজুর ছিল তা নীচের তালিকাতে পাওয়া যাবে।

প্রদেশ	স্ত্রী শ্রমিকের অংশ
মান্দ্রাজ	২৫.৬৩
বোম্বে	২০.৭৩
বাংলা	১৩.৭৫
যুক্তপ্রদেশ	৭.০৬
পাঞ্জাব	১৪.৪৭

ব্রহ্মদেশ	১০'২৬
বিহার ও উড়িষ্যা	৮'৯৮
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	৩৫'১৭
আসাম	৩৩'৪৮
আজমীড় মাড়োয়ারা	১১'৪৯
দিল্লী	২'৭৫
কুর্গ ও বাঙ্গালোর	২৭'৯৯
উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ	৬'০৭

পরবর্ত্তী বৎসরগুলিতে প্রাদেশিক সংখ্যাতালিকায় স্ত্রীমজুরের সংখ্যা হ্রাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৯এ বাংলাদেশের কারখানায় মোট ৭৭, ৯৬৬ স্ত্রীমজুর ছিল তার মধ্যে পাটকলেই ছিল ৫৪,৬৭০। ১৯৩৩এ মোট সংখ্যা ছিল ৫৬৯৩৫ আর পাটকলে ছিল। ৩৭,৩৩৭ বোম্বেতেও অনুরূপ হ্রাস দেখা যায়। ১৯২৯এ বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে মোট স্ত্রীমজুরের সংখ্যাছিল ৭৪,৯২৪, আর ১৯৩৩এ মোটসংখ্যা ৬৮, ৪৪৬এর মত ছিল। কাজে কাজেই কোন কোন প্রদেশে সামান্য সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও বাংলা ও বোম্বের মত শিল্পপ্রধান প্রদেশগুলিতে—যেখানে সবচেয়ে অধিক সংখ্যক স্ত্রীমজুর নিযুক্ত হয়—সেখানে সংখ্যার বিশেষ হ্রাস দেখা গিয়েছিল। এই হ্রাসের নানা কারণ আছে। ব্যবসা মন্দার দরুণ সাধারণ বেকার অবস্থার সৃষ্টিতো হোয়েই ছিল উপরন্তু স্ত্রীশ্রমিকদের নিয়োগে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় বলে মালিকেরা পুরুষ শ্রমিক বেশী পছন্দ কোরতো।

(ক্রমশঃ)

"Our Cause" পুস্তকে শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় লিখিত Women in Industry নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।



অন্তরাত্মা

বীণাপাণি রায়

'চা আর টোষ্ট দাও তো' বলে, সে চুল্লীর পাশে টেবিলের ধারে বসে পড়লো। বাইরে, গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ পড়ছে, তারই কতকগুলো টুকরো পকেটে ঢুকে গিয়ে হালকা নীল জামার মধ্যে কালো কালো ছাপ এঁকেছে।

'একজনের চা আর টোষ্ট' তরুণী পরিচারিকা বললো বার্ত্তাবহ নলের মধ্যে। সে দাঁড়িয়ে ছুরী কাঁটার টেবিলের পাশে, আয়নার মধ্যে নিজের দিকে তাকাচ্ছে, পশ্চাতের পতনশীল বরফ ও নকল মুলিয়ন-লগ্ন বাতায়নের প্রতিফলিত পরিবেশে তাকে যেনো মধ্যযুগের শুচিশুদ্ধ তাপসবালার মতো দেখাচ্ছিল।

কুমারী পিলচার টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়ে শব্দ করলো, অধৈর্য্য হয়ে। 'ওগো গরম জল দাও' বলে কুঁজোটা বাড়িয়ে ধরলো। তার হাত শুভ্র, নরম, সুবিন্যস্ত ও সুতপ্ত। গ্রীবা ও কটিদেশের মাঝে বক্ষটি স্তনভারে টেবিলের উপর অবনমিত, নিতম্ব সুনীল আচ্ছাদনের ভিতরে চেয়ার ছাপিয়ে পড়েছে। মুখটী গোলগাল ও গোলাপী আভাযুক্ত, জোড়া চিবুকের ভাজ, তার পায়ের গোড়ালিতে খাঁচ আছে, কাঁধে ও হাঁটুতেও, যদিও এ সব কেউ জানতো না। সে পরেছে ক্রেপ-ডি-সিনের গোলাপী আঙ্গিয়া, বুকের মাঝে লম্বা করে ভি গলা কাটা, অভ্যন্তরস্থ জামার লেসের ধারগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, পাশে গোলাপ পাতার উপরে বাঁশী হাতে স্বর্ণনির্ম্মিত কিউপিড।

পরিচারিকা কুঁজোটা হাতে খাদ্যবহ নলের ধারে গেলো। 'একজনের গরম জল' নলের মধ্যে বললো মৃদুমধুর সুরে। আবার আয়নায় নিজেকে একান্তভাবে নিরীক্ষণ করে, গভীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে দেখে নিতে চায় অন্তরের আলো মুখে কোথাও প্রতিফলিত হয়েছে কিনা।

এনড্রু ডেকে বললেন 'ওগো আমার বিলটা দাও তো।' পরিচারিকা কাগজ নিয়ে বিলটা হিজিবিজি করে লেখে। বিলতো সব সময়ই একরকম, এক পেয়ালা চায়না চা ও মাখনে সুসিক্ত পাইলেট মাছ। হিসাবটা মিষ্টার এনড্রুর কাছে নিয়ে যায়, কোণের টেবিলের ধারে তিনি তো সব সময়ই বসে থাকেন, পরিবেশনরত তরুণীটির দিকে চেয়ে নানা রঙ্গ করে হাসেন, আবার অতর্কিতে অন্য মেয়েদেরও দেখে নেন।

'দিনটা বেশ' বলে এনড্রু তার হাতের মধ্যে গুঁজে দেন একটা ছয়পেনী, সপ্তাহে একবার করে দেন কাজেই গড়পড়তা এক পেনীই পড়ে রোজ। তাকিয়ে হাসেন, ফোলা লালমুখে দুটি ছোট নীল চোখের দৃষ্টি তরুণীর কাঁধ বুলিয়ে যায়। সে চলে যায় কিন্তু পিছনের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছে বেশ বুঝতে পারে। এনড্রু টুপি তুলে চলে যান।

পিলচারের গরম জল প্রস্তুত। 'ধন্যবাদ', পিলচার, বলেন ; একখানা চলচ্চিত্রের কাগজ

মিয়ে সম্মোহিনী ছায়া-নটীর চোখের পাতা গুণতে তিনি বড় ব্যস্ত, ইতিমধ্যেই নিজের চোখের পাতা গোণা শেষ হয়ে গিয়েছে, প্রত্যেক চোখে একুশটা হালকা হালকা সোনার হুক্।

পশ্চাতে আবার পরিচারিকা ছুরীর টেবিলের ধারে আয়নার মুখোমুখি, নিস্তব্ধ, আপন প্রতিচ্ছবি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণে রত; দেহের গঠনটী তার অনুন্নত, চামড়া সুচিক্কণ, চোখ নীল, সুগঠিত ও আয়ত; ওষ্ঠ রক্তিম ও বঙ্কিম, ছোট সাদা দাঁত, সে ক্ষীণাঙ্গী, কামবিধুরা নয়। তার ক্রস-সেলাই দেওয়া সাদা বহিরাবরণের ভিতর অপরিণত বক্ষ ফুটে উঠেছে।

তাকে ওরকম দেহ-সর্ব্বস্ব দেখায় না, সে ভাবে। সে কখনো পুরুষ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে না, স্বেচ্ছায় তো কখনই নয়, সে চায় না যে তারা তার দিকে তাকায়, চোখ টেপে, হাত নেড়ে দেয়, বা তাদের মোটা হাতগুলি দিয়ে হাঁটু স্পর্শ করে। তবুও তারা এ সব করে কারণ এ তাদের স্বভাব। সে ভাবে, পুরুষেরা শুধু আসক্ত নারীদেহে, অন্তরাত্মার প্রতি উদাসীন; নারীর মুখে খোঁজে শুধু তার দেহকে, যেনো সেই কেবল তার একান্ত দর্শন-যোগ্য, কিন্তু যে অন্তরাত্মা তার মুখমণ্ডলে উজ্জ্বল তারার মতো প্রদীপ্ত, তা রইলো অজ্ঞতার অন্তরালে। সে ভাবে, তারা কি কোনদিন আপন অন্তরাত্মার সন্ধান নিয়েছে বা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে দেখেছে অন্তরের কোথায় সেই শাশ্বত সত্য, আপনার অন্তর্লীন সূক্ষ্ম সত্বাকে ভাববার প্রয়াস তারা করবে কখন? সারাদিন তারা ঘুরে বেড়ায় অফিসে অফিসে, আড়তে আড়তে প্রাতঃকালীন কফি ও সান্ধ্য চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করে, সারাক্ষণ চলে ব্যবসা, গালগল্প ও খেলাধূলার আলোচনা। অবাক হয়ে সে ভাবে এ সব ছাড়া আর কখনো কিছু কি তাদের মনে জাগে না? সাধারণের "আমি"র উর্দ্ধে যেখানে জীবন মহৎ, উদার ও অনাস্বাদিত সেখানে যাওয়ার চেষ্টা কি তারা করে? মানুষ কি কেবল মাংস ও মগজ, তাদের চিন্তায় নারীও কি শুধু তাই, তার চেয়ে মহিমময় কিছু নয়?

সে ভাবে, প্রতি দেহেই আত্মা বিরাজমান, আত্মার অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী কারণ আমাদের সৃষ্টিই হয়েছে এ রকমে, তবে কেন মানুষেরা আত্মাকে এতো দলিত, মথিত ও লাঞ্ছিত করে? কেন তারা উদ্বোধিত হয় না, অন্তরের আলোকে মুক্তপক্ষে বিচরণ করে না কল্পলোকে?

বৃদ্ধ লোকটীর চা ও টোষ্ট খাদ্যবহ নলের ধারে এসে গেলো, তাড়াতাড়ি সে ট্রেতে তুলে টেবিলে নিয়ে যায়। চুল্লীর পাশে বসে বৃদ্ধ নিজেকে গরম করে, জুতো প্রায় আলগা হয়ে ঝুলে পড়েছে, সার্টটা অতি জীর্ণ, গলাবন্ধ যেনো শতছিন্ন সুতার গুছি। ওভার কোটটা খোলে নাই যেহেতু নীচের জামাটা পাজামার উপরে বড় বিসদৃশ, বেজায় ঢিলা ও সস্তায় কেনা বলে বেমানান; মনে মনে সে এর জন্য বিশেষ লজ্জিত।

দেখে তার মনে হয় এ লোকটি সুদিনের মুখ দেখেছে এক সময়ে, তাকে তো ভদ্রলোকের মতই লাগে।

পরিচারিকা ফিকে আলাপ করে, "বিশ্রী দিন, বড় শীত।" সে উত্তর দেয়, "বড় কনকনে।" তার হাতদুটি নীল, ঘাড় ফিরালে চোখে পড়ে গভীর রেখাঙ্কিত মুখ, ক্ষৌরকার্য্যের একান্ত

প্রয়োজন, চিবুক সাদা খরখরে দাড়িতে ঢাকা; চক্ষুনিষ্প্রভ। তার কর্ত্তিত ঘন ভ্রূ আবার গজিয়েছে যেনো সাদা সাদা তারকাটার ঝোপ।

এক কামড়ে রুটিটা শেষ করে, চায়ের পেয়ালায় গভীর চুমুক দিলো। সেদিন এই প্রথম তার পেটে কিছু পড়লো, গরম পানীয় ভিতরে ঢুকে রুদ্ধ চিন্তার মুখ খুলে দেয়। আবার সে চুল্লীর ধারে ঝুঁকে বসে, যেনো স্বপ্নাবেশে দেখে সেই সব অফুরন্ত পথে পথে বিচরণ, অগণিত প্রবেশদ্বার উন্মোচন ও সঙ্কোচন, এবং সেই সব অসংখ্য রূদ্ধ কপাট যেখানে সে ঘা মেরেছে, অপেক্ষা করেছে, কিন্তু সাড়া পায় নাই। সে মনে মনে বলে, এও কিন্তু তবু একটা কাজ, এও একট কিছু যার দ্বারা দিন তার চলে যায়, কিন্তু হায় বিধাতা, এ যে কী তিক্ততা, কী হীনতা!

অধৈর্য্য হয়োনা। হৃদয়ের শৈথিল্য ও নৈরাশ্য দূর করতে আবার নিজে নিজেই আর এক পেয়ালা চা ঢেলে নিলো, আগে যেমন করতো তেমনি তার নিজের অবস্থাটা আবার একটু কৌতুকের চোখে দেখতে চায়। সে হাসতে থাকে "ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কোম্পানীর" কর্ত্তাদের মজাদার কলাকৌশলে, তারা অধিকাংশ গৃহকর্ত্রীদের বিগতপ্রায়যৌবনা দেখে ক্যানভ্যাসার নিয়োগ করতো তরুণ ও উদ্যোগীদের মধ্য থেকে নয়, কিন্তু রাখতো অমায়িক কায়দাদুরস্ত, মার্জ্জিত বৃদ্ধ গোছের লোকদের। তারই মত বুড়ো ধরণের লোক, যাদের সম্বন্ধে মানুষে ভাবে সুদিনের মুখ এরা দেখছে, তাদের ধরণধারণ ভদ্রলোকেরই মত। কী রঙ্গদারই না তাদের লাগে, সে ভাবে, দরজায় দরজায় ফেরে, টুপিটা একটু উঁচু করে তোলে, কপট ও কৃত্রিম সুরে কথা বলতে বলতে গিন্নীদের মন ভিজায় যাতে তারা "ভ্যাকুমায় ক্লীনারের" যন্ত্রকৌশল দেখাতে দেয়, অবশ্য এর জন্য তাদের কোন দেনাপাওনার বাধ্যবাধকতা থাকে না। এ সব মজার গল্পের শুধু জাল বোনা যায়, বুঝতে হলে বাহ্যবস্তু হতে কিছুটা নির্লিপ্ততার দরকার। সত্যিকারের বিক্রয়ে আবার দাম দেওয়া হয় কমিশনে, হ্যাঁ, সবটা সত্যিই একটা প্রহসন।

"টোষ্টের সাথে ডিমের পোচ দাও তো, বেশী সেদ্ধ নয় এক-আধটু রেখেই উঠাবে:" লোকটী পিলচারের দিকে মুখ ফিরলো। পিলচারের উষ্ণ নরম হাতটী উর্দ্ধে উত্থিত, নিজের নখাগ্রে সময়ের পরিমানটা বুঝিয়ে দিলো।

পিলচারের মুখ ঈষৎ রক্তিম। সে অনুভব করলো যে তার উপরে পুরুষটীর চক্ষু ন্যস্ত কিন্তু তার দিকে দৃষ্টিপাত করলো না, কারণ এ বিষয়ে বইয়ে পড়েছে যে বেশীরকম আগ্রহ দেখানো অনুচিত, ঔদাসীন্য দেখিয়ে অনুসরণ করতে দেওয়াই সঙ্গত। চক্ষু কাগজখানার উপর নিবদ্ধ করেও ওর মুখ ফিরানো বুঝতে পারলো। চুল্লীর দিকে ঈষৎ অবনমিত লোকটীকে ও পর্য্যবেক্ষণ করতে সুরু করে। সে ভাবে বেশ বয়স হয়েছে, প্রায় সত্তরের কাছাকাছি (পিলচারের বয়স পঞ্চাশ হবে) তাকে দেখে মনে হয় সুদিনের মুখ দেখেছে, ভদ্রলোকই তো বটে!

ম্যাগাজিনের পাতা উলটিয়ে যায়। হঠাৎ সে যেনো প্রাণরসে সঞ্জীবিত, উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, ধমনীতে প্রবাহিত ও উচ্ছোলিত হয় জীবনীধারা, দেহ সতেজ, মন উত্তেজিত; প্রতিটি ইন্দ্রিয় দুঃসহ

বেদনায় সুতীক্ষ্ণতম। পিলচার খুসী হয়ে হেসে উঠলো, অদ্ভুত নির্ব্বোধ হাসি। কারণ সম্প্রতি সে যেনো প্রাণহীন হয়ে পড়েছে, অনেকদিন হতে। পিলচারের সঙ্গে তার জীবনের এ এক অদ্ভুত খেলা। কতদিনের জন্য সরে যায় দূরে, রেখে যায় অপস্মৃতির ছাপ তার মুখে নিয়ে যায় তার সমস্ত প্রিয় দ্রব্য হতে আহরিত আনন্দ ও জীবনের প্রতি আস্থা। বিশ্বাস নেই যে সব কিছুই কর্ত্তব্যের অঙ্গ, প্রতি জীবনের পরিণতি সুখে, ন্যায়ের দেবতা সকলের জন্যই জাগ্রত। প্রত্যেকেই আমরা সমপরিমান সুখদুঃখের অধিকারী, ধনীরাও গোপন ব্যাথায় ব্যথী কাজেই আমরা সকলেই সমপর্য্যায়ভুক্ত। প্রাণশক্তি বিহীন সে যেনো বিফলতার প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু দিন কাটে পূর্ব্বেরই মতো, বাধা নিয়মে, এগারোটায় ঘুম ভাঙ্গে, উপন্যাসখানা বদলিয়ে আসে লাইব্রেরীতে গিয়ে, দোকানে দোকানে ঘোরে, মধ্যাহ্ন ভোজন সারে, বিকালে বসে বসে ঝিমোয় কখনো বই নাড়ে বা লেখে ক্রিমের নমুনার জন্য খোঁজে শীর্ণ হওয়ার পুস্তিকা, সন্ধ্যায় যায় ছবি দেখতে।

সত্যিকার জীবন কাটাবার সময় সে যে ভাবে চলতো এখনও তাই চলে, সেই বাঁধাধরা পদ্ধতিতে, কিন্তু প্রাণের বহতা তাকে যখন উঁচু শুষ্ক বেলাভূমিতে তুচ্ছ উপলখণ্ডের মতো রেখে চলে যায় তখন বেঁচে থাকার সমস্ত আনন্দ নিঃশেষিত হয়ে যায়। ছবিগুলি লাগে অসার, উপন্যাস নীরস, সজ্জিত বিপণিমালা মনে হয় চক্ষুশূল। সঙ্ক্ষেপে বলতে গেলে প্রাণরস-বিবর্জ্জিত জীবন ধূলা-মাটীর মত, যেনো মৃত্যুর উচ্ছিষ্ট।

কিন্তু জীবনপ্রবাহ আবার ফিরে আসে...পিলচার তখন বিহ্বল রসাবেশের স্বপ্নে, হাসে, কাঁদে পূজা পায় তার নায়িকাদের মতোই, দৃষ্টিতে ভাসে, যে সব কিছু যেনো সৃষ্ট তারই চিত্ত্যবিনোদনের জন্য, সে যেনো রাজরাজেশ্বরী সকলেরই ঈপ্সিত, আপন খেয়ালে যার উপর খুসী সেই কৃতার্থ হয়। নিজের ও মানুষের অক্ষয় নিয়তিতে আস্থা জন্মে। প্রত্যাবৃত্ত জীবনের ভবিষ্যৎ-আশা, জীবনের অমূল্য অভিজ্ঞতার আহৃত সঞ্চয়—নতুনতর অভিজ্ঞতার সন্ধানেই যে জীবন তাকে ক্ষণকালের জন্য দূরে রেখে ছিলো—জাগে সেই উদ্দাম, উচ্ছলিত অনুভূতির তীব্র উন্মাদনা। জীবনের পরিশ্রুত নির্ম্মল নির্য্যাসে পুনরায় সে হয় সঞ্জীবিত।

ইতিমধ্যে সে লোকটী একটু গরম হয়েছে, চা ও টোষ্টে কতকটা পরিতৃপ্ত, চেয়ারে হেলান দিয়ে ভাবনায় মগ্ন। খাদ্যবহ নলের ধারে দণ্ডায়মান পরিচারিকার দিকে তাকালো, সে পিলচারের ডিমের পোচ উঠাতে অপেক্ষা করছে। আয়নায় দৃষ্টি রেখে বোধহয় ভাবছে, ভাবছে এখনো তার চূলে ঢেউ তোলার বয়স আছে না গেছে; কারণ যৌবনকালে তার যখন বয়স ছিলো সতেরো আঠারো অথবা পঁচিশ, সেও যে ভাবতো একরকমভাবে কিন্তু সেদিন এখন গত, রয়েছে শুধু অতীতের রেশ।

আমাদের যৌবনকালে সবই সহজ, পথ বড় সরল, পূর্ণতার সাফল্য পথে থাকে না কোন বাধা। সতেরো বৎসর বয়সেই জীবনের অভিপ্রায়-বেগ কোন্ পথে চলেছে—দেখতে পেয়েছিলো যার শেষে আছে বৃদ্ধ বয়স, যখন অবসর ভোগের কাল; শক্তি ক্ষীণতর কিন্তু অন্তর শান্তির আবাস, ও স্থৈর্য্য—

গম্ভীর। সে ভাবতো, বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে অভিজ্ঞতা, যার অনবদ্য শোভা জারিত হীরকখণ্ডের মতো জ্বলবে আপন অন্তরে, পাবে পরিশ্রমের ফল। অসম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়ে উঠবে গোপন আদর্শের পূর্ণতায়। কিন্তু এখন সে উপনীত জীবনের সেই কালে, তার বয়স সত্তোর, যতদিন যাবে সে বুড়ো হয়ে পড়বে কিন্তু অন্তরে তার কোন শান্তি নাই।

তার চিন্তা, বিশ্বাস ও বাসনা পূর্ব্বের মতোই অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ। পরিণত জীবনের শান্তি-সুধা তার মিলে নাই ; জীবনে সে নেমে গেছে অনেক নীচে কেন তা সে ভাবে। ভুল পথে যে তার যাত্রা সেই পথেই তার অনুসরণ প্রতারণা করেছে আপনার অন্তরাত্মাকে। এখন আর পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের সময় নেই, জীবন আশাহীন, নিরবলম্ব ও নিরুদ্যম। তরী ঠেকেছে শেষ ঘাটে, আছে শুধু পরম্পরার আবর্ত্তন, জলাশয়ের বুকে সামান্য আলোড়নের মত।

সশব্দে পিলচারের ডিমের পোচ এসে পড়লো মাখন রুটির উপরে রইলো সুখাসীনা নটীর মতো।

পরিচারিকা পিলচারের টেবিলে নিয়ে গেলো।

লোকটী দেখলো, পিলচার ডিমের সাদা আবরণ কাটলে হলদে তরল অংশটা বেড়িয়ে এলো।

সে পরিচারিকাকে ডেকে বললে, আমাকেও একটা পোচ দাও তো। মুখ ফিরিয়ে তাকায়, পিলচারও প্রেমচ্ছলে চোখের সোনালী হালকা হালকা পাতা মেলে তাকায়, সুডৌল গ্রীবাদেশ তুলে ধরে।

ঈষৎ অবনমিত মস্তক লোকটীর, উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে হাসে, তুজন যেনো তুজনকে বোঝে ও বিচার করে।

পরিচারিকা তাদের দেখে নাই, সে নলের মধ্যে গুণ্ গুণ্ করছিলো।

পিলচার ডিমের মধ্যে যেনো ডুবে গেলো, আঃ কী চমৎকার সুন্দর ও সুস্বাদু। তার হৃদ-যমুনায় আবার জোয়ার এসেছে, মাধুর্য্যে ও আবেগে কাণায় কাণায় ভরা, ও মন আনন্দের শেষ সপ্তকে মিশে আছে। উত্তেজনার কিছুটা ছাপিয়ে পড়ল ডিমে, বাষ্পরুদ্ধ তার কণ্ঠ। আঃ নিশ্চয়ই জীবন এবার তার জন্য কিছু এনেছে।

সে অবাক হয়ে ভাবে, চুল্লীর পাশের লোকটির জন্য তার কর্ত্তব্য আছে কিনা। তাকে দেখে তো মনে হয় অতীতে তার সুদিন ছিল, ভদ্রলোকের মতোই তার চেহারা। বেশ সুন্দর দেখতে, শান্ত, খুব বিদ্বান বলে মনে হয়। যা হোক, তত কিছু বয়স নয় এবং গরীব যে সে তো দেখাই যাচ্ছে, কিন্তু সেটা সম্ভবতঃ তার আবরণ। এসব তো কেউ জানে না, কখনো কখনো বইয়ে পড়া যায় ও শোনা যায় যে ধনীরা বধূর সন্ধানে যাত্রা করেন ছদ্মবেশে, খ্যাতনামা শিল্পী ও লেখকগণ উপাদান সংগ্রহে গিয়ে আনেন মনের মতো সঙ্গিনীকে। আঃ সে কী হতে পারে তার কি অবধি আছে? সে কিন্তু অদূরে উপবিষ্ট, স্থির, কদর্য্যতার আবরণে ঢাকা। তার পূর্ব্বরাগ অতি স্পষ্ট ; সেও কি

তার অনুকরণে ডিমের পোচের আদেশ দেয়নি ? সেই তো তার প্রথম সংরাগের ইঙ্গিত। তার দৃষ্টি ও হাসি শুধু একই লক্ষ্যে আসুক। জীবনের নিভৃত সঞ্চয়ের ডালি নিয়ে আজ তার বিচিত্র অভিসার, যার জন্য বহুদিন কেটেছে তার প্রতীক্ষায়। জীবনসাথীর সন্দর্শন—ধনী বিদ্বান ও খ্যাতনামা কিন্তু ছদ্মতার আবরণে।

পরিচারিকা আয়নায় আপনাকে ও পিলচারের ডিম খাওয়া দেখে; ভাবে, ও অধিকাংশ স্ত্রীলোকের মতো পান, ভোজন, বেশভূষা ও পুরুষের কথা ব্যতীত আর কিছু জানে না। এসব হতে বিমুক্ত হয়ে জীবনকে কেউ ভাবিতে পারে না ? অনুভব করে না গভীরতর সত্বা, জীবনের ভাসা ভাসা তুচ্ছতা অপেক্ষা অমূল্য সম্পদ কোথায় বর্ত্তমান ? এসব কি কেবল তারই অনুভূতি; তার 'আমি' কি তার দেহ হতে বড় নয় ? যে 'আমি' মুক্ত, অনন্ত-আলোকচারী।

বৃদ্ধ ভাবে মোটা স্ত্রীলোকটি কী মজা করেই না ডিমের পোচ ভক্ষণে লেগে গেছে। আমার চেয়ে বয়স তো বেশী নয় কিন্তু তাও কি....বেশ তরুণী বলে মনে হচ্ছে। পূর্ণযৌবনা, তেজস্বিনী শক্তিময়ী ও ভবিষ্যতে আস্থাশীল। হঠাৎ সে ভাবে নিজের বার্দ্ধক্যের কথা; ভাবে গত যৌবন, অবসাদ দারিদ্র্য ও নৈরাশ্যই তার জীবনের শেষ পুরস্কার, হয়ত এসব ভাবা তার অন্যায়। সম্ভবত সে এখনো রয়েছে জীবন-মধ্যাহ্নে, শান্তি ও সাফল্যের পুরস্কার এখনো অনাগত, সে পথে যাত্রা সুরু হয়েছে মাত্র। অন্তরে সবল প্রতীতি জাগে, নৈরাশ্য ও তিক্ততার লেশমাত্র নেই। নবীন শক্তির প্রেরণায় অন্তর পূর্ণ। অভিনব শৌর্য্যে বিপদ পদদলিত করে, আত্মপ্রতিষ্ঠিত হয়ে, আত্মাভিলাষের পূর্ণতা সাধন করার মনের সম্পদ তার আছে।

পরিচারিকা একধারে, আয়নার প্রতিফলিত ছায়ায় বৃদ্ধলোকটির উদ্দীপ্ত মুখ নজরে পড়ে, নিস্প্রভচক্ষু উদ্ভাসিত, পাশ ফিরে চোখে চোখ পড়াতে একটু হাসলো।

সে অনুভব করে আয়নার দিকে তার চোখ পরিচারিকার প্রতি হাসছে, সেই মুহূর্ত্তে সে যেনো তার নিকট প্রতিভাত হয় মূর্ত্তিমতী আশা, যৌবন, প্রেম—নবতর মহিমা ও সৌন্দর্য্যে রূপান্তরিত হয়ে, সে যেনো নতজানু হয়ে তার পদধূলিতলে মলিন গালিচায় অনায়াসে চুম্বন দিতে পারে।

ডিমের পোচ চট্ করে এসে পড়লো। ছুরী কাঁটা এগিয়ে দিতে দিতে সে ভাবে, এর চিত্তের বিকাশ হয়েছে, চুল্লীর পাশে বুড়ো লোকটির আত্মবোধ জাগ্রত, মুখে তা প্রতিফলিত দেখ্‌ছি। হায় আমার আত্মাও কি এমন প্রদীপ্ত হয়ে উঠবেনা, মানুষের নয়নে ভাস্বর হয়ে উঠবেনা আমার মহিমাময় জীবন, যা গভীর ও নিগূঢ়।

ব্যগ্র হয়ে পোচ নিয়ে যায় টেবিলে; সংসারে এমন কি আছে যা একে দিতে পারা যায় না ? সে যে আত্ম-সম্পদে সুমহান; টেবিলে পিরিচটা রাখলো, লোকটির হৃদয় স্নেহে একেবারে আপ্লুত হয়ে উঠেছে, সে যেনো তার যৌবন প্রত্যাগত।

"তোমার হাতটি কি আমাকে একবার চুম্বন করতে দেবে ;" সে বলে উঠলো।

পরিচারিকা হঠাৎ পাণ্ডুর হয়ে ত্রস্তভাবে দূরে সরে গেল।

সে ঘৃণার স্বরে বললো "অসভ্য বুড়ো! এ কেমনতরো নোংরামি।" দ্রুতপায়ে গিয়ে আয়নার ধারে টেবিলের কাছে জামায় মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেললো, বৃদ্ধ স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারপর পিলচারের দিকে তাকালো। পিলচার মুখ ফিরলো যেন তাকে কেউ চপেটাঘাত করেছে; স্তিমিত দৃষ্টিতে সে নিজকে দেখে নিলো, কি যেন একটা তার জীবন থেকে খসে গেছে।

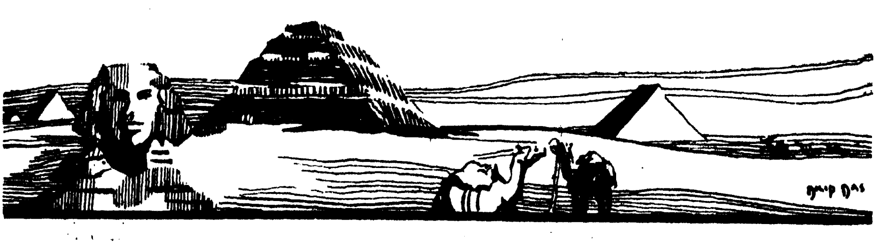
বৃদ্ধের সাথে চোখাচোখি হলো তার মুখমণ্ডল কাষ্ঠফলকের মত ভাব লেশহীন।

"আপনার ব্যবহারে লজ্জিত হওয়া উচিত," বলে সে উঠে গেলো মেয়েটীর পাশে।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল। লজ্জায় ও নৈরাশ্যে হতবুদ্ধি। তার যথাসর্ব্বস্ব তুইটি শিলিং টেবিলে রেখে কাফের বাইরে বেড়িয়ে গেলো, পা আর চলে না। ডিমের পোচ যেভাবে ছিল সেভাবেই টেবিলের উপর পরে রইল।

"ছি ছি বাছা এসব কি এতো ধরতে আছে" পিলচার রোদনরত বালিকাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, "ও তো তোমাকে স্পর্শও করে নাই, এতে কী আসে যায়? কিন্তু কে ভাবতে পারতো তার মতো ভদ্রলোক এমন বিশ্রী কাজ করতে পারে"—মৃতুস্বরে বল্‌লো, "তার মুখে সুদিনের ছাপ আছে। সে সত্য সত্যই ভদ্রলোক এটা তুমি অস্বীকার করতে পার না।"

* 'পেলিষ্ট্যান চ্যাপম্যান' লিখিত 'Soul!' হইতে।



অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—মনোনিবেশ

লতিকা গুপ্তা

"মন দিয়ে পড়, মন দেও, নইলে তোমার কিছু শেখা হবে না"

পার্শ্বোপবিষ্টা কন্যাকে এই কথা কয়টী বেশ গম্ভীরভাবে বলে নিজে একখানা বই নিয়ে বসলাম। বইখানা কি তা বলা নিষ্প্রয়োজন, তবে সেটী যে আমার প্রিয় বইগুলির অন্যতম তাতে সন্দেহ নাই।

পড়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল কাণের কাছে কে যেন বলছে—"মন দিয়ে পড়, মন দেও, নইলে কিছু হবে না।" চমকে উঠে নিজের মনের দিকে চেয়ে দেখি, মন তখন বছর দশেক আগে ফিরে গেছে এবং ফিরে যে গেছে তা সে নিজেই জানে না। কোথায় বা বর্ত্তমান, কোথায় বা প্রিয় পুস্তক! কে সতর্ক করলো ভেবে তখন চারিদিকে তাকালাম—কাউকেই চোখে পড়লো না। অপ্রস্তুত হয়ে চোখকে কাজে অবহেলার জন্য দায়ী করতে গিয়ে দেখি চোখ অতি বিশ্বস্তভাবে লাইনের পর লাইন পার করে চলেছে। বুদ্ধিকে বিচারক করে মনের কর্ত্তব্যচ্যুতিতে লজ্জা পেয়ে আবার বইতে মনোনিবেশ করলাম। যে একাবার দোষ করে, তার কাজের উপর যেমন স্বভাবতই একটু সন্দেহ মিশ্রিত সচেতন দৃষ্টি আপনা থেকেই থেকে যায়, তেমনি হয়তো আমার মধ্যেও একটু সচেতন সত্ত্বা আপনাকে সমস্ত অধ্যয়ন অধ্যায় হতে পৃথক রেখে উঁকি মেরে ছিল, কারণ কিছুক্ষণ পরে দেখলাম বিনা আয়াসেই ধরা গেল যে এই সময়ের মধ্যে আমার পড়া বেশ কয়েক পৃষ্ঠা অগ্রসর হলেও তারই ভিতর অন্তত পাঁচ সাতবার তো নিশ্চয়ই,—মন আমার সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করতে কিছুমাত্র ক্রুটী করে নি।

দোষ কি শুধু আমারই মনের? না, সমস্তটা নয়, মনোযোগ জিনিষটীরই ধর্ম্ম নাকি কতকটা এই। সে কখনও সর্ব্বদা একভাবে থাকে না, কখনও গভীর হয়ে বিষয় বস্তুর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, কখনও বা অগভীর নির্লিপ্তভাবে বিষয় বস্তুকে গ্রহণ করে, কখনও বা এতটা অগভীর হয় যে অন্য বিষয়বস্তুকেও কৃপাদৃষ্টিদানে কার্পণ্য দেখায় না। হয়তো ও চির শিশু, স্বভাবধর্ম্মেই ওকে চঞ্চল করেছে। তার প্রমাণ হচ্ছে জল প্রপাতের দূরশ্রুত শব্দ। প্রপাতের জলধার একভাবেই পড়ছে, কিন্তু দূর থেকে আমরা শুনি যে সে শব্দ একটানা, এক পর্দ্দায় বাঁধা শব্দ নয়, সে শব্দ কখনও কম কখনও বেশী। পণ্ডিতদের মতে এর কারণ প্রপাতের বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে

না, এর কারণ হচ্ছে শ্রোতার মনোযোগের গভীরতার তারতম্য। অবিরত এই স্বাভাবিক তারতম্যের ফলেই শব্দের ঐ তারতম্যের উদ্ভব।

তাই যদি হয়, তবে এই চঞ্চলা বধূকে বাঁধা যায় কি দিয়ে ও কি করে, সেই চিন্তাই আমাদের আগে করতে হবে কারণ ওই-ই আমাদের গৃহলক্ষ্মী, ওর স্থিতিই আমাদের ঘরে ঘরে কল্যাণ দীপশিখা জ্বালিয়ে তোলে। হোক না ওর মন চঞ্চল শিশুধর্ম্মী, ভুলিয়ে খুসী করে ওকে দিয়েই আমাদের সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে নিতে হবে।

মনোযোগকে আকর্ষণ করে তাকে দিয়ে কাজ পেতে হলে দুটো জিনিষ দরকার। একটী বাইরে থেকে সুন্দরের আকর্ষণ, অপরটী ভিতর থেকে প্রয়োজনের ও কল্যাণেচ্ছার প্রেরণা। সুন্দরের আকর্ষণ চঞ্চল মনোনিবেশকে কতকটা তার জ্ঞাতসারে কতকটা তার অজ্ঞাতসারে নিজের দিকে টেনে নেবে মুগ্ধ শিশুর মত, আর প্রয়োজনের, কল্যাণলাভের প্রেরণা তাকে দেবে শক্তি, গভীরতা ও একটা উচ্চতর আনন্দ। আমাদের এই চঞ্চলা বধূটীকে দিয়ে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাতে হলে আমাদের তুলসীমঞ্চ চাই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন, স্থান হওয়া চাই অনুকূল বাতাসে ভরা স্নিগ্ধশ্রীময়, কাল হওয়া চাই উপযুক্ত অর্থাৎ শান্তির অনুচ্চারিত বাণীমুখর সন্ধ্যা, দীপ হওয়া চাই উজ্জ্বল প্রভায় আনন্দোদ্ভাসিত। প্রথমে এই সব বাইরের সৌন্দর্য্য ও আনন্দ দিয়ে তার মনকে মুগ্ধ করতে হবে, তারপর ভিতর থেকে জাগিয়ে তুলতে হবে তার কল্যাণবোধ। এই দীপের আলোয় তার গৃহ সুন্দর হবে, তার প্রিয়জনের কল্যাণ হবে, তার অন্তর মধুর হবে, সে বোধ জাগিয়ে দিতে হবে তার মনে। তবেই সে কল্যাণময় সন্ধ্যাপ্রদীপখানি তার শ্রীমণ্ডিত অঙ্গুলিস্পর্শে জ্বালিয়ে দেবে, যাতে আমাদেরও কল্যাণ হবে।

যদিও মনোনিবেশের সাধারণ স্বরূপই চঞ্চলধর্ম্মী তবু বয়স্ক ব্যক্তিদের মনের চেয়ে আমাদের ভাবতে হয় বেশী শিশুমন নিয়ে, কারণ মনকে সংযত করে আমি পড়া শেষ করে নিতে নিতেই দেখি, কোন অবসরে আমার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ছাত্রীটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। মাঝে এক সময়ে দেখেছিলাম সে বইয়ের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে অদূরবর্ত্তী একটী বিড়াল ছানার দিকে মনোনিবেশ করেছিল। এখন দেখলাম বই অনাদৃত পড়ে আছে, পাঠিকা অদৃশ্য।

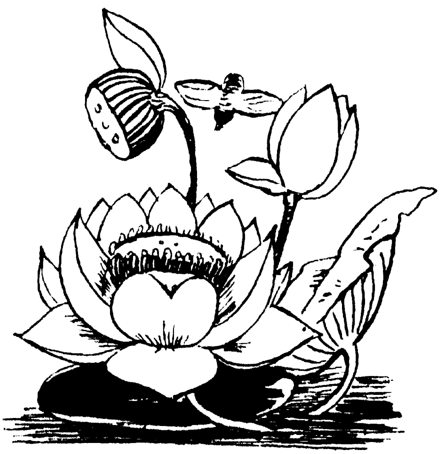
ওর ও তো দোষ দেওয়া যায় না—একে তো মনোনিবেশ নিজেই চিরচঞ্চল, তারপর শিশুমনও তো সদাচঞ্চল, উভয়েই বৈচিত্র্য চায়, কাজেই কোন বিশেষ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য শিশুর মনোনিবেশ করাতে হলে চাই আরো কিছু আয়োজনের সমাবেশ। প্রথমে চাই বেশী পরিমাণে বাইরে থেকে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের আকর্ষণ—গান, গল্প, ছবি, প্রতিকৃতি, খেলা, অভিনয়—তারপর ক্রমশঃ কতকটা এই সমস্তের ভিতর দিয়ে, কতকটা শিক্ষাদাতার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও আদর্শের প্রভাব দিয়ে, তার মনে জাগিয়ে তুলতে হবে অন্তরের কল্যাণপ্রেরণা। ভিতরের প্রেরণা যত জাগবে, বাইরের আকর্ষণের প্রয়োজনও ততই কমে আসবে। শিক্ষার্থী কি জানবে বা কি শিখবে

তা দেশকালপাত্রভেদে পরিবর্ত্তন হতে পারে, হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু মনোনিবেশের এই গতি ও ধর্ম্ম সাধারণভাবে সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল, আমার ক্ষুদ্র ছাত্রীটী অদূরেই আছে। পরিত্যক্ত পুস্তকের দিকে চেয়ে দেখি, আজকের পাঠ খোলা আছে—A bird has two wings.—ডাকলাম, মিতু! দেখ এসে, কি সুন্দর একটা পাখী আঁকছি, কত বড়ো দু-দুটো ডানা, কি সুন্দর রং।"

আনন্দোদ্ভাসিত মুখে সে ছুটে এলো। আমি তখন সোৎসাহে হাতের বই দাগ দেবার রঙীন পেন্সিলের সাহায্যে পাখী আঁকতে নিবিষ্টচিত্ত।

অঙ্কন বিদ্যায় আমার পারদর্শিতার পরিচয় দেওয়া নিরাপদ নয়, সেজন্য এখানেই শেষ করা বোধ হয় সব দিকে থেকে ভাল।



অগ্নি বাণী

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

তব কণ্ঠস্বরে যেন শুনিলাম নূতন মিনতি
নূতন নেশার স্বাদে ক্ষুব্ধ যেন পুরাণো মাতাল ;
অথবা কবিতা যেন—কবিতা সে আদিম যুবতী
রতিরসলগ্নে যার নাই দিবা রাত্রি ও সকাল !

বাহিরিনু রাজপথে—জনতার সমুদ্র অগাধ
মুহূর্ত্তে মুছিয়া গেল, শুনিলাম ওই তব স্বর !
জীবন-বাসরে যেন মিলনের মৃত্যুর আস্বাদ
শ্মশান-বধূর বুঝি হবে আজ অগ্নি—স্বয়ম্বর ?

কেন তুমি দিলে ডাক, হে আমার নতুন যোগিনী,
সংসারের চক্র হতে সন্ন্যাসের একি অভিসার !
বিপ্লবের কোন্ মন্ত্রে দীক্ষা তুমি দিবে উন্মাদিনী,
কলঙ্ক রজনীশেষে তব বীণা দিবে কি ঝঙ্কার ?

তব কণ্ঠস্বরে যেন লক্ষ লক্ষ যুগের বাসনা
এলো ছায়ামূর্ত্তি ধরি' শব্দহীন প্রেতের মতন।
বিদ্রোহী পুরুষ তাই অকস্মাৎ করিল রচনা
আসন্ন মিলনক্ষণে গোধূলির রক্তিম স্বপন !!

কাজ করি কেন ?

চিন্মোহন সেহানবীশ

"কাজ করি কেন" ?—এ প্রশ্নের উত্তরটাকে মোটামুটী চারভাগে ভাগ করা যায়—

১। কাজ করি পারিশ্রমিকের আশায়,

২। কাজ করি পদোন্নতির লোভে,

৩। কাজ করি কাজ ভাল লাগে বলে,

৪। কাজ করি কাজ না করলে খেতে পাইনা তাই।

এর মধ্যে প্রথম দু'টো কারণের পিছনে পুরস্কারের ও শেষেরটার পিছনে একটা শাস্তির ইঙ্গিত আছে। তৃতীয় কারণটার বেলায়, অর্থাৎ কাজ ভাল লাগে বলে যখন কাজ করা হয়—কাজই তখন চরম উদ্দেশ্য। পুরস্কার বা তিরস্কারের কথা সেখানে ওঠেনা কিম্বা বলা যেতে পারে সে ক্ষেত্রে কাজ করতে পারাটাই পুরস্কার আর না করতে পারাটাই শাস্তি। সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে এখানে আদর্শনিষ্ঠা প্রবল। আমরা সকলেই অল্পবিস্তর এই চারটে কারণের জন্যই কাজ করে থাকি—স্বভাব, শিক্ষা, সামাজিক আবহাওয়া, আর্থিক অবস্থা ইত্যাদির ফলে হয়ত ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে কোনও একটা কারণ প্রধান হয়ে ওঠে, এই মাত্র। এখন দেখতে হবে চলতি সমাজ ব্যবস্থায় পুরস্কারের লোভ ও শাস্তির ভয়ে কাজ কেমন চলছে আর মানুষের আদর্শনিষ্ঠার দিকটা কতটা বিকাশ বা স্ফূর্ত্তির সুযোগ পাচ্ছে।

পারিশ্রমিকের আশায় কাজ আমরা সকলেই করে থাকি। বর্ত্তমানে সমাজের অধিকাংশ লোককেই জীবনধারণের জন্য যে ধরণের একটানা ও এক ঘেঁয়ে কাজ করতে হয় খতিয়ে না দেখলে মনে হয় সে কাজে প্রবৃত্ত করবার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ এইটাই। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা আরও একটু তলিয়ে দেখা দরকার।

জমি, কারখানা প্রভৃতি উৎপাদন যন্ত্রের মালিক তাদের কাজের পরিবর্ত্তে যে পারিশ্রমিক পায় তার নাম মুনাফা। বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এদের পুরস্কারটা একটু ঘটা করেই হয়ে থাকে। কাজেই এদের পক্ষে মুনাফার আকর্ষণে কাজ করাটাও বিচিত্র নয়। কোনও কোনও স্বাধীন "পেশা-দার"কেও (Independent Professional) সমাজ মুক্তহস্তে পুরস্কৃত করে। অনেক সময়ে দেখা যায় ডাক্তার, উকীল, শিল্পী ধীরে ধীরে উৎপাদন যন্ত্রের মালিকে পরিণত হচ্ছে।

এখন সমাজে একটা মস্ত বড় ধাপ্পা চলছে যে সমাজের সব লোকের পক্ষেই বুঝি এইরকম পুঁজিদার হওয়া সম্ভব। সকলেই আমরা সমান অবস্থা থেকেই সুরু করছি—যে খাটিয়ে যে বুদ্ধি-

---

* গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য যে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম সমাজের অধিকাংশ মানুষকেই করতে হয় "কাজ" কথাটা এখানে প্রধানতঃ সেই অর্থেই ব্যবহার করা হোলো।

মান, যে সঞ্চয়ী সেই ধনদৌলতের মালিক হতে পারে এই চলতি বিশ্বাসটা অত্যন্ত আংশিকভাবে আগেকার সমাজের পক্ষে সত্য হলেও আজ তা' একেবারেই ভুয়া। নেহাৎ যারা চোখ বুঁজে থাকতে ভালবাসে তারা ছাড়া অন্যের কাছে একথা ধরা পড়ছে যে শুধুমাত্র পরিশ্রম করে উপরের দিকে ঠেলে ওঠা ক্রমেই শক্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু সমাজে অধিকাংশ লোকেই চোখ খুলে অপ্রীতিকর জিনিষটা দেখতে নারাজ কাজেই এখনও দিশাহারা তরুণকে কৃষ্ণপান্তি, রামদুলাল সরকার থেকে সুরু করে মায় হেনরী ফোর্ড পর্য্যন্ত সমস্ত ধনবীরদের চমক্‌প্রদ জীবনবৃত্তান্ত শোনান হয় যাতে তারাও ঐরকম হতে পারে। সিনেমার পর্দায় দেখান হয় বরাত থাকলে কেমন করে কারখানার মজুর অপুত্রক কলওয়ালার একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করে বিশাল সম্পত্তির মালিক হতে পারে। অবশ্য এক্ষেত্রে সামাজিক বাস্তবতার চাপে পড়ে অগত্যা সিনেমাওয়ালাকেও বুদ্ধি, সঞ্চয়শীলতা, শ্রমনিষ্ঠা প্রভৃতি ব্যক্তিগত গুণের চেয়ে বরাতের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আত্মসম্মোহনের (self-hypnosis) বর্ম্ম ভেদ করে সামাজিক সত্যের খোঁচাটা ক্রমেই বেশী করে লাগছে। এখন অবধি আগেকার সমাজের সত্য ভূত হয়ে আমাদের সামাজিক চিন্তার ঘাড়ে চেপে বসে আছে বটে তবুও যে মজুর রোগজর্জ্জর দেহে কলের বাঁশীর ডাকে বস্তি থেকে বেরিয়ে আসছে, যে চাষা এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে হাড়ভাঙা খাটুনী খাটছে বা যে কেরাণী অফিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে আলো জ্বালিয়ে নথিপত্রের মধ্যে পরমার্থ খুঁজছে, সম্ভাবনা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা দিনকে দিন অস্থিমজ্জায় একথা বুঝতে সুরু করেছে যে পুঁজিদার হওয়ার আশা আকাশকুসুম। আর এরাই হচ্ছে সমাজের শতকরা নব্বই অংশ।

কিন্তু পারিশ্রমিকের অন্য আর এক রূপ আছে। উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা থেকে লক্ষ-টাকার মুনাফা লাভের দুরাশা হয়ত আমাদের অনেকেরই নেই (বা থাকলেও কমে আসছে) কিন্তু সকলেই আমরা ভাল বেতন, উন্নততর জীবনযাত্রার আশা রাখি। একথা সত্য যে এ আশা মেটা অসম্ভব নয়। চলতি সমাজ ব্যবস্থায় দু'রকম ভাবে এই পারিশ্রমিকের বন্দোবস্ত করা হয়েছে —প্রথম Piece rate বা কাজের পরিমাণ অনুসারে বেতন নির্দ্ধারণ, ও দ্বিতীয় দক্ষতার ক্রমপর্য্যায় অনুসারে বেতনের ব্যবস্থা। এইভাবে কাজের পরিমাণ ও দক্ষতা দুটোকেই পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে আগেকার তুলনায় যে গণ্ডীর মধ্যে বেতন বাড়া কমার দৌড় সীমাবদ্ধ ছিল তা' ক্রমশঃই সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠছে। শিল্প-বিপ্লবের প্রথম যুগে পটু অপটু কর্ম্মীর মধ্যে যে তফাত ছিল বেতনের দিক থেকে ধীরে ধীরে সেটা ছোট হয়ে আসছে। তা' ছাড়া আমাদের ভারতীয় সমাজে বেতনের প্রশ্ন লোকসংখ্যার এক বিপুল অংশের কাছে ওঠেইনা কারণ জমী থেকে যাদের খাওয়া পরার সংস্থান হয় তাদের অনেকেরই আয় বেতনরূপে লব্ধ হয়না। তবুও একথা সত্য যে আগেকার চেয়ে কম হলেও চলতি সমাজ ব্যবস্থায় বেতন বৃদ্ধি বা জীবনযাত্রার উন্নতির আশা আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করাবার একটা বড় উপাদান।

পদোন্নতি ও তার ফলে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আশা আমাদের সমাজে বেতন বৃদ্ধির আনুসাঙ্গিক। কাজেই যে পরিমাণে বেতন বৃদ্ধির আকর্ষণীশক্তি গণ্ডীবদ্ধ হচ্ছে ঠিক সেই পরিমাণেই পদোন্নতির আশা সুদূর-পরাহত হয়ে পড়ছে। তবুও বেতন বৃদ্ধি, পদোন্নতি ও জীবনযাত্রার উন্নতির আশা আমাদের আংশিকভাবে কাজ করতে প্রবৃত্তি যোগায় একথা নিঃসন্দেহ।

কাজ ভাল লাগার প্রশ্ন বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে কাজ ভাল লাগতে পারে দু'টো কারণে। প্রথমতঃ আমার স্বভাব, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক আবহাওয়া এই সবকিছুর ফলে আমার যে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তার সঙ্গে খাপ খায় বলে হয়ত আমার কাজ ভাল লাগতে পারে। দ্বিতীয়তঃ আমার কাজের সঙ্গে সমাজের কল্যাণ জড়িত এই বিশ্বাসে আমার কাজ ভালো লাগা সম্ভব। আমরা এই দুটো'দিকই বিচার করে দেখব।

ব্যক্তিগত শক্তির বিকাশ যে কাজে সম্ভব সে কাজ সকলের পক্ষেই ভাল লাগা স্বাভাবিক। শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি মনধর্ম্মীদের পক্ষে বিশেষ করে একথা খাটে, সাধারণের এই বিশ্বাস। তাঁরা প্রত্যক্ষ লাভের চাইতে মনের তৃপ্তিকে বড় মূল্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ হল আদর্শবাদের কথা, আর নির্জ্জলা আদর্শবাদকে স্থায়ীভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার মধ্যে নিশ্চিত আনন্দ থাকলেও তার দুঃখও কম নয়। কাজেই অত্যন্ত দৃঢ় চরিত্র লোক ছাড়া অন্য সকলেই আদর্শবাদ ও বিষয়বুদ্ধির মধ্যে একটা আপোষের বন্দোবস্ত করতে হয়—সে ক্ষেত্রে যে কাজ তাঁরা করতে বাধ্য হন সে কাজ ভাল লাগে একথা তাঁদের পক্ষে বিশেষ সম্মানের নয়। এঁরা ছাড়া শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে একটা অবিরাম দ্বন্দ্ব চলতে থাকে যতদিন না শেলী-সেক্সপিয়ার লেজার বইয়ের অতলে স্থান পায়। এই শিক্ষা ও জীবনের বিরোধ যাঁরা শিক্ষাকে জীবনের স্তরে নামিয়ে এনে মেটাতে চান—তাঁদের বাস্তবতা সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞানসম্পন্ন বলে আখ্যা দেওয়া হয়। আর যাঁরা জীবনকে টেনে শিক্ষার পর্য্যায়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেন তাঁদের বলা হয় আদর্শবাদী পাগল। যাই হো'ক, সমাধানটা যে পথেই হো'ক না কেন—সমস্যাটা আজকের জগতে অত্যন্ত বাস্তব এ বিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এঁরাও হলেন গিয়ে শিক্ষিত মুষ্টি-মেয়র দল। এঁদের দুনিয়ার বাইরে আমাদের সমাজে যে বিশাল জনসমুদ্র, তাদের কাজ ভাল লাগা না লাগার প্রশ্ন ওঠেই না। রোগশীর্ণ দেহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা কাজ করে চলে তাও এক কোমর জলে দাঁড়িয়ে নয়ত অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কারখানার গহ্বরে। মনস্তত্ত্বের দিক থেকেও ভৃত্যের কাজের চাইতে প্রভুর কাজ প্রীতিকর তার কারণ সেখানে স্বাধীন চিন্তা প্রয়োগের সুবিধা থাকে। কর্ম্মপ্রেরণা যোগানোর দিক থেকে কাজের মাধুর্য্যের কথা তোলা—অন্ততঃ এদের পক্ষে—মারাত্মক রকমের ঠাট্টা।

আমার কাজের সঙ্গে সমাজের কল্যাণ জড়িত—এই বিশ্বাসে মানুষ তার ক্ষুদ্র স্বার্থকে উপেক্ষা করতে পারে—একথা সত্য। কিন্তু চলতি সমাজ ব্যবস্থা এই আদর্শবাদের বিকাশ বা স্ফূর্ত্তির সুযোগ দিতে পারছে কি? এখনও দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, ভূমিকম্প বা দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার

মানুষের এই আদর্শবাদকে উদ্বুদ্ধ করে দেখা যায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এই আদর্শবাদকে কাজে লাগাবার কোনও স্থায়ী বন্দোবস্ত নেই। আরও বিপদের কথা এই যে কখনও কখনও মানুষের এই সম্পদকে ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। দেশ প্রেমের দোহাই দিয়ে সাম্রাজ্যতন্ত্র যখন দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেকে মহাযুদ্ধের নরমেধ যজ্ঞে পাঠায় তখন খবরের কাগজ, বক্তৃতা-মঞ্চ, রেডিও থেকে এক বিরাট 'বাহবা' ধ্বনি ওঠে শুধু মানুষের এই আদর্শবাদকে ভালভাবে ক্ষেপিয়ে তুলতে। আজ তাই মানুষের ভিতরের আদর্শনিষ্ঠার হয় অব্যবহার নয়ত অপব্যবহার ঘটছে।

বর্ত্তমান সমাজের বিপুল জনসাধারণ কাজ করে পুরস্কার বা আত্মতৃপ্তিরূপ বিলাস চরিতার্থ করতে নয়—শাস্তির ভয়ে। তারা কাজ করে কাজ না করলে বাঁচবার উপায় নেই বলে। এই হল একটানা, একঘেঁয়ে কাজ করার প্রধান কারণ—বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতির আশা, কাজ ভাল লাগা এ সব হল গৌণ। আইনতঃ অবশ্য কোন লোকই শাস্তির ভয় দেখিয়ে অন্যকে কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না—আইনের চোখে সবাই সমান কিন্তু চলতি সমাজ ব্যবস্থায় সে সাম্য দাঁড়িয়েছে—Anatole Franceএর তীব্র শ্লেষের ভাষায়—The Majestic equality of Law which forbids the rich and the poor alike to sleep under the bridge, to steale... এই ছদ্মবেশী দাসত্বপ্রথার সমাজে কাজ যদি আমার ভাল না লাগে, কিম্বা যদি আমার নিজসর্ত্তে আমি কাজ করতে চাই তবে মূলধনীর হাতে রয়েছে চরম শাস্তি—তার কারখানা, তার জমী সে দেবে না ব্যবহারের জন্যে ফলে আইনের নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও আমার কপালে আছে নিশ্চিত অনাহার ও মৃত্যু। মূলধনীর অবশ্য তাতে কিছু এসে গেলো না কারণ আমার জায়গাটা দখল করবার জন্য কারখানার "No Vacancy" লেখা দরজায় মাথা খুঁড়ছে হাজারো লোক যাদের অভাব আমার চেয়ে এক তিলও কম নয়। সব চাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে কারখানার বাইরের জনসমুদ্র যত বিপুলতর হচ্ছে কারখানার ভিতরের লোকদের উপরে মূলধনীর বজ্রমুষ্টি ততই দৃঢ়তর হচ্ছে কারণ পছন্দ না হলেই আমার বাইরে যাওয়া, আর বাইরের অসংখ্য লোকের মধ্যে কোন এক ভাগ্যবানের ভিতরে আসা—এই আনাগোনা ততই সহজ হয়ে উঠছে। আইনের চোখে যে আমরা সবাই সমান এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই!

এইখানে আমরা চল্‌তি সমাজ ব্যবস্থার একটা বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাই। "কাজ করি কেন" এ প্রশ্নের বিচার প্রসঙ্গে এতক্ষণ আমরা তাদের কথাই বললাম যাদের সমাজ এখনও কাজ দিতে পারছে। কিন্তু একটু আগেই আমরা দেখলাম সমাজে বহুলোকের কোন কাজেরই সংস্থান হচ্ছে না। যাদের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না তারা কাজ করে কেন এ রকম উদ্ভট প্রশ্নকে আমরা বিনা দ্বিধায় বাতিল করে দিতে পারি। এদের পক্ষে কাজ ভাল লাগা না লাগা, পুরস্কারের টান বা তিরস্কারের তাড়া কোনটাই খাটে না—অথচ এদের সংখ্যা স্থায়ী ভাবে ও যথেষ্ট পরিমাণে কমবার কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। সমাজের নিম্নস্তরের কথা বাদ দিলেও শিক্ষিত তরুণ

তরুণীর মধ্যে এই কর্ম্মহীনতা—আমেরিকার মত শিল্পপ্রধান দেশেও কি রকম প্রসার লাভ করেছে এইখানে একটু সে কথা বলব।

"In his biennial report of 1932-34 President Coffman, President of the University of Minnesota, stated that of the 21½ million American young men and women between 16 and 25 years of age, 1 million were in college, 2 millions were in secondary schools, 2 millions were at work, while 16½ millions were out of school and out of work."

John Strachey এর উপর মন্তব্য করেছেন—"The sixteen and a half million young Americans may typify the other uncounted millions of young men and women of every capitalist nation who have found that the world of to-day has no use for them. It is horrible to imagine the sense of frustration which these millions of idle young men and women must experience. To be 20 years old, and to have nothing to do; to discover that nowhere in the whole gigantic, complex, dazzling panorama of modern life is there a single task with which one can be entrusted; to find that no man needs one for anything, anywhere—what could be worse than this."

এই sense of frustration বা বিফলতা-বোধের ফলে ক্রমে ক্রমে মানুষের দেহে মনে ঘুন ধরে যাচ্ছে। এইখানেই সমাজের সবচেয়ে বিপদের সূচনা হয়—সে বিপদ হচ্ছে কর্ম্মহীনের ধীরে ধীরে অকর্ম্মণ্যে পরিণতি। একবার এই কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটলে বেতনবৃদ্ধি বা পদোন্নতির আশা এমন কি শাস্তির ভয় কোন কিছুই তাকে কাজে প্রবৃত্ত করাতে পারে না। বাধ্যতামূলক কর্ম্মহীনতার অন্তিম অবস্থা দৈহিক ও মানসিক জড়ত্ব।

অতএব সব দিক থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেলো যে চলতি সমাজ ব্যবস্থার সমর্থকদের ওকালতী সত্ত্বেও কাজের প্রবর্ত্তনার দিক থেকে একে কোনক্রমেই আদর্শ সমাজ বলা যেতে পারে না—দ্বিতীয়তঃ পুরস্কারের টান বা কাজের মনোহারীত্বের তুলনায় শাস্তির ব্যবস্থাটাই সমাজে ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে অর্থাৎ পরিবর্ত্তনটা হচ্ছে অকল্যাণের দিকে।

এইবারে আমরা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এ সমস্যা সমাধানের কি রকম চেষ্টা হয় তাই দেখব।

প্রথমেই দেখতে পাই যে শাস্তির দিক থেকে দুই সমাজে একই ব্যবস্থা—সমাজতান্ত্রিকও বলছে "If you don't work, neither shall you eat" এবং এই নিয়ম সে আগেকার তুলনায় আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে। কিন্তু বাইরের এই সাদৃশ্যের পিছনে দুই সমাজের মধ্যে মস্ত বড় পার্থক্য রয়েছে। বর্ত্তমান সমাজ কাজ না করলে খেতে দেবে না অথচ কাজ যোগাড়

করে দেবার দায়িত্ব তার নেই। সমাজতন্ত্রও বলছে, না খেটে খেতে পাবে না কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে প্রত্যেকের কাজের সংস্থানও করছে ; বাধ্যতামূলক কর্ম্মহীনতা সেখানে নেই—ফলে মানুষের জড়ে পরিণত হবার সম্ভাবনাও সেখানে অত্যল্প।

সমাজতন্ত্র উৎপাদন-যন্ত্রের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে না কাজেই মুনাফার উৎপত্তিও সে ব্যবস্থায় অসম্ভব। কাজেই এককালে যারা মুনাফাজীবী ছিল সমাজতন্ত্র তাদের চোখে বিভীষিকা বলে বোধ হয়। কাজে প্রবৃত্ত হবার উপযোগী কোন প্রেরণাই এখানে তারা পায় না—অন্য দশজনের মত না খাটলে তাদের বাঁচার উপায় নেই। কিন্তু যেহেতু এরা সমাজের মুষ্টিমেয় অংশ আর সমাজের অগণিত জনসাধারণের কাছে এই ধরণের কর্ম্মপ্রেরণা কার্য্যকরী নয় কাজেই মোটের উপরে নূতন ব্যবস্থায় এই দিক থেকে ব্যাপক ভাবে ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

আমরা চলতি সমাজ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে সমাজের অধিকাংশ লোককে কাজে প্রবৃত্ত করবার একটা মস্ত বড় উপায় হচ্ছে বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতি বা উন্নততর জীবন যাত্রার আশা— উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানার আকাশকুসুম নয়। এই দিক থেকে দেখি সমাজতন্ত্র চলতি সমাজ ব্যবস্থার চাইতে অনেক এগিয়ে গেছে। বর্ত্তমানে শিক্ষার ব্যবধান, শ্রেণী-সাম্প্রদায়িকতা, আত্মীয় স্বজনকে সুবিধা দেওয়া পুঁজিবাদের এই সব অবশ্যম্ভাবী ফলের জন্য অনেক কাজেই উপযুক্ত লোকে ঠাঁই পায় না। শ্রেণী বিভাগটা ক্রমেই জাতি বিভাগের মত অচল, অনড় হয়ে উঠছে—ফলে সেই পরিমাণে এই কর্ম্মপ্রবর্ত্তনার কার্য্যকারীতাও কমে আসছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ এই সমস্ত বাধা ব্যবধান দূর করে ব্যক্তিগত পুরস্কারের আশা সমস্ত শ্রমজীবীদের চোখের সামনে উজ্জ্বল করে ধরছে। যেখানেই সম্ভব Piece-rate বা কাজ অনুযায়ী বেতনের বন্দোবস্ত ও দক্ষতার ক্রমপর্য্যায়ে বেতনের পরিমাণ ধার্য্য করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফল কি হয়েছে তা সিড্‌নী, বিয়াট্রিস ওয়েবের ভাষায় বলছি :—

"In the Soviet union, the upward march, from grade to grade, of the more ambitious, the more able, the more industrious, and the more zealous workers in industrial occupations is widespread and continuous In no other country, not even in the United States, it is so general...... The Capitalist employers in every other country, whilst complacant about their own superior efficiency in profit making, must now and then envy the industrial directors of the U. S. S. R. the extraordinary increases of output obtained by the incentives that Soviet Communism supplied to its labour force !" (Soviet Communism :—A New Civilisation Pp. 712 and 719.)

আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে। দক্ষতার সিঁড়ি দিয়ে সমাজতন্ত্রের শ্রমিক যেমন ক্রমশঃই উপরের দিকে উঠছে তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষারও প্রচুর ও যথাযথ বন্দোবস্ত হচ্ছে। এ শিক্ষা পুঁথিগত বিদ্যাসঞ্চয় নয়, আবার শুধুমাত্র কলকারখানা চালাবার উপযোগী শিক্ষাও নয়।

এ শিক্ষা শ্রমিকের নিজ কাজের সঙ্গে সমাজের যোগসূত্র স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়ে তাকে এক সমাজ দর্শনের পরিচয় করিয়ে দেয়। দৃষ্টির প্রসারের ফলে সে ধীরে ধীরে পরিচালনার ভার গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠে। পদোন্নতির এই সব প্রত্যক্ষ প্রণালী ছাড়াও সুদক্ষ কর্ম্মীর সামাজিক সম্মানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খনিমজুর Stakhanov এর নাম আজ লোকের মুখে মুখে, খবরের কাগজের পাতায় পাতায় তার ছবি।

আর যেখানে মানুষ কাজের নেশায় বা সমাজমঙ্গলের জন্য পরিশ্রম করতে প্রস্তুত—মানুষের সেই আদর্শবাদের দিকটার চরম বিকাশ এই সমাজতন্ত্রেই সম্ভব। চলতি সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদনের সত্যকার সামাজিক রূপটা ঢাকা পড়ে গেছে ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণের তলায়। যে কাজ করে তাকে অজানিতভাবে দেখানো হচ্ছে যে দুনিয়ায় একমাত্র কাম্য হচ্ছে নিজস্বার্থসিদ্ধি। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত পুরস্কার প্রথা তুলে দিচ্ছে না সত্য কিন্তু ব্যক্তির পরিশ্রমের সঙ্গে বিকাশোন্মুখ সমাজের নিগূঢ় সম্বন্ধ সকলের চোখের সামনে ধরছে, তাকে দিচ্ছে এক নূতন জীবন-দর্শন। কাজেই মানুষ আজ নিজেকে বুঝতে শিখছে ভবিষ্যৎ সমাজের স্রষ্টারূপে। এই অনুভূতিই—এই সৃষ্টির আনন্দই—সমাজতন্ত্রের মানুষের আদর্শবাদকে সাময়িক ভাবে নয়—প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে উদ্‌বুদ্ধ করছে। এইখানে ষ্ট্যালিনের কথা উল্লেখযোগ্য :—

"Under Capitalism, labour has a private, personal character. If you have worked more, you receive more and live for yourself as you know, best. Nobody knows you or wants to know you. You work for Capitalists, you enrich them. And how otherwise? It is for that you were hired to enrich the exploiters. You do not agree with this—then join the ranks of the employed and eke out an existence as best you can—we shall find others more tractable. It is for this reason that the labour of people is not highly valued under Capitalism.......It is a different matter in the conditions of the Soviet system. Here the man of labour is held in honour. Here he works not for the exploiters but for himself, for his class, for society. Here the man of labour cannot feel himself neglected and alone. On the contrary, the man of labour feels himself in our country to be a free citizen of his country, a sort of public figure. And if he works well and gives to society what he is able to give—he is a hero of labour, he is surrounded with glory."

একই সময়ে বিভিন্ন মনোবৃত্তির লোকের ও বিভিন্ন সময়ে একই লোককে আকৃষ্ট করবার উপযুক্ত প্রবর্ত্তনা যোগানোর দিক থেকে আমাদের চলতি সমাজ ব্যবস্থা ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে উঠছে—আর শাস্তিকে গৌণ করে পুরস্কার ও আদর্শ নিষ্ঠাকে মুখ্য করে সমাজতন্ত্র মানুষের কল্যাণময় ভবিষ্যতের ইঙ্গিত করছে।

বাংলার সেকালের মেয়েদের কথা

আশালতা সেন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা 'রাজস্থানে' রাজপুত রমণীদের কঠোর জহরব্রতের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। প্রায়ই দেখা যায় যে বিজয়ী শত্রুহস্তে বিজিত জাতির রমণীকুলের লাঞ্ছনার আর পরিসীমা থাকে না। বিজিত শত্রুর স্ত্রী-কণ্যাদের বন্দিনী করিয়া আনিয়া তাহাদিগকে নানা ভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা বিজয়ী শত্রুপক্ষের বিজয়োল্লাসের যেন একটি প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। একাদশ খৃষ্টাব্দের একখানা শিলালিপিতে জনৈক নৃপতির বিজয় কাহিনী বর্ণনায় বিভিন্ন রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের পত্নীগণকে বন্দিনী করিয়া রাখার বিষয় সগৌরবে এইভাবে উক্ত হইয়াছে,—

> "কা ত্বং কাঞ্চীনৃপতিবণিতা কা ত্বমন্ধ্রাধিপস্ত্রী
> কা ত্বং রাঢ়পরিবৃঢ়বধূঃ কা ত্বমঙ্গেন্দ্রপত্নী,
> ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরীপ্রিয়ানাং
> কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরানাং বভূবঃ।"

"তুমি কে ?—কাঞ্চীনৃপতিবণিতা,—তুমি কে ?—অন্ধ্রাধিপস্ত্রী,—তুমি কে ? রাঢ়ারাজবধূ,—তুমি কে ? অঙ্গরাজপত্নী,"—সমরজয়ী নৃপতির কারাগারে অশ্রুসিক্ত নীলোৎপলনয়না শত্রুপত্নীগণের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

শত্রুহস্তে বন্দিনী এইসব ললনাবৃন্দ যে নির্য্যাতন ও অসম্মান ভোগ করিতে বাধ্য হইতেন তাহা হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এই জহরব্রত অনুষ্ঠানের প্রথম পরিকল্পনা। রাজ্য যখন শত্রু-করতলগত হওয়ার সম্ভাবনা, তখন জহরব্রত অনুষ্ঠান কারিণী যে সব পুরনারীগণ মূহুর্ত্তের আহ্বানে মরণকে অকাতরেই বরণ করিতে প্রস্তুত হইতেন তাঁহাদের হৃদয়ের বল ও মানসিক দৃঢ়তা সত্যই অতুলনীয়।

আমরা এইরূপ একটি জহরব্রত অনুষ্ঠানের উল্লেখ বাংলার ইতিহাসেও দেখিতে পাই। এই ঘটনাটি দ্বিতীয় বল্লাল সেনের সময় সংঘটিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ জহরব্রতের অনুষ্ঠানই অতিশয় করুণ। কিন্তু দ্বিতীয় বল্লাল সেনের রাজান্তঃপুরিকাদের জহরব্রতের কাহিনীর মত করুণ ও মর্ম্মান্তিক ঘটনা খুব কমই ঘটিয়া থাকে। কথিত আছে দ্বিতীয় বল্লাল সেন জনৈক মুসলমান ফকীরের সহিত যখন যুদ্ধ যাত্রায় বহির্গত হন তখন দুইটি সুশিক্ষিত কবুতর সঙ্গে নিয়া যান ও বলিয়া যান যে ঐ কবুতর যদি একাকী রাজবাড়ীতে ফিরিয়া আসে তবে বুঝিতে হইবে যে বল্লাল

সেন যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন এবং রাজপুরী অচিরেই শক্রপক্ষের হস্তগত হইবে। আর সেই মূহুর্ত্তেই রাজপুরনারীগণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন।

বল্লাল সেন এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন ও যুদ্ধে শক্রপক্ষকে পরাজিত করিয়া বিজয় লাভ করিলেন। যুদ্ধান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে দৈবক্রমে বল্লাল সেনের অলক্ষিতে সেই কবুতর তাঁহার কাছ হইতে রাজধানীতে অতি সত্বরই উড়িয়া যায়। কবুতর দুটিকে এইভাবে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া পুরনারীগণ তৎক্ষণাৎই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দলে দলে আত্মাহুতি প্রদান করিলেন। এদিকে বল্লাল সেন কবুতর উড়িয়া যাওয়ার কথা জানিবা মাত্র একান্ত উদ্বেগে যথাসম্ভব দ্রুতবেগে রাজপুরীতে ফিরিয়া আসেন ও দেখিতে পান যে তাঁহার আসিবার পূর্ব্বেই সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। দেখিতে পান যে তাঁহার বিজয়লাভের সকল আনন্দ ভস্মিভূত করিয়া এক মহাশ্মশানবক্ষে শত শত লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিশিখা উন্মত্তের মত নৃত্য করিতেছে। কথিত আছে যে এই ঘটনায় একান্ত শোকাভিভূত হইয়া সেই অগ্নি কুণ্ডেই পতিত হইয়া বল্লাল সেন নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

সম্রাট আকবরের সমসাময়িক কালে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আমরা বাংলার একটি বীরাঙ্গণার বিবরণ পাইয়া থাকি। তাঁহার নাম রাণী ভবশঙ্করী। তাঁহার পিতা দীননাথ চৌধুরী পশ্চিম বঙ্গের জনৈক দুর্গাধিপের অধীনে একজন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার ও সহস্রাধিক সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। অস্ত্রনৈপুণ্য ও বীর্য্যবত্তার জন্য তিনি বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। শৈশবে মাতৃহীনা কন্যা ভবশঙ্করী পিতা দীননাথ চৌধুরীর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। কথিত আছে ভবশঙ্করী অসাধারণ দৈহিক বল সম্পন্না ছিলেন ও অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পিতার নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা ও বন্যপশু শিকার অভ্যাস করিয়া তাহাতে আশ্চর্য্য নিপুণতা লাভ করেন। পশ্চিম বঙ্গের ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভূরস্যুট) রাজ্যের রাজা রুদ্রনারায়ণ একদিন দৈবক্রমে এক নিবিড় অরণ্যের নিকটে কিশোর বয়স্কা ভবশঙ্করীকে বন্য পশু শিকার করিতে দেখিতে পান ও অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও মুগ্ধ হইয়া যান এবং ভবশঙ্করীর পিতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইয়া এই কিশোরী বীরবালার পাণি প্রার্থী হন। দীননাথ চৌধুরীও আনন্দসহকারেই নিজ সম্মতি প্রদান করেন। বিবাহের পর ভবশঙ্করী পতির সহিত রাজ্যের নানারূপ উন্নতি বিধানে যথেষ্ট উদ্যোগী হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের এই সুখময় বিবাহিত জীবন বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। একটিমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবার অল্প কিছুকাল পরেই রাজা রুদ্রনারায়ণ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অল্পবয়স্কা বিধবা রাণী ও শিশু রাজপুত্র। শক্রদলের পক্ষে ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগে ভূরস্যুট রাজ্যের নিকটবর্ত্তী এক সামন্ত রাজ্য হইতে ওস্‌মান নামে পাঠানদলের এক সর্দ্দার অতর্কিতে সৈন্যদল সহ ভূরস্যুট রাজ্য আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য রাণী ভবশঙ্করী স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া উক্ত পাঠান সর্দ্দারকে পরাজিত ও নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে সম্রাট আকবর বীর রমণীর এই বীরত্বের বার্ত্তা শ্রবণ

করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করেন ও রাণী ভবশঙ্করীকে উপযুক্তরূপ উপঢৌকন প্রেরণ ও তাঁহাকে 'রায়বাঘিনী' এই বীরত্বব্যঞ্জক উপাধি প্রদান করেন। বাংলার ঘরে ঘরে বধূ নির্য্যাতন কারিণী ননদিনীকুলের প্রতি যে উপাধিটি নিরুপায় ভ্রাতৃবধূরা এযাবৎকাল প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছেন, সেই উপাধিটি যে একদিন বাংলারই একটি বীর রমণীকে সম্মান প্রদর্শনার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা অনেকেই জানেন না।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গে বার ভূঁইয়ার অন্যতম চাঁদরায় ও তাঁহার ভ্রাতা কেদাররায় তাঁহাদের বল ও বিক্রমের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। চাঁদরায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীর নামও যে কোনও ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরাঙ্গনার সমপর্য্যায়ভুক্ত হইবার যোগ্য। বিশেষতঃ স্বর্ণময়ীর জীবনের ঘটনা সংস্থানে অদৃষ্টের যেরূপ ক্রূরতা দেখা যায় সেরূপ খুব কমই দেখা গিয়া থাকে।

চাঁদরায়ের এই অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী দুহিতা স্বর্ণময়ী নিতান্ত বালিকা বয়সেই বিধবা হন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম যৌবনেই একদিন দৈবক্রমে বারভূঁইয়ার অন্যতম ঈশাখাঁর দৃষ্টিপথে পতিত হন। ঈশাখাঁ চাঁদরায়ের নিকট স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলে চাঁদরায় ঘৃণার সহিত সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। স্বর্ণময়ীকে সদুপায়ে লাভ করিতে অসমর্থ ঈশাখাঁ অসদুপায়ে তাঁহাকে পাইবার প্রচেষ্টা করেন। সবচেয়ে গুরুতর লজ্জা ও দুঃখের কথা এই যে চাঁদ ও কেদার রায়ের শ্রীমন্ত খাঁ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী ঈশাখাঁর সহিত স্বর্ণময়ী হরণ সংক্রান্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া স্বর্ণময়ীকে মাতুলালয়ে লইয়া যাইবার ছলনা করিয়া ঈশাখাঁর হাতে সমর্পণ পূর্ব্বক চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করে। ইহার পর ঈশাখাঁ স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন ও এই সময় হইতে স্বর্ণময়ী 'সোনাবিবি' নামে আখ্যাত হন। চাঁদরায় এই ঘটনাতে লজ্জা, দুঃখ ও অপমানে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। আর কেদার রায় তাঁহার যতদূর সাধ্য ঈশাখাঁর সহিত শত্রুতা সাধনে তৎপর হন।

ঈশাখাঁর অন্তঃপুরে স্বর্ণময়ী তাঁহার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু ঈশাখাঁর মৃত্যুর পর শ্রীপুর, ত্রিপুর ও আরাকান হইতে শত্রুদল যখন তাঁহার সোণারগাঁর রাজ্য বারবার আক্রমণ করিতে থাকে তখন স্বর্ণময়ী তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজ শক্তিবলে বহুদিন নিজ রাজ্য রক্ষা করেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লিখিত আছে। কথিত আছে যে স্বর্ণময়ী স্বয়ং অশ্বারোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু নিজে অতিশয় শক্তি-মতী নারী হইলেও তাঁহার আজন্ম সঙ্গী দুঃর্ভাগ্যকে তিনি কিছুতেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। স্বর্ণময়ী হরণ ব্যাপারে যত অমার্জ্জনীয় অপরাধই করিয়া থাকুন না কেন সোণারগাঁ অধীশ্বর ঈশাখাঁ অন্যপ্রকারে বহু গুণশালী ও একজন বিক্রমশালী যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন। বিবাহান্তে স্বর্ণময়ীকে তিনি তাঁহার উপযুক্ত যথেষ্ট সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু স্বর্ণময়ীর পুত্রগণ নিতান্তই অপদার্থ ছিল। এবং তাহাদের কাছ হইতে কোন সাহায্য পাওয়াই স্বর্ণময়ীর

সম্ভব হয় নাই। অবশেষে বারবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে একাকী রাজ্যরক্ষায় ক্লান্ত স্বর্ণময়ী শেষবার আরাকানের মগদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা ও রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় না দেখিতে পাইয়া জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করেন। অবশেষে এইভাবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর ঘাত প্রতিঘাতে শ্রান্ত ও ক্লান্ত একটি শক্তিমতী বঙ্গদুহিতার জীবনের শেষ যবনিকা পতন হয়।

এইখানে চাঁদরায়ের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কেদার রায়ের বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী পত্নীর কথাও উল্লেখ-যোগ্য। কেদার রায় মানসিংহের সহিত তাঁহার শেষ যুদ্ধযাত্রার সময় তাঁহার পত্নী ও রাজকর্ম্মচারী-দের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যান। কেদার রায়ের যুদ্ধে নিহত হওয়ার সংবাদ আসিলে তাঁহার তেজস্বিনী পত্নী প্রথমে কিছুতেই সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইতে রাজী হন্ নাই। কিন্তু একদিকে প্রবল প্রতাপ ভারতেশ্বর দিল্লীর বাদসাহ, আর একদিকে হত-নায়ক ক্ষুদ্র শ্রীপুর রাজ্য। এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য রাজপরিষদগণ তাঁহাকে সন্ধিস্থাপন করার জন্যই বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের পরামর্শ ও অনুরোধে অবশেষে কেদার-মহিষী সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন্। সন্ধিস্থাপনের পর রাজ্ঞী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনার ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিষ্ণুপুর রাজ্যের মল্লবংশীয় রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের পত্নীর যে কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেও বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া রাজ্যের কল্যাণ কামনায় তিনি যে নির্ম্মম কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার ভিতর দিয়া আমরা তাঁহার অসাধারণ মানসিকবলের পরিচয় লাভ করি।

বিষ্ণুপুরের রাজা রঘুনাথ সিংহ 'লালবাই' নামে এক অপূর্ব্ব রূপসী মুসলমান রমনীর প্রণয়া-সক্ত হন। তিনি তাহার নাম অনুসারে বিষ্ণুপুরে লালবাঁধ নামে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করান ও তাহার জন্য এক স্বতন্ত্র প্রাসাদও নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে লালবাই যখন বুঝিল যে রাজা তাহার একান্ত অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন তখন সুযোগ বুঝিয়া সে প্রস্তাব করিল যে রাজাকে তাঁহার রাজ্যের সমস্ত প্রজাসহ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ কিছু ইতস্ততঃ করিয়া মোহান্ধ রাজা অবশেষে লালবাই-এর প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। লালবাই মহাউৎসাহে বিষ্ণুপুররাজ্যের প্রজাবৃন্দসহ 'ইস্‌লাম' ধর্ম্মগ্রহণ ও তাহার আনুষঙ্গিক ভোজের জন্য উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করিল। এই সংবাদ সমস্ত রাজ্যে অচিরেই ছড়াইয়া পড়িয়া সর্ব্বত্র একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল!

এদিকে বিপথগামী রাজাকে ফিরাইবার কোনও উপায় না দেখিয়া রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজমহিষীর সহিত পরামর্শ করিয়া এক গোপন ষড়যন্ত্র করিতে বাধ্য হইলেন। তাহাতে এই স্থির হইল যে রাণী রাজাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুরোধ করিয়া নিজ মহল্লায় ডাকাইয়া আনিবেন ও সেখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। একদিকে সমগ্র রাজ্যের কল্যাণ ও অপর দিকে পতির প্রাণ বিনাশ! এইরূপ মর্ম্মান্তিক সমস্যায় পতিত হইয়া রাণী অসাধারণ স্থৈর্য্য ও হৃদয়বল প্রদর্শন

করিয়া পতির প্রাণ বিনাশই সমর্থন করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যও স্থির করিয়া রাখিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ষড়যন্ত্র অনুসারে যথাসময়ে রাজা রাণীর মহল্লায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে রাজভ্রাতার অনুচরবৃন্দ তাঁহাকে হত্যা করিল। রাণী পতির মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতানলে স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন!

১৬৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের শোভাসিংহ নামে এক তালুকদার বিদ্রোহী হইয়া বর্দ্ধমানের জমিদার রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে কৃষ্ণরাম রায় নিহত হন। বিদ্রোহীরা রাজ প্রাসাদ দখল করে ও রাজ পরিবারবর্গকে বন্দী করিয়া নিয়া যায়। এই রাজ পরিবারের মধ্যে কৃষ্ণরাম রায়ের এক পরমা সুন্দরী কন্যাও বন্দিনী হন। দুর্ব্বৃত্ত শোভাসিংহের পাপদৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয়। জনৈক মুসলমান লেখক এই রাজকন্যার বিষয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে "চীনের ছবির ন্যায় সুন্দরী পবিত্র হৃদয়া রাজকন্যা কোনমতেই ব্যভিচার পাপে লিপ্ত হইবেন না। দুর্ব্বৃত্ত শোভাসিংহও কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। একদা রাত্রিযোগে শয়তান ইয়াজুজের,—আস্‌মতের (পবিত্রতার) ভিত্তিতে ছিদ্র করিবার চেষ্টার ন্যায় সেই মানব পশু অতি সন্তর্পণে কন্যার কারাগৃহে প্রবেশ করিল।" একদিকে কারাগারে বন্দিনী অসহায়া কিশোরী রাজকন্যা, অপরদিকে দোর্দ্দণ্ড শক্তিশালী শোভাসিংহ, কিন্তু সেই তেজস্বিনী কুমারী এই বিষম সঙ্কট মূহুর্ত্তে বিন্দুমাত্রও ভয়ে অভিভূত হইলেন না। তাঁহার বস্ত্রাভ্যন্তরে পূর্ব্ব হইতেই একখানা শানিত ছুরিকা লুক্কায়িত ছিল। শোভাসিংহ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র তিনি সেই শাণিত ছুরিকা তাহার উদরদেশে আমূল প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। এইভাবে সেই তেজস্বিনী বীরবালার হস্তে দুর্ব্বৃত্ত শোভাসিংহের জীবন লীলার অবসান হইল। জনৈক হিন্দু ঐতিহাসিক এই ঘটনা প্রসঙ্গে এইরূপ লিখিয়াছেন যে "এখানে পুরুষের পশ্বাচার ও রমণীর অপূর্ব্ব দেবভাবের প্রাচীন কাহিনীর পুনরবতারণা।"

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের পুণ্যশীলা রাণী ভবানীর নাম অবগত নহেন এমন লোক বাংলাতে বোধহয় কমই আছে। তাঁহার বিষয় বিস্তারিত এখানে আর লিখা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। ইহার পরবর্ত্তী কালে বর্ত্তমান ইংরাজ আমলেও বাংলার অনেক বড় বড় জমিদারী সংক্রান্ত ব্যাপারে দেখা যায় যে বাংলার অনেক মহিলাই যথেষ্ট যোগ্যতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মহারাণী স্বর্ণময়ী, রাণী শরৎসুন্দরী, রাণী রাসমণি ও অন্যান্য আরও অনেকেরই নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ইঁহারা সকলেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা, দয়া দাক্ষিণ্য ও ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণে বিভূষিতা ছিলেন। ইঁহাদের জীবন কাহিনী এখনও খুবই সহজলভ্য, কাজেই এ প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আর বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন মনে করি না।

(৬)

বাংলার সেকালের মেয়েদের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে অনেক প্রশ্নই মনে জাগে। তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি কিরূপ ছিল তাহাও জানিতে স্বভাবতঃই কৌতূহল হয়।

এ সম্বন্ধে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে বাংলার বিখ্যাত রাজা প্রথম বল্লাল সেনের সময়ের একটি কাহিনীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বল্লালসেন ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন উভয়েই খুব বিদ্যানুরাগী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহাদের পুরমহিলাগণও যে বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন তাহা আমরা এই কাহিনী হইতে জানিতে পাই। এক সময় কোনও কারণে বল্লালসেনের সহিত লক্ষ্মণসেনের গুরুতর মনান্তর উপস্থিত হয় ও লক্ষ্মণসেন পিতার ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাজধানী হইতে অন্যত্র চলিয়া যান। কথিত আছে এই সময়ে লক্ষ্মণসেনের পত্নী একদিন পতি-বিচ্ছেদ বেদনা ব্যক্ত করিয়া একটি সুন্দর সংস্কৃত-শ্লোক রচনা করেন ও তাহা হর্ম্ম্যতলে লিপিবদ্ধ করিয়া মানসিক দুশ্চিন্তাবশতঃ ক্লান্তদেহে তাহারই পার্শ্বে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রাভিভূত হন। সেই সময় বল্লালসেন দৈবাৎ অন্তঃপুরে আসিয়া সেই শ্লোক ও তাহারই পার্শ্বে পতি-বিরহ কাতরা পুত্রবধূকে ম্রিয়মান ভাবে ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় পতিত দেখিতে পান। তাঁহার হৃদয় ইহাতে খুবই ব্যথিত ও স্নেহোচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে এবং তিনি তৎক্ষণাৎই পুত্রকে মার্জ্জনা করিয়া আবার নিজের নিকট আহ্বান করিয়া আনেন।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্দ্ধমান অঞ্চলে বীরসিংহ নামে জনৈক পরাক্রমশালী নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার বিদুষী কন্যা বিদ্যার নাম ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' কাব্যের ভিতর দিয়া বাংলাতে খুবই প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ভারতচন্দ্রের কাব্যের বিষয়ীভূত রাজকন্যা বিদ্যা কবি-কল্পনার সৃষ্টি নহেন। বীরসিংহ দুহিতা পরমা বিদুষী বিদ্যার পণ এই ছিল যে তাঁহাকে যে বিচারে পরাস্ত করিতে পারিবে তাঁহাকেই তিনি মাল্য দান করিবেন। কাঞ্চীপুর-রাজ গুণসিন্ধুর পুত্র সুন্দর তাঁহাকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাজিত করিয়াই যথারীতি বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া কবি ভারতচন্দ্র যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে একদিকে নানাপ্রকার অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও অপরদিকে নিতান্তই রুচি বিকারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অবশ্য কথা আছে যে "কবয়ো নিরঙ্কুশাঃ।" কবিরা তাঁহাদের কল্পনার রথ যে দিকে খুসী চালাইতে পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও বিদ্যা ও সুন্দরের উপাখ্যান নিয়া ভারতচন্দ্র যে গর্হিত রুচির পরিচয় দিয়াছেন এবং "গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়"—বলিয়া যে ভাবে এই বিদুষী মহিলার প্রতি অন্যায় দোষারোপ করিয়াছেন তাহা কিছুতেই সমর্থন করিতে পারা যায় না।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন একটা প্রবল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হয়, সে সময়েও কোন কোন বঙ্গমহিলার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তির কথা অবগত হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অদ্বৈত গৃহিণী সীতাঠাকুরাণী ও নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবী দেবীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা তাঁহাদের ঐকান্তিক ধর্ম্মানুরাগ; তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা এবং পবিত্র চরিত্রগুণে সেই সময়কার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সময়ে মহিলাদের ভিতর লেখাপড়া শিক্ষার ও যে প্রচলন ছিল তাহাও বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী, যিনি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর লোক সমাজের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিতান্ত নিভৃতে

কঠোর তপস্বিনীর জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তিনিও চৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে একবার কোনও বৈষ্ণব গ্রন্থকার তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পড়িয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ঐ গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত বিবরণে ভুল দেখিতে পাইয়া তাহা গ্রন্থকারকে জানাইয়া দেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্যা মাধবী দেবী যেমন উচ্চদরের সাধিকা তেমনই বিদ্যাবতী ছিলেন। কবিতা রচনাতেও তাঁহার যথেষ্ট নৈপুণ্য ছিল এবং তাঁহার রচিত কতকগুলি সুন্দর পদাবলী বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি বংশীয় সুপণ্ডিত লালা রামগতি সেনের কন্যা আনন্দময়ী বিদ্যাবত্তা ও কবিত্ব শক্তির জন্য যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আনন্দময়ী ১৭৫২ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। লালা রামগতি সেন স্বয়ং কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ও আনন্দময়ীর একজন অধ্যাপক ছিলেন। ছিলেন। আনন্দময়ী কেবল বাংলাতে নহে সংস্কৃতেও যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন। তাঁহার স্বামী অযোধ্যারামও সংস্কৃত শাস্ত্রে একজন বিশেষ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু আনন্দময়ীর যশোপ্রভা পতির পাণ্ডিত্যকেও অতিক্রম করিয়া অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ যে 'অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ' করেন লালা রামগতির নিকট সে বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি চাহিয়া পাঠান। লালা রামগতি সে সময় অন্য কাজে ব্যাপৃত থাকায় কন্যা আনন্দময়ী নানা পুস্তক হইতে আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাজবল্লভের রাজ সভায় স্বহস্তে তাহা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। আনন্দময়ীর পাণ্ডিত্যে সকলের এতদূর প্রগাঢ় আস্থা ছিল যে সকলেই সেই তথ্য নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিলেন।

আনন্দময়ীর রচিত বহু মনোরম কবিতাবলীও প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার কবিতায়,—

"কুটিল কুন্তল তার বন্ধন শঙ্কায়
নিতম্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায়।"

অতি সংক্ষেপে এই দুইটী পদের ভিতর দিয়া রমণীর এলায়িত সুদীর্ঘ কেশপাশের যে সুন্দর বর্ণনা রহিয়াছে এরূপ সুন্দর বর্ণনা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে আনন্দময়ীর খুল্লতাত কবি জয়নারায়ণের একখানা গ্রন্থের দশ অবতার স্তোত্রের দুইটী পংক্তি আনন্দময়ীর রচিত খুল্লতাতকে এই স্তোত্র রচনা সম্পর্কে বিশেষ বিব্রত দেখিয়া আনন্দময়ী মুহূর্ত্তকাল মধ্যে দশ অবতারের বর্ণনা এইভাবে অতি সংক্ষেপে লিখিয়া দেন,—

"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম
খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম।"

আনন্দময়ীর পিসিমাতা গঙ্গামণি দেবীও কবিত্ব শক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ময়মনসিংহ অঞ্চলের গীতি কবিতাবলীর ভিতর মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর অনুপম কবিত্বশক্তিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরিদপুর জেলার সুপণ্ডিত ময়ুরভট্টের বংশে বৈজয়ন্তী দেবী নামে জনৈকা বিদুষী মহিলা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রদের পাঠাভ্যাসের সময় বৈজয়ন্তীও শিক্ষালাভের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কন্যার এইরূপ শিক্ষানুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে সযত্নে শিক্ষাদান করেন ও বৈজয়ন্তী কাব্য, ব্যাকরণ ও দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হন। ফরিদপুর কোটালিপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিত কৃষ্ণনাথ সার্ব্বভৌমের সহিত বৈজয়ন্তীর বিবাহ হয়। কৃষ্ণনাথ 'আনন্দলতিকা' নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান তাহার রচনায় বৈজয়ন্তী দেবী যথেষ্ট সাহায্য করেন। কৃষ্ণনাথ পত্নীকে তাঁহার উক্ত পুস্তকের রচনার সহকারিণী বলিয়া নিজগ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,—

"আনন্দলতিকা গ্রন্থো যেনাকাবি স্ত্রীয়া সহ।"

আনন্দলতিকা গ্রন্থে বৈজয়ন্তী দেবীর রচিত অনেক সুন্দর শ্লোক আছে। তিনি অনেক সংস্কৃত উদ্ভট কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দে কোটালিপাড়াতে শিবরাম সার্ব্বভৌম নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কন্যা প্রিয়ংবদা দেবীও অতি শৈশব হইতে অত্যন্ত মেধাবিনী ছিলেন। কন্যার ধীশক্তি ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া তাঁহার পিতা নিজ ছাত্রগণের সহিত কন্যাকেও সংস্কৃত ভাষায় সযত্নে শিক্ষা প্রদান করেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই প্রিয়ংবদা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ পারদর্শিনী হন ও সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণরাম সার্ব্বভৌমের রঘুনাথ মিশ্র নামে এক পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ ছাত্র ছিলেন। প্রিয়ংবদার তাঁহার সহিত বিবাহ হয়। প্রিয়ংবদা সংস্কৃতে এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে ভিন্ন ভাষাভাষী রঘুনাথ মিশ্রের সহিত তিনি সংস্কৃতেই অনর্গল বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হইতেন।

বিবাহের পর স্বামীগৃহে আসিয়া সংসারের অনেক কর্ম্মভারই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি একদিকে সাংসারিক কর্ত্তব্য কাজ, ও অপরদিকে বিদ্যালোচনা, এই উভয়ই সমানভাবে সম্পন্ন করিতেন। বিবাহের পর তিনি পৌরাণিক মদালসার উপাখ্যান ও মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্মের বিস্তৃত টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিল। অনেক সংস্কৃত পুঁথি তিনি বাংলা অক্ষরে লিখিয়া লইতেন। প্রথম বয়সে কাব্যচর্চ্চায় তিনি বেশী অনুরাগিনী ছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বামীর সহিত দর্শনশাস্ত্র চর্চ্চায় সমধিক উৎসাহী হন্।

ইহারই প্রায় সম সাময়িক কালে মালিনী দেবী নামে আর একজন সুপণ্ডিতা মহিলারও বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত ইন্দ্রেশ্বর চূড়ামণির কন্যা। মালিনী দেবী স্মৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন ও অনেক সংস্কৃত কবিতা ও স্তোত্রাদি রচনা করিয়াছিলেন।

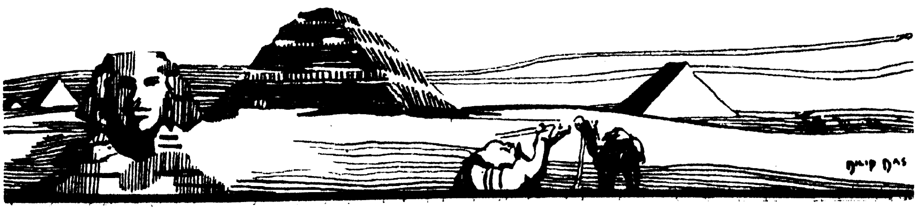
এই সব বিদুষী ও সুপণ্ডিতা মহিলাদের বিষয় আলোচনা করিলে কোন সময় হইতে যে বাংলাদেশে মেয়েদের বিদ্যাচর্চ্চার সঙ্গে তাহাদের 'পতি দেবতা'দের আয়ুর যোগাযোগ সংঘটিত'

হইয়াছিল,—আর অকাল বৈধব্যের আশঙ্কায় মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়!

(৭)

আমার লিখিত এই প্রবন্ধটিকে একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ঐতিহাসিক প্রবন্ধ বলিয়া যাঁহারা মনে ধারণা করিতেছিলেন তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া নিরাশ হইবেন সন্দেহ নাই। এই বিষয়ে উপযুক্তরূপ প্রবন্ধ লিখিবার জন্য যেরূপ গবেষণার প্রয়োজন, এই প্রবন্ধ লেখিকার সেরূপ গবেষণা করার সময় ও ক্ষমতা উভয়েরই একান্ত অভাব। এই প্রবন্ধটি কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই লিখিত হইল যে বাংলার নিজের অতীত ইতিহাসে অনুসন্ধান করিলে এমন কত মহিলার দেখা পাওয়া যাইতে পারে যাঁহারা যে কোন দেশের ও যে কোনো জাতির পরম গৌরবের বিষয় হওয়ার উপযুক্ত। যাঁহারা ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া থাকেন তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করাই আমার এ প্রবন্ধ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। আমরা যে মেয়েদের কথা বলিতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল ও অতি দূরবর্ত্তী রামায়ণ মহাভারতের সমসাময়িককাল ভিন্ন অন্য কোনও কালের কথা ভাবিবার আছে মনে করিতে পারি না,—আমরা ইহার মধ্যবর্ত্তী এই যে সুদীর্ঘকালটাকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছি ইহা কি বাঞ্ছনীয়?

বাংলার যাঁরা ঐতিহাসিক তাঁহাদের এদিক দিয়া আলোচনা করার একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া বাংলার সেকালের মেয়েদের কথা বিশেষ ভাবে সংগ্রহ করিতে ও সে বিষয় বিশদভাবে লিখিতে প্রবৃত্ত হন এবং আমরা যদি বাংলার বিস্মৃত যুগের মহীয়সী মহিলাদের নাম বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করি তবেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে।



বক্সাক্যাম্পে ভোর—

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

সভাপতি মহাশয় ও ভদ্রমহোদয়গণ!—

সবার ভোর এক সময়ে হয় না। ভূগোলের ক্লাশে শুনিয়াছি, আমাদের আকাশে যখন ভোর, পৃথিবীর অন্য দিকের আকাশে তখন সন্ধ্যা। পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা পিঠটাই রৌদ্রে শুকাইয়া লয়, তাইতেই নাকি এ গণ্ডগোল।

অতএব, আপনাদের ভোরে ও আমার ভোরে তফাৎ আছে, এটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে মানিতে আপনারা বাধ্য।—Early to bed ও করিনা বা early to rise ও করিনা,—কারণ, happy ও wise হইবার দুরাশা আমার নাই।

রাত্রি জাগিয়া থাকি,—ও আমার অভ্যাস এবং আরও অনেকেরই তা'। মনে করিবেন না— চোর, পেঁচা বা লম্পটের কথা বলিতেছি। এই আপনাদেরই অনেকের কথা বলিতেছি, জাগিয়াই যারা রাত্রিটা ফুরাইয়া দেন, পূবের আকাশে অন্ধকার যখন ফ্যাকাশে হইতে সুরু করে তখন যারা বিছানায় গা দেন।

দুর্গের ঘণ্টায় যখন সাতটা বাজে তখন বিছানায় জাগি। ঐ নাক বোঁচা গুর্খা ব্যাটারা দেখিতে ছোট, কিন্তু ঘণ্টা-পেটবার বেলায় আস্ত দৈত্য বিশেষ—যেন দুই হাতে হাতুড়ী মারিয়া সময়ের বুকের মধ্যে কষিয়া গজাল ঠুকিতেছে।

বিছানায় জাগিয়া বাহিরে বারান্দায় গলার আওয়াজ শুনি,—ব্রাহ্ম মুহূর্তে জাগার দল বহু পূর্ব্বেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। পাহাড়ী ভোরের বাতাস— স্বাস্থ্যপ্রদ বলিয়া বদনাম আছে, বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া তা নষ্ট হইতে দিতে উহারা মোটেই রাজী নন। এরা জানেন এবং মনে মনে বিশ্বাস করেন যে, সুপ্ত সিংহের মুখে মৃগ প্রবেশ করে না, তাই হাঁ-করা মুখেই বাহির হইয়া পড়েন। আরও একটা কথা আছে,—দেবতা দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে হয় নিজেরই আগাইয়া। ভাগ্যের ত্রুটি পর্য্যন্ত পৌরুষে সংশোধন করিয়া লইতে পারেন—ইহারা সেই জাতীয় লোক। কাজেই ভোরের বাতাস—তাকে শুষিয়া লইয়া সারপদার্থ ছাঁকিয়া লইবেন—ইথে আশ্চর্য্য হইবার কোন হেতু নেই।

—বিছানা হইতেই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের ব্রাহ্মচারীদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাই।

একবার ভাবি, উঠিয়া পড়ি, খানিকটা বাতাস গিলিয়া আসি, রক্ত কণিকাগুলিকে একটু তাজা ও লাল করিয়া লই।—কিন্তু উঠিতে পারি না। ইচ্ছাগুলি এত নিস্তেজ যে জন্মিবার সাথে সাথেই মনের সূতিকাগারে শিশু-মৃত্যুতে শেষ হয়।—ইচ্ছার যদি অত জোরই থাকিবে, তবে তো চরিত্রবানই হইতাম। কারণ, যার ইচ্ছা যত জোরালো সে নাকি তত চরিত্রবান।

তন্দ্রাচ্ছন্ন মন, একেই ঘুমের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে, তায় আবার কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কে যেন মন্ত্রণা দেয়,—এত ত্বরাই বা কিসের। ভোরের বাজার নেই, কলেজের পড়া নাই, অফিসের চাকুরী নাই, স্বদেশী হাঙ্গামা নাই, পুলিশের পিছু তাড়া নাই,—এক কথায়, কারু ভক্ষণও করি না, পরিধানও করিনা। কি হইবে উঠিয়া।

—পাশ ফিরিয়া পাশ বালিশটা আরও কাছে টানিয়া লই।

জাগিয়া জাগিয়া ঘুমানো, মানে এই অর্দ্ধেকটা মন ঘুমের মধ্যে, বাকীটা জাগাইয়া রাখা—আঃ, এতে আরাম কত। ঘুমের মত জিনিষ আর আছে নাকি।...ঘুম আর সমাধি একই বস্তু, নাম ভেদ মাত্র। ঘুমের আনন্দ ব্রহ্মেরই আনন্দ। সেই জন্যই তো ঘুমের দিকে প্রাণি মাত্রেরই এমন ঝোঁক। মরাকে আমরা ঈশ্বর প্রাপ্তি বলি, আর মড়া লোকের ঘুম নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবেন—আগুনে পোড়াইলেও সে পাকা ঘুম আর ভাঙ্গে না।—মহা আরামে বিছানায় মরার মত পড়িয়া থাকি।

কিন্তু পৃথিবীতে কোন কিছুই নির্ব্বিঘ্ন নহে। বিশেষ করিয়া ভালো কাজ, এ একটা না একটা ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিবেই। যেমন, এখন কাণে আসিতেছে,—বারবেলের শব্দ, ডাম্বেলের ক্রিং ক্রিং, মুগুরের সোঁ সোঁ, বৈঠকের তুপ্ দাপ, এবং হাপরের মত সশব্দে শ্বাস ফেলা ও শ্বাস লওয়া।

বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, কম্বলের ঘরে দত্ত সাহেব ঢুকিয়াছেন। অনেকে দৈত্যও বলেন।

দত্ত সাহেবের বিরাট শরীর। ওজন বাড়িতে বাড়িতে দুশত পাউণ্ড পার হয় দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়া উঠেন। ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, কলেজে পড়িবার সময়ই পালোয়ান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন; ব্যায়ামে বরাবরই তার অত্যধিক রুচি। ওজনকে দাবাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে আবার ব্যায়াম সুরু করিয়াছেন। ব্যারাকের রুমের মধ্যভাগেই অনেকখানি জায়গা কম্বলে ঘিরিয়া লইয়া তিনি ব্যায়ামাগার তৈরী করিয়া লইয়াছেন। দেয়াল জোড়া বড় বড় আয়নাও খানচারেক টাঙ্গাইয়া লইয়াছেন। বারবেল, মুগুর, ড্যাম্বেল ইত্যাদি যাবতীয় সরঞ্জামও সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন। এবং সর্ব্বশেষে মেম্বর রিক্রুট করিতে মনোযোগ দিয়াছেন। হাঁড়পাঁজর বাহির করা লোক তিনি মোটেই পছন্দ করেন না; তার তাগাদায় পড়িয়া ঐ ব্যায়ামাগারে বহু মেম্বর জুটিয়া গিয়াছে। এমন কি নীচের চার নম্বর ব্যারাক হইতে শীতের ভোরেও পান্না মিত্র পর্য্যন্ত আসিয়া ল্যাঙ্গোটী আঁটিয়া ডন লয়, আর আয়নায় নিজের মাসেল দেখে। পান্নাবাবুর ওজন প্রায় ৭০ পাউণ্ড হইবে, আঙ্গুল ফুলিয়া কদলী বৃক্ষ হইবে, এরকম একটা আশ্বাস বোধ হয় দত্ত সাহেব তাকে দিয়া থাকিবেন।—ব্যায়ামাগারের হুঙ্কার শুনি, আর ভয়ে ভয়ে থাকি যে, আবার না ছোটে!

'আবার না ছোটে' কথাটার ব্যাখ্যা দরকার।—

সেও এমনি ভোরে। হঠাৎ ভয়ানক আওয়াজ, একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ। ঘুম জখম হইয়া গেল।—চমকাইয়া জাগিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ফণীর (মজুমদার) আর্ত্তচীৎকার—"বাবারে, গেছিরে।" দেখিতে শান্ত হইলে কি হয়, চীৎকারের গলা তো বেশ আছে। নস্যি-নেওয়া

নাক,—তাই "বাবারে-গেছিরে" উচ্চারণে ন'য়ের মিশাল দেওয়া হইতেছে। কেন যে সে গেল এবং কি জন্য যে পিতৃদেবকে এমন ভক্তিভরে চেঁচাইয়া ডাকিতেছে, বুঝিতে পারিলাম না।

এদিকে আর এক কাণ্ড। ঐ শব্দটার সঙ্গে সঙ্গে কে একজন দৌড়াইয়া আসিয়া মশারির মধ্যে আমাকে জড়াইয়া ধরিল। বুকটা ভয়ে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। ফিনে ব্যাটা (Commandant) বাঁশডলা দিতে আসিল না তো?

চোক মেলিয়া প্রথম মুখ ঠাহর করিতে পারিলাম না। ওদিকে চাপের চোটে শ্বাসের গতিক আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে? কি হয়েছে?" উত্তর হইল,—"আমি।"

—"কে? উপেনবাবু? হোল কি? হাত দুটা আলগা করুন তো, একটু নিশ্বাস নেই।"

বাহুবেষ্টন শিথিল করিয়া উপেনবাবুর পাশে শুইয়া পড়িলেন। মাথাটা বালিশে বিন্যস্ত করিতে গিয়াই বাধা পাইলেন, ঘাঁড়ের তল হইতে কি একটা বস্তু টানিয়া বাহির করিলেন।

কহিলেন,—"এটা আবার কি? কি যে অভ্যাস করেছেন, সিগারেটের টিনটা শিওরে নিয়ে ঘুমুবেন। উঃ—মাথাটা গেছে।"

বলিয়া সিগারেটের কৌটাটা ছুঁড়িয়া মারিতে যাইতেছিলেন। কহিলেন,—"দিন, আমাকে দিন, রেখে দিচ্ছি। দেখবেন ওখানে একটা ম্যাচও আছে, ভাঙ্গবেন না যেন।"

ম্যাচটা রাখিতে রাখিতে কহিলাম,—"ব্যাপার কি? উপেনবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু আমার হাতটা টানিয়া তার বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। দেখিলাম, বুক দপ্‌দপ্‌ করিতেছে। মানুষের বুক যে এত হাঁপাইতে পারে, এ আমার জানা ছিল না। তুফানের মার খাওয়া সমুদ্র যেন।

—"ব্যাপার কি, তাই বলুননা।"

—"দৈত্য মুগুর ছুঁড়ে মেরেছে, কপাল ঘেঁষে গেছে। কপাল জোরে বেঁচে গেছি, কিন্তু বুকের আদ্ধেকটা রক্ত শুষে নিয়ে গেছে।"

বলিয়া আমার দুই ঠ্যাংয়ের কবল হইতে পাশ বালিশটা হ্যাঁচ্‌কাটানে ছুটাইয়া নিয়া নিজের দুই উরুর মধ্যে চাপিয়া লইয়া চোক বুজিলেন।—আমি উঠিয়া আসিলাম।

বাহির হইয়া দেখি, নিক্ষিপ্ত গদা যথাস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে দৃশ্য দেখিলাম,—তাহা 'প্যাথেটিক'।

কম্বলের ঘরটার প্রায় গা ঘেঁষিয়া ফণীর টেবিল, তারপরে তার খাট। সেই লোহার খাটের মশারী টাঙ্গাইবার একটা ডাণ্ডা ধরিয়া ফণী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। চোক মুখের ভাব দেখিয়া করুণা হইতে বেশীক্ষণ লাগে না। বলির জীবটার সঙ্গেও মানুষের সাদৃশ্য মাঝে মাঝে হইয়া থাকে—স্পষ্টই দেখিলাম।

আগাইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলাম,—"কিরে, কি হয়েছে?"

আমি ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলাম, আমার মুখে বোধহয় একটু হাসির চিহ্ন ছিল। দেখিয়া ফণী ক্ষিপ্ত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"দাঁত বের করে হাসিস্ কোন আক্কেলে, লজ্জা করে না? কি হয়েছে—" বলিয়া আমার স্বরটাকে যথাশক্তি নকল করিল।—"হবে আবার কি? যত সব বন্ধু জুটেছেন! শেষটা অদৃষ্টে অপঘাত মৃত্যুই আছে দেখছি। ব্যাটা আস্ত যম হয়ে ঢুকেছে।—আজ যে গদার চোটে চ্যাপটা হয়ে যাই নি—এ একটা accident বল্লেই হয়; দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে গেছি।"

অনেকেই নিজ নিজ খাট ছাড়িয়া আসিয়া ভিড় জমাইয়া ফেলিলেন। মাষ্টার মশায় (অশ্বিনী দাস) তার ভুটিয়া কুকুরটাকে হাওয়া খাওয়াইয়া চেন হাতে ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিলেন,—"কি ব্যাপার কি? এত ভীড় কিসের?"

তারপর পলকে দেখিয়া লইয়া বুঝিলেন, এ নাট্যের নায়ক বর্ত্তমানে কে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হয়েছে ফণীবাবু?" প্রশ্নে যেন ফণীর মুখের ঢাকনী খুলিয়া গেল।

সমান বলিয়া চলিল,—"না মাষ্টার, এ ঘরে আর একদণ্ডও নয়। বারান্দায় পড়ে থাকব—সেও ভালো।.... আজ ফস্‌কেছে বলে যে কালও ফসকাবে, তাতো নয়। বরং অভ্যাসে ব্যাটার তাগ লক্ষ্যভেদী অর্জ্জুনকেও তাক্ লাগিয়ে দেবে, দেখে নেবেন।...... ও বাবা লালজী, তোম্ ওধার খাড়া হ্যায় কাহে, এধার আ-যাও। তবু দাঁড়িয়ে হ্যায়? ধর না ব্যাটা খাটটা ওধারে নিয়ে যাই। কি—গ্রাহ্যি হোল না? ভাবছ ঠাট্টা করতা হ্যায়। আমার যাতা হ্যায় জান, আর এ হোল আমার ঠাট্টা করবার সময়—আমাকে কি উজবুক পেয়েছিস?"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির খোঁচা দিয়া কহিল,—"আর তুই বা ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন? ধর, নিয়ে যাই।—গদা মারবার বেলা তো যত বন্ধু।"

চৌকি ধরিয়া কহিলাম,—"কোথায় যাবি?"—"যাবো গোল্লায়।—এ ঘর ছেড়ে যেতে পারলেই বাঁচতাম। ব্যাটারা আবার পার্টি-অনুযায়ী ঘর ভাগ করেছেন। আর কোন ঘরেই বা নেবে? কারু সঙ্গে আর সুহৃদ রাখোনি যে, অসময়ে জায়গা দেবে?"

—"চল ঐ কোণায় নিয়ে যাই।"

—"কোন কোণায়?"

—"যতীনদাসের ওখানে। ওর মুগুর ভাঁজার রোগ নেই।

—আর দেখ, ফিনি ব্যাটাকে একটা শ্লিপ লিখে দে।

—ঘরের মধ্যে ডন-বৈঠক কি? এটাতো খোট্টার খোঁয়াড় নয়, ভদ্রলোকের থাকবার জায়গা।"

এমন সময়ে দত্ত সাহেব কম্বলের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘামে একেবারে স্নান করিয়া উঠিয়াছেন, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মের গঙ্গোত্রী-ধারা।

লালপাড় দেওয়া মস্ত বড় একটা টার্কিশ-টাওয়েলে ঘাড়, মুখ ও কপাল মুছিতে মুছিতে খাটের নিকট আসিয়া দত্ত সাহেব দাঁড়াইলেন।

কহিলেন,—"কি রে, খাট সরাচ্ছিস যে?"

ফণী খাট ছাড়িয়া সোজা সটান দাঁড়াইল, তারপর জবাব দিল,—"কেন, আপত্তি আছে ?"

—"মোটেই না। সর আমি নিয়ে দিচ্ছি ?"

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গদা ছুঁড়ে মারলি কেন ?"

—"পাগল হয়েছিস। ছুঁড়িনি, ফসকে গেছে।"

ফণী নাচিয়া উঠিল,—"ফস্‌কে গেছে! একি গরু পেয়েছ যে, বুঝিয়ে দিলেই হোল ? জিজ্ঞেস করি, অন্যের মাথায় তাগ্ করে ফসকায় কেন ? হাতের কাছে নিজের মাথাটা পছন্দ হয় না ? ফস্‌কে গেছে—"

দত্ত মৃদু মৃদু হাস্য সহকারে কহিল,—"এতো আর হামেশা হয় না। আজ accidentally—"

কথা শেষ করিবার অবসর দত্ত সাহেব পাইলেন না, ফণী কহিয়া উঠিল,—"আহা, কত দুঃখ—হামেশা হয় না। আজ যদি accidentally সত্যই একটা accident হোত ? তবে—?"

—"তবে আর কি। একদিন তো মরতেই হবে। অমর হয়ে তো আসিস নি,—নয় আজই যেতিস্।"

ফণী আনন্দে আবার নাচিয়া উঠিল,—"একেবারে মোহমুদ্গর হয়ে জন্মেছেন দেখছি। একদিন তো মরতেই হবে......আচ্ছা, এতই যদি টনটনে জ্ঞান, তবে আর ও হাঙ্গামা কেন ? দড়ি দিচ্ছি, ঝুলে পড় না—আপদ যাক্।"

দত্ত একটু হাসিলেন মাত্র। আমরা কিন্তু উভয়ের বাক্য-বিনিময়ে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছিলাম।—মাষ্টার মহাশয় ইতিমধ্যে কুকুরটাকে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কহিলেন,—"না দত্ত, এ তোমার ভারী বাড়াবাড়ি। গায়ে জোর আছে বলেই তুমি মরার ভয় দেখাবে নাকি ? মরতে আমরা খুব পছন্দ করি, এ খবর তোমাকে কে দিল ? ফণীবাবু! আপনার বাবা যেন এ বিষয়ে কি বল্‌তেন ? তাঁর সঙ্গে তো দেখছি দত্তের মতের মোটেই মিল নেই।"

ফণীর উষ্মা তখনও পর্য্যন্ত ঢিলা পড়ে নাই, কহিল,—"রাখেন মশায়। আমি আছি নিজের জ্বালায়, উনি এলেন জানতে বাবা কি বলতেন। অন্যের বিপদে দেখছি আপনাদের দারুণ সহানুভূতি।"

মাষ্টার দমিবার পাত্র নহেন, কহিলেন,—"দত্ত বলল যে, একদিন মরতেই। অথচ আপনার বাবা নাকি বলতেন,—ব্যাটার যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি, মরেও না। এত লোক মরে, আর তুমি ব্যাটা অমর হয়ে জন্মেছ—না ?"

ফণী এবার শান্ত সুরে জবাব দিল,—"এত সয়েও টিকে গেছি। কিন্তু মাষ্টার, এত দিনে শেষটা যমের নজর পড়েছে—বুঝ্‌তে পারছি।—কৈ, যমদূতটা গেল কোথায় ? খাট সরিয়ে দেবে বলে তো খুব দরদ দেখিয়ে গেল।"

দত্ত কোন সময়ে সরিয়া পড়িয়াছিল, লক্ষ্য করি নাই। মাষ্টার কহিলেন,—"পালায়নি, ঐ তো অমল বাবুর টেবিলের কাছে।"

আমার টেবিলের কাছে! ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিরে, ওখানে কি হচ্ছে?"

জবাব দিল না; টাওয়েলে কি যেন লইয়া দরজার দিকে পা বাড়াইয়া দিল।

—"কিরে, কি নিয়ে গেলি?"

—"হাঁসপাতাল থেকে কাল রাত্রে তোকে ছ'টা লেবু দিয়ে গেছে। তোর জন্য টেবিলে রেখে গেলাম।"

মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ক'টা নিলে বাবা!" দত্ত এক হাতের আঙ্গুল ক'টা মেলিয়া সংখ্যা দেখাইয়া দিল—মুখে উত্তর দিল না।

—"ছ'টার মধ্যে মাত্র পাঁচটা নিলে কেন? আর একটাও নিয়ে যাও—বাকী ক'টাতেই অমলবাবুর চলে যাবে।"—দত্ত হাসিয়া ফেলিলেন।

মাষ্টার আবার কহিলেন,—"ভাই, ধন্য তোমার সংযম এবং ধন্য তোমার ত্যাগ।"

দত্ত দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে ফণীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এখন ওসব রাখ্। আমি মাঠ থেকে আসছি, এসে সব ঠিকঠাক করে দেব।" এবং দত্ত অদৃশ্য হইলেন।

এবার আমার পালা। কহিলাম,—"ঠুঁটো জগন্নাথের মত দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে, না খাটটা সরাতে হবে?"

—"সাধে কি জগন্নাথ হয়েছি। শুনলিনা বলে গেল, মাঠ থেকে এসে নিজেই সব করবেন। ইচ্ছে থাকে তুমি খাটে হাত দাও;—আমার প্রাণের মায়া আছে—আমি ওর মধ্যে নাই।"

হাসিয়া চলিয়া আসিলাম। পিছন হইতে ফণী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি, সাহসে কুললো না বুঝি? মুখে তো দেখি—হ্যান করেঙ্গী, ত্যান করেঙ্গী,—আর শক্তের পাল্লায় পড়লে—দোহাই হুজুর।"

** ** ** ** ** **

বিছানায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি,—কম্বলের ঘরের পালোয়ানদের কসরতের সাড়াশব্দ পাই, আর ভাবি—আবার না ছোটে।

সাতটা বাজিয়া যায়—কিন্তু চোখের পাতা ছাড়িয়া তন্দ্রার জড়তা যাইতে চায় না। মায়ের পেটে একটানা দশমাস অন্ধকারে ঘুমের রিহার্সেল দিয়া পৃথিবীতে নামিয়াছি, তাই সারা জীবনে ঘুমের জের টানিয়া চলি—শেষে মৃত্যুতে মহা ঘুম ঘুমাইবার অধিকার লাভ করি। ঘুম আর জাগরণ, আর মাঝখানে স্বপ্নের সমুদ্র—সেখানে দোল খাইতে থাকি। একবার ঘুমের অতল ছুঁইয়া আসি,...আবার ভাসিয়া উঠিয়া চেতনার তীর ছুঁই ছুঁই হই। আঃ—কি আরাম! সুষুপ্তিতে শুধু অন্ধকার, অস্তিত্বহীনতা......জাগরণে কেবল তীক্ষ্ণ আলোক, অস্তিত্বের দুর্ভরতা কিন্তু স্বপ্নের অন্ধকার—আলোতে রঙ্গীন; স্বপ্নের আলো—অন্ধকারে স্নিগ্ধ।...অপূর্ব্ব সে আলো-অন্ধকারের ছায়া-

বীথি, চেতনার নেশায় ভরপূর মাতালের মত সে পথে টলিতে টলিতে চলে।—বক্‌সাতে রাত্র শেষের দিকে গ্রীষ্মেও ঠাণ্ডা পড়ে। রাগটা টানিয়া গলা পর্য্যন্ত আনি, পাশ বালিশটা, বেশ করিয়া জড়াইয়া লই এবং আবার ঘুমের জন্য প্রস্তুত হই।

কিন্তু ছেঁড়া-মেঘের ফাঁক দিয়া যেমন আলো চুঁইয়া চুঁইয়া নীচে নামে, তেমনি তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনার ছিদ্র পথে বাহিরের কর্ম্ম ব্যস্ততার শব্দ কোলাহল মগজে ঢুকিতে থাকে।......ঘুমের frontier সুরক্ষিত নহে, সীমাও সুনির্দ্দিষ্ট নহে, তাই জাগ্রত পৃথিবীর অনেক কিছু সীমান্ত পার হইয়া এধারে আসিয়া পড়ে!—

বিছানা হইতেই গলার আওয়াজ পাই। মধ্যম ভ্রাতা (টেনাবাবু) "আয় আয়" বলিয়া ডাকিতেছেন। বকসার শকুন্তলা বোধহয় প্রিয় মৃগশাবককে আপেল খাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। পরে শিষ্‌ দিয়া ডাকিতে শুনিয়া বুঝি, মৃগ শিশুকে নয়—শুক শাবককে। হাঁ, পাখী পোষা, হরিণ পোষা এই বিরাট দেহ পুরুষকেই মানায় বটে।

এই দীর্ঘকায় বিপুল দেহধারী লোকটি হরিণ বাচ্চাকে আদর করিতেছেন দেখিয়া ওস্তাদজী অমর চাটার্জ্জী একদিন বলিয়াছিলেন,—

"মেজ্‌ ভাই—!"

—"আজ্ঞা করুন।"

—"একটা কথা বলব।—"

—"বলুন।"

—"সভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব?"

—"নির্ভয়েই বলুন।"

—"হাতির বাচ্চার জন্য রিকুইজেশন দেন না কেন? তা যদি না মেলে, তবে অন্ততঃ একটা বাঘের ছানা।"

—"বাঘের ছানা?"

—"হাঁ, তা বই কি। আপনার তো একটা প্রেষ্টিজ আছে। হরিণ, পাখী, পোকা মাকড়, এসব কি আপনার মানায়? লোকে হাসে। ভেবে দেখুন দিকি, আপনি আগে আগে যাচ্ছেন, আর পিছনে পিছনে পোষা কুকুরের মত বাঘের বাচ্চাটা চলেছে—

—কি grand সে দৃশ্য।"

মধ্যম ভ্রাতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অমর চাটার্জ্জী সভয়ে কহিল,—"আহা, করেন কি, থামুন। সর্ব্বনাশ করবেন দেখছি।"

—"কেন কি হোয়েছে?"

—"এলার্ম বেল পড়ল বলে। সিপাইশান্ত্রী লোকজন ছুটে আসবে—একটা হৈ হৈ কাণ্ড না বাধিয়ে ছাড়বেন না দেখছি।"

—"কেন ?"

—"ওরাতো বুঝবেনা, মনে করবে বোমা ফেটেছে। মানুসের হাসি, একথা বল্লে বিশ্বাস তো করবেই না,—বরং ভাববে, প্রাণের দায়ে মিছে বলছি আমরা।"

আবার সেই হাসি। মধ্যম ভ্রাতার এ হাসি যেন থামিবেই না। ওস্তাদজী এবার নিজেই হাসিয়া ফেলিল,—"উঃ—কি হাসিই হাসতে পারেন।"

বাহিরে শিষ দিয়া পাখীর আদর চলিতে থাকে, বিছানায় থাকিয়া শুনি।

মেথর ঘরে ঢুকিয়াছে...প্রত্যেক সীট হইতে স্পীটুন তুলিয়া নিবার কর্কশ শব্দ পাথরের মেঝেতে তুলিয়া তুলিয়া আগাইতেছে...তারপর ঝাঁটার মার্জ্জনা চলে, সর্ব্বশেষে ফিনাইলের ছড়া দিয়া সে বাহির হইয়া যায়।—সবই টের পাই।

ওদিকের দেয়ালের কাছে খুট্‌খুট্‌ কি রকম একটা আওয়াজ চলিতে থাকে। হঠাৎ শুনি—"এস গো পীতম বেলা বয়ে যায়"—গ্রামোফোন বাক্সের মধ্যে মীরাবাঈ কাঁদিয়া উঠিয়াছেন।

চীৎকার করিয়া বলি,—"বন্ধ কর, ভোর না হতেই বেলা বয়ে যায় কাঁদুনি। নে বন্ধ কর।" —"থাম্‌না, গানটা শুনতে দে।"—দত্তের গম্ভীর কণ্ঠ। থামিতেই হয়। মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আটটার সময় ঘড়িতে দম দিয়া নীচে টিফিন রুমে নামিয়া যায়, এই সময়টা গান শুনিয়া মনটা ঠাণ্ডা করা তার অভ্যাস। খানদশেক গানের আগে এ সঙ্গীত-পিপাসী পালোয়ান তৃপ্তি মানে না।

—এর পরে বিছানায় থাকা অসম্ভব। তা'ছাড়া দুর্গের ঘণ্টায় আটটা হাতুড়ীর ঘা মারা হইয়া যায়—সময় কতদূর আগাইয়াছে, জানাইয়া দেওয়া হইল।......দিন আগাইয়া পড়িয়াছে, অথচ আমি রাত্রিকে ধরিয়া রাখিয়াছি,—নিজের কাছে নিজেই লজ্জাবোধ করি।

অনিচ্ছুক মনকে তাড়া দিয়া বলি,—সময় হয়েছে এবার, মানে বিছানা ছাড়িতে হবে।

ভালো করিয়া লুঙ্গিটা কোমরে জড়াইয়া লই। চেয়ারের হাতল হইতে গেঞ্জিটা তুলিয়া লইয়া পরিধান করি। কৌটা হইতে একটা সিগারেট লই—ধরাইয়া মুখে লইয়া বাহির হই। এতক্ষণে দিন সুরু হয়।

দরজায় পা দিতেই পাশের সিট্‌ হইতে কোনদিন মাষ্টার মহাশয় আড়-চোখে দেখিয়া লইয়া বলেন,—"দুর্গা-দুর্গা।"

কোনদিন হয়তো বলেন,—"সামনে চৌকাট, চোক মেলে চলুন—হোচট্‌ খাবেন না যেন।" কোনদিন হয়তো উপেনবাবু হ্যাঁচ্চো বলিয়া যাত্রার মাঙ্গলিক ধ্বনি করেন।

বারান্দায় আসিতেই ওধার হইতে আহ্বান শুনি,—"কে ? মিঃ দাশগুপ্টা ?"

ফিরিয়া দেখি, বীরেনদা (চাটার্জ্জী) লোহার খাটে বসিয়া গড়গড়ায় তামাকু সেবন করিতেছেন। সামনে লাল ঝুলিটী নিয়া হিন্দুস্থানী ক্ষৌরকার বসিয়া আছে,—বাবুর অবসর হইলেই সাবান মাখাইয়া গাল চাঁছিতে লাগিয়া যাইবে।

বীরেনদা বলেন,—"এত ভোরে উঠ্‌লে যে? মরবার মতলব বুঝি?" প্রশ্নই শুধু করেন, উত্তর চাননা—তাই না থামিয়াই জিজ্ঞাসা করেন,

—"শুনেছ?"

—"না, শুনিনি।"

—"কেমন করে শুনবে, এখন পর্য্যন্ত তো কাউকেই বলিনি। একমাত্র টেনুকে বলেছি।"

—"কি বলেছেন?"

—"ভয়ানক খবর। অতি নিজস্ব সম্বাদ-দাতার কাছে এ খবর জানতে পেরেছি। আচ্ছা টোম্বাকটো কোথায় বলতে পার?"

—"কেমন করে বলব? ওটা খায়—না, গায়ে মাখে, না অন্য কিছু—তাইই জানিনা।"

বীরেনদা গম্ভীরকণ্ঠে বলেন,—"মনে করেছিলাম যে, তুমি একটু লেখা-পড়া জানা ছেলে। এখন দেখছি, কিছু জাননা,—নো হোপ্‌। টোম্বাকটো খাবার লাড্ডুও নয়, গায়ে মাখার সাবানও নয়—একটা জায়গার নাম। যাক্ সন্তোষ জংলীকে (গাঙ্গুলীর খাঁটী ইংরেজী উচ্চারণ) দিয়ে ম্যাপটা খুঁজে দেখতে হবে।"

—"তা নয় দেখবেন, কিন্তু টোম্বাকটোর কথা এল কিসে?"

—"এল তোমাদের জন্য। টোম্বাকটো; বুঝলে, একটী দ্বীপ। তবে আতলান্তিক সাগরে না প্রশান্ত মহাসাগরে—তা ঠিক বলতে পারব না।"

—"তাতে কোন ক্ষতি হবেনা। আপনি আসল কথাটা বলুন। তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?"

—"সম্বন্ধ—স্থানের সঙ্গে অধিবাসীর। লিঙ্গডন্ (Willingdon) সাহেব সেখানে ক্যাম্প খুলেছেন, তোমাদের বেছে বেছে সেখানে নেবার ব্যবস্থা হয়েছে। জায়গা-জমি পাবে, ইচ্ছে হয় চাষবাস করে থাক,—বিয়ে থা করেও থাকতে পার। কিন্তু দেশে আর ফিরতে হবে না।"

—"কবে যেতে হবে?"

অপাঙ্গে একবার দেখিয়া লইয়া কহিলেন,—"যখন যাবার সময় হবে, তখন ও হাসি আর থাকবেনা চাঁদ।"

পাশের ঘর হইতে ক্ষিতীশ ব্যানার্জ্জি বাহির হইয়া আসেন। বলেন,—"পট্টিপাট্টা কমিটীর বুলেটিন বাহির হচ্ছে বুঝি? ভোর থেকেই কাজ সুরু করেছেন? সুরু করেছেন?"

—"আপনাদের মত নাস্তিকদের কাছে কথা বলাই ভুল। এই বলে রাখলুম, আগামী দু' মাসের মধ্যে আপনাদের এখান থেকে চালান হয়ে যেতে হবে—হবে—হবে। ব্যস্—দেখে নেবেন। আরে আস্তে খুরপি চালাও, এটা মানুষের গাল—ক্ষেত নয়।"

এখানেও ভীড় জমিয়া যায়। বীরেনদা গলা বাড়াইয়া থাকেন, হিন্দুস্থানী নাপিত খাড়া হইয়া ক্ষুর চালাইয়া যায়। বীরেনদা সমানভাবে সবার সঙ্গে সেই 'একাকুম্ভরক্ষা করে নকলবুঁদি গড়' করিতে থাকেন।

বারান্দা ছাড়িয়া বাহিরে আসি। সূর্য্য পূবের পাহাড়ের মাথা ডিঙ্গাইয়া ফেলিয়াছে।......

শীতগ্রীষ্ম নাই, সুদিন-দুর্দ্দিন নাই, বারোমাস ত্রিশদিন ঠিক সময়ে পূবের আকাশে হাজিরা দেয়। পৃথিবীতে কত কি ঘটিল, কত কোটিবছর পার হইয়া গেল, কত লোক আসিল গেল—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একদিনও লেট্ হয় নাই, কাজকামাই করে নাই। কি কঠিন কর্ম্মের শিকলেই বাঁধা পড়িয়াছে,—এক কণা আলো থাকা পর্য্যন্ত এর রেহাই নাই। পশ্চিমদিক লক্ষ্য করিয়া পাড়ি দিয়া চলিয়াছে, তাকাইয়া দেখিলাম, অনেকখানি আকাশ অতিক্রমও করিয়াছে।

—ভুটিয়া ছেলেটা সন্ধ্যা হইলে ব্যারাকে টেবিলে টেবিলে আলো দিয়া যায়, ভোরে আসিয়া সেগুলি আবার জড় করে। দেখিতে পাই, ব্যাডমিন্টন-কোর্টের একধারে লণ্ঠনগুলি আনিয়া সে মজুত করিয়াছে। উঁচু পোষ্ট হইতে গ্যাসের বড় আলো কয়টাও আনিয়া একপাশে কাৎ করিয়া রাখিয়াছে। পাশেই তার ছোট ভাইটা বসিয়া তারই একটার চিমনীর উপর সযত্নে হাত বুলায়।

সামনেই রবার গাছটা দাঁড়াইয়া আছে। তারই একটা ডালে টেনাবাবুর মোরগ তিনটী রঙ্গীন ও দীর্ঘ লেজ ঝুলাইয়া ঠায় বসিয়া থাকে। ময়ূর বলিয়া প্রথমে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ভোরবেলা খাঁচা হইতে ছাড়া পাইয়াই সটান রবার গাছের ডালে গিয়া উড়িয়া বসে,—সন্ধ্যার সময় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া তাদের নামাইয়া আনিতে হয়। এ কয়টী বিহঙ্গমের উপর অনেকের নজর পড়িয়াছে। কে একজন জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিয়াছিল,—"টেনাবাবু, এদের চপ কেমন হয় বলতে পারেন?" কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। টেনাবাবুর ভয়ে মুরগীর গায়ে চোক-বুলানো ছাড়া হাত বুলানোর যো নাই।

রবার গাছের গা ঘেঁষিয়া নীচে যাইবার সিঁড়ি, পাথর কাটিয়া বানানো। নামিবার পথে ডান পাশেই চারনম্বর ব্যারাক—এ, বি এবং সি।...সামনের ছোট্ট খোলা জায়গাটুকুতে বাগান বানাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী ব্যাপৃত। গেঞ্জি গায়ে খুরপী হাতে মাটি অর্থাৎ. পাথর খুঁড়িতেছে। বারান্দায় এক চেয়ারে মেরুদণ্ড সোজা রাখিয়া কালিদাস নাহা রায় হৃষ্টপুষ্ট মহাদেবের মত বসিয়া বিস্কুট চর্ব্বণ করে, আর গাঙ্গুলী মহাশয়ের ফুলপাতাগাছশূন্য মালঞ্চের দিকে তাকাইয়া থাকে।

সিঁড়ীর'পর দাঁড়াইয়াই শুনিতে পাই যে, ব্যারাকের মধ্যে কে যেন পৌরুষে উত্তেজিত হইয়া বিক্রম প্রকাশ করিতেছে—"থাকে যদি বীর্য্য এই বাহুতে আমার..." গলা শুনিয়া বুঝিতে পারি ধীরেন চক্রবর্ত্তী। বামুন হইলে কি হয়, প্রকৃতিতে দেখিতেছি নির্জ্জলা ক্ষত্রিয়! ক্যাম্পে 'মহুয়া' যাত্রাপালা হইবে—পার্ট অভ্যাস চলিতেছে।

সিঁড়ী দিয়া নামিতে নামিতে কোনদিন হয়তো নৃপেন মজুমদারের সঙ্গে দেখা হয়। বগলে জাইঙ্গা ও ল্যাঙ্গোটী, হাতে বড় একটী আপেল—কামড়ে কামড়ে তাকে খাবলাইয়া লইতেছেন আর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিতেছেন, অক্ষতস্থান কতটুকু বাকী আছে। সিঁড়ি দিয়া ধীরে ধীরে গণিয়া

গণিয়া পা ফেলিয়া উঠিয়া আসিতেছেন। বুঝিতে পারি, দত্ত সাহেবের কম্বলের ঘরের তীর্থযাত্রী তিনি।

তবু আমাইরা জিজ্ঞাসা করি,—"কোনদিকে ?"

—"এই একটু exercise—"

—"আর কেন! ও সব ছেড়ে দিন। Longitude ও latitude প্রায় সমান হয়ে এল যে এদিকে, তা কি দেখতে পান না ?"

আশঙ্কার কোন চিহ্নই মুখে দেখিনা, বরং কথাটা শুনিয়া যেন খুসী হন বলিয়াই মনে হয়। হাসিয়া বলেন,—"বন্ধু মানুষ, তাই বাড়িয়ে বলছেন। অমর সেদিন বল্ল, 'নেপেনদা—তোমাকে দিয়ে এখনও ক্লাশে গ্লোবের কাজ কিন্তু চলেনা—খেয়াল থাকে যেন।' শুনে বড্ড দমে গেছি। exercise আরও পোনের মিনিট বাড়িয়ে নিয়েছি।" —"লেগে থাকুন। অধ্যবসায়ের একটা ফল আছেই। শুনেন নি, ইচ্ছার কাছে পাহাড় পর্য্যন্ত টলে যায়—আর এ তো নিজের আপন শরীর, হুকুম না-মেনে উপায় আছে ?"

বিরাট দংশনে আপেলটীর খানিকটা মাংস ছিঁড়িয়া মুখে পুরিয়া লইয়া বলেন,—"আপনাদের কথা শুনলে যে কত উৎসাহ পাই...। আর বুঝতেই তো পারেন, সময়ে সঞ্চয় না করে রাখলে—দুর্দ্দিনে বড় ভুগ্‌তে হয়। যা নিয়ে বেরুব, দেখবেন, কলকাতার রাস্তায় ক'দিনের হাঁটার খরচ পোষাতেই বেরিয়ে যাবে।"

—"মিথ্যে ভাবছেন। সমুদ্রের ক'কলস জল গেলে কিইবা যায় আসে। ও শরীরে ক্ষয় নেই।"

—"কি যে বলেন। তবে এ ঠিক যে, একবার বেঁধে নিতে পারলে মরণ পর্য্যন্ত বাঁচা যায়, ভাবনা থাকে না।"

আপেলের বাকী অংশটুকু মুখে ফেলিয়া চিবাইতে চিবাইতে নৃপেনবাবু উপরে উঠিয়া যান। আমি নীচে নামিয়া আসি।

চার নম্বরের বারান্দায় দেখি মাষ্টার মহাশয় (অধ্যাপক ঘোষ) ইজি চেয়ারে বসিয়া থাকেন, দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর যতদূর দৃষ্টি যায় প্রসারিত, হয়তো সেদিকে চাহিয়া চিন্তায় মগ্ন থাকেন—কি ভাবেন তিনিই জানেন। কোনদিন একাই থাকেন, কোনদিন পাশের চেয়ারে তত্ত্বজিজ্ঞাসু কেহ কেহ হয়তো থাকেন।

চায়ের ঘরের দরজায় গিয়া এক সময়ে পৌছাই,—দেখিয়া বুঝি যে, চায়ের পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, ঘর ধোয়া মোছা পর্য্যন্ত শেষ হইয়াছে। টেবিল বেঞ্চিগুলি এখন ঘর পাহারা দিতেছে। দরজা হইতে নজরে পড়ে না, কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া দেখি যে, গৃহ একেবারে শূন্য নয়; খাঁ সাহেব (রেজাক) এক কোণায় বেঞ্চির উপর উবু হইয়া বসিয়া আছেন, লম্বা হাতদুটা ভাঁজ করিয়া কোলের মধ্যে রাখা—যেন একটী প্রকাণ্ড শকুন পাখা গুটাইয়া ঘাড় ঈষৎ বাঁকা করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়া কি অবলোকন করিতেছে।

—"খাঁ সাহেব যে—"

—"হাঁ, বসুন।"

টেবিলের উপর উঠিয়া খাঁ সাহেবের মুখোমুখি আসন-পিড়ী করিয়া উপবিষ্ট হই।

কহিলাম,—"এত দেরী যে?"

—"দেরী? তা একটু......রাত্রে শরীরটা তেমন ভালো ছিল না,...ঘুমঠুম...আর কয়েক ব্যাটা ঘরে যা জুটেছে..."

বাবারে মারিয়া ফেলিবে নাকি! কত স্ক্রু প্যাঁচের মত মোঁচড় খাইয়া বাহির হয়—সোজা আসে না। পূরা কথাটা যে কখন শেষ করিবেন অপেক্ষায় হাঁ করিয়া ঝুলিয়া থাকিতে হয়। এজন্য ফণী মজুমদার বলে যে, খাঁ সাহেবের প্রেসে ফুলষ্টপ্ নাই।

কহি,—"কয়েক ব্যাটা ঘরে কি করেছে?"

—"হল্লা। বিশ্বেস করবেন না, রাত তিনটা অবধি। খুব সুখে আছি।"

—"ঘরে কেউ নেই?"

—"কোথায়? চায়ের ঘরে? তা আছে।"

—কে?

—গোবিন্দ। ডাক দিন।

ডাকিয়া বলি, গোবিন্দ আছ?

—আছি।

—চা নিয়ে এস।

গোবিন্দ আসিল না, আসিল ভিতর হইতে তার বাক্য। বিড় বিড় করিয়া কি বলিল, সবটা বুঝিলাম না। শুধু শুনিলাম,—এইতো সবে এলেন।

—কি বলছ, পরিষ্কার করে বল।

—কিছুনা।...আপনি তো এই এলেন; খাঁ সাহেব আধঘণ্টা বসে আছেন চা দিতে পারিনি। আর আপনি—

কথা অসমাপ্ত রাখিল বটে, কিন্তু বক্তব্য দুর্বোধ্য থাকেনা। আধঘণ্টা অপেক্ষা করিয়াও খাঁ সাহেব চা পান নাই, আর ঘরে পা না দিয়াই আমি চা চাহিতেছি—এ আমার পক্ষে রীতিমত অন্যায়; সব বিষয়ে অধীর হইলে চলিবে কেন।

বলি,—তা খাঁসাহেবকে দাওনি কেন?

—কেমন করে দি। কাপ পেয়ালা ধুতে হবে তো?

—আধঘণ্টার মধ্যে তুমি একটা কাপ ধুয়ে উঠতে পারলে না?

—তা পারব না কেন।

—তবে? এত সময়ে তুমি চা দিতে পারলে না?

—পরশুরাম নেই। সংক্ষেপে উত্তর করিল।

—পরশুরাম না থাকে—আপদ গ্যাছে। তার জন্য আমি উতলাও হইনি, তার কথা জিজ্ঞেসও করি নি। আধঘণ্টার মধ্যে তুমি একটা কাপ ধুয়ে চা দিতে পারলে না কেন,—তাই আমি জানতে চেয়েছি।

কি—উত্তর দিচ্ছ না যে?

উত্তর যা দিবার তা সে দিয়াছে—পরশুরাম নেই, এতেই তার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। মেলা কথা বলিতে তার ভালো লাগে না। কড়াভাবে গোবিন্দকে কয়েকটা কথা বলিতে যাইতেছিলাম, বাধা পাইলাম। খাঁসাহেব হাতের ঈষৎ চাপ দিয়া আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করি,—কি?

—ডিউটী ভাগ। তাই—

—কিসের ডিউটী ভাগ?

—চাকর বাকরদের। চা-করা আর চা দেওয়া—গোবিন্দের কাজ। কাপ-পেয়ালা ধোয়া মোছা পরশুরামের ভাগে পড়েছে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া গেল।

—ও, তাই। ডিসিপ্লিন ভাঙ্গতে রাজী নয়। গোবিন্দ?

উত্তর করে,—বলুন।

—পরশুরাম কোথায়?

—গেটে গেছে, বাজার আনতে।

—তুমি গেলেনা কেন?

ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন, রাজী হইনি। রাম অবতারের কাজ, রামঅবতার করবে। শেষে পরশুরামটাকেই ধরে নিয়ে গেছেন।

তুমি চায়ের জল চড়াও তো।

—চড়ানোই আছে।

—চড়ানোই আছে? বেশ এখন একটু কষ্ট করে কাপ পেয়ালা গুলো কোথায়; দেখিয়ে দাওতো—ধুয়ে নিচ্ছি।

—থাক, উঠবেন না। আমিই করছি।...এখানে থাকা বেশীদিন পোষাবে না।

—কি, রাগ করলে?

কাপপেয়ালা ধুইবার শব্দ শুনি, কিন্তু গোবিন্দ কথা বলেনা। খাঁ সাহেব বলেন,—চলুন, এই ফাঁকে উঠে পড়ি।

—না—বসুন। চা-টা খেয়েই যাই।

দুই পেয়ালা চা আমাদের সম্মুখে টেবিলের উপর ধরিয়া দিয়া গোবিন্দ যেমন নিঃশব্দে আসে তেমনি নিঃশব্দে চলিয়া যায় দেখিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি,—কি, চাকুরী ছাড়বে নাকি ?

—না ছেড়ে উপায় নেই। যারা নিয়ম করবেন—তারাই তা ভাঙ্গবেন, এ আমি পছন্দ করি না।

—পছন্দ করনা ? তবে কি করবে ?

—"কয়েকদিন দেখব—তারপর যদি বুঝি থাকা চলবে না, চলে যাব।

বলিয়া গোবিন্দ চায়ের ঘরে অদৃশ্য হয়।

খাঁসাহেব বলেন,—ভালো করেন নি। গোবিন্দ বড় সম্মানী ব্যক্তি।

ঠাট্টা করিতেছেন, না সিরীয়সলী বলিতেছেন,—সুর শুনিয়া বুঝা গেল না, মুখ দেখিয়াও আঁচ করিতে পারিলাম না। বলি,—ভাববেন না, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—গরম হলে তো ঠাণ্ডা হবে। গরম ঠাণ্ডা এসব আপদবালাই গোবিন্দের নাই। এক মূর্ত্তি। কী চীজই যে আমদানী করেছে।

এবার খাঁসাহেব যেন একটু হাসেন মনে হয়।

চা শেষ করিয়া বাহির হইয়া আসি। যে পথে নামিয়াছিলাম সে পথেই আবার ফিরিয়া চলি। সঙ্গে খাঁসাহেব। কিছুদুর আগাইতে গাঙ্গুলীমশায়ের ভাবী মালঞ্চের দিকে তিনি মোড় লন।

কহি,—কোনদিকে ?

—চার নম্বর ব্যারাকে।

—কেন ? উপরে চলুন—আমাদের এখানে।

—এখন না। একটা মিটিং আছে।

—কিসের মিটিং ?

—কর্ত্তাদের। কমাণ্ডাণ্ট্ হুকুম দিয়েছেন, ঘরে আর রোল কল হবে না।

—কেন ? কল উঠে গেল নাকি ?

—না, উঠেনি। ঘরে ঘরে যেতে তাব বিস্তর অসুবিধা হয়। এখন থেকে ভোর আটটায় সবাইকে মাঠে নেমে যেতে হবে। আমরা ফাইল করে দাঁড়িয়ে যাব, তিনি নাম ডেকে যাবেন।

—তা' আমাদের মিটিংয়ে কি ঠিক হোল ?

—কিছুনা। মাত্র তিনটা সিটিং হয়েছে, আরও গোটা তিনেকের আগে কিছু ঠিক করা যাবেনা। সবার মত শুনতে হবে তো ? আলাপ আলোচনা করতে হবে—তারপর যদি—

—আপনার নিজের কি মত ?

—আমি বলি, রাজার জাত,— যা বলে রাজী হয়ে যাও। ভোরে উঠা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো। কি বলেন ?

—ভালোই বলি।

—তা বলবেন বৈ কি। কিন্তু কয়েকজন বড় ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

—কি বলেন তারা ?

—বলেন না,—ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করতে চান।

—ঠাণ্ডা করবে ? কি ভাবে ?

—ডাণ্ডায়।...ব্যাটাকে নাচানো যেতো, কিন্তু সাহস হয়না।

—কেন ?

—বড় নার্ভাস,—সাহসী মানুষ হলে ভাবনা ছিল না। অবস্থা সিরীয়স দেখলেই গুলিগোলা চালিয়ে বসতে পারে। নার্ভাস লোককে responsible পোষ্টে রাখা বড় বিপজ্জনক। যাই এখন—।

খাঁসাহেব চার নম্বর ব্যারাকের দিকে চলিয়া যান। আমি মাথায় চিন্তার বোঝা লইয়া উপরে উঠিতে থাকি। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে! ও পক্ষের কর্ত্তাতো নার্ভাস—আর এ পক্ষেও একদল যা আছেন, তাতে কুরুক্ষেত্র যখন তখন বাধিতে পারে।

উপরে যখন রবার গাছের তলায় আসি, তখন দেখি সূর্য্যের অগ্রগতি অনেকখানি হইয়াছে—রৌদ্র রীতিমত তপ্ত লাগে।...উত্তরে পাহাড়ের মাথা বেষ্টন করিয়া মেঘ জমা বাধিয়াছে—যেন মেঘের পাহাড়ী আটা, তাতে সূর্য্যের আলো ঝিলিক দিতেছে। আর একটু পশ্চিমে চূনাভাঁটির পথে মানুষ উঠা-নামা করিতেছে। দূর হইতে মানুষগুলিকে ক্ষুদ্র দেখায়। কাছে আসিলে দৃষ্টি আবদ্ধ করে —দূরে গেলে নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়, এই মানুষকে কোথায় রাখিয়া দেখিলে যে ঠিক দেখা হয়—তাহা আজ পর্য্যন্ত জানিয়া উঠা গেলনা।

বারান্দায় দাবা খেলার ভিড় একটা চৌকীর চারিপাশে জমিয়াছে। পাশ কাটাইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকি। এখানেও এক কোণায় ভিড়, তুমুল তর্ক চলিতেছে। সামনে টেবিলের উপর মোটা বই খোলা, পড়িতে পড়িতে আলোচনাও চলিতেছিল, তাহাই এখন তর্কযুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদের সংঘর্ষ চলিয়াছে—একপক্ষে materialism, অন্যপক্ষে idealism। সত্য কোন মতবাদের দখলে আছে—বিবাদ করিয়া তাহা আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। জীবনের যাবতীয় দুরূহ প্রশ্নই দেখি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—মীমাংসার জন্য। স্নান করিতে যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত সমানভাবে এ লড়াই চলিবে। কেহ কেহ স্নানের ঘরে মাথা ভিজাইয়া রান্নাঘরে পর্য্যন্ত এ আলোচনাকে টানিয়া তুলিবে। তাতে যদি না কুলায়—তবে রাত্রটা তো হাতেই আছে।......... যে অনন্ত জিজ্ঞাসা সৃষ্টির মুখের দিকে অতন্দ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তার তল দিয়া কত যুগান্ত তার সভ্যতা মানুষজন নিয়া আসিল ও বাতাসে খড়কুটার মত উড়িয়া মিলাইয়া গেল। আজ এই এক আসরেই সেই জিজ্ঞাসার উত্তর এরা দিয়া ছাড়িবেন—এমনই তপ্ত জিদ্ এদের।

নিজের সিটে আসি। একটা সিগারেট ধরাইয়া লই। যে কোন একটা বই টানিয়া লইয়া ডেকচেয়ারে কাৎ হই। পড়িবার আগ্রহে নয়, অভ্যাসবশতঃই বই খুলিয়া বসি। মন কিন্তু পলাতক হয়। চিন্তার অন্তহীন তেপান্তরের মাঠে মনের ঘোড়া ঘুরে ঘুরে ধূলা উড়াইয়া ছুটিয়া চলে। ধূ ধূ সীমাহীন সে মাঠ, কিন্তু ঘোড়াও তো ক্লান্তি মানে না, উদ্দাম উধাও ছুটিয়াছে...... .

দুর্গের ঘণ্টায় মধ্যপ্রহরের ঘা মারা হয়—ঢং ঢং করিয়া বারোটা বাজে। উঠিয়া বসি। দেখি কোলের উপর ছোট্ট একটুকরা চিঠি, খোলা বইয়ের ভিতর হইতে কখন পড়িয়াছে খেয়াল করি নাই। তুলিয়া দেখি, ছোট্ট কচি হাতের লেখা, কাকে লিখিয়াছে বুঝিলাম না। লেখা আছে—তুমি কবে আসিবে? কে কবে আসিবে—একথা কে জানিতে চাহে?

সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুবর্গ, আপনাদের বন্দীশিবিরের সাহিত্যসভার উন্নতি কামনা করি, কিন্তু দীর্ঘায়ু কামনা করিতে পারিলাম না। কারণ,—তুমি কবে আসিবে?

বিরোধের মূল

অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, পি, আর, এস্

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আধুনিক কালের সমস্ত বিরোধের মূল এখানেই ; আন্তর্জাতিক সংঘর্ষগুলির বিশ্লেষণ করলে এই কথাটিই স্পষ্ট বুঝতে পারা যাবে। বস্তুতঃ কোনো একটী দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অপর কোনো দেশের জনসাধারণের কোনো শত্রুতা ছিল না, থাকতে পারে না ; অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই দেখা গেল প্রত্যেক প্রধান দেশের ধনিকেরা অন্যান্য দেশের ধনিকদের ব্যবসায়ের মূলোচ্ছেদ করে' পৃথিবীর বাজারে একাধিপত্য স্থাপন করতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ১৯১৪ সালে, প্রথমে বিরোধ বাধল জার্ম্মানী আর ব্রিটেনের ধনিকদের মধ্যে ; ফরাসী ধনিকদের লক্ষ্য হল জার্ম্মানীর কাছ থেকে তাদের আলসেস্‌লোরেণ প্রদেশ আবার কেড়ে নিয়ে ইয়োরোপ মহাদেশে একাধিপত্য লাভ করা। রাশিয়ার লক্ষ্য হল সমস্ত পূর্ব্ব-ইয়োরোপে সর্ব্বপ্রধান হয়ে ওঠা ; ইটালী আশা করেছিল যে সে-ও এই সুযোগে চারদিকে প্রসারলাভ করে নিতে পারবে ; জাপান চেয়েছিল প্রশান্ত মহাসাগরের প্রভুত্ব। এমেরিকার বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে কোনও প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল না, সে কেবল আর্থিক সুবিধার জন্যেই মিত্রপক্ষে যোগ দিয়ে তাদের বিজয়-লাভে সাহায্য করেছিল। ইয়োরোপের কয়েকটি প্রাচীন প্রবল সাম্রাজ্য ধ্বংস হল ; অর্থ-নৈতিক সংঘর্ষের ক্ষেত্র থেকে তাদের ধনিকদের সরিয়ে দেওয়া হল। বাকী কয়েকটী দেশের ধনিকদের কিছুদিনের মত মনস্কামনা পূর্ণ হল, জার্ম্মানীর আর্থিক সমৃদ্ধির মূলোচ্ছেদ করা হল। পৃথিবীর শ্রমশিল্প ও অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের ক্ষেত্রে তার যে উঁচু স্থানটি ছিল সেখানে বসল ফ্রান্স, ব্রিটেন, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি। তার উপনিবেশগুলি এবং বহির্বাণিজ্য, তার সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ এবং বাণিজ্যপোত এসে পড়ল ব্রিটেনের ভাগে। এর ওপর একদিকে তার যেমন সামরিক শক্তির ধ্বংস সাধিত এবং তার ভবিষ্যৎ সমর সজ্জা নিষিদ্ধ ছিল, তেমন অপরদিকে ক্ষতিপূরণের নামে তার ওপর অত্যন্ত অসহনীয় অর্থদণ্ডের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হল।

মহাযুদ্ধের ফলে বিজয়ী শক্তিগুলির ধনিকদেরই লাভ হয় ; জনসাধারণের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি, বরং আর্থিক দুর্দ্দশা আরোও বেশী তীব্র হয়ে ওঠে। বিজিতদের কাছ থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল সে সমস্তই ধনিকদের মধ্যেই ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিকেরা কেবল আরো বেশী করভারে জর্জ্জরিত হয়েই উঠ্‌ছিল ; সবদিক থেকেই তাদের ক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে, খাটুনী বাড়িয়ে এবং বেতন হ্রাস করে, জীবন যাত্রার স্তর আরো নামিয়ে দেওয়া হয় ; অস্বাস্থ্য ও অর্দ্ধাশন অনশনের পরিমাণ ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াতে লাগিল। বেকার সমস্যার কথাত সকলেরই জানা।

আছে। আসল কথা এই যে, দেশের ঐশ্বর্য্য মাত্র কয়েকজনের হাতে গিয়েই জমতে লাগল। তারাও আবার নিজের দেশেরই গরীবদের আরো বেশী শুষতে থাকল।

যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশেই ধনিকদের মুনাফা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল; মাত্র কয়েকজন কারবারী ও ব্যবসায়ীর হাতে সমস্ত দেশটারই সমগ্র অর্থ-নৈতিক জীবনের ভার সঁপে দেওয়া হয়েছিল। কৃষিশিল্প, বাণিজ্য, বীমা, ব্যাঙ্কিং, জাহাজী ব্যবসায়, যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ সকল বিষয়েই এঁরা কয়েকজনে মিলে যা করবেন সমস্ত রাষ্ট্র তাই মেনে নিতে বাধ্য। সমস্ত নরনারীর সবকিছুই এরা নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, কোন বিষয়েই কারো কোনো স্বাধীনতা ছিল না; এই কয়েকজন ধনিক যে জিনিষের যে দর চাইতেন, তাই পেতেন। তাঁদেরই ইচ্ছামত বহুশত কোটি টাকা ব্যয় করে যুদ্ধ চালনার বিবিধ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁরা এমনই নিখুঁতভাবে সমগ্র জনসাধারণের সকল শ্রেণীর নরনারীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন, তাদের মনে এমনই ভীষণ আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন, যে তাঁদের প্রত্যেকটি কথাই সকলে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। সকল দেশেরই রাষ্ট্রনেতা, মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, সেনানায়ক, বিভিন্ন দলের দলপতি সকলেই এদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিলেন। এদের টাকার জোর এতই বেশী ছিল যে, এদের সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ জেনেশুনেও সমস্ত সভ্যজগতে এমন কেউ একজন ছিল না যে এদের কথার কোন প্রতিবাদ করতে বা এদের কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। "দেশ বিপন্ন" এই ধুয়ো তুলে এরা কয়েক বৎসর সমগ্র সভ্যজগতে যা খুসী তাই করতে পেরেছিলেন। দেশের নামে এঁরা যেভাবে সকল ব্যাপারেই সফল হতে পেরেছেন, যেমন করে প্রায় সমস্ত মানবজাতিরই ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন যে জগতের ইতিহাসে এরকমটি আর কখনো দেখা যায়নি; পৃথিবীটা যে কার বশ তা সকলেই টের পেয়েছিলেন।

ধনিকদের কোনদিকেই কোন পক্ষপাত ছিল না; টাকা পেলে এঁরা উভয় পক্ষকেই সমানে সকলরকম অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের উপকরণ যোগাতে কুণ্ঠিত হতেন না। "দেশ বিপন্ন" অতএব তাঁরা কেবল নিজেদের মুনাফার কথাই ভাববেন; কারা দেশকে বিপন্ন করচে, কারা তাঁদের দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করচে, তা ভাববার কথা ত তাঁদের নয়, তাঁরা ব্যবসায়ী, বিক্রী করাই তাঁদের কাজ; তাঁরা সকলকেই বিক্রী করছিলেন, তাতে দেশের লোকেদেরই ধ্বংস হলেও তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই। তাঁদেরই অস্ত্রে তাঁদেরই দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণেরা মরছিল, তা জেনেও তাঁরা নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জার্ম্মাণীর বিখ্যাত ক্রুপ কোম্পানী জার্ম্মানীর শত্রু ভিকার্স কোম্পানীর কাছে ১২৩০০০০০০টি অস্ত্র (fuses for hand grenades) বিক্রী করছিলেন, তাতে যে কত জার্ম্মাণ যুবক ও বালকের প্রাণহানি হয়েছে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। অষ্ট্রিয়ার স্কোডাওয়ার্কসের একটি কামান সারাবার কারখানা ছিল, রাশিয়ার রাজধানীতে, সেই সব কামানের গোলায় অনেক অষ্ট্রিয় সৈন্যই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। জার্ম্মাণ কোম্পানীর কাছ থেকে কেনা Parseval আকাশ যানের সাহায্যেই বহু জার্ম্মাণ সাবমেরিণকে নষ্ট করতে পারা গিয়েছিল। জলের নীচে কোথায়

কোথায় জার্ম্মাণির "মাইন" লুকানো আছে, এই আকাশ যানের সাহায্যেই সেগুলি খুঁজে বার করা সহজ হোত ; আরো বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, যখন যুদ্ধ চলছিল তখনই জার্ম্মাণ ধনিকেরা জার্ম্মাণির শত্রুদের কাছে অনেক মালমসলাই বিক্রী করেছিলেন। ১৯১৪ সনের মাঝামাঝি জার্ম্মাণরাও উত্তর ফ্রান্সের খনি এবং কারখানাগুলি দখল করে বসল, ফ্রান্স এবং ইতালীর জীবনমরণ অনেকটা এদেরই লোহা ও ইস্পাতের উপর নির্ভর করছিল, কেননা জার্ম্মাণ সাবমেরিণের সাহায্যের জন্যে এমেরিকা থেকে ফ্রান্সে লোহা আর ইস্পাতের আমদানী কমে গিয়েছিল। (তখন জার্ম্মাণিরই শরণাপন্ন হওয়া গেল, কেননা তার লৌহ সম্পদ অপর্য্যাপ্ত) ১৯১৬ সনের প্রথম আটমাসে সেখানের ধনিকেরা প্রতিমাসে গড়ে ১৫০০০০ টন লোহা ও ইস্পাত ফ্রান্সের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন, অথচ এই ধনিকেরাই তাঁদের বিপন্ন স্বদেশ জার্ম্মাণির সমরনায়কদেরই জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা জার্ম্মাণির ব্যবহারের আর অতিরিক্ত লোহা ইস্পাত যোগাতে পারবে না। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে, ফ্রান্স ও ইতালী এই লোহা ইস্পাতের জন্য কিছু বেশী দরই দিচ্ছিলেন। অবশ্য জার্ম্মাণ ধনিকেরা ভাব দেখাতেন যে এই লোহা ইস্পাত তাঁরা সুইট্জার-ল্যাণ্ডকে বিক্রী করছেন, সে আবার কাকে বিক্রী করবে সেটা দেখা তাঁদের কোন কাজ নয়। জার্ম্মাণ সরকারও অবিশ্যি সব খবরই রাখতেন, তাঁরা তবু শত্রু পক্ষকে যুদ্ধোপকরণ যোগানোর ব্যবসায়ের পথে কোন বাধা সৃষ্টি করতে চান নি। বিখ্যাত ষ্টিনেস্ ফ্যাক্টরীও এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। এবং বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী থাইসেনও বাদ পড়েন নি, যে অস্ত্র থাইসেন কোম্পাণী জার্ম্মাণ সরকারকে ১১৭ মার্ক দরে বিক্রী করছিলেন, হল্যাণ্ডকে সেই সেই অস্ত্রই অনেক কম দরে (৬৮ মার্ক) সরবরাহ করতে পেরেছিলেন। এ সমস্ত জেনেও জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট কিছুই করেন নি। জার্ম্মাণ ধনিকেরা রাশিয়ান সরকারকেও অনেক জিনিষই পাঠিয়েছিলেন।

অপরদিকে ফরাসী ধনিকেরা বড় কম যান না। গত মহাযুদ্ধে তুর্কী ও বুলগেরিয়া উভয়েই জার্ম্মাণীর দিকে যোগ দিয়েছিল। তার আগে ফরাসী ধনিকেরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছিলেন, ব্যাঙ্ক থেকে অনেক টাকা পাঠিয়েছিলেন, সেই টাকা দিয়ে তুর্কী জার্ম্মাণ কামান কিনেছিল এবং মিত্রশক্তিদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। তুর্কী অবশ্য ভিকার্স ও আর্ম্মষ্ট্রং কোম্পানীর কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছে। তাদেরই অস্ত্রশস্ত্রে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ব্রিটেনের সেনাই নিহত হয়েছে, ব্রিটিশ রণতরী জলে ডুবেছে। হাঙ্গেরীর ফিউম বন্দরে যে ব্রিটিশ কারখানা ছিল, তারই টর্পেডো, টর্পেডো বোট, টর্পেডোবোট ডেষ্ট্রয়ার, সাবমেরিন, মাইন প্রভৃতি ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজের অনেক ক্ষতিই করেছে। ধনিকদের কোনও সঙ্কীর্ণ স্বদেশ প্রেম নেই। নোবেল্‌ ডিনামাইট ট্রাষ্ট কোম্পানী পৃথিবীর অনেক দেশেই কারখানা খুলেছেন। এই কারবারটি যুদ্ধের সময় এক বৎসর ধরে জার্ম্মাণী ও ব্রিটেন উভয়কেই সমান নিরপেক্ষভাবে বারুদবিস্ফোরক বিক্রী করে এসেছিলেন। এই দুটি দেশই সব জেনে শুনেই অনেক দিন কিছু করে উঠতে পারেন

নি। এই কারবারের যুদ্ধোপকরণের জন্যে ব্রিটিশ ও জার্ম্মাণ যুবকেরা সমানভাবেই নিহত হয়েছে আর জার্ম্মাণ ও ব্রিটিশ অংশীদারেরা সমানভাবেই লভ্যাংশ ভোগ করে এসেছেন। চিল্‌ওয়ার্থ গানপাউডার কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে ব্রিটিশরাও আছেন জার্ম্মাণও আছেন এবং তাঁরা ব্রিটিশ ও জার্ম্মাণ উভয়কেই বারুদ জুগিয়েছেন।

যুদ্ধোপকরণ হিসাবে নিকেল খুবই বেশী প্রয়োজনীয়, এর ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য্য। একটি ব্রিটিশ কারবার (ব্রিটিশ এমেরিকান নিকেল কর্পোরেশন) স্বদেশের সরকার থেকে প্রকাণ্ড অর্ডার এবং ৬২০০০০ পাউণ্ড ধার পেয়েছিল, এরই সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি নরওয়ের কারবার (K. N. R.) তারা জার্ম্মানীকে প্রতিমাসে ৬০ টন নিকেল দিত। জার্ম্মানীতে নিকেল আমদানী কমাবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার K. N. R.কে ১০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়েছিলেন; অথচ ১৯২০ সনে দেখা গেল যে ব্রিটিশ সরকার নিকেল পাননি, যে টাকা ধার দিয়েছিলেন তার সুদও পান নি। সুইডেনের কারবারীরা খুব বেশী পরিমাণে ব্রিটিশ নিকেল আমদানী করে জার্ম্মাণীর অস্ত্র নির্ম্মাণের কাজে লাগিয়েছে বা জার্ম্মাণীতেই পাঠিয়েছে।

যুদ্ধের সময় তামাও খুব বেশী কাজে লাগে, ব্রিটিশ ধনিকেরা প্রচুর তামা সুইডেনে পাঠিয়েছে আর সেই তামা জার্ম্মাণীতে পৌঁচেছে। তাছাড়া গ্লিসিরিণ, সিমেণ্ট প্রভৃতি অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষই জার্ম্মানীতে ব্রিটিশ কারবারীরা বিক্রী করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভিন্নদেশে কারবারীরা মুনাফার জন্য নিজেদের মধ্যে খুব অবাধেই যুদ্ধোপকরণের বাণিজ্য চালিয়ে এসেছেন। মহাযুদ্ধের সময় যখন দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ চলছে তখনও তাদের নিজেদের মধ্যে অকপট প্রেমের বন্ধন চিরকালই অটুট ছিল। তাঁরা সকল জাতিকেই নিরপেক্ষভাবে অস্ত্র বিক্রী করে মুনাঁফা অর্জ্জন করেছেন, অংশীদারদের খুব মোটা লভ্যাংশই দিয়ে এসেছেন, "জাতীয়" সম্পদ অনেক বাড়িয়েছেন। ঐ অস্ত্র দিয়ে কি হবে, কে কিনবে, কে মারবে, কে মরবে, কে জিতবে, কে হারবে এই সব তুচ্ছ প্রশ্ন নিয়ে তাঁরা কখনো মাথা ঘামান নি। তাঁদের কাজ তাঁরা করে গিয়েছেন। সকল দেশেরই দেশনেতারা তাঁদের সর্ব্বোচ্চ সম্মানে বিভূষিত করেছেন, "বিপন্ন" দেশবাসীরা তাঁদের দেশের ত্রাণকর্ত্তা বলে স্বীকার করেছে।

আর একটি লক্ষ্য করবার জিনিষ এই, বিভিন্ন দেশের কোটি কোটি কিশোর বালকেরা যখন অন্ধের মত, উন্মত্তের মত পরস্পরকে এবং নিজেদের হনন করছিল, যখন অসহনীয় কষ্টের ফলে ফরাসী, রাশিয়ান, জার্ম্মাণ সেনাদলে বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, যখন দেশের অধিকাংশ নরনারীরা অর্দ্ধাশনে অনশনে দিন কাটাচ্ছিল, যখন হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষা বিশ্বমানবের মনকে বিষাক্ত করে তুলছিল, তখন ধনিকদের এবং তাঁদের প্রাণের বন্ধু দেশনেতাদের প্রীতির সীমা-পরিসীমা ছিল না। ১৯১৭-১৮ সনে ব্রিটিশ দেশনেতারা কেবল যুদ্ধোপকরণ কিনতেই ৬৭২,১৬৪,৯৩৩ পাউণ্ড খরচ করেছিলেন। এক সময়ে তাঁরা প্রত্যহ সত্তর লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করতেন। যুদ্ধের পর

যুদ্ধ-ঋণ বাবত তাঁরা প্রত্যহ দশ লক্ষ পাউণ্ড সুদ দিয়ে এসেছেন। ধনিকরা তাঁদের এই প্রাণের বন্ধু দেশনেতাদের ভোলেননি, ভুলতে পারেন না। তাঁরা প্রায়ই এই সকল প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সেনানায়কদের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ অনেক মূল্যবান উপহার দিতেন, অযাচিতভাবে তাঁদের অনেক টাকা ধার দিয়ে ফিরে চাইতে ভুলে যেতেন, তাঁরা সরকারী কাজ থেকে অবসর নিলে পর নিজেদেরই কারখানায় অনেক সময় খুব মোটা মাইনের বড় বড় চাকুরী দিয়ে দিতেন, অবশ্য এখনও এই মধুর প্রেমের, এই উদার বদান্যতার কাহিনীগুলির সবকটিই জানতে পারা যায়নি, তবে যে কয়টি জানা গেছে তাই যথেষ্ট। গত মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধে ব্যাপৃত দেশগুলির সমগ্র সমবেত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬০০,০০০,০০০,০০০ ডলার; এর মধ্যে মহাযুদ্ধেই খরচ হয়েছিল সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০,০০০,০০০,০০০ ডলার। আর, লোক ক্ষয়? ধনিকেরা বলে থাকেন, খুব বেশী লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই বর্ত্তমানে এত দুর্গতি; যদি তাই হয়, তাহলে মহাযুদ্ধে ইয়োরোপের যে বহুলক্ষ যুবক ও কিশোরের অকাল মৃত্যু হয়েছে তাতে কিছু বলবার নেই।

মহাযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিদের অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে দেবার কাজের সবচেয়ে বড় কর্ত্তা ছিলেন স্যার বেসিল জাহারফ্। কেবল মিত্রশক্তিদেরই বা বলি কেমন করে; সকল দেশেরই অস্ত্রশস্ত্র যোগাবার ভার ছিল তাঁর উপর। মিত্র শক্তিদের সেনা ধ্বংস কার্য্যে যারা ব্যস্ত ছিল তাদেরও প্রতি কার্পণ্য করেন নি, অবশ্য যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যে। তবে মিত্রশক্তিদের প্রধানমন্ত্রীদের (লয়েড জর্জ্জ, ক্লেমাসোঁ, ব্রিয়াঁ) সঙ্গেই তাঁর বেশ দহরম মহরম ছিল; এঁরা প্রায়ই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন, তাঁদের সমস্ত গোপন কথা, সমস্ত পরিকল্পনা এঁর জানা ছিল। রণক্লান্ত বিশ্ব যখন কায়মনোবাক্যে শান্তি কামনা কচ্ছিল তখনও ইনিই যুদ্ধ বিরতির সমস্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯১৭ সনে যখন এমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যদিয়ে এই রকম একটা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন এঁর পরামর্শ নেওয়া হয়, তিনি যা বলেছিলেন প্যারির তদানীন্তন ব্রিটিশ রাজদূত লর্ডবার্টির ১৯১৭ সনের ২৫শে জুন তারিখের ডায়েরীতে লেখা আছে, Zaharoff is all for continuing the war *jusqian bout* জাহারফ্ যুদ্ধ চালাবারই পক্ষপাতী।

এই সময়ে সন্ধি স্থাপিত হলে হয়ত প্রায় এক কোটি লোকের প্রাণ বাঁচতে পারত, কিন্তু এঁর মুনাফা কম হত। একমাত্র ইপ্রের তৃতীয় যুদ্ধেই চল্লিশ লক্ষ "শেল" নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার দাম ২২০ লক্ষ পাউণ্ড।

জাহারফের অসাধারণ ফরাসী ও ব্রিটিশ প্রীতির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে ফরাসী Grand Cross of Legion of Honour নাইট উপাধি, অক্সফোর্ডের D.C.L. উপাধি প্রভৃতি দেওয়া হয়েছিল; এরকম সৌভাগ্য খুব বেশী লোকের হয়নি।

ধনিক ও সেনানায়কে সম্প্রীতির ইতিহাস চিরকালই চিত্তাকর্ষক; এই শ্রেণীর বিশ্বপ্রেমের অনেকগুলি কাহিনী জানা গেছে; ১৯১০ সনের প্রথমেই একজন জাপানী নৌসেনাপতি ব্রিটিশ ক্রুইজার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে ইংলণ্ডের ভিকার্সের কারখানায় আসেন, তাঁরই উপদেশানুসারে

জাপানী সরকার ভিকার্সকে ২৩,৬৭১০০ পাউণ্ডের কণ্ট্রাক্ট দেন। পরে জানা যায় যে ভিকার্স তাঁর বন্ধুত্বের প্রতিদানস্বরূপ অনেক বৎসর ধরেই বহু অর্থ দিয়ে আসছেন। আরো একজন জাপানী কর্ম্মচারীর পরামর্শমতে ডেষ্ট্রয়ারের অর্ডার দেওয়া হয়। অনেকগুলি সেনানায়কই অস্ত্রের কারখানার মালিকদের কাছ থেকে বেশ মোটা টাকাই পেয়ে আসছেন। আর কেবল জাপানীদেরই দোষ কি ? সকল জাতিরই সেনানায়কদের এই রকমভাবে পুরস্কার দেওয়া হোয়েছে।

জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্টের গোপন কাগজ পত্র বিশেষ করে সামরিক বিভাগের প্ল্যান প্রভৃতি জোগাড় করে দেবার জন্যে ক্রুপ অস্ত্র কারখানার মালিকেরা একজন জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করে রেখেছেন। তিনি অবশ্য বেশ মোটা টাকা পেয়ে আসছিলেন; তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ আনা হয়, এবং তাঁর চারমাস জেল হয়, তাঁকে সাহায্য করার জন্যে ক্রুপের একজন ডাইরেক্টরের ১২০০ মার্ক জরিমানা হয়।

সুইডেনের সামরিক বিমান বিভাগের একজন সেনাপতিকে বহুকালের জন্যে নাকি ১৬০০০ মুদ্রা ধার দেওয়া হয়েছিল, ধার ফেরৎ দেবার খবর পাওয়া গেছে বলে জানা নেই। এ বিষয়েও অনুসন্ধান করবার সময় দেখা যায় যে বিমান বিভাগে প্রায় অসম্ভব ঘটনাই ঘটে আসছে।

রুমানিয়াতে স্কোডা কোম্পানীর একজন প্রতিনিধির ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনার সময় এই অভিযোগ করা হয় যে স্কোডাতে ১৮০০০০০০ পাউণ্ডের অর্ডার দেবার ব্যাপার সম্পর্কে তিনজন মন্ত্রী প্রায় ১১০০০০ পাউণ্ড পেয়েছিলেন, আরো কয়েকজন ব্যক্তিকে প্রায় ৯০০০০ পাউণ্ড দেওয়া হয়েছিল। স্বয়ং রুমানিয়ার রাজা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন এবং অভিযোগকারীর মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা পান। অবশেষে ব্যাপারটা এত দূর গড়ায় যে একজন সেনাপতি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন।

সরকারী কাজ থেকে অবসর নেবার পরে অনেক সেনানায়ক বা সমর বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অস্ত্র কারখানাতে বড় বড় কাজ পেয়ে যান। এঁরা বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, এঁদেরই পরামর্শমত এত বেশী কণ্ট্রাক্ট করা হয় অর্ডার দেওয়া হয়, এঁরা এত গোপন সংবাদ দিতে পারেন যে এঁদের চাকরি দিয়ে অস্ত্র কারখানাগুলির খুব বেশী লাভই থাকে। ভিকার্সের ডিরেক্টারদের মধ্যে ব্রিটিশ সমর বিভাগের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নেতাদের অনেকেই রয়েছেন।

সাধারণের ও সরকারের মনে আতঙ্ক জাগিয়ে দিয়েও কারাখানাগুলির খুব বেশী লাভ হয়ে থাকে। জার্ম্মানীর নেতাদের কাছে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর গোপন খবর অথবা ব্রিটিশ কর্ত্তাদের কাছে জার্ম্মাণদের চক্রান্তের গুজব এনে দিলে তাঁরা পাগলের মত অধীর হয়ে সমর সজ্জায় আরো কোটি কোটি টাকার অর্ডার দেন। জার্ম্মানি বেশী খরচ করচে খবর পেয়েই (সে খবর সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক) ব্রিটিশ সরকার আরো বেশী খরচ করতে থাকেন, অমনি জার্ম্মানীকেও আরো বেশী

খরচ করতেই হবে, তারপর ব্রিটেনকে এবং তারপর আবার জার্ম্মানীকে, ইত্যাদি। এ খেলার আর শেষ নাই।

ধনিকদের আর একশ্রেণীর প্রাণের বন্ধু আছেন, খবরের কাগজের মালিকেরা। তাঁরা উপযুক্ত মূল্য পেলে যে কোনদিন যে কোনো সুরে গাইতে পারেন, সে বিষয়ে তাঁদের কোনো দ্বিধা সঙ্কোচ নেই; ধনিকেরা আবার অনেক সময়েই রাতারাতি খবরের কাগজগুলিকে কিনেই নেন। খবরের কাগজগুলি আবার, যাতে আরো বেশী অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী হতে পারে, তারজন্যে প্রাণপণ করেন। ১৯১৩ সনেই প্যারিতে রাসিয়ান রাজদূত M. Raffalovitch সেণ্টপিটার্সবর্গে অর্থসচিবকে লিখেছিলেন, "The merchants, of armaments, armoured plate, and munitions have recourse to indirect methods in influencing public opinion by the intermediary of the Press."

"They possess newspapers, acquire others, they buy journalists those writers who sound the patriotic note, who proclaim the military preparations of neighbouring states, who talk of the German and French menace, believe themselves to be heroes."

"The corruption takes all forms, from a good dinner with choice wines in the company of pretty women (paid in advance to finish up the night), with the general seated on their right, up to the more delicate attentions, such as the promise of a well-paid situation."

"That there should be leakages (communication of military secrets) which benefit the dealers in shells and guns is very probable."

(The Secret International)

বিভিন্ন দেশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত ক'রে সমরসজ্জা আরও বেশী বাড়াবার দিকেই সংবাদপত্রগুলির বেশী ঝোঁক। ১৯০৭ সালে জার্ম্মাণ অস্ত্রকারখানার—মালিকরা তাঁদের প্যারীর এজেণ্টদের কাছে এই মর্ম্মে আদেশ পাঠান, তাঁরা যেন ফরাসী সংবাদপত্র গুলিতে এমন সংবাদ ছাপাতে সুরু করেন যাতে জার্ম্মানদের মনে ফরাসী সমরসজ্জা সম্বন্ধে খুব বেশী আতঙ্ক জন্মাতে পারে এবং জার্ম্মানেরা ভয় পেয়ে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ে আরও বেশী খরচ করতে থাকে।

গ্রন্থ-পরিচয়

Imperialism : a study--J. A. Hobson

Third, revised and reset edition, 1938.

Allen and Unwin, ৮ 6d

মহাযুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গিবাদ এক ভীষণ উগ্র মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। ফলে বিশ্বের শান্তি, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সাম্যবাদ ও প্রগতিশীল আন্দোলন সব কিছুই আজ এই দুই দানবীয় শক্তির প্রভাবে প্রহত হইয়াছে। যদিও ধনিকবাদের বর্ত্তমান সামাজিক পরিবেশ ও অসুস্থ পরিণতিতে ইহাদের উদ্ভব ও বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী, তবু ইহারা যে পৃথিবী হইতে বিনা বিপ্লবে অচিরে লোপ পাইবে ইহা বিশ্বাস করা চিন্তাশীলের পক্ষে শক্ত। রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিপ্লবের সাহায্যে সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ধনিকবাদ ও তাহার চরম বিকৃত স্ফীতি--বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদের--উচ্ছেদ সাধন একান্ত প্রয়োজন। ইহা করিতে হইলে সাম্রাজ্যবাদের মর্ম্মমূল কোথায়, ইহার স্বরূপ কি এবং কিভাবে ইহার লাভ-লোলুপ প্রচেষ্টা কায়েমী স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য বিশ্ব গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তাহা সম্যকরূপে জানা দরকার। Hobsonএর বইখানার বর্ত্তমান পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণ এই উদ্দেশ্যে একটি classic work বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকটি ১৯০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া লেনিন ইহা হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যদিও মাঝে মাঝে (Sidney Webকে যেমন বলিতেন 'Thoroughly Scientific but Bourgeois) বক্র উক্তি করিতে ছাড়েন নাই, তবু লেনিন আপন মত ও বিশ্লেষণ সমর্থনের জন্য Hobson এর এই বইয়ের উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়াছিলেন। কাজেই ইহা কত মূল্যবান গ্রন্থ বলা নিষ্প্রয়োজন। এতদিন পর ইহার পুনঃ মুদ্রণ একটী বড় অভাব দূর করিয়াছে সন্দেহ নাই। এই বইখানা দুইভাগে বিভক্ত। অর্থনৈতিক কারণে কি ভাবে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তথ্য ও সংখ্যা সাহায্যে প্রথম ভাগে তাহাই দেখান হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন ও প্রয়োগের জন্য কিরূপে কতকগুলি মতবাদ সৃষ্ট হইয়াছে এবং পরাধীন অনুন্নত জাতি সমূহের উপর ইহার কুফল কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোষণপুষ্ট বিজেতা বৃটন ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি-গুলির সামাজিক ও নৈতিক জীবনে ইহার ফলে কত পঙ্কিলতা আসিয়াছে, দ্বিতীয় ভাগে তাহা আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বণিক সভ্যতার যুগে উৎপাদন শক্তি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে আসায় ধন বন্টন ও ব্যয়ে ভীষণ বৈষম্য আসিয়াছে। এই বৈষম্য হইতেই অর্থনৈতিক নিয়মে

প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদ—'Last stage of 'Capitalism'এর উদ্ভব হইয়াছে। Hobson-এর ভাষায় 'The system prevailing in all the developed countries for production and distribution of wealth has reached a stage in which productive powers are held in leash by its inequalities of distribution ; the excessive shares that goes to profits, rents and other surpluses, impelling a chronic to over-save in the sense of trying to provide an increased productive power without a corresponding outlet in purchase of consumable goods. This drive towards oversaving is gradually checked by the inability of such saving to find any profitable use in the provision of more plant and other capital. But it also seeks to utilise political power for outlets in external markets and as the foreign independent markets are closed or restricted, the drive to the acquisition of colonies, protectorates and other areas of imperial development becomes a more urgent and conscious national policy 'ইংরেজ শাসিত ও শোষিত দেশগুলিকে এজন্যই James Mill বলিতেন 'A vast system of outdoor relief.'

আজকাল কোন মতবাদই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও দার্শনিক ভিত্তি ভিন্ন টিকিতে পারে না। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ স্থায়ী করিতে হইলে চিন্তারাজ্যে ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে একদল পণ্ডিত বহুদিন হইতে নানা ভাব ও ভাষায় ইহার কদর্য্য নগ্নমূর্ত্তি ঢাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং যুদ্ধেচ্ছু জাতির মানসপটে এক রক্তিম ইন্দ্রধনু আঁকিয়া তুলিয়াছেন। ফলে সাম্রাজ্যবাদ ও জঙ্গিবাদের নৈতিক সমর্থন আজকাল অনেক জাতি করিতেছে। ব্রিটিশ Imperial policy সম্বন্ধে তাই Kurt Riesler বলিয়াছেন '...every interest is linked with a theory ; religious and moral ideals, concrete and pliant and moulded by a keen and constant sense of actually and practically managed to follow their development the sequence of political interests'. কূট রাষ্ট্রনীতি দ্বারা ধুরন্ধরগণ যদিও নানা আদর্শে রঞ্জিত করিয়া সাম্রাজ্যবাদকে সাধারণের চক্ষে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তবু ইহার পিছনে যে শুধু লাভলোলুপ লালসা ও স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতারণা আছে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'While producing for popular consumption doctrines of national destiny and imperial missions of civilisation, contradictory in their true import, but subsidiary to one another as supportors of popular Imperialism, it has evolved a calculating, greedy type of Maechiavellianism entitled '*real-politik*'......The sliding scale of diplomatic language—hinterland, sphere

of interest, sphere of influence, paramountcy, suzerainty, protectorate, veiled or open, leading up to acts of forcible seizure or annex-ation which sometimes continue to be hidden under 'lease', 'rectification of frontiers', concession and the like is the invention and expression of this cynical spirit of 'Imperialism'.

Imperialist মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে জাতীয় জীবন অবনতির দিকে টানিয়া আনে। বর্ত্তমান পুঁজিবাদ সমাজে এক শ্রেণীর পরগাছা সৃষ্টি করে যাহারা শুধু বিলাস. ব্যসনে আপনাদের শক্তি ও জাতির অর্থ অপব্যবহার করে। 'It is a depraved choice of national life, imposed by self-seeking interests which appeal to the lusts of quantitative acquisitiveness and of forceful domination surviving in a nation from early centuries of animal struggle for existence. Its adoption as a policy implies a deliberate renunciation of that cultivation of the higher inner qualities which for a nation as for an individual constitutes the ascendency of reason over brute impulses,'

Imperialism সম্বন্ধে এরূপ বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত খুব কম বই আছে। রাজনীতিতে Imperialism এর বিরুদ্ধে 'United front' গড়ে তোলার চেষ্টাই সর্ব্বত্র হইতেছে। কাজেই বর্ত্তমানে এই বইখানা up-to-date ভাবে পুনঃ মুদ্রিত হওয়ায় বিশেষ ভাল হইয়াছে।

The Far East in World Politics

--a study in recent history—By G. F. Hudson,
Oxford Un. Press. 7/6d.

বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা দিন দিনই সঙ্কটাপন্ন হইতেছে। যদিও অষ্ট্রিয়া-গ্রাস ও চেকোশ্লোভোকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া সাময়িকভাবে ইয়োরোপের তথা পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করা হইয়াছে, তবু যে ঘনায়মান সঙ্কট হইতে বহুদিনের জন্য মানব সমাজ পরিত্রাণ পাইয়াছে, বলা যায় না। এ ধূমিত বহ্নি যে কোন সময়ে প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে। এই আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধবিগ্রহের মূলে রহিয়াছে অর্থ-নৈতিক কারণ, কায়েমী স্বার্থের সংঘাত। কাজেই বর্ত্তমানে অর্থজাত ও শ্রেণীগত বৈষম্য দূর না হইলে এবং শাসক শোষিতের সম্বন্ধ লোপ না পাইলে এরূপ যুদ্ধবিগ্রহ অনিবার্য্য।

পৃথিবীর কোন জায়গা আজ আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। একের স্বার্থ অন্যের সাথে বিশেষভাবে জড়িত। কাঁচামাল ও প্রস্তুত দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের জন্য ব্যবসা-প্রধান ইউরোপীয়

জাতিগুলি এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি অনুন্নত দেশগুলির উপর একান্ত নির্ভরশীল। চীন এবং প্রশান্ত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ প্রকৃতির দানে নানা ক্ষেত্রজ ও খনিজ পদার্থে সমৃদ্ধ। কাজেই finance, capital ও market এর জন্য এই দেশগুলি, 'International gangster'দের একান্ত প্রয়োজন এবং '*real-politik*'—ও এই কারণেই তাহাদের এতটা প্রভাব।

আলোচ্য গ্রন্থটি Far East ও বর্তমান আন্তর্জ্জাতিক স্বার্থ কিভাবে সংশ্লিষ্ট এবং ইহাদ্বারা ইউরোপীয় ও আমেরিকান রাজনীতি কিরূপ প্রভাবিত হইতেছে, তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ। Far East বলিতে সাধারণতঃ এশিয়ার নিকটবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপমালা বুঝায়, তবে চীনের মত উপকূলে অবস্থিত ২১টি দেশও ইহার অন্তর্ভূক্ত। একশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় জাতি সমূহের আগমনে প্রথম চীনের 'opening of the gates' সুরু হয়। জাপানে ও সে চেষ্টা হয়। তবে বিশেষ ফল হয় নাই। ধীরে ধীরে দ্বীপগুলি বৈদেশিক শক্তির কবলে পতিত হয়। ইহা অন্যান্য দেশে উপনিবেশ বিস্তার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ এখানে শুধু 'natives' who are all the passive, helpless subjects of arrangements or disputes between 'White men's Governments' নয়। এখানে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থ ও তাহার সংঘাত সংযোগ বর্ত্তমান ছিল। কাজেই বৈদেশিক রাজনীতিতে ইহার গুরুত্ব অনেক বেশী। 'The Far East is itself the origin of an independent political activity and an economic competition which have acquired great importance in the affairs of the world as a whole',

প্রাচ্যে প্রতীচ্যের অধিকার বিস্তার সম্ভব হইয়াছে ধনতন্ত্রের উদ্ভবে। উৎপাদন ক্ষেত্রে বিপ্লব আসিলে ইউরোপীয় জাতি সমূহ নূতনভাবে শক্তি সম্পন্ন হয়। এই শক্তি রোধ করিবার মত ক্ষমতা প্রাচ্যবাসীর ছিল না 'It was no doubt historically inevitable that former or later in the 19th century the expansive forces of European Capitalism furnished with an ever-widening margin of superiority in armed power and with greatly improved facilities of transport. would break into the great closed market on the teeth of whatever opposition the 'native' rules might attempt to offer'.

কিন্তু জাপানে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ কেন আপনাদের অধিকার বিস্তার করিতে পারে নাই, সে প্রশ্ন স্বভাবতঃই আসে। ইহার কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া জাপান অতি সত্বর আপন জাতীয় জীবন সেই আদর্শে গড়িয়া তুলিল ও শক্তি সম্পন্ন করিল। তার উপর সমুদ্রবেষ্টিত প্রাকৃতিক অবস্থিতি এবং বৈদেশিক শক্তি সমূহের আত্মকলহ ও স্বার্থ সংঘাত। কাজেই জাপান রাষ্ট্র সংগঠনের অনেক অনুকূল অবস্থা লাভ করিয়াছে যাহা চীন পায় নাই। এক, ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শ, একই সময় এবং প্রায় একই পরিবেশ, অথচ চীন ও জাপান তাহার

প্রতিক্রিয়া ও প্রতিফলন সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইল কেন এই আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন বলা যায় না। তাহার মতে (Social ascendency of a military caste and the intense martial pride to the defeats inflicted by the superior armaments of Western Nation)ই ইহার মূলকারণ। 'Samurai'গণ জাপানের একনিষ্ঠ সেবক ও স্বাধীনতাকামী এবং সভ্যতার একমাত্র প্রতীক বলা 'Blood purity,' 'Nordism' কেই প্রকারান্তরে সমর্থন করা। হিটলারের 'Aryanism'এর মূলে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য নাই, শুধু রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ইহার উদ্ভব ও প্রচার সম্ভব হইয়াছে সবাই জানে।

চীনে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা থাকায় well-crystallised ও well-defined governing class গড়ে উঠে নাই, বরং Social mobilityর ফলে নানারূপ সংযোগ ও সংমিশ্রন হইয়াছে; আভিজাত্য সম্পন্ন কোন বিশেষ শ্রেণীর অভ্যুদয় হয় নাই। কাজেই শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন কে করিবে ?

ইংলণ্ডে শাসন কার্য্যের নিয়োগ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় হয় কিন্তু তাহাতে শক্তিশালী centralised state গঠনের কোন বাধা জন্মিয়াছে এমন কথা কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন বা সমর্থন করিবেন মনে হয় না।

জাপানের উত্থান শুধু শ্রেণী বিশেষ দ্বারাই সম্ভব হয় নাই। সমস্ত জাতি এবং সর্ব্বশ্রেণী তাহাতে অংশ নিয়াছে। কাজেই ইহা শুধু 'Samurai' শ্রেণীর সুকৃতির ফল বলা যায় না।

জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হইলে জাতীয় জীবনে পরিবর্ত্তন কত দ্রুত ও অভাবনীয় হয় তাহার প্রমাণ ভার্সাই সন্ধিতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত জার্ম্মেন জাতি। কাজেই অপমানকর 'Perry's ultimatum'এ জাপানের জাতীয় জীবন হঠাৎ উদ্‌জীবিত ও উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিল এই কথা স্বীকার্য্য।

বিংশ শতকে চীনের জাতীয় জাগরণ কিভাবে পরিশেষে সানইয়াট্‌সেনের নেতৃত্বাধীনে স্থায়ী আন্দোলনে পরিণত হইল এবং National Government প্রতিষ্ঠিত হইল তাহার বেশ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই পুস্তকে পাওয়া যায়। সানইয়াট্‌সেনকে গ্রন্থকার একজন visionary হিসাবে দেখিয়াছেন missionary ভাবে নয়। কাজেই তাহার মতে 'San proved more valuable to his party dead than alive. He had been the supreme ideologist of the party and his singleness of purpose had won for him the devotion of the zealots, but he always lacked practical political competence' বর্ত্তমান চীন জাপান যুদ্ধের মূলে কোন 'civilising mission' বা Pan-Asiaর প্রেরণা নাই। ইহা নিছক স্বার্থসিদ্ধিরই নামান্তর জাপান সাম্রাজ্যবাদের মূল কথা 'Japan—Manchukus—China economic bloc' সৃষ্টি করা। 'The Japanese seek to control China's development so that it may

bring no injury to the vested interests of Japan economically or politically' এই 'Control'এর পশ্চাতে রহিয়াছে 'Gun-boat policy'র নগ্ন বর্ব্বরতা

চীনকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করিতে হইলে জাপানের নৌশক্তির একান্ত প্রয়োজন। Far Eastএ প্রভাব বিস্তার করিতে হইলেও তা। কাজেই ১৯৩২-৩৬ সাল হইতে জাপান 'has presented the Anglo-Saxon powers with an uncompromising demand for naval parity ?

Far Eastিএ পাশ্চাত্য জাতি সমূহের নানা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এজন্যই 'manifest duty still points to the West.

Parliamentary Government in England.

a Commentary,—By H. J. LasKi, Ailen and Unwin 12 6d

Parliamentary Government, Democracy ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু মনীষী নানা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে। Prof. Laski সে পথে যান নাই। তাহার মতে সব কিছুর মূলে রহিয়াছে অর্থ-নৈতিক কারণ। কাজেই তাঁহার বিশ্বাস 'We cannot understand the parliamentary system in Great Britain unless we recognise that, beneath the appearance of democracy, this is the economic and social system it is intended to uphold. It was made by the owners of the instruments of production in the interest of their property and the safe guarding of their conception of their rights is inherent in all the rules by which it moves' পূর্ব্ব প্রকাশিত তাহার 'Rise of European Liberalism পুস্তকখানার মূল সূত্র ও সিদ্ধান্তগুলি এই 'Parliamentary Government এ আরো পরিস্ফুট ও ব্যাপক করিয়াছেন। আবার Liberalism এর সঙ্গে Parliamentarianism ওতপ্রোতভাবে জড়িত কাজেই বই দুইখানা পরস্পরের সম্পূরক।

পুস্তকের ভূমিকাটি বেশ বড়, সুচিন্তিত এবং তথ্যপূর্ণ। বর্ত্তমান parliament এবং constitution অর্থ-নৈতিক সম্বন্ধের উপরই অবস্থিত, ইহা বেশ পরিষ্কার, ন্যায়ানুগভাবে দেখান হইয়াছে।

Constitutional System দ্বারা সমাজের কোন আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়। 'major reconstruction in the realm of our nation life' কখনই বিপ্লব ভিন্ন হয় না।

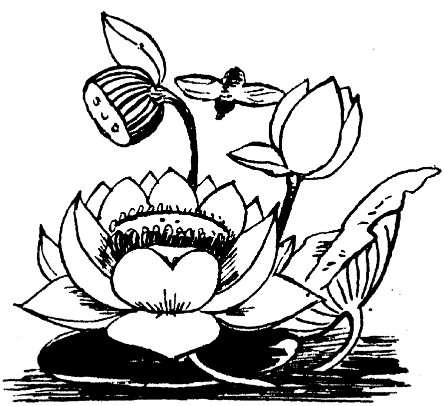
ইংলণ্ডে 'Constitutional System' স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে শুধু 'economic success, success in war, success in empire-building and pegging out claim for posterity'র ফলে। এই গুলির অভাব হইলে evolutionist না হইয়া ইংরেজ revolutionist হইত।

Parliament এর আদর্শ এবং 'Great myth' (King-Emperor) এর আকর্ষণ দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। কাজেই British Commonwealthএ ভাঙ্গন ধরিবে. কিন্তু কিভাবে তাহা দ্রুত সম্ভব হবে তাহা ভাবিবার বিষয়।

'The sober truth is that those who have power do not propose to abdicate from its possession. They require an ideology to justify their hold to those who do not profit by it, perhaps even to justify it to themselves; and they use their co-ercive power, which they clothe in the majestic paramountcy of a state, to impose the acceptance of that ideology upon the masses. The coercion may well wear the appearance of consent. Once any considerable section of them does so, their criticism becomes a threat, their organisation sedition or treason and the power of the state is brought into play to crush the challenge to law and order.'

Prof. Laskiর এই কথাগুলি বিপ্লবী ভারতের বিশেষ প্রনিধানযোগ্য।

শৈলেশ রায়



সম্পাদকীয়

বাঙ্গলার রাজনৈতিক-বন্দী—

বাঙ্গলা সরকারের ইস্তাহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলনের আর এক অঙ্কের উপর যবনিকা পড়্‌লো। প্রাদেশিক সায়ত্ত্ব শাসন প্রবর্ত্তনের পরেও যখন বাঙ্গলার রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হোল না—তখন আন্দামানের রাজনৈতিক বন্দীদের জীবনপণ কোরে অনশন—মুক্তি দাবী কোরে—এবং তার ফলে দেশময় বিক্ষোভ. জেলে জেলে ও বন্দীশিবিরগুলিতে অনশন ও মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে অনশনভঙ্গ ইত্যাদি আজ ইতিহাসে পরিণত হোয়েছে। তারপর মহাত্মাজীর মধ্যস্থতায় বাংলা সরকারের সঙ্গে পত্রালাপ ও আলোচনাকালে সমস্ত আন্দোলন স্থগিত রাখ্‌তে মহাত্মাজী অনুরোধ কোরেছিলেন, যাতে প্রতিপক্ষ কোনপ্রকার অজুহাতের অবকাশ না পায় ও মহাত্মাজীও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ আব-হাওয়াতে আলোচনা চালাতে পারেন। মহাত্মাজীর অনুরোধে তখনকার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্দোলনকে বন্ধ রাখা হোয়েছিল। তার ফল ভাল হোয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। দেশময় আন্দোলনের মধ্যে যে জাতীয় দাবী ভাষা পেয়েছিল, কৃত্রিম উপায়ে তার কণ্ঠরোধ করাতে জনমত জোরালো হোয়ে উঠতে পারেনি। গত ৮ই নভেম্বর বঙ্গীয়-প্রাদেশিক-রাষ্ট্রিয় সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক বৈঠকে মুক্তি আন্দোলন আবার সুরু করবার প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে ও বাংলার সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এক কমিটি গঠিত হোয়েছে এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে।

১২ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায় এই আন্দোলন আবার সুরু করা হোয়েছে ও ২০শে নভেম্বর বাংলার সর্ব্বত্র সভাসমিতি ও শোভাযাত্রা ইত্যাদি দ্বারা বাংলার জনসাধারণের দাবী জানানো হবে। আন্দোলন দেরীতে হোলেও আবার যে সুরু হোল এটা আনন্দের কথা—এই আন্দোলকে স্থায়ী ও কার্য্যকরীভাবে পরিচালিত করবার দায়িত্ব এই কমিটির। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত এ আন্দোলন চালাতে হবে।

এই মুক্তি প্রশ্ন সম্পর্কে সার নাজিমুদ্দিন যে দুইটী নূতন যুক্তির অবতারণা কোরেছেন তা মৌলিকত্বের দাবী করতে পারে। সরকারী সাপ্তাহিক "বাংলার কথায়" সার নাজিমুদ্দিন লিখেছেন যে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করবার যে প্রাথমিক অধিকার প্রত্যেকের আছে—সন্ত্রাসবাদ তা

থেকে দেশকে বঞ্চিত করতে চেয়েছিল—এই জন্য সন্ত্রাসবাদকে দমন করবার প্রয়োজন ঘটেছে। সন্ত্রাসবাদ দমন করবার নামে সমস্ত দেশের চিন্তা ও কর্ম্মকে যে ভাবে শৃঙ্খলিত করা হোয়েছিল তার পরে আর ব্যক্তি স্বাধীনতার বুলি আওড়ানো শোভা পায় না। আর একটি যুক্তি এই যে, বহু সংখ্যক রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দী, সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করছেন অতএব এই বন্দীদের সকলকে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া বিচক্ষণতার কাজ হবে না। প্রথমতঃ যতদিন পর্য্যন্ত সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার বে-আইনী বলে ঘোষিত না হোচ্ছে ততদিন এই অজুহাতে কাউকে বন্দী রাখা যায় না—হয়ত যে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের অধিকারে বিঘ্ন ঘটবার ভয়ে সার নাজিমুদ্দিন এতটা বিচলিত—সেই অধিকারই যে উপরোক্ত যুক্তিতে ক্ষুণ্ণ হোয়েছে তা স্বীকার করবার মত উদারতা তাঁর মধ্যে আশা করা যায় না বটে, তবে যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন তার মধ্যে অন্ততঃ চিন্তার পারম্পর্য্য আমরা আশা কোরেছিলাম।

আসল কথা একান্ত বাধ্য না হোলে তারা রাজনৈতিক বন্দীদের কিছুতেই মুক্তি দেবেন না। এই বাধ্য করবার পথই এখন দেশকে আবিষ্কার করতে হবে। এবার আবার আন্দোলন সুরু কোরে মধ্যপথে যাতে থেমে না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাক্‌তে হবে। নিজের যথার্থ স্বার্থ সম্বন্ধে যদি ব্রিটিশ সরকার অবহিত হোতেন তবে আসন্ন সমরাশঙ্কা ও জাপানের ক্রমবর্দ্ধিত ক্ষুধার ভয়াবহতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যও ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট রাখতেন! কিন্তু কোন প্রকার দূরদর্শিতা অথবা বলিষ্ঠ রাজনৈতিকতা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

শ্রমিকদের উপর গুলি চালনা—

বাণিজ্য-বিরোধ-বিলের প্রতিবাদকারী বোম্বের ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের উপর গুলীবর্ষণে সমস্ত দেশ বিক্ষুব্ধ হোয়েছে। যে কংগ্রেস জনসাধারণের—আর জনসাধারণ বলতে বুঝি বিশেষভাবে চাষী ও মজুর—প্রতিনিধিত্বের দাবী করে. সেই কংগ্রেস সরকারের আওতায় এ ঘটনাটি ঘটাতে কংগ্রেসের মর্য্যাদা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হোয়েছে। বিশেষতঃ অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের গুলীবর্ষণ পরিহাসের মতই শোনায়। এ ঘটনাটীর জন্য দায়ী কে? বোম্বে সকরার যখন এ বিলটী আনেন তখন স্থানীয় ও নিখিল-ভারত-ট্রেড্‌ইউনিয়ান কংগ্রেস এর বিরোধিতা করেছিলেন। ট্রেড্‌ ইউনিয়ান কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা না কোরে কোন বিল পাশ করবার ফলে যে কুফল আশঙ্কা করা হোয়েছিল তাই ঘটেছে।

ট্রেড-ইউনিয়ান-কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করেছে প্রধানতঃ দুই কারণে। প্রথমতঃ এ বিলে শ্রমিকদের শতকরা মাত্র ৬ জনকে নিয়ে গঠিত মালিকদের দ্বারা অনুমোদিত কমিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হোয়েছে. অননুমোদিত শতকরা ২৫ জনকে নিয়ে গঠিত কমিটির উপর। ট্রেড্‌ ইউনিয়ান বলেন—এতে কতকগুলো Slave unions গড়ে উঠবে। কারণ এ বিল্‌ অনুযায়ী কোন একটি স্থানে একটি ইউনিয়ান গঠিত হওয়ার পর শতকরা ২৫ জন শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত না

হোলে অন্য কোন ইউনিয়ান অনুমোদিত হবে না। শ্রমিক কর্ম্মীরা আশঙ্কা করেন শ্রমিকদের বর্ত্তমান শিক্ষার অবস্থায় শতকরা ২৫জন শ্রমিক দ্বারা ইউনিয়ান গঠিত করা দুঃসাধ্য, ফলে মালিকদের দ্বারা অনুমোদিত ইউনিয়ানই প্রাধান্য লাভ করবে ও তাতে যথার্থ শ্রমিক স্বার্থ রক্ষিত হবে না।

বিলটির বিরুদ্ধে ট্রেড্ ইউনিয়ানের ২য় অভিযোগ—বিলটি শ্রমিকদের একমাত্র অস্ত্র, ধর্ম্মঘট করবার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত কোরেছে। বোম্বে কংগ্রেস অবশ্য এই অভিযোগটি অস্বীকার কোরেছেন—তবে বিলটি যে শ্রমিকদের সমর্থন লাভ করেনি তা ৮০ হাজার ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিকদের ব্যবহারেই প্রকাশ পেয়েছে। সর্দ্দার প্যাটেল প্রভৃতির মোটরের উপর প্রস্তার নিক্ষেপ করা বা মিলের দরজা জানালা ভাঙ্গা কেউ সমর্থন করেননা,—কিন্তু জনতাকে এভাবে উত্তেজিত হবার কারণ যাঁরা জোগাচ্ছেন তাঁদের দায়িত্বও কম নয় এ ব্যাপারে। ব্যোরক্রেটিক সরকারের নীতি অনুযায়ী জনমত দলিত কোরে শাসনের Steel frameকে যেন তেন প্রকারেণ নিখুঁত রাখবার ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকারের নিকট আমরা আশা করিনি। উচিত ছিল এ বিলটী আনবার আগে ট্রেড ইউনিয়ানের সঙ্গে আলোচনা কোরে—তার সমর্থন নেওয়া।

সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে বোম্বে সরকার নিখিল-ভারত-ট্রেড্-ইউনিয়ান কংগ্রেসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাবার জন্যে এক বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাবে রাজী হোয়েছেন—এ শুভ বুদ্ধি যদি এর আগে হোত তবে ঐ শোচনীয় অঙ্কটী আর অভিনীত হোত না। আর এই লজ্জাকর আত্ম-বিরোধও এতটা প্রবল হোত না।

উপরোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ভাববার খোরাক যথেষ্ট মিলবে। কংগ্রেসকে যথার্থ গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার কথা আজকাল পথে ঘাটে শোনা যায়—যদি এ সব উক্তির মধ্যে যথার্থ আন্তরিকতা থেকে থাকে, তবে কিভাবে তা করা সম্ভব তার শ্রেষ্ঠ উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ত্তৃপক্ষ স্বতন্ত্র গণ-প্রতিষ্ঠানের বিরোধী—তাঁরা বলেন একমাত্র কংগ্রেসের মধ্য দিয়েই কৃষক ও শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ প্রকৃষ্ট ও অ-হিংস উপায়ে প্রকাশ হোতে পারে। বোম্বের ঘটনা কিন্তু বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে বেশী সংখ্যক, কংগ্রেসকে যে তাঁদের যথার্থ প্রতিনিধি মনে করেনি তার প্রমাণ তো হাতে হাতেই পাওয়া গেল—কারণ কংগ্রেস কর্ম্মীরা এই ধর্ম্মঘট যাতে না হয় তার জন্য বহু প্রচার কোরেছেন—আবার শ্রমিক কর্ম্মীরাও ধর্ম্মঘট করবার উপদেশ দিয়েছেন—বহু সংখ্যক শ্রমিক শেষোক্ত উপদেশ শুনেছে। এসব ঘটনায় কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের চিন্তা করবার খোরাক প্রচুর রয়েছে।

একমাত্র কংগ্রেসের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থরক্ষা সম্ভব, দাবীর সারবত্তা কতটা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে। দক্ষিণ ও বাম-পন্থীদের মধ্যে যে ক্রমবর্দ্ধমান দূরত্ব দেখা দিচ্ছে তাতে জাতীয় সংহতি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা হবে কিনা—সেটাও ভাববার বিষয়। আগামী কংগ্রেসে এসব গুরুতর সমস্যার আলোচনা হবে ও দেশবাসী এক সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাবে এ আশা আমরা করছি।

ভূমি-রাজস্ব কমিশন—

বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি যে ভূমিরাজস্ব কমিশন বসিয়েছেন তাতে প্রজা-প্রতিনিধি ছাড়া আর সকলেই আছে। জমিদার, প্রফেসার, সরকারী চাকুরে প্রভৃতি কমিশনের গুরুত্ব বাড়িয়েছেন, কিন্তু প্রজা-প্রতিনিধির স্থান এতে হয়নি, এতেই স্পষ্ট হয় কমিশনের উদ্দেশ্য, প্রজার হিতসাধন নয়—কমিশন গঠন কোরে কিছু সময় নেওয়া মাত্র। কিন্তু এভাবে প্রজাদের কতদিন আর প্রতারিত করা সম্ভব হবে। প্রজার ভোটে পরিপুষ্ট হক সাহেব বাংলার মন্ত্রীত্বের মস্নদে বসে—প্রজাদের কথা ভুলতে পারেন—কিন্তু দরিদ্র চাষী কি কোরে ভুলবে কত আশা কোরে—সে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল তার অবস্থার পরিবর্ত্তন হবে এই ভরসায়। এই কমিশনের সঙ্গে কোন প্রজা-হিতৈষীর, বিশেষভাবে কংগ্রেসের কোন প্রকার সহযোগিতা করা উচিত নয়।

ভারত-রক্ষা তদন্ত কমিটী

নিরীহ কামধেনুকে যেমন ক'রে দোহন করে ভারতবর্ষকে তেমনি দোহন ক'রেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিজকে পুষ্ট করছে। ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় কুটো নড়লেও বুঝতে হবে ইংলণ্ডের কোনো দিকে আত্মপুষ্টির ব্যবস্থা আছে। ভারতে ইংরেজের এই স্বার্থসিদ্ধির ইতিহাস ঘেঁটে লাভ নেই। ভারতবর্ষের ঘাড়ে পা দিয়ে ইংরেজ বার বার আপন মতলব সিদ্ধ করছে। একথা এত সাধারণ যে তার উল্লেখ করবার প্রবৃত্তিও কারুর হয় না। সম্প্রতি আর একবার এই নির্লজ্জ অভিনয় ঘটচে। চারদিক থেকে প্রতিবাদও উঠেছে। কিন্তু কোন ফল যে হবে না, একথাও সবাই জানে।

চ্যাটফিল্ড কমিটী এসেছে ভারতে। এই কমিটীর উৎপত্তি হয়েছে আশু যুদ্ধের সম্ভাবনায়। চারদিকে যে ঘনঘটা সেজে এসেছে, তাতে ইংলণ্ডে সাজ সাজ রব পড়েছে। জোর যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হয়েছে বিলেতে। সৈন্যদলেও সামরিক ব্যবস্থায় নানা সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। এই নব সমর সংস্কারের হাঙ্গামা ভারতকেও পোহাতে হবে। জগতের সামরিক ব্যাপারে ভারতবর্ষের একটা গুরুত্ব আছে। তাছাড়া ব্রিটিশ প্রয়োজনের গুরু ব্যয়ভার ভারতের পিঠে অনেকখানি চাপানো যাবে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জনমতের চাপে পড়ে ব্রিটিশ সরকারকে আংশিক ব্যয় বহনের জন্য কাকুতিমিনতি করায় এই কমিটীকে পাঠোনো হয়েছে মীমাংসার জন্য। এই কমিটী নির্দ্ধারণ করবেন যুদ্ধায়োজনে কতটা ভারতের স্বার্থ এবং কতটা বা ইংলণ্ডের স্বার্থ। সেই অনুসারে ঠিক হবে কতটা ব্যয় বহন করবে ভারত এবং কতটা ইংলণ্ড।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ভারতের স্বার্থ জড়িত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় কোনো সভ্যই এই কমিটীতে নেই। কারণ দেখানো হবে যে সামরিক ব্যাপারে ভারতীয়দের অভিজ্ঞতা নেই, কাজেই ভারতবর্ষের কাউকে কমিটীতে নেওয়া হয়নি। এই কারণ যে ভিত্তিহীন তা প্রত্যক্ষ। এই ধরণের ভূয়া ওজরে যে ভারতবর্ষের লোক ঠকবে না তা' বলা বাহুল্য। হোর-বেলিশা,

স্যামুয়েল হোর, ডাফ কুপার মহারথীরা কেউই সামরিক কর্ম্মচারী নন। অথচ তা' সত্ত্বেও হোর বেলিশার যুদ্ধ আফিস চালাতে এবং স্যামুয়েল হোর ও ডাফ কুপারের নৌবহর সংক্রান্ত কাজ চালাতে কোন দিক দিয়েই বাধে না। এই ছলের আশ্রয় নিয়ে ভারতরক্ষার ব্যাপার থেকে ভারতীয়দের বাদ দেওয়া হয়েছে। এই নির্লজ্জ অবিচারের বিরুদ্ধে দেশের নরমপন্থীরা পর্য্যন্ত প্রতিবাদ জানিয়েছে। কংগ্রেস-নেতারা এই কমিটীকে কোনো সাহায্য করবেন না, স্থির করেছেন। সাক্ষ্য দিতে ডাকলে এঁরা কেউ যাবেন না। এই বয়কট নীতিকে লিবারেল ফেডারেশানের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত চিমনলাল শীতলবাদের মত মডারেট নেতাও সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন। পূর্ব্বে সাইমন কমিশনকে যেমন দেশের সর্ব্বত্র বর্জ্জন করা হয়েছিল, আমরা আশা করি এই স্বেচ্ছাচার-ভিত্তিক কমিটীও তেমনি ভারতের সকল শ্রেণী দ্বারা সর্ব্বত্র বর্জ্জিত হবে।

সাম্প্রদায়িক-দাঙ্গা

বর্দ্ধমান ও সিলেটে প্রতিমা বিসর্জ্জন উপলক্ষ কোরে সাম্প্রদায়িকতার যে উগ্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ জাতীয় সংহতিকে নষ্ট কোরে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিজম এর খেলারপুতুলমাত্র হবার নির্ব্বুদ্ধিতা বা দুর্ব্বুদ্ধিতার অভাব ঘটেনি আজও। এসব দাঙ্গা সম্বন্ধে যবনিকার অন্তরালের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে—বিপন্ন ধর্ম্মকে রক্ষা করবার যুক্তি অজুহাত মাত্র। আসল কথা হোচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থ, ধর্ম্মের মুখোস পরে, নির্ব্বোধ নিরীহ সর্ব্বসাধারণকে ভোলায়। সিলেটের দাঙ্গার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সাদুল্লা মন্ত্রীমণ্ডলীর পতন ও কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীমণ্ডল গঠনই দাঙ্গার আসল কারণ। সাদুল্লা মন্ত্রীমণ্ডলের পতনের পর হাজার হাজার Pamphlet বিলি কোরে নিরীহ নিরক্ষর মুসলমানদের বোঝানো হোয়েছে যে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল এবং অতঃপর মুসলমানের নমাজপড়া, আজান দেওয়া বা গরু কোরবানী করা বন্ধ হোয়ে যাবে—মস্‌জিদ্ ভাঙ্গার মিথ্যা গুজোবও রটানো হোয়েছিল---এতে যে মুসলমান গণসাধারণ ক্ষেপে উঠে অঘটন ঘটাবে, এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ ধরণের ব্যাপার বন্ধ করবার উপায় কি তা' বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে। গণসাধারণকে এ সব মিথ্যা প্রচারের হাত থেকে রক্ষা করবার পথও বের করতে হবে। আমাদের মনে হয় এর একমাত্র উপায় counter-propaganda আর তার ভার নিতে হবে কংগ্রেসকে। কংগ্রেসের সুপরিচালিত ও সুচিন্তিত এক প্রচার বিভাগ খুলতে হবে ও শিক্ষিত বেতনভোগী কর্ম্মীদের গ্রামে গ্রামে প্রচারের জন্য পাঠাতে হবে---ম্যাজিক লণ্ঠন, সিনেমা ও যাত্রার মধ্য দিয়ে প্রচার চালাতে হবে। আর এতেই হবে সত্যিকার গণসংযোগ সম্ভব। প্রতি ইউনিয়ানে স্থায়ী প্রচার বিভাগ খুলতে হবে—গ্রামের কর্ম্মীরা কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে এসে শিক্ষা নিয়ে যাবে। দু'তিনটী ইউনিয়ন কমিটী মিলে একটী ম্যাজিক লণ্ঠন কেনা ও প্রচার বিভাগ স্থাপন করা অসম্ভব বা কঠিন নয়। আশা করি দেশের দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্যজনক উক্তি না করে কর্ম্মীরা সত্যকার

মীমাংসার পথ বেছে নেবেন---কারণ জাতীয় ঐক্য আন্‌তেই হবে যদি ভারতকে স্বাধীন হোতে হয়।

ফেডারেশান

ভেদনীতির সাহায্য ছাড়া যে শোষণ চলে না, একথা ব্রিটিশ শাসকগণ যেমন বোঝেন তেমন আর কেউ বোঝেন না। ইংলণ্ডের ২০০ বছরের ইতিহাস ভারতবর্ষে এই সত্যের চরম সাক্ষ্য দান করছে। নানা ছলে নানা ধরণের ভেদ ও বিবাদ সৃজন করবার কৌশলকে ইংরেজ অতি চমৎকার ভাবে আয়ত্ত করেছে। ব্রিটিশ সরকারের এই চিরন্তন নীতির দৃষ্টান্ত হচ্চে ১৯৩৫ সনের নতুন শাসন-তন্ত্র। এতে কত যে রকম-বেরকমের বিভেদ ও বিচ্ছেদ ভারতীয়দের মধ্যে প্রবর্ত্তন করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার ঠিক নেই। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের নামে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আমদানী ক'রে জনসাধারণকে খণ্ড বিখণ্ড করা হয়েছে। তারপরে ফেডারেশানের অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে ভারত-বর্ষকে ত্রিখণ্ডিত করা হয়েছে। একদিকে ব্রিটিশ ভারত, অন্যদিকে দেশীয় ভারত। এর ভিতরে আবার রয়েছে মুসলমান, হিন্দুর পৃথক সত্তা। সামন্ত-রাজন্যবৃন্দ, কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ এই তিন শক্তির পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে ভারসাম্য রক্ষিত হবে ইংরেজ সরকারের পক্ষে। এই আশায় ও উদ্দেশ্যে ফেডারেশানের কলকব্জা তৈয়ার করা হয়েছে। কাজেই ফেডারেশান যদি চালু হোয়ে যায় তবে দেশের রাজনৈতিক ক্ষতি যে পরিমাণ হবে তার আর প্রতিকার থাকবে না। একবার এর কবলে ভারতবর্ষ পড়লে, দেশের সকল প্রগতিমূলক উন্নয়নের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। ছলে বলে কৌশলে যে ভাবেই হোক ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপরে এই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা চাপাবেনই, একথা দিন দিন স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ছে।

রাজন্যবর্গ এ ফেডারেশানকে চায় না। কারণ তাদের আশঙ্কা রয়েছে নিয়মতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা দেশে এলেই তাদের নিজেদের রাজ্যের স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র অচল হয়ে উঠ্‌বে। যে অবাধ প্রভুত্ব তারা আপন আপন রাজ্যগুলিতে বহুদিন যাবৎ ভোগ করে আস্‌চেন, সে প্রভুত্ব পাছে বা খানিকটাও খর্ব্ব হয়, এই ভয়ে তারা ফেডারেশনকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। বিশেষতঃ ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি সামন্তরাজ্য সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ কোনো রকমে করবার সুযোগ পাবে, এ কল্পনাও তাদের অসহ্য। কাজেই রাজন্যবর্গ ফেডারেশনকে চায় না। দ্বিতীয়তঃ মুসলেম লীগও এই ফেডারেশনের বিরোধী; অবশ্য অন্য কারণে। এরা আশঙ্কা করছেন সর্ব্বভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে ফেডারেশানের সর্ব্বসমেত হিন্দু সংখ্যাধিক্য হওয়ায় মুসলমান অংশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা আর চল্‌বে না। কাজেই প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থায় এরা যে সাম্প্রদায়িক সুবিধা ভোগ করছেন, সে সুবিধা-ভোগ সর্ব্বভারতীয় ব্যবস্থায় অটুট থাকবে না। সর্ব্বভারতীয় কল্যাণ নয়, সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুসলীম লীগ এই ফেডারেশনের বিরোধী। অবশ্য এই বিরোধ কোনোদিনই সক্রিয় ও তীব্র হয়ে উঠ্‌বে না, কারণ ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সত্যিকার বিরোধ ঘটাবার মনোভাব এদের

নেই। এরা বড়জোর হুমকী হামকী দিয়ে পরক্ষণেই স্তুতিবাদ ও আপ্যায়ন ক'রে মন ভিজাবার মোলায়েম পন্থাকেই অবলম্বন করে থাকেন। সর্ব্বশেষে, কংগ্রেস এই ফেডারেশনকে সর্ব্বপ্রকারে বিরোধিতা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে। ফেডারেশান যে ভারতীয় কল্যাণের পরিপন্থী এ কথা কংগ্রেস স্পষ্ট করে বলেছে এবং এই হানিজনক ব্যবস্থা যাতে ভারতের ওপরে না চালানো হতে পারে, তার জন্যে বহুমুখীন সংগ্রামের প্রবর্ত্তন করতেও কংগ্রেস প্রস্তুত আছে।

কিন্তু সবচাইতে বড়ো বিপদ লুকিয়ে আছে কংগ্রেসেরই নিজের মধ্যে। আটটা প্রদেশে শাসনব্যবস্থা হাতে নেবার ফলে কংগ্রেস আজ নিয়মতান্ত্রিকতার পাঁকে ডুবে গেছে। কংগ্রেসের সংগ্রামপ্রবণতা মন্দীভূত হয়ে এসেছে। কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণপন্থীরা একটা বড়ো অংশ। ফেডারেশান প্রবর্ত্তনে বাধা দিতে কতদূর যে আগ্রহ ও সংগ্রামশীল মনোভাব এই অংশের আছে তা' দুর্ব্বোধ্য। শ্রীযুত সত্যমূর্ত্তির উক্তিগুলি থেকে অনেকটাই বোঝা যায় যে হাওয়া কোন্ দিকে বইছে। ফেডারেশান সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট সাবধানবাণী অনেককেই আশ্বস্ত করবে সন্দেহ নেই। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত ফেডারেশানের বিরুদ্ধে কতটা সংহত শক্তি প্রবল হয়ে উঠ্‌বে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। যাহোক বর্ত্তমানে ফেডারেশান ক্রমেই আসন্ন হয়ে আসছে। এখন থেকেই সকল শক্তিকে সংহত করে সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। এর জন্য চাই ফেডারেশান-বিরোধী সকল শক্তির পরস্পর সংযোগ এবং সর্ব্বভারতীয় একটা কর্ম্মপদ্ধতি ও প্ল্যান। সুচিন্তিত একটা প্ল্যান গড়ে তুলতে হলে এখন থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা বিশেষ ক'রে বামপন্থী কর্ম্মীদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

কংগ্রেস ও যন্ত্রশিল্প—

কংগ্রেসকর্ম্মী ও কর্ম্মী নন এমন বহুলোকের কয়েকটী বিষয় সম্পর্কে কংগ্রেসের যথাযথ মত কি, সে সম্বন্ধে নানা অস্পষ্টতা ও প্রশ্ন রয়েছে। যেমন অহিংসা সম্বন্ধে কংগ্রেস পক্ষের ব্যাখ্যা কি ও তা রক্ষা কর্‌বার উপায় কি। সম্প্রতি বোম্বের কংগ্রেসী সরকার ধর্ম্মঘটীদের উপর গুলি চালনা করেও "অহিংসা" থাকতে পেরেছেন কি না জানিনা যদি বলা হয় আত্মরক্ষার জন্য হিংসা, অহিংসার ব্যতিক্রম নয়, তবে বলতে হয় কিছুদিন পূর্ব্বে মহাত্মা গান্ধি জার্ম্মানী কর্ত্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাসের প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে চেকোশ্লোভেকিয়ানরা যদি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ না করতো তবে আরো ভালো হোত; কাজেই আত্মরক্ষার যুক্তিও খাটে না। এ সম্পর্কে কংগ্রেসের যথার্থ মত কি সে সম্বন্ধে বিশদ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন।

যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধেও কংগ্রেসের যথার্থ attitude কি সে সম্বন্ধে নানা অস্পষ্টতা ছিল। অনেকের মত আমাদেরও বিশ্বাস ছিল মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর মতাবলম্বীরা কুটীর শিল্পের প্রসারই চান যন্ত্রশিল্পের নয়। কাজেই রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবানুযায়ী জাতীয়-শিল্প পরিকল্পনা-কমিটী গঠিত হওয়াতে

অনেকের মনে নানা সংশয় ও প্রশ্ন জাগে। কিন্তু সম্প্রতি কোন মিলের উদ্বোধন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী স্পষ্ট কোরে বলেছেন—

There should be no mistaken idea in the minds of any one that the Gandhi-man is .....an enemy of the large workshop. He is the enemy of the large workshop that kills the small workshop. But he is not the enemy of the large workshops that make what are necessary for the people and probably make some of the small workshops thrive as a result.

এরপর আর অস্পষ্টতা থাকা উচিত নয়। তবে এরপরে ওয়ার্দ্ধা পরিকল্পনা ইত্যাদিতে সুতো কাটা বাধ্যতামূলক করবার যুক্তি আমরা পাইনা। নানাপ্রকার শিল্পের শিক্ষা দেওয়া অবশ্যই সমর্থনযোগ্য—কিন্তু সকলের জন্য ও সকলের পক্ষে সুতো কাটা রূপ একটী মাত্র শিল্পের ব্যবস্থা করবার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না, যদি কংগ্রেস কুটীরজাত বস্ত্রের দ্বারা ভারতবর্ষের লজ্জা নিবারণ করতে না চান। বিজ্ঞানের দানকে স্বীকার করতেই হবে বর্ত্তমানযুগে—বিশেষতঃ যদি বিদেশী শিল্পের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়—কাজেই এই শিল্প-পরিকল্পনা কমিটির গঠনকে আমরা অভিনন্দিত করছি—কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলি শিল্পবাণিজ্যে অন্য প্রদেশগুলির পথপ্রদর্শক হবে আমরা আশা করছি।

সুজাতা সরকারের মৃত্যু—

সম্প্রতি যে সংবাদ খবরের কাগজে বেরিয়েছে, তা যদি সত্য হয় তবে এসব অনভিজ্ঞও অল্পবুদ্ধি তরুণদের ভদ্র বেশী বর্ব্বরদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবার দিন এসেছে। কিছুদিন আগে করপোরেশন সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেক গলদ বেরিয়ে পড়ে, আবার এই তরুণী বালিকাটীর মৃত্যু সংবাদে শুধু বিচলিত হোলেই চলবে না, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে দুর্ব্বৃত্তরা প্রকাশ পায় ও উপযুক্ত শাস্তি পায়। এবং ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা অসম্ভব হয়। অভিভাবক ও হোষ্টেলের সুপারিন্টেডেন্টদেরও আমরা বলি—তাঁরা কোনরূপ রাজনৈতিক বা সামাজিক কল্যাণের কাজে তাঁদের কন্যাদের দিতে নানারূপ কড়াকড়ি করেন, কিন্তু যথার্থ বিপদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করবার মত সামর্থ্যের তাঁদের একান্ত অভাব। আমরা তদন্তের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি, তারপর এরূপ ব্যাপার যাতে ভবিষ্যতে ঘটতে না পারে তার জন্যে আন্দোলন ও ব্যবস্থা কোরতে বাঙ্গলার মেয়েদের বিশেষভাবে অবহিত হোতে অনুরোধ করছি।

মিউনিক প্যাক্টের পর—

মিউনিকে চতুঃশক্তি প্যাক্ট ও তার ফলে চেকোশ্লোভেকিয়াকে বলীদানের পরও জগতের শান্তিরক্ষা কতদূর অগ্রসর হোল, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এ প্রশ্ন আজ করছেন। শান্তিকামী ব্যক্তিরা যদি মনে কোরে থাকেন এক স্বাধীন বীর রাষ্ট্রের আত্মবলীদানের পরিবর্ত্তে চিরকালের জন্য না হউক অন্ততঃ দীর্ঘকালের জন্য সমরাশঙ্কা থেকে রেহাই পাওয়া গেল তবে এ ভুল তাঁদের রূঢ়ভাবেই ভাঙ্গবে—এবং অবস্থা দেখে মনে হয় সে দিনও খুব দূরে নয়। এখন দেখা যাক মিউনিক প্যাক্টের কি re-action হোয়েছে জগতের রাষ্ট্রগুলির উপর। সর্ব্ব প্রথমেই দেখা যায় এতে সর্ব্বত্র বহু প্রকারে ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলিরই সুবিধা হোল। প্রথমেই দেখা যাবে মধ্য ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী প্রভাব ও মর্য্যাদা একেবারে বিলুপ্ত হোয়েছে—তার পরিবর্ত্তে মধ্য ইউরোপের ছোট ছোট রাজ্যগুলি জার্ম্মানির সঙ্গে মৈত্রীতা করাই অধিকতর বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে বুঝ্‌ছে। ফ্রান্স—তার চুক্তির সর্ত্ত, ইংলণ্ডের চাপে পড়ে বিসর্জ্জন দিয়ে চেকদের বন্ধুত্ব চিরকালের জন্য হারিয়েছে।—উপরন্ত রুশকে বাদ দিয়ে মিউনিক বৈঠকে যোগ দেওয়ার ফলে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তিও শিথিল হোতে বাধ্য। কারণ সোভিয়েট এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ফ্রান্স যদি সম্মত হয় তবে চেক রাজ্য রক্ষার্থে লাল ফৌজও তৈরী হবে, কিন্তু ফ্রান্স সোভিয়েটের-সঙ্গে আলোচনা না কোরেই মিউনিক বৈঠকের সর্ত্তমেনে নিল, ফলে রুশীয়ার দক্ষিণ সীমান্তে ফ্যাসিষ্ট প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দী হোয়ে উঠবার সুযোগ পেল—আর এ সুযোগ কোরে দিতে সাহায্য করলো ফ্রান্স, এতে ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় হবার কথা নয়। চেকরও বুঝলো তাদের পুরোনো বন্ধুদের শক্তি সামর্থ্য ও কথার মূল্য কতদূর,—এরপর থেকে হের হিটলারের মনোরঞ্জন কোরে চলাই বরং নিরাপত্ততার দিক থেকে তারা শ্রেয়ঃ মনে করবে। এছাড়া সুদেতেন জার্ম্মাণদের দৃষ্টান্তানুযায়ী হাঙ্গেরী, পোলাণ্ড প্রভৃতিও চেক রাজ্যে ভাগ বসাতে চেষ্টা করছে।—বার্লিনের চরদের প্ররোচনায় মেমেলের নাৎসীরা লিথুনিয়ান গবর্ণমেণ্টের নিকট যে দাবী পেশ কোরেছে—সুদেতেন জার্ম্মাণ নেতার দাবীর সঙ্গে তার আশ্চর্য্য মিল রয়েছে। সকলেই অনুমান করছেন জার্ম্মাণীর মেমেল, অধিকারের এটাই প্রথম অঙ্ক। ফ্রান্স আত্মরক্ষার অতি সঙ্কীর্ণনীতি অবলম্বন কোরে একটার পর একটা চুক্তিকে অগ্রাহ্য কোরে চলেছে, সেই আত্মরক্ষাই শেষ পর্য্যন্ত তার পক্ষে কতদূর সম্ভব হবে সে সম্বন্ধে সংশয়ের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পোলাণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্স মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সত্বেও পোলাণ্ড যখন জার্ম্মাণীর সহায়তা কোরে চেক্ রাজ্যের ষ্টেশন অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ কোরলো তখন সোভিয়েট ইউনিয়ান জানিয়ে দিল, যে পোলাণ্ড চেক্ রাজ্য অধিকার করা মাত্র চেক-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল হোয়ে যাবে, কিন্তু ফ্রান্স নিঃশব্দে চেকের বিরুদ্ধে পোলাণ্ডের সমরায়োজন দেখল, প্রতিবাদমাত্র কোরলো না—জার্ম্মেণীর ভয়ে। এদিকে মুসোলিনী ঘোষণা করেছেন ফ্রাঙ্কোর পরাজয় তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না—এবং ফ্রান্সের পররাষ্ট্র

সচিব যদিও মত প্রকাশ করেছেন যে বৈদেশিক সৈন্য সরিয়ে নিলেই স্পেনের সমস্যা মীমাংসা হওয়া সম্ভব এবং তাতেই ফ্রান্সের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে, মুসোলিনীর ঘোষণার মুখে—তার সম্ভাবনা যে কতটুকু সকলেই বুঝবেন, আর এই ঘোষণা সত্ত্বেও এ্যাংলো-ইটালীয়ান চুক্তি বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা হোচ্ছে নভেম্বরের মাঝামাঝি, তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে স্পেনে ফ্যাসিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, ইংলণ্ড পরোক্ষভাবে স্বীকার কোরে নিয়েছে। উপরের ঘটনাগুলীর আলোচনায় স্পষ্টই দেখা যায় মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দী-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। পোলাণ্ড, বেলজিয়াম, সুইজারলেণ্ড, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক এবং ফ্রান্সের উত্তরাংশ ১৯৪১ সনের মধ্যে জার্ম্মাণের হস্তগত হবে এরূপ মর্ম্মে ৯টী মানচিত্র জার্ম্মাণীর ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সর্ব্বত্র বিলি হোচ্ছে, বলে যে খবর পাওয়া গেছে তা অবিশ্বাস করবার কোন কারণই নেই। এরূপ আকাঙ্খা থাকা জার্ম্মাণীর পক্ষে স্বাভাবিক এবং তা অসম্ভবও নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মেণ্ডেটারী অঞ্চলেরও কোন কোন স্থানে আতঙ্কের সৃষ্টি হোয়েছে এবং বৃটেনকে এবিষয়ে সতর্ক হবার জন্য এসব অঞ্চল অনুরোধ কোরেছে। এদিকে মিউনিক প্যাক্টের প্রভাব সুদূর প্রাচ্যেও দেখা যাচ্ছে, ইতিপূর্ব্বেই সুদূর প্রাচ্যে ইঙ্গ-আমেরিকান প্রভাব প্রায় লুপ্ত হোয়ে ছিল, মিউনিক প্যাক্টে তার অবশিষ্টটুকুও থাক্‌লো না। চেম্বারলেনের কাজের ফলে জাপানের ইউরোপীয় বন্ধু, জার্ম্মানী ও ইটালী শক্তিশালী হওয়াতে, পরোক্ষভাবে তার সুবিধা হোয়েছে। আমেরিকা জাপ-আমেরিকান চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য জাপানকে বার বার যে লিপি পাঠাচ্ছে—জাপান তা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনছে না—উপরন্তু জাপানের প্রধান মন্ত্রী, আমেরিকান লিপির যে উত্তর দেবেন তাতে নয়শক্তি চুক্তি (nine power pact) জাপানের পক্ষে প্রযুজ্য নয়, একথাই উল্লেখ করবেন বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এদিকে চেম্বারলেনের চেষ্টা স্বত্ত্বেও হিট্‌লারের মন ভিজলো না, মিউনিক প্যাক্টের অব্যবহিত পরেই ভাইমারের বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে জার্ম্মাণি শান্তি চায়, কিন্তু তার স্বার্থ বিসর্জ্জন একচুলও করবেনা, আর এবিষয়ে ইংলণ্ডের খবরদারিও সহ্য করবেনা। গণ-তান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টগুলি সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, যে এসব রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোনো নিশ্চয়তা নেই—আজ চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রী থাকাতে যুদ্ধ স্থগিত থাক্‌তে পারে, কিন্তু কাল যদি ইডেন বা চার্চ্চহিলের মত লোক গদিতে বসেন তবে যুদ্ধ অনিবার্য্য, এসব মন্তব্য শুনে মনে হয়—এরপরই ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনের আভ্যন্তরিণ রূপ পরিবর্ত্তন দাবী করবেন, এসব দেখে শুনে প্রশ্ন জাগে, জগতের ভবিষ্যৎ কি? এ সম্পর্কে চেকোশ্লোভেকিয়ার এক বিখ্যাত সংবাদপত্র ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত এভাবে কোরেছেন—ঐ পত্রিকা বল্‌ছেন 'মধ্য ইউরোপের আর অস্তিত্ব নাই। ইহার পর কি হইবে? জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ—না জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ? অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করিয়া লইবার উদ্দেশ্য জার্ম্মাণী ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপন? আমাদের মনে হয় কোন ক্ষেত্রেই জার্ম্মাণীর ও রাশিয়ার মধ্যে মৈত্রী স্থাপন

হবে না। কারণ ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রয়োজনও হয়তো জার্ম্মাণীর হবে না, হুম্‌কি দিয়েই কাজ হাঁসিল করা চল্‌বে। ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে নাৎসী প্রভাব দেখা যাচ্ছে—যে মঃ দালাদিয়ের, দুই বৎসর পূর্ব্বেও স্যোসিয়ালিষ্ট ও কম্যুউনিষ্টদের সহিত গভীর বন্ধুত্ব ছিল—সম্প্রতি তিনি তীব্রভাবে সেই কম্যুউনিষ্টদের আক্রমণ কোরেছেন। সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ড কম্যুউনিজমের শক্তি বৃদ্ধি যাতে না হয় তার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ ও অপমানই সহ্য করতে পারবে—কিন্তু মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত এই নীতি অনুসরণ কোরে—ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলি এত শক্তিশালী হোয়ে উঠবে, যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের, আশ্রিত সামন্ত রাজ্যের অনুরূপ অবস্থা হবে না, একথা বলা যায় না। মোট কথা এতবড় নিষ্ঠুর বলীদানেও জগতের শান্তি রক্ষা বিন্দুমাত্র বাস্তব হয়নি—সমরায়োজন পুরো দমেই চলছে পররাষ্ট্র আক্রমণের বা অধিকারের অভিনয় ও জল্পনা কল্পনাও বন্ধ হয়নি—জগতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে আশা করবার কারণও ঘটেনি। সংঘর্ষ আসবেই তার জন্য প্রস্তুত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ভারতবর্ষ এই ভবিষ্যৎ সংঘর্ষে কোন অংশ গ্রহণ করবে, আর তার জন্য প্রস্তুতই বা হবে কোন উপায়ে, সে বিষয় বাস্তববাদীর দৃষ্টি নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

চীন-জাপান সংঘর্ষ—

জাপানের বিমানাক্রমণের সঙ্গে, চীনসৈন্য অসীম সাহস ও কষ্টসহিষ্ণুতা দেখান সত্ত্বেও পেরে উঠ্‌ছে না। পরপর কেণ্টন ও হংকং এর পতনে জগতের স্বাধীনতাকামী জাতিমাত্রেই ব্যথিত হবে। সমস্ত সভ্যজগত একদিন ইতালীর আবেসিনিয়া গ্রাস যেমন নির্ব্বিকার চিত্তে দেখেছে আজও চীনের মত এক অতি পুরান সভ্যতার ধ্বংসলীলা জগতের চোখের সামনেই অভিনীত হোচ্ছে, কেউ বাধাদানের চেষ্টাও করছে না। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রভাব ও প্রতিপত্তি সুদূর প্রাচ্য থেকে বিলুপ্ত হয়েছে—চেম্বারলেন সম্প্রতি কমন্স সভায় কোন সভ্যের প্রশ্নের উত্তরে বলেন—চীনে ব্রিটিশ শিল্পবাণিজ্য বর্ত্তমানে ক্ষতিগ্রস্ত হোচ্ছে সত্য কিন্তু—চীন ধ্বংস হোলে বিজয়ী জাপানের ইংলণ্ডের নিকটই মূলধনের জন্য আসতে হবে, তাতে ইংলণ্ডের লাভ বই লোকসান হবে না। বণিকসুলভ লাভক্ষতির বিবেচনা কোরে যারা একটি প্রাচীন সভ্যজাতীর বিলুপ্তি নির্ব্বিকারভাবে দেখতে পারে, তাদের কতবড় অধঃপতন হোয়েছে তা ভাববার বিষয়। কোন শক্তিশালী রাষ্ট্র যে এত সংকীর্ণ স্বার্থ দেখে চল্‌তে পারে, না দেখ্‌লে তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু চেম্বারলেন শ্রেণীর সংকীর্ণ ব্যবসাবুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা বুঝতে পারছে না—যে এতে তাদের স্বার্থরক্ষা শেষ পর্য্যন্ত হবে না। জাপান চীন অধিকার কোরেই নিবৃত্ত হবে না। ব্রহ্ম দেশও

ভারতবর্ষের উপর তার দৃষ্টি পড়বে এর পর। এখনই জাপান গর্ব্ব করচে যে চীনে ইংলণ্ড ২য় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হোয়েছে। জাপানে ঘোষণা কোরেছে সুদূর প্রাচ্যে পাশ্চাত্য প্রভাব কিছুতেই সে স্বীকার কোরবে না—। ইংলণ্ড এখন কোন পথ নেবে? জাপান যদি এর পর ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি দেয়—তবে ইউরোপে জাপানের বন্ধু জর্ম্মানী ও ইটালী ইংলণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করবে, ফলে একই সঙ্গে এসিয়াও ইউরোপে যুদ্ধ চালানো ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব হোয়ে দাঁড়াবে। স্বভাবতঃ ভারতবর্ষকে তখন জাপানের ক্ষুধা মেটাতে হবে। কিন্তু এসব জেনে-শুনেও ভারতবর্ষকে অসন্তুষ্ট রাখছে কেন বৃটেন? ভারতবর্ষকেও আত্মরক্ষা করবার কথা বাস্তবতার সঙ্গে ভাবতে হবে।

প্যালেষ্টাইনে ইংরেজ—

সাম্রাজ্যবাদের প্রবল অস্ত্র হলো ভেদনীতি। ইংরেজ এই অস্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। জগতের সর্ব্বত্র এই কুট-নীতির সাহায্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভারতে ইংরেজ সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত; মুসলমান ভারত ও হিন্দু ভারত। আয়ার্ল্যাণ্ডে গড়ে তুলেছে আলষ্টার সমস্যা, সৃষ্টি করেছে গেলিক আয়ার্ল্যাণ্ড ও ব্রিটিশ আয়ার্ল্যাণ্ড। এককে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে এবং অপরকে অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে ব্রিটিশ শাসন চিরশোষণের পথ উন্মুক্ত রেখেছে জগতের সর্ব্বত্র। সমস্ত আরব মেসোপোটেমিয়া,ও প্যালেষ্টাইনেও এই ক্রূর নীতি অবলম্বন করেই সেখানকার বাসিন্দাদের সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে রক্তশোষণ নইলে চল্‌বে কি কোরে!

আমীর ফয়জলের ইরাক, আবদুল্লার ট্রান্স্‌জড়ডান, হুসেনালীর হেজাজ, এ সব রাজ্যের ইতিহাসই ব্রিটিশের স্বার্থসিদ্ধির ইতিহাস বই আর কিছু নয়। ১৯২০ সনের সেভার্স সন্ধিও (Treaty of sevres) ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপূরক হয়েই তুর্কী রাজ্যকে খণ্ড বিখণ্ড করেছিল। যুদ্ধের সময়ে আরবদের স্বজাতিপ্রীতিকে প্ররোচিত করে ইংরেজ তুর্কীর মরণের ব্যবস্থা করেছে, তুর্কীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে আরবদের। প্যালেষ্টাইনেও যে নীতি ইংরেজ অবলম্বন করেছে তাতে সেখানেও অন্তর্বিভেদ জাগিয়ে তোলার স্থায়ী পথ বানানো হয়েছে।

প্যালেষ্টাইন আরবদের দেশ। এখানকার সংখ্যাধিক বাসিন্দা আরব। প্রায় ৮ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার ইহুদী এবং প্রায় সমসংখ্যক খৃষ্টান মাত্র এখানে বাস করছে। বাকী সবাই আরব। এই আরব দেশে একটা স্থায়ী ইহুদী রাজ্য জোর করে স্থাপন করলে এখানে একটা অন্তর্বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকবে চিরদিন, একথা কে না বোঝে? অথচ ইংরেজ জেনেশুনে

ঠিক তাই কর্ব্বার চেষ্টায়ই আছে। ১৯১৭ সনের ২রা নভেম্বর বিখ্যাত বেলফুর ঘোষণা (Balfour Declaration) জগৎকে জানিয়েছিল যে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জন্য একটা "স্বদেশ" বা "National Home" স্থাপন করার চেষ্টা করবে ইংরেজ সরকার। "National Home" শব্দটা রাজনীতি শাস্ত্রে নতুন এবং এর মানেও অতি অস্পষ্ট ও অমীমাংসিত। এই নতুন পরিভাষাটা 'Zionism' নামক ইহুদীদের নবজাতীয়তাবাদকে সূচনা করে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। কারণ ইহুদীদের 'national home' শব্দটা আর যাই বোঝাক্ না কেন, "Jewish State" যে বোঝায় না একথা অ-বিসংবাদিত। বিশেষ কোরে, ইহুদী জাতীয়তা নামক বস্তুটী যেমন জগতে আছে, ৬॥০ লক্ষ লোকের আরব জাতীয়তাও তেমনি রয়েছে প্যালেষ্টাইনে। ব্রিটিশের ব্যাবসা-বাণিজ্যগত স্বার্থ এবং বিশ্বব্যাপী ইহুদী মহাজনী ব্যবসাকে খুশী করবার মতলব ইহুদীদের 'national home'এর সমর্থনের মূলে, কিন্তু আরবজাতি কেন ব্রিটিশ স্বার্থের কাছে আত্ম-বলি দিতে যাবে! কাজেই তারা সমকণ্ঠে এই Balfour প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে। League of Nations থেকে যখন ইংরেজকে প্যালেষ্টাইনের সুশাসনের দায়িত্ব (mandate) দেওয়া হয়েছিল, তখন বেলফুর প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করবার দায়িত্বও এই সঙ্গেই এদের ওপর ন্যস্ত হয়। বেলফুর প্রস্তাব হলো প্যালেষ্টাইনে ব্রিটিশ কূটনীতির এক অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে পীল কমিটীর রিপোর্ট থেকে। ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে পীল কমিশনের রিপোর্ট বের হয়। এই রয়াল কমিশন প্যালেষ্টাইনকে দুভাগ করে দুটো স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবার পরামর্শ দিয়েছে। এই দুটোর একটা হবে ইহুদী রাষ্ট্র, অন্যটী হবে আরব রাষ্ট্র। অবশিষ্ট কিছু অংশে ইংরেজ শাসনই বহাল থাকবে। ব্রিটিশ সরকার এই পীল ব্যবস্থাকে গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৭ সনের ২৩শে ডিসেম্বরের ঘোষণায় একটা Technical Commission নিয়োগ ক'রে ভাগবাটোয়ারার একটা নির্দ্দিষ্ট প্ল্যান তৈয়ার করতে আদেশ দেন। এই প্যালেষ্টাইন-বিভাগ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই Partition Commission নিযুক্ত হবার পর থেকেই প্যালেষ্টাইনে আরব বিদ্রোহ বিপুল আকার ধারণ করে। বিশেষ কোরে দলে দলে ইহুদীদের প্যালেষ্টাইনে ঢুকিয়ে স্থায়ীভাবে ইহুদী উপনিবেশ স্থাপন করবার চেষ্টা চল্‌তে থাকে বলে আরব জাতি একেবারে মরিয়া হয়ে এই প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে থাকে। ফলে সমস্ত আরবদেশে, বিশেষতঃ প্যালেষ্টাইনে ইহুদী-বিদ্বেষ আগুনের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গত এক বছর যাবৎ প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে সংঘর্ষ অবিশ্রান্ত ভাবে চলতে থাকে এবং দিনরাত্রি হত্যা, লুণ্ঠন এবং অগ্নিকাণ্ড একটানা দেশের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে। প্যালেষ্টাইনে ইংরেজ সরকার প্রকারান্তরে একরকমের সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে ব্যর্থকাম হয়েছেন। ভারত-খ্যাত টেগার্ট সাহেবের পরামর্শমত Tegart Wall নামে প্রাচীর বানিয়েও প্যালেষ্টাইনে অস্ত্র আমদানী বন্ধ করতে পারা যায়নি। অবস্থা যখন চারদিক থেকে সঙ্গীন হয়ে উঠেছে এমনি সময়ে Partition Commission রিপোর্ট দিয়েছে যে প্যালেষ্টাইন বিভাগের যতোগুলো প্রস্তাব ছিলো সবগুলোই

অকেজো। কারণ অর্থাভাবে দুটো রাষ্ট্র চালাবার মতন সুবিধে প্যালেষ্টাইনে বর্ত্তমানে নেই। এর ওপরে ভিত্তি করে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেছেন যে আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব বর্জ্জন করা হলো। বিশেষতঃ ইহুদী ও আরবদের মৈত্রীর ওপরে ভিত্তি না করলে কোনো বন্দোবস্তই কার্য্যকর হবে না এবং সেই কারণে শীঘ্রই লণ্ডনে দুপক্ষের লোকদের বৈঠকে প্যালেষ্টাইনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মীমাংসা করা হবে। দুপক্ষের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত কিছু না পাওয়া গেলে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারেই সকল ব্যবস্থা করবেন।

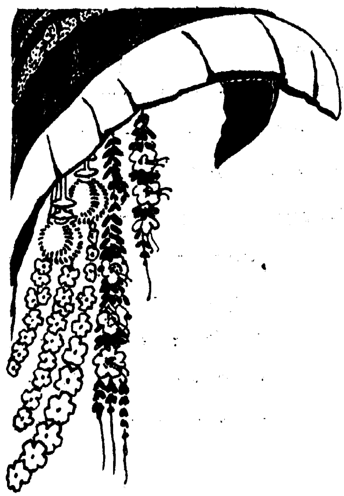
জবরদস্তি করে কোনো ব্যবস্থা কোনো জাগ্রত জাতির ওপরে চাপানো যায় না। মৈত্রী এবং সহযোগিতার পথ ব্যতীত অন্য পথে কোনো রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হয় না। এই সহজ কথাটা ইংরেজ সরকার স্বীকার করলেন অনেক বিলম্বে এবং অনেক প্রাণহানি ও অনেক রক্তপাতের পরে। স্বাধীনতার জন্যে মানুষ প্রাণ দেয়, রক্ত দেয়। একথা কি ব্রিটিশ সরকার জানতেন না? ইতিহাসের বহু সাক্ষ্য চোখের উপর রেখেও তারা প্যালেষ্টাইনে গত এক বছর ধরে আরবদের দুর্নিবার দেশপ্রেমকে অস্বীকার করেছেন। এতে তাদের বাস্তববাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। বহু বিলম্বে আজকে তারা বলছেন, "it is clear that the surest foundation for peace and progress in Palestine would be an understanding between Arabs and Jews..." আশীহাজার ইহুদীর স্বার্থের দিকে চেয়ে তারা ৬॥০ লক্ষ আরবদের স্বাধীন অধিকারকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু এই লণ্ডন সম্মেলনে যে কি সুফল ফলবে সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ রয়েছে। কারণ এতে ডাকা হবে এমন সব নেতাদের যারা ব্রিটিশ সরকারের মতানুসারে গত এক বছরের অশান্তির জন্য দায়ী নন। তার মানে আরবদের মধ্যে যারা বিদ্রোহী নন, ব্রিটিশের সমর্থক, তাদেরই কি তবে ডাকা হবে? এই একটী মাত্র সর্ত্তের রাস্তা দিয়েই সমস্ত আলোচনা ও সম্মেলনের বিফলতা আসতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে আরবরা এই লণ্ডন সম্মেলনকে বয়কট করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। তারা বলছে যে প্যালেষ্টাইনের সমস্ত অশান্তির জন্য দায়ী হচ্ছে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এবং দেশবিদেশের ইহুদী আন্দোলনের কর্ত্তারা। যে সম্মেলনের সূচনা হচ্ছে এই বিরোধ ও সন্দেহের মধ্য দিয়ে সেখানে যে কী মীমাংসা হবে তাতো বোঝাই যাচ্ছে। আমরা আশা রাখি, এখনো ব্রিটিশ সরকারের চেতনা ও শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং প্যালেষ্টাইনের সমস্ত সমাধান আরব জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সহযোগিতায় করবার ব্যবস্থা করা হবে।

কামাল আতাতুর্ক—

১৯০৫ সন থেকে ১৯১১ সন পর্য্যন্ত যে যুগ গেছে, সেই যুগে এশিয়ার সর্ব্বত্র এক নতুন জাগরণ এসেছিল। নতুন গণতান্ত্রিক আদর্শ এশিয়ার জাতিগুলিকে বিপ্লবের পথে নিয়ে চলেছিল

ধীরে ধীরে। তুর্কীতে “তরুণ তুর্ক” (Young Turk Party) দল ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্তে জনসাধারণকে প্রস্তুত করবার প্রাথমিক সাধনা করেছিল। ফলে ১৯০৯-১১ সনের বিরাট আলোড়ন তুর্কীর বুকের ওপর দিয়ে বয়ে গেল ঝড়ের মতন। আবদুল হামিদ স্বেচ্ছাচারের মুল্য দিয়ে সরে পড়ল। আনোয়ার পাশা, টিউফিক মাদার পাশা, একে একে বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেলো; যুদ্ধের যুগে তুর্কীর অপমান ও অধোগতি শেষ ধাপে নেমে গিয়েছিল। এমন সময় ১৯২২ সনে দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্য থেকে উদয় হলো তুরস্কের নব সূর্য্য মুস্তাফা কামাল। সমস্ত তুরস্ককে নবযুগোপযোগী রূপ দান করে নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন কামাল। কামাল আজ অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। চারদিকের অব্যবস্থার মাঝে তাঁর অভাব আজ তুরস্ককে কোন্ পথে নিয়ে যাবে, কেউ জানে না। কিন্তু তুরস্কের এ ক্ষতির পরিপূরণ হবে না, একথা নিশ্চিত। বিশেষ করে ভারতবর্ষের পক্ষে কামালের মতন অ-সাম্প্রদায়িক, উদার কর্ম্মবীরের জীবন্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে কামালের গ্রহীষ্ণু জীবন উদার মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ করবে, এ আশা আমাদের আছে।



ভুল সংশোধন

কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাংলার সেকালের মেয়েদের কথা’ নামক প্রবন্ধে কর্ণে[illegible]র স্থানে কর্ণেল টড হইবে।